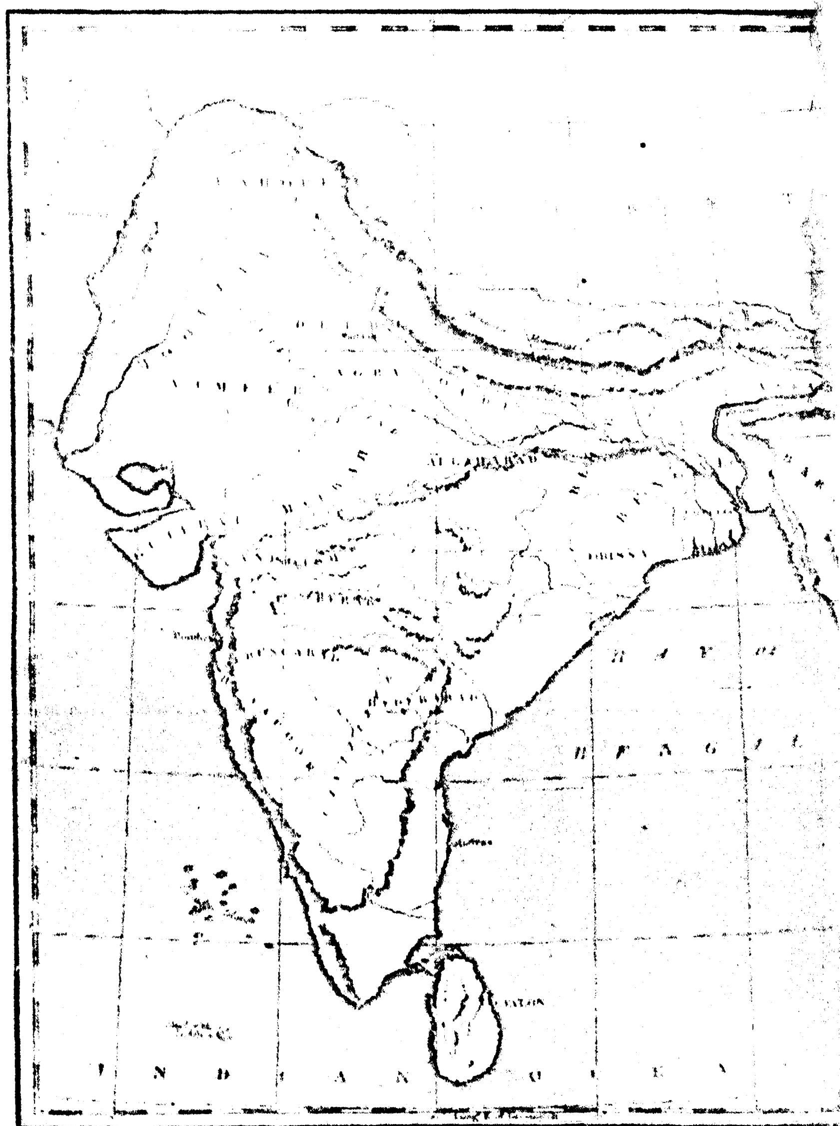


রামমোহন কর্তৃক তাঁর Judicial and Revenue System in India (লণ্ডন ১৮৩২

মুদ্রিত ভারতবর্ষের মানচিত্র।

জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা।

রামমোহন-সমীক্ষা

দিলীপকুমার বিশ্বাস



সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী :: কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক :
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ ১৩৭৩

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
চারু খান

মুদ্রক :
সুধাবিন্দু সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ৬৫'০০ টাকা

স্বর্গত পিতৃদেব ও স্বর্গতা মাতৃদেবীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

প্রাক্‌-কথন

রামমোহন রায়ের জীবন ও তাঁর কাল সম্পর্কে গত প্রায় কুড়ি বৎসর যা ভেবেছি এবং অনুসন্ধান ও অনুশীলন করেছি সে সব মিলিয়ে বর্তমান গ্রন্থখানি গড়ে উঠেছে। ১৯৬২ সালে যখন স্বর্গত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় শ্রীমতী সোফিয়া ডবসন কলেট কৃত রামমোহনের ইংরেজি জীবন-চরিতের নূতন সংস্করণ সম্পাদনা করি তখন থেকেই এই জাতীয় একখানি গ্রন্থরচনার চিন্তা আমার মাথায় এসেছিল। অবশেষে এতদিনে সেই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হল। এই গ্রন্থে রামমোহনের জীবনী নূতন করে লেখবার চেষ্টা করা হয় নি। আমি মুখ্যত তাঁর চিন্তার সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে এর বৈশিষ্ট্যনির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের জাতীয় জীবনে রামমোহনের চিন্তা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করে ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে তাঁর বসবাস আরম্ভ হবার সময় থেকে। তাঁর ভারতত্যাগ (১৮৩০) ও বিদেশে মৃত্যুর (১৮৩৩) পরেও এই প্রভাবের স্রোত কেবল যে অব্যাহত ছিল তা নয় ক্রমশ তা আরও প্রবল ও বহুমুখী হয়ে উঠেছিল। আমি সপ্তম অধ্যায়ে এর পরিণতি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অনুসরণ করেছি। কোনও বিশিষ্ট ভাবধারার উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনায় বাহ্যঘটনাভিত্তিক ঐতিহাসিক কালক্রম সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়। তবু মনে হয়, ১৮১৪-১৫ থেকে আনুমানিক ১৮৫৫ পর্যন্ত সময়কে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর কালসীমা ধরলে খুব বেশী ভুল হবে না।

রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'ভারত-পথিক'। অভিধাটির তাৎপর্য গভীর। ভারতবর্ষের ঋদ্ধিবান পরম্পরাগত সভ্যতার একটি একান্ত নিজস্ব সাধনার ধারা আছে। বেদ-উপনিষদের কাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত—সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তন, ঘাত প্রতিঘাত, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের অন্তরালে এই অসাম্প্রদায়িক উদার সার্বভৌম অধ্যাত্মসাধনার ধারাটি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবহমান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন নিজেকে তারই অন্তর্গত বলে দাবি করেছেন এবং এই আদর্শটিকেই দেশে নবাগত পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে

পরিমার্জিত করে তার ভিত্তিতে যুগোপযোগী নূতন জীবনদর্শন রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এ হল ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্তাকে নূতন করে আবিষ্কারের সাধনা। সেই সঙ্গে এ কথাটিও মনে রাখা প্রয়োজন রামমোহন ছিলেন বিশ্বপথিক। আধুনিক যুগে তিনিই বোধ করি সর্বপ্রথম মুক্তকণ্ঠে বিশ্বমানবের একজাতিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর ভিত্তিতে এক বিশ্বসংস্থা গড়বার স্বপ্ন দেখেছেন। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি করতে থাকেন শুধু ইংলণ্ড নয় আমেরিকা পরিক্রমারও পরিকল্পনা; তাঁর ফার্সী সংবাদপত্র 'মিরাৎ-উল্ আখবার' এর গ্রাহক-পরিধি সম্প্রসারিত ছিল সুদূর পারস্য পর্যন্ত; ভারতবর্ষে বাস করে পত্রালাপের দ্বারা তিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন ইংলণ্ড, আমেরিকা, পারস্য ও পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের সঙ্গে এবং সে যোগ এতই অন্তরঙ্গ ছিল যে কোনও অসুবিধার জন্য সাময়িকভাবে তা বন্ধ হলেই তত্রস্থ বন্ধুরা অভিযোগ করতে থাকতেন ('They were such that I entirely neglected my correspondence with Persia, England, America and every part of the world, as is well known to my friends in various quarters who complained of my neglect of their communications'- উইলিয়ম আলেকসাণ্ডারকে লিখিত রামমোহনের ১৬ জুলাই ১৮৩১ তারিখের পত্রাংশ); ইউরোপ থেকে ফিরবার সময় রাশিয়া, তুরস্ক ও পারস্য পর্যটন করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল (দ্রষ্টব্য, গার্সাঁ দ্য তাসীর সাক্ষ্য পৃ: ৫৩৯); সমকালীন আমেরিকায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের একজন রামমোহনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত 'রামমোহন রায়' ছদ্মনামে উক্ত মুক্তি-আন্দোলনের একখানি ইস্তাহার স্বাক্ষর করেন দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৮২); ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত স্পেনের সুবিখ্যাত উদারনৈতিক সংবিধানের একটি সংস্করণ রামমোহনকে শ্রদ্ধার সহিত উপহার দেওয়া হয়েছিল; ইত্যাদি বহু সমকালীন দলিলপত্রের সাক্ষ্য এ বিষয়ে উপস্থিত করা যেতে পারে। প্রকৃত অর্থেই রামমোহন ছিলেন তাঁর কালের সর্বপ্রধান বিশ্বনাগরিক। এই বিশ্বচেতনা তাঁর ভারতচেতনাতে এক নূতন মাত্রা যুক্ত করেছে। তাঁর বিশ্বমার্গ তাঁর ভারতমার্গেরই সুচিন্তিত পরিণতি; তাঁর চিন্তায় দুই-এর মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। তাঁর স্বদেশচিন্তার এই বৈশিষ্ট্য উত্তরকালে সর্বাধিক মূর্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথে। কবি যখন বলেন,

"In finding the solution of our problem we shall have helped to solve the world problem.···The whole world is becoming one country through scientific facility.···There is only one history—the history of man. All national histories are merely chapters in the larger one We are content in India to suffer for such a great cause." (*Nationalism* London 1950, p 99), তখন তাঁর উক্তিতে আমরা রামমোহনেরই প্রতিধ্বনি শুনি।

বর্তমান গ্রন্থের সাতটি অধ্যায়ে রামমোহনের চিন্তা ও কীর্তির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর দেশ থেকে বিশ্বে উত্তরণের এই সূত্রটি সর্বদা সামনে রাখবার চেষ্টা করেছি। প্রথম জীবনে তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্পর্শে আসেন নি; মাতৃভাষায় এবং দেশীয় পদ্ধতিতে আরবী-ফার্সী-সংস্কৃতে পাঠ নিয়েছেন, হিন্দি-উর্দুতে মাতৃভাষার মতই স্বচ্ছন্দ অধিকার অর্জন করেছেন। সেই সঙ্গে ব্যাপক পর্যটনের ফলে দেশের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর গড়ে উঠেছে নিবিড় পরিচয়। উত্তরকালে যখন তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান-ধ্যানধারণার জগতে প্রবেশ করলেন সে-সময়ে তাঁর চিন্তা ভারতীয় সংস্কারে দৃঢ়মূল। ভারতীয় উপাদানে তাঁর মনের জমিটি তখন তৈরী হয়ে গেছে। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে এই পূর্বার্জিত দেশীয় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলি পরীক্ষিত ও পরিমার্জিত হয়েছিল। হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম এবং সংস্কৃতির গভীর অনুশীলনের ফলে তিনি যে অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম জীবনদর্শনে দীক্ষিত হয়েছিলেন পাশ্চাত্য প্রভাবে তা পরিস্রুত হয়ে ক্রমশ বিশ্বজনীনতার ভূমিতে উত্তীর্ণ হল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই উপাদানই এই প্রক্রিয়াতে সমানভাবে ক্রিয়াশীল; তাঁর চিন্তার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে দুটিকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তাই রামমোহন-মানসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপাদানগুলির সংস্থান নিয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা করেছি। এটিকে পরবর্তী অধ্যায়গুলির প্রয়োজনীয় ভূমিকা রূপে পাঠ করা যেতে পারে।

ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতি রামমোহনের মনোভাব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এ কথা সত্য যে ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনকে তাঁর কালে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। এর কারণ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অন্তরঙ্গ ভাষায়: "রাজা রামমোহনের কৃপায় আমাদের মনের

দরজা-জানালা খুলে গেল, আমরা মুক্ত হাওয়া পেলাম; আমরা বুঝলাম বিদেশী গভর্ণমেন্টের পিছনে আছে এক বড় সভ্যতা, সে-সভ্যতাকে ভিক্টোরিয়ান যুগের শুচিবাই-গ্রস্ততা পর্যন্ত নষ্ট করতে পারে নি—সে সভ্যতা নিতান্তই জীবন্ত এবং তার মূল কথা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রহণ করবার দান করবার সৃষ্টি করবার স্বাধীনতা।" আর একটু ভেঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয় – ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন দুটি সম্ভাবনা—ভারতে একটি মুক্তিকামী সুসংগঠিত বুর্জোয়া-শ্রেণীর আবির্ভাব এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যায় ভারতবাসীর শিক্ষালাভ করবার সুযোগ। রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তিগণ আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের নবজন্মের বীজ যুগোপযোগী এই নবশিক্ষার মধ্যেই নিহিত; এই শিক্ষাই ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করবে; এবং এজন্য অন্ততপক্ষে অর্ধশতাব্দীকাল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজন আছে। রামমোহনশিষ্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর তো ১৮৩৮-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর Reformer পত্রে স্পষ্টই লিখেছিলেন, এই নবশিক্ষার ফলে ভারতবাসী ভবিষ্যতে একদিন স্বাধীনতা দাবি করবে এবং নিজ বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকার অঙ্গীকার পেলে (না পাবার কোনও কারণ তিনি দেখতে পান নি) ইংরেজ সে দাবি মেনে নিতে আপত্তি করবে না (দ্রষ্টব্য, পঞ্চম পরিশিষ্ট পৃঃ ৫৯৯-৬১৪)। হয়তো এমন কল্পনার মধ্যে বিদেশী শাসনের সদিচ্ছা সম্পর্কে সরল বিশ্বাসের কিছু আধিক্য ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা যে এঁদের কল্পনা-বহির্ভূত ছিল না তার প্রমাণ আছে। কার্ল্ মার্ক্সের ভাষায় বলতে গেলে ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনের দুটি ভূমিকা, একটি ধ্বংসের (destructive) অপরটি পুনরুজ্জীবনের (regenerating)। ধ্বংসাত্মক ভূমিকাটি সম্পর্কে রামমোহন অনবহিত ছিলেন না। ইংরেজশাসনে ভারতবর্ষের অর্থসম্পদ কিভাবে শোষিত হয়ে বিদেশের ও বিদেশীর সেবায় লাগছে (drainage) তিনিই প্রথম হিসাব করে তা দেখান (দ্রষ্টব্য, *English Works* Pt. III pp. 73-77)। ইংরেজ প্রবর্তিত নূতন ভূমিব্যবস্থার অধীনে কৃষককুল (that most numerous but indigent class of British subjects called Ryots) কি ভাবে উত্তরোত্তর দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে সমকালীন ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁরই রচনায় সে কাহিনী বিবৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও regeneration

বা পুনরুজ্জীবনের দিকটির উপরই তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন, কেন না তিনি জানতেন এই পথই ভারতের ভবিষ্যৎ মুক্তির পথ। ইংরেজ শাসনের নানা অন্ধকার দিক সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি তাঁর তৎসাময়িক অনুকূল মনোভাবের এই হল মর্মকথা। ইংরেজশাসন এবং এই আমলে প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্তর্নিহিত ভাবধারার স্ববিরোধ যেমন রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তিগণের দৃষ্টি এড়ায় নি তেমনি এ-সম্পর্কে অবহিত দেখা যায় একালের একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিককে। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু থেকে বেন্টিংকের নবশিক্ষানীতি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন: "...it was not so much the fact that English was established as the official and literary language that was unfortunate, as the choice of models and text-books afterwards made. It would have been prudent to train the subject races for self-government by inculcating obedience to law and a sense of discipline. The whole trend of English ideas for the next fifty years lay in the direction of pronounced individualism and freedom from restrictive bonds of every kind. Englishmen with law-abiding and phlegmatic temperaments could indulge in revolutionary theories without any noticeable effect upon their practice. But the quicker and subtler brain of the Oriental is not so apt to keep speculation and action apart. The prose models, on which for many years Indian education was based, consisted of Burke, Bentham, Mill and the philosophical Radicals. Absurdly enough our Eastern subjects were prepared for taking their part in the government of the country by the study of writers who taught that government itself was at best a necessary evil. We attempted to raise a race of administrators on the literature of Revolt." (P. E. Roberts *History of British India* Third Ed., Second Indian Impression, 1977,

p. 304)। এই খেদোক্তির মধ্যে আর কিছু থাক বা না থাক সততার অভাব নেই!

রামমোহন নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে শাস্ত্র ও যুক্তির একটি সমন্বয় করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওয়াহ্‌হিদিন্‌'-এর সময় (১৮০৩-০৪) থেকে জীবনের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত তাঁর চিন্তায় স্পষ্ট ক্রম-অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়কেই তিনি শ্রদ্ধা করেছেন এবং উভয়ের সীমাকেও মেনেছেন। 'তুহ্‌ফাৎ'-পরবর্তী যুগে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে তাঁর কাছে উচ্চতম সত্তা অবশ্যই কেবলমাত্র অনুভূতিগম্য; সে ভূমিতে লৌকিক যুক্তির অনুসরণ ফলদায়ক হতে পারে না। তাঁর ভাষায়: "....the reasoning faculty which leads men to certainty in things within its reach, produces no effect on questions beyond its comprehension ('Translation of an Abridgement of the Vedant', Introduction *English Works* II p 60; আরও দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৭৩, ১০৬-০৭)। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের নিয়ন্ত্রণে বা বিচার-বিতর্কের স্তরে অবলম্বিত তাঁর মার্গে যুক্তির স্থান ছিল সর্বপ্রথম। বেকন, লক, নিউটন প্রভৃতি যে সব ইউরোপীয় মনীষীদের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর মনের ছাঁদটা এইখানে তাঁদের সঙ্গে মিলেছে। সামগ্রিক বিচারে তাঁর মননে তাই একাধিক মাত্রার অস্তিত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উত্তরকালে ভারতীয় চিন্তাজগতের উপর রামমোহনের প্রভাবের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের মূল সূত্রও এই বহুমাত্রিকতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী অক্ষয়কুমার দত্ত, স্বাধীন চিন্তার উপাসক 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত যুবকগণ, মরমী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সকলেই নিজ নিজ ভাবে রামমোহনের চিন্তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। অথচ এঁদের নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কত প্রভেদ! এমন কি যোগমার্গী অরবিন্দকেও এই প্রসঙ্গে হিসাব থেকে বাদ দেওয়া চলে না। নিজের স্বীকৃতি অনুসারে তাঁর Yogic Sadhan গ্রন্থখানি রামমোহনের অশরীরী সত্তার অনুপ্রেরণায় লিখিত (দ্রষ্টব্য, নলিনীকান্ত গুপ্ত, 'স্মৃতির পাতা', শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলিকাতা ১৩৭০, পৃঃ ৮৯)। বহুস্তরবিশিষ্ট এই গহন চিন্তারণ্যে বিচরণ সহজ কাজ নয়; এর দুরূহতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য যে রামমোহন কোনও একটি স্থানে বা গ্রন্থে

সুশৃঙ্খল ভাবে তাঁর চিন্তাসূত্রগুলি বিবৃত করে যান নি—জীবনে সে সময়ই তিনি পান নি। একাধিক ভাষায় রচিত তাঁর টীকা, ভাষ্য, অনুবাদ, বিচারগ্রন্থ ও পত্রাবলীতে এবং সমকালীনগণের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণে এগুলি ছড়িয়ে রয়েছে, কোথাও স্পষ্ট কোথাও বা অস্পষ্ট আকারে। জিজ্ঞাসুকে সেগুলি স্বীয় চেষ্টায় খুঁজে বার করে সাজিয়ে নিতে হয়। তবেই এ চিন্তারাজ্যের সমগ্র রূপের আভাস পাওয়া যায়। আমার মনে হয় এ পর্যন্ত একমাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছাড়া রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও মনীষার এই বহুমাত্রিকতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি সম্যক্ ভাবে কেউ আকর্ষণ করেন নি। তাঁর চিন্তা বা কীর্তির এক-একটি বিশিষ্ট ধারা নিয়ে আলোচনা অনেকেই করেছেন এবং অনেক সময় সার্থক ভাবেই করেছেন। কিন্তু অসুবিধা হয়েছে তখনই যখন এই আংশিক মূল্যায়ন সমগ্রভাবে রামমোহনের উপর আরোপিত হয়েছে। এতে পরিপূর্ণ চিত্র ফোটেনি। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মত ভূয়োদর্শী মনীষীও এ-বিষয়ে সূত্রাকারে কয়েকটি ইঙ্গিতের বেশী আর কিছু লিপিবদ্ধ করে গেলেন না। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় থেকে সপ্তম অধ্যায়ে আমি সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে কিছু বিস্তারিত ভাবে রামমোহনের চিন্তার সমগ্র রূপটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়গুলিতে এর কয়েকটি মৌলিক উপাদানের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেগুলি সচরাচর উপেক্ষিত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত রামমোহনের চিন্তাসূত্রগুলির একত্র আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনের একটি সমগ্র পরিচয় দেবার প্রয়াস পাঠক লক্ষ্য করবেন। পঞ্চম ও সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলির প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও আশা করি কোনও প্রশ্ন উঠবে না। প্রধানত অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজ প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা আরম্ভ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রয়াস অপেক্ষাকৃত সুব্যবস্থিত, বিচিত্রমুখী ও গভীরগামী হয়। সম্প্রতি এমন একটি মত প্রচারিত হয়েছে, ইংরেজ পণ্ডিতগণের প্রাচ্য বিদ্যানুশীলন ভারত-সংস্কৃতির প্রাচীন সম্পদ শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুসমাজের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়ার ফলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় চিত্তজাগৃতি সম্ভবপর হয়েছিল। রামমোহনের জীবন ও সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রশ্নটির বিচার করেছি পঞ্চম অধ্যায়ে। হিন্দু কলেজের প্রতিভাশালী তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও এবং তৎপ্রভাবিত ছাত্রদল বাঙ্‌লা দেশে যে স্বাধীন

চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করেন তার সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগের বিষয়টি সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য। দুই সমকালীন মনীষী রামমোহন ও ডিরোজিওকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করবায় একটি প্রবণতা বর্তমানে কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তম অধ্যায়ের বক্তব্য পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

পঞ্চম অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে আর একটি বক্তব্য আছে। আমি রামমোহনের খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত গবেষণাকে তাঁর প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের কোঠায় ফেলতে দ্বিধা করিনি। খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব প্রাচ্যভূমিতে; এর প্রবর্তক স্বয়ং প্রাচ্যদেশীয়। আদি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র প্রাচ্য ভাষা হিব্রুতে রচিত; পরে অবশ্য গ্রীক এবং লাটিন তার মাধ্যম হয়েছিল। এ শাস্ত্র আলোচনা-গবেষণার নিমিত্ত রামমোহনকে হিব্রু-গ্রীক-লাটিন-সিরিয়াক ভাষাসমূহের চর্চা এবং উক্ত ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থাদি ব্যবহার করতে হয়েছিল। তাঁদের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। আমি এই পণ্ডিতদের পরিচয় যথাসাধ্য উদ্‌ঘাটন করে এ বিষয়ে রামমোহনের অনুশীলনক্ষেত্রের পরিধি নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি (দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৩০-৩৫ । যতদূর জানি এ প্রসঙ্গটির কোনও উল্লেখযোগ্য আলোচনা এখন পর্যন্ত হয়নি। রামমোহন যে সব পাশ্চাত্য ইতিবৃত্তকারদের সাহায্য নিয়েছেন তাঁদের গ্রন্থাদির নাম তিনি উল্লেখ করেছেন প্রায়ই খুব সংক্ষেপে (দ্রষ্টব্য, *English Works* III p 6n)। সে সবের পূর্ণ পরিচয়ও পঞ্চম অধ্যায়ে পাওয়া যাবে (দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৫১-৫৩)। উল্লেখ্য যে লণ্ডন থেকে ১৮৩২ সালে Smith Elder & Co কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর Exposition of the Practical Operation of the Judicial and Revenue System of India গ্রন্থের মুখবন্ধরূপে রামমোহন ভারতবর্ষের যে সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ লেখেন সেটি বিশদ করবার জন্য তিনি এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র মুদ্রিত করেছিলেন। রামমোহন-গ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে সেখানি দেখা যায় না। বর্তমান গ্রন্থের মুখচিত্ররূপে সেটি প্রকাশিত হল। সে যুগে ভারতীয়গণের মধ্যে খুব কমসংখ্যক ব্যক্তিই স্বদেশবিষয়ক আপন বক্তব্য স্পষ্ট করবার উদ্দেশ্যে মানচিত্র-ব্যবহারের কথা ভেবেছেন। এখানি স্বদেশের ভৌগোলিক ঐক্য সম্পর্কে রামমোহনের নিশ্চিত ধারণার দ্যোতক।

এই গ্রন্থরচনায় আমি যে সব নূতন দলিলপত্রের সাহায্য নিয়েছি তার কিছু কিছু আটটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। সপ্তম ও অষ্টম পরিশিষ্টে মুদ্রিত সমকালীন ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রবাদী নেতা রবার্ট্ ওয়েন ও তাঁর পুত্রকে লিখিত পত্রগুলি রামমোহনের এক নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নবপ্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন— কিন্তু ওয়েনের প্রবল ধর্মবিরোধিতা ও নাস্তিকতা এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হবার পক্ষে তাঁর কাছে বাধাস্বরূপ মনে হয়েছিল। এই সূত্রে ওয়েন-পুত্র রবার্ট্ ডেলকে লিখিত পত্রে তিনি একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেন যার মর্ম এই : "যদি কোনও যুক্তিবাদী (free-thinker) ধর্মের তত্ত্বভাগ (ঈশ্বর, পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কীয় বিশ্বাস) গ্রহণ করতে অপারগও হন তা হলেও খ্রীষ্টীয়, হিন্দু প্রভৃতি উচ্চপর্যায়ের ধর্মসমূহ যে প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে আসছে সেই চিরন্তন পুরুষার্থগুলি গ্রহণ করবার পক্ষে তাঁর বাধা কোথায়? রবার্ট্ ওয়েন সেটুকু করলে তাঁর সমাজতন্ত্র প্রচারের পথ সুগম হবে।" সাম্প্রতিক নীতিবোধের জগতে রামমোহন উত্থাপিত এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসহীন কিছু কিছু পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী মনীষী বর্তমান ভোগলোলুপ, বিচ্ছিন্নতাবোধপীড়িত আণবিকযুদ্ধাতঙ্কগ্রস্ত সভ্যতার পক্ষে ধর্মপ্রবর্তকগণের, বিশেষ করে খ্রীষ্টধর্মের প্রেমের বাণীকেই একমাত্র প্রতিষেধক মনে করছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নাস্তিকতা সুবিদিত। যাঁরা তাঁর Why I am not a Christian পড়েছেন তাঁরা জানেন খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসে খ্রীষ্টধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা কত তীব্র। স্বতন্ত্রভাবে খ্রীষ্টধর্মনীতিকে কিন্তু রাসেল চিরদিন উচ্চ মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। বহু বৎসর পূর্বে লেখা *Roads to Freedom*-এ তিনি বলেছিলেন (Third Ed, p. 188), "A life lived in this spirit—the spirit that aims at creating rather than possessing—has a certain fundamental happiness of which it cannot be robbed by adverse circumstances. This is the way of life recommended in the Gospels, and by all the great teachers of the world."। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এ বিষয়ে তিনি হয়ে পড়েছেন আরও আবেগপ্রবণ—এই সময়কার অপর এক গ্রন্থে তাঁকে বলতে শোনা যায় : 'The root of the matter is a very simple and old-fashioned thing, a thing so

simple that I am almost ashamed to mention it, for fear of the derisive smile with which wise cynics will greet my words. The thing I mean······is love, Christian love, or compassion. If you feel this, you have a motive for existence, a guide in action, a reason for courage, an imperative necessity for intellectual honesty. If you feel this you have all that anybody should need in the way of religion. Although you may not find happiness, you will never know the deep despair of those whose life is aimless and void of purpose; for there is always something that you can do to diminish the awful sum of human misery". (*The Impact of Science on Society.* Second Impression 1959, p 114)। জি. ই. মুরের মত বিশ্লেষণমার্গী, বাহ্যার্থবাদী (realist) দার্শনিকও নীতি-দর্শন সংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্মনীতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে ভোলেন নি (*Principia Ethica* Cambridge 1960, p. 177)। মোট কথা ঘাত-প্রতিঘাতময় পরিবর্তনশীল বাহ্য পরিবেশের উপর মানুষের নীতিচিন্তাকে স্থাপন করার পরিবর্তে চিরন্তন পুরুষার্থরূপে প্রেম, মৈত্রী ও কারুণ্যের অনুশীলনের পথেই যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক শ্রেয় লাভ সম্ভব এ ভাবনা বর্তমানে আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে কিছু কিছু বিচারশীল চিন্তানায়কের মনকে নাড়া দিয়েছে। রবার্ট্ ডেল ওয়েনকে লিখিত পত্রে রামমোহনকে সংক্ষেপে এই সমাধানসূত্রটিই তুলে ধরতে দেখা যায়।

এই গ্রন্থের কোনও কোনও অংশ ইতিপূর্বে পত্র-পত্রিকায় বা অন্যত্র প্রাথমিক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল—যথা 'রামমোহন রায় ও বেদান্ত' (বিশ্বভারতী পত্রিকা—বর্ষ ২৮ সংখ্যা ২); 'রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল' ('ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল—'যোগেশচন্দ্র বাগল স্মারক-গ্রন্থ', নব বারাকপুর ১৯৭৪); 'রামমোহন রায় ও পুরাণ-তন্ত্র' অধ্যায়ের তন্ত্রসংক্রান্ত অংশ ('রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্ত্রশাস্ত্র' —বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৪); এবং পরিশিষ্টভুক্ত 'রামমোহন রায় ও ফরাসী বিদ্বন্মণ্ডলী'-র প্রথম অংশ (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ১) ও

'জবাব্-ই-তুহ্ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্' ('তত্ত্বকৌমুদী' ১-১৬ শ্রাবণ ১৩৭৬ ; ১-১৬ ভাদ্র, ১৩৭৬ ; ১-১৬ আশ্বিন, ১৩৭৬)। মূলত সে রচনাগুলি গ্রন্থপরিকল্পনারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রন্থভুক্তির সময় সবগুলিই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত এবং স্থলবিশেষে পরিবর্তিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ছাপার কাজ চলেছে ; এর মধ্যে আমার অনবধানতার জন্য কোনও কোনও শব্দের প্রচলিত দু'রকম বানান মুদ্রিত হয়েছে। এর জন্য এবং আরও কয়েকটি অসাবধানতাপ্রসূত ভুলের প্রতি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলির জন্যও পাঠকবর্গের ক্ষমা প্রার্থনা করছি : (১) প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ কোলব্রুকের মৃত্যু তারিখ ২১৮ পৃষ্ঠায় ১৮৩৭-এর স্থলে ১৮৩৬ ছাপা হয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করবেন ২৩৯ পৃষ্ঠায় এটি যথাযথ ১৮৩৭ ই আছে ; (২) পৃঃ ২৭২—উল্লেখ সংখ্যা ১৩৩ ভ্রমক্রমে ১৭৩ ছাপা হয়েছে ; (৩) পৃঃ ২৭২—দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি, 'বিধবাবিবাহ সমর্থন' স্থলে পাঠ 'বিধবাবিবাহ নিবারণ' হবে ; (৪) পৃঃ ১২৩, পঙ্‌ক্তি ১৭-তে প্রদত্ত বেদান্তাচার্যদের তালিকায় 'শ্রীপতি' স্থলে অনবধানতাবশত 'শ্রীকর' মুদ্রিত হয়েছে। 'শ্রীকর' প্রকৃতপক্ষে বীরশৈব ভাষ্যকার শ্রীপতি রচিত বেদান্তভাষ্যের নাম। পাঠক লক্ষ্য করবেন শ্রীপতি ও তৎকৃত শ্রীকরভাষ্য অন্যত্র যথাযথভাবেই উল্লিখিত ও ব্যবহৃত হয়েছে (দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১২৪, ১৬১ ও ১৯৭ উল্লেখ '২৭' ও '২৮') ; (৫) পৃঃ ২৮০—পঙ্‌ক্তি ২—উল্লেখ সংখ্যা '১৪৭ ক' ভ্রমক্রমে '১৪৬ ক ছাপা হয়েছে। এগুলি আবিষ্কার করে ভয় হচ্ছে, এ জাতীয় আরও ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই গ্রন্থ রচনায় আমার দুই পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীসুশোভনচন্দ্র সরকার ও ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রথম থেকে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। এঁরা আজ প্রয়াত। আমার প্রচেষ্টার মধ্যে দোষক্রটি যাই থাকুক আমি জানি তাঁরা বইটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে দেখলে কত খুশী হতেন। দুজনকেই আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। রামমোহনের মূল বিচারগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করতে হলে ভারতীয় শাস্ত্রবিচারপদ্ধতির সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃত কলেজ টোলবিভাগের মহাচার্য পণ্ডিত শ্রীমোহন তর্কবেদান্ততীর্থ ও সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারের পুঁথিবিভাগের প্রাক্তন পণ্ডিত অনন্তদেব তর্কতীর্থের কাছে ভারতীয় দর্শনের পাঠ নেওয়ার ফলে এ বিষয়ে আমি পরম উপকৃত হয়েছি। আমার এই দুই আচার্যকে সশ্রদ্ধ প্রণাম

জানাচ্ছি। দ্বিতীয় অধ্যায় রচনাকালে বুদ্ধবচনপ্রামাণ্য সংক্রান্ত দু'খানি পালি শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সংস্কৃত কলেজের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী। পঞ্চম অধ্যায়ের ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক প্রসঙ্গগুলি লিখবার সময় সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতবিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীমতী সুব্রতা সেনের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। আমার ছাত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমৃণালকান্তি চন্দ ও ছাত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী অনীতা কুমার আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। আমার সিদ্ধান্তসমূহের এবং ত্রুটিবিচ্যুতির দায়দায়িত্ব অবশ্য সবই আমার নিজের। গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে এঁদের সকলেরই উল্লেখ পাওয়া যাবে। কিন্তু স্নেহভালবাসার ঋণ তার দ্বারা শোধ হয় না। আমার পত্নী শ্রীমতী ভারতী দেবী যদি সংসারের সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় ও প্রফুল্ল চিত্তে বহন করে সে বিষয়ে আমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না করতেন তাহলে বইটি লিখতে এতখানি সময় ও শ্রম ব্যয় করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। এ ঋণও অপরিশোধ্য। বইটি সুধীসমাজ ও ছাত্রগবেষকদের দ্বারা সমাদৃত হলেই সকল শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃপক্ষ অশেষ সৌজন্য সহকারে তাঁদের সংগ্রহ থেকে দু'খানি ব্লক ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছেন। সারস্বত লাইব্রেরী বইটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রকাশ করতেই শুধু এগিয়ে আসেন নি, দুই বছরের অধিক কাল ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে মুদ্রণকার্যের তত্ত্বাবধান করেছেন। এঁদের উদ্যম ছাড়া গ্রন্থখানি এভাবে প্রকাশিত হতে পারত কিনা সন্দেহ। কামনা করি এঁদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীবিভাস ভট্টাচার্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী ডঃ অশোক ভট্টাচার্যের জন্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। সর্বশেষে ব্রাহ্মমিশন প্রেস কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

বিষয়-সূচী

চিত্রসূচী

সংক্ষেপিত উল্লেখ-তালিকা

১ গ্রন্থাবলী = রামমোহন-গ্রন্থাবলী (সাতখণ্ডে সম্পূর্ণ); বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

২ নগেন্দ্রনাথ=নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' পঞ্চম সংস্করণ; ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯২৮।

৩ Collet = The Life and Letters of Raja Rammohun Roy by S. D. Collet; Third Edition, ed. Dilip Kumar Biswas and Prabhat Ghandra Ganguli; Calcutta 1962.

৪ English Works = The English Works of Raja Rammohun Roy ed. Kalidas Nag and Debajyoti Burman, Parts I-VI; Calcutta 1945-51.

৫ English Works (G) = The English Works of Raja Rammohun Roy, ed. Jogendra Chandra Ghosh Vol. I, Calcutta 1885; Vol. II, Calcutta 1887.

৬ Last Days = The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy by Mary Carpenter; Calcutta Edition, 1915.

Letters and Documents = Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy, Vol. I, (1791-1830); ed. Ramaprasad Chanda and Jatindra Kumar Majumdar, Calcutta 1938.

Progressive Movements = Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India: A Selection from Records 1775-1845; ed. Jatindra Kumar Majumdar, Calcutta 1941.



প্রথম অধ্যায়

রামমোহন রায়ের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ

জাতীয় সংহতি অর্জনের সমস্যা সম্ভবত বর্তমান ভারতবর্ষের সম্মুখে কঠিনতম অবশ্যবিচার্য প্রশ্নগুলির একটি। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যতদিন দেশ বিদেশী শাসনবিন্যাসে শৃংখলিত ছিল ততদিন এ সমস্যা আজকের মত কঠোর বাস্তবে রূপান্তরিত হয় নি। ইংরেজ শাসনের আমলে প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে আগত নব্য চিন্তার সংস্পর্শেই ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা সর্বপ্রথম সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় নবজাগৃতির প্রথম পর্বের নেতৃস্থানীয় পুরুষগণ যে সব কারণে ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ জ্ঞান করেছিলেন এটি তার অন্যতম। প্রথম যুগে এই দেশচৈতন্য ছিল প্রধানত একটি ভাবগত আদর্শ; কিন্তু উত্তরকালে তা ক্রমশ একটি বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করে এবং নানা অভ্যন্তরীণ স্তরভেদ ও বিরোধ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত একটি উগ্র ও একমুখী আন্দোলনে পরিণত হয়। শেষ পর্বে এই জাতীয় আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী শাসনের অপসারণ। যে বিকেন্দ্রিক শক্তিগুলি সাম্প্রতিক কালে সমগ্র ভারত-চেতনাকে খণ্ডিত করতে উদ্যত সেগুলির অস্তিত্ব যে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ছিল না তা নয়; কিন্তু ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব ও ইংরেজ-বিতাড়নের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাই সেগুলিকে বহুলাংশে প্রশমিত রেখেছিল। অপর পক্ষে ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা দেশের রাষ্ট্রীয় অঙ্গবিন্যাসে এমন এক সমরূপতার সৃষ্টি করেছিল যাকে বাহ্যদৃষ্টিতে সহজেই মৌলিক জাতীয় ঐক্য বলে ভুল হতে পারে। এই কাঠামোটিকে রক্ষা করবার জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত কখনও দমননীতি, কখনও বা কূটকৌশল প্রয়োগের দ্বারা বিকেন্দ্রিক স্বার্থের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিয়ে এসেছে। তার আচরণের ব্যতিক্রম ও বৈপরীত্য ঘটল শাসনের অন্তিম পর্বে—যখন তার ভারত-ত্যাগ যে ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি এ বিষয়ে সে সুনিশ্চিত। আঞ্চলিকতা, ধর্মান্ধতা, গোষ্ঠীবিরোধ প্রভৃতি সর্ববিধ সংকীর্ণ মনোভাব এই সময়েই সম্পূর্ণ

বল্‌গামুক্ত হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। বিদেশী শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-বিরোধিতারূপ যে ঐক্যসূত্রটি এই পরস্পর বিরোধী স্বার্থগুলিকে বাহ্যত আবদ্ধ রেখেছিল সেটিও লুপ্ত হল; ইংরেজের শাসন-নিয়ন্ত্রণও আর রইল না। এই ভাবে অন্তরবাহিরের বাধা একযোগে অপসারিত হওয়ার ফলেই যে সাম্প্রতিক বিভক্ত ভারতবর্ষেও ঐক্যচেতনা ও খণ্ডস্বার্থবোধের সংঘাত ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে—ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠক সে কথা স্বীকার করবেন। কিন্তু সমস্যাটি বর্তমানে প্রবল আকারে আমাদের দৃষ্টিগোচর হলেও এর সূত্রগুলি পুরাতন এবং ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে জড়িত। আধুনিক যুগের অভ্যুদয় থেকেই ভারতীয় মনীষিবৃন্দ এ বিষয়ে চিন্তা করেছেন এবং তাঁদের মনন ও কর্মসাধনার মধ্যে সমাধানের মূল্যবান ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন। জাতীয় জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও রামমোহন রায়কে পথিকৃৎ মনে করলে ভুল হবেনা।

একথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে আধুনিক কালে ইংরেজি 'নেশন' ও 'ন্যাশনালিজম' এর বাঙলা প্রতিশব্দরূপে যে 'জাতি' ও 'জাতীয়তা' শব্দদ্বয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত—সে দুটির অন্তর্নিহিত প্রত্যয় আমরা লাভ করেছি পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে। এই অর্থে অখণ্ড দেশচেতনা ভারতবাসীর স্বভাবসিদ্ধ নয়। এ-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি স্মরণীয়: "এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত, জাঠ, এক ধর্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালি, বেহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলী কনোজী একভাষী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্বাংশে এক; যাহাদের এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতা জ্ঞান নাই।... ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে,

বুঝাইতেছে ; যে পথে কখন চলি নাই সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে হিন্দু জানিত না।"[১]

বঙ্কিম তাঁর উক্তিতে জাতি শব্দে পশ্চিমী অর্থে 'নেশন' বা 'ন্যাশনালিটি' বুঝেছেন। এই অর্থে 'জাতি' শব্দের প্রয়োগ ইউরোপেও আধুনিক কালের পূর্বে প্রচলিত হয় নি। 'রেনেশাঁস' ও 'রিফর্মেশন' ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রে যে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তারই ফলে ইউরোপের মধ্যযুগীয় মানচিত্র বদলে যায় ও জাতিভিত্তিক রাজতন্ত্র-শাসিত রাষ্ট্রগুলি (Monarchical Nation States) সেখানে ধীরে ধীরে রূপগ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়া পাশ্চাত্য জগতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল। ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রের জন্ম এই শতাব্দীতেই। 'জাতি' শব্দের এই নূতন অর্থ ও 'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কিত এই আধুনিক প্রত্যয় পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে অন্য পাঁচটি পশ্চিমী ভাবধারার মতই এদেশের শিক্ষিত সমাজের চিত্ত আলোড়িত ও আকৃষ্ট করেছিল। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত চিন্তার ইতিহাসে যে এর নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত সমীচীন বলে মেনে নিলেও এমন ধারণা করা ভুল হবে, ভারতবাসীর মনে দেশচৈতন্য কখনও কোনও রূপেই প্রতিফলিত হয় নি।

ইতিহাসে ভারতবাসীর ঐক্য-চেতনাকে সাধারণতঃ তিনটি ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়। এর প্রথমটি ভৌগোলিক পরিধিগত ঐক্যবোধ। তার সম্যক প্রকাশ হয়েছে সমগ্র ভূখণ্ডটির জন্য একটি নাম পরিকল্পনার মধ্যে। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে এই নাম হল ভারতবর্ষ ; বৌদ্ধ সাহিত্যে পৌরাণিক ঐতিহ্য থেকে একটি নাম গ্রহণ করে ব্যবহার করা হয়েছে—জম্বুদ্বীপ ; ও মধ্যযুগে এর পরিবর্তে এসেছে হিন্দ্ বা হিন্দুস্তান। ভৌগোলিক অর্থে এই নামগুলি সমগ্র দেশবাচক। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিষ্ণুপুরাণের এই ভারতবর্ষ বর্ণনায় :

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।[২]

এই উক্তি বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক নয়। পৌরাণিক সাহিত্যে গানের ধুয়ার মতই বার বার তা উচ্চারিত হয়েছে। বায়ুপুরাণে এটিকেই আমরা আবিষ্কার করি পরিবর্তিত আকারে :

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণং চ যৎ।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা ॥[৩]

অথবা মার্কেণ্ডেয় পুরাণে :

দক্ষিণাপরতো হ্যস্য পূর্বেণ চ মহোদধিঃ।
হিমবানুত্তরেণাস্য কার্মুকস্য যথা গুণঃ ॥[৪]

মৌর্যসম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য পূর্বে ও দক্ষিণে অল্প কিছু অংশ বাদ দিয়ে প্রায় সমগ্র ভারতে বিস্তীর্ণ ছিল। তিনি স্বয়ং তাঁর এক শিলালেখে এই দেশকে অভিহিত করেছেন 'জম্বুদ্বীপ' নামে। দ্বিতীয় ধারাটিকে বলা চলে রাষ্ট্রীয় ঐক্যচেতনা। আসমুদ্রহিমাচল রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অবশ্য ভারতবর্ষে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে অতি অল্পকালের জন্য; তবু চিন্তার স্তরে একরাষ্ট্র কল্পনার অস্তিত্ব একেবারে দুর্লভ নয়। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে হিমালয় থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ-বিস্তীর্ণ ও তির্যক ভাবে সহস্র যোজন পূর্ব-পশ্চিম-বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে (অর্থাৎ আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষকে) চক্রবর্তি-ক্ষেত্র—অর্থাৎ একচ্ছত্র চক্রবর্তী সম্রাটের অখণ্ড শাসনক্ষেত্র নামে অভিহিত করেছেন।[৫] উত্তরকালে নাট্যকার ও আলঙ্কারিক রাজশেখরের (নবম-দশম শতাব্দী) 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থেও আমরা 'চক্রবর্তি-ক্ষেত্র'-এর প্রায় একই সংজ্ঞা পাই।[৬] এখানে বলা হয়েছে কুমারিকা অন্তরীপ থেকে বিন্দু-সরোবর (হিমালয়ে অবস্থিত) পর্যন্ত সহস্রযোজনব্যাপী ভূমিখণ্ডের নামই চক্রবর্তি-ক্ষেত্র। এই ভূমি যিনি জয় করতে পারেন তিনিই চক্রবর্তী সম্রাট্ গণ্য হন। থেরবাদী বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ 'অঙ্গুত্তর-নিকায়' সমগ্র জম্বুদ্বীপখণ্ডে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা এক চক্রবর্তী সম্রাটের শাসনের বিষয় কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।[৭] কিন্তু এই একরাষ্ট্র কল্পনা প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে অতি অল্প সময়ের জন্যই। ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন পর্বে চন্দ্রগুপ্ত থেকে অশোক পর্যন্ত মৌর্যরাজগণ ও গুপ্তবংশীয় কয়েকজন নরপতি এই কল্পনাকে বাস্তব রূপদানের প্রয়াস পেয়েছিলেন কিন্তু স্থায়ী ফললাভ করতে পারেন নি। আলাউদ্দীন খল্‌জি থেকে ঔরংজিব পর্যন্ত মধ্যযুগের সম্রাটগণের উত্তর ভারতীয়

রাষ্ট্রের সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলকে যুক্ত করবার কয়েক শতাব্দীব্যাপী উদ্যমের মধ্যেও একই মনোভাব প্রতিফলিত ; কিন্তু খল্‌জি-তুঘলক পর্বে অত্যল্পকাল ও ঔরংজিবের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর ভিন্ন এ স্বপ্নের পূর্ণ সাফল্য কোথায় ? ঐতিহাসিক ভারত-চেতনার শেষ ধারাটি তুলনায় সম্ভবত সর্বাধিক জটিল। পরিধিগত অখণ্ডত্ব বা শাসনতান্ত্রিক সমীকরণের স্তর অতিক্রম করে ঐক্যবোধ এখানে যে ভূমিতে উত্তীর্ণ, সেখানে ভৌগোলিক রূপ বা রাষ্ট্রবিস্তারের কল্পনার তার কোনও মূর্ত প্রকাশ হঠাৎ চোখে পড়ে না। একে বলা যেতে পারে, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, লোকব্যবহার, কৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসংখ্য বৈচিত্র্য, বিরোধ ও ব্যবধানের অস্তিত্ব সত্ত্বেও জাতীয় জীবনে একটি মানসিক ও আত্মিক ঐক্যভূমি আবিষ্কার করবার সদা জাগ্রত প্রবণতা। এই ভাবরূপী ও অন্তর্মুখীন ঐক্যবোধ সর্বদা জনমানসের সচেতন স্তরের বস্তু নয়। অতি সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল মনের অনুভূতিতে ভিন্ন তা সহজে ধরা পড়ে না। এর আভাস পাওয়া যায় কবির কল্পনায় বা সাধকের ধ্যানে। উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে সুপরিচিত সপ্ততীর্থ বর্ণনা :

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥

অথবা অনুরূপ সপ্তনদীস্তুতি :

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

ছত্রগুলি আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মনে সমগ্র দেশের একটি বিশেষ ভাবমূর্তির উদয় হয়। অথচ তা পূর্ণমাত্রায় ভৌগোলিক রূপ নয়, রাষ্ট্রীয় ঐক্যগত রূপ তো নয়ই। ভারতবর্ষ এখানে মাত্র ভৌগোলিক সত্তা বা অখণ্ড রাষ্ট্র অপেক্ষাও বেশি কিছু—এক কথায় বলতে গেলে একটি বিশিষ্ট সংস্কার। বস্তুজগৎ অবলম্বন করে এই সংস্কার বিকশিত হলেও শেষ পর্যন্ত বস্তুর আশ্রয় ছেড়ে তা এক ভাবসামান্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতের দূরতম দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র-নির্গত শিলাখণ্ডের উপর বসে বিবেকানন্দের চিত্তে সমগ্র দেশের যে রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, এ সেই রূপ।

রামমোহনের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারত-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে। সর্বভারতীয় মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র তখন ভেঙে পড়েছে,

আঞ্চলিক স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে সমস্ত দেশ বিমথিত। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে ইংরেজ-রাজত্বের বুনিয়াদ গড়ে উঠছিল, কিন্তু তা সুনিশ্চিত ও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে মারাঠা শক্তির পতনের পর। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল মার্কুয়িস অফ হেস্টিংস্ এক প্রকাশ্য ঘোষণায় বলেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকার করেছে। বণিকের মানদণ্ডের রাজদণ্ডে রূপান্তর এইবার সম্পূর্ণ হল। রামমোহন কৈশোর-যৌবনে এই ভাঙাগড়ার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন। ভারতের পূর্বতন নিজস্ব রাষ্ট্রীয় ঐক্যকল্পনার সঙ্গে এই নবাগত সার্বভৌম বিদেশী শাসনাদর্শের মৌলিক পার্থক্য ও দ্বিতীয়টির স্বকীয়ত্ব সহজেই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। আধুনিক ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন, নবপ্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য শাসনের পশ্চাতে রয়েছে এক বিরাট সভ্যতা যার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শই একমাত্র ভারতবাসীর নিজস্ব সভ্যতার প্রাণশক্তিকে যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপযুক্তভাবে সক্রিয় ও সৃষ্টিশীল করে তুলতে পারে। একথাও বুঝতে তাঁর মত প্রতিভাধরের বিলম্ব হয়নি যে ভারতীয় সংস্কৃতি রাষ্ট্রচিন্তায় দুর্বল; আধুনিক কালের রাষ্ট্রনির্ভর জাতীয়তাবোধের আদর্শ অনুযায়ী ভারতবাসীকে যদি বিশ্বের দরবারে এক-জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হয় তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রশাসনাদর্শের পরিবর্তে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞাননির্ভর ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশাসনের অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। অপর পক্ষে শেষোক্ত রাষ্ট্রাদর্শের মধ্যে যে সর্বগ্রাসী সমীকরণতত্ত্বের সম্ভাবনা নিহিত আছে সে বিষয়েও তাঁর দৃষ্টি সজাগ ছিল। ভারতীয় দৃষ্টিতে ঐক্য ও সমীকরণ এক নয়। নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব যেমন স্বীকৃত, সংস্কৃতির জগতে নানা বিচিত্র, এমন কি বিরোধী উপাদানের সহাবস্থান সত্ত্বেও সমমানসিকতার একটি বুনিয়াদ ভারতীয় চিন্তায় তেমনি সুনির্দিষ্ট। এ-কথা মনে করবার কারণ আছে। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দেশচৈতন্য মনে প্রবল থাকায় পাশ্চাত্য রাষ্ট্রাদর্শকে রামমোহন দেশগঠন সমস্যার একমাত্র সমাধান বিবেচনা করেন নি।

ভৌগোলিক পরিধিগত ও সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধ দুই স্বতন্ত্র স্তরের চিন্তা হলেও পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। বাহ্য দেশপরিচয় থেকেই ভারতবাসীর দেশচেতনা ক্রমশ অন্তর্লোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই দুই

স্তরের চৈতন্যকে অধিগত করবার মুখ্য উপায় ছিল তীর্থভ্রমণ—যা তখনকার দিনে সাধিত হত প্রধানতঃ পদব্রজে—কখনও বা আজকের তুলনায় অতি মন্থরগতি যানবাহনের সাহায্যে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণরহস্যের যাঁরা ধারক-বাহক সেই পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, যোগী, শ্রমণ, পীর, ফকীর, দরবেশ, বাউল প্রভৃতির অধিকাংশ ছিলেন পর্যটক। এই অদ্রুত, বিপদসঙ্কুল, শ্রমসাধ্য ভ্রমণের মাধ্যমে দেশের বহুবিচিত্র প্রকৃতি, মানুষ, জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ঘটত। বহুযুগসঞ্চিত সেই পরিচয়ের অভিজ্ঞতাই ছিল ভৌগোলিক ও সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধের জনক। এই ঐক্যচেতনা রাষ্ট্রকে আধাররূপে অবলম্বন করে নি, কেননা ভারতীয় চিন্তায় সার্বভৌম রাষ্ট্রের কল্পনা থাকলেও ইতিহাসে তার সফল পরীক্ষা হয়েছে খুব কম, এবং ভারতীয় সমাজবিবর্তনে রাষ্ট্রশক্তির প্রভাবও অনুপাতে পড়েছে অল্প। আধুনিক যুগে তীর্থযাত্রার আকর্ষণ ক্রমশ কমে এলেও এই পর্যটক-মনোবৃত্তির বৃহত্তর তাৎপর্যের প্রতি মনীষিবৃন্দ উদাসীন থাকেন নি। তাই দেখা যায় এ যুগের চিন্তানায়ক ও জননেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই যথাসাধ্য ভারত-পরিক্রমার দ্বারা নিজ নিজ দেশপরিচয়কে সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় করেছেন এবং এদেশের সাংস্কৃতিক অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় নেবার প্রয়াস পেয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণশিষ্যগণ, দয়ানন্দ সরস্বতী, মহাত্মা গান্ধী,—এমন অনেক নাম এই প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। রামমোহনের জীবন পর্যালোচনা করলে তাঁকে বর্তমান কালের এই ভারত-আবিষ্কারক দলের অগ্রণী মনে করতে আমাদের দ্বিধা হবার কথা নয়। কিংবদন্তী ও তথ্য মিলিয়ে তাঁর কৈশোর-যৌবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তার থেকে এটুকু সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা চলে, প্রথম বয়স থেকে পর্যটনের নেশা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বিদ্যার্জন, ধর্মজিজ্ঞাসা, চাকরি, ব্যবসা প্রভৃতি উপলক্ষ তরুণ বয়স থেকে বার বার তাঁকে ঘরছাড়া করেছে। ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ফার্সী পুস্তিকা 'তুহ্ফাৎ-উল-মুওয়াহিদিন'এর আরবী ভূমিকায় তিনি স্বয়ং তাঁর বিভিন্ন দেশপর্যটনের উল্লেখ করেছেন এই ভাবে: I travelled in the remotest parts of the world, in plains as well as in hilly lands...।"[৮] এরই প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায় তাঁর শেষ জীবনে লিখিত আত্ম-জীবনীমূলক সুবিখ্যাত পত্রে। এখানে তিনি নিজের প্রথম বয়সের ভ্রমণ সম্পর্কে

বলেছেন : "...I proceeded on my travels, and passed through different countries, chiefly within, but some beyond, the bounds of Hindoostan, with a feeling of great aversion for the establishment of the British power in India."[৯] তথ্যবিচার করে দেখলে মনে হয় কিশোর রামমোহনের তিব্বত-পর্যটন সম্পর্কিত যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে তার মূল সত্যতা অস্বীকার করবার সম্ভবতঃ কোনও কারণ নেই। হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষের সীমানার বাইরে যে সব দেশ তিনি পরিদর্শন করেছিলেন, তিব্বত সেগুলির অন্যতম হওয়া অসম্ভব নয়।[১০] পাটনা, বারাণসী ও উত্তর ভারতের সুদূরবর্তী আরও অনেক স্থান যে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর মোকদ্দমা-সংক্রান্ত নথিপত্রের মধ্যেই আছে।[১১] কর্মোপলক্ষে বঙ্গ-বিহারের নানা স্থানে তাঁকে বাস করতে হয়েছিল এবং রংপুরে অবস্থানকালে তাঁকে ইংরেজ-সরকারের দূত হয়ে দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে ভুটান-রাজ্য পর্যন্ত পরিদর্শন করতে হয়েছিল।[১২] এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে হিন্দী ও উর্দু ভাষাদ্বয়ে তাঁর অধিকার ছিল প্রায় মাতৃভাষা বাঙলারই মত এবং সম্ভবতঃ কোনও একটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাও তিনি কতকটা আয়ত্ত করেছিলেন।[১৩] সুতরাং এই পর্যটনপর্বে জনজীবন ও জনসংস্কৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভে তাঁর ভাষাগত কোনও অসুবিধা বা ব্যাঘাত ঘটেনি। দুঃখের বিষয় রামমোহনের পর্যটক-জীবনের কোনও স্বরচিত ধারাবাহিক বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নি কিন্তু আর এক প্রসঙ্গে তিনি যে উক্তি করেছেন তা থেকে হয়তো এই দেশভ্রমণের পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য ছিল সে-বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। পূর্বোল্লিখিত আত্মজীবনীমূলক পত্রে অন্যত্র আছে :

"I now felt a strong wish to visit Europe, and obtain by personal observation, a more thorough insight into its manners, customs, religion and political institutions"।[১৪]

অন্ততঃপক্ষে ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রামমোহন যে ইউরোপ-যাত্রার সংকল্প করেছিলেন এমন প্রমাণ আছে।[১৫] এই সিদ্ধান্তের মূলে যে মনোভাব ছিল তা তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইউরোপীয় জীবনচর্যা ও রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণতর ও গভীরতর জ্ঞান আহরণ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘ চোদ্দ বৎসর পরে দিল্লীর বাদশাহের

দৌত্যকার্যকে উপলক্ষ করে। একই প্রেরণার বশে তিনি আমেরিকা পরিদর্শনেও ইচ্ছুক ছিলেন ও এক সময়ে স্থির করে ফেলেছিলেন ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকা যাবেন।[১৬] তাঁর এই বাসনা পূর্ণ হয় নি। যাই হোক এই সবের থেকে ধরে নিলে অন্যায় হবে না, রামমোহনের বিশ্বাস ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিন্ন দেশপরিচয় সম্পূর্ণ হয় না; এবং বাহ্য উপলক্ষ যাই হোক তাঁর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষীয় জীবনধারার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া। এই দেশপরিক্রমাই রামমোহনের ভারতচিন্তাকে এত বাস্তবানুগ ও জীবন্ত করে তুলেছিল। স্বদেশ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কেবলমাত্র দেশী-বিদেশী কিছু পুঁথির পাতায় আবদ্ধ থাকেনি। জনৈক ফরাসী মনীষী বলেছিলেন, অনুশীলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ না করে,—দূর থেকে অনুসন্ধান করতে গেলে কখনও কখনও একটি গ্রন্থাগারকেই একটি দেশ বলে ভুল করবার সম্ভাবনা থাকে (A travailler loin de l'objet de ses études on risque de prendre quelquefois une bibliotheque pour l'equivalent d'un pays)। রামমোহন সে ভুল করেন নি।

স্বদেশ সম্পর্কে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনের ভারত-জিজ্ঞাসা তরুণ বয়স থেকেই অগ্রসর হয়েছিল সুবিস্তীর্ণ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের পথে। ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যার চর্চা তিনি আরম্ভ করেন পরিণত বয়সে। তাঁর জ্ঞানচর্চার দৃঢ় বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এদেশের টোলচতুষ্পাঠী-মক্তব-মাদ্রাসায় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে। ফলে ভারতীয় বিদ্যার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য কেবল যে তাঁর স্বাভাবিক মনীষাকে সমৃদ্ধ করেছিল তাই নয়, তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য 'ওরিয়েণ্টালিস্ট'এর কেতাবী দৃষ্টি দিয়ে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিচার করতে অগ্রসর হন নি। সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষাত্রয় প্রাচীন ভারতীয় ও ইসলামী মননভাণ্ডারের তিন চাবিকাঠি। আর কে না জানে ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব যেমন বহুবিস্তারী তেমনি গভীর? উক্ত তিন ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করার ফলে ভারতীয় হিন্দু ও মধ্যযুগে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামীয় জ্ঞানরাজ্যে রামমোহনের সঞ্চরণ ছিল অনায়াস ও অবাধ। বাঙলা, হিন্দুস্থানী ও ইংরেজি ব্যতীত আরবী ও ফার্সীতেও তিনি কথোপকথন করতে পারতেন[১৭] এবং গদ্যপদ্যাত্মক সংস্কৃতরচনা

তাঁর যেটুকু পাওয়া গেছে সেখানে লিখনশৈলীর প্রসাদগুণ আজও আমাদের মুগ্ধ করে।[১৮] ইসলামের সঙ্গে গভীর পরিচয় তাঁর চিন্তাকে তিনভাবে প্রভাবিত করেছিল। কুরাণ শরীফ অধ্যয়নের ফলে হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রতীকোপাসনায় তাঁর বিশ্বাস শিথিল হয় ও তিনি আজীবন নিশ্ছিদ্র একেশ্বরবাদের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয়তঃ ইসলাম ধর্মের মুতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ ও আপেক্ষিক সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী বহুল পরিমাণে তাঁর অসাম্প্রদায়িক ও বিচারশীল মনোভাব গঠনে সহায়ক হয়। উপরন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুফী মরমীয়তাবাদের প্রতি ক্রমশ গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। হিন্দু ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় মুখ্যত উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা—মোক্ষশাস্ত্রের এই প্রস্থানত্রয়ের মাধ্যমে। বেদান্ত অনুশীলন প্রচলিত হিন্দু প্রতিমাপূজায় তাঁর শিথিল বিশ্বাস সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। উত্তরকালে বৈদান্তিক ও বেদান্ত-ব্যাখ্যাতারূপেই যদিও তাঁর প্রসিদ্ধি, তবু মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর পরিচয় যথেষ্ট গভীর ছিল। হিন্দু ষড়দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিনিবন্ধ ও লৌকিক কাব্যাদি তিনি যত্ন করেই পড়েছিলেন। তাঁর বিচারগ্রন্থগুলিতে ও জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে এই সুবিস্তীর্ণ অধ্যয়ন-অনুশীলনের প্রচুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। সম্ভবত তরুণ বয়সে তিব্বত-পর্যটন ও ভুটান-ভ্রমণের সময়ে রামমোহন কিছু পরিমাণে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে আসেন। উত্তরকালে কথোপকথনপ্রসঙ্গে একবার তিনি রেভাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফকে বলেছিলেন, বৌদ্ধ ত্রিপিটক তিনি অধ্যয়ন করেছেন।[১৯] রামমোহনের মৃত্যুর পরে স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট 'এথেনিউম' পত্রিকার অক্টোবার ৫, ১৮৩৩ সংখ্যায় যে স্মৃতিকথা লেখেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, মাণিকতলার বাড়ীতে একবার এক নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে রামমোহনের দিনব্যাপী বিচার-বিতর্ক হয়; আর্নট স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[২০] তা ছাড়া বৌদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে রামমোহনের সংস্রবের প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙলা অনুবাদ সমেত সম্ভবত কোনও বৌদ্ধ আচার্য প্রণীত 'বজ্রসূচী' গ্রন্থটির এক সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। রংপুরে বাসকালে (১৮০৯-১৮১৫) তিনি 'কল্পসূত্র' ইত্যাদি কিছু জৈন শাস্ত্রগ্রন্থও অধ্যয়ন করেছিলেন বলে প্রকাশ।[২১] সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উত্তরভারত পরিভ্রমণ, বিশেষত কাশী-প্রবাস এবং হিন্দী ভাষায় অধিকারের ফলে তিনি ভারতীয় মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং এর স্রষ্টা সন্তমণ্ডলীর সঙ্গে সর্বদা আধ্যাত্মিক নৈকট্য অনুভব করতেন। 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩) শীর্ষক পুস্তিকায় এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি স্মরণীয়: "দশনামা সন্ন্যাসিদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু-নানকের সম্প্রদায় ও দাদুপন্থী ও কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতি এই [রামমোহন ব্যাখ্যাত সার্বভৌম একেশ্বরবাদী] ধর্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয়।"[২২] এই ভাবে কালানুক্রমিক বিচার করলে দেখা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিকশিত ভারতীয় চিন্তার প্রধান ধারাগুলির প্রায় সব কটির সঙ্গেই রামমোহনের চিত্তের যোগ স্থাপিত হয়েছিল।[২৩] বাহ্য দেশপরিক্রমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানস কালপরিক্রমা।

এই ভাবে দেশে ও কালে ভারত-পরিক্রমার মাধ্যমে রামমোহন যে বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতাটি লাভ করেছিলেন তা ছিল তাঁর জীবনদর্শনের ভিত্তিস্বরূপ। ঘনিষ্ঠ দেশপরিচয়ের ফলে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধের অধিকারী হয়েছিলেন তার আভাস তাঁর রচনার মধ্যে বহু স্থলেই পাওয়া যাবে। ডঃ টাইট্‌লারের সঙ্গে বিতর্কের প্রসঙ্গে এক স্থানে তিনি উক্তি করেছেন: "If by the 'Ray of Intelligence' for which the Christian says we are indebted to the English, he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent and also my gratitude; but with respect to Science, Literature or Religion, I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by a reference to history it may be proved that the World was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge, which sprang up in the East and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own, which distinguishes us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners."।[২৪] নিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে গর্ববোধের এমন স্পষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে? *The Brahmunical Magazine* এর তৃতীয় সংখ্যায় মিসনারী প্রতিপক্ষকে তিনি বলেছেন,

ইউরোপীয়গণের গার্হস্থ্য জীবনের নৈতিক বিশুদ্ধতা ভারতীয়দের চেয়ে মোটেই বেশী নয়: "As to the 'moral death' ascribed to them by the Editor, I might easily draw a comparison between the domestic conduct of the natives and that of the inhabitants of Europe, to show where the grossest deficiency lies; but as such a dispute is entirely foreign to the present controversy, I restrain myself from so disagreeable a subject, under apprehension that it might excite general displeasure."।[২৫] ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অধিবেশনে (৬ ভাদ্র, ১২৩৫; ২৩ আগস্ট ১৮২৮), আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে উপদেশ দেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী কৃত তার ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে কোনও ইংরেজ বন্ধুর নিকট তিনি মন্তব্য করেন, ব্যাখ্যানটির মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে তা হল "......the simplicity, comprehensiveness and toleration which distinguish the religious belief and worship formerly adopted by one of the most ancient nations of the earth and still adhered to by the more enlightened portion of their posterity"।[২৬] ব্রাহ্মণ-সেবধির ইংরেজি সংস্করণ The Brahmunical Magazine এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এই গর্বমিশ্রিত শ্রদ্ধার স্ফুটতর প্রকাশ লক্ষ করা যায়: "It is well-known to the whole world, that no people on earth are more tolerant than the Hindoos who believe all men to be equally within the reach of Divine beneficence which embraces the good of every religious sect and domination;...।"[২৭] এমন উদাহরণ আরও বাড়ানো চলে। বেশ বোঝা যায়, ভারতীয় জীবনচর্যার সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বস্তু ছিল এবং এর ফলে তিনি এক গভীর স্বাজাত্যবোধের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এই স্বাজাত্যবোধ পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত। শিক্ষিত সমাজকর্তৃক পশ্চিমের সেই অন্ধ অনুকরণের যুগেও আহার-ব্যবহারে তিনি ছিলেন সর্বাংশে ভারতীয়। তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ভারতবাসীর মুসলমানী দস্তুরের পোশাক এদেশে ও ইউরোপে

সর্বদা তাঁর অঙ্গে শোভা পেত। তাঁর মধ্যাহ্নের আহার ছিল সম্পূর্ণ বাঙালী ধরনের, রাত্রে তিনি খেতেন মুসলমানী খানা। এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা মেকলে এক শিক্ষিত গোষ্ঠী সৃষ্টি করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন যাঁরা হবেন: "Indian in blood and in colour, but English in tastes, in opinions and in morals and in intellect."।[২৮] রামমোহন পশ্চিমের অনুরাগী ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় সিদ্ধ হয়েও এ স্বপ্নের মূর্তিমান প্রতিবাদ। এই সূত্রে ১৮২২ সালের ৩১ জানুয়ারী সংখ্যা Calcutta Journal এ প্রকাশিত ৫ মার্চ ১৮২২ সংখ্যা 'সংবাদ-কৌমুদী'র বিষয়সূচীর অন্তর্গত সপ্তম প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি হল একখানি "Letter pointing out the absurdity of the conduct of some Natives who ridicule their own manners and customs in order to gain the approbation of Europeans."।[২৮ক] রামমোহন প্রতিষ্ঠিত এই বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রখানিতে অন্ধ পাশ্চাত্যানুকরণ সম্পর্কে কি জাতীয় আলোচনা প্রকাশিত হত—পত্রের বিষয়বস্তু থেকে তার কতকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তদানীন্তন হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষণীয়। সপ্তম অধ্যায়ে প্রসঙ্গটি যদিও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে তবু এখানে সংক্ষেপে অল্প কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলভুক্ত বেশ কিছু তরুণের চিত্তে ইংরেজি শিক্ষা মাদকের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে তাঁরা সামগ্রিক ভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এঁদেরই প্রতিনিধি-স্থানীয় মাধবচন্দ্র মল্লিক সগর্বে লিখেছিলেন,"···if there be anything under heaven that either I or my friends look upon with most abhorrence, it is Hindooism. And if there be anything that we regard as the best instrument of evil, it is Hindooism···।"[২৯] ফোঁটা তিলকধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখলেই বিদ্রূপ, নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে আস্ফালন ও ভুক্তাবশেষ রক্ষণশীল প্রতিবেশীর গৃহে নিক্ষেপ, ঠাকুরঘরে মন্ত্রের পরিবর্তে হোমারের 'ইলিয়াড' আবৃত্তি, প্রকাশ্যে সুরাপান প্রভৃতি উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণেও তাঁদের দ্বিধা ছিল না। অবশ্য গতানুগতিকতা ও জীর্ণ আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহী মনোভাব এই সব কাজের

•

মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা শ্রদ্ধার যোগ্য। এ কথাও স্বীকার্য যে এই তরুণ দল উত্তর জীবনে আত্মস্থ হয়ে আপন আপন প্রতিভার বলে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং এঁদেরই মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদনের মত কবি, রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত রাষ্ট্রনীতিনিপুণ দেশকল্যাণকর্মী, শিবচন্দ্র দেব ও রামতনু লাহিড়ীর মত পূতচরিত্র আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত স্থিতধী শিক্ষাবিদ্, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্রর মত আদর্শবাদী সাহিত্যিক ও সংস্কারক, রাধানাথ শিকদারের মত বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী, রসিককৃষ্ণ মল্লিকের মত নির্ভীক, স্পষ্টবক্তা, সংস্কারমুক্ত জ্ঞানী ও রাজনারায়ণ বসুর মত ঈশ্বরভক্ত ও স্বদেশপ্রেমিক। কিন্তু হিন্দু কলেজলব্ধ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম লগ্নটিতে এঁদের চিত্তে যে অস্থিরতার সঞ্চার হয়েছিল তার বশবর্তী হয়ে এঁরা স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হয়েছিলেন। এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। এমন অশ্রদ্ধা পোষণ করা রামমোহনের পক্ষে অসম্ভব ছিল। মনস্বী লেখক অজিতকুমার চক্রবর্তীর ভাষায়: "রামমোহন রায় পরিষ্কার বুঝিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের ধর্মশাস্ত্রকে আমরা না পড়িতে পারিলে কোন কালেই তাহার নিত্য তত্ত্ব এবং খণ্ডকালের হিসাবেও তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য আমরা ধরিতে পারিব না।...রামমোহন রায় তাই পশ্চিমের দিকে দেশের মুখ ফিরাইয়াছিলেন যাহাতে দেশের দিকেই সেই মুখখানা ভাল করিয়া ফেরে। হেয়ার, মেকলে বা ডিরোজিয়োর মত তিনি স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে হিন্দুসভ্যতার মধ্যে শিখিবার কিছুই নাই, যাহা কিছু আছে তাহা পশ্চিমের সভ্যতার ভাণ্ডারে।"[৩০] এই সামঞ্জস্যবোধ ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত অধিকাংশ তরুণের মানসিক উন্মেষের প্রথম পর্বে দৃশ্যমান নয়। ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের প্রারম্ভে রামমোহনের আবির্ভাবই প্রমাণ করেছে, ভারতের নিজস্ব সভ্যতার প্রাণশক্তি তখনও নিঃশেষিত হয়নি। দেশে নবাগত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে এদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে পরীক্ষা করে যথোচিত গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সেগুলিকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার ও এর দ্বারা নূতন যুগোপযোগী জীবনদর্শন গড়বার কাজে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। তাঁর গভীর দেশচেতনা

ও দেশপ্রেমই এ ব্যাপারে তাঁর পথপ্রদর্শক ছিল। মেকলের দম্ভোক্তিকে তা শেষপর্যন্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।

প্রাণবন্ত ভারতীয় চিত্ত যে বিদেশী সংস্কৃতি ও ভাবধারাকে কখনও অশ্রদ্ধা করে নি ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে তার বহু নজির আছে। এই ঐতিহ্যগত গ্রহণশীল মনোভাব রামমোহনের চিন্তাধারারও এক বিশিষ্ট লক্ষণ। তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর কালক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতীয় ভাবধারায় তাঁর জীবনদর্শনের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি রীতিমত ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা উপনিষদ্-ব্রহ্মসূত্রে, একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা ইসলামে, যুক্তিবাদের ভিত্তি মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ ও তর্কপদ্ধতিতে। ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ভক্তি-পন্থিগণের সংগীতাশ্রয়ী উপাসনা পদ্ধতি তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল।[৩১] বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বভাগের না হলেও বর্ণাশ্রমবিরোধী উদার সামাজিক দৃষ্টির তিনি অনুরাগী ছিলেন এবং এই মনোভাব তাঁর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বজ্রসূচী' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে প্রতিফলিত।[৩২] ইউরোপীয় মননজগতের গভীরে যখন তিনি মানসযাত্রা শুরু করেন (সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষ বা উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে এর সূচনা) তখন এই ভাবে প্রাচ্য ভাবধারায় স্নাত হয়ে তাঁর মনের জমিটি তৈরী হয়ে গিয়েছে। রামমোহনের জীবনদর্শনের এই অষ্টাদশ-শতকীয় বুনিয়াদটিকে সর্বদা মনে রাখলে তাঁর চিন্তার বিচার ও মূল্যায়ন আমাদের পক্ষে সহজ ও সম্পূর্ণ হবে। তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে বহু সাধনায় অর্জিত পাশ্চাত্য বিদ্যা ছিল এই মৌল প্রাচ্য ও ভারতীয় চিন্তার পরিপূরক।

ডিগবীর অধীনে রংপুরে কর্মরত থাকা কালে তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের অন্তর্নিহিত মানবপ্রগতির আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঐ দুটি ঐতিহাসিক অভ্যুদয়ের পিছনে যে জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিক চিন্তার প্রেরণা ছিল তার সঙ্গে পরিচিত হন। বেকন, লক, নিউটন, হিউম, গিবন, ভোলতেয়ার, ভোলনি, টম পেইন প্রমুখ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সমাজ-তাত্ত্বিকদের রচনা এই পর্বে তাঁর প্রধান পাঠ্য ছিল। ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করবার পর খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্ব ও ইতিহাস হয় তাঁর বিশেষ অনুসন্ধানের বস্তু। সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে তিনি

ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম ও জেম্‌স মিল ব্যাখ্যাত হিতবাদী দর্শন ও সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। এই দর্শনের মুখ্য প্রবক্তা বেন্থামের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতাও গড়ে উঠেছিল। জীবনের শেষ পর্বে সম্ভবত তিনি তৎকালীন পাশ্চাত্য (মুখ্যত ব্রিটিশ) সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগও পেয়েছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তা রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্ক ও ওয়েন-পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও পত্রালাপ স্মরণীয়। এই সংক্ষিপ্ত হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে তদানীন্তন পাশ্চাত্য জগতের যুক্তিবাদী ও আধ্যাত্মিক দুই চিন্তাধারারই গভীর অনুশীলন রামমোহন করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি সর্ববিষয়ে বিস্তীর্ণ ছিল। তাঁর সংস্কার ও দেশগঠনমূলক কার্যাবলীর প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার না করে সেগুলির মধ্যে যদি একটি মূল সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, যে আদর্শকে তিনি জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা রূপদান করতে চেয়েছেন তা পাশ্চাত্য চিন্তার উক্ত ঐতিহ্যদ্বয় কর্তৃক সুমার্জিত তাঁর মৌল ভারত-চেতনারই প্রকাশ।

রামমোহনের সম্মুখে দেশগঠন সংক্রান্ত দুটি প্রবল সমস্যা ছিল। তাঁর সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত; অতীতে নিবদ্ধদৃষ্টি সামন্তচক্র কর্তৃক প্রভাবিত আঞ্চলিক স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত ভারতবর্ষীয় রাজনীতির একমাত্র বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের কল্পনা পর্যন্ত লুপ্ত। অপর পক্ষে ভারতে যে বিদেশী শাসনের সূত্রপাত হয়েছে তা এমন এক সভ্যতার প্রতীক যা আধুনিক কালের নূতন জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বলীয়ান। দেশে নবাগত এই সভ্যতা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল জাতীয়তার এক নূতন সংজ্ঞা। উক্ত সংজ্ঞানুসারে একজাতিত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব—এই দুটি প্রত্যয় অবিচ্ছেদ্যরূপে পরস্পরনির্ভর। যুগসন্ধিক্ষণে স্বদেশচিন্তায় রামমোহনের সর্বাধিক কৃতিত্ব তিনি আদর্শ নির্বাচনে ভুল করেন নি; দেশের ভবিষ্যৎ প্রগতি ও কল্যাণের জন্য সাময়িকভাবে ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি একথা জানতেন, ভারতবাসীকে একজাতিরূপে গড়ে তুলতে হলে যে সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের প্রয়োজন ভারতবর্ষের স্বার্থেই তার গড়ন পশ্চিমী ছাঁচের হওয়া আবশ্যক,—প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতীয়

রাষ্ট্রব্যবস্থা সেক্ষেত্রে অচল। ইংরেজ-শাসনের প্রতি এই অনুকূল মনোভাব রামমোহন থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতকীয় নবজাগৃতির প্রায় সমস্ত চিন্তানায়কের মধ্যে লক্ষণীয়।[৩৩] কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে তদানীন্তন ভারতবর্ষের পক্ষে ইংরেজশাসনকে মঙ্গলজনক মনে করলেও রামমোহন কি একে ইতিহাসের এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন? তাঁর বিভিন্ন রচনায় এ প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত রয়েছে। ভারতবর্ষের পক্ষে ইংরেজশাসনের মঙ্গলকারিত্ব সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা যে শেষ কথা নয় এবং ভবিষ্যতে যে এ বিষয়ে পুনর্বিচারের প্রয়োজন হতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা উল্লিখিত হয়েছে তাঁর Brief Remarks Regarding Modern Encroachment on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance (১৮২২) শীর্ষক গ্রন্থে: 'At present the whole empire (with the exception of a few provinces) has been placed under British power and some advantages have already been derived from the prudent management of its rulers from whose general character a hope of future quiet and happiness is justly entertained. The succeeding generation will however, be more adequate to pronounce on the real advantages of this government'।[৩৪] ১৮ আগস্ট, ১৮২৮ এক ইংরেজ বন্ধুকে লিখিত পত্রে তিনি ইংরেজ-ভারতবাসী সম্পর্কের যে ভবিষ্যৎ রূপকল্পনা করেছেন সেখানেও দেখা যায় পরবর্তী এক শতাব্দীর ব্যবধানে ইংরেজশাসনের কবল থেকে ভারতবর্ষের মুক্তিলাভের সম্ভাবনা স্পষ্টত স্বীকৃত: "Supposing some hundred years hence the Native character becomes elevated from constant intercourse with Europeans and the acquirements of general and political knowledge as well as of modern arts and sciences, is it possible that they will not have the spirit as well as the inclination to resist effectually any unjust and oppressive measures serving to degrade them in the scale of society? It should not be lost

sight of that the position of India is very different from that of Ireland, to any quarter of which an English fleet may suddenly convey a body of troops that may force its way in the requisite direction and succeed in suppressing every effort of a refractory spirit. Were India to share one fourth of the knowledge and energy of that country, she would prove from her remote situation, her riches and her vast population either useful and profitable as an ally of the British empire or troublesome and annoying as a determined enemy" ।[৩৫] ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরিত তাঁর সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষে ইংরেজদের স্থায়ী বসবাস-সমস্যা সংক্রান্ত স্মারকলিপিতেও তিনি ভবিষ্যতে ইংরেজশাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের আবির্ভাবের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছিলেন এবং ইংলণ্ড ও উক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের পারস্পরিক প্রীতিসম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকবে এমন আশা প্রকাশ করেছিলেন: "......still a friendly and highly advantageous commercial intercourse may be kept between two free and christian countries united as they will then be by resemblances of language religion and manners" ।[৩৬] ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার এই কল্পনা রামমোহনের ক্ষণিক চিন্তাবিলাস ছিল না। সমগ্র রামমোহন-গোষ্ঠী সম্ভবত এর দ্বারা ভাবিত ছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে তাঁর সম্পাদিত 'রিফর্মার' পত্রিকার স্তম্ভে এই বিষয়ে একই মন্তব্য করতে দেখা যায়। পঞ্চম পরিশিষ্টে প্রসন্নকুমারের প্রাসঙ্গিক মতামতের কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ সব তো গেল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত। এ ছাড়াও রামমোহন সমকালীন ফরাসী পর্যটক ভিকতর জাঁকমঁ ও নিজের একান্ত সচিব স্যাণ্ডফোর্ড আর্নটকে এই প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা স্পষ্ট প্রমাণ করে, ভারত যে চিরকাল ইংরেজ শাসনাধীন থাকবে না এ তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। প্রথম জনের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "ভারতবর্ষের পক্ষে এখনও আরও বেশ কিছু দিন ইংরেজ অধিকারের প্রয়োজন যাতে সে যখন তার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে তখন তাকে অনেক কিছু

শুভকর বস্তু) হারাতে না হয় (Il faut à l'Inde bien des années de domination anglaise pour qu'elle puisse ne pas perdre beaucoup en ressaisissant son indépendence politique)।[৩৭] সুতরাং ভবিষ্যতে ইংরেজশাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ যে ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি এ বিষয়ে রামমোহনের মনে অন্তত কোনও সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা ছিল না। আর্নটের সাক্ষ্য আরও স্পষ্ট: "He……always contended for the necessity of continuing British rule for at least forty or fifty years for the good of the people themselves……।"[৩৮] দেখা যাচ্ছে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব কতদিন থাকা বাঞ্ছনীয় সে-সম্পর্কেও রামমোহনের একটি নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, ইংরেজশাসনের সূত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ অন্ততপক্ষে অর্ধশতাব্দী কাল না পেলে ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। সক্রিয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর্ব আসবে তার পরে। এই কারণে তাঁর সময়ে নব প্রতিষ্ঠিত ইংরেজশাসনের উচ্ছেদকল্পে কোনও আন্দোলনের সূত্রপাত করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। পরাধীনতার বেদনা অনুভব করা সত্ত্বেও দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের আশায় বিদেশী শাসনকে মেনে নিয়েছিলেন। বিলেত থেকে প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে লিখিত এক পত্রে তাঁকে বলতে শোনা যায়: "Though it is impossible for a thinking man not to feel the evils of political subjugation and dependence on foreign people, yet when we reflect on the advantages which we have derived from our connection with Great Britain we may be reconciled to the present state of things which promises permanent benefit to our posterity"।[৩৯]

কিন্তু এই পাশ্চাত্য সংস্পর্শ দ্বারা ভবিষ্যৎ দেশগঠন ত্বরান্বিত হবে কি ভাবে ও কোন পথে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে সর্বপ্রথম 'আধুনিক' বিশেষণটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয়। 'মধ্যযুগ' থেকে 'আধুনিক' যুগে উত্তরণের মূলে যে সামাজিক প্রক্রিয়াটি কার্যকরী হয়েছে সে-সম্পর্কে রামমোহন ও তাঁর মণ্ডলীর দৃষ্টি কতদূর স্বচ্ছ ছিল তাও বিচার করে দেখা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে রামমোহনের চিত্ত অনুপ্রবিষ্ট ছিল এবং সমকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার

ইতিহাসেরও তিনি অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে এ সত্য ধরা পড়েছিল যে রেনেশাঁসের কাল থেকে ফরাসী বিপ্লব অবধি ইউরোপের আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুত্থান ও সংগঠনের মাধ্যমে আনীত অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের ফলে। এই রূপান্তর জীর্ণসংস্কার নয়, পরিপূর্ণ বিপ্লব—মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের স্থলে সম্পূর্ণ নূতন এক শ্রেণীতন্ত্রের অভিষেক। এই সমাজবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীর এই ঐতিহাসিক অগ্রগতিকে অত্যল্পকালের মধ্যে প্রায় অবিশ্বাস্যরূপে ত্বরান্বিত করেছিল। এর ফলে প্রায় অকল্পনীয় উৎপাদন-শক্তির সৃষ্টি হল এবং ইতিহাসে নবোত্থিত এই শ্রেণীর উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর সর্বতোমুখী ও সামগ্রিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। ইউরোপের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার এই মৌল রূপান্তর থেকেই জন্ম নেয় নবযুগের নূতন জীবন-দর্শন যা মধ্যযুগীয় সমস্ত অন্ধসংস্কার ক্রমশ অস্বীকার ও বর্জন করেছে ও মানুষের ব্যক্তিস্বরূপকে পূর্ণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে নবযুগের রাজনৈতিক মুক্তির আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীন ব্যবস্থার সংরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাষ্ট্রশক্তিসমূহের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের যুগ্ম আদর্শে উদ্বুদ্ধ বুর্জোয়াশ্রেণীর নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রাম ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বুর্জোয়াশ্রেণীর এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌সের কিছু সুপরিচিত উক্তি আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি: "The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionary part. The bourgeoisie wherever it has got the upper-hand, has put an end to all feudal, patriarchal, idyllic relations.······It has been the first to show what man's activity can bring about. It has accomplished wonders far surpassing Egyptian pyramids, Roman aqueducts and Gothic cathedrals; it has conducted expeditions that put in the shade all former exoduses of nations and crusades. The bourgeoisie cannot exist without constantly revolutionising the instruments of

production and thereby the relations of production and with them the whole relations of society……All fixed fast-frozen relations with their train of ancient and venerable prejudices and opinions are swept away, all new formed ones become antiquated before they can ossify.……The bourgeoisie during its rule of scarce one hundred years, has created more massive and more colossal productive forces than have all preceding generations together. Subjection of nature's forces to man, machinery application of chemistry to industry and agriculture, steam-navigation, railways, electric telegraphs, clearing of whole continents for cultivation, canalisation of rivers, whole populations conjured out of the ground—what earlier century had even a presentiment that such productive forces slumbered in the lap of social labour" ?[৫০] অবশ্য এটা জানা কথা, মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রশংসা করে একথা লেখেন নি—বুর্জোয়া শোষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে ডাক দেওয়াই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু অকল্পিতপূর্ব সামাজিক শক্তিরূপে এই বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুত্থানই যে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক যুগ ও আধুনিকতার সৃষ্টি সম্ভব করেছে সভ্যতার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাঁদের এ স্বীকৃতিও ছিল দ্বিধাহীন ও মুক্তকণ্ঠ। আশ্চর্যের বিষয়, মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স যার প্রবক্তা সেই বিশিষ্ট সমাজদর্শনের সঙ্গে কোনও পরিচয় বা মতসাদৃশ্য না থাকলেও রামমোহন ও তাঁর ক্ষুদ্র মণ্ডলী তাঁদের পূর্বেই এই বিশ্লেষণাত্মক সামাজিক দৃষ্টি স্পষ্টত আয়ত্ত করেছিলেন এবং এর সাহায্যে বাঙলাদেশের পাশ্চাত্য সংঘাতজনিত সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিচার করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ সিংহ প্রভৃতির সহযোগিতায় রামমোহন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে Bengal Herald নামক যে চতুর্ভাষী (ইংরেজি-বাঙলা-হিন্দুস্থানী-ফার্সী) সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন তার ১৩ জুন ১৮২৯ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছে :

"There can be little doubt that the increase of wealth in Calcutta and throughout Bengal, has been rapid within the last few years, and we are naturally led to enquire the reason thereof. The value of land may be assigned as the more immediate, and the lesser restriction on commerce and greater introduction of Europeans, as the primary cause of this beneficial change...By means of this territorial value, a class of society has sprung into existence, that were before unknown; these are placed between the aristocracy and the poor, and are daily forming a most influential class. Previous to their formation, the wealth of the country was in the hands of a few individuals, while all others were dependent on them, and the bulk of the people were in a state of abject poverty of mind and body, which will perhaps form a juster reason for the pervading moral bondage of the Hindoos than the more specious ones of climate or religion ......It is the dawn of a new era. Whenever such an order of men have been created, freedom has followed in its train. Do we need an example?—look at England after the Norman conquest when the people were serfs and the land-holders lived as Zemindars of this country did some years ago; but watch their progress up to the eighth Henry, when wealth became more equally diffused and continue the view until the son of a butcher dethroned and decapitated a monarch and made the Republic of England feared and admired by the world. Do we need an instance of the misfortune of having only two ranks in a country; look at Spain, where every man that can afford it, lives without either mental or bodily labour, and claims

the rank of an *Hidalgo*. Need we go further—look at unhappy Poland, where the peasantry are sold with the soil. With the many examples of this nature before us, it may not be deemed presumptuous to assert that the middling class of inhabitants of Bengal, afford the most cheering indications of any that exist at the present period." ।[৪১] ঐতিহাসিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ এই উক্তির কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা আমাদের করতে হবে পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায়ে। বর্তমানে এইটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী-চেতনার পরিচয় রামমোহন প্রাতষ্ঠিত বাঙ্‌লা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সংবাদ-কৌমুদী'র পৃষ্ঠাতেও অলভ্য নয়। 'সংবাদ-কৌমুদী'র কোনও সংখ্যা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত না হলেও এর প্রথম নয় সংখ্যার বিষয়সূচী ইংরেজি অনুবাদে সমসাময়িক Calcutta Journal-এর ৩১ জানুয়ারী ১৮২২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় রচনার বিষয়: "Another appeal to the Government to take into their benevolent consideration, the serious privation under which the middle class of its native subjects labor from the want of proper Medical advice and treatment." ।[৪২] সমাজের এই নূতন শ্রেণীর বিন্যাস ও রূপান্তর সম্পর্কে চেতনা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা—প্রমাণ করছে, রামমোহনের মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই হবে ভবিষ্যৎ ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজের মেরুদণ্ড। সমসাময়িক জগতে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির সুসংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রভাবিত বিপ্লব আন্দোলনগুলির দুটি মৌলিক আদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র। রামমোহন যে এই বিপ্লবাদর্শের প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন একথা সুবিদিত।[৪৩] সুতরাং সহজেই মেনে নেওয়া যেতে পারে, তিনি বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে ভারত একজাতিরূপে সংগঠিত হবে এবং এদেশের ভবিষ্যৎ সংবিধানের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র। এই গণতান্ত্রিক দেশ শেষপর্যন্ত অবশ্যই হবে স্বাধীন। স্বাধীন ভবিষ্যৎ ভারতের অস্তিত্ব যে তাঁর কল্পনায় ছিল তা পূর্বেই দেখা গেছে। ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর চিন্তার আরও কিছু পরিচয় আমরা পেতে পারি তাঁর

জীবনের শেষ পর্বের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে। গত শতাব্দীর কুড়ির দশকে কলিকাতায় যখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত তখন তিনি সম্ভবত কতকটা ইংলণ্ডীয় সংবিধানের ভক্ত। 'মিরাৎ-উল্-আখ্‌বার' নামক যে ফার্সী সাপ্তাহিক পত্র তিনি প্রকাশ করেন (১৮২২) তার দ্বিতীয় সংখ্যায় বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের একটা তুলনামূলক বিচার আছে। সেখানে তিনি স্বৈররাজতন্ত্র (absolute monarchy), অভিজাততন্ত্র (aristocracy) ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (প্রাচীন গ্রীক গণতন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থা যেক্ষেত্রে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন নাগরিক রাষ্ট্র পরিচালন ব্যাপারে অংশগ্রহণ করবার অধিকারী)—এই তিন পদ্ধতির শাসনকেই (ভারতের পক্ষে) অনুপযুক্ত গণ্য করে বাতিল করেছেন। মনে রাখতে হবে শেষোক্ত ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ পূর্ণভাবে রূপায়িত হলেও ইতিহাসে তার সার্থক প্রয়োগস্থল প্রাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্রায়তন নগররাষ্ট্রগুলির বাইরে বিশেষ কোথাও দেখা যায় না। ভারতের মত নানা গোষ্ঠী-জাতি-ধর্ম-ভাষা অধ্যুষিত বিশাল দেশে তার কল্পনাও অসম্ভব। সে যুগে রামমোহনের গণতন্ত্রচিন্তায় এই সতর্কতা ও অন্তর্দৃষ্টি সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু তখন পর্যন্ত ইংলণ্ডের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের উপরই তাঁর আস্থা। এ ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক—কিন্তু সর্বসাধারণের পরিবর্তে শাসনকার্যের ভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের উপর ন্যস্ত; রাজা সেখানে নামে সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হলেও জনসাধারণের (অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিগণের) ইচ্ছায় চলতে বাধ্য (the executive power should be committed to a single individual, on condition that he do not infringe the laws established by the nation : which has been experienced to be the best of all forms of government ; since in this case the subjects have the power of watching the proceedings of the executive government ; which is thus obliged to court the good will of its subjects)।[৪৪] কিন্তু জীবনের শেষপর্বে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ডীয় সংবিধানের এই শূন্যগর্ভ রাজতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস যেন অন্তর্হিত হয়েছে। ইংলণ্ডে রামমোহনের অন্তরঙ্গমহলের একাংশের তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হতেই বিশ্বাস জন্মেছিল যে তিনি রাজনীতিতে সাধারণতন্ত্র বা republicanism-এ বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। জেম্‌স

স্যাদার্ল্যাণ্ড বা স্ট্যাণ্ডফোর্ড আর্নটের মত যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতেন তাঁদের উক্তিতে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৪৫] রাজভক্তি ইংরেজচরিত্রের (অন্ততঃ উনবিংশ শতকীয় ইংরেজচরিত্রের) অন্যতম বৈশিষ্ট্য; সাদার্ল্যাণ্ড ও আর্নট এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন না। রামমোহনের সাধারণতন্ত্র-প্রীতি এঁদের কাছে সম্ভবত কিছুটা অস্বস্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে উঠেছিল; ব্যাপারটির উল্লেখ করেই তাই তাঁরা সযত্নে প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে গেছেন। সাদার্ল্যাণ্ড তো একটু সাফাই গাওয়ার ভঙ্গীতে একথাও বলে ফেলেছেন—সাধারণতন্ত্রের প্রতি রামমোহনের অনুরাগ থাকলেও তিনি ইংলণ্ডের পক্ষে একে প্রয়োজনীয় মনে করতেন না; তাঁর মতে রামমোহন "admired republicanism in the abstract and thought that in America it worked well."।[৪৬] কিন্তু তাঁদের উক্তি থেকে একথাও পরিষ্কার বোঝা যায়, তদানীন্তন ইংলণ্ডের ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের দৃঢ় ধারণা ছিল রামমোহন রাজনীতিতে সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এর কিছু প্রমাণও বর্তমান লেখকের হস্তগত হয়েছে। ইংলণ্ডে পৌঁছে রামমোহন প্রথম পদার্পণ করেন লিভারপুল সহরে। এখানে রেভাঃ উইলিয়ম স্কোর্সবীর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। উত্তরকালে তাঁর স্মৃতিকথায় স্কোর্সবী স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, রামমোহন ইংলণ্ডে প্রকাশ্য আলোচনায় রাজনীতিপ্রসঙ্গে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতেন, কেন না তিনি জানতেন, তাঁর সাধারণতান্ত্রিক মতবাদ ইংরেজদের কাছে প্রীতিপ্রদ হবে না (Aware, I apprehend, that his republican sentiments would not fiind very general acceptance,—he spoke cautiously in mixed society, on political subjects.)।[৪৭] ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে রক্ষিত রামমোহন সংক্রান্ত একটি অপ্রকাশিত সমসাময়িক বিবরণ এ বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করে। ১৯ মার্চ ১৮৩২ রামমোহনের এক ইংরেজ বন্ধু (দুঃখের বিষয় তিনি নিজ নাম উল্লেখ করেন নি) তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে দীর্ঘ আলাপের পর উক্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেন। দেখা যায় আলোচনায় রাজনীতি, ধর্ম, সংগীত প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ উঠেছিল। সাধারণতন্ত্র বা re-publicanism সম্পর্কেও তাঁরা আলাপ করেছিলেন। বিবরণকার এই সূত্রে রামমোহন সম্পর্কে বলছেন: "When he heard Kingly Govern-

ment praised he smiled and said, he did not know what to say to that; he could not sympathise with the English in their partiality for it—that there was indeed the highest authority against it; ·····"।[২৮] গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও রাজা বা রাজতন্ত্রের প্রতি ইংরেজ জাতীয় চরিত্রে যে দুর্বলতা আছে সেটুকু তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি—কথোপকথনপ্রসঙ্গে অনতিপরে তিনি তা নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে স্নিগ্ধ কৌতুকও করেছেন ("···there is a great attachment to Royalty in this country," he continued, "when I first came and saw the word 'Royal' associated with places of business & amusements and establishments of various kinds I thought that the king must have had some share in their building or was in some way personally connected with them.")। সুতরাং একথা নিরাপদে মেনে নেওয়া চলে শেষজীবনে রামমোহন রাজতন্ত্রের মোহমুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সঙ্গে সাধারণতন্ত্রের যোগকেই আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা ভাবতে সুরু করেছিলেন। সম্ভবতঃ ফ্রান্স ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত এবিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের কারণ —কেননা এই দুই দেশের সঙ্গে তাঁর নিবিড় আত্মিক যোগ ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শ তাঁকে যৌবনকাল থেকেই গভীর ভাবে আকর্ষণ করেছে। অল্প সময়ের জন্য হলেও ফ্রান্স পরিদর্শন করবার অবসর তিনি পেয়েছিলেন যদিও তাঁর আমেরিকা দর্শনের স্বপ্ন সফল হয়নি। অবশ্য আমেরিকাস্থ কোনও কোনও বন্ধুকে লিখিত পত্রে তিনি আমেরিকার তৎকালীন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্টত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ পরিণত ধ্যানটি যদি তিনি সবিস্তারে প্রকাশ করে যাবার সুযোগ পেতেন তাহলে আমরা সেখানে ভারতকে জনপ্রতিনিধিমূলক সাধারণতন্ত্র (democratic republic) রূপে কল্পিত দেখতে পেতাম এ অনুমান ন্যায়সঙ্গত ভাবেই করা চলে। দুঃখের বিষয় অকালমৃত্যু তাঁকে এই অবসর দেয়নি।

রামমোহনের ভারতচিন্তার আর এক বৈশিষ্ট্য, তিনি এই বিশাল ও বিচিত্র দেশকে কেবলমাত্র হিন্দু জাতির বাসভূমি ও হিন্দুসংস্কৃতির বিকাশভূমি রূপে

কল্পনা করেন নি। অথচ হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা ও হিন্দুসমাজের সংস্কারপ্রয়াসী হিসাবে এরূপ একদেশদর্শিতা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করলে সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত হত না। তাঁর রচনার মধ্যে বার বার তাঁর এই ধারণা অতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখা যায় যে ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের যৌথ বাসভূমি। এদেশে আট শতাব্দীব্যাপী মুসলিম শাসনকালে মুসলমান সভ্যতার যে দৃঢ় বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে অস্বীকার করলে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হয়। ধর্মবিতর্কে রামমোহন যেখানে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন সেখানে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম ও সম্প্রদায়ের স্বপক্ষে তাঁর কণ্ঠ উচ্চারিত। 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র (১৮২১) ভূমিকাতে তাঁর এই মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়: "…ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংবেজ যাহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা-প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পূর্ণ হয় (।) দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন (।) তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগো কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসক্য জন্মে।" এর পর রামমোহন তাঁর যুক্তিকে আরও সম্প্রসারিত করে বলছেন—বঙ্গদেশে রাজশক্তি ইংরেজ এবং সেই সুবিধা নিয়েই মিশনারীরা হিন্দু-মুসলমান প্রজার ধর্মের এমন নিন্দা ও উৎপীড়ন করতে সাহসী হচ্ছেন। তুর্কী, পারস্য প্রভৃতি স্বাধীন মুসলমানরাষ্ট্রে তাঁদের এমন আচরণ করবার স্পর্ধা হবে না: "কিন্তু… মিসনরি বা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন (।) কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয়

না…।"[৪৯] অন্যত্র তাঁর An Appeal to the Christian Public গ্রন্থেও দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় প্রাতপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কথা মনে রেখেই যুক্তিপ্রয়োগ করেছেন: "Hindusthan is a country of which nearly three fifhs of the inhabitants are Hindoos and two-fifths Musalmans……weighing these circumstances, and anxious from his long experience of religious controversy with natives, to avoid further disputation with them, the Compiler selected those Precepts of Jesus, the obedience to which he believed most peculiarly required of a Christian and such as could by no means tend, in doctrine, to excite the religious horror of Muhammadans or the scoffs of Hindoos. What benefit or peace of mind can we bestow upon a Musalman who is an entire stranger to the Christian world by communicating to him without preparatory instruction all the peculiar dogmas of Christianity... ?"[৫০] ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ আলোচনা-প্রসঙ্গেও দেখা যায় রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গী অব্যাহত। তিনি সর্বদা স্মরণে রেখেছেন এ দেশ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত নিবাস এবং এই দুটি উপাদানকে সুনিপুণ ভাবে মেলাতে পারলেই ভারতীয় জাতিগঠন সম্পূর্ণ হতে পারে। পার্লামেন্টের সিলেক্ট্ কমিটির সম্মুখে প্রদত্ত তাঁর সাক্ষ্যে এ বিশ্বাস উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পেয়েছে যে দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গল নির্ভর করবে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়দ্বয়ের সহযোগিতার উপর যে হেতু এদের বিশিষ্ট গুণগুলি অনেকাংশে পরস্পরের পরিপূরক: "The Mohammadans are more active and capable of exertion than the Hindus, but the latter are also generally patient of labour and diligent in their employments."।[৫১] সরকারী কাজে লোক-নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্নে দেখা যায় হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান রামমোহনের মন আশ্চর্যরকম সংস্কারমুক্ত। 'Are the native law-assessors generally competent ?' সিলেক্ট্ কমিটির এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বলছেন: "They are generally so: some of

the Muftis (Musalman law-assessors) are men of such high honour and integrity, that they may be entrusted with the power of a jury with perfect safety"।[৫২] আর একটি প্রশ্নের (Should not the jury be selected from persons of all religious sects and divisions?) উত্তরে রামমোহন বলেন: "Since the criminal law has hitherto been administered by the Mohammadans, to conciliate this class, the assessors should still be selected from among them, until the other classes may have acquired the same qualifications and the Mohammadans may become reconciled to co-operate with them."।[৫৩] মোটকথা দেশে তৎকাল প্রচলিত ফৌজদারী আইনে যে সম্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমানরাই তুলনায় অধিক পারদর্শী এ কথা রামমোহন তাঁর সাক্ষ্যে বেশ জোর দিয়েই একাধিক স্থলে বলেছেন।[৫৪] ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে জুরী আইনের বিরুদ্ধে রামমোহনের উদ্যোগে দু'শ-একুশটি স্বাক্ষর-সংযুক্ত যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয় তাও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিবাদ। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একশ ছাব্বিশ জন ছিলেন হিন্দু ও পঁচানব্বই জন মুসলমান।[৫৫] সুতরাং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও মৈত্রীর পথই যে ভারতীয় জাতিসংগঠনের উপযুক্ত পথ রামমোহনের চিন্তায় এ সত্য ধরা পড়েছিল। জাতি হিসাবে ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানের যোগ্যতার প্রশ্নেও দেখা যায় তাঁর কোনও হীনমন্যতা (inferiority complex) নেই। সিলেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে 'What capability of improvement do they possess?' এই প্রশ্ন করা হলে তিনি দ্বিধাহীন উত্তর দিয়েছিলেন: "They have the same capability of improvement as any other civilised people."।[৫৬] বস্তুত আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তার ক্রম-অভিব্যক্তির ইতিহাসে রামমোহনের এই সুস্থ সামগ্রিক জাতীয় চেতনা বিশেষভাবে স্মরণীয়, কেননা উত্তরকালে স্বদেশী আন্দোলন, চরমপন্থী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের কোনও কোনও পর্বে একে সংকীর্ণ ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবোধের দ্বারা খণ্ডিত হতে দেখা গিয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের এই পর্যায়ে রামমোহন জীবিত থাকলে সম্ভবতঃ 'ঘরে-বাইরে'র নায়ক নিখিলেশের মতই সাবধানবাণী উচ্চারণ

করতেন: "ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিষ হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।"

ভারতবর্ষের সভ্যতা কৃষিভিত্তিক। এদেশের জনসাধারণের অধিকাংশ গ্রামবাসী ও কৃষিজীবী। এই বর্ণনা সাম্প্রতিক কালের পক্ষেও সত্য,—রামমোহনের সমকালীন ভারত সম্পর্কে তো আরও অনেক বেশী যথাযথ। জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ দেশের বিশাল কৃষককুলের মঙ্গল চিন্তা রামমোহনের জাতীয়তাবোধ ও উদার মানবিক দৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ ছিল। বেণ্টিঙ্কের কাছে তদানীন্তন ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি যে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন ও পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে তিনি যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে দেশের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কৃষকের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি। ইংরেজ প্রবর্তিত রায়তওয়ারি ও চিরস্থায়ী—উভয়বিধ ভূমিব্যবস্থার ফলে ভারতীয় কৃষকের অবস্থা যে উত্তরোত্তর শোচনীয় হয়েছে এ কথা তাঁর সাক্ষ্যে তিনি দ্বিধাহীন ভাবেই ঘোষণা করেছিলেন।[৭৭] জমিদারের অর্থলিপ্সা ও শোষণ এবং রাজকর্মচারিবৃন্দের উৎপীড়নের হাত থেকে কৃষকগণকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ছিল। এ বিষয়ে কিছু নূতন তথ্য বর্তমান লেখকের হস্তগত হয়েছে এবং সেই সূত্রে দ্বিতীয় পরিশিষ্টে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে; এখানে তার পুনরাবৃত্তি না করে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে, তিনি প্রস্তাব করেছিলেন কৃষকগণের উপর করের বোঝা আর না বাড়িয়ে তা চিরদিনের মত নির্দিষ্ট করে দিতে হবে: "The new system acted upon during the last forty years having enabled the land-holders to ascertain the full measurement of lands to their own satisfaction and by successive exactions to raise the rent of the cultivators to the utmost possible extent, the very least I can propose for bettering the condition of the peasantry is absolutely to interdict any further increase of rent on any pretence whatsoever......."।[৭৮] অর্থাৎ রামমোহনের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবলমাত্র জমিদারের সঙ্গে নয়—রায়তের সঙ্গেও হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে এইভাবে নিঃস্ব গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের স্বার্থরক্ষার উপায়

নির্দেশ করে রামমোহন ভবিষ্যৎ জাতিগঠনপন্থার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। নবগঠিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও গ্রামীণ কৃষকসমাজ সম্পর্কে তাঁর এই ধারণার কথা মনে রাখলে বোঝা সহজ হয় কি কারণে তিনি এদেশে ইউরোপীয়গণের স্থায়ী বসবাস বা 'কলোনাইজেসন' এর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল—ইউরোপীয়গণের উদ্যমশীল চরিত্র ও মূলধনের সংস্পর্শ পরোক্ষভাবে এদেশে একটি প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দ্রুত সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে সাহায্য করবে; এবং ভূম্যধিকারীরূপে একটি ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অবলম্বিত বিজ্ঞানসমৃদ্ধ উন্নততর কৃষিপদ্ধতি এদেশের কৃষিকার্যে নবযুগ আনয়ন করবে। স্মরণ রাখা উচিত তিনি যোগ্য, উন্নতচরিত্র ও সুশিক্ষিত ইউরোপীয় ও নিম্নস্তরের অর্ধশিক্ষিত বেপরোয়া ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীর মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল ভারতে যদি ইউরোপীয় বসতি গড়ে ওঠে তা হলে বসবাসকারীরা সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীভুক্ত হবেন ও তাঁরা এদেশকে সম্পূর্ণ নিজের বলে গ্রহণ করবেন। এ স্বপ্ন অবশ্য সফল হয় নি। কিন্তু সে যুগে এমন স্বপ্ন রামমোহন একা দেখেন নি; ডিরোজিও ও তৎপ্রভাবিত নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীও এই উন্নত শ্রেণীর ইউরোপীয়গণের ভারতে বসতিস্থাপন বা 'কলোনাইজেসন্'-এর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত ইউরোপীয়গণের মধ্যে গুণগত বিভাগ-নির্ধারণের অভ্যাসটিও রামমোহনের সময় থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তানায়কদের মধ্যে টিকে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কৃত 'বড় ইংরেজ' ও 'ছোট ইংরেজ'-এর পার্থক্যও মনে পড়ে।

এই পথে জাতীয় সংহতির ভিত্তি রচনা সম্ভব হলেও একটি মূল সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়। ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রাকৃতিক ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যে স্বতস্ফূর্ত ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক দেশচৈতন্য ভারতবাসী বহুযুগ ধরে অন্তরে পোষণ করে এসেছে তা আদৌ রাষ্ট্রভিত্তিক নয়। তার মূল ব্যক্তিচৈতন্যের অতি গভীরে অবস্থিত। এই বোধটিকে জাগরিত রাখতে না পারলে ভারতবর্ষের পক্ষে পশ্চিমী ছাঁদের জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ তার যুগোপযোগিতা সত্ত্বেও গুরুতররূপে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাধনার দ্বারা ভারতীয় প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য রামমোহন স্বয়ং ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন; আর সেই কারণেই তিনি নবযুগের

দেশোপলব্ধিকে এই পূর্ণতর ও গভীরতর ভিত্তির উপর স্থাপন করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন প্রয়াস রামমোহনের পূর্বেও দেখা গেছে। আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষের অসংখ্য ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ভারতবাসীর মধ্যে একটি মানসিক সমভূমি আবিষ্কারের পথে প্রধান বাধাস্বরূপ। এই সমস্যাটি প্রায় প্রতিযুগেই ভারতের চিন্তারাজ্যের নেতৃস্থানীয়গণকে বিব্রত করেছে—এবং প্রায় প্রতিবারই ইতিহাসে আমরা এক-একটি সমাধান-সূত্রের ইঙ্গিত পেয়েছি যার কোনটি প্রচ্ছন্ন, কোনটি বা স্পষ্ট। উপনিষদের উদার ব্রহ্মবাদ, এসিয়া-বিজয়ী মহাযান বৌদ্ধধর্ম, সম্রাট আকবর উদ্ভাবিত দীন্-ই-ইলাহি, হিন্দু-মুসলমান ধর্মচিন্তার সমন্বয়ের ভিত্তিতে উদ্ভূত মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলন প্রভৃতিকে এর নিদর্শন গণ্য করা যেতে পারে—যদিও সমাধান হিসাবে এর সব কটি সমান সফল বা পূর্ণাঙ্গ নয়। রামমোহনের যুগে পূর্বপ্রচলিত সাম্প্রদায়িক ও উপসাম্প্রদায়িক ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এদেশে নবোদ্যমে প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মের সংঘাত। বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর তর্ক-বিতর্ক ও কলহ-বিবাদ তখন প্রতিপদে ভারত-চেতনাকে খণ্ডিত করে চলেছিল। এই মত-সংঘর্ষ নিরোধে রামমোহন দুটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রথমটি হল সংগ্রামের। তিনি হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র (তৎসহ সম্ভবত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের কিছু অংশ) গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেন—প্রত্যেক ধর্মে কালক্রমে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও অন্ধ আচারের স্তূপ জমা হয়, কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানবসমাজে ভেদ সৃষ্টিকারী সে-সব অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের কোনও সম্পর্ক নেই। সমগ্র 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্'-এ এই ছিল তাঁর অন্যতম প্রতিপাদ্য। উত্তর জীবনেও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও অর্থহীন আচারপরায়ণতাকে আক্রমণ করতে কখনও তিনি দ্বিধা করেন নি। ফলে সকল ধর্মের রক্ষণশীল গোষ্ঠী তাঁর উপর খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। শোনা যায় রংপুরে অবস্থানকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক ধর্মান্ধ অংশ তাঁকে হত্যার চেষ্টাও করেছিল। সতীদাহ উচ্ছেদ আইন পাশ হবার পরে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সমস্ত আক্রোশ তাঁর উপর পড়ে ও গুপ্ত আততায়ীর ভয়ে তাঁকে সর্বদা কতখানি সতর্ক থাকতে হত সমসাময়িক Johu Bull পত্রিকা তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।[২৩] জরথুস্ত্রীয় সম্প্রদায় তাঁকে কিরূপ হিংস্র আক্রমণ করেছিলেন তার প্রমাণ থেকে গিয়েছে 'জবাব্-ই-তুহ্ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন'

নামক ফার্সী পুস্তিকার পৃষ্ঠায়।[১০] খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের সঙ্গে তাঁকে ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। বাঙ্‌লা 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) ইংরেজি The Brahmunical Magazine (প্রথম তিন খণ্ডের প্রকাশ ১৮২১; চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ ১৮২৩) ও Appeal to the Christian Public পর্যায়ের তিনখানি গ্রন্থ (প্রকাশকাল ১৮২০, ১৮২১ ও ১৮২৩) এই উপলক্ষে রচিত। এই সব বাদানুবাদের ভূমিতে রামমোহনকে দেখা যায় সংগ্রামী সংস্কারকরূপে। এ ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিতর্কের শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ করে ধর্মবিরোধের মূলস্বরূপ অন্ধবিশ্বাস ও প্রাণহীন আচারের রাশিকে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার অঙ্গন থেকে দূর করতে উদ্যত। কিন্তু এর পরিপূরক তাঁর একটি দ্বিতীয় ভূমিকা আছে। এটি হল সমন্বয়াচার্যের,—ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি রূপে কল্পনা এই দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। এই সমন্বয়াদর্শ রূপায়িত করতে রামমোহনের দীর্ঘ সময় লেগেছিল। তরুণ বয়স থেকে তিনি তাঁর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন শাস্ত্রে ও জীবনের অভিজ্ঞতায়। অবশেষে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্থাপন করেন ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মসভা। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই প্রতিষ্ঠানের ন্যাসপত্রে[১১] এর আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে বিবৃতি আছে সেখানে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ জাতিধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে; এখানে একমাত্র অনন্ত, অচিন্ত্য, বিকাররহিত, অক্ষয়, অবিনাশী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা পরমেশ্বরের উপাসনা হবে; কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক চিহ্ন বা প্রতীক উপাসনায় ব্যবহৃত হবে না বা কোনও চিত্র, মূর্তি বা প্রতিমূর্তি এখানে স্থান পাবে না; এবং উপাসনাকালে কোনও সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবী, ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মগুরুর নিন্দা করা এখানে চলবে না। ধর্মচিন্তা ও উপাসনাপদ্ধতিকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিশিষ্টতার ঊর্ধ্বে এক সামান্য ভূমিতে স্থাপনের প্রয়াস এখানে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। যদি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে এই উপাসনামন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ে তাঁদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত ও আচার ত্যাগ করবার অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করতে হত, তবে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও আত্মিক ঐক্যভূমিতে উপনীত হবার চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ অবশ্যই ক্ষুণ্ন হত। কিন্তু রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ সমবেত উপাসকগণের কাছে এই জাতীয় আধ্যাত্মিক

সমীকরণ দাবী করে নি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ভুক্তগণ নিজ মতে প্রতিষ্ঠিত থেকেও জড়পূজা, স্থূল ও নিরর্থক ক্রিয়াকর্মের স্তর (প্রত্যেক ধর্মের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিতে যেগুলি মূল অধ্যাত্মচেতনার চতুর্দিকে প্রলিপ্ত) অতিক্রম করে যাতে বিশুদ্ধ সার্বভৌম আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে মিলিত হতে পারেন—এমন একটি পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করাই আদৌ ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ছিল। রামমোহন স্বয়ং বিগ্রহপূজা ত্যাগ করেছিলেন—কিন্তু তাঁর মত জোর করে তিনি কারও উপর চাপিয়ে দেন নি—এমন কি নিজ পুত্রদ্বয়ের উপরও নয়। 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩; এর ইংরেজি সংস্করণ Humble Suggestions to his Countrymen who believe in the One True God এক সঙ্গে একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল) শীর্ষক পুস্তিকায় তিনি দেশী বিদেশী সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি মতভেদসত্ত্বেও অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ও প্রীতিপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম পর্বের উপাসনাতে সর্বসম্প্রদায়ের মানুষ যে উপস্থিত থাকতেন তার উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মাঝে মাঝে এখানে স্তবগানের ভার দেওয়া হত ফিরিঙ্গী ও মুসলমান বালকদের উপর।[৫২] এই ভাবে উপাসনার হিন্দুধর্মসম্মত কাঠামো বজায় রেখেও আধ্যাত্মিক মার্গে এক মিলনভূমির কল্পনার মাধ্যমে রামমোহন তাঁর ভারতচেতনারই এক গভীরতর ভূমি অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পালের মূল্যায়ন যথার্থ: 'জীবের সকল অঙ্গ যদি নষ্ট হইয়া একমাত্র অঙ্গে পরিণত হয় তাহাতে যেমন সে পঙ্গু হইয়া পড়ে সেইরূপ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসকল যদি একাকার হইয়া যায় তাহা হইলে বিশ্বমানবও পঙ্গু হইয়া পড়িবে। রাজা রামমোহন এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, ধর্ম এবং সাধনাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা করেন নাই। হিন্দুকে তিনি হিন্দু রাখিয়া বড় করিতে চাহিয়াছিলেন, মুসলমানকে মুসলমান রাখিয়াই বিশ্বমানবের অভিমুখী করিতে চাহিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বিদিগকে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত এবং সাধনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই সেই সকল সিদ্ধান্ত ও সাধনের মধ্যে যে সনাতন সত্যের ও কল্যাণের ধারা প্রবাহিত, যুগে যুগে সাধক এবং সিদ্ধ মহাজনপরম্পরায় যে সত্য ও কল্যাণের আশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়াই নিজেদের সাম্প্রদায়িক ধর্মকে

উদার বিশ্বধর্মের প্রতি উন্মুখ করিতে চাহিয়াছিলেন।...সেই মহামিলনক্ষেত্রের পথ গড়িয়া তুলিবার আশাতেই রাজা 'ব্রহ্মসভা'র প্রতিষ্ঠা করেন।.. ভারতবর্ষ আপনার বৈচিত্র্যে একটা ক্ষুদ্র বিশ্বের মতন।...এখানে বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহুবিধ সামাজিক রীতিনীতি বহু আচারপদ্ধতি, বহু সাধনা এবং সভ্যতা আসিয়া মিলিয়াছে। এই ভারতে যদি এক মহাজাতি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যকে যথাযোগ্যভাবে বজায় রাখিতেই হইবে।... আধুনিক জগতে ভারতবর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার এই প্রকৃতিগত ধর্মানুরাগকে নষ্ট করিলে চলিবে না। ধর্ম যেখানে সংস্কারবদ্ধ হইয়া নিজের প্রাণতা হারাইয়াছে সেখানে তাহাকে সংস্কারমুক্ত করিয়া সজীব করিতে হইবে; যেখানে সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে সেখানে উহাকে উদার হইতে হইবে, কিন্তু ভারতের ধর্মপ্রাণতাকে নষ্ট করা তো দূরের কথা, উপেক্ষা করিয়াও একটা জাতিগঠন করা সম্ভব নহে। আর অন্যদিকে হিন্দুকে মুসলমান কিংবা মুসলমানকে হিন্দু অথবা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া এবং জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সেই সংঘভুক্ত করিয়া ভারতে একটা ধর্মের প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নহে।.. অন্যপক্ষে এ সকল ধর্মের মধ্যে যে ভেদ ও বিরোধ আছে তাহার তীব্রতা যদি নষ্ট না হয়, তাহা হইলেও হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টীয়ান প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ সমাজের এবং সমষ্টিভূত ভারতীয় জাতীয় জীবনের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে বিরোধ আছে তাহা দূর না হইলে ভারতে আধুনিক আদর্শে একটা নূতন জাতির পত্তন কিছুতেই হইতে পারে না। রাজা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এবং ভারতের জাতীয়তার মূল অন্তরায় দূর করিবার উদ্দেশ্যেই, মনে হয়, তিনি তাঁহার 'ব্রহ্মসভা'র প্রতিষ্ঠা করেন।...ধর্মে ধর্মে যে ভেদ-বিরোধ তাহা বহিরঙ্গের; আচার-বিচারের সাধন অতি নিম্নস্তরের।...হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের চিন্তানায়ক ও উদার সাধকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাহাতে একে অন্যের ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের ও কল্যাণের সন্ধান পাইতে পারেন এবং সেই সন্ধান পাইয়া একে অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন ইহাই রাজার 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠার নিগূঢ় উদ্দেশ্য মনে হয়।...এইরূপে ভারতের জনসমুদ্রের ধর্ম ও আচারগত ভেদ ও বিরোধের অন্তরায়কে ক্রমে ক্রমে

দূর করিয়া এ সকল ভেদের ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষে একটা বিরাট জাতীয় একতার প্রতিষ্ঠা করিবার আশাতেই মনে হয় রাজা তাঁহার 'ব্রহ্ম-সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন।"৬৩ উত্তরকালে প্রধানত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যুগ থেকে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ যে প্রতিষ্ঠানগত রূপ ধারণ করে তার প্রকৃতি রামমোহন পরিকল্পিত 'ব্রাহ্মসমাজ' বা 'ব্রহ্মসভা' হতে মৌলিকভাবেই ভিন্ন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রামমোহনের জাতিগত ঐক্যচেতনার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উপসংহারে উল্লেখ না করলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভারতবর্ষে জাতি ও রাষ্ট্রের সংগঠন বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট ও মৌলিক চিন্তা ছিল এবং এর গভীরতর ভিত্তি হিসাবে ধর্মাশ্রয়ী ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র ভাবনাধারার একটি আত্মিক মিলন-ভূমি রচনার পরিকল্পনাও তিনি করেছেন। রামমোহনের চিন্তাধারাকে কালানুক্রমিকভাবে অনুসরণ করলে দেখা যায় এই ভারতচেতনাই তাঁকে ক্রমশঃ উত্তীর্ণ করেছিল বিশ্বচেতনায়। একদিকে তাঁর ব্রহ্মবাদ সর্বপ্রকার ধর্মীয় আচারগত সংকীর্ণতা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল, অন্যদিকে ছিল সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের দীক্ষা। তাই কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদের পরিধির মধ্যে তাঁর চিত্ত শেষ পর্যন্ত আবদ্ধ থাকে নি। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখিত তাঁর পত্রখানিতে এই মনোভাবের উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে তিনি পৃথিবীর দেশ ও জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের জন্য একটি জাতি-সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন ও এই প্রসঙ্গে তাঁর যে উক্তিটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য তা এই: "It is now generally admitted that not religion only but unbiassed common sense as well as accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse, in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantages and enjoyment of the whole human

race." ।[৩৪] রামমোহনের ভারতচিন্তা এই ভাবেই বিশ্বমানবিক চেতনার সঙ্গে নিজেকে সমন্বিত করবার প্রয়াস পেয়েছিল। মনে রাখতে হবে ইংলণ্ডে বাসকালে যখন তিনি এই উক্তি করেন—তখন তিনি সর্বতোভাবে স্বদেশ-সেবায় নিযুক্ত। প্রিভি কাউনসিলে সতীদাহবিরোধী আইন উচ্ছেদকল্পে ভারতীয় রক্ষণশীলগণের আবেদনের বিরুদ্ধে জনমতসংগঠন, ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনদে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কল্যাণসূচক ধারা সংযোজনের প্রচেষ্টা, মুঘলসম্রাটের ভাতাবৃদ্ধির প্রয়াস ইত্যাদি বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর দেহমনের শক্তি অনবরত ক্ষয় হচ্ছে। এই দেশাত্মবোধের মধ্য থেকেই তাঁর বিশ্ববোধ প্রসূত—দুইএর মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনই তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষকে তিনি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেখানেই তাঁর চিন্তার গণ্ডী টানেন নি। শেষ পর্যন্ত জাতীয়তার ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থেকেও সে চিন্তা জাতীয়তার সীমানা অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয়েছে বিশ্বমানবের মিলনপ্রাঙ্গণে।

প্রমাণপঞ্জী :

১. বিবিধ প্রবন্ধ, 'ভারত-কলঙ্ক-ভারতবর্ষ পরাধীন কেন ?', উদ্ধৃত অংশ যুক্ত একটি পাদটীকায় লেখক স্পষ্ট বলেছেন, "এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।"

২. বিষ্ণু পুরাণ : ২. ৩. ১. (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কৃত সংস্করণ, পৃ: ২৩০)

৩. বায়ু পুরাণ : ৪৫. ৭৫-৭৬ (বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃ: ২২৯)

৪. মার্কণ্ডেয় পুরাণ : ৫৭. ৫৮ (নিরপেক্ষ ধর্ম-সঞ্চারিণী সভা সংস্করণ পৃ: ৯১)

৫. অর্থশাস্ত্র : ৯. ১ : 'দেশ: পৃথিবী। তস্যাং হিমবৎসমুদ্রান্তরমুদীচীনং যোজন-সহস্রপরিমাণং তির্যক্ চক্রবর্তিক্ষেত্রম্।' (গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৫)। কেউ কেউ এই অংশের 'তির্যক্' শব্দটিকে 'অতির্যক্' পড়েছেন। আমি গণপতি শাস্ত্রীর 'তির্যক' পাঠই গ্রহণ করেছি। উক্তিটিকে বুঝবার পক্ষে এই 'পাঠ'ই অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত বলে মনে হয়।

৬. কাব্যমীমাংসা, সপ্তদশ অধ্যায় : 'তত্রেদং ভারতং বর্ষম্। অস্য চ নব ভেদা: ।... পঞ্চশতানি জলং পঞ্চ স্থলমিতি বিভাগেন প্রত্যেকং যোজনসহস্রাবধয়ো দক্ষিণাৎসমুদ্রাদদ্রি-রাজং হিমবন্তং যাবৎপরস্পরমগম্যাস্তে। তাংস্তেতানি যো জয়তি স সম্রাড়িত্যুচ্যতে। কুমারী-পুরাৎ প্রভৃতি বিন্দুসরোঽবধি যোজনানাং দশশতী চক্রবর্তিক্ষেত্রম্। তাং বিজয়মানশ্চক্রবর্তী ভবতি।' (গাইকোয়াড় সংস্কৃত সিরিজ—দালাল ও শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্করণ পৃ: ৯২।) এই

প্রসঙ্গে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার প্রণীত *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India* (প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০) গ্রন্থের 'Chakravarti-Kshetra' শীর্ষক সুলিখিত অধ্যায়টি পঠিতব্য। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও অনুশাসনাবলীর প্রায় সমস্ত প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যপ্রমাণ এখানে নিপুণভাবে একত্র করা হয়েছে।

৭. অঙ্গুত্তর নিকায়—পালি টেকস্ট সোসাইটি সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৯০ :

চক্কবত্তী অহুং রাজা জম্বুসণ্ডস্স ইস্সরো
মুদ্ধাভিসিত্তো খত্তিয়ো মনুস্সাধিপতী অহুং।
অদণ্ডেন অসত্থেন বিজেয্য পঠবিং ইমং
অসাহসেন ধম্মেন সমেন মনুসাসিয়া।
ধম্মেন রজ্জম্ কারেত্বা অস্মিং পঠবিমণ্ডলে।

এক্ষেত্রে জম্বুখণ্ডের এই অধিপতিকে পৃথিবীর অধীশ্বররূপেই বর্ণনা করা হয়েছে বটে—কিন্তু একচ্ছত্র রাজাদের সম্পর্কে এমন অতিরঞ্জিত উক্তি প্রাচীনকালে প্রথাগত ছিল। সম্রাট অশোকের রাজ্যের আয়তন ছিল পূর্বে ও দক্ষিণে অল্প কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ। এই সাম্রাজ্য তাঁর এক শিলা-লেখে জম্বুদ্বীপ নামে উল্লিখিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ধৌলিতে প্রাপ্ত তাঁর পঞ্চম মুখ্য শৈলানুশাসনে তিনি পরোক্ষভাবে বলেছেন তাঁর শাসনক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী (এ ইয়ং ধংমনিসিতে তি ব ধংমাধিথানে তি ব দানসযুতে ব সব-পুঠবিয়ং ধংমযুতসি বিয়াপটা ইমে ধংমমহামাতা)।

৮. দ্রষ্টব্য *Tuhfat-ul Muwahhidin or A Gift to Deists*, মৌলবী ওবেদুল্লা-আল ওবেদ কৃত ইংরেজি অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা ১৯৪৯, ভূমিকা।

৯. Collet, p. 497

১০. রামমোহনের তিব্বতভ্রমণের ঐতিহাসিকতায় কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। প্রসঙ্গটির বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Collet pp. 12-13। রামমোহন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ লান্ট কার্পেন্টারের কাছে স্বয়ং দু'বার তাঁর তিব্বত-ভ্রমণের কাহিনী বলেছিলেন—একবার লণ্ডনে, আর একবার ব্রিস্টলে (দ্রষ্টব্য, লান্ট কর্পেন্টার—*A Review of the Labours Opinions and Character of Rajah Rammohun Roy* London and Bristol, 1833, pp. 101—02, বিশেষতঃ ১০২ পৃষ্ঠায় সংযোজিত পাদটীকা)। কালক্রমের দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় ১৭৮৮ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত তিন বৎসর বা এই পর্বের কোনও ভাগ রামমোহনের পক্ষে তিব্বতে অতিবাহিত করা অসম্ভব ছিল না।

১১. দ্রষ্টব্য *Letters and Documents* pp. 132, 155, 169, 259 ; বারাণসীর সমকালীন কমিশনার দফ্তরের নথিপত্র থেকে সম্প্রতি জানা গিয়েছে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বারাণসীতে সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন (দ্রষ্টব্য Collet p. 412)।

১২. দ্রষ্টব্য Collet pp. 39-40, রামমোহনের ভুটান-পরিদর্শনের একটি অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় 'জবাব-ই-তুহ্ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন' নামক সমকালীন ফার্সী গ্রন্থে। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট—৪।

১৩. সৌভাগ্যক্রমে রামমোহনের হিন্দী ও উর্দু রচনার নিদর্শন অল্প কিছু কিছু পাওয়া গেছে। তাঁর হিন্দী লিখনশৈলী সম্পর্কে দ্রষ্টব্য পণ্ডিত হাজারি প্রসাদ দ্বিবেদী 'হিন্দী ভাষার রামমোহন' *The Father of Modern India ; Rammohun Centenary Commemoration Volume* Pt. II pp. 465-68 ; উর্দু রচনার নমুনা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য গার্সাঁ দ তাসিকে লিখিত তাঁর উর্দু পত্র—পরিশিষ্ট—১। বলা বাহুল্য এই দুই ভাষাতেই তিনি অনর্গল কথোপথন করতে পারতেন। তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে একটি শ্রুত কাহিনীর উল্লেখ করেছেন জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (নগেন্দ্রনাথ পৃ: ২৬৯)। বস্তুত রামমোহনের মত ছিল, কোনও দেশের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করতে হলে সেখানকার ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। ফ্রান্সে অল্পকাল বাস করেই তিনি ইংলণ্ডে ফিরে গিয়েছিলেন—কারণ তখন পর্যন্ত ফরাসী ভাষা তাঁর পাকাপাকি আয়ত্ত হয়নি। ফরাসী ভাষা ভাল করে শিখে নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় বার ফ্রান্সে যাবার ইচ্ছা ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি রীতিমত ফরাসী চর্চাও শুরু করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য, ৩১ জানুয়ারী ১৮৩৩ মি: উড্‌ফোর্ড্‌কে লিখিত তাঁর পত্র, Collet p 343)। অকাল মৃত্যুর ফলে এই আশা পূর্ণ হয়নি।

১৪. Collet p 498

১৫. দ্রষ্টব্য, ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দের কোনও সময়ে ইংলণ্ডে জন্ ডিগ্‌বীকে লিখিত রামমোহনের পত্র—Collet p. 72 ; ১৮১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে লে: কর্ণেল ফিৎসক্লারেন্সের কাছেও রামমোহন তাঁর ইংলণ্ড গমনের ও সেখানকার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে যোগদান করবার সংকল্পের কথা প্রকাশ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য Lt. Col. Fitzclarence *Journal of a Route Across India through Egypt to England in the Latter End of the year 1817 and the Beginning of 1818*, London 1819, p. 107)।

১৬. ১৭ অক্টোবর ১৮২২ রেভা: জ্যারেড্ স্পার্ক্‌সকে লিখিত এক পত্রে রামমোহন লিখছেন : I shall in all probability visit America in 1824...'। দ্রষ্টব্য, *Bengal Past and Present* January-June, 1975 (Vol XCIV Pt. I No. 178) p. 28।

১৭. রামমোহনের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে তাঁর প্রাক্তন একান্ত-সচিব স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট লণ্ডনের 'এথেনিউম' পত্রিকার ৫ অক্টোবর, ১৮৩৩ সংখ্যায় যে 'স্মৃতিকথা' লেখেন তাতে তিনি বলেছেন : 'Persian, the court language of the East he knew as his mother tongue ;...'। অন্যত্র ঐ প্রবন্ধে রামমোহনের ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন : "In regard to his literary attainments, he was acquainted more or less with ten languages : Sanscrit, Arabic, Persian, Hindustani, Bengali, English, Hebrew, Greek, Latin and French. The two first he wrote critically as a scholar ; the third, fourth, fifth and sixth, he spoke and wrote fluently ; in the eighth, perhaps, his studies or reading did not extend much beyond the originals of the Christian scriptures, and in the latter two his knowledge was apparently more limited ; though to show his unwearied

industry it may be noticed that he had seriously resumed the study of French in the present year." । জেম্স বাকিংহাম ইংলণ্ডের সমকালীন পত্রিকা *The Monthly Repository of Theology and General Literature*-এর অষ্টাদশ খণ্ডে ১৮১৮ সালে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় সম্পর্কে লেখেন, 'My first hour's conversation with him was in Arabic that being the oriental language most familiar to me, and not knowing at first that he spoke English with ease and fluency. (পুনর্মুদ্রিত *Modern Review* March 1932 p. 281) ।

১৮. রামমোহনের সংস্কৃত রচনা যা পাওয়া গেছে সেগুলি এই: (১) 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত' বিচার শীর্ষক তিনখানি সংস্কৃত পুস্তিকা (১৮১৬-১৭) ; (২) 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, এর সংস্কৃত অংশ ; (বাঙলা, হিন্দী ও ইংরেজি ভাষাতেও এটি প্রকাশিত হয়েছিল (৮২০)) ; (৩) 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্ (বঙ্গানুবাদ সহ) (১৮২৭) ।

১৯. দ্রষ্টব্য George Smith *Life of Alexander Duff* Vol I, London 1879, p. 117 ।

২০. 'The writer remembers finding him at his Garden House, near Calcutta, one evening about seven o' clock, closing a dispute with one of the followers of Budh, who denied the existence of a deity. The Rajah had spent the whole day in the controversy without stopping for food, rest or refreshment, and rejoicing more in confuting one atheist than in triumphing over a hundred idolators :...' Sandford Arnot in the *Atheneum* October 5, 1833 ।

২১. দ্রষ্টব্য Leonard *History of the Brahmo Samaj* Calcutta 1879. p. 23.

২২. গ্রন্থাবলী ৪, পৃ: ২৭ ।

২৩. শিক্ষিত সমাজ বহির্ভূত লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার কোনও ধারা রামমোহনকে আকর্ষণ করেছিল কি ? এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক তুষার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার ও নিকটবর্তী নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 'কর্তাভজা' নামক সাধকগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । এঁরা ঈশ্বরের কোনও বিশিষ্ট নাম স্বীকার করেন না—সাধারণত তাঁদের উপাসনা ও সঙ্গীতে ঈশ্বরকে 'কর্তা' বলে উল্লেখ করে থাকেন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু আউলে বা আউলেচাঁদ (ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী) । এঁদের উপাসনায় জাতিভেদ বা স্ত্রী-পুরুষভেদ অস্বীকৃত এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগমার্গের কিছু কিছু ক্রিয়া এঁদের সাধনপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত। সঙ্গীতও এঁদের উপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত কিংবদন্তী অনুসারে রামমোহনের সঙ্গে সমকালীন এই সাধক-সম্প্রদায়ের যোগাযোগ ঘটেছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সমাজভুক্ত কেউ কেউ যে এই সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালীর

প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এমন প্রমাণ আছে। উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয়গণের মধ্যে উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে সাধনসূত্রে কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের কোনও সাধকের যোগ স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানের ফলে যদি রামমোহনের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের যোগাযোগ সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে রামমোহনের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস-চর্চায় নিঃসন্দেহে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত হবে।

২৪. *English Works* Pt. IV pp. 71-72.

২৫. *English Works* Pt. II p. 167; ব্রাহ্মণ-সেবধি—তৃতীয় সংখ্যা—গ্রন্থাবলী-৫ পৃঃ ২৯।

২৬. Collet p. 225.

২৭. *English Works* Pt. II p. 140.

২৮. মেকলের ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ তারিখের শিক্ষাবিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্যলিপি,—দ্রষ্টব্য H. Sharp, *Selections from Educational Records* Part I, 1781-1839 (Calcutta, 1920) p. 116.

২৮ক. *Progressive Movements* No. 169, p. 290.

২৯. অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 'বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (কলিকাতা ১৯৬৮) পৃঃ ২০৫-২০৬-এ উদ্ধৃত; এর বাঙ্‌লা সংস্করণের জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (চতুর্থ সংস্করণ) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫২।

৩০. অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ১৯১৬) পৃঃ ৩০-৩১।

৩১. দ্রষ্টব্য: 'প্রার্থনাপত্র': "দশনামা সন্ন্যাসিদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায় ও দাদূপন্থী ও কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি এই ধর্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ আমাদের কর্তব্য হয়। ভাষাবাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বার এবং ভাষাগানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাঁহাদের পরমার্থসাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে।" এর পরে সঙ্গীতের দ্বারাও যে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে রামমোহন শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করেছেন। গ্রন্থাবলী ৪, পৃঃ ২৭।

৩২. গ্রন্থাবলী ৪, পৃঃ ৪৫-৪৮। সংস্কৃত ভাষায় 'বজ্রসূচী নামক দু'খানি গ্রন্থ আছে: (১) 'বজ্রসূচী' বা 'বজ্রসূচিকা' নামক একটি উপনিষদ্ পদবাচ্য গ্রন্থ; (২) বৌদ্ধ আচার্য অশ্বঘোষ প্রণীত 'বজ্রসূচী'। দু'খানি গ্রন্থেই ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমধর্মের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়বস্তু এক, আলোচনাপ্রণালীও এক, এমনকি ভাষাও স্থানে স্থানে প্রায় এক; যদিও দ্বিতীয় গ্রন্থখানির আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। রামমোহন উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে প্রথমখানির মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (১৮২৭)। এই প্রথম গ্রন্থখানির

অজ্ঞাত গ্রন্থকারকে কেউ কেউ বৌদ্ধ মনে করেন না। কারও কারও মতে এই 'বজ্রসূচী উপনিষদ্'-এর রচয়িতা স্বয়ং শংকরাচার্য বা তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক। (দ্রষ্টব্য, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় *The Vajrasuchi of Asvaghosha*, 2nd Ed. Visva-bharati, 1960, pp. xv-xvii)। কিন্তু এঁরা ভেবে দেখেননি, রক্ষণশীল বর্ণাশ্রমপন্থী শংকর বা তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত কারও পক্ষে—এই দুই গ্রন্থে যেমন আছে—বর্ণাশ্রমধর্মের তেমন কঠোর সমালোচনা করা একেবারে অসম্ভব। অশ্বঘোষের গ্রন্থতো স্পষ্টত বৌদ্ধ রচনা। প্রথম গ্রন্থখানিও ব্রাহ্মণ্য ছদ্মবেশে বর্ণাশ্রমবিরোধী কোনও বৌদ্ধের রচনা হওয়াই সম্ভব, কেননা বৌদ্ধরাই বর্ণাশ্রম ধর্মসম্মত ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের সমালোচনা করেছেন সবচেয়ে বেশী। এর সঙ্গে উত্তরকালে রচিত 'আল্লোপনিষদ্'-এর তুলনা করা যেতে পারে। আল্লা ও মুসলমান-ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করবার জন্য কোনও সংস্কৃতজ্ঞ মুসলমান মধ্যযুগে এটি রচনা করেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজে উপনিষদের উচ্চমর্যাদার কথা মনে রেখেই এই সব বিরোধী সম্প্রদায় তাঁদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী বক্তব্যকে উপনিষদের আকারে রূপ দিতেন। এস্থলে উল্লেখ্য, অশ্বঘোষ-কৃত 'বজ্রসূচী'র জাপানী অনুবাদের ভূমিকায় অনুবাদক ডঃ তাকাকুসু অশ্বঘোষের গ্রন্থখানিকে 'বজ্রসূচী' উপনিষদের টীকা বলে গণ্য করেছেন।

৩৩. আমাদের জাতীয়তাবাদের ক্রম-অভিব্যক্তির ইতিহাসে স্পষ্টত দুটি স্তর আছে: (১) স্বদেশচেতনার জন্ম ও পরিণতির পর্ব; (২) পরাধীনতামুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও তার জন্য সংগ্রামের পর্ব। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির নায়কগণ প্রায় সকলেই অনুভব করেছিলেন —পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে ভারতবর্ষের চিত্তভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে—মধ্যযুগের অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা থেকে ভারতবর্ষ আধুনিক যুগের জ্ঞানালোকদীপ্ত ভূমিতে উত্তীর্ণ হতে চলেছে। ইংরেজ শাসন মাধ্যমে এই পাশ্চাত্য সংযোগ সম্ভব হয়েছিল বলেই ইংরেজ শাসনকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁদের যুগ—আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের জন্ম ও ক্রমপরিণতির যুগ। এই জাতীয়তাবাদের জন্মেরও প্রধান কারণ পাশ্চাত্য-সংস্পর্শ। ইংরেজ শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্তি ঘটতে দীর্ঘকাল লেগেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে ও আরও স্পষ্টভাবে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে পরাধীনতা-মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণপর্বে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রসঙ্গ যে একবারের জন্যও উচ্চারিত হয় নি তা নয়। কিন্তু এসব কল্পনা বা আলোচনাও ছিল প্রায় সবটুকুই বিমূর্ত ও ভাবসর্বস্ব। কেউই ভাবেন নি—ভারতবর্ষের অবিলম্বে স্বাধীনতালাভ বাস্তবতার দিক থেকে সম্ভব।

৩৪. *English Works* Vol. I p. In.

৩৫. *Ibid* Pt. IV p. 103.

৩৬. *Ibid* Pt. III p. 85.

৩৭. Victor Jacquemeut *Voyage dans l' Inde* Tome I, Paris 1841, p. 187.

৩৮. *Asiatic Journal* Vol. XII New Series, September to December, 1833, p. 212.

৩৯. প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পাদিত *The Reformer*-এ প্রকাশিত ও *India Gazette*, 22 January, 1833-এ উদ্ধৃত ; ডঃ যতীন্দ্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত *Indian Speeches and Documents on British Rule (1821-1918)* (Longmans Green, Calcutta 1937) p. 48 ; আরও দ্রষ্টব্য *Progressive Movements* No. 205, p. 394.

৪০. *Manifesto of the Communist Party* (1848),

৪১. J. K Majumdar (ed,) *Selections from Indian Speeches and Documents on British Rule (1821-1918)* pp. 36-37 ; *Progreseive Movements* No. 221, pp. 434-35 ; একই তারিখে (১৩ জুন, ১৮২৯, ১ আষাঢ় ১২৩৬) *Bengal Herald*-এর বাঙলা অংশ 'বঙ্গদূত'এ-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'গৌড়দেশে শ্রীবৃদ্ধি' শিরোনামে, দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (চতুর্থ মুদ্রণ) প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২-৫৪।

৪২. *Progressive Movements* p. 286.

৪৩. Collet pp. 161-63.

৪৪. *Progressive Movements* pp. 294-95.

৪৫. Collet pp. 394-96.

৪৬. *India Gazette*, February 1834 ; পুনর্মুদ্রিত *The Calcutta Review* Vol. 57, No. 1 (October 1935) p. 69.

৪৭. W. Scoresby *Memorial of an affectionate and dutiful Son, Frederick R. H. Scoresby who fell asleep in Jesus December 31, 1834* London 1837, p. 78.

৪৮. লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের পক্ষ থেকে শ্রীমতী জেন বরিংটন ১১ আগস্ট ১৯৭২ অশেষ সৌজন্যসহকারে আমাকে এই বিবরণটির জেরক্স্ প্রতিলিপি পাঠিয়েছিলেন। প্রতিলিপির উপর লিখিত: 'No. MSS. number yet. Will be accessioned later'. পাণ্ডুলিপিখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা চার। উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি তৃতীয় পৃষ্ঠায় আছে। ষষ্ঠ পরিশিষ্টে সমগ্র বিবরণটি মুদ্রিত হল।

৪৯. গ্রন্থাবলী ৫, পৃঃ ৩।

৫০. *English Works* Pt. V pp. 67-68 ; আরও দ্রষ্টব্য 'Appeal' *English Works* Pt. V. pp. 65-66 ; 'Second Appeal' *English Works* Pt. VI pp. 28-30, 44 ; 'Final Appeal' *English Works* (G), Vol II, p. 358.

৫১. *English Works* Pt. III p. 66.

৫২. *Ibid* p. 30.

৫৩. *Ibid* p. 32.

৫৪. 'Questions and Answers on the Judicial System of India' শীর্ষক প্রশ্নোত্তরমালায় '৬৪' সংখ্যক প্রশ্নের (From what class of men would you select

the juries in the criminal courts?) রামমোহন প্রদত্ত উত্তর; বিশেষ দ্রষ্টব্য—*English Works* III p. 31.

৫৫. *Progressive Movements* No. 196, pp. 368-70.

৫৬. *English Works* III p. 66.

৫৭. *Ibid* p. 45.

৫৮. *Ibid.*

৫৯. *John Bull* February 27, 1830, quoted in the *Asiatic Journal* Vol II, New Series (May to August 1830): Asiatic Intelligence, p. 202; আরও দ্রষ্টব্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মসমাজে পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (নব সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৬০) পৃ: ২৬।

৬০. চতুর্থ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৬১. 'Collet'-এর চতুর্থ পরিশিষ্টরূপে ন্যাসপত্রখানি মুদ্রিত হয়েছে।

৬২. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৮৯ শক, পৃ: ৮৯-৯২; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মসমাজে পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (নব সংস্করণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ) পৃ: ১৩।

৬৩. বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা (কলিকাতা ১৩৬২) পৃ: ৩৬-৩৮, ৪১।

৬৪. *English Works* Pt IV p. 127; অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার (*On Rammohun Roy* p. 49) রামমোহনের এই বিশ্বমানবিক চেতনা সম্পর্কে একটি অদ্ভুত উক্তি করেছেন: "Rammohan's cosmopolitanism or internationalism may be a greater or higher virtue, but it is diffent from nationalism, and for this patriotism and national consciousness, which marked the New Age, the Bangalis are perhaps indebted to Derozio even more than the abstract ideas of freedom cherished by Rammohan though they were very liberal and noble,"। ডিরোজিও এবং তাঁর প্রভাবমণ্ডলের অন্তর্গত তরুণ শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে রামমোহনের চিন্তাধারার সম্বন্ধ বিষয়ে সপ্তম অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। এখানে বাহুল্য হলেও কেবল এইটুকু বলা কর্তব্য দেশচৈতন্যের সঙ্গে বিশ্ববোধের কোনও মৌলিক বিরোধ নেই। আধুনিককালে রামমোহনের চিন্তাতেই সর্বপ্রথম সুসমঞ্জস ভারতচেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে বিশ্বমানবিক দৃষ্টিও। জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর গর্ববোধ বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার—হিন্দু-মুসলমানে সমদৃষ্টি, উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, কৃষিভিত্তিক ভারতীয় সমাজে বিশাল কৃষককুলের গুরুত্ব সম্পর্কে নির্ভুল অন্তর্দৃষ্টি ও জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকস্বার্থ রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ, ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য আমৃত্যু অক্লান্ত পরিশ্রম—প্রতিপদে তাঁর দেশবাৎসল্য প্রকাশ করে। স্বামী বিবেকানন্দের মত স্বদেশপ্রেমিকের দেশভক্তিও রামমোহন কর্তৃক অনুপ্রাণিত। স্বামীজি একদা স্বশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে বলেন, তিনটি বিষয়ে তিনি রামমোহন নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করেছেন।—

(১) বেদান্ত অনুশীলন ও প্রচার, (২) দেশভক্তি ও (৩) হিন্দু-মুসলমানে সমদৃষ্টি (his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism and the love that embraced the Mussulmun equally with the Hindu) । (দ্রষ্টব্য Sister Nivedita *Notes of Some Wanderings with Swami Vivekananda* Calcutta 1948. p. 16) । বস্তুত নিরপেক্ষ তথ্যনিষ্ঠ বিচারে রামমোহনকে স্বদেশচেতনার আদিগুরু হিসাবে স্বীকার না করে উপায় নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলাদেশে আধুনিককালে স্বদেশপ্রীতির উদ্ভবের কথা বলতে গিয়ে তাই যথার্থভাবেই রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে রামমোহনকেও স্মরণ করেছেন এই ক্ষেত্রে আদিপুরুষ রূপে ("দেশবাৎসল্য পরম ধর্ম, কিন্তু এ ধর্ম অনেক দিন বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কিনা বলিতে পারি না।·· ···মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা-দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।' —'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-জীবনচরিত ও কবিত্ব'—তৃতীয় পরিচ্ছেদ) । অপর পক্ষে জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেও রামমোহনের দৃষ্টি সার্বভৌমিক। তাঁর প্রতিভার এখানেই বিশেষত্ব। একেত্রে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য রামমোহনের এই বিশ্বমানবিক চেতনা তাঁর যুগের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর ছিল। সে যুগে ভারতে কেন, পাশ্চাত্য দেশেও এর মর্মগ্রহণ করবার যোগ্য মানুষ প্রায় ছিলেন না বললেই হয়। এ যুগেও এর বৈশিষ্ট্য বুঝবার ক্ষমতা যে সকলের নেই রমেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামমোহন রায় ও শাস্ত্র

হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের সংস্কারকরূপেই মুখ্যত রামমোহনের পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা। সমসাময়িক প্রধান ধর্মমতগুলির বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর নিজসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মত্রয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে শাস্ত্রপ্রামাণ্যের প্রশ্নটি তাঁর নিকট স্বভাবত খুব বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল—কেননা এই সব ধর্মই কোনও না কোনও ভাবে শাস্ত্রবাক্যকে সর্বোচ্চ প্রমাণ গণ্য করেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মদ্বয়ে অবশ্য হিন্দুধর্মের মূল প্রমাণ বেদ অগ্রাহ্য, কিন্তু এগুলিরও প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থের বা আপ্তবচনের যে একেবারে অভাব ছিল এমন কথা জোর করে বলবার উপায় নেই। জৈনসম্প্রদায়ের কাছে বর্ধমান মহাবীর ও তাঁর পূর্ববর্তী তীর্থংকরগণের উক্তিগুলি শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকৃত—এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'শ্রুত'। এই সুভাষিতাবলী যে শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত—তার নাম দেওয়া হয়েছে 'অঙ্গ'। নিষ্ঠাবান জৈনের নিকট এই অঙ্গ, হিন্দুর নিকট বেদের মতই মান্য। দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের চারখানি প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ হল (১) প্রথমানুযোগ, (২) করণানুযোগ, (৩) দ্রব্যানুযোগ, ও (৪) চরণানুযোগ। এই গ্রন্থচতুষ্টয় দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়ের 'চতুর্বেদ' আখ্যায় পবিচিত। তেমনি কার্যত বৌদ্ধধর্মে গৌতম বুদ্ধের বচনরূপে প্রসিদ্ধ উক্তি সকল—ব্রাহ্মণ্যধর্মে বেদের যে স্থান—কতকটা তার অনুরূপ স্থান গ্রহণ করেছে। সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রদ্ধাশীল বৌদ্ধের দৃষ্টিতে সমগ্র ত্রিপিটকশাস্ত্রই বুদ্ধবচনরূপে মান্য। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকর্তা বুদ্ধঘোষ 'অভিধম্ম-পিটক'-এর 'অত্থশালিনী' নামক যে টীকা রচনা করেছেন তার মধ্যে ত্রিপিটকের কোন্ অংশকে 'বুদ্ধবচন' বলা যাবে এ সম্পর্কে একটা বিচার আছে। বুদ্ধ-ঘোষের সিদ্ধান্ত—ত্রিপিটকের অন্তর্গত ভগবান বুদ্ধের সুপরিচিত উক্তিগুলিই যে কেবল আপ্তবাক্যরূপে মান্য তাই নয়, বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের উক্তিকেও বুদ্ধবচনের মর্যাদা দিতে হবে ; কেননা তাঁরা ঐ সকল দেশনা বুদ্ধের স্বমুখ থেকেই শ্রবণ করেছিলেন। এখানেই শেষ নয়। বুদ্ধের পরবর্তী কালে যে সকল গ্রন্থ

ত্রিপিটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—বুদ্ধঘোষ এগুলিকেও প্রকারান্তরে প্রামাণিক বুদ্ধ-বচনের মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেন নি। 'কথাবত্থু' নামধেয় অভিধম্মগ্রন্থটি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশনে ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'কথাবত্থুপ্পকরণ-অট্‌ঠকথা' নামক এর যে টীকা বুদ্ধঘোষ লিখেছেন তাতে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন—আলোচ্য গ্রন্থখানি (বুদ্ধের দুই শতাব্দী পরে সংকলিত হলেও) —বুদ্ধবচনরূপেই গণ্য, কেননা সর্বজ্ঞ ভগবান বুদ্ধ তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টির সাহায্যে তাঁর জীবদ্দশাতেই ভবিষ্যতে রচনীয় এই গ্রন্থের বিষয়সূচী ও রচনাপদ্ধতি নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন; বুদ্ধপরিনির্বাণের দুই শতাব্দীরও অধিক কাল পরে মৌর্যসম্রাট অশোকের রাজত্বে অনুষ্ঠিত তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন উপলক্ষে স্থবির মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স 'কথাবত্থু' নামধেয় যে গ্রন্থ রচনা করেন ও যা ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত হয়, তা সেই বুদ্ধ-বচনেরই অনুবর্তন মাত্র। এই যুক্তিতে বুদ্ধঘোষ সমগ্র গ্রন্থখানিকেই বুদ্ধবচনের মর্যাদা দান করেছেন।[১]

ভারতীয় দার্শনিক বিচারে নির্বিচারে গৃহীত এই শ্রুতিপ্রমাণ বা আপ্ত-সাক্ষ্যের বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর যে কখনও শোনা যায় নি তা অবশ্য নয়। তৃতীয় অধ্যায়ে বেদান্তবিদ্ রূপে রামমোহনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাব তিনি শাস্ত্র-বিচারের ক্ষেত্রে যুক্তিমার্গের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে বৃহস্পতির নামে প্রচলিত এক বচন নিজমতের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন :

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥[২]

"কেবলমাত্র শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে কোনও কিছু সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। বিচার যুক্তিহীন হলে ধর্মহানি ঘটে।" তেমনি বুদ্ধের মুখে বৌদ্ধ আচার্যগণই এমন বাণী সন্নিবেশ করেছেন :

তাপাচ্ছেদাচ্চ নিকষাৎ সুবর্ণমিব পণ্ডিতৈঃ।
পরীক্ষ্য ভিক্ষবো গ্রাহ্যং মদ্বচো ন তু গৌরবাৎ ॥[৩]

"জ্ঞানিগণ যেমন স্বর্ণকে ছেদন করে, উত্তপ্ত করে, কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করে তার যাথার্থ্য পরীক্ষা করে তাকে গ্রহণ করেন, তেমনি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার উক্তি পরীক্ষা করেই গ্রহণ করবে, আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়।" জৈন দার্শনিক সংগ্রহকার হরিভদ্রসূরি রচিত 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থের জৈন টীকাকার

মণিভদ্র '৫৪' সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন প্রায় একই শ্রেণীর একটি আশ্চর্য শ্লোক :

পক্ষপাতো ন মে বীরে ন দ্বেষঃ কপিলাদিষু।
যুক্তিমদ্বচনং যস্য তস্য কার্যঃ পরিগ্রহঃ ॥[৪]

"মহাবীরের প্রতি আমার কোনও পক্ষপাত নেই; (সাংখ্যকার) কপিল প্রভৃতির প্রতিও কোনও বিরাগ নেই; যিনি যুক্তিযুক্ত কথা বলেন তাঁর মত-গ্রহণই কর্তব্য।" দেখা যাচ্ছে শাস্ত্রীয় বা ব্যক্তিগত আপ্তবচন এবং যুক্তির মধ্যে আপাতবিরোধের সমস্যাটি প্রায় সব সম্প্রদায়ভুক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের কাছেই কোন না কোন সময়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবে এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পর্যায়েরই কথা। কার্যত আস্তিক ব্রাহ্মণ্য দার্শনিকগণ বা বুদ্ধ ও মহাবীরের শ্রদ্ধাশীল অনুবর্তিগণ দার্শনিক বিচার প্রসঙ্গে সর্বদা এতটা মুক্ত ও নিরপেক্ষ মনের পরিচয় দিয়ে এসেছেন কিনা সন্দেহ। রামমোহন হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র অতি নিষ্ঠা ও শ্রম সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন একথা সুবিদিত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্রদ্বয়েও তাঁর যে সম্ভবত কিছু প্রবেশ ছিল প্রথম অধ্যায়ে তার দু'একটি সমসাময়িক প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে।[৫] এই সুবিস্তীর্ণ শাস্ত্রজ্ঞানের পাশাপাশি তিনি অধিগত করেছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ। সুতরাং ধর্মের নূতন যুগোপযোগী সংস্কারের প্রশ্নে প্রচলিত ধর্মগুলির শাস্ত্রপ্রামাণ্যে বা আপ্তবচনপ্রামাণ্যে বিশ্বাস ও আধুনিক মনের যুক্তিশীলতা ও বিচারপ্রবণতা—এই দুই আপাত-বিরোধী চিন্তাধারার সামঞ্জস্যবিধানের সমস্যাটি তাঁর সম্মুখে প্রবল ও জটিল রূপেই বর্তমান ছিল। তাঁর জীবনব্যাপী অনুশীলন ও অনন্যসাধারণ ধীশক্তির দ্বারা তিনি এর একটি সমাধানও করেছিলেন যা আধুনিক কালের চিন্তায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি কিছু বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে।

রামমোহন তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন্'-এ পরিপূর্ণ যুক্তিবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থখানি আরবী ভূমিকা সংবলিত ফার্সী রচনা,—প্রকাশিত হয় আনুমানিক ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে। যদি প্রকাশকালের উক্ত অনুমান নির্ভুল হয় তাহলে ধরতে হবে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল লেখকের ৩০-৩২ বৎসর বয়সে—যে সময়ে তাঁর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। শোনা যায় কিশোর বয়সে তিনি প্রচলিত হিন্দু

প্রতিমাপূজার নানা দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করে ফার্সী ভাষায় এক গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু এমন কোনও গ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। 'তুহ্ফাৎ' গ্রন্থে তিনি (ফার্সী বা 'তুহ্ফাত'-এর মত মিশ্র আরবী-ফার্সী ভাষায়) স্বরচিত 'মনাজারাৎ-উল্-আদিয়ান্' ('নানা ধর্মের বিচার') নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন—কিন্তু এখানিও আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। সুতরাং দুর্ভাগ্যবশত তাঁর পূর্ণ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনার জন্য 'তুহ্ফাৎ-উল-মুওহাহিদ্দিন' পুস্তিকাখানিই আমাদের একমাত্র সম্বল।

'তুহ্ফাৎ' গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে রামমোহনের তৎকালীন যে কটি সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায় তা এই: (১) সকল ধর্মেই জগতের কর্তা ও বিধাতা একজন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এই বিশ্বাস বিশ্বজনীন। মানুষ স্বভাবত এক অনাদি অনন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। সুতরাং মানুষের পক্ষে তা স্বাভাবিক। এই জগৎকর্তা পরমেশ্বরে বিশ্বাস কোনও কৃত্রিম উপায়ে কেবল অভ্যাসের বশে মানুষের মনে উৎপন্ন হয় না। মানবমনের স্বাভাবিক গতি ঈশ্বরবিশ্বাস অভিমুখী।

(২) দেহাতিরিক্ত আত্মায় এবং পরলোকে বিশ্বাস সকল ধর্মের ভিত্তি। এই পরলোককে এমন এক স্থানরূপে কল্পনা করা হয় যেখানে মানুষ মৃত্যুর পরে সংসারের অনুষ্ঠিত তার পুণ্য বা পাপকর্মের জন্য পুরস্কার বা দণ্ড লাভ করে। যদিও আত্মা বা পরলোকের অস্তিত্ব মানববুদ্ধির অগম্য এক গুপ্ত রহস্য—তবু এই বিশ্বাসের সামাজিক মূল্য আছে, কারণ পারলৌকিক শাস্তির ভয়ে সাধারণ মানুষ জীবদ্দশায় পাপানুষ্ঠানে বিরত থাকে (As the foundation of religions, is based on the belief in the existence of soul [which is defined to be a substance governing body] and on the existence of the next world which is held to be the place of receiving compensation for the good and evil deeds done in this world after the separation of the soul from the body; they [mankind] are to be excused in admitting and teaching the doctrine of existence of the soul and the next world although the real existence of soul and the next world is hidden and mysteroius, for the sake of welfare of the

people [society] as they simply, for the fear of punishment in the next world······refrain from commission of illegal deeds.) ।[*]

(৩) বিশেষ বিশেষ দেবতা, মহাপুরুষ, আচার, অনুষ্ঠান, শাস্ত্র বা উপাসনা-প্রণালীতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়; এ সব তার পরিবেশ, শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল। এক্ষেত্রে সম্প্রদায়ভেদে বা দেশ-কাল-অঞ্চল ভেদে ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক প্রভেদ দেখা যায় (Yet it is clear that everyone in imitation of the individuals of the nation among whom he has been brought up, profess the existence of a particular Divinity [with particular attributes ascribed to him] and adopts certain tenets following that particular creed. For instance some of them believe in a God qualified with human attributes as anger, mercy, hatred and love; and others believe in a Being comprehending and extending all over nature; a few are inclined to atheism or thinking the *Dahr* (time) or *nature* as the creative principle of the Universe, and some of them give Divine attributes to large created beings and make them objects of worship.) ।[*] এই প্রসঙ্গে রামমোহন মানুষের স্বভাবগত ও অভ্যাসগত বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করেছেন: (These persons do not make any distinction between the beliefs which are the results of a special training and habit and an absolute belief in the Source of Creation which is an indispensable characteristic in mankind.···Had there been any real effect of these imaginary things it must have been common to all nations of different persuasions and should not have been confined to one particular nation's beliefs and habits. For although the degree of the strength of effect varies according to the different capacities of persons subject to it, yet it is

not dependent upon the belief of a certain believer)।[৮]
উল্লেখ্য যে তিনি নিরীশ্বরবাদকেও মানুষের অভ্যাসগত বিশ্বাসের (habit) অন্তর্ভুক্ত করেছেন—স্বভাবগত বৃত্তির (nature) নয়।

(৪) ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস—মানুষের স্বভাবগত সার্বভৌম এই বৃত্তিদ্বয়কে বাদ দিলে মানুষের অভ্যাসগত সংস্কার ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর মতভেদ ও পার্থক্য দেখা যায়। পরস্পরের মত খণ্ডনে এরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সক্রিয়। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে—এই সব ধর্মগুলিই কি সত্য? অথবা সব ধর্ম মিথ্যা? সর্ব ধর্ম সত্য—এ কথা স্বীকার্য নয়, কেননা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে বিপরীত মত পোষণ করেন এবং এক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিধি অপর ধর্মে নিষিদ্ধ। এই পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাসমূহের সব কটি এক সঙ্গে বা এককালে সত্য হতে পারে না। আবার কোনও এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক মত সত্য ও অবশিষ্ট সকল ধর্ম মিথ্যা—এমন কথাও স্বীকার করা যায় না। ঈশ্বরের স্বরূপ, পরকাল, মুক্তি ও ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান বিষয়ক কোনও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রচলিত বিশ্বাসগুলির পক্ষে এমন কোনও অমোঘ যুক্তি নেই যা প্রমাণিত করতে সক্ষম যে এই বিশেষ ধর্মটিই সত্য এবং অন্য সব ধর্ম মিথ্যা। এই অভ্যাসগত সংস্কার ও বিশ্বাস সর্বমানবের পক্ষে স্বাভাবিকও নয় বা সর্বমানবের জ্ঞানের বিষয়ও নয়। সুতরাং যাঁরা বলেন—তাঁদের ধর্মই একমাত্র সত্য, অন্য সব ধর্ম মিথ্যা—তাঁরা অযৌক্তিক কথা বলেন। যখন সব ধর্ম সত্য একথা স্বীকার করা যাচ্ছে না, কোনও বিশেষ ধর্ম সত্য—তাও যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না—তখন সিদ্ধান্ত করতেই হয়, সব ধর্মই মিথ্যা। তা না বলে যদি বলা যায় কোনও কোনও ধর্ম মিথ্যা এবং কোনও কোনওটি সত্য—তাহলে সে যুক্তি আরবী তর্কশাস্ত্র অনুসারে 'তর্জিবিলা মুরাজ্জে' বা 'অহেতুক অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব' দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে।

(৫) ধর্মপ্রবক্তা ও ধর্মগুরুগণের উপর বিশ্বাসস্থাপন করা অযৌক্তিক ও নিরর্থক। ঈশ্বরই এ বিশ্বের সব কিছুর আদি কারণ। অবশ্যই তিনি ছাড়া কিছু গৌণ ও পরবর্তী কারণ আছে যার উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। উক্ত ধর্মনায়কগণের তথাকথিত প্রাপ্ত ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ সাক্ষাৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট নতুবা কোনও গৌণ মধ্যবর্তী কারণসঞ্জাত। যদি এই প্রত্যাদেশ সাক্ষাৎ ঈশ্বর-

প্রেরিত হয় তাহলে তার জন্য কোনও মধ্যবর্তী প্রবক্তা বা গুরুর প্রয়োজন নেই ; কেন না যা সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত তাতে সর্বমানবের সমান অধিকার ; আর যদি মধ্যবর্তিত্ব স্বীকার করতে হয়—তাহলে একজন মধ্যবর্তীর পরিবর্তে একটি মধ্যবর্তী-পরম্পরা মানতে হয় যার কোনও শেষ নেই। কিন্তু দেখা যায় প্রচলিত শাস্ত্রগুলি তা করেন নি—অবতার বা প্রবক্তাদের ধারাকে ইতিহাসের কোনও এক মুহূর্তে এনে ছেদ টেনে দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন এর পরে আর অবতার বা প্রবক্তা জন্মাবেন না। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জাতীয় বহু পরস্পর-বিরোধী পরম্পরা স্বীকৃত হয়েছে। অভ্যাস ও সংস্কারগত বিশ্বাসের ক্রিয়াই এখানে লক্ষণীয়—এ বিশ্বাসের স্বাভাবিক বিশ্বজনীনতা নেই। তাই রামমোহনের সিদ্ধান্ত : "Hence advent of prophets and revelation like other things in nature depend upon external causes without reference to God i. e. they depend upon the invention of an inventor. Prophets etc. are not particularly missioned for instructions of invented creeds. Besides what a nation calls a guide of true faith, another calls it a (guide) misleading to an erroneous way"।[*] রামমোহনের যুক্তির সমর্থনে বলা যায়, নানা শাস্ত্রেই এই প্রেরিত-পরম্পরা বা apostolic succession-এর দৃষ্টান্ত আছে। পঁচিশজন বুদ্ধ-পরম্পরা, চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্কর-পরম্পরা ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় প্রবক্তা ও প্রেরিত পরম্পরা প্রভৃতির নিদর্শন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কুরাণে হজরৎ মহম্মদকে বলা হয়েছে নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শেষ। ইসলাম ধর্মে ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় প্রাক্তন ধর্মাচার্যগণকেও পরম্পরাভুক্ত করে সম্মানিত স্থান দেওয়া হয়েছে।

(৬) অলৌকিক (miracle), অতিপ্রাকৃত (supernatural), ঐতিহ্যগত অর্থহীন সংস্কার প্রভৃতিতে বিশ্বাস সর্বথা বর্জনীয়। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে রামমোহন অনেকগুলি তীক্ষ্ণ যুক্তি দিয়েছেন ; সংক্ষেপে সেগুলির মর্মোদ্ধার করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধর্মগুরু ও ধর্মপ্রবক্তা নিজেরা জনসাধারণের নিকট সম্মান ও গৌরব অর্জন করবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি অযৌক্তিক মত ব্যক্ত করেন এবং অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক ক্রিয়াকারিত্বের দাবী করে সেই মতসমূহের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। এই ভাবে সাধারণ মানুষকে পরিত্রাণের লোভ দেখিয়ে তাঁরা শিষ্য করেন। এঁদের অলৌকিক শক্তির

মোহ সাধারণ মানুষের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি নষ্ট করে এবং তারা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও বদ্ধ আচারনিষ্ঠতার পথে অন্ধের ন্যায় এদের অনুসরণ করে। অলৌকিকত্বের দাবী ও লোকমুখে প্রচারিত এই ধর্মগুরুগণসংক্রান্ত অসম্ভব কাহিনীসমূহ মানুষের অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসেরই পুষ্টিসাধন করে। লোকের ধর্মবুদ্ধি এই অনিষ্টকর প্রভাবের ফলে এতই বিকারগ্রস্ত হয় যে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে মিথ্যাকথন, চৌর্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যভিচার পর্যন্ত পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান রূপে গণ্য হয়—যেগুলি জনসমাজের পক্ষে অনিষ্টকর ও পরলোকে দুর্গতির কারণ। এই মোহ মানবমনকে এমনই আচ্ছন্ন করে যে যদি কারও চিত্তে কখনও স্বাধীন ভাবে সত্যনির্ণয়ের প্রবৃত্তি জাগে—সকলে, এমন কি সে ব্যক্তি নিজেও, সে ইচ্ছাকে পাপবুদ্ধি বলে নির্দেশ করে থাকে।

(৭) প্রত্যাদিষ্ট বা আপ্তশাস্ত্রের বাক্য বিশ্বাসের অযোগ্য, কেন না বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে পরস্পর-বিরোধী উক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রে যে সব বিধি আছে তা অন্ধভাবে অনুসরণ করবার ফলে হিন্দুজাতির দুর্দশা ও অধঃপতন ঘটেছে। অপরপক্ষে মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে বিধর্মীদের প্রতি অত্যাচার এমনকি তাদের হত্যা করবার নির্দেশ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। একদল তাঁদের ধর্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে বলেন, তাঁদের ধর্মপ্রবক্তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবক্তাগণের আবির্ভাবকালের সমাপ্তি ; আবার অন্য সম্প্রদায়ের মতে ঐশী বিধান এই যে, দায়ূদের বংশ যতদিন থাকবে—প্রবক্তা-পরম্পরাও ততদিন চলবে। অন্যান্য সম্প্রদায় এই পরম্পরাকে প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন, যেমন ভারতবর্ষে নানকের সম্প্রদায় ; তাঁদেরও অভ্রান্ত শাস্ত্র আছে। এই স্ববিরোধগুলি অতি নিপুণভাবে দেখিয়ে রামমোহন বলছেন : "Now, are these contradictory precepts or orders consistent with the wisdom and mercy of the great, generous and disinterested Creator or are these the fabrications of the followers of religion? I think a sound mind will not hesitate to prefer the latter alternative"।[১০]

(৮) স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান। এরই প্রয়োগ করে এবং প্রত্যাদেশবাদ বর্জন করে, অন্ধভাবে কোনও শাস্ত্রবিধানের উপর আস্থা না রেখে সদসৎ বিচারপূর্বক—জাতিধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে, সর্বমানবকে প্রীতিপাশে বদ্ধ

করে—উদার ও গভীর আধ্যাত্মিক জীবন গঠনই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত।
স্বাধীন বিচারবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এখানে রামমোহনের সিদ্ধান্ত অতি স্পষ্ট: "Besides the fact of God's endowing each individual of mankind with intellectual faculties and senses, implies that he should not, like other animals, follow the examples of his fellow-brethren of his race, but should exercise his own intellectual power with the help of acquired knowledge, to discern good from bad, so that this valuable divine gift should not be left useless"।[১১] প্রচলিত প্রত্যাদেশবাদ সম্পর্কেও তিনি দ্বিধাহীনভাবেই কঠোর: Those who prefer the so-called invented revelation of mankind to the natural inspiration from God, which consists in attending to social life with their own fellow species, and having an intuitive faculty of discriminating good from evil, instead of gaining union of hearts with mutual love and affection of all their fellow-creatures without difference in shape and colour or creeds and religions which is a pure devotion acceptable to God and nature, consider some especial alterations and bodily motions to be the cause of Salvation and receiving bounty from Almighty God।[১২]

'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌ মুওহাহিদিন্‌'এর অন্তর্ভুক্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলির আনুপূর্বিক আলোচনা করলে দেখা যায় রামমোহন এখানে অবতারবাদ, মধ্যবর্তিবাদ, গুরুবাদ, গুরুপরম্পরাবাদ, অভ্রান্তশাস্ত্রবাদ, প্রত্যাদেশবাদ, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, অন্ধ সংস্কার, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসের সবগুলি লক্ষণকেই বর্জন করেছেন। তাঁর মতে সার্বভৌম ধর্মের পক্ষে দুটি বিশ্বাস অপরিহার্য ও বাঞ্ছনীয়—জগতের স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা, অক্ষয়, অনন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং আত্মা ও পরলোকে বিশ্বাস। আত্মা ও পরলোককে তিনি তত্ত্ব হিসাবে কতকটা অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কোঠায় ফেলেছেন। এ বিশ্বাসের স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি—এটি মানবমনের

স্বাভাবিক বৃত্তি এবং সামাজিক শুচিতা ও সংহতি রক্ষার বিশেষ উপযোগী। এ বিশ্বাসের তাত্ত্বিক মূল্য অপেক্ষা সামাজিক মূল্যের উপরই তিনি বেশী জোর দিয়েছেন। শোনা যায় উত্তরকালে তিনি বলতেন মাতৃগর্ভস্থ শিশু বহির্জগৎ সম্পর্কে যেটুকু জানে—পরলোক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানও তদ্রূপ।[১৩] এই দুটি প্রত্যয় যে কেবল সর্বমানবের পক্ষে স্বাভাবিক তাই নয়—মানবসমাজের কল্যাণ, শৃঙ্খলা ও সংহতি এর উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু তিনি এই গ্রন্থে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, বা reason এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি।

'তুহ্ফাৎ' পুস্তিকাখানি সম্পর্কে রামমোহনের জীবনীকার ও মতব্যাখ্যাতাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। শ্রীমতী কলেট এই গ্রন্থে প্রতিভাত লেখকের আন্তরিকতা ও যুক্তিনৈপুণ্যের প্রশংসা করলেও সমগ্রভাবে এটিকে বলেছেন শৃঙ্খলাহীন ও অপরিণত: "Its arrangement is however quite unsystematic and the whole is merely a series of descriptive sketches; but these show much acuteness of observation and reasoning...The treaties is important as the earliest available expression of his mind and as showing his eagerness to bear witness against error but it is too immature......।"[১৪] অন্যান্য যাঁরা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন, তাঁরা কিন্তু রামমোহনের শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থকে এতটা তাচ্ছিল্য করেন নি; বরং এর বিশেষ তাৎপর্য স্বীকার করেছেন।[১৫] এঁদের প্রায় সকলের মতেই 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্' এ প্রকাশিত রামমোহনের যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি যথেষ্ট সুপরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল ও পরিণত; শাস্ত্রসম্পর্কে তাঁর উত্তর জীবনের অনুশীলন ও অভিজ্ঞতাজাত মতবাদের মধ্যেও 'তুহ্ফাৎ' পর্বের চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী।

'তুহ্ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্' গ্রন্থের লেখক হিসাবে রামমোহনের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রে, বিশেষত আরবী তর্কবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ অধিকার। আপন বক্তব্যের সমর্থনে এখানে তিনি যে সব যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করেছেন তার সবগুলিই ইসলামীয় শাস্ত্র থেকে সংগৃহীত। বইখানি আদ্যোপান্ত পড়লে সন্দেহ থাকে না, ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ এর প্রতিপাদ্য এবং তার উৎস হল ইসলামীয় ধর্মসাহিত্যের ইতিহাসে

কালক্রমে উদ্ভাবিত 'ইলম্-উল্-কালাম্' (বা scholastic theology) ও কিছু পরিমাণে উত্তরকালীন সূফী মতবাদ। এই 'ইলম্-উল্-কালাম্' এ যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা ইসলামের ইতিহাসে 'মুতকল্লিম্' নামে পরিচিত। প্রথমে যুক্তিবাদী 'মুতাজিলা' সম্প্রদায়ই 'মুতকল্লিম্' আখ্যা লাভ করেছিলেন। ইসলামের কট্টর শাস্ত্রপন্থিগণের সঙ্গে কুরাণ-শরীফ্ সম্পর্কে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য ছিল। রক্ষণশীল শরীয়ৎ-বিশ্বাসীরা মনে করতেন কুরাণ নিত্য, ঈশ্বরের অব্যক্ত বাণীর সমষ্টি—এক দিব্য আকররূপে তা সপ্তম স্বর্গে নিত্য বিরাজমান। এই অনাদি উৎস থেকে জিব্রাইল কুরাণের বাণী মহম্মদের অন্তরে প্রেরণ করেছেন। মুসলমান সম্প্রদায় যে কুরাণ অভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থরূপে অধ্যয়ন করেন তা কোনও সৃষ্ট বস্তু নয়, উক্ত নিত্য কুরাণেরই বাণীরূপ। এই মতের সমালোচনায় মুতাজিলা সম্প্রদায় বলতেন, কুরাণশরীফ অনাদি ও নিত্য হতে পারে না, এই গ্রন্থ ঈশ্বরের বাণী হলেও তা সৃষ্ট বস্তু (খাল্ক)। একে যদি অনাদি ও নিত্য বলা যায় তাহলে অনাদি, অনন্ত, নিত্য পরমেশ্বরের অতিরিক্ত আর একটি অনাদি ও নিত্য বস্তু স্বীকার করতে হয় এবং তার দ্বারা ইসলামের মূল তত্ত্ব একেশ্বরবাদই খণ্ডিত হয়। মুতাজিলাপন্থিগণ ঈশ্বরের গুণ স্বীকার করেন নি, মৃত্যুর পর শারীরিক কিয়ামতে বা স্বর্গে ঈশ্বরের চাক্ষুষ দর্শনলাভের সম্ভাব্যতায় এঁদের বিশ্বাস ছিল না। তা ছাড়া এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আরও কিছু মৌলিকতা ছিল: মানুষের পাপ-পুণ্য, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের দায়িত্ব মানুষের নিজের, এই তত্ত্ব স্বীকার করে এঁরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ক্রিয়াশীলতাকে কিছুদূর পর্যন্ত মেনেছেন। উত্তরকালীন মরমীয়া সূফীগণের মত এঁরা গুহ্য তত্ত্বে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। শিয়া সম্প্রদায়ের গুরুবাদকে এঁরা প্রকাশ্যে আক্রমণ করেছেন। প্রচলিত প্রত্যাদেশবাদের ধারণায় এবং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপেও এঁদের আস্থা ছিল না।[১৬] এই যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের মতবাদ তাই স্বভাবত রামমোহনকে আকর্ষণ করেছিল। দশম-একাদশ খ্রীষ্টাব্দের আরব কবি ও দার্শনিক আবুল-আলাল মাআরির চিন্তার সঙ্গে 'তুহ্‌ফাৎ' এ ব্যক্ত রামমোহনের চিন্তার সাদৃশ্যের প্রতিও কেউ কেউ ইঙ্গিত করেছেন।[১৭] আল-মাআরিও রামমোহনের মত প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মকে মানুষের অভ্যাস, পরিবেশ ও শিক্ষাজাত সংস্কারের ফল বলেই গণ্য করেছেন এবং ধর্মপ্রবক্তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রভাববৃদ্ধি ও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাল্পনিক

ধর্মমত প্রচারের অভিযোগ এনেছেন। এই প্রসঙ্গে ইব্‌ন আরবি ব্যাখ্যাত ইসলামীয় দর্শনের 'আল্-নূর' বা দিব্যজ্যোতির ধারণার সঙ্গে রামমোহন কর্তৃক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে ঈশ্বরের দানরূপে স্বীকারের ধারণার সাদৃশ্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১৮] ইব্‌ন আরবি বলেন, মানবজ্ঞানকে আমূল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মানুষের যে বোধশক্তি সেটি জ্যোতি ছাড়া আর কিছু নয় (আল্-নূর্) (Man's power to apprehend—the power that they usually describe as spirit he defines as light, *al-nūr*. In man this light takes the form of the rational soul, which in turn, is a mode of Universal Reason *al-aqual al Kulli* the Aristotelian Agent Intellect or Neo-Platonic Logos······Both mental faculties and sensory perceptions owe their rational character to that Light, the seat of which Ibn Arabi identifies with a non-physical centre which he calls the heart or sometimes, the inward eye, *al-ayan al basirah.* Everything that enables us to apprehend life, in fact our very awareness of living is this light)।[১৯] রামমোহনের উপর এই সিদ্ধান্তের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। 'তুহ্‌ফাৎ'-এ রামমোহনের বুদ্ধিবৃত্তির বিশ্লেষণ অবশ্য এত পুঙ্খানুপুঙ্খ নয়। কিন্তু অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য, প্রত্যাদেশবাদ, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি যে ভাবে মানুষের সার্বভৌম স্বাধীন বিচারবুদ্ধি (intellectual faculties and senses) ও স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি (intuitive faculty)কে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান বলে গণ্য করেছেন তা ইবন আরবির কথা মনে করিয়ে দেয়। সূফী মরমীদের মধ্যে রুমী, সাদি, হাফিজ প্রমুখ কবিগণ রামমোহনের প্রিয় ছিলেন। এঁরা শাস্ত্রীয় সংকীর্ণতা থেকে বহুলাংশে মুক্ত ছিলেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগে এবং ঈশ্বর ও জীবজগতের ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই রামমোহনের চিত্তকে আকর্ষণ করেছিলেন।

ইস্‌লামীয় ধর্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসত্ত্বেও 'তুহ্‌ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্' ছাড়া রামমোহন উক্ত শাস্ত্রের আলোচনামূলক আর কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন কিনা জানা যায় না। সে রকম কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়নি। 'মনাজারাৎ-

উল্‌-আদিয়ান' বা 'নানা ধর্মের বিচার' শীর্ষক একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন এমন উল্লেখ 'তুহ্‌ফাৎ'-এ আছে। এখানি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। জরথুষ্ট্রীয় সম্প্রদায় কৃত 'তুহ্‌ফাৎ'-এর সমালোচনার প্রত্যুত্তর-স্বরূপ 'জওআব-ই-তুহ্‌ফাৎ উল্‌-মুওহাহিদিন্‌' নামে যে পুস্তিকাটি সম্ভবত ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল সেটি বর্তমান লেখক ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম তার বঙ্গানুবাদ করেছেন (পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)। অনুমান করবার কারণ আছে, এ গ্রন্থ রামমোহনের রচিত নয়, তাঁর অন্তরঙ্গ কোন (সম্ভবত মুসলমান) বন্ধুর রচিত। সুতরাং এর সাক্ষ্য আমাদের বর্তমান আলোচনায় কাজে লাগবে না। কলিকাতা বাসকালে রামমোহন হজরৎ মহম্মদের এক জীবনী লিখবার সংকল্প করেছিলেন; দুর্ভাগ্যবশত এই সংকল্প কাজে পরিণত কবতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে বন্ধু এ্যাডামকে তিনি বলেছিলেন, মহম্মদের গোঁড়া ভক্ত ও বিরুদ্ধবাদী শত্রু ও সমালোচকগণ—কেউই এই মহাপুরুষের প্রতি সুবিচার করেন নি। মহম্মদের প্রকৃত মাহাত্ম্য সম্পর্কে জগৎবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল এই জীবনীরচনার উদ্দেশ্য।[১৯ক] যদি গ্রন্থটি তিনি লিখে যেতে পারতেন আমরা তাঁর প্রজ্ঞার আলোকদীপ্ত, ইসলামীয় আকরের ভিত্তিতে রচিত মহম্মদের জীবনী ও উপদেশ সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ লাভ করতাম এবং ইসলামীয় শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর পরিণত মতামতের পরিচয়ও সে গ্রন্থে অবশ্যই পাওয়া যেত। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের নিরাশ হতে হয়। পরবর্তী রচনার মধ্যে তাঁর খ্রীষ্টীয় বিতর্কের স্থানে স্থানে রামমোহনকে মুসলমান শাস্ত্রের সাক্ষ্য ব্যবহার করতে দেখা যায় যেমন—Second Appeal to the Christian Public -এর তৃতীয় অধ্যায়ের উপসংহারে। কিন্তু এই পর্বে তিনি তাঁর পূর্বের কট্টর যুক্তিবাদকে কতকটা নমনীয় করে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন এবং যুক্তির পরিপূরক হিসাবে প্রত্যাদেশকেও গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এই পর্বে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের মত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তিনি ইসলামীয় শাস্ত্রকেও প্রত্যাদিষ্ট বলে স্বীকার করতেন। তাছাড়া এই বিচারগ্রন্থগুলিতে প্রায় সর্বত্র প্রত্যাদিষ্ট ইহুদী ধর্মশাস্ত্র বা Jewish Revelationকেও যে খ্রীষ্টীয় প্রত্যাদেশ বা Chirstian Revelation-এর সঙ্গে সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাও লক্ষণীয়। শাস্ত্র সম্পর্কে রামমোহনের এই সংশোধিত দৃষ্টি যথাস্থানে আলোচ্য।

রামমোহনের উপর ইসলামীয় চিন্তার এই বিশিষ্ট ধারাগুলির প্রভাব স্বীকার করে নেবার পরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। ইসলামীয় জগতের যে সব সম্প্রদায় বা মনীষীর সঙ্গে রামমোহনের চিন্তার সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের কেউই কুরাণশরীফের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন নি—এমন কি যে মুতাজিলা সম্প্রদায় কুরাণের নিত্যতা মানতেন না,—তাঁরাও নয়। সুফী মরমীদের মধ্যে শরীয়তী বিধিনিষেধ পালনে তেমন উৎসাহ দেখা যেতনা এবং তাঁদের সাধনপ্রণালীর মধ্যে এমন অনেক উপাদান কালক্রমে প্রবেশ করেছিল যা হয় তো ইসলামের মূল তত্ত্বের অঙ্গ নয়।[২০] কিন্তু অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদের বিরুদ্ধে সজ্ঞানে সুপরিকল্পিতভাবে বিদ্রোহ করবার আগ্রহ তাঁরা দেখান নি। বরং তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ও সাধক মূল ইসলামের সঙ্গে সুফীমতবাদের সামঞ্জস্যবিধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুবিখ্যাত মনীষী আল্‌-গজ্জালি (১০৫৮-১১১১)-র যত্নে শেষ পর্যন্ত শরীয়তের সঙ্গে সুফী মতবাদ সমন্বিত হয়।[২১] 'তুহ্‌ফাৎ'এ প্রতিফলিত যুক্তিবাদ কিন্তু সম্পূর্ণ শাস্ত্রনিরপেক্ষ। এর প্রেরণা সেক্ষেত্রে রামমোহন পেলেন কোথা থেকে?

এ পর্যন্ত সকলেই অনুমান করেছেন, 'তুহ্‌ফাৎ'-এর রচনাকাল ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দ। প্রচলিত ধারণা,—সে সময়ে রামমোহন যদিও ইংরেজি শিখেছেন, তবু তাঁর ইংরেজি জ্ঞান তখন পর্যন্ত এতদূর অগ্রসর হয়নি যার সাহায্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞানদর্শনে তিনি পূর্ণ অধিকার অর্জন করতে পারেন। কিন্তু যে শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত তিনি 'তুহ্‌ফাৎ'এ প্রকাশ করেছেন তার যুক্তিবাদের অংশ ইসলাম-প্রভাবিত হলেও শাস্ত্রনিরপেক্ষতার প্রশ্নে তা আমাদের ইউরোপীয় যুক্তিবাদী চিন্তাধারার ঐতিহ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা পরিপুষ্ট হয় যথাক্রমে বেকন ও লক্‌; কলিন্‌স, টিণ্ডাল, টোলাণ্ড্‌, মরগ্যান, শ্যাফ্‌টস্‌বেরী প্রভৃতি যুক্তিমূলক একেশ্বরবাদের পরিপোষক (Deist)গণ; ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাদস্থ দার্শনিক প্রেরণার উৎস ভোলতেয়ার্‌, দিদেরো, হেলভেসিয়াস, দ্য'লেম্‌ব্যের, রুষো, ভোলনি প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দ; এবং টমাস পেইন্‌ ও ডেভিড্‌ হিউমের হাতে। এঁদের অনেকের দ্বারা রামমোহনের চিত্ত যে প্রভাবিত হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বেকন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চিন্তার জন্য এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন (novum organum বা new organ) এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে

জনশ্রুতি, কুসংস্কার ও আপ্তবাক্যের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে কি ভাবে সত্য নির্ণয় করতে হবে—তার পথনির্দেশ করেন। লক্ এই প্রণালীর আরও উন্নতি সাধন করে তাকে দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। তাঁর মতে সত্য নির্ণয়ের পূর্বে জানা আবশ্যক সত্য কি? জ্ঞান কি? জ্ঞেয়ই বা কি? মানুষের কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে জানবার শক্তি একেবারেই নেই? এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের উপর আমাদের জ্ঞানের সত্যতা নির্ভর করছে। কিন্তু বেকন ও লক্ অভ্রান্ত শাস্ত্রকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি। তাঁদের মতে, যে সব তত্ত্ব এই জগৎকৌশল দেখেও জানা যায় না—যা আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার বহির্ভূত—সেইগুলিই আমরা শাস্ত্রবিশ্বাসের মাধ্যমে জানতে পারি; কিন্তু এই বিশ্বাসলব্ধ তত্ত্ব স্বাভাবিক জ্ঞানাতিরিক্ত হলেও, স্বাভাবিক জ্ঞানের বিরোধী নয়। লক্ তাঁর এক গ্রন্থে যুক্তি ও বিশ্বাসের এই পরস্পর-নির্ভরতা সম্পর্কে বলেছেন: "...I think it may not be amiss to take notice that however faith be opposed to reason, faith is nothing but a firm assent of the mind; which if it be regulated, as is our duty, cannot be afforded to anything but upon good reason and so cannot be opposed to it"।[২২] কিন্তু ইংরেজ ডীয়িস্টগণের সিদ্ধান্তে শাস্ত্রবিশ্বাসের এই সীমিত স্থানটুকুও ছিল না। ঈশ্বর ও পরলোক সংক্রান্ত প্রত্যয়গুলিকে অগ্রাহ্য না করলেও তাঁরা কোনও শাস্ত্রেরই অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁদের প্রধান যুক্তি দু'টি: (১) কোন বিশেষ শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করলে ঈশ্বরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ করতে হয়, কেননা বিভিন্ন দেশে ও কালে নানা গ্রন্থই শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করেছে; (২) শাস্ত্রবিশ্বাস অনৈসর্গিক ক্রিয়ায় বিশ্বাসেরই নামান্তর। অনৈসর্গিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস অযৌক্তিক, কেন না তা মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও নৈতিক প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। প্রাগুক্ত ফরাসী চিন্তানায়কগণের মধ্যে ভোলতেয়ার্, রুশো ও ভোলনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, বাকীরা প্রায় সকলেই হয় জড়বাদী নাস্তিক না হয় সংশয়বাদী। এঁদের আক্রমণ ও সমালোচনার লক্ষ্য ছিল—সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্মব্যবস্থায় পুঞ্জীভূত সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ, নিপীড়ন, অসাম্য ও কুসংস্কার; এবং আরাধ্য ছিল জ্ঞান ও স্বাধীনতা। এঁদের মধ্যে যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী তাঁদের মতে ধর্মশাস্ত্রে কিছু সত্য থাকলেও তার সঙ্গে বহু

নীতিবিরুদ্ধ কথা, অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাহিনী এবং কুসংস্কারের সমাবেশ ঘটেছে। সমসাময়িক ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড্ হিউম ছিলেন পরিপূর্ণ সংশয়বাদী; তিনি স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা ধর্মের উৎপত্তি ও ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন ও সত্যনির্ণয়ের পথে কার্যকারণসম্বন্ধমূলক যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করেন। অলৌকিক ক্রিয়া (miracle) বা অভ্রান্ত শাস্ত্রে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। অলৌকিক ক্রিয়া বা miracle সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধে তিনি বলেছেন, "A miracle is a violation of the laws of nature; and as a firm and unalterable experience has established these laws, the proof against a miracle, from the very nature of the fact, is as entire as any argument from experience can possibly be imagined."।[২৩] উক্ত প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে তিনি অলৌকিক ক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিগুলিকে আরও বিস্তারিত করেছেন এবং শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে যুক্তিদ্বারা খ্রীষ্টধর্মকে কিছুতেই সমর্থন করা চলে না যে হেতু খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি হল অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাসের উপর (I am the better pleased with the method of reasoning here delivered, as I think it may serve to confound those dangerous friends or disguised enemies of the *Christian Religion* who have undertaken to defend it by the principles of human reason. Our most holy religion is founded on *Faith*, not on reason;··· the *Christian Religion* not only was at first attended with miracles but even at this day cannot be believed by any reasonable person without one.)।[২৪] অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের জ্ঞানবিভাসিত্ যুগের (Age of Enlightenment) দার্শনিকগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁরা শাস্ত্রবিশ্বাস ও অলৌকিক ক্রিয়াদির ধারণা বিবর্জিত এক ধর্মের পরিকল্পনা করেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল natural religion বা নৈসর্গিক ধর্ম। সংশয়বাদী হিউমও তাঁর Dialogues Concerning Natural Religion গ্রন্থে ধর্মের উৎপত্তির মূলস্বরূপ কল্পিত সকল অনৈসর্গিক তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেছেন। সুতরাং রামমোহনের অনতিপূর্বে পাশ্চাত্য চিন্তায় নৈসর্গিক ধর্ম সম্পর্কে দুটি বিশিষ্ট

দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যাচ্ছে—(১) ধর্মবিশ্বাসী (২) সংশয়বাদী। 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওহ্‌হিদিন্' গ্রন্থে রামমোহন এই নৈসর্গিক-ধর্মবাদী রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। তবে 'তুহ্‌ফাৎ' পাঠে এ কথাও স্পষ্ট যে তিনি বিশ্বাসীদেরই দলভুক্ত, ধর্মের মূল সত্য সম্পর্কে সংশয়বাদী নন।

'তুহ্‌ফাৎ'এ রামমোহন শাস্ত্রবিশ্বাস সংক্রান্ত যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত আধুনিক যুগের ইউরোপীয় জ্ঞানরাজ্যের যুক্তিবাদের সঙ্গে তার বিস্ময়কর সাদৃশ্য নিশ্চয় লক্ষ্য করবার মত। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সর্বপ্রথম দেখান, এই গ্রন্থের উপসংহারে তিনি ভোলতেয়ার ও ভোলনির মত অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস সম্পর্কে মানবজাতিকে চার ভাগ করেছেন: (১) যারা প্রতারক,—অর্থাৎ লোক-সংগ্রহের জন্য ইচ্ছাপূর্বক অলৌকিক কাহিনী সৃষ্টি করে মানুষকে প্রতারণা করে; (২) যারা প্রতারিত—অর্থাৎ নির্বিচারে ঐ সব ব্যক্তিদের রচিত উদ্দেশ্যমূলক আজগুবি কাহিনীতে বিশ্বাস করে ঠকে; (৩) যারা একযোগে প্রতারক এবং প্রতারিত— অর্থাৎ যারা নিজেরা অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করে এবং অন্যদেরও তা বিশ্বাস করতে প্রণোদিত করে; (৪) যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদে প্রতারণাও করেনা প্রতারিতও হয় না।[২৭] কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে 'তুহ্‌ফাৎ' প্রকাশের কালে রামমোহনের ইংরেজি শিক্ষা ও ইউ-রোপীয় বিদ্যায় প্রবেশ বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ এই গ্রন্থের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল—এমন সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া একটু কঠিন। সযত্নে অর্জিত ইসলামীয় বিদ্যার ছাপ 'তুহ্‌ফাৎ'-এর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে এবং সমগ্র রচনাভঙ্গীতে অতি স্পষ্ট। এই প্রখর যুক্তিবাদের উৎস তাই ইসলামীয় আকরেই অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু ইসলামীয় সূত্রের এই যুক্তিবাদ শাস্ত্রনিরপেক্ষ ছিল না—শাস্ত্রের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যাই তার বৈশিষ্ট্য। 'তুহ্‌ফাৎ'-এ রামমোহন দাঁড়িয়েছেন সম্পূর্ণ মুক্ত মনের স্বাধীন বিচার বুদ্ধির উপর। শাস্ত্রপ্রমাণকে এখানে তিনি সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছেন। 'তুহ্‌ফাৎ'-এর ধর্ম সন্‌তারিখের হিসাবে পাশ্চাত্য ডীইস্ট বা নৈসর্গিক ধর্মবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব হলেও তাঁদের মতবাদের যে সমগোত্রীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই একথা মেনে না নিয়ে উপায় থাকে না যে রামমোহন এখানে মুখ্যত যুক্তিবাদী ইসলামীয় দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁর যুক্তিবাদ আরও অগ্রসর হয়ে যে সম্পূর্ণ শাস্ত্রনিরপেক্ষতার স্তরে পৌঁছেছিল, সে সিদ্ধান্ত

ইসলামীয় দর্শন মার্জিত তাঁর মনীষার তৎকালীন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। 'তুহ্ফাৎ' প্রকাশের পরবর্তীকালে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর অধিকার ক্রমশ গভীর হলে তার দ্বারা এই মনোভাব নিশ্চয় আরও সমৃদ্ধ ও শাণিত হয়েছিল।

জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে রক্ষণশীল হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বিচার প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থগুলিতে শাস্ত্রের প্রতি রামমোহনের যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত—তা 'তুহ্ফাৎ' পর্বের অকৃত্রিম যুক্তিবাদ থেকে আপাতদৃষ্টিতে কিছু পৃথক। দেখা যায় উভয়ত্র তিনি যথাক্রমে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করে নিয়েই বিচারে অগ্রসর হয়েছেন। এর থেকে স্বভাবত মনে হতে পারে 'তুহ্ফাৎ'-এ তাঁর যে পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী মানসের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল উত্তর পর্বে তার পরিবর্তন হয়েছে এবং পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে সেই প্রখর যুক্তিবাদ খানিকটা সংশোধন করে তিনি শাস্ত্রপ্রমাণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রাচীন লেখকগণের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং একালে কাজি আবদুল ওয়াদুদ এই সিদ্ধান্ত মানতে চাননি। শেষোক্ত জন বলেন 'তুহ্ফাৎ'-এ যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, শাস্ত্রপ্রামাণ্যের প্রশ্নে সেইটি রামমোহনের প্রকৃত মনোভাব; উত্তরকালের বিচারগ্রন্থগুলিতে শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকৃতির যে নিদর্শন আছে—তা তর্ককৌশলমাত্র—সমসাময়িক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গোঁড়া খ্রীষ্টীয় মিশনারী মহলের অন্ধ শাস্ত্রানুগত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য তাঁকে এই তর্কপ্রণালী উদ্ভাবন করতে হয়েছিল।[২৩] রামমোহনের শাস্ত্রসম্পর্কীয় মতের অগ্রপশ্চাৎ সামঞ্জস্য করা সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন বিচারের পূর্বে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রদ্বয় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্তসার উদ্ধার করা প্রয়োজন। পরবর্তী অধ্যায়ে রামমোহনের বেদান্তচর্চা সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রের প্রামাণ্যের প্রশ্নে তাঁর মতের কিছু বিস্তারিত উল্লেখ করতে হয়েছে। তাই পুনরাবৃত্তির জন্য অগ্রিম মার্জনা চেয়ে এখানে কেবল সূত্রগুলি পরপর সাজিয়ে দেওয়া যাচ্ছে :

১. বেদই সর্বাধিক প্রামাণিক এবং যা বেদবিরোধী তা শাস্ত্ররূপে গণ্য হবার যোগ্য নয়; ২. জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে জ্ঞানই হল শ্রেষ্ঠ, এবং সেই সূত্রে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্‌ভাগ তার কর্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ৩. বেদ ও উপনিষদে যে সব পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্ত দেখা যায় সেগুলি শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকারের পথে কোন বাধা নয়। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সমগ্র বেদ এক অখণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্ত্র। পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্যের একবাক্যতা স্থাপন করেই উক্ত স্ববিরোধ ও

অসঙ্গতিগুলি দূর করতে হবে ; ৪. পুরাণ-তন্ত্রাদি বেদোত্তর কালে রচিত গ্রন্থসমূহও শ্রুতিবিরুদ্ধ না হলে শাস্ত্ররূপেই গণ্য হওয়া উচিত। এগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে এক অংশ উপনিষদের মতই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক। এ সম্পর্কে কোন আপত্তি উঠতে পারে না। অন্যত্র যেখানে সাকার দেবতা ও সাকারোপাসনার বর্ণনা আছে, সেগুলি দুর্বল অধিকারীদের জন্য প্রদত্ত বিধান মাত্র। চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানোদয় হলে এই সব কাল্পনিক উপাসনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এই ভাবে শ্রুতির সঙ্গে একবাক্যতা ও বিষয়বস্তুর একবাক্যতা স্থাপন করে পুরাণ-তন্ত্রকে শাস্ত্ররূপে মান্য করা কর্তব্য ; ৫. শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হলে শ্রুতি সর্বত্র মান্য, প্রমাণ হিসাবে স্মৃতির স্থান শ্রুতির অনেক নিম্নে। স্মৃতিসমূহের মধ্যে মনুস্মৃতির প্রামাণ্য সর্বাধিক ; যে স্মৃতির সাক্ষ্য মনুর বিরোধী সে স্মৃতি প্রমাণ হিসাবে অগ্রাহ্য।

হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন শ্রুতিপ্রমাণ স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রতিপক্ষগণ এক্ষেত্রে সকলেই সনাতনপন্থী ছিলেন এবং শ্রুতি তাঁদের কাছে অবশ্যমান্য ছিল। স্বতন্ত্রভাবে তাঁরা এই প্রমাণপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন নি। সেই কারণেই রামমোহনকেও প্রমাণরূপে শ্রুতি কি হিসাবে কতদূর গ্রাহ্য সে প্রশ্নটিকে বিচারের বিষয় করতে হয়নি, যদিও শ্রুতিপ্রমাণের দোহাই তাঁকে অনেকবারই দিতে হয়েছে। আস্তিক হিন্দুদর্শনের সবকটিতেই বেদপ্রামাণ্য স্বীকৃত, কিন্তু সেগুলির মধ্যেও এই প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য আছে। মীমাংসকগণের মতে বেদ সৃষ্টবস্তু নয়। কোনও পুরুষ বা ঈশ্বর একে সৃষ্টি করেন নি। মীমাংসা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। এই মতে বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য, এর বাক্যসকল শব্দ ও বর্ণের মতই চিরন্তন—অনাদিকাল থেকে সেগুলি বর্তমান এবং অনন্তকাল বর্তমান থাকবে। বেদমন্ত্রের সঙ্গে যে সব ঋষির নাম যুক্ত তাঁরা মন্ত্রগুলির রচয়িতা নন,—এগুলির দ্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা মাত্র। জৈমিনিকৃত মীমাংসাসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৪ থেকে ৩২ সূত্র পর্যন্ত এই বিষয়টির আলোচনা আছে এবং শবরস্বামীর ভাষ্যে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। সায়ণাচার্যের ঋগ্বেদ ভাষ্য-ভূমিকাতেও অনেকাংশে অনুরূপ যুক্তির সাহায্যে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপন করবার প্রয়াস লক্ষিত হয়।[২৬ক] এর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন নৈয়ায়িকগণ। ন্যায় মতে বেদ নিত্য নয়, তা ঈশ্বর বা পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট—তাই

একে পৌরুষেয় বলতে হবে। ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে বেদ সৃষ্টি ক..ছেন, প্রলয়কালে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বেদও ধ্বংস হবে; আবার নবকল্পে নূতন সৃষ্টিকালে নূতন বেদের সৃষ্টি হবে। পূর্বকল্পের বেদের সঙ্গে এই নববেদের মিল নেই, কল্পভেদে শ্রুতিও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং প্রতি কল্পেই বেদবাহিত ঐতিহ্যের ধারাচ্ছেদ ঘটে। প্রতি কল্পারম্ভে ঈশ্বর নূতন করে বেদ সৃষ্টি করেন; ঈশ্বরসৃষ্ট বলেই বেদ মান্য। বৈদান্তিকগণের দৃষ্টিতে এই দুই সিদ্ধান্তের কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নয়। বেদ নিত্য হতে পারে না, কেন না বেদ যে সৃষ্ট বস্তু এমন উক্তি বেদেই পাওয়া যায়। শংকর ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের তৃতীয় সূত্র 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'-এর উপর কৃত নিজভাষ্যে বলেছেন,— যে ঋগ্বেদ প্রভৃতি মহাশাস্ত্র নানা বিদ্যার আকর, সমুদায় জ্ঞানবিজ্ঞানের আশ্রয়, প্রদীপের ন্যায় সর্বাবভাসক—সুতরাং সর্বজ্ঞতুল্য, সেই ঋগ্বেদ প্রভৃতির যোনি বা উদ্ভবস্থান ব্রহ্ম।[২৭] অর্থাৎ বেদ যে ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট বস্তু তা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই অর্থে বেদ নিত্য না হলেও, তা ক্ষণিক নয়, পৌরুষেয়ও নয়। বর্ণসমষ্টি পদসমষ্টি ও বাক্যসমষ্টিরূপ বেদ আকাশাদির মত সৃষ্টিকালে উৎপন্ন এবং প্রলয়কালে বিনষ্ট; সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে কোনও সময়ে তাব আর উৎপত্তি-বিনাশ নেই। সুতরাং তা ক্ষণিক নয়।[২৮] আর পুরুষাধীন বা উৎপন্ন বস্তু বলেই যে তা পৌরুষেয় গণ্য হবে তাও নয়। কেননা কবির কাব্যসৃষ্টি ও ঈশ্বরের বেদসৃষ্টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। কবি যা সৃষ্টি করেন তা তাঁর পূর্বে আর কেউ করেন নি, সে সৃষ্টি সম্পূর্ণ তাঁরই অধীন, সুতরাং তা পৌরুষেয়। কিন্তু প্রতি সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর বেদ সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু সে সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য নেই, তিনি পূর্বকল্পের বেদের সমান আনুপূর্বিক বেদ রচনা করেন। সুতরাং এই সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছাধীন নয়, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরাবর্তন মাত্র।[২৯] এই অর্থে বেদ অপৌরুষেয়। রামমোহন তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দুটি সূত্রস্থলে (১, ১, ৩ এবং ১, ৩, ২৮) শংকরকে অনুসরণ করেছেন। সুতরাং শ্রাতপ্রমাণের প্রশ্নে তাঁর সিদ্ধান্ত বেদান্তভাষ্য প্রকাশকালে, অর্থাৎ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, দাঁড়াল: বেদ ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তু এবং বেদ নিত্য না হলেও বেদবাক্যের ঐতিহ্য নিত্য। পূর্বেই বলেছি এই সিদ্ধান্ত মীমাংসা ও ন্যায়মতের মধ্যবর্তী।

হিন্দুশাস্ত্র সংক্রান্ত বিচারপ্রসঙ্গে রামমোহন শব্দপ্রমাণ বা বেদপ্রমাণের প্রসঙ্গটি যেমন একাধিক স্থানে উত্থাপন করেছেন, খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে

আলোচনাকালে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের অভ্রান্ততার প্রশ্ন নিয়ে তেমন কোন স্বতন্ত্র আলোচনা করেন নি। কিন্তু তাঁর পরোক্ষ উক্তিগুলি থেকে বুঝতে অসুবিধা বা বিলম্ব হয় না যে এ ক্ষেত্রেও তিনি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র বা বাইবেল গ্রন্থকে প্রমাণস্বরূপ অবলম্বন করেই বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর এই বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ The Precepts of Jesus—the guide to Peace and Happiness-এর ভূমিকাতে তিনি স্বীকার করেছেন, ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণাবলী, আত্মার প্রকৃতি প্রভৃতি দুরূহ তত্ত্ব মানববুদ্ধির অগম্য। এই সকল বিষয়ে বুদ্ধিমার্গীয় জিজ্ঞাসা আমাদের শান্তি বা তৃপ্তি দিতে পারে না। কিন্তু এক অদ্বিতীয়, সৃষ্টি-স্থিতি-পালনকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও এমন নৈতিক মূল্যবোধ যা আমাদের শিক্ষা দেয় অপরের প্রতি সেই আচরণ করতে যা আমরা নিজের প্রতি অপরের নিকট হতে কামনা করি,—আমাদের জীবনকে রমণীয় ও সর্বমানবের পক্ষে কল্যাণকর করে তোলে। ঈশ্বরবিশ্বাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও সার্বভৌম, এর উৎস শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত শিক্ষা (tradition and instruction); এবং প্রকৃতির মধ্যে পরমেশ্বরের যে অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল পরিস্ফুট তার অনুশীলন। অপর পক্ষে নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীতা সব ধর্মেই যদিও স্বীকৃত তথাপি খ্রীষ্টধর্মে সমগ্রভাবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এটিই খ্রীষ্টধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় 'খ্রীষ্টান' অভিধাটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। কেউ বা বলেন খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, পবিত্রাত্মা (হোলি গোস্ট্) ও ঈশ্বর—এই তিন তত্ত্বে বিশ্বাসী না হলে নিজেকে খ্রীষ্টান বলা চলে না; কারও মত উদারতর, তাঁরা শুধু বলেন বাইবেলকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করাই খ্রীষ্টান বলে চিহ্নিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, সেই বাইবেলের অংশবিশেষের ব্যাখ্যায় একের সঙ্গে অপরের যতই মতপার্থক্য থাকুক না কেন; আর এক দল আছেন যাঁরা বলেন বাইবেল শাস্ত্রে স্বয়ং খ্রীষ্টের মুখনিঃসৃত যে উপদেশাবলী আছে সেগুলি যথাযথভাবে পালন করলেই খ্রীষ্টান হওয়া যায়।[৩০] কেননা খ্রীষ্টের প্রেরিত শিষ্যগণের উক্তির মধ্যে অনেক সময় স্ববিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত তৃতীয় সিদ্ধান্তই রামমোহনের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তিনি সর্বসাধারণের জন্য খ্রীষ্টোপদেশ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর এই সংকলনটি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশন কর্তৃপক্ষের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁরা রামমোহনের গ্রন্থকে আক্রমণ করেন। এর ফলে যে সুদীর্ঘ বিতর্ক শুরু হয় সেই

উপলক্ষে রামমোহনকে রচনা করতে হয় An Appeal to the Christian Public (১৮২০), Second Appeal to the Christian Public (১৮২১) এবং Final Appeal to the Christian Public (১৮২৩)। The Precepts of Jesusএ রামমোহন যদিও বাইবেলভুক্ত খ্রীষ্টের নিজস্ব উক্তিগুলিকে এই শাস্ত্রের অন্যান্য অংশের থেকে পৃথকীকরণের পন্থাই বেছে নিয়েছিলেন, তবু বাইবেল ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র এ মত তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি। দেখা যায় এখানে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসের যে দুটি উৎস নির্দেশ করেছেন তার একটি শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য (tradition) অপরটি পরম্পরাগত শিক্ষা (instruction)। এখানে স্পষ্টত তিনি 'তুহফাৎ'এ ব্যক্ত তাঁর পরিপূর্ণ যুক্তিবাদ কিছু পরিমাণে সংশোধন করেছেন। 'তুহ্ফাৎ'এ ঈশ্বর-বিশ্বাসকে তিনি বলেছেন মানুষের স্বভাবজাত, এবং শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য ও অভ্যাসজাত সংস্কারকে বলেছেন সর্বথা বর্জনীয়। এই প্রসঙ্গে 'তওয়াতুর' বা ঐতিহ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার বিরুদ্ধে তার তীক্ষ্ণ যুক্তিগুলি মনে পড়ে।[৩১] Precepts-এর ভূমিকায় তাঁকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলতে শুনি: Besides, in matters of religion particularly men in general through prejudice and partiality to the opinions which they once form, pay little or no attention to opposite sentiments (however reasonable they may be) and often turn a deaf year to what is most consistent with the laws of nature, and conformable to the dictates of human reason and divine revelation.।[৩২] সুতরাং আদৌ 'তুহ্ফাৎ'এ ব্যাখ্যাত এবং এখানে পুনরুক্ত নৈসর্গিক নিয়ম ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির নির্দেশের সঙ্গে এখানে একটি নূতন মাত্রা যুক্ত হয়েছে—divine revelation বা ঐশ প্রত্যাদেশ। সমালোচকের আক্রমণের উত্তরে An Appeal to the Christian Public এ রামমোহন তাঁর Precepts গ্রন্থের এই ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন: These expressions are calculated, in my humble opinion, to convince every mind not biassed by prejudice, that the compiler believed not only in one God ...... but in the truths *revealed* by the Christian system.।[৩৩] (italics লেখক

সংযোজিত)। এই গ্রন্থেই আবার অন্যত্র তিনি ঈশ্বরসত্তার একত্ব (বা unity of God) সম্পর্কে স্পষ্টোক্তি করেছেন—the only doctrine consistent with reason and revelation ;[৩৪] কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে বলেছেন—প্রত্যাদেশ বা revelation স্বীকার না করেও ঈশ্বরবিশ্বাস সম্ভব, এবং এমন বিশ্বাসী বহু আছেন : "I am at a loss to trace the origin of his··· argument imputing atheism to the majority of those who deny the divinity of the Jewish and Christian Revelation. For notwithstanding my acquaintance with several Europeans and Asiatics who doubt the possibility of Revelation I have never met with one, to the best of my recollection, maintaining atheism, however widely they might differ from the Reviewer [রামমোহনের Precepts-এর সমালোচক খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষ] and the Compiler [Precepts-এর সংকলক রামমোহন স্বয়ং] in a great many points of belief relating to the Deity"।[৩৫] রামমোহন রচিত Second Appeal (১৮২১) ও Final Appeal (১৮২৩) গ্রন্থদ্বয়ে শেষ পর্যন্ত বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ত্রিতত্ত্ববাদ (Trinitarianism) বনাম একেশ্বরবাদ (Unitarianism) ; এবং এই সূত্রে রামমোহন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যীশুর মানবত্ব এবং ঈশ্বরাধীনত্ব। এই প্রসঙ্গে তিনি যীশুর ঈশ্বরত্ব (Deity) মতবাদ, যীশু-প্রায়শ্চিত্তবাদ (বা Doctrine of Atonement of Christ—সর্বমানবের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যীশু স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন,—প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের এই সিদ্ধান্ত), এবং যীশুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত কাহিনীগুলি অশাস্ত্রীয় এবং যুক্তি দ্বারা বিশ্বাসের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। এই প্রচলিত খ্রীষ্টীয় সংস্কারগুলির পরিবর্তে তিনি যীশুকে ঈশ্বরসৃষ্ট (created), ও ঈশ্বরপ্রেমিক ধর্মোপদেষ্টা রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর অবলম্বিত প্রণালী খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রগ্রন্থের উপযুক্ত পঙ্‌ক্তি-বিচার বা textual criticism। সর্বত্র তিনি প্রতিপক্ষগণকে বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁদের ধর্মশাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রচলিত ত্রিতত্ত্ববাদের অনুকূল নয়। এই বিচারে শাস্ত্রপ্রমাণই তাঁর অস্ত্র।

এই সূত্রে রামমোহনকৃত শাস্ত্রবিচারের যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সংক্ষেপে

সেগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে: ১. তিনি আক্ষরিক অর্থে শাস্ত্রকে গ্রহণ করবার ঘোর বিরোধী। তাঁর খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণ বাইবেলকে বর্ণে বর্ণে অভ্রান্ত মনে করেছেন—তাঁদের দৃষ্টিতে এর শুধু অর্থ নয়—প্রতিটি শব্দ এবং তার বিন্যাস পর্যন্ত নিত্য এবং অভ্রান্ত। রামমোহন এর প্রতিবাদে সঙ্গত ভাবেই দেখিয়েছেন মূল বাইবেলের ভাষা রূপকবহুল ও অলঙ্কারাকীর্ণ—একে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করলে অর্থসঙ্গতি কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের প্রাচ্যদেশে উদ্ভব; প্রাচ্য ভাষাসমূহের প্রকাশভঙ্গী স্বভাবত অলঙ্কারমণ্ডিত, প্রাচ্যদেশীয়রা আজন্ম এই ভাষা শুনতে অভ্যস্ত। তাই বাইবেল বা কুরাণের বচন শুনলে বাহ্যাড়ম্বরের অন্তরালে নিহিত প্রকৃত অর্থ গ্রহণে তাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু শত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও অনভ্যস্ত ইউরোপীয়দের পক্ষে এর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা সহজ নয়; তাই তাঁরা আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে ভ্রমে পতিত হন।[৩৬] Second Appeal গ্রন্থে এই হাস্যকর আক্ষরিক ব্যাখ্যার এক উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে: "I find to my great surprise, that the plural form of expression in the 26th verse of the first chapter of Genesis, "And God said Let us make man in our image, after our likeness," has been quoted by some divines as tending to prove the doctrine of the deity of the Holy Ghost., and that of the Son with the deity of the Father of the Universe, commonly called the doctrine of the Trinity. ....Were we even to disregard totally the idiom of the Hebrew, Arabic and of almost all Asiatic languages in which the plural number is often used for the singular, to express the respect due to the persons denoted by the noun, ...the quotation would still by no means answer their purpose; ....To those who are tolerably versed in Hebrew and Arabic,...it is a well known fact that in the Jewish and Muhammadan scriptures, as well as in common discourse, the plural form is often used in a singular sense, when the superiority of the subject of discourse is intended to be kept

in view : ...".[৩৭] এই শাস্ত্রোক্তির us শব্দটিতে যে প্রাচ্য ভাষারীতি অনুযায়ী গৌরবে বহুবচনের প্রয়োগ হয়েছে—এটি যে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের বহুত্বনির্দেশক নয় এই সহজ তত্ত্বটি প্রতিপক্ষকে বোঝাতে রামমোহনকে এতগুলি কথা খরচ করতে হয়েছিল।

২. হিন্দুশাস্ত্রের বেলায় যেমন তিনি বেদ এবং পুরাণ-তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে শ্রুতি বা বেদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন এবং বেদের অনুগত হলে তবেই পুরাণ-তন্ত্রের প্রামাণ্য মেনেছেন, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তেমনি খ্রীষ্টের মুখনিঃসৃত বাণীকেই উচ্চতম মর্যাদা দিয়েছেন। বাইবেলের যে সব অংশ ঐতিহাসিক বিবরণ, অলৌকিক কাহিনী, রহস্যময় তত্ত্ব ইত্যাদির বর্ণনায় মুখর সেগুলিকে তিনি প্রাধান্য দেন নি, কেন না সে বিষয়গুলি বিতর্কিত ও যুক্তিবাদী এবং অখ্রীষ্টানগণ সেগুলিকে অগ্রাহ্য করে থাকেন। একমাত্র খ্রীষ্টের অমূল্য উপদেশাবলীই সর্বজনগ্রাহ্য এবং প্রাকৃতিক নিয়ম, যুক্তি, শাস্ত্র—সব কিছু দ্বারা সমর্থিত (most consistent with the laws of nature, and conformable to the dictates of human reason and divine revelation)।

৩. ঐশ প্রত্যাদেশ অবশ্যই মান্য, কিন্তু তার সঙ্গে সহজ বুদ্ধি, প্রাকৃতিক নিয়ম এবং মানববুদ্ধির কদাচ কোনও বিরোধ নেই।

৪. যাঁরা প্রত্যাদেশবাদ গ্রহণ করতে অক্ষম তাঁরাও স্বচ্ছন্দে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হতে পারেন। প্রত্যাদেশে অবিশ্বাস করলেই কেউ নাস্তিকরূপে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যান না।

৫. অন্যের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করার কারও অধিকার নেই (As religion consists in a code of duties which the creature believes he owes to his creator.....it must be considered presumptuous and unjust for one man to attempt to interfere with the religious observances of others, for which he well knows, he is not held responsible by any law either human or divine)।[৩৮]

দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রত্যেক ধর্মের ঐতিহ্যেই শাস্ত্রপ্রামাণ্য বা আপ্তবচন-প্রামাণ্যের একটি নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তবে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় ধর্মত্রয়ের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যবিশ্বাসের যে স্তরভেদ

ঘটেছিল তার মধ্যে একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্র দুই স্তরের পার্থক্য প্রধানত অভ্রান্ত শাস্ত্র ও প্রত্যাদিষ্ট বচন নিয়ে। মীমাংসকগণ যে অর্থে বেদপ্রামাণ্য মেনেছেন তদনুযায়ী বেদকে শুধু প্রামাণিক গ্রন্থই বলা হয় নি, তাকে নিত্য, অপৌরুষেয় ও বর্ণে বর্ণে অভ্রান্ত বলা হয়েছে। এই মতে ঈশ্বর বা ঋষিগণ বেদস্রষ্টা নন। নৈয়ায়িকরা এরই প্রতিবাদে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন বেদ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট বস্তু, ঈশ্বরের বাণীরূপেই তার প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসেও তর্কটা উঠেছিল; সনাতনপন্থিগণ (হিন্দু মীমাংসকদের মত) ঘোষণা করেছিলেন কুরাণশরীফ নিত্য,—এ গ্রন্থ ঈশ্বরের অব্যক্ত বাণীর সমষ্টি—সপ্তম স্বর্গে রক্ষিত এক দিব্য আকর থেকে জিব্রাইল কর্তৃক এই বাণী মহম্মদের অন্তরে প্রেরিত হয়। সুতরাং এর শুধু অর্থই নয়, প্রতিটি শব্দই নিত্য এবং অভ্রান্ত। এই মতের প্রতিবাদ করেন যুক্তিপন্থী মুতাজিলিগণ অনেকটা ভারতীয় নৈয়ায়িকগণের অনুরূপ যুক্তির অনুসরণ করে। তাঁদের মতে কুরাণ প্রামাণিক শাস্ত্র হলেও তা সৃষ্ট বস্তু, নিত্য নয়। এর বাণীগুলি ঈশ্বরপ্রেরিত, কিন্তু প্রেরণকালে সৃষ্ট,—তা কোনও নিত্য অব্যক্ত সত্যের প্রতিধ্বনি নয়। ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র সম্পর্কেও একই কথা। বাইবেলের প্রামাণ্যও প্রথম যুগে বিশ্বাস করা হত এই অর্থে যে এর প্রতিটি শব্দ এমন কি প্রতিটি অক্ষরই অভ্রান্ত (divina scriptura), এবং বাইবেল বর্ণিত প্রবক্তা ও প্রেরিতগণ অনুলিপিকার মাত্র। পরবর্তী কালে এই বিশ্বাসের স্বপক্ষীয় যুক্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ এর পরিবর্তে মনে করা হয় বাইবেলের শব্দ ও অক্ষরগুলি কোনও নিত্য, অব্যক্ত, আধ্যাত্মিক সত্যের বহিঃপ্রকাশ নয়; মহাপুরুষগণের অন্তরে যোগলব্ধ ঈশ্বরের যে বাণী স্ফূর্ত হয়েছিল, বাইবেলে তাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানেই revelation কথাটির অর্থ বদলে যাচ্ছে। মহাপুরুষ যোগযুক্ত অবস্থায় ঈশ্বরের বাণী স্বাভাবিক ভাবেই শুনেছেন, এর মধ্যে কোনও অলৌকিকত্ব নেই। অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ থেকে এই প্রেরণাবাদ বা theory of inspiration সম্পূর্ণ ভিন্ন। শেষোক্ত মতে যোগী মহাপুরুষগণ জীবনে যে ঐশী বাণী লাভ করেছেন, শাস্ত্র তারই সমষ্টি এবং সেই কারণেই মান্য।

এখন প্রশ্ন আসবে শাস্ত্রপ্রামাণ্য সম্পর্কে রামমোহনের মত উত্তরজীবনে এর কোনটি ছিল—আক্ষরিক অর্থে অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ না প্রেরণাবাদ? ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামীয় যুক্তিবাদ ও তর্কশাস্ত্রে দীক্ষার ফলে

'তুহ্ফাৎ' রচনাকালে তিনি উগ্র এবং পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী বা deist রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোক্ষশাস্ত্র বেদান্তের প্রস্থানত্রয়—উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা (এবং সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শন) গভীর ভাবে অনুশীলনের ফলে তাঁর প্রথম জীবনের কঠোর যুক্তিবাদী মনোভাব অনেকটা নমনীয় হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় এই পরিবর্তনের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করেছিল। তিনি ক্রমশ শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রচর্চার পাশাপাশি প্রথম পর্বের যুক্তিবাদী চিন্তাধারাটিও ক্রমশ আরও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে—এর উপর আস্থা তিনি কোন সময়েই হারান নি। তাই ইসলামের শরীয়ৎপন্থিগণের অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ, ভারতীয় মীমাংসা-বেদান্ত-ন্যায়-দর্শনের বেদপ্রামাণ্য-প্রতিপ্রাদক যুক্তি (তা যতই সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক হোক না কেন), বা প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। শাস্ত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধা অটুট রেখেও এবং শাস্ত্রসাক্ষ্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও—প্রাচীন অর্থে শাস্ত্র-নিত্যতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হয়েছিলেন। তাঁর পরিণত জীবনের মত এই বিষয়ে যা দাঁড়ায় তা এই: বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্ন ঋষি ও দ্রষ্টাদের অন্তরে প্রজ্ঞালব্ধ সত্যসকল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র এই সকল সত্যেরই বাণীরূপ। অনুভূতিমূলক এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলি নিত্য এবং নিছক যুক্তি বা লৌকিক বিচারবুদ্ধির অগম্য। এর পাশাপাশি শাস্ত্রে ধর্মজীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর বহু প্রসঙ্গ, স্থূল বর্ণনা, বিশ্বাসের অযোগ্য অলৌকিক কাহিনী, ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর কুসংস্কার ইত্যাদি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এগুলি বর্জনীয়; কিন্তু ধর্মজীবন গঠনের পক্ষে নিত্য আধ্যাত্মিক সত্যগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়। সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি বা বিচার-বুদ্ধিরও সমান প্রয়োজন রয়েছে। শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে যুক্তি বা প্রাকৃতিক নিয়মের কোনও বিরোধ নেই। রামমোহনের দৃষ্টিতে তাই শাস্ত্র ও যুক্তির সমান মর্যাদা। বিচারগ্রন্থগুলিতে নিছক শাস্ত্রনির্ভর মনোভাবের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি একাধিকবার যে বৃহস্পতিবচনটি উদ্ধার করেছেন তা পুনরায় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥[৩০]

অপর পক্ষে কেবল যুক্তিতর্ক আধ্যাত্মিক সত্যলাভের সহায়ক নয়। যুক্তিমার্গের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কেনোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় তাঁর স্পষ্ট উক্তি রয়েছে: "When we look to the traditions of ancient nations we often find them at variance with each other; and when discouraged by this circumstance, we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is, alone, to conduct us to the object of our pursuit. We often find that, instead of facilitating our endeavours or clearing up our perplexities it only serves to generate a universal doubt incompatible with the principles on which our comfort and happiness mainly depend. The best method perhaps is, neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other; but by a proper use of the lights furnished by both, endeavour to improve our intellectual and moral faculties, relying on the goodness of the Almighty Power, which alone enables us to attain that which we earnestly and diligently seek for।"[৪০] সুতরাং শাস্ত্র সম্পর্কে রামমোহনের পরিণত মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে: শাস্ত্র নিত্য এই অর্থে যে তা প্রজ্ঞালব্ধ ঈশ্বরীয় বাণী যা ঋষি, দ্রষ্টা ও মহাপুরুষগণের অন্তরে সাধনালব্ধ প্রজ্ঞাদৃষ্টির মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়; সর্বদেশে ও সর্বকালে এমন নরোত্তমগণ জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁদের অন্তরে এই বাণী প্রত্যাদেশের আকারে প্রকাশিত হয়েছে ও শাস্ত্রে সঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং শাস্ত্র কোনও বিশেষ দেশে বা কালে আবদ্ধ নয়; ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাষায় এই অর্থে বিভিন্ন শাস্ত্রকে বলা যেতে পারে repositories of the collective wisdom of the human race। এই শাস্ত্রীয় চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্য এবং মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি পরস্পরের পরিপূরক। এমন সিদ্ধান্তকে কিছুতেই আক্ষরিক অর্থে অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস বলা যাবে না—একে যুক্তি দ্বারা পরিমার্জিত প্রেরণাবাদ বা প্রত্যাদেশবাদ বলাই সঙ্গত। আপত্তি উঠতে পারে, 'তুহ্ফাৎ' পর্বে তিনি প্রত্যাদেশবাদকে বাতিল করে দিলেও স্বাধীন স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধি বা

natural inspiration তো স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এই natural inspirationকে সেখানে তিনি মানুষের ঈশ্বরদত্ত একটি স্বাভাবিক বৃত্তি বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। উত্তর পর্বে তিনি যে revelation বা প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী হয়েছিলেন তা মহাপুরুষগণ কর্তৃক বিশেষ ব্রহ্মযোগে লব্ধ। সর্বমানবের অন্তরস্থ স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য আছে।

শাস্ত্রপরিক্রমায় প্রথম পর্বের যুক্তিবাদ থেকে উত্তর পর্বের প্রত্যাদেশবাদে উত্তরণ পর্যন্ত রামমোহন-মানসের অভিব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করলে তার একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিণত জীবনে শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়কে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু 'তুহ্ ফাৎ'এ প্রত্যাদেশ, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ (miracles), মধ্যবর্তিবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর যে সুস্পষ্ট মত প্রকাশিত হয়েছিল, উত্তরজীবনের শাস্ত্রস্বীকৃতি দ্বারা তা কিছু পরিমাণে সংশোধিত হলেও খণ্ডিত হচ্ছে না। ঋষি, জ্ঞানী বা ঐশভাবাপন্ন মহাপুরুষগণ ব্রহ্মযোগের অবস্থায় সত্য লাভ করে থাকেন। শাস্ত্রে তা লিপিবদ্ধ। এই প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞান যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই তা গ্রহণযোগ্য একথা পরবর্তী জীবনেও রামমোহন খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন। Precepts of Jesus-এর ভূমিকায় যীশুর উদ্বুদ্ধ উপদেশগুলি সংগ্রহের অন্যতম কারণ তিনি এই দেখিয়েছেন যে, এগুলি হল "most consistent with laws of nature, and conformable to the dictates of reason and human revelation"। দেখা যাচ্ছে তিনি শাস্ত্রকে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিকের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার ও যুক্তির আলোকে পরীক্ষা করবার পক্ষপাতী; এবং nature ও reason তাঁর ক্রমবিন্যাসে revelation বা প্রত্যাদেশের অগ্রবর্তী। এই reason এবং revelation (revelation এবং scripture তাঁর পরবর্তী ব্যাখ্যায় সমার্থবাচক)-এর সঙ্গে তিনি অন্য একটি প্রমাণের উল্লেখ করেছেন—যেটিকে তিনি বলতেন common sense বা সহজ বুদ্ধি। শাস্ত্রালোচনা ও ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই তিনটি বৃত্তির উপযুক্ত সংমিশ্রণই ছিল তাঁর মতে আদর্শ। ইংলণ্ডে ইউনিটেরিয়ান এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সংবর্ধনার উত্তরে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "There is a battle going on between reason, scripture and common sense and wealth, power

and prejudice. These three have been struggling with the other three." ।[৪১] লক্ষণীয় এখানেও reason-এর স্থান প্রথম।

শাস্ত্রকে যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করবার আদর্শ নিঃসন্দেহে রামমোহনের গভীর মনীষালব্ধ। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রভাবের সম্ভাবনাও বিচার্য। ইসলামীয় তর্কশাস্ত্র—বিশেষত মুতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ তাঁকে যথেষ্ট আকর্ষণ করেছিল এবং 'তুহ্‌ফাৎ'পর্বে এদের প্রভাব তাঁর উপর অস্বীকার করবার উপায় নেই। সম্ভবত এরই ফলে রামমোহনের জিজ্ঞাসু মন অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তির পথে প্রথম অগ্রসর হয়। শাস্ত্রগ্রন্থ সৃষ্ট বস্তু নয়, নিত্য ও অপৌরুষেয়, এবং এর বর্ণমাত্রই অপরিবর্তনীয়—এ জাতীয় বিশ্বাস তিনি তাঁর অনুশীলিত সর্বধর্মেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই মত যে তিনি প্রথম থেকেই অগ্রাহ্য করেছেন তার প্রমাণ রয়েছে 'তুহ্‌ফাৎ'এ ও পরবর্তী কালের খ্রীষ্টীয় বিতর্কে। আমরা পূর্বে দেখেছি ধর্মশাস্ত্রের অলঙ্কারবহুল ভাষাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করবার বিপদ সম্পর্কে তিনি খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষকে বার বার সচেতন করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে গৌরবে প্রযুক্ত বহুবচনকে আক্ষরিক অর্থে নেবার জন্য Second Appeal-এ তাঁকে যথেষ্ট সমালোচনা ও ব্যঙ্গ করেছেন। এই কারণেই দেখা যায় সমস্ত শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই তিনি শাস্ত্রের মুখ্য আর গৌণ অংশের মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করতে ভোলেন নি। মুখ্য অংশটি তাঁর মতে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ বা ঋষিদের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য; গৌণ ভাগ অলৌকিক কাহিনী ও কিংবদন্তীতে পূর্ণ। এই ধরণের প্রত্যাদেশবাদের আদর্শের নজির তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করেছিলেন খ্রীষ্টধর্মের অভিব্যক্তির সুদীর্ঘ ইতিহাসে যাতে তাঁর অধ্যয়ন ছিল গভীর। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রেও এই রকম একটা মত আছে: ঈশ্বর বেদস্রষ্টা, কিন্তু তিনি নিরাকার সেই অবস্থায় তাঁর পক্ষে সৃষ্টি সম্ভব নয়; তাই তিনি ঋষিদেহ ধারণ করে বা ঋষিশরীরে আবিষ্ট হয়ে ঋষিমুখমাধ্যমে বেদ সৃষ্টি করেছেন।[৪২] আবেশ বা inspiration-এর মতবাদটি সুতরাং এখানেও পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় দর্শনে পারঙ্গম রামমোহনের চিত্তে এই প্রভাবও কার্যকরী হয়েছিল, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। প্রত্যাদেশবাদকে যুক্তির দ্বারা পরিমার্জিত করে নেবার প্রেরণা পরবর্তী জীবনে রামমোহনের চিত্তে এসেছিল পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর ক্রমবর্ধমান পরিচয়ের ফলে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের ধর্মবিশ্বাসী ও সংশয়বাদী বা নাস্তিক ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের নাম করেছি এবং এঁদের দুই দলের চিন্তা রামমোহনকে প্রভাবিত করলেও তিনি যে ধর্মবিশ্বাস হারান নি তারও উল্লেখ করেছি। রামমোহনের রচনায় যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে মনে হয় যে দুই মনীষীর প্রভাব সেখানে অতি স্পষ্ট তাঁরা হলেন ডেভিড হিউম ও জন লক।

ডেভিড হিউম ছিলেন সংশয়বাদী, রামমোহন ছিলেন বিশ্বাসী। রামমোহনের ধর্মবিশ্বাসে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের কোনও স্থান ছিল না। অলৌকিক ক্রিয়া বা miracle সম্পর্কে হিউমের বিরুদ্ধ উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর Second Appealএ রামমোহন খ্রীষ্টীয় miracle বা অলৌকিক কাহিনী সম্পর্কে যা বলেছেন তার প্রতি ছত্র হিউমকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও হিউমের নাম তিনি করেন নি: "The Editor must be well aware, that the enemies to revelation draw a line of distinction on the subject of proofs by testimony, between the current events of nature familiar to the senses of mankind, and within the scope of human exertions; and extraordinary facts beyond the limits of common experience, and ascribed to a direct interposition of divine power suspending the usual course of nature. If all assertions were to be indiscriminately admitted as facts, merely because they are testified by numbers, how can we dispute the truth of the miracles which are said to have been performed by persons esteemed as holy amongst natives of this country?"[৬৩] এ যেন হিউমের উক্তির প্রতিধ্বনি। রামমোহনের উপর হিউমের মত সংশয়বাদীদের প্রভাব ছিল ঋণাত্মক—অন্ধ বিশ্বাসের খণ্ডনেই তা মুখ্যত কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু যুক্তির সঙ্গে শাস্ত্রবিশ্বাসের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে যে মনীষী তাঁকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিলেন তিনি নিঃসংশয়ে ইংরেজ দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪)। লকের গ্রন্থাবলী তিনি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গে একাধিকবার

তিনি লকের উল্লেখ করেছেন ও তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৪৪] Final Appeal গ্রন্থে লককে তিনি one of the greatest men that ever lived বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।[৪৫] মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত এক পত্রেও তাঁকে পরম শ্রদ্ধাভরে লকের উল্লেখ করতে দেখা যায়।[৪৬] লকের দার্শনিক গ্রন্থ An Essay concerning Human Understanding (১৬৯৫) ছাড়াও অন্য যে গ্রন্থগুলি তাঁকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল সেগুলি হল: (১) An Essay concerning Toleration (১৬৬৭); (২) A Letter concerning Toleration (১৬৮৯); (৩) A Second Letter concerning Toleration (১৬৯০); (৪) A Third Letter Concerning Toleration (১৬৯২); (৫) Reasonableness of Christianity as delivered in the Scriptures (১৬৯৫); (৬) A Paraphrase and Notes on Epistles of St. Paul to the Galatians (১৭০৫); (৭) A Paraphrase and Notes on Epistles of St. Paul to the Corinthians (১৭০৬)। তা ছাড়া লকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত A Fourth Letter concerning Toleration (অসম্পূর্ণ) ও A Discourse on Miracles নামক নিবন্ধ দুটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লক পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক পর্বে যুক্তিবাদের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন, এবং উগ্র ধর্মীয় সংকীর্ণতা তাঁর ঘৃণার বস্তু ছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয় সাধন তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর জীবনীকার খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে লকের দৃষ্টিভঙ্গীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন তা এই: "The Gospel is a revelation, but it is reasonable throughout. Its delineation of the Godhead as one Supreme Being, its description of Him as merciful, its interpretation of man's duties and of the Law and its doctrine of Justification by Faith (rightly understood), are all wholly rational. Nothing in Christianity contradicts our human reason".।[৪৭] বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত সন্ত পলএর পত্রাবলীর দুটি পরিচ্ছেদের টীকা রচনা করে তিনি আধুনিক বাইবেল-গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেন।[৪৮] তাঁর খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক মতের সঙ্গে যুক্তিপন্থী একেশ্বরবাদি (ডীইস্ট)-

গণের ও একতত্ত্ববাদী (ইউনিটেরিয়ান) খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে—যদিও তিনি নিজে আজীবন অ্যাংলিকান সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। Reasonableness of Christianity গ্রন্থে তিনি বাইবেল কথিত যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত শিক্ষাবলীকে পরবর্তী নানা অর্বাচীন তত্ত্বের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ রূপে স্থাপন করবার প্রয়াসী। তাঁর মতে যীশুকে ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ ও যীশুর প্রকৃত সরল নৈতিক উপদেশগুলি পালন—এই দুটিই হল প্রকৃত খ্রীষ্টানের কর্তব্য।[৪৯] অপরের ধর্মমত সম্পর্কে তিনি উদার সহিষ্ণুতার উপদেশ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিগুলি অতি পরিষ্কার : (১) কোনও ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা Church রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা দাবী করতে পারে না। শাসন করবার অধিকার শুধু রাষ্ট্রের ; কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রেরও শাসন করবার অধিকার নেই ; (২) কোনও ধর্মসংঘ বা ব্যক্তিবিশেষ এমন দাবী করতে পারেন না তিনি মানব-জীবন ও মানবভাগ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্যকে জেনেছেন। সুতরাং অপরকে জোর করে স্বমতে আনবার অধিকার তাঁদের নেই ; (৩) জোর করে কোনও ব্যক্তিকে মত পরিবর্তনে বাধ্য করলে তিনি ভয়ে আন্তরিক বিশ্বাস ছাড়াই প্রবলতর পক্ষের মন রাখবার জন্য তার মতে সায় দেবেন ; এতে কোনও লাভ নেই।[৫০] রামমোহন যীশুকে একমাত্র ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করেন নি কিন্তু তাঁর উদার পরমতসহিষ্ণুতা, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের যুক্তিমূলক সমালোচনা, বাইবেলের তত্ত্বভাগ, ঐতিহাসিক বিবরণ, অলৌকিক কিংবদন্তীগুলি বর্জন করে যীশুর প্রকৃত উপদেশ চয়ন—সব কিছুই প্রতিপদে আমাদের লককে স্মরণ করিয়ে দেয়। Final Appeal-এর ভূমিকায় পরধর্মমতসহিষ্ণুতা বা toleration সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য পড়লে লকের এই বিষয়ক যুক্তিগুলির সঙ্গে তার সাদৃশ্য চোখে পড়ে।[৫১] এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য, রামমোহন খ্রীস্টীয় প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট বলেছিলেন, খ্রীস্টীয় প্রত্যাদেশবাদে কেউ অবিশ্বাসী হলেই তাঁকে নাস্তিক বলবার অধিকার কারও নেই। এই উক্তিতেও অসাম্প্রদায়িক, সহিষ্ণু দৃষ্টি প্রতিফলিত। যুক্তি (reason) ও প্রত্যাদেশ (revelation)-এর পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে লক তাঁর Essay concerning Human Understanding-এ বলেছেন : "Revelation cannot be admitted against the clear evidence of reason. Since no evidence of our faculties by which we receive such revelations, can exceed, if equal,, the

certainty of our intuitive knowledge, we can never receive for a truth anything that is directly contrary to our clear and and distinct knowledge......Revelation where God has been pleased to give it, must carry it against the probable conjectures of reason. But yet it still belongs to reason to judge of the truth of its being a revelation, and of the signification of the words wherein it is delivered......... Whatever God has revealed is certainly true ; no doubt can be made of it. This is the proper object of faith ; but whether it be a divine revelation or no, reason must judge ; which can never permit the mind to reject a greater evidence to embrace what is less evident, nor allow it to entertain probability in opposition to knowledge and certainty. There can be no evidence that any traditional revelation is of divine original, in the words we receive it, and in the sense we understand it, so clear and so certain as that of the principles of reason. And therefore, nothing that is contrary to, and inconsistent with the clear and self-evident dictates of reason, has a right to be urged or assented to as a matter of faith, wherein reason hath nothing to do."।[৫২] উক্তিটিকে সহসা রামমোহনের বলে ভুল হয়। যুক্তি, প্রত্যাদেশ ও বিশ্বাসের এই সমন্বয় সাধন আধুনিককালে রামমোহনের বৈশিষ্ট্য এবং এ পথে তাঁর স্বীকৃত পূর্বসূরী মনীষী জন লক। Second Appeal-এ লকের Reasonableness of Christianity ও Final Appeal-এ সন্ত পলের পত্রাবলীর উপর লক কৃত টীকাকে রামমোহন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন।[৫৩] সুতরাং বাইবেল-গবেষণাতেও তাঁর প্রেরণার অন্যতম সহায়ক লকের রচনাবলী একথা মনে করলে অন্যায় হবে না। এখানে উল্লেখযোগ্য, লকের সঙ্গে আর এক মহামনীষীর নামও রামমোহন কর্তৃক একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে,—তিনি সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী সার আইজাক নিউটন। নিউটন যে যীশুকে ঈশ্বরের সঙ্গে

অভিন্ন ভাবেন নি ঈশ্বর প্রেরিত মহামানবরূপে তাঁকে গ্রহণ করেছেন—এই মতের সমর্থনে তিনি নিউটনের Observations upon the Prophecies নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৫৩ক]

শাস্ত্রসম্পর্কে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিব্যক্তি ও পরিণতির বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে শাস্ত্রগ্রন্থের উপযুক্ত পাঠনির্ণয়ের জন্য তাঁর প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন প্রয়োজন। খ্রীস্টীয় এবং রক্ষণশীল হিন্দু প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বিচার করবার সময়ে তাঁকে একাধিক বার আলোচ্য শাস্ত্রগ্রন্থগুলির উপযুক্ত পাঠ ও অর্থনির্ণয়ের উপর জোর দিতে দেখা যায়। Second Appeal গ্রন্থের তৃতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ও সংযোজন অংশে; এবং Final Appeal-এর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়গুলিতে তিনি প্রয়োজনমত বাইবেলের মূল হিব্রু ও গ্রীক সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠ ও অনুবাদের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করেছেন। হিন্দু প্রতিপক্ষদের সঙ্গে বিচারের বেলায় পুরাণ-তন্ত্রের শাস্ত্রীয়তার প্রশ্নে তাঁকে একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পুরাণ-তন্ত্রকে বিশেষ অর্থে তিনি শাস্ত্র বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত অনেক গ্রন্থ পুরাণ ও তন্ত্র নামে চলে যাচ্ছে, নির্ভরযোগ্য প্রাচীন পুরাণ-তন্ত্রাদির সমান মর্যাদা এই সব অর্বাচীন রচনা কিছুতেই দাবী করতে পারে না। এগুলিকে শাস্ত্র বলতে রামমোহন রাজী ছিলেন না। কিন্তু প্রামাণ্যবিহীন এই সব গ্রন্থকে চিনবার উপায় কী? এখানে রামমোহন বিচারের দুটি মানদণ্ড নির্দেশ করেছেন: ১. প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থের সুপরিচিত টীকা থাকবে; ২. নিবন্ধকার প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহকর্তাদের রচনায় তার উদ্ধৃতি থাকবে। এই দুই বৈশিষ্ট্য পুরাণ-তন্ত্র জাতীয় যে গ্রন্থের নেই তা শাস্ত্রপদবাচ্য হবে না এবং বিচার প্রসঙ্গে তার প্রামাণিকতাও স্বীকার্য হবে না। হিন্দুশাস্ত্রের বিচারে এই কথাটি রামমোহন তাঁর প্রতিপক্ষগণকে বার বার বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার প্রয়োজন হবে, এখানে এই সংক্ষিপ্ত উল্লেখটুকুই যথেষ্ট। শাস্ত্র বা সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার বা textual criticism ক্রমশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কোনও প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার পূর্বে সাধারণত প্রশ্ন তোলা হয় আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রাচীনত্বের

দাবী বিচারসহ কিনা; গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ কি এবং প্রচলিত পাঠটি শুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য কিনা। ইউরোপীয় রেনেশাঁসের যুগ থেকেই পণ্ডিতমহলে এই পদ্ধতি ক্রমশ স্বীকৃত হতে শুরু করেছে। রামমোহনের শাস্ত্রবিষয়ক পাণ্ডিত্য ও গবেষণা রেণেশাঁসের এই বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। এখানে উল্লেখযোগ্য, যে উচ্চতর বাইবেল গবেষণার জন্য একটি স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিকা স্থাপনের পরিকল্পনাও তাঁর ছিল এবং ১৮২৩-এর এপ্রিল মাস থেকে এটি প্রকাশ করবার প্রস্তাবও তিনি করেছেন Final Appeal-এর ভূমিকায়।[৫৪] সম্ভবত এ সংকল্প কার্যে পরিণত হয় নি।

পূর্বে বলেছি গত শতাব্দীতে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বর্তমানে কাজি আবদুল ওয়াদুদ রামমোহনের ধর্মমতের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন।[৫৫] এঁদের সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে এই অধ্যায়ের উপসংহার করা যেতে পারে। এঁদের দুজনের সিদ্ধান্তই প্রায় একরকম: 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওহাহিদিন'-এ রামমোহনের যে শাস্ত্রনিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বীয় বিচারবুদ্ধিনির্ভর একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস প্রতিফলিত এঁরা তাকেই তাঁর পূর্ণ ও পরিণত অধ্যাত্মদর্শনরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর উত্তরকালের শাস্ত্র-স্বীকৃতি এঁদের মতে প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবলম্বিত একটা কৌশল মাত্র। শাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক অংশকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু কোন শাস্ত্রকেই অভ্রান্ত জ্ঞান করেন নি। কথাটা অক্ষয়কুমারের সময় বিশেষ করে উঠেছিল এই জন্য যে, সে-সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক প্রভাবশালী দল রামমোহনকে অনেকটা উপনিষদ্‌-বেদান্ত সম্মত ব্রহ্মজ্ঞানমার্গী বলে গণ্য করবার পক্ষপাতী ছিলেন। অপর পক্ষে অক্ষয়কুমার ছিলেন বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী,—ব্রাহ্মসমাজের ধর্মকে তিনি বেদান্তের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর একেশ্বরবাদরূপেই কল্পনা করতে চাইতেন। এই জন্যই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধে-রামমোহনকে কেন শাস্ত্রপ্রামাণ্যবাদী বৈদান্তিক গণ্য করা যেতে পারেনা তা বিস্তারিত যুক্তি প্রয়োগ করে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। এই দুই মনীষীর বিচারে যে দুর্বলতাটুকু দেখা যায় তা এই: এঁরা শাস্ত্রসম্পর্কে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের ক্রম-অভিব্যক্তিকে হিসাবের মধ্যে ধরেন নি। এরা দুজনেই 'তুহ্‌ফাৎ'-এ প্রতিফলিত রামমোহনের কঠোর যুক্তিবাদ ও

শাস্ত্রসম্পর্কে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার অভাবকেই তাঁদের প্রধান যুক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অক্ষয়কুমারের ভাষায়, "তিনি ঐ পুস্তকে ['তুহ্‌ফাৎ'] একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া সর্বপ্রকার প্রচলিত শাস্ত্রের শিরে এতাদৃশ দণ্ডাঘাত করিয়া গিয়াছেন যে তদীয় যাতনা হইতে তাহাদিগের পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই।"[৫৫ক] কিন্তু রামমোহন যে পরবর্তী কালে প্রথম জীবনের এই উগ্র মতবাদ সংশোধন করে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন, অক্ষয়কুমার সেটুকু বিবেচনা করেন নি। আমরা দেখেছি উত্তরজীবনে ধর্মজীবন লাভের জন্য রামমোহন বিশুদ্ধ যুক্তিকে যথেষ্ট মনে করেন নি; হিন্দু মীমাংসক, সনাতন শরীয়ৎপন্থী মুসলমান বা সংকীর্ণ খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের মত বেদ, কুরাণ বা বাইবেল আক্ষরিক অর্থে বর্ণে বর্ণে অভ্রান্ত এমন তত্ত্ব স্বীকার না করলেও সীমায়িত ভাবে প্রত্যাদেশ বা revelation মেনেছেন এবং শাস্ত্রের যে সকল অংশে ঋষি, মহাপুরুষ বা প্রবক্তাগণের ঐশী প্রেরণাজাত বাণী সঞ্চিত আছে সেগুলির প্রামাণ্য স্বীকারেও আপত্তি করেন নি। তৎসহ অন্যান্য অংশগুলির একবাক্যতা স্থাপন করে সমগ্র শাস্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যও এই পর্বে তিনি আগ্রহী। অপর পক্ষে তিনি নিজ বিচারবুদ্ধিকেও অটুট রেখেছেন এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা না করে কোনও উপলব্ধির সাক্ষ্যকেই আমল দেন নি। 'তুহ্‌ফাৎ' পর্বের যুক্তিবাদের ধারাটিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে আরও মার্জিত করে এই ভাবে তিনি শাস্ত্রনিষ্কাশিত প্রত্যাদেশবাদের সঙ্গে তাকে সমন্বিত করেছেন। তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ও পরিণতির প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবলমাত্র 'তুহ্‌ফাৎ'এর সিদ্ধান্তগুলির আলোকে তাঁকে বিচার করতে গেলে-সে বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অক্ষয়-কুমার বা আবদুল ওয়াদুদের বক্তব্য এই অসম্পূর্ণতা বা অব্যাপ্তি দোষ থেকে মুক্ত নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে রামমোহনের বেদান্ত ও পুরাণতন্ত্র সম্পর্কীয় মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা তাঁকে কত ব্যাপক ও গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় প্রত্যাদেশের উপর গভীর আস্থা সেখানে প্রতিপদে পরিস্ফুট, যদিও সজাগ বিচারবুদ্ধিও সর্বত্র সক্রিয়। বস্তুত প্রত্যাদেশ ও যুক্তির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে আপন পাণ্ডিত্য ও মনীষা দ্বারা রামমোহন শাস্ত্রচর্চার যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তার প্রসার ও গুরুত্ব অসাধারণ। উত্তরকালে এই উৎসমুখ

থেকে একাধিক ধারা প্রবাহিত হয়ে বাঙলার মননজগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশুদ্ধ ডীয়িস্ট্ অক্ষয়কুমার দত্ত যখন বলেন, "বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য। ভাস্কর ও আর্যভট্ট এবং নিউটন ও হর্শেল যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং গাল ও বেকন যে কোন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ্ ও তলবকার মূষা ও মহম্মদ, যিশু ও চৈতন্য এবং পার্কর ও লে হণ্ট্ পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম";[৫৬] তখন তিনি রামমোহনেরই প্রতিধ্বনি করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন সমগ্র বেদ-উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি করবার প্রয়াসে বুদ্ধি-বিবেকের সমর্থন না পেয়ে আক্ষেপ করেন: "আমি সমগ্র বেদ এবং সমগ্র উপনিষদ্কে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্যের নহে, যে হেতুক সমস্ত খনি কিছু স্বর্ণ হয় না; খনির অসার প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়। এই খনি-নিহিত সকল স্বর্ণই যে বাহির হইয়াছে তাহাও নহে। বেদ্-উপনিষদ্ রূপ খনির মধ্যে এখনও কত সত্য কত স্থানে গভীররূপে নিহিত আছে"[৫৭]; তখন এই সশ্রদ্ধ বিচারশীল উক্তির মধ্যেও আমরা যেন রামমোহনের কণ্ঠস্বরই শুনতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে কৃষ্ণচরিত্র বিচারের পূর্বে আকরগ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেন ও শাস্ত্রের অর্বাচীন ভাগকে কঠোর হাতে বাতিল করেন সেখানেও তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে রামমোহনেরই উত্তর-সাধক। আবার স্বামী বিবেকানন্দ যখন বেদপ্রামাণ্য সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, "বেদের যতখানি অংশ যুক্তি-সিদ্ধ, আমি ব্যক্তিগত ভাবে ততটুকু গ্রহণ করি"[৫৮]; তখন পূর্বসূরী হিসাবে রামমোহনকেই মনে পড়ে।

প্রমাণপঞ্জী :

১. *The Debates Commentary* (কথাবত্থুপ্পকরণ-অট্‌ঠকথা—ইংরেজি অনুবাদ—বিমলাচরণ লাহা) (পালি টেক্সট সোসাইটি, লণ্ডন, ১৯৬৯) পৃ: ২-৬ ; *The Expositor* (অত্থসালিনী, বুদ্ধঘোষকৃত ধম্মসঙ্গনীর টীকা—ইংরেজি অনুবাদ,—পে-মঙ্‌-তিন) প্রথম খণ্ড (পালি টেক্সট সোসাইটি, লণ্ডন, ১৯৫৮) পৃ: ৬ ; এই দুটি আকরগ্রন্থের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সহকর্মী বন্ধু সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী।

২, তৃতীয় অধ্যায়ে পুনরুদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য সেই অধ্যায়ের পাদটীকা ৩৩

৩. আর্যদেব কৃত জ্ঞানসারসমুচ্চয়, কারিকা ৩১, বিধুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত *The Basic Concepts of Buddhism* (University of Calcutta 1934) p. 11 note.

৪. ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় (চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস ১৯৫৭) পৃ: ৩৪

৫. দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পৃ: ১০

৬. *Tuhfatul Muwahhidin* ·Eng. Translation by Moulavi Obaidullah el Obaide (Second Ed. Calcutta 1944), p. 5

৭. *Ibid* pp. 7-8

৮. *Ibid* pp. 8-9

৯. *Ibid* p. 17

১০. *Ibid* p. 19

১১. *Ibid* p. 21

১২. *Ibid* pp 23-24

১৩, নগেন্দ্রনাথ, পৃ: ৫৬৮ পাদটীকা

১৪. Collet pp. 18-19.

১৫. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : নগেন্দ্রনাথ, ষোড়শ অধ্যায় ; ব্রজেন্দ্রনাথ শীল *Rammohun the Universal Man* pp. 9-10 ; সৈয়দ মুজতবা আলি 'রাজা রামমোহন রায় ও ইলম্‌-উল্‌-কালাম' ভাবীকাল, রামমোহন সংখ্যা পৌষ ১৩৪০, তত্ত্বকৌমুদী, ৬৪ খণ্ড, প্রথম সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত পৃ: ৩৪-৩৬ ; কাজি আবদুল ওয়াদুদ 'তুহ্‌ফাৎ-উল মুওহ্‌হিদিন্‌' তত্ত্বকৌমুদী ৭৭ খণ্ড, নবম সংখ্যা পৃ: ৬৭-৭০ ; নির্মল মুখোপাধ্যায় 'Rammohun, Islam and Deism' *Humanist Review* July-Septemer 1969 pp. 259-72

১৬. মুতাজিলা দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে দ্রষ্টব্য De Lacy O'leary, *Arabic Thought and its place in History* (London 1954) pp. 123-34 ; A Guillaum. *Islam* (2nd ed 1956) pp, 129-34.

১৭. *Humanist Review* July-September, 1969, pp. 261-62

১৮. *Ibid*. pp. 263-64

১৯, Rom Landau *The Philosophy of Ibn Arabi* (London 1959) pp. 86-87

১৯ ক. Collet pp. 201-02

২০. দৃষ্টান্তস্বরূপ সূফী মতবাদের উপর বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক প্রভাব সম্পর্কে দ্রষ্টব্য R. A. Nicholson *The Mystics of Islam* (London 1914) pp. 16-27

২১. O'leary *Arabic Thought and its place in History* pp, 219-25 : P. K. Hitti *History of the Arabs* (London 1958) pp. 431-32, 436

২২, *Essay concerning Human Understanding* (ed, A. S. Pringle Pattison Oxford Univ, Press, 1924) p. 354

২৩. *Enquiries concerning Human Understanding and concerning the Principles of Morals* (edited by L. A. Selby-Bigge, Second Ed.) p. 114

২৪. *Ibid* pp. 130-131

২৫. *Tuhfat-ul-Muwahhidin* Eng. Trans. p, 24 ; Seal *Rammohun the Universal Man* p. 10

২৬. তত্ত্বকৌমুদী ১১ খণ্ড, নবম সংখ্যা, পৃঃ ৬১-৭০

২৬ ক. সাধারণত ব্যাপক অর্থে 'শ্রুতি' শব্দের দ্বারা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ পর্যন্ত সমগ্র 'বেদ'কেই বোঝায়। কিন্তু মীমাংসাদর্শনে 'শ্রুতি' কথাটির একটি বিশেষ অর্থও আছে। 'বেদশাস্ত্র' অর্থে মীমাংসকগণ যে শব্দদ্বয়ের বহুল ব্যবহার করে থাকেন সে দুটি হল 'বেদ' বা 'আম্নায়'। যে বেদবাক্যের অর্থ স্বপ্রকাশ, শ্রবণমাত্র যার অর্থ শ্রোতার অন্তরে প্রতিভাত হয়—লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণাদির সাহায্যে যার কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না—বিশেষ অর্থে মীমাংসকগণ তাকেই 'শ্রুতি' আখ্যা দিয়ে থাকেন (দ্রষ্টব্য Kisori Lal Sarkar *The Mimansa* Rules *of Interpretation as applied* to *Hindu Law*—Tagore Law Lectures 1905 : Calcutta 1909 pp. 101-04)। বর্তমান প্রসঙ্গে 'শ্রুতি' শব্দটি আমরা ব্যাপক অর্থে সমগ্র বেদশাস্ত্রকে বোঝাবার জন্যই ব্যবহার করেছি ; মীমাংসা ব্যবহৃত বিশেষ অর্থে নয়।

২৭. ব্রহ্মসূত্র, শাংকরভাষ্য ১, ১, ৩ 'মহত ঋগ্বেদাদে : শাস্ত্রস্যানেক-বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদি-লক্ষণস্য সর্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি'।

২৮, এই অর্থে বেদান্তের শব্দনিত্যতা স্বীকৃতি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, ব্রহ্মসূত্র, শাংকরভাষ্য, ১, ৩, ২৮,

২৯. দ্রষ্টব্য ব্রহ্মসূত্র, শাংকরভাষ্য ১, ১, ৩ এর বাচস্পতি মিশ্র কৃত 'ভামতী' টীকা : 'বৈয়াসিকন্তু মতমনুবর্তমানাঃ শ্রুতিস্মৃতীতিহাসাদিসিদ্ধ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ানুসারেণ অনাদ্য-বিদ্যোপধানলব্ধ-সর্বশক্তিজ্ঞানস্যাপি পরমাত্মনো নিত্যস্য বেদানাং যোনেরপি ন তেষু স্বাতন্ত্র্যম্ ; পূর্বপূর্বসর্গানুসারেণ তাদৃশতাদৃশানুপূর্বীবিরচনাৎ।...তদনুরোধাৎ সর্বজ্ঞোঽপি সর্বশক্তিরপি পূর্বপূর্বসর্গানুসারেণ বেদান্ বিরচয়ন্ ন স্বতন্ত্রঃ।' 'বেদান্ত-পরিভাষা'কার ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র

আরও সরল ভাষায় এই বিষয়ে বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন : "অস্মাকং তু মতে বেদো ন নিত্যঃ উৎপত্তিমত্ত্বাৎ ।...তথা চ বর্ণপদবাক্যসমুদায়স্য বেদস্য বিয়দাদিবৎ সৃষ্টিকালীনোৎপত্তিকত্বম্ প্রলয়কালীনধ্বংসপ্রতিযোগিত্বঞ্চ ।...তস্মান্ন বেদানাং ক্ষণিকত্বম্ ।...তথা চ সর্গাদ্যকালে পরমেশ্বরঃ পূর্বসিদ্ধবেদানুপূর্বীসমানানুপূর্বীকং বেদং বিরচিতবান্ । ন তু তদ্বিজাতীয়মিতি ন সজাতীয়োচ্চারণানপেক্ষোচ্চারণবিষয়ত্বং পৌরুষেয়ত্বম্ ।" বেদান্ত-পরিভাষা, আগম-পরিচ্ছেদঃ (শ্রীমোহন তর্কবেদান্ত তীর্থ সম্পাদিত সংস্করণ ; পৃঃ ১০৫-০৬) ।

৩০. *English Works* Pt. V p. 3

৩১. *Tuhfat* pp. 13-14

৩২. *English Works* Pt. V p. 4

৩৩. *Ibid* p. 57

৩৪. *Ibid* p. 70

৩৫. *Ibid.*

৩৬. *Second Appeal*এ কুরাণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :..."Metaphorical expressions having been very common among Oriental nations, Muhammadans could not fail to understand them in their proper sense although these expressions may throw great difficulty in the way of an European Commentator even of profound learning." *English Works* Pt. VI p. 30 ; বাইবেলের ভাষাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও রামমোহনের এমন একাধিক উক্তি আছে ।

৩৭. *English Works* VI pp. 51-52

৩৮. 'Final Appeal' *English Works* (G) Vol. II p. 254

৩৯. দ্রষ্টব্য, পাদটীকা ২

৪০. *English Works* II p. 15

৪১, Carpenter *Last Days* p. 98

৪২. ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, স্থায়-পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৭৮) পৃঃ ১৮২

৪৩. *English Works* Pt. VI pp. 43-44

৪৪. 'Second Appeal' *English Works* Pt. VI p. 89 ; 'Final Appeal' *English Works* (G) Vol II pp. 321-32 , 342-43 , 418 ; 500-02

৪৫. 'Final Appeal' *English Works* (G), Vol II, p. 321

৪৬. Collet p. 494

৪৭. R. I. Aaron *John Locke* (Oxford University Press 1937) p. 301

৪৮. *Ibid* p. 299

৪৯. *Ibid* pp. 299-300

৫০. *Ibid* pp. 297-98

৫১. 'Final Appeal' *English Works* (G) Vol. II p 254

৫২. *Essay Concening Human Understanding* pp. 356-58

৫৩. পাদটীকা ৪৪

৫৩ক. 'Second Apeal' *English Works* Pt. VI p. 89

৫৪. 'Final Appeal' *English Works* (G) Vol. II p. 253

৫৫. অক্ষয়কুমারের রচনার জন্য দ্রষ্টব্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম ভাগ, ১০৩ সংখ্যা (ফাল্গুন ১৭৭৩ শক) পৃঃ ১৪৬-৫০; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চতুর্থ ভাগ, ১৩৯ সংখ্যা (ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক) পৃঃ ১৫৭-৬২; কাজি আবদুল ওয়াদুদ, তত্ত্বকৌমুদী ১১ খণ্ড, নবম সংখ্যা পৃঃ ৬৭-৭০

৫৫ক. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৭৬ শক, পৃঃ ১৬১

৫৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৭৭ শক, পৃঃ ১০

৫৭. আত্মজীবনী (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ১৩৬

৫৮. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (শতবার্ষিকী সংস্করণ) দশম খণ্ড, পৃঃ ২৭২; এটি স্বামীজীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তরূপেই গ্রহণীয়। মীমাংসা সম্মত বেদের অভ্রান্ততাবাদের সপ্রশংস ব্যাখ্যা বা উল্লেখ তিনি বহুস্থলে করেছেন। কিন্তু তাঁর মত প্রখর মনীষাসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে যুক্তিকে সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব ছিল না। এ কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামীজী বিশুদ্ধ জ্ঞানপন্থী শংকর ও তৎশিষ্য রামমোহনের মত বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে তার কর্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

রামমোহন রায় ও বেদান্ত

ভারতবর্ষে উদ্‌ভাবিত দর্শনপ্রস্থানসমূহের মধ্যে বেদান্ত এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা সম্পর্কে সাধারণভাবে অবশ্য একথা বলা যায়, তা কেবলমাত্র বুদ্ধি আশ্রয়ী বিচার-বিতর্কের পথে বিকশিত হয় নি। এক হিসাবে প্রতিটি ভারতীয় দর্শনই মোক্ষশাস্ত্র; তার তত্ত্বগুলি যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেই সে দর্শন অনুশীলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সেগুলিকে সাধনার দ্বারা জীবনে প্রতিফলিত করে তার নির্দেশে পরমপুরুষার্থলাভ শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ লক্ষ্য বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু এর মধ্যেও বেদান্তদর্শন কিছু বিশেষ অর্থে মোক্ষশাস্ত্র। বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে এর যোগ অতি নিবিড়। ভারতবর্ষীয় ধর্মচিন্তা ও ধর্মসংগঠনের ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে, যখনই যে সম্প্রদায় প্রভাবশালী হয়েছে তখনই তা প্রয়োজনমত বেদান্তমতকেই সাম্প্রদায়িক রঙে রঞ্জিত করে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে ও প্রতিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিয়েছে। ঐ-সকল ক্ষেত্রে সাধারণত যে প্রণালী অবলম্বন করা হত তা হল সম্প্রদায়ের বিশেষপূজ্য দেবতার সঙ্গে বেদান্তের মূল তত্ত্ব পরব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন। বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়দ্বয়ের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বেদান্তদর্শনের প্রধান গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের যে-সব সাম্প্রদায়িক ভাষ্য রচিত হয়েছিল সেগুলিকে এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন গণ্য করা যেতে পারে।[১] আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পর্কেও সেই একই কথা। প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের অধিকাংশের সাধনার দার্শনিক ভিত্তি ও অবলম্বন কোনও না-কোনও আকারে বৈদান্তিক চিন্তা। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই জনৈক বিদেশী ধর্মযাজক রেভারেণ্ড জে. টাইস্‌হুল ডেভিস বলেছিলেন : "...no great soul has appeared in India during the last 3000 years that has not accepted the call of the teaching of the Vedanta, the spirit of the oldest and the most enduring religious philoso-

phy based not on speculation but on real experience and summed up in three words—*Tat tvam asi*, Thou art Brahman।"[২] এই উক্তির মধ্যে হয়তো কিছুটা আতসরল একদেশদর্শিতা আছে, কিন্তু এর মূল বক্তব্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আধুনিক যুগের সূচনায় যখন ধর্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল তখন স্বভাবত ভারত-বর্ষীয় ধর্মজগতের এই চিরাচরিত ঐতিহ্য উপেক্ষিত হয় নি। ধর্মপ্রবক্তারূপে রামমোহন রায় যে মুখ্যত বেদান্তকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছিলেন তার নিগূঢ় অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। সমকালীন দেশকালগত পটভূমিকায় তাঁর বেদান্ত-অনুশীলন ও সমগ্র চিন্তাধারায় বৈদান্তিক আদর্শের স্থান ও প্রভাব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

বেদান্তশাস্ত্রের মূল বৈদিক সাহিত্যের উপনিষদ্‌ভাগ যা শ্রুতির মধ্যে গণ্য। এর অপর দুখানি চিরস্মরণীয় গ্রন্থ ভগবদ্‌গীতা ও বাদরায়ণ কৃত ব্রহ্মসূত্র, যেগুলি স্মৃতিপর্যায়ভুক্ত হলেও ঔপনিষদতত্ত্বের ধারক-বাহকরূপে শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে অত্যুচ্চস্থানের অধিকারী। এই তিন অঙ্গ একত্র মোক্ষশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয় নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণ্যদর্শনের আত্মজ্ঞানতত্ত্ব প্রধানত এগুলিকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছিল। এই আত্মতত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রে রামমোহন যে হিন্দুদের পৃথিবীর সর্বাধিক অগ্রসর জাতি মনে করতেন এ বিষয়ে অন্তত দুটি সুনিশ্চিত সাক্ষ্য আছে। ফ্রান্সের অন্তর্গত ব্লোয়ার বিশপ আব্বে গ্রেগোয়ারের নিকট তিনি এক সময়ে বলেন, হিন্দু তত্ত্ববিদ্যার সমতুল্য কোনও কিছু তিনি ইউরোপীয় দর্শনে দেখতে পান নি (he has found nothing in European books equal to the scholastic philosophy of the Hindus)।[৩] দ্বিতীয়ত রামমোহনের অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের মৃত্যুর পর যে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে দেখা যায়, হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় ধর্মদ্বয়ের কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর, একদা চন্দ্রশেখরের এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন তাঁকে বলেন: "The Hindus seem to have made greater progress in sacred learning than the Jews, at least when the Upanishads were written...If religion consists of the blessings of self-knowledge and improved notions of God and his attributes and a system of morality holds a subordinate place, I

certainly prefer the Vedas।"[8] মনে রাখতে হবে 'বেদ' অর্থে রামমোহন তাঁর রচনার সর্বত্র বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্‌ভাগকে বুঝেছেন— যা বেদান্তদর্শনের প্রতিষ্ঠাভূমি। সুতরাং বিবিধধর্মশাস্ত্রদর্শী রামমোহনের মনে যে বৈদান্তিক তত্ত্ববিদ্যার তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রত্যয় ছিল ও তার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এ কথা স্বচ্ছন্দে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক তাঁর সুবিখ্যাত পত্রে বেদান্তদর্শন সম্পর্কে রামমোহন যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্বভাবত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। উক্ত পত্রের একস্থানে তিনি বলেছেন: "Neither can such improvement arise from such speculations as the following, which are themes suggested by the Vedant: In what manner is the soul absorbed into the deity? What relation does it bear to the divine essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence: that as father, brother, etc. have no real entity they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better।"[9] রামমোহনের এই বিখ্যাত উক্তিটিকে সম্ভবত ভুল বুঝে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন রামমোহন বেদান্ত সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধাবান ছিলেন না এবং এই দর্শনপ্রস্থানকে আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রমে স্থান পাবার অনুপযুক্ত মনে করতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পত্রাংশটি উদ্‌ধৃত করে মন্তব্য করেছেন: "বেদান্ত সম্বন্ধে রামমোহনের এই মতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। একেশ্বরবাদ ও নিরাকার উপাসনার পরিপোষক বলিয়াই তিনি বেদান্তপ্রচারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই পত্রে উল্লিখিত বেদান্ত দর্শনের আলোচিত বিষয়গুলি তাঁহার রচিত বেদান্তসার পুস্তকে স্থান পায় নাই।"[10] বেদান্ত সম্পর্কে রামমোহনের পূর্বাপর সকল উক্তি ও চিন্তার সাধারণ পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে ঐ পত্রাংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে, এমন-কি, সমগ্র পত্রখানি থেকে উক্ত কয়েক পঙ্‌ক্তিকে পৃথক করে বিচার করলে আপাতদৃষ্টিতে এই ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। দুঃখের বিষয় ব্রজেন্দ্রনাথ এখানে পত্রখানির সমগ্র

বক্তব্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে রামমোহনের বিশেষ উক্তির বিচার করেন নি, অথবা বেদান্ত সম্পর্কে রামমোহনের আনুপূর্বিক সমগ্র চিন্তাধারার সঙ্গে সেটিকে মিলিয়ে নেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে আমহার্স্ট‌কে লিখিত পত্রে রামমোহন মধ্যযুগের ভারতীয় ও আধুনিক পাশ্চাত্য—এই দুটি পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক শিক্ষাপদ্ধতির তুলনাপ্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্যালয়ে মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য প্রচলনের অনুপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ উক্ত পদ্ধতিগত সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং বেদান্ত, মীমাংসা ও ন্যায়দর্শন শিক্ষার উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—প্রাচীন টোল-চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীর রূপায়নের জন্য সরকারি অনুমোদন ও অর্থানুকূল্যে কলিকাতায় সরকার-প্রস্তাবিত নূতন সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করবার কোনও আবশ্যকতা নেই, কেননা দেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত এই জাতীয় বিদ্যায়তন দেশে যথেষ্ট রয়েছে; আর আধুনিক যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শ ব্যতীত নিছক প্রাচীন পদ্ধতিগত শিক্ষা দেশকে প্রগতির পথে চালিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ইংলণ্ডের ইতিহাসে সংঘটিত শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিক রূপান্তরের তুলনা দিয়ে উক্ত পত্রে এই মর্মে তিনি বলেছেন: "If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sangscrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British Legisla ture।"[৭] এখানে স্পষ্টত একটি নূতন যুগোপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেটির পাঠক্রম কোন্ কোন্ বিষয়ে রচিত হলে দেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে রামমোহন পত্রে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন: "But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embrac'ng mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy with other useful sciences which may be accomplished with

the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus।"[৮] সুতরাং প্রস্তাবিত সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পরিবর্তে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উপযোগী অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার সংবলিত একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। এই নূতন 'কলেজ' স্থাপনের মাধ্যমে প্রাচীন, প্রথাবদ্ধ, আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সংগতিহীন শিক্ষা-পদ্ধতির পুনঃ-সম্প্রসারণ ঘটুক, সেটা তিনি চান নি। মনে রাখতে হবে তিনি যার বিরোধিতা করেছেন তা হল তাঁর ভাষায় 'the Sangscrit system of education' বা টোল-চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত সনাতন রীতি সম্মত সংস্কৃত শিক্ষা-প্রণালী, যেখানে কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কাল নির্দিষ্ট ছিল দ্বাদশ বৎসর এবং বেদান্তাদি দর্শন শিক্ষা দেওয়া হত আধুনিক জীবনের নূতন প্রয়োজন ও মূল্যজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না রেখে। তাঁর সমালোচনা যে মুখ্যত পদ্ধতির, বিষয়বস্তুর নয়, তা প্রমাণিত হয় ঐ পত্রেরই অংশবিশেষ থেকে যেখানে তিনি আমহার্স্ট্‌কে জানিয়েছেন, সংস্কৃত ভাষা ও সে-ভাষায় সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের উপযুক্ত সংরক্ষণ ও প্রসার হতে পারবে—নূতন সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে নয়—দেশের টোল-চতুষ্পাঠীগুলিকে ও সেখানে অধ্যাপনারত প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যার ধারক-বাহক বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীকে মুক্ত হস্তে সরকারি অর্থসাহায্যদানের মাধ্যমে ("But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the valuable information it contains, this might be much more easily accomplished by other means than the establishment of a new Sangscrit College; for there have been always and are now numerons professors of Sangscrit in the different parts of the country, engaged in teaching this language as well as the other branches of literature, which are to be the object of the new Seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted by holding out

premiums and granting certain allowances to the most eminent Professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertions")।[৯] সংস্কৃতবিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে ও তার সংরক্ষণ ও অনুশীলনকে প্রয়োজনীয় মনে না করলে এমন প্রস্তাব করা রামমোহনের পক্ষে সম্ভব হত না। অতএব দেখা যাচ্ছে শিক্ষা-বিষয়ে রাষ্ট্রশক্তির নিকট তাঁর প্রত্যাশা ছিল দুটি: সরকারি সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও সেইসঙ্গে দেশের প্রচলিত প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতিকে তার নিজস্ব কেন্দ্রসমূহে প্রাণবন্ত রাখবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। তিনি মনে করেছিলেন, এই দ্বিমুখী উদ্যমের ফলে প্রাচীন ও নবীন জীবনবোধ ও মূল্যজ্ঞানের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে। দ্বিতীয়ত, বেদান্তদর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলি রামমোহন তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে আলোচনা করেন নি, তাঁর মন্তব্যের এই অংশের দ্বারা ব্রজেন্দ্রনাথ সম্ভবত প্রমাণ করতে চেয়েছেন, রামমোহন সেগুলি অশ্রদ্ধেয় জ্ঞানে বর্জন করেছিলেন। ইঙ্গিতটি কিছু আশ্চর্য লাগে, কারণ রামমোহনের সংস্কৃত-বাঙলা গ্রন্থাবলীর (বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) অন্যতম সম্পাদক হিসাবে তাঁর না জানবার কথা নয় যে 'বেদান্তসার' রামমোহনের বৃহত্তর ও বিস্তীর্ণতর পূর্বরচনা 'বেদান্ত-গ্রন্থে'র সংক্ষিপ্তসার মাত্র, তাতে সাধারণের জন্য বেদান্তের কয়েকটি নির্বাচিত ও সরল প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এ-গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস ও আলোচনা পূর্ণাঙ্গ বা বিস্তারিত নয়, তা হবার কথাও নয়। অপরপক্ষে পূর্বোক্ত পত্রোল্লিখিত বিষয়গুলি যথা, পরমাত্মা-জীবাত্মার পরস্পর-সম্পর্ক, মায়াতত্ত্ব ইত্যাদি, রাম-মোহনের বেদান্তবিষয়ক মূল পূর্ণাঙ্গ রচনা 'বেদান্তগ্রন্থে' যথোচিত গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারেই আলোচিত হয়েছে—অনাবশ্যক বা অশ্রদ্ধেয় বলে বর্জিত হয় নি। উপনিষৎ-পঞ্চকের অনুবাদে ও 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (ও তার ইংরেজি সংস্করণ Brahmunical Magazine) পত্রেও স্থানে স্থানে প্রসঙ্গগুলি উত্থাপিত ও আলোচিত হতে দেখা যায়। বর্তমান অধ্যায়ে যথাস্থানে সে-সবের বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজন হবে। সুতরাং রামমোহনের 'বেদান্তসার' পুস্তকে বেদান্তের কয়েকটি প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত, এই যুক্তিতে রামমোহন বেদান্তের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন না এমন প্রমাণ করা অসম্ভব।

স্বয়ং গ্রন্থরচনার মাধ্যমে বেদান্তমতের প্রচার ও প্রসার ভিন্ন রামমোহন যে নিজব্যয়ে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করে বেদান্তশিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিও স্মরণে রাখা কর্তব্য। রামমোহনের পত্রে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কলিকাতায় সরকারি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে। সম্ভবত এর অল্পকাল পরেই, তিনি নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় একটি বেদান্ত-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। রামমোহনের ইংরেজ জীবনীকার এই সম্পর্কে রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্য পাদ্‌রী উইলিয়ম অ্যাডামের ২৭ জুলাই, ১৮২৬ তারিখে লিখিত এক পত্রের অংশ উদ্‌ধৃত করেছেন: "Rammohun Roy has latey built a small but very neat and handsome college which he calls the Vedanta College, in which a few youths are at present instructed by a very eminent Pandit, in Sanskrit literature with a view to the propagation and defence of *Hindu* Unitarianism. With the institution he is also willing to connect instructions in European science and learning and in Christian Unitarianism, provided the instructions are conveyed in the Bengali or Sanskrit language।"[১০] অ্যাডাম-প্রদত্ত এই সংবাদটি একাধিক কারণে বিশেষ মূল্যবান। প্রথমত এটি এক হিসাবে আমহার্স্ট্‌কে লিখিত পত্রের অন্তর্ভুক্ত বেদান্তশিক্ষাবিষয়ক রামমোহনের মতের পরিপূরক। এই বেদান্তবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাই প্রমাণ করে রামমোহন বেদান্তদর্শন সম্পর্কে অশ্রদ্ধাযুক্ত তো ছিলেনই না বরং বেদান্তের অনুশীলন ও প্রচারে তাঁর এতদূর আগ্রহ ছিল যে তার চর্চার জন্য তিনি একক উদ্যমে ও অর্থব্যয়ে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে পর্যন্ত অগ্রণী হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত অ্যাডামের বর্ণনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁর বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ শিক্ষা-দানের একটি নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল। এর সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের শিক্ষা যুক্ত করতে চেয়েছিলেন; অধিকন্তু তাঁর এ ইচ্ছাও ছিল যে এই সমগ্র শিক্ষার বাহন হবে সংস্কৃত অথবা বাংলা ভাষা। সরকারি কর্তৃপক্ষকে লিখিত পত্রে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার দ্বিধারার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত যে অনুরোধ তিনি করেছেন—তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠান

বেদান্ত-বিদ্যালয়ের পাঠক্রমনিরূপণের মধ্যে সেই সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অ্যাডামের পত্রে প্রকাশিত তথ্যটিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে সরকারি সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে বিকীরিত প্রাচীন পদ্ধতিগত সংস্কৃত-শিক্ষা ও রামমোহন-পরিকল্পিত আধুনিক যুগোপযোগী শাস্ত্রানুশীলন-পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্যটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও প্রাচীন পদ্ধতির কেন্দ্রস্বরূপ সরকারি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতি রামমোহনের বিরূপতার কারণটিও স্পষ্ট হয়। সুতরাং আনুপূর্বিক আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত করতে বাধা নেই, বেদান্ত সম্পর্কে উচ্চ ও সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করেই রামমোহন এই শাস্ত্রের অনুশীলনে ব্রতী হন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের বেশ কিছুকাল পূর্ব হতেই নিশ্চয় তাঁর বেদান্তচর্চা আরম্ভ হয়েছিল; কেননা কলিকাতা থেকে ঐ বৎসরই তাঁর বেদান্তবিষয়ক প্রথম ও প্রধান কীর্তি 'বেদান্তগ্রন্থ' ও সম্ভবত এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'বেদান্তসার'ও প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগে বেদান্তচর্চা ও বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের প্রসার সম্পর্কে তাঁর যে এক সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল, বেদান্তবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও এর বিশিষ্ট পাঠক্রম-নির্মাণ-প্রয়াস তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রামমোহন তাঁর প্রকাশ্য বেদান্তচচা আরম্ভ করেন। তার পূর্বে বাংলা দেশের সারস্বত সমাজে বেদান্তের অনুশীলন বা অধ্যাপনার প্রসার কতদূর ছিল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সহজ নয়। এক সময়ে এমন একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে প্রাক্-রামমোহন কালের বঙ্গীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণের প্রতিভা প্রধানত ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রদ্বয়কে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছিল—বেদান্তশাস্ত্রে তাঁরা যে কেবল অনধিকারী ছিলেন তা নয়, এ শাস্ত্র তাঁদের অনেকের নিকট ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত, এমন-কি, অশ্রুতপূর্ব। রামমোহন সম্পর্কে তাঁর এক ভাষণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ইঙ্গিত করেছেন: "যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্‌ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন-সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য করতে কুণ্ঠিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদ্‌কে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন…।"[১১] রামমোহনের সমকালীন প্রতিপক্ষগণের গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করলে কিন্তু মনে হয় না বেদান্ত সম্পর্কে তাঁদের সকলের অজ্ঞতা সর্বদা এতদূর গভীর ছিল। তাই এই বিষয়ে

সমসাময়িক তথ্যপ্রমাণগুলি একবার যাচিয়ে দেখা আবশ্যক। শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের পাদ্রী উইলিয়ম কেরী ও যোশুয়া মার্শম্যানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী উইলিয়ম ওয়ার্ড্‌ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দুদের শাস্ত্র, ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণ সম্পর্কে যে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন তাতে তিনি তৎকালীন বাংলার টোল-চতুষ্পাঠীগুলিতে প্রচলিত সংস্কৃতশিক্ষার একটি চিত্র তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন। ওয়ার্ড্‌ বলেন, বেদান্তের প্রকৃত চর্চা ও অধ্যাপনা হত কাশীতে— বঙ্গীয় পণ্ডিতদের বেদান্ত-জ্ঞান ছিল সামান্য (At Benares, the meemangsu, shankhyu, vadantu patunjulu voishashiku shastrus and the Vadus are taught more or less, but the Bengal pundits know only scraps of these things.)।[১২] টোলের পাঠক্রমের মধ্যে বেদান্ত-শিক্ষার্থীদের আনুপাতিক সংখ্যানিরূপণের কিছু চেষ্টাও ওয়ার্ড্‌ করেছিলেন এবং অনুসন্ধানের ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা এই : "Amongst one hundred thousand bramhuns there may be one thousand or thereabouts who learn the grammar of the Sungskritu Of this one thousand bramhuns who have learnt the Sungskritu language, four hundred or five hundred may read some parts of the Kavyu shastrus, and fifty some parts of the ulunkaru shastrus. Four hundred of this thousand may read some of the smritees. Of this one thousand persons ten persons may read parts of the tuntrus. Three hundred out of this one thousand brahmuns may read parts of the nyayu shastrus. Out of one thousand persons who learn the Sungskritu, five or six may read parts of the meemangsu shankyu, vadantu, patunjulu, voishashiku shastrus and the vadus।"[১৩] অর্থাৎ এক হাজার সংস্কৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়পড়তায় যেখানে কাব্যের ছাত্র ৪০০।৫০০, অলংকারের ছাত্র ৫০, স্মৃতির ৪০০, তন্ত্রের ১০, ন্যায়ের ৩০০, সেখানে বেদ-বেদান্ত-মীমাংসা-সাংখ্য-পাতঞ্জল (যোগ)-বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্রগুলি মিলিয়ে ছাত্রের সংখ্যা পাঁচ অথবা ছয়। তদানীন্তন বাঙ্‌লার

টোলগুলিতে বেদান্তের এই স্বল্পসংখ্যক ছাত্রকে কোন্ কোন্ গ্রন্থ অধ্যয়ন করানো হত সে প্রসঙ্গে ওয়ার্ড্ বলেছেন : "The original work of Vadu-vyasu is called Sareeriku-sootru. The other works at present read in Bengal are the following viz. Sareerika-bhashyu, Bachus-putee, Kulputuroo, Purimulu, Bibburunu, Vartiku, Vadantu-puribhasha, Siddhantu lasu, Siddhantu-vindoo and Punchu-dushee. The second and the sixth of the above books are commentaries on the work of Vadu-vyasu. The rest are compilations from the Vadantu।"[১৪] সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনামগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বেদান্ত-অধ্যাপনার বিষয় ছিল বাদরায়ণ (বা ব্যাস)-কৃত ব্রহ্মসূত্র যার অপর নাম শারীরকসূত্র ; শংকর-কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (বা শারীরক-ভাষ্য); উক্ত ভাষ্যের উপর বাচস্পতি মিশ্র রচিত 'ভামতী' টীকা ; অমলানন্দ রচিত ভামতীর টীকা 'কল্পতরু' ; অপ্পয়দীক্ষিত রচিত কল্পতরুর টীকা 'পরিমল' ; সম্ভবত প্রকাশাত্মন্ রচিত পদ্মপাদাচার্যের 'পঞ্চপাদিকা'র টীকা 'পঞ্চপাদিকা-বিবরণ' অথবা তদবলম্বনে বিদ্যারণ্য রচিত 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ'[১৫] ; শংকরাচার্যের বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্-ভাষ্যের উপর সুরেশ্বর রচিত 'বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্-ভাষ্য-বার্তিক' ; ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের 'বেদান্তপরিভাষা' : অপ্পয়-দীক্ষিত রচিত 'সিদ্ধান্তলেশ' ; মধুসূদন সরস্বতী রচিত 'সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দু' বা 'সিদ্ধান্তবিন্দু' ; ও বিদ্যারণ্য-কৃত 'পঞ্চদশী'। লক্ষ্য করবার বিষয় অধ্যেতব্য গ্রন্থনিচয়ের সব কথানিই শংকরাচার্য-ব্যাখ্যাত নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের পরিপোষক। এর মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের শাংকর ভাষ্য (তালিকাভুক্ত দ্বিতীয় গ্রন্থ) ও সুরেশ্বর-প্রণীত বৃহদারণ্যকোপনিষদের শাংকর ভাষ্যের বার্তিক (তালিকাভুক্ত ষষ্ঠ গ্রন্থ)-কে যথাক্রমে ব্যাসের নামে প্রচলিত মূল বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আলোচনা বলা চলে। অপর গ্রন্থগুলিতে (এমন-কি ভামতী, কল্পতরু, পরিমল প্রভৃতি টীকাজাতীয় রচনাতেও) নির্বিশেষ অদ্বৈততত্ত্ব অনেকটা স্বাধীন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ওয়ার্ড্ পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিপূরক অপর এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৮১৫-১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে তৎকালীন বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যত্র অবস্থিত সংস্কৃতশিক্ষার প্রধান কেন্দ্রসমূহের এক তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং বাংলার নবদ্বীপ, কলিকাতা, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, কুমারহট্ট,

ভাটপাড়া, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, জয়নগর, মজিলপুর, আন্দুল, বালী প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত চতুষ্পাঠীসমূহের অনেকগুলির পাঠ্যসূচীরও উল্লেখ আছে। তদনুসারে দেখা যায়, নবদ্বীপে অধ্যয়নের বিষয়— ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ; কলিকাতার সর্বসমেত আটাশটি শিক্ষাকেন্দ্রে ন্যায় ও স্মৃতি; বাঁশবেড়িয়া, গোন্দলপাড়া ও ভদ্রেশ্বরে— ন্যায়। অন্যান্য স্থানের বিষয়ের উল্লেখ নেই। সমকালীন বাঙালী পণ্ডিতগণের মধ্যে ওয়ার্ডের মতে একমাত্র ত্রিবেণীর স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননই কিছুটা বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। অপরপক্ষে ওয়ার্ডের সাক্ষ্য অনুযায়ী সেই সময়ে কাশীতে ও অন্ধ্রদেশে বেদ-বেদান্তের বিশেষ চর্চা ছিল; কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট ও হনুমন্ত ঘাটে বেদান্ত ও মীমাংসা বিশেষরূপে অধ্যয়নের জন্য দুটি কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়।[১৬] ১৮৩৫ ও ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-বিহারের তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে উইলিয়ম অ্যাডাম কর্তৃক সংকলিত তিনটি বিবরণে বাঙ্‌লার টোল-চতুষ্পাঠীগুলির যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ওয়ার্ডের বর্ণনা থেকে কোনও অংশে পৃথক নয়।[১৭] বেদান্ত সম্পর্কে কৌতূহল ও এর ছাত্রের সংখ্যা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় তখনও নগণ্য; পাঠ্যতালিকায় কোনও পরিবর্তন নেই; এবং পূর্বের ন্যায় বেদান্তচর্চার মুখ্য কেন্দ্র তখনও কাশী। রাজশাহী জেলার এক বেদান্তের টোল সম্পর্কে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাডামের মন্তব্য: "The Vedantic school No. 70 of Table III can scarcely be said yet to exist. The Pundit after completing the usual course of study in his native district Rajsahi, to extend his acquirements went to Benares whence he had returned a month before I saw him···He had no pupils at the time of my visit to his village"।[১৮] ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে প্রকাশিত মন্‌টগোমারী মার্টিন কৃত পূর্ব-ভারতের সুবিখ্যাত সমীক্ষার সাক্ষ্যও এর সঙ্গে মেলে। দিনাজপুর জেলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মার্টিন বলছেন: "There is no Bedanto Pandit in Dinajpoor. It is indeed alleged that there was none in Bengal until of late, when some learned men were brought from Benares by a rich Kayostho of Calcutta (Nobokrishno or Nobokissen) who had acquired a large

fortune in the service of Lord Clive।"[১৯] রংপুর, ও বাঙলার প্রান্তবর্তী বিহারের পুর্ণিয়া জেলা সম্পর্কেও মার্টিনের সিদ্ধান্ত অনুরূপ।[২০] কলিকাতায় ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্কৃত কলেজে প্রথম থেকেই একটি বেদান্ত-শ্রেণীর প্রবর্তন করা হয়েছিল; কিন্তু ছাত্রাভাবে ১৮৪২ সালে কর্তৃপক্ষ সেটি উঠিয়ে দিতে বাধ্য হন।[২১] অতএব দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত তথ্যাবলী একটি সাধারণ সিদ্ধান্তকেই নির্দেশ করছে যা এই: উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার পণ্ডিতসমাজে বেদান্তের পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ অপ্রচলিত না থাকলেও ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চার তুলনায় এর পরিমাণ ছিল নগণ্য; বেদান্ত সম্পর্কে কৌতূহল বা বেদান্ত পাঠে আগ্রহ সংস্কৃতশিক্ষার্থিগণের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যেত; উত্তর-ভারতে বেদান্ত-শিক্ষার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল কাশী; বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত ক্ষীণ বেদান্তচর্চা ও বেদান্তাধ্যাপনা মুখ্যত শাংকর অদ্বৈতবাদকেই অবলম্বন করেছিল; এবং মোক্ষশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে টোল-চতুষ্পাঠীতে এক ব্রহ্মসূত্রই টীকা-ভাষ্য সমেত পড়ানো হত। সভাষ্য উপনিষদ্-গীতা পাঠ্যতালিকার প্রায় বহির্ভূত ছিল।

পূর্বোক্ত প্রচলিত ধারণার সঙ্গে এই চিত্রের সামঞ্জস্য কতখানি? দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের সমকালীন বাংলার প্রথাগত সংস্কৃত পাণ্ডিত্য মুখ্যত বিকাশ লাভ করেছিল কাব্য, অলংকার, ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রকে অবলম্বন করে; বেদান্তপাঠে ছাত্রসমাজের আগ্রহ ও ঐ শাস্ত্রের অনুশীলন এবং অধ্যাপনার পরিমাণ ছিল সে তুলনায় অতি সামান্য; টোল-চতুষ্পাঠীতে তার যেটুকু ক্ষীণ অস্তিত্ব ওয়ার্ড, অ্যাডাম বা মার্টিনের বর্ণনা থেকে অনুভব করা যায় তাও ছিল এক বিশেষ ধারাশ্রয়ী। অপরপক্ষে এমন উক্তি নিঃসংশয়ে অতিরঞ্জন যে শাস্ত্রবিচারের ক্ষেত্রে রামমোহনের সমস্ত প্রতিপক্ষই বেদান্তশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। এঁদের মধ্যে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যে, গভীরভাবে না হলেও, বেদান্তসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে রামমোহন-রচিত 'বেদান্তগ্রন্থ'এর উত্তরস্বরূপ প্রকাশিত তাঁর 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র পৃষ্ঠায়।[২২] আদৌ রামমোহনের প্রতিপক্ষ, উত্তরকালে তাঁর মতানুবর্তী শিষ্য উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে উপনিষদ্ পাঠ করতেন। রামমোহন স্বয়ং 'কবিতাকারের সহিত বিচার' গ্রন্থে বলেছেন: "আমরা ঈশ,

কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য ঐ দশোপনিষদের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঁচ উপনিষদের ভাষাবিবরণ করিয়াছি…সেই সকল ভাষাবিবরণের পুস্তক শত শত এই নগরে এবং এতদ্দেশে পাওয়া যাইবেক এবং ঐ সকল মূল উপনিষদ্ ও আচার্যের ভাষ্য এবং বেদান্তদর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের বাটিতে এবং কালেজে ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে তাহা দৃষ্টি করিলে বিজ্ঞলোক জানিতে পারিবেন বেদের স্থান স্থানের বিপরীত অর্থকে ও বেদান্তদর্শনের বিপরীত সূত্রকে ভাষায় বিবরণ করা গিয়াছে কিম্বা সম্পূর্ণ উপনিষদ্ সকলের ও বেদান্তদর্শনের অর্থ করা গিয়াছে।"[২৩] রামমোহনের সমকালে বাঙলাদেশে অতি ক্ষীণভাবে হলেও বেদান্তচর্চার যে অস্তিত্ব ছিল এই উক্তিই তার প্রমাণ। তবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। 'কবিতাকার'এর প্রতি প্রদত্ত রামমোহনের উত্তরের শেষাংশ থেকে মনে হয় কবিতাকার এমন একটা অভিযোগ তুলেছিলেন যে রামমোহন উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনের নাম করে যা প্রচার করেছেন তা প্রকৃত উপনিষদ্ বা বেদান্ত নয়—অনেকাংশে কল্পিত বা কৃত্রিম শাস্ত্র। দুর্ভাগ্যবশত 'কবিতাকার'এর পরিচয় জানা যায় নি বা রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রকাশিত তাঁর মূল পুস্তকের সন্ধানও মেলে নি। তা ছাড়া 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের অভিযোগ ছিল রামমোহন-প্রচারিত শাস্ত্রসমূহ 'স্বকপোলকল্পিত'; যার উত্তরে রামমোহনকে বলতে হয়েছিল: "প্রণব কি স্বকপোলকল্পিত হয়েন? কি গায়ত্রী ও দশোপনিষৎ, বেদান্ত, যাহা আমাদের উপাসনীয় হইয়াছেন, তাহা স্বকপোলকল্পিত হয়েন? ও বেদান্তদর্শন ও মনুস্মৃতি ও ভগবদ্গীতা ও প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারধৃত বচন সকল, যাহা ব্যতিরেক অন্য কোন বচন কোন স্থানে আমরা লিখি না, সেই সকল শাস্ত্র কি স্বকপোল কল্পিত হয়েন?"[২৩ক]

সে-যুগে যে অল্প পরিমাণ বেদান্তচর্চার অস্তিত্ব ছিল সেটুকুও এর ধারক-বাহক পণ্ডিতবর্গের রক্ষণশীল গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য জাতির কোনও বৃহৎ কল্যাণসাধনে ব্যবহৃত হতে পারে নি। এই পণ্ডিতগণ বেদান্তকে সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় গণ্ডিবদ্ধ করে রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙলা প্রভৃতি প্রচলিত লৌকিক ভাষায় এই মোক্ষশাস্ত্রের অনুবাদ বা সাধারণের মধ্যে তার প্রচারের তাঁরা ছিলেন ঘোর বিরোধী। রামমোহন কর্তৃক বাঙ্লা, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমে বেদান্ত-প্রচারকে বিদ্রূপ করে মৃত্যুঞ্জয়

বিদ্যালঙ্কার তাঁর 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'তে বলেছেন : "তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীদের হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান এই লৌকিক গাথার ন্যায় যে যে অসত্তপদেশ তাহাতে আস্থা করিয়া অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়ে নষ্ট হইবে না।"[২৪] অন্যত্র তাঁর উক্তি আরও স্পষ্ট : "...শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরী ফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্ন উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেই পরাঙ্মুখ হন।"[২৫] রামমোহন-প্রতিপক্ষ 'কবিতাকার' এমন হাস্যকর অভিযোগও করেছিলেন যে রামমোহন কর্তৃক বেদান্ত-উপনিষদ্ বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশের ফলে দেশে ব্যাপকভাবে অমঙ্গল, মন্বন্তর ও মারীভয় উপস্থিত হয়েছে।[২৬] পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সংস্কৃত ও বাঙ্‌লার মাধ্যমে বেদান্তশিক্ষার যে ব্যবস্থা রামমোহন তাঁর বেদান্ত-বিদ্যালয়ের মাধ্যমে করেছিলেন এবং বাঙ্‌লা ও হিন্দুস্থানী অনুবাদের মাধ্যমে ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্ ও গীতার তত্ত্ব যেভাবে সাধারণের মধ্যে পরিবেশন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন সেই নির্ভীক, মুক্ত, উদার দৃষ্টির সঙ্গে পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণের রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের কী দুস্তর প্রভেদ! এই কারণেই রামমোহনের দ্বারা আধুনিক যুগে জাতির ভাবজীবনে বেদান্তের সময়োপযোগী নবজন্ম সম্ভবপর হয়েছিল আর তাঁর সমকালীন বিরুদ্ধপক্ষীয় পণ্ডিতগণের বেদান্তজ্ঞান আপনাকে প্রমাণ করেছিল বন্ধ্যা।

উত্তর-ভারতের তৎকালীন বেদান্তচর্চার প্রধানতম কেন্দ্র কাশীতে যে রামমোহনের বেদান্তচর্চার সূত্রপাত এই প্রচলিত ধারণায় সন্দেহ করবার বিশেষ কোনও কারণ দেখা যায় না। তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ একেশ্বরবাদী (unitarian) পাদ্রী অ্যাডাম ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে মন্তব্য করেছিলেন, রামমোহন সর্বসাকুল্যে দশ বা বার বৎসর কাশীতে অবস্থান করেন।[২৭] এই ধারণা ভ্রান্ত। রামমোহনের বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার নথিপত্র থেকে প্রমাণিত হয়, সম্ভবত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাটনা, কাশী প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলে যাবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন। কারও কারও মতে ১৮০০ বা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অল্প সময়ের জন্য একবার ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এর কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নেই। অপর পক্ষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে কাশীতে কর্মরত ছিলেন

কিছু সমসাময়িক স্থানীয় নথিপত্রের সাহায্যে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।[১৮] রামমোহনের কাশীপ্রবাস অ্যাডামের অনুমান অনুযায়ী দশ বা বার বৎসর দীর্ঘ হলে তাঁর জীবনের এই পর্বভুক্ত অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য করা যায় না। কিন্তু সম্ভবত ১৭৯৯ থেকে ১৮০৩-০৪ এর মধ্যে রামমোহন বেশ কিছুকাল কাশীতে কাটিয়েছিলেন। সে-সময়ে কলিকাতা বা বাঙলাদেশের অন্যত্র বেদান্তচর্চার বিশেষ সুবিধা না থাকায় কাশীবাসকালে সেখানে এই শাস্ত্র অনুশীলনের প্রাপ্ত সুযোগ যে রামমোহন গ্রহণ করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। উত্তরকালে জীবনের রংপুর-পর্বে (১৮০৯-১৮১৫) তিনি উপনিষদ্-বেদান্তে তাঁর ব্যুৎপত্তি নিয়মিত অনুশীলনের দ্বারা গভীরতর করেছিলেন নিশ্চয়, কেননা, দেখা যায় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'বেদান্তগ্রন্থ' শীর্ষক তাঁর সুদীর্ঘ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থের প্রাথমিক রচনাপর্ব অবশ্যই রংপুরে সমাপ্ত হয়েছিল।

বৈদান্তিক ও বেদান্ত-ব্যাখ্যাতা রূপে রামমোহনের আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁর জীবনের কলিকাতা-পর্বে (১৮১৫-১৮৩০)। হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও বিচার-সম্পর্কিত তাঁর সবগুলি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছিল এই সময়সীমার মধ্যে। তার মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থনিচয়ের একটি তালিকা এখানে দেওয়া যেতে পারে :

বাঙ্লা : (১) বেদান্তগ্রন্থ (কলিকাতা, ১৮১৫); (২) বেদান্তসার (কলিকাতা, ১৮১৫ বা ১৮১৬); (৩) তলবকারোপনিষৎ (কেনোপনিষৎ), মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৬); (৪) ঈশোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৬); (৫) কঠোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৭); (৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৭); (৭) মুণ্ডকোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৯); (৮) শংকরাচার্য কর্তৃক রচিত বলে অনুমিত 'আত্মানাত্মবিবেক', মূল ও বঙ্গানুবাদ (কলিকাতা, ১৮১৯)।

হিন্দুস্থানী : (১) বেদান্তগ্রন্থ (এই নামের পূর্বোক্ত বাঙলা গ্রন্থের হিন্দুস্থানী অনুবাদ) (কলিকাতা, ১৮১৫); (২) বেদান্তসার (ঐ নামের পূর্বোক্ত বাঙলা গ্রন্থের হিন্দুস্থানী অনুবাদ) (কলিকাতা, ১৮১৫ বা ১৮১৬)।

ইংরেজি : (২) Translation of an Abridgment of the Vedant ('বেদান্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদ) (Calcutta, 1816) ; (২) Translation of the Kenopanishad (Calcutta, 1816) ; (৩) Translation of the Ishopanishad (Calcutta, 1816) ; (৪) Translation of the Mundukopanishad (Calcutta, 1819) ; (৫) Translation of the Kathopanishad (Calcutta, 1819)।

জার্মান : (১) Auflosung des Wedant ('বেদান্তসার'-এর জার্মান অনুবাদ) (Jena, 1817)।

ওলন্দাজ : (১) Vertaling Van Verscheidene voername Boeken Pladtsen en Teksten van de Veddas (Kampen, 1840) ; ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিচারমূলক রামমোহনের তেরখানি পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের একটি একত্র সংস্করণ 'Translation of Several Principal Books, Passages and Texts of the Veds, and of some Controversial Works in Brahmunical Theology' আখ্যায় লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ওলন্দাজ ভাষায় সেটিরই অনুবাদ রামমোহনের মৃত্যুর পরে উপরি-উক্ত নামে কাম্পেন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রদত্ত তালিকায় এ পর্যন্ত-রামমোহনের শাস্ত্রানুবাদ ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রেণীর গ্রন্থগুলির নামই করা হয়েছে। এই পর্যায়ের রচনার মধ্যে তাঁর অধুনালুপ্ত ভগবদ্‌গীতার বাঙলা পদ্যানুবাদের নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। গীতা তাঁর নিজের অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল।[২৯] তা ছাড়া তিনি বেদান্তশাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষদের সংস্কৃত বৃত্তিসমেত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন ; ব্রহ্মসূত্রের সমগ্র শাংকর ভাষ্যও তিনি পৃথকভাবে মুদ্রিত করেন (কলিকাতা, ১৮১৮)।[৩০] রামমোহনের বাঙলা গ্রন্থাবলীর সম্পাদক রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উল্লেখ করেছেন, তিনি 'ছান্দোগ্য' ও 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ্‌দ্বয়ও (সংস্কৃত মূল অথবা অন্যগুলির ন্যায় বঙ্গানুবাদ সহ) প্রকাশ করেছিলেন,[৩১] কিন্তু এগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নি। উপরি-উক্ত রচনাসমূহের মধ্যে প্রধানত বেদান্তের তত্ত্বব্যাখ্যাতারূপে রামমোহনের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে বিভিন্ন

প্রতিপক্ষের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। সেই বিচারগ্রন্থগুলিতে রামমোহনের তর্কপ্রতিভা বিশেষরূপে পরিস্ফুট। এগুলি যেন তাঁর সমগ্র বেদান্ত-আলোচনার তর্কপাদ। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে সংস্কৃতে ও বাঙলায় অন্তত চারটি উল্লেখের দাবি রাখে, যথা ১. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (কলিকাতা, ১৮১৬-১৭); ২. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (কলিকাতা, ১৮১৭); ৩ গোস্বামীর সহিত বিচার (কলিকাতা, ১৮১৮); ও ৪ কবিতাকারের সহিত বিচার (কলিকাতা, ১৮২০)। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর প্রধান দুখানি গ্রন্থ ১. A Defence of Hindoo Theism in reply to the attack of an advocate for Idolatry, at Madras (কলিকাতা, ১৮১৭); ও ২. A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds in reply to an apology for the present state of Hindoo Worship (কলিকাতা, ১৮১৭)। এই গোত্রভুক্ত আরও কয়েকখানি বাঙলা-ইংরেজি পুস্তক-পুস্তিকা আছে, তবে আলোচ্য প্রসঙ্গে সেগুলির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প। প্রয়োজনমত সেগুলি যথাস্থানে উল্লিখিত হবে। কিন্তু রামমোহন কেবলমাত্র তাত্ত্বিক বা তার্কিক ছিলেন না; বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদকে জীবনে রূপায়িত করবার প্রয়োজন তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। সুতরাং ধর্মজীবন সংগঠনের জন্য তাঁকে একটি উপাসনা-প্রণালী উদ্‌ভাবন করতে হয়েছিল। ব্রহ্মবাদের এই ব্যবহারিক দিকটি তাঁর অপর কতিপয় রচনার বিষয়, যথা, ১. গায়ত্রীর অর্থ (কলিকাতা ১৮১৮) ২. প্রার্থনাপত্র (কলিকাতা, ১৮২৩), ৩. ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (কলিকাতা, ১৮২৬), ৪. গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্ (কলিকাতা, ১৮২৭); ৫. ব্রহ্মোপাসনা (কলিকাতা, ১৮২৮); ৬. অনুষ্ঠান (কলিকাতা, ১৮২৯); ও ৭. ক্ষুদ্রপত্রী (কলিকাতা, ?)। এগুলির অনুরূপ কিছু রচনা ইংরেজিতেও আছে, যেমন ১. Humble Suggestions to his countrymen who believe in the One True God (কলিকাতা, ১৮২৩); ২. Translation of a Sanskrit Tract on different modes of Worship (কলিকাতা, ১৮২৫); ৩. A Translation into English of a Sanskrit Tract inculcating the Divine Worship; esteemed by those who believe in the revelation of the Veds as most appropriate

to the nature of the Supreme Being (কলিকাতা, ১৮২৭) ; ও ৪. The Universal Religion : Religious Instructions founded on Sacred Authorities (কলিকাতা, ১৮২৯)। দেখা যাচ্ছে, তত্ত্বব্যাখ্যা, তর্কবিচার ও সাধন—মুখ্যত এই তিন ভূমিকে আশ্রয় করে রামমোহনের বেদান্ত-আলোচনা বিস্তার লাভ করেছে। আমাদের যথাক্রমে এগুলির আলোচনায় অগ্রসর হতে হবে।

রামমোহন বেদান্ত-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন শংকর, রামানুজ প্রমুখ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বেদান্তাচার্যগণের প্রদর্শিত পথ ও ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে। এই চিরাচরিত ধারার সম্ভবত তিনিই শেষ বেদান্তভাষ্যকার। শ্রুতিপ্রামাণ্যের সম্পূর্ণ স্বীকৃতির উপরই এই ধারা প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়ে জনৈক আধুনিক মনস্বী সমালোচক যথার্থ বলেছেন : "…মহাত্মা রামমোহন রায়…একজন শাস্ত্রের অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন।…তিনি বেদ ও অন্যান্য সমুদায় শাস্ত্রের যথাযোগ্য মান্য রাখিয়া শাস্ত্রের এক চমৎকার সংক্ষেপ মীমাংসা আমারদিগকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এইক্ষণে ইওরোপীয় দর্শনকারদিগের শ্রেণীর অনেক গ্রন্থকার এ দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু রামমোহন রায় যে শ্রেণীর দর্শনকার ছিলেন, বোধ হয় শাস্ত্রপ্রিয় ভারত-রাজ্য তাঁহার অর্ণবপোতারোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে চিরকালের নিমিত্তে বঞ্চিত হইয়াছেন।"[৩২] এই বেদ-প্রামাণ্য ও আনুষঙ্গিক শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য রামমোহন কী অর্থে কতদূর স্বীকার করে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে কিছু বিস্তারিতভাবে তার বিচার করে দেখা আবশ্যক, কেননা বেদান্তমত স্থাপনে তাঁর সুবিখ্যাত পূর্বসূরিগণের মতোই তিনি শ্রুতিকে অন্যতম প্রমাণ হিসাবে বার বার উল্লেখ করেছেন।

তাঁর প্রথম জানিত রচনা আরবী-ফার্সীতে লিখিত'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওয়াহিদিন্‌'-এ (রচনাকাল আনুমানিক ১৮০৩-০৪) রামমোহন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কঠোর যুক্তিবাদিরূপে। ইসলামের যুক্তিবাদী মুতাজিলা সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় যদিও তিনি এক সার্বভৌম একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তবু কোনও প্রচলিত ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মগুরুকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন নি ; অধিকন্তু প্রত্যেক ঐতিহাসিক ধর্মের মূল সত্যের সঙ্গে কালক্রমে যে বহুল পরিমাণে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস,

অলৌকিক গাল-গল্প ও পুরোহিততন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটেছে ও ফলে ধর্মবিশ্বাসীদের ভাগ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জুটেছে প্রবঞ্চনা, নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা তা দেখিয়েছেন। কিন্তু উত্তর জীবনে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। বিভিন্ন শাস্ত্রের, বিশেষত উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা,- বেদান্তের এই প্রস্থানত্রয়ের, গভীরতর আলোচনার ফলে তিনি ক্রমশ উপলব্ধি করেন বিভিন্ন দেশকালে বিভিন্ন ঋষি ও দ্রষ্টাদের প্রজ্ঞালব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যসকল ধর্মশাস্ত্রগুলিতে সঞ্চিত হয়ে আছে; অনুভূতিমূলক এই সত্য নিছক যুক্তির অগম্য। শাস্ত্রসমূহের মধ্যে এই রত্নের পাশে অবশ্য যুগে যুগে বহু আবর্জনাও জমা হয়েছে যেগুলি সর্বথা বর্জনীয়; কিন্তু রত্নগুলিকে অবহেলা করলে চলবে না। ধর্মের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে হলে শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক সত্য ও যুক্তি, দুইয়েরই সমান প্রয়োজন—একটিকেও বাদ দেবার উপায় নেই। তাই প্রমাণ হিসাবে তিনি শাস্ত্র ও যুক্তিকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। বিচার প্রসঙ্গে নিছক শাস্ত্রনির্ভর মনোভাবের অসম্পূর্ণতা প্রতিপাদনপূর্বক তাঁকে নিম্নলিখিত বৃহস্পতি-বচন উদ্ধৃত করতে দেখা যায় :

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥[৩৩]

অপর পক্ষে সম্পূর্ণ যুক্তিতর্কের পথেও যে আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করা যায় না সে সম্পর্কেও তাঁর মনে পরবর্তীকালে কোনও সন্দেহ ছিল না। এই সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে; সংক্ষিপ্তাকারে সূত্রগুলির পুনরুল্লেখ করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাণ রয়েছে কেনোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় তাঁর এবংবিধ উক্তিতে: "When we look to the traditions of ancient nations we often find them at variance with each other; and when discouraged by this circumstance, we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is, alone, to conduct us to the object of our pursuit. We often find that, instead of facilitating our endeavours or clearing up our perplexities, it only serves to generate a universal doubt incompatible with the principles

on which our comfort and happiness mainly depend. The best method perhaps is, neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other ; but by a proper use of the lights furnished by both, endeavour to improve our intellectual and moral faculties, relying on the goodness of the Almighty Power, which alone enables us to attain that which we earnestly and diligently seek for।"[৩৪] সুতরাং রামমোহনের পরিণত মতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যের স্বীকৃতি আছে—কিন্তু সে শাস্ত্রপ্রামাণ্য হবে যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। এর সঙ্গে তিনি আর-একটি প্রমাণ স্বীকার করতেন যেটিকে তিনি বর্ণনা করেছেন common sense বা সহজ জ্ঞান বলে। শাস্ত্রালোচনা ও ধর্মসাধনার পথে তিনি এই তিনের উপযুক্ত সংমিশ্রণকেই আদর্শ মেনেছেন। ইংলণ্ডে ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সম্বর্ধনার উত্তরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি এই মত স্পষ্ট ব্যক্ত করেন : "There is a battle going on between reason, scripture and common sense, and wealth, power and prejudice. These three have been struggling with the other three ; but I am convinced that your success, sooner or later, is certain।"[৩৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে রামমোহন উত্তরকালে তাঁর প্রথম জীবনের বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ পরিত্যাগ করে শ্রুতিপ্রামাণ্য স্বীকার করলেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ এককভাবে তাকে যথেষ্ট মনে করেন নি, যুক্তি ও সহজজ্ঞানের সঙ্গে শ্রুতিলব্ধ অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যকে সমন্বিত করে নেবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আর-এক বিষয়েও এক্ষেত্রে রামমোহনের দৃষ্টি ভারতবর্ষীয় পূর্বাচার্যগণের অপেক্ষা উদার ও যুগোপযোগী ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বেদান্তাচার্যরা শাস্ত্র বলতে বুঝতেন মুখ্যত বেদকে ও গৌণত বৈদিক ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদিকে। তাঁদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের এই ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলকে কদাচ অতিক্রম করে নি। অপর পক্ষে রামমোহন অনুভব করেছিলেন, প্রজ্ঞালব্ধ আধ্যাত্মিক সত্য কদাচ কোনও বিশেষ দেশ, কাল, জাতি বা গোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি হতে পারে না ; সর্বদেশে সর্বকালে এই সত্যদ্রষ্টাগণের আবির্ভাব হয়েছে। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কেবলমাত্র বৈদিক ঋষিগণেরই ছিল এমন কথা

বলা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ও অযৌক্তিক সংকীর্ণ-দৃষ্টির পরিচায়ক; পৃথিবীর সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই এই সত্যোপলব্ধির পরিচয় আছে। তাঁর মুসলিম ও খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে আলোচনা-কালে তিনি ঐ সম্প্রদায়দ্বয়ের ধর্মশাস্ত্রগুলিকেও সমুচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন, যেমন শ্রুতিপ্রামাণ্য স্বীকার করেছেন বেদান্ত-আলোচনার বেলায়। এই অসাম্প্রদায়িক বিশ্বদৃষ্টি রামমোহনের শাস্ত্র-প্রামাণ্য-স্বীকারের বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, সর্বশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই তিনি শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানকে যুক্তি ও সহজবুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা ও মার্জনা করে নেবার উপদেশ দিয়েছেন।

রামমোহনের সুবিস্তীর্ণ রচনার মধ্যে শাস্ত্রপ্রামাণ্যকে যে ভাবে এবং যে পরিমাণে স্বীকার করা হয়েছে তার মধ্যে স্পষ্টত একটি ক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই ক্রমনির্দেশের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ ভাবে ভারতের পূর্বতন বেদান্তাচার্যগণের অনুসরণ করলেও কোনও কোনও দিকে স্বকীয়তার পরিচয়ও দিয়েছেন। শাস্ত্র-প্রামাণ্য বিচারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্ব অনুসারে যে ভাবে ভাগ করা যেতে পারে তা সম্ভবত এই :

১. বেদই সর্বাধিক প্রামাণিক এবং শাস্ত্রাদির মধ্যে যা বেদবিরুদ্ধ বা বেদার্থপ্রতিস্পর্ধী তা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। দ্বিতীয় সংখ্যা 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রে (১৮২১) তিনি স্পষ্ট বলেছেন, "গ্রন্থের মান্যামান্যের সাধারণ নিয়ম এই, যে সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ অর্থ কহে তাহা অপ্রমাণ।...হিন্দুদের পুরাণতন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন; বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে ঐ পুরাণাদির বচন অগ্রাহ্য হয়।" অতঃপর তিনি তাঁর উক্তির সমর্থনে স্মার্ত (রঘুনন্দন)-ধৃত নিম্নলিখিত বচন উদ্ধার করেছেন :

শ্রৌতস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্যং স্মার্তং বৈদিকবৎ সতা॥[৩৬]

২. রামমোহন-অবলম্বিত শাস্ত্রবিচারের দ্বিতীয় সূত্র হল, শ্রুতি বা বেদ শাস্ত্রহিসাবে সর্বাধিক প্রামাণিক হলেও বেদের জ্ঞানকাণ্ড (অর্থাৎ উপনিষদ্) তার কর্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে তিনি মুণ্ডকোপনিষদ (১.১.৫) উদ্ধৃত করেছেন : "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ; তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি; অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—বিদ্যা দুই প্রকার হয়

জানিবে ব্রহ্মজ্ঞানিরা কহেন ; এক পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা হয় ; তাহার মধ্যে ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ আর জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা হয় ; আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা অক্ষর, অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানা যায় সে কেবল বেদশিরোভাগ উপনিষদ্ হয়েন।"[৩৭] এখানে শ্রুতিপ্রমাণের সাহায্যে তিনি বলতে চেয়েছেন, বেদের যাগযজ্ঞাদি বাহ্য অনুষ্ঠান বিষয়ক ও স্বর্গাদি ফললাভ বিষয়ক উপদেশসম্পন্ন অংশগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ; এগুলি শ্রুতির ভাষায় অপরা বিদ্যা মাত্র। সেই বিদ্যাই পরা বা শ্রেষ্ঠ যার দ্বারা অক্ষর পুরুষ বা ব্রহ্মকে জানা যায়। পরা বিদ্যা বলতে উপনিষদ্‌কে বুঝতে হবে ; সুতরাং শ্রুতির অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক উপনিষদই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও মান্য। রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে বিশেষভাবে শংকরমতের দ্বারা প্রভাবিত এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। শংকর বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও তাঁর বেদান্তভাষ্যের মুখবন্ধে তাকে অবিদ্যাধীন, অধ্যাসমূলক ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী রূপে বর্ণনা করেছেন।[৩৮] উপরন্তু শংকর শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণের উপর নির্ভর করে এমনও বলেছেন যে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত কোনও একটি বিশেষ আশ্রম যিনি অবলম্বন নাও করেছেন এমন ব্যক্তিও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে রামমোহনকেও শংকরের প্রতিধ্বনি করতে দেখা যায়।[৩৯] মুখ্যত এই সমস্যা নিয়েই দক্ষিণী পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের শাস্ত্রার্থ হয়েছিল। শাস্ত্রীর বক্তব্য ছিল, বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হতে পারে না। উত্তরে, রামমোহন শাস্ত্রপ্রমাণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেন, "ইহা সর্বথা অমান্য হয়, যে বর্ণাশ্রমকর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।"[৪০] সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান যে শ্রৌত-কর্মনিরপেক্ষ হতে পারে এ বিষয়ে রামমোহন সুনিশ্চিত ছিলেন এবং শংকরের মতো এই জ্ঞানমার্গের শ্রেষ্ঠতায় দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন।

৩. রামমোহন বেদান্তব্যাখ্যায় শ্রুতিপ্রমাণপ্রয়োগপ্রসঙ্গে তৃতীয় যে সূত্র স্বীকার করেছেন তাকে শংকর-রামানুজ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের অনুসরণে বলা যেতে পারে শ্রুতির একবাক্যতা। উপনিষদ্‌গুলি বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যার মূলাধার হলেও ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে আপাতদৃষ্টিতে কিছু কিছু পরস্পর-

বিরোধী সিদ্ধান্তও বর্তমান। কোথাও বা সগুণ উপাসনা, কোথাও বা নির্গুণ উপাসনা ব্যাখ্যাত হয়েছে। কোথাও বা সৃষ্ট বস্তু বা দেবতাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র শ্রুতিকে তর্কাতীত প্রমাণ গণ্য করতে হলে এই-সব আপাত-অন্তর্বিরোধের নিরসন হওয়া আবশ্যক। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই আসে শ্রুতির একবাক্যতা স্বীকার। এই দৃষ্টিতে তত্ত্বগত ভাবে সমগ্র বেদ এক অখণ্ড ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্ত্র। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী শ্রুতি-বাক্যসমূহের মধ্যে সংগতি রক্ষা করাই এই মতাবলম্বিগণ কর্তব্য মনে করেন। শংকর তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রায় সর্বত্র নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের সমর্থনে বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের নিমিত্ত প্রভূত যত্ন করেছেন। এ ক্ষেত্রে রামমোহনের বক্তব্য ছিল, সকল বেদের প্রতিপাদ্য একমাত্র পরব্রহ্ম; শ্রুতি-বাক্যের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি নির্বাচন করে প্রাধান্য দিলে সেগুলির তাৎপর্যের সঙ্গে শ্রুতিবাক্যের সামগ্রিক তাৎপর্যের অসংগতি ঘটতে পারে। শ্রুতিসাক্ষ্যের মধ্যে এই স্ববিরোধ এড়াবার উদ্দেশ্যে রামমোহন একাধিক স্থলে বলেছেন, শ্রুতিতে যেখানে আপাতবিচারে সগুণ বা সাকার উপাসনার কথা বলা হয়েছে বলে ধারণা হয়, সেই সকল অংশ প্রকৃতপক্ষে বহুদেবোপাসনাবাচক নয়; ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যেই সেখানে সীমিত বস্তুকে ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে; যেমন, "বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত-শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হয়েন।... যদি বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণবিশিষ্ট দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন অতএব তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্য হয়েন ইহার উত্তর এই: অত্যল্প মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক যে এমত কথনের দ্বারা ওই দেবতা কিম্বা মনুষ্যের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই, যেহেতু বেদেতে যেমন কোন কোন দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্বকথন দেখিতেছি সেইরূপ আকাশের এবং মনের এবং অন্নাদির স্থানে স্থানে বেদে ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন আছে; এ সকলকে ব্রহ্মকথনের তাৎপর্য বেদের এই হয় যে ব্রহ্ম সর্বময় হয়েন, তাহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায়; পৃথক পৃথককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য নহে এই মত সিদ্ধান্ত বেদ আপনি অনেক স্থানে করিয়াছেন....।"[৪১] সুতরাং দেখা গেল শংকর যেমন উপনিষদ্-সমূহের একবাক্যতা-প্রতিপাদনকল্পে যুক্তিসহকারে প্রমাণ করবার

চেষ্টা করেছেন, উপনিষদ্‌সিদ্ধান্তমাত্রই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের পরিপোষক, রামমোহনও অনুরূপভাবে স্থাপন করবার প্রয়াস পেয়েছেন শ্রুতিবাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সর্বত্র পরব্রহ্মের অখণ্ডত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার। মুখ্যত প্রচলিত প্রতিমাপূজার সমর্থকগণের সঙ্গে তাঁকে বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল বলেই তাঁর উক্তিতে একতত্ত্ববাদ অপেক্ষা স্থানে স্থানে একেশ্বরবাদের উপর ঝোঁক কিছু বেশি পড়েছে; কিন্তু মূলত তিনি যে একতত্ত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তার প্রমাণ 'তাহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায়' তাঁর পূর্বোদ্ধৃত এই উক্তির মধ্যেই আছে।

৪. রামমোহন-নির্দিষ্ট শাস্ত্রবিচারের পরবর্তী সূত্রটি পুরাণতন্ত্রাদি বেদোত্তর-কালে রচিত গ্রন্থসমূহের প্রামাণ্যবিষয়ক। এই ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন পুরাণ ও তন্ত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে দুটি ভাগ আছে। এক অংশে এগুলিতে উপনিষদের মতোই ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে; অন্যত্র অবশ্যই সাকার দেবতার ও সাকারোপাসনার সুবিস্তীর্ণ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বর্তমান। কিন্তু এই সকল গ্রন্থেই আবার বার বার বলা হয়েছে যে দ্বিতীয়োক্ত স্থূল বর্ণনা কেবল তাঁদেরই জন্য যাঁরা চিত্তের দুর্বলতাহেতু নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা করতে অশক্ত। শ্রুতিবিরুদ্ধ না হলে তন্ত্রপুরাণের উক্ত প্রথম অংশ অবশ্য মান্য; এবং শাস্ত্রবাক্যসমূহের সামঞ্জস্যরক্ষার জন্য মনে করতে হবে দ্বিতীয় অংশে প্রদত্ত সাকারোপাসনার বিধান কেবলমাত্র নিম্নাধিকারিগণের জন্য। এ সম্পর্কে 'ঈশোপনিষদ' এর ভূমিকায় রামমোহনের উক্তি অতি স্পষ্ট: "যদি কহ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতাদির উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল কি অপ্রমাণ আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন। তাহার উত্তর এই যে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধিমনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন; তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপে করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক; পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।... অতএব বেদপুরাণতন্ত্রাদিতে

যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্বলাধিকারীর নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে এইরূপ শত শত বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন।"[৪২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রুতিসম্মত হলে পুরাণতন্ত্রের প্রামাণ্য মানতেও রামমোহনের আপত্তি ছিল না; অধিকন্তু তিনি অধিকারিভেদের তত্ত্বও স্বীকার করেছেন। উক্ত দুই বিষয়েই তাঁর দৃষ্টি ভারতবর্ষের পূর্বতন শাস্ত্রব্যাখ্যাতা আচার্যগণেরই অনুরূপ। কিন্তু শাস্ত্রহিসাবে পুরাণতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাতে বিপদ আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত অনেক গ্রন্থ পুরাণ ও তন্ত্রের ছাপ নিয়ে ঐ দুই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। নির্ভরযোগ্য প্রাচীন শাস্ত্র থেকে এই প্রামাণ্যবিহীন অর্বাচীন গ্রন্থসমূহকে পৃথক করবার উপায় কি? রামমোহনের প্রখর ও সতর্ক মনীষা সেই নিমিত্ত কোনও পুরাণ বা তন্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্যবিচারের যে দুটি মানদণ্ড নির্ণয় করেছিল তা এই: ১. গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্যের প্রথম লক্ষণ, তার টীকা থাকবে; ২ দ্বিতীয় লক্ষণ, তার বচন নিবন্ধাদি সংগ্রহগ্রন্থে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত থাকবে। তাঁর উক্তি অনুসারে: "...ইহা বিশেষরূপে জানা কর্তব্য যে তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ত নাই; সেইরূপ মহাপুরাণ, পুরাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার; এ নিমিত্ত শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজনাদির ধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য; অন্যথা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয় এমৎ নহে; অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক হইবার সম্ভাবনা আছে; কোনো কোনো পুরাণতন্ত্রাদি একদেশে চলিত আছে অন্য দেশীয়রা তাহাকে কাল্পনিক কহেন, বরঞ্চ একদেশেই কতক লোক কাহাকে মান্য করেন কতক লোক নবীনকৃত জানিয়া অমান্য করেন। অতএব সটীক কিম্বা মহাজনধৃত পুরাণতন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন।"[৪৩] যে গ্রন্থের টীকা রচিত হয়েছে অথবা স্মৃতিকারগণ যার বচনকে প্রমাণস্বরূপ উদ্‌ধৃত করেছেন তার গুরুত্ব ও প্রামাণ্য ঐ টীকা বা উদ্‌ধৃতির মাধ্যমে তর্কাতীতরূপেই বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃত হয়েছে—এ কথাই এখানে রামমোহনের বলবার উদ্দেশ্য। শাস্ত্রপ্রামাণ্য -বিচারের এই মানদণ্ড আধুনিক বিচারশীল মনের সৃষ্টি। শাস্ত্রের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও শাস্ত্রগ্রন্থ নির্বাচনে রামমোহন কী পরিমাণ স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তাঁর এই আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগই এর

প্রমাণ। এই সতর্কতা পূর্বতন আচার্যগণের সকলের মধ্যে সর্বদা লক্ষ্য করা যায় না।

৫. রামমোহন শাস্ত্রবিচারের অপর এক সূত্ররূপে স্বীকার করেছেন, স্মৃতিসমূহের মধ্যে মনুস্মৃতির প্রামাণ্যই সর্বাধিক কেননা মনু বেদার্থের সংগ্রহকর্তা। এই প্রসঙ্গে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' শীর্ষক পুস্তিকায় তিনি বলেন: "বেদদ্বেষকারি জৈন ও যবনাদির আক্রমণ প্রযুক্ত ভারতবর্ষে নানা শাখাবিশিষ্ট বেদের সমুদায় প্রাপ্তি হইতেছে না, কিন্তু এই দৌর্ভাগ্য প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন যে-যদ্বৈ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং—'যাহা কিছু মনু কহিলেন তাহাই পথ্য হয়', অর্থাৎ কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয় প্রকার বেদার্থ মনুগ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছে. তদনুসারে অনুষ্ঠানে বেদবিহিত অনুষ্ঠানের সিদ্ধি হয়।"[৪৩] অন্যত্রও এ বিষয়ে তাঁর উক্তি অতি স্পষ্ট: "বেদার্থবিবরণকর্তা যত মুনি তাঁহাদের মধ্যে ভগবান মনু সকলের প্রধান; তাঁহার বাক্যের বিপরীত যে সকল বাক্য তাহা অপ্রমাণ হয়, যেহেতু বৃহস্পতি কহেন: 'মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে'—মনু অর্থের বিপরীত যে ঋষিবাক্য তাহা মান্য নহে ··।'[৪৪] মনুস্মৃতিকে এই বিশেষ মর্যাদা-প্রদানের ব্যাপারেও রামমোহন সাধারণভাবে পূর্বতন আচার্যদেরই অনুগামী ছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রামমোহন শাস্ত্রপ্রমাণের সঙ্গে সত্যস্থাপনের আর দুটি যে উপায় স্বীকার করেছেন তা হল যুক্তি (reason) ও সহজ বুদ্ধি (common sense)। এ ক্ষেত্রে সর্বত্র তিনি প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্যগণ-অবলম্বিত পরিভাষা ব্যবহার করেন নি। শংকর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সিদ্ধান্তে পরস্পরবিরোধী হলেও তাঁরা মূলত যে প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন সেগুলি ছিল প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি।[৪৬] এর মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণের স্থান সর্বোচ্চ। শংকর স্পষ্টই বলেছেন, শ্রুতিসাক্ষ্যই ব্রহ্মের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ, তর্ক বা অপর কিছু নয়।[৪৭] তথাপি উক্ত আচার্যগণ যুক্তিতর্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি। তাঁদের দৃষ্টিতে সমস্ত প্রমাণই তর্কসাহায্যনির্ভর। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শ্রুতির বৈশিষ্ট্য আছে; শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ; সুতরাং যুক্তিতর্ক হবে শ্রুতির অধীন। শ্রোতার পক্ষে যুক্তির সাহায্য সর্বদা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু যুক্তি কখনও শ্রুতিকে অতিক্রম করতে পারবে না; শ্রুতির সহায়করূপে শ্রুতির অধীন থেকে তাকে চলতে হবে। রামানুজের মতে সকল প্রমাণের পক্ষেই তর্কের সাহায্য আবশ্যক; যদিও শ্রুতি

প্রমাণ অপর কোনও কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় এবং এর বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়জগতের অতীত, তথাপি এর পক্ষে সর্বদা তর্কের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।[৩৮] দেখা যাচ্ছে, আচার্যগণ প্রমাণ ও তর্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করলেও, স্বতন্ত্রভাবে এদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ; শ্রুতিপ্রমাণকে শ্রেষ্ঠ ও স্বতঃসিদ্ধ গণ্য করেছেন ; এবং তর্ককে প্রণালীহিসাবে সবকটি প্রমাণের একান্ত সহায়ক বলে নির্দিষ্ট করবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শ্রুতির অধীনরূপে সীমিত করতেও দ্বিধা করেন নি। বেদান্ত-সম্পর্কিত রামমোহনের রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনিও প্রাচীন আচার্যগণের মতো শ্রুতি ভিন্ন প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে দুটি অতিরিক্ত প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন।[৩৯] কিন্তু উক্ত প্রমাণদ্বয় সম্পর্কে কোথাও তিনি স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে যান নি। অপর পক্ষে সত্যস্থাপনে যুক্তিতর্কের আবশ্যিকতা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় শাস্ত্রবিচারে যুক্তিতর্কের অবতারণা ও জীবনের নানা লৌকিক সমস্যার সমাধানকল্পে সমগ্রভাবে যুক্তির প্রয়োগ—এই দুইয়ের মধ্যে রামমোহন স্পষ্টত প্রভেদ করেছেন। প্রাচীন আচার্যগণের মতোই তিনি মানতেন আধ্যাত্মিক জীবনে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মূল্যই সর্বাধিক ; শ্রুতি সেই অভিজ্ঞতার আধার হিসাবে সর্বাগ্রে ও সর্বতোভাবে গ্রাহ্য ; সুতরাং ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য তর্কের ব্যবহার সেখানে স্বভাবত হবে সীমিত ও শ্রুতির অনুগত। স্বরচিত বেদান্ত-ভাষ্যে তিনি এই হেতু বলেছেন : "তর্ক কেবল বুদ্ধিসাধ্য এই হেতু তাহার প্রতিষ্ঠা নাই ; অর্থাৎ স্থৈর্য নাই ; অতএব তর্কে বেদের বাধা জন্মাইতে পারে নাই ; যদি তর্ককে স্থির কহ তবে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ হইবেক·· অতএব কোন তর্কের প্রামাণ্য নাই।"[৪০] অন্যত্র এ বিষয়ে তাঁর উক্তি : "যেখানে যেখানে তর্কের নিষেধ আছে সে বেদবিরুদ্ধ তর্ক জানিবে ; কিন্তু বেদসম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্বথা নির্ণয় করা কর্তব্য···।"[৪১] কিন্তু এ তো গেল আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথা যেখানে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই জিজ্ঞাসু মানুষের আরোহণের শেষ ভূমি। লৌকিক জীবনের শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কিত দুরূহ সমস্যাসমূহের বিচার-বিশ্লেষণেরও কি একই মানদণ্ড? সেখানেও কি শ্রুতিপ্রমাণকে সর্বাগ্রে স্থাপন করে যুক্তিকে তার পশ্চাদনুসরণ করানোই হবে বিধি? এই প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে পূর্বতন ভারতীয় আচার্যগণের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য ছিল। শংকর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈদান্তিকগণের

জগৎ ছিল সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জগৎ। মানুষের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভিন্ন অন্য কোনও জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁরা অন্বেষণ করেন নি। অপর পক্ষে রামমোহনের মানস ছিল নবযুগের নূতন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকস্নাত; তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা ছিল প্রাচীন আচার্যগণের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অপেক্ষা শতগুণে ব্যাপকতর—যার মধ্যে তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তি ও ইহলৌকিক কল্যাণকে তুল্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। এ হল রেনেশাঁস বা নবজাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত আধুনিক যুগোপযোগী জীবনাদর্শ, মধ্যযুগের ভারতবর্ষীয় বেদান্তাচার্যগণের কল্পনায় যা আসে নি। সেই কারণে তিনি শেষোক্তগণের নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগী অনুসন্ধানপ্রণালী লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে কখনও প্রয়োগ করেন নি। সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতির সহিত জড়িত সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ ও সমাধানের প্রসঙ্গে তাঁকে কোথাও শাস্ত্রপ্রমাণের দোহাই দিতে দেখা যায় না। এখানে তিনি পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী। এই যুক্তিবাদে তাঁর প্রথম দীক্ষা ইসলামের মুতাজিলা সম্প্রদায়ের শাস্ত্র থেকে। উত্তরকালে এই মনোভাব পুষ্ট ও সম্প্রসারিত হয়েছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে। আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জীবন তাঁর নিকট ছিল দুই স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। অবশ্য যৌবনে রচিত 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুওয়াহিদিন্‌' গ্রন্থে তিনি যুক্তিবাদের প্রয়োগকালে এই দুইয়ের মধ্যে সীমারেখা টানেন নি—নির্বিচারে শাস্ত্রপ্রমাণকে অস্বীকার করে নিছক যুক্তির সাহায্যে জীবনের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উভয় দিকেরই বিচার করেছিলেন। পরবর্তী জীবনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুভবের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে তিনি এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণকে প্রধান ও যুক্তিকে তার সহায়ক গণ্য করেন; কিন্তু লৌকিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পূর্বের ন্যায়ই যুক্তির সার্বভৌমত্বে তাঁর আস্থা অটুট ছিল। সেখানে শাস্ত্রপ্রমাণের কোনও স্থান ছিল না। আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জিজ্ঞাসাদ্বয়ের প্রকৃতিগত প্রভেদ ও উভয়ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রণালীদ্বয়ের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তাঁর এই সচেতন মনোভাবের উৎস নিঃসন্দেহে তাঁর স্বীকৃত তৃতীয় উপায়—যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'সহজ বুদ্ধি' বা common sense। একে স্বতন্ত্র প্রমাণ বা তর্ককৌশল হিসাবে পূর্ববর্তী ভাষ্যকারেরা কোনও স্থান দেন নি। এর স্বীকৃতি রামমোহনের আধুনিক যুগোপযোগী পরিপূর্ণ জীবনজিজ্ঞাসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও এখানে শংকরের একটি তাৎপর্যপূর্ণ

উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্যের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, যা দৃষ্ট বিষয়, অর্থাৎ ইহলোকে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায়, তা প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারাই জানা যেতে পারে; তার জন্য শ্রুতিপ্রমাণ অন্বেষণ করবার প্রয়োজন নেই (দৃষ্টবিষয়ে চ ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারোপ্রায়জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামেব সিদ্ধত্বাৎ ন আগমান্বেষণা)।[৫১ক] রামমোহন যেখানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরের ব্যাবহারিক জীবনে শাস্ত্রপ্রমাণকে সম্পূর্ণ পরিহার করে যুক্তিকে আশ্রয় করেছেন সেখানে শংকরের এই উক্তিটি যে তাঁর মনকে একেবারেই স্পর্শ করেনি তা জোর করে বলা যায় না।

মুখ্যত যে গ্রন্থগুলি অবলম্বন করে রামমোহন বৈদান্তিক তত্ত্বব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন—তা হল পাঁচখানি উপনিষদের ভূমিকাসহ অনুবাদ; ব্রহ্মসূত্রের 'বেদান্তগ্রন্থ'শীর্ষক ভাষ্য ও 'বেদান্তসার' নামধেয় তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; ও ভগবদ্গীতার ছন্দোবদ্ধ বঙ্গানুবাদ। এর মধ্যে গীতার অনুবাদখানি পাওয়া যায় নি। সুতরাং তত্ত্বব্যাখ্যাতারূপে রামমোহনের মূল্যায়ন তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও অনূদিত উপনিষদ্গুলির সাহায্যেই করতে হবে; অবশ্য প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বিচারমূলক তাঁর গ্রন্থগুলি থেকেও এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাবে। পূর্বেই নানা সাক্ষ্যপ্রমাণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রামমোহন যখন বেদান্তের ব্যাখ্যা ও প্রচারে প্রবৃত্ত হন তখন বঙ্গীয় পণ্ডিতসমাজে বেদান্তের পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হলেও তার ধারা ছিল অতি ক্ষীণ। প্রকাশ্য বেদান্ত আলোচনায় বা বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কে রচনা প্রকাশে, পণ্ডিতগণের মধ্যে অত্যল্পসংখ্যক যাঁরা উক্ত শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন—তাঁরাও ছিলেন স্পষ্টত অনিচ্ছুক। এ বিষয়ে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্মহলেও তখন পর্যন্ত ব্যাপক উদ্যম দেখা যায় না। উপনিষদ্কে বেদান্তশাস্ত্রের শ্রুতিপ্রস্থান বলা হয়। রামমোহন কর্তৃক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বে—অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে—সার উইলিয়ম জোন্‌স ঈশোপনিষদের একখানি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।[৫২] এর কিছুকাল পরে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে হেনরী টমাস কোলব্রুক ঐতরেয় উপনিষদের এক ইংরেজি অনুবাদ 'এসিয়াটিক রিসার্চেস্' অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিত 'বেদ' সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত

করেন।[৫২ক] পরবৎসর (১৮০৬) শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্‌রী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক উইলিয়ম কেরী তাঁর ইংরেজিতে রচিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে সংস্কৃত পদবিন্যাসপ্রকরণের অন্যতম দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজি অনুবাদসহ ঈশোপনিষদ্‌খানি মুদ্রিত করেন।[৫৩] দুখানি মাত্র উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করে এই দু'একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে রামমোহনের পূর্বে এ দেশে উপনিষদ্ প্রচারের অপর কোনও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। এ কথাও স্মরণীয়, জোন্‌স বা কেরী উপনিষদ্‌তত্ত্বের কোনও ব্যাখ্যা বা আধুনিক যুগপরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনও আলোচনা তাঁদের অনুবাদের সঙ্গে যোগ করেন নি। ভারতে উপনিষদ্‌চর্চায় যে ধারা শংকর প্রমুখ বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের মাধ্যমে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রবাহিত তার সঙ্গেও এঁদের পরিচয়ের কোনও প্রমাণ নেই। কোনও ভাষ্যেরই তাঁরা উল্লেখ করেন নি। অন্য পক্ষে রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল উপনিষদ্-প্রোক্ত ব্রহ্মবাদকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তার প্রভাবে জাতির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন সাধন। 'ঈশোপনিষৎ'এর বঙ্গানুবাদের মুখবন্ধে তিনি স্পষ্ট বলেছেন: "এই সকল উপনিষদ্‌কে শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া তাহার অর্থকে পুনঃ পুনঃ চিন্তন করিলে ইহার তাৎপর্য বোধ হয়। কেবল ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিলে বিশেষ অর্থবোধ হইতে পারে না; অতএব নিবেদন ইহার অর্থে যথার্থ মনোযোগ করিবেন।"[৫৪] মনন ও নিদিধ্যাসন ছাড়া শাস্ত্রপাঠ যে সম্পূর্ণ হয় না— এই উক্তিতে চিরন্তন সেই ভারতীয় মনোভাবই প্রতিফলিত। বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থানরূপে পরিচিত ভগবদ্‌গীতা রামমোহনের কালে উপনিষদ্ অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণে অনুশীলিত হত যদিও টোল চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত বেদান্তের পাঠক্রমে যে এর বিশেষ কোনও স্থান ছিল না তা আমরা পূর্বে দেখেছি। পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্‌গণের মধ্যে চার্লস উইলকিন্স ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গীতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তা ছাড়া রামমোহনের উক্তি থেকেই জানা যায়, তাঁর সময়ে তাঁর নিজের অধুনালুপ্ত অনুবাদ ভিন্ন এর কয়েকটি বাংলা ও হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রচলিত ছিল।[৫৫] কিন্তু আধুনিক যুগে ব্রহ্মবাদের স্থাপনে ও সামাজিক প্রশ্নের বিচারে বেদান্তের অঙ্গরূপে রামমোহন তাঁর অন্যান্য বিচারগ্রন্থসমূহে গীতার তত্ত্ব যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন সে প্রণালী এক দিকে পূর্ববর্তী শংকর রামানুজ প্রভৃতি বিখ্যাত আচার্যগণকে

ও অন্য দিকে বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, টিলক প্রভৃতি উত্তরকালীন মনস্বী গীতাভাষ্য-কারগণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাদরায়ণ-রচিত ব্রহ্মসূত্র বেদান্তশাস্ত্রের ন্যায়প্রস্থানরূপে প্রসিদ্ধ। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে রামমোহনই ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ভাষ্যকার। তাঁর পূর্বে প্রাচীন ধারায় ব্রহ্মসূত্রের শেষ ভাষ্য রচিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওড়িশাবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি বা সিদ্ধান্তের দিক থেকে বলদেব ছিলেন সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয়—তাঁর সঙ্গে রামমোহনের দূরতম সাদৃশ্যও ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের বিস্তারিত আলোচনা আরম্ভ করেন রামমোহনের অনেক পরে। বস্তুত সব দিক বিচার করলে স্বীকার করতে হয় বেদান্ত অধ্যয়ন ও এর তত্ত্বব্যাখ্যার পথে রামমোহনকে পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করে প্রায় একক প্রচেষ্টায় অগ্রসর হতে হয়েছিল। দেশীয় বা পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে তখন পর্যন্ত প্রকাশ্য বেদান্তচর্চার এক স্বাভাবিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় নি। সুতরাং সহায়ক পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যমান থাকলে এই ক্ষেত্রে তাঁর অধ্যয়ন, অনুশীলন, মনন, চিন্তন ও প্রচার যত স্বচ্ছন্দ হতে পারত, তা হয় নি। এই কারণেই বেদান্তশাস্ত্রে যে সুবিস্তীর্ণ অধ্যয়ন, অনায়াস অধিকার ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তাঁর গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় তা অতি বিস্ময়কর মনে হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে বেদান্তের যুগোপযোগী নূতন ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন অতি গভীরভাবে অনুভব করলেও রামমোহন এই ব্যাখ্যার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে বেদান্তের প্রাক্তন আচার্যগণের নির্দিষ্ট পদ্ধতির অনুসারী। শেষোক্তগণের মধ্যে শংকরের প্রভাবই তাঁর উপর সর্বাধিক। কি উপনিষদের অনুবাদে, কি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে শংকরের ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করেছেন, যদিও শংকরের সঙ্গে কোনও কোনও বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্যও লক্ষণীয়। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের ও কেন, কঠ ও মাণ্ডুক্য উপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত শংকরের নামোল্লেখ করতে দেখা যায়।[৬৬] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক রামমোহন ব্রহ্মসূত্রের যে পাঠ গ্রহণ করেছেন তার সঙ্গে শংকর-অবলম্বিত পাঠের ঈষৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়। ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত সূত্রগুলির সংখ্যা সম্পর্কে ভাষ্যকারগণ অবশ্য একমত নন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই সূত্রসংখ্যা পাঁচশ পঞ্চাশ। রামমোহনও সে কথা জানতেন, এবং অন্তত তিন স্থানে এই প্রথাগত ধারণার

উল্লেখ করেছেন।[৫৭] কিন্তু কার্যত ভাষ্যরচনাকালে তিনি সূত্রসংখ্যা ধরেছেন পাঁচশ আটান্ন। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা এক নিম্বার্ক ভিন্ন কোনও ভাষ্যকারই সূত্রের সংখ্যা পাঁচশ পঞ্চাশ ধরেন নি, কেউ নিয়েছেন বেশি, কেউ কম।[৫৮] শংকরের হিসাবে সূত্রসংখ্যা পাঁচশ পঞ্চান্ন। ভাষ্যকারগণের মধ্যে এই পাঠভেদ অবশ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কখনও দেখা যায় কোনও ভাষ্যকার একটি সূত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দুটি পৃথক সূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন; কোথাও বা একটি বিশেষ সূত্রের শেষ শব্দটি পরবর্তী সূত্রের প্রথমে যুক্ত হওয়ায় দুটি সূত্রের পাঠই ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। এতে মাঝে মাঝে ভাষ্যকারগণের মধ্যে নিজ নিজ মতানুযায়ী ব্যাখ্যার তারতম্যও ঘটেছে। শংকর তাঁর ভাষ্যে সম্ভবত এই কথা মনে রেখেই বলেছেন, এক ভাষ্যকারের মতে যেটি সিদ্ধান্ত, অপরগণের মতে সেইটিই পূর্বপক্ষ।[৫৯] ব্রহ্মসূত্রের শংকর-অবলম্বিত পাঠের সঙ্গে রামমোহন-গৃহীত পাঠের পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. রামমোহন-ভাষ্য: ২ ৩. ১৯: 'যুক্তেশ্চ'; শাংকর-ভাষ্যে এই সূত্র নেই।

২, শাংকর-ভাষ্য: ২. ৪ ৩: 'তৎ প্রাক্ শ্রুতেশ্চ'; রামমোহন-ভাষ্যে এই সূত্র নেই।

৩. রামমোহন-ভাষ্য: ৩. ২ ২৫: 'প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষাম্'; ৩. ২. ২৬: 'প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ'; শাংকর-ভাষ্য: ৩. ২. ২৫এ দুটি সূত্রকে একত্র করে একটি সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে: 'প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ'; সুতরাং রামমোহনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ২৬ সংখ্যক সূত্রটি অতিরিক্ত দাঁড়াচ্ছে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য দ্বৈতবাদী আচার্য মধ্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণকেও ৩. ২. ২৫ সংখ্যক সূত্রটিকে অনুরূপ ভাবে দ্বিধাবিভক্ত করতে দেখা যায়। রামমোহন এই পাঠ অনুসরণ করেছিলেন।

৪. রামমোহন-ভাষ্য: ৩. ২. ৪৩. 'মায়িকত্বাত্তু ন বৈষম্যং'; শাংকর-ভাষ্যে এই সূত্র নেই।

৫. রামমোহন-ভাষ্য: ৩, ৩. ৩: 'স্বাধ্যায়স্ত তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ'; ৩. ৩. ৪: 'শরবচ্চ তন্নিয়মঃ॥ সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ'; শাংকর-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের রামমোহন-প্রদত্ত চতুর্থ সূত্রটি স্বতন্ত্রভাবে ধরা হয়

নি। শংকর এই পাদের তৃতীয় সূত্রের যে পাঠ দিয়েছেন তা এই: 'স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ।' এই সূত্রটির পাঠ সম্পর্কে ভাষ্যকারগণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। রামানুজধৃত পাঠ শংকরের সঙ্গে মেলে। অপর পক্ষে ভেদাভেদবাদী ভাষ্যকার ভাস্কর 'সববচ্চ তন্নিয়মঃ' অংশের স্থলে পড়েছেন 'সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ'। দ্বৈতবাদী মধ্ব 'সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ' অংশটিকে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চতুর্থ সূত্ররূপে উল্লেখ করেছেন। স্পষ্ট বোঝা যায় 'সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ' এই পাঠান্তরের ঐতিহ্য যথেষ্ট প্রাচীন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী বলদেব বিদ্যাভূষণ শংকর অবলম্বিত ৩. ৩ ৩. সংখ্যক সূত্রটিকে বিভক্ত করে দুটি সূত্রে পরিণত করেছেন যথা: 'স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ' (৩. ৩. ৩.); 'সববচ্চ তন্নিয়মঃ' (৩. ৩ ৪.), যার সঙ্গে রামমোহনকৃত উক্ত সূত্রবিভাগের সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রামমোহন অবলম্বিত পাঠ বিচার করলে দেখা যায় তিনি শংকর প্রদত্ত সূত্রটিকে (৩. ৩. ৩) দ্বিখণ্ডিত করে তার শেষাংশ (শরবচ্চ তন্নিয়মঃ) পরবর্তী চতুর্থ সূত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং চতুর্থ সূত্রের শেষাংশরূপে গ্রহণ করেছেন ভাস্কর ও মধ্ব প্রদত্ত অপর একটি সূত্র বা সূত্রাংশ (সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ)। সুতরাং তাঁর ভাষ্যে সমগ্রটি একটি অতিরিক্ত সূত্র হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করতে হয়, রামমোহন-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চতুর্থ সূত্রের প্রথমাংশ রূপে তাঁর গ্রন্থাবলীর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণে যা মুদ্রিত হয়েছে তা স্পষ্টত মুদ্রণ-প্রমাদ। অংশটির প্রকৃত পাঠ 'শরবচ্চ তন্নিয়মঃ' নয়, 'সববচ্চ তন্নিয়মঃ'। 'সব' শব্দটি এখানে অথর্ববেদাধ্যায়িগণ অনুষ্ঠিত সৌর্য হতে শতৌদন অবধি সাতটি হোমক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সকল ভাষ্যকারই এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। রামমোহনও যে এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নন তা তাঁর এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা থেকেই প্রমাণিত হয়[৩০]: 'শর [?] অর্থাৎ সপ্ত হোম যেমন আথর্বণিকদের নিয়ম সেইরূপ মুণ্ডকাধ্যয়নেতে শিরোঙ্গারব্রতের নিয়ম হয়।' 'শর' শব্দটি এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অর্থহীন। মূল পাণ্ডুলিপিতে যে সংস্কৃতে বাংলায় উভয়ত্র 'সব' শব্দ ছিল অর্থব্যাখ্যার সঙ্গে সূত্রাংশটি মিলিয়ে পড়লে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। দুঃখের বিষয় রামমোহন-গ্রন্থাবলীর কোনও সম্পাদকই মুদ্রিত গ্রন্থে মূল ও ভাষ্যের

এই বিরোধ লক্ষ্য করেন নি এবং তদনুযায়ী প্রকৃত পাঠ নির্ণয়ের প্রয়াস পান নি।

৬. এ ভিন্ন আরও কয়েকটি সূত্রে শংকর ও রামমোহনের মধ্যে পাঠের সামান্য তারতম্য লক্ষিত হয় যেমন, শংকর (৩. ২. ১৮): 'অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ'; রামমোহন (৩. ২ ১৮): 'অতএবোপমা সূর্যকাদিবৎ'; শংকর (৩. ৩. ৮): 'সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তদপি'; রামমোহন-ভাষ্যে এটি পরবর্তী সূত্র (৩. ৩. ৯): 'সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি'; শংকর (৩. ৩. ৬৬): 'দর্শনাৎ'; রামমোহন-ভাষ্যে এটি পরবর্তী সূত্র (৩. ৩. ৬৭): 'দর্শনাচ্চ'; ইত্যাদি। এগুলি 'চ-বা-তু'র গুরুত্বশূন্য অকিঞ্চিৎকর পার্থক্যমাত্র।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী বেদান্তভাষ্যকারগণের মধ্যে আচার্য শংকরকে সর্বাধিক মান্য করলেও, রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশকালে ব্রহ্মসূত্রের যে পাঠ অবলম্বন করেছিলেন তা সর্বাংশে শংকর-প্রদত্ত পাঠ নয়। কোনও কোনও স্থলে তাঁর পাঠ বা সূত্রবিভাগ ভাস্কর মধ্ব ও বলদেব বিদ্যাভূষণের সঙ্গেও মিলছে। এটি অবশ্য আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মধ্বসম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং ওড়িশার অধিবাসী বলদেব তো স্বয়ং ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই ভাষ্যকার। রামমোহন যেখানে বেদান্তচর্চা করেছিলেন, সেই পূর্বভারতে, এই দুই আচার্য সম্যক্ পরিচিত ছিলেন, ও অনুমান করতে বাধা নেই সাধারণ টোল-চতুষ্পাঠীর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত না হলেও তাঁদের ভাষ্যদ্বয়েরও—অন্তত পক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে—বহুল প্রচলন ছিল। সেহেতু তাঁদের অবলম্বিত পাঠের সঙ্গে যে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান রামমোহনের পরিচয় থাকবে এটা স্বাভাবিক, যদিচ ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের রামমোহন ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মনে হয়, মূলত এ বিষয়ে রামমোহনের মনে কিছু অতৃপ্তি থেকে গিয়েছিল এবং শংকর-অবলম্বিত ব্রহ্মসূত্রের বিশুদ্ধ পাঠের অন্বেষণে তিনি তাঁর স্বীয় বেদান্তভাষ্য প্রকাশের (১৮১৫) পরেও বিরত হন নি। এই প্রচেষ্টাই তাঁকে প্রণোদিত করেছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বহু অনুসন্ধানে ও যত্নে সমগ্র শাংকর-ভাষ্য সমেত ব্রহ্মসূত্রের একটি সুবৃহৎ সংস্করণ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করতে। দেখা যায়, এই গ্রন্থে তিনি আদ্যোপান্ত শংকর-অবলম্বিত ব্রহ্মসূত্রের পাঠই গ্রহণ করেছেন এবং এখানে সূত্রসংখ্যাও স্বভাবত পাঁচশ পঞ্চান্ন। যতদূর জানা যাচ্ছে

ব্রহ্মসূত্রের শংকর-কৃত সুবিখ্যাত ভাষ্যের এটিই সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ এবং এর সম্পাদনা ও প্রকাশ রামমোহনের এক অক্ষয় কীর্তি।[৩১] মনে রাখতে হবে, ব্রহ্মসূত্রের পাঠ সম্পর্কে শংকর ও রামমোহনের পারস্পরিক পার্থক্যের সবগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভাষ্যকারগণের মধ্যে এই জাতীয় পাঠভেদ অভূতপূর্বও নয়। তবে সমগ্র বিচারে রামমোহন-অবলম্বিত 'সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ' (৩. ৩. ৪) পাঠের যে তাঁর নিজস্ব তত্ত্বসিদ্ধান্তের দিক দিয়ে কিছু গুরুত্ব ছিল, আলোচনা-প্রসঙ্গে তা দেখা যাবে।

তত্ত্বব্যাখ্যাতারূপে রামমোহনকে বিচার করতে অগ্রসর হলে প্রথমেই আচার্য শংকরের প্রতি তাঁর অতি সশ্রদ্ধ মনোভাব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার প্রথম কারণ নিশ্চয় এই যে প্রাক্তন বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে শংকর বেদান্তশাস্ত্রের সম্পূর্ণ ব্রহ্মপর ব্যাখ্যাই করেছিলেন। তিনি একটি মাত্র তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তা নির্গুণ অদ্বৈত ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে তিনি কোনও প্রকার বৈশিষ্ট্য বা সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সীমিত করেন নি। তাঁর মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমস্ত দেবদেবী মিথ্যা; ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত যাগযজ্ঞপূজার্চনা প্রভৃতি সর্ববিধ শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম ও বিধিনিষেধাদি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। অপর পক্ষে শংকরোত্তর অধিকাংশ ভাষ্যকারই বেদান্তের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা করেছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও বিষ্ণু অভিন্ন; দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী নিম্বার্কও বেদান্তের ব্রহ্ম ও ভক্তগণের উপাস্য বিষ্ণুর মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখেন নি; রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উপাস্য; দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য বলেন যিনি ব্রহ্ম তিনিই বৈকুণ্ঠলোকবাসী বিষ্ণু বা হরি; শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভ ব্রহ্মের সঙ্গে গোলকাধিপতি কৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করেছেন; গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষ্যকার অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলদেবও তাই; অপর পক্ষে শৈব সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীকণ্ঠের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যানুসারে শিবই পরব্রহ্ম। তদুপরি উক্ত সাম্প্রদায়িক ভাষ্যসমূহে, বিশেষত বৈষ্ণব ভাষ্যগুলির মধ্যে, সাকার উপাসনা অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও সাকার উপাসনার ঘোর বিরোধী আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন রামমোহনের নিকট তাই এগুলির যুক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি। অপর পক্ষে শংকরের অপেক্ষাকৃত মুক্ত, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি তাঁর সঙ্গে চিত্তের নিবিড় যোগস্থাপনের পক্ষে রামমোহনের সহায়ক হয়েছিল।

বধৃতস্বভাবানামযথাবধৃতস্বভাবত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং জীবাদিষু পদার্থেষ্বেকস্মিন্ ধর্ম্মি
ণি সত্ত্বাসত্ত্বয়োর্বিরুদ্ধয়োরসম্ভবাৎ সত্ত্বে চৈকস্মিন্ ধর্ম্মেহসত্ত্বস্য ধর্ম্মান্তরস্যাসম্ভবা
দসত্ত্বে চৈবং সত্ত্বস্যাসম্ভবাদসঙ্গতমিদমার্হতং মতং। এতেনৈকানেকনিত্যা
নিত্যব্যতিরিক্তাব্যতিরিক্তাদ্যনেকান্তাভ্যুপগমা নিরাকৃতা মন্তব্যাঃ। যত্তু পুদ্গল
সংজ্ঞকেভ্যোণুভ্যঃ সঙ্ঘাতাঃ সম্ভবন্তীতি কল্পয়ন্তি তৎ পূর্ব্বেণৈবাণুবাদনিরাকরণেন
নিরাকৃতং ভবতীত্যতো ন পৃথক্ তন্নিরাকরণায় প্রযত্যতে॥ ৩॥ এবঞ্চাত্মাকার্ৎস্ন্যং
॥ ৩॥ ৩৪॥ যথৈকস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধধর্ম্মাসম্ভবো দোষঃ স্যাদ্বাদে প্রসক্তঃ এবমা
ত্মনোপি জীবস্যাকার্ৎস্ন্যমপরো দোষঃ প্রসজ্যেত। কথং শরীরপরিমাণো হি জী
ব ইত্যার্হতা মন্যন্তে। শরীরপরিমাণতায়াঞ্চ সত্যামকৃৎস্নোহসর্ব্বগতঃ পরিচ্ছিন্ন
আত্মেত্যতো ঘটাদিবদনিত্যত্বমাত্মনঃ প্রসজ্যেত। শরীরাণাঞ্চানবস্থিতপরিমা
ণত্বান্মনুষ্যজীবো মনুষ্যশরীরপরিমাণো ভূত্বা পুনঃ কেনচিৎ কর্ম্মবিপাকেন হস্তিজন্ম
প্রাপ্নুবন্ন কৃৎস্নং হস্তিশরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ পুত্তিকাজন্ম চ প্রাপ্নুবন্ন কৃৎস্নঃ পুত্তিকাশরী
রে সম্মীয়েত। সমান এষ একস্মিন্নপি জন্মনি কৌমারযৌবনস্থাবিরেষু দোষঃ। স্যাদে
তৎ অনন্তাবয়বো জীবঃ তস্য ত এবাবয়বা অল্পে শরীরে সঙ্কুচেয়ুর্মহতি বিকসেয়ুরিতি
। তেষাং পুনরনন্তানাং জীবাবয়বানাং সমানদেশত্বং প্রতিহন্যেত বা নবেতি বক্তব্যং
। প্রতিঘাতে তাবন্নানন্তাবয়বাঃ পরিচ্ছিন্নে দেশে সম্মীয়েরন্। অপ্রতিঘাতেপ্যেকাবয়
বদেশত্বোপপত্তেঃ সর্ব্বেষামবয়বানাং প্রথিমানুপপত্তের্জীবস্যাণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ স্যা
ৎ। অপিচ শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নানাং জীবাবয়বানামানন্ত্যং নোৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যং
। অথ পর্য্যায়েণ বৃহচ্ছরীরপ্রতিপত্তৌ কেচিজ্জীবাবয়বা উপগচ্ছন্তি তনুশরীরপ্রতিপ
ত্তৌ চ কেচিদপগচ্ছন্তীত্যুচ্যেত তত্রাপ্যুচ্যতে॥ ৩॥ নচ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বি
কারাদিভ্যঃ॥ ৩॥ ৩৫॥ নচ পর্য্যায়েণাপ্যবয়বোপগমাপগমাভ্যামেতদ্দে
হপরিমাণত্বং জীবস্যাবিরোধেনোপপাদয়িতুং শক্যতে কুতঃ বিকারাদিদোষপ্রস
ঙ্গাৎ। অবয়বোপগমাপগমাভ্যাং হ্যনিশমাপূর্য্যমাণস্যাপক্ষীয়মাণস্য চ জীব
স্য বিক্রিয়াবত্ত্বং তাবদপরিহার্য্যং বিক্রিয়াবত্ত্বে চর্ম্মাদিবদনিত্যত্বং প্রসজ্যেত ত
তশ্চ বন্ধমোক্ষাভ্যুপগমো বাধ্যেত কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিতস্য জীবস্যালাবুবৎ সংসার
সাগরে নিমগ্নস্য বন্ধনোচ্ছেদাদূর্দ্ধগামিত্বং ভবতীতি। কিঞ্চান্যৎ আগচ্ছতামপগচ্ছ

রামমোহন কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত
ব্রহ্মসূত্র-শাংকর ভাষ্যের এক পৃষ্ঠা।
সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার, কলিকাতা।

শাংকর ভাষ্যের প্রতি রামমোহনের আকৃষ্ট হবার দ্বিতীয় কারণ নিঃসন্দেহে এই যে পূর্বতন ভাষ্যকারগণের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র শংকরই বহুল পরিমাণে পৌরাণিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। নিজ সিদ্ধান্তসমূহের স্থাপনে তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে যে-সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধার করেছেন তার মধ্যে প্রচলিত পুরাণগুলি প্রায় অনুল্লিখিত। এমন-কি, বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ভুক্ত চতুর্থ (মৈত্রেয়ী) ব্রাহ্মণের এক অংশে উল্লিখিত 'পুরাণ' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি ইঙ্গিত করেছেন পুরাণ অর্থে 'পুরাবৃত্তপ্রকাশক বিবরণ'; এবং নিজমতসমর্থনে দৃষ্টান্তরূপে, প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখমাত্র না করে তৈত্তিরীয় উপনিষদ (দ্বিতীয় বল্লী, সপ্তম অনুবাক)এর বচন উদ্ধৃত করেছেন: 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' (এই জগৎ আদৌ অসৎ ছিল)।[৬২] শংকরের সমগ্র শাস্ত্রবিচার মুখ্যত শ্রুতিনির্ভর, এবং সে ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ড। তাঁর উদ্ধৃত প্রায় সকল শাস্ত্রবাক্যই চয়ন করা হয়েছে শ্রুতি থেকে। রাধাকৃষ্ণন তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন: "He tried to bring back the age from the brilliant luxury of the Purāṇas to the mystic truth of the Upaniṣads।"[৬৩] অপর পক্ষে শংকর-পরবর্তী বেদান্তাচার্যগণ যথা রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বিজ্ঞানভিক্ষু, বল্লভ, জীব গোস্বামী, শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ, রাধাদামোদর, বলদেব প্রভৃতি—তাঁদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রচুর পুরাণবচন উদ্ধার করেছেন। পুরাণের এই বহুল প্রয়োগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচার্যের সাম্প্রদায়িক মনোভাবও সুপরিস্ফুট। মধ্বের মতে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র ও বৈষ্ণব পুরাণগুলির প্রামাণ্য চতুর্বেদের তুল্য এবং শৈব শাস্ত্র বিষ্ণুর আদেশে অসুরগণকে বিমূঢ় করবার জন্যই রচিত হয়েছে। বিজ্ঞানভিক্ষু কূর্ম-পুরাণের অন্তর্গত 'ঈশ্বরগীতা'র এক স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করেছেন।[৬৪] তেমনি পাওয়া যাচ্ছে বল্লভাচার্য রচিত ভাগবত পুরাণের টীকা 'সুবোধিনী'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তো প্রথমে ভাগবত পুরাণকেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য গণ্য করেছিলেন এবং বৃন্দাবনের সুপণ্ডিত গোস্বামিগণ সেই কারণে কোনও স্বতন্ত্র বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য রচনা করে বলদেব বিদ্যাভূষণ এই অভাব দূর করেন। জীব গোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভ' প্রকৃতপক্ষে ভাগবতপুরাণেরই বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা। জীব গোস্বামী, রাধদামোদর প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ পুরাণগুলির

সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক শ্রেণীবিভাগ করে বৈষ্ণব পুরাণগুলিকেই সাত্ত্বিক গণ্য করেছিলেন এবং এই শ্রেণীর মধ্যেও ভাগবত পুরাণকে সমগ্র শ্রুতি-স্মৃতির ঊর্ধ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন। শ্রীকণ্ঠ তাঁর শৈবভাষ্যে শিব-পুরাণের অন্তর্গত বায়বীয় সংহিতার প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন,[৬৫] এবং এই শৈব সাম্প্রদায়িক দৃষ্টির স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায় বীরশৈব ভাষ্যকার শ্রীপতি-কৃত শ্রীকর-ভাষ্যে, যেখানে গ্রন্থকার বলছেন, বেদ রচিত হবার পূর্বেই স্বয়ং শিব কর্তৃক পুরাণ রচিত হয়; প্রচলিত পুরাণগুলির মধ্যে শিবপুরাণই শ্রেষ্ঠ; এবং বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক অপরাপর পুরাণগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট।[৬৬] আলোচনাপ্রসঙ্গে পূর্বেই দেখা গিয়েছে রামমোহন শাস্ত্রপ্রামাণ্য-বিচারকালে শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ডকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। পুরাণ ও তন্ত্রকে তিনি শাস্ত্র বলে গণ্য করলেও প্রামাণ্য ও গুরুত্বের দিক থেকে এই শাস্ত্রদ্বয়কে তিনি শ্রুতি অপেক্ষা অনেক নিম্নমর্যাদাসম্পন্ন মনে করতেন। তাঁর স্বকৃত বেদান্তভাষ্যে ও উপনিষদের অনুবাদে ভূমিকাগুলির আলোচনাভাগ ব্যতীত তিনি কোথাও পুরাণতন্ত্রাদির কোনও বচন প্রমাণস্বরূপ দাখিল করেন নি। পুরাণতন্ত্রাদির প্রচুর ব্যবহার তাঁকে করতে দেখা যায় প্রধানত তাঁর বিচারগ্রন্থগুলিতে প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে তর্কপ্রসঙ্গে। অধিকন্তু সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল বিরাগ ও শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল আধুনিক ও বিচারশীল। সুতরাং তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক দিক থেকে শংকরোত্তর বৈদান্তিকগণের পুরাণ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মান্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গত বৈষ্ণব প্রতি-পক্ষের সঙ্গে বিচারকালে ভাগবত পুরাণকে কেন বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপে গণ্য করা হবে না—এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর তীক্ষ্ণ বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি স্মরণীয়।[৬৭] বিভিন্ন বিচারগ্রন্থে অমোঘ যুক্তি প্রয়োগ করে তিনি আরও দেখিয়েছেন: সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলির সাক্ষ্য যুক্তিহীন ও পরস্পরবিরোধী; বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক পুরাণ-সমূহ যেমন অন্যান্য দেবতাকে হেয় প্রতিপন্ন করে বিষ্ণুমাহাত্ম্য স্থাপনে তৎপর, শৈব পুরাণসমূহ শিবপক্ষে ও তন্ত্রাদি গ্রন্থ শক্তিপক্ষে অবিকল সেইরূপ;[৬৮] সুতরাং এই-সকল গ্রন্থোক্ত পরস্পরপ্রতিস্পর্ধী সাম্প্রদায়িক বচনগুলি প্রমাণ হিসাবে নির্ভরের অযোগ্য। এখানে বক্তব্য, মূলত প্রমাণ হিসাবে পুরাণতন্ত্র অপেক্ষা শ্রুতির শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে রামমোহনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শংকরমতের সাদৃশ্য থাকলেও রামমোহন এই যুক্তির বিস্তারে শংকরকে অতিক্রম

করে গিয়েছেন। পৌরাণিক সাক্ষ্যের অন্তর্বিরোধ ও দুর্বলতা বিষয়ে এমন নিপুণ বিশ্লেষণ শংকর বা অন্য কোনও প্রাচীন ভাষ্যকারের রচনায় দেখা যায় না। এক্ষেত্রে রামমোহনের দৃষ্টি সম্পূর্ণ আধুনিক। চতুর্থ অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে।

শংকরের প্রতি রামমোহনের অসীম শ্রদ্ধার অপর কারণ নিশ্চয় ছিল শংকরের আপসহীন নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ। এই একতত্ত্ববাদ রামমোহন স্বয়ং যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর রচনায় এর প্রচুর নিদর্শন আছে। অদ্বৈতবাদের মূল কথা হল, একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনও কিছুরই পারমার্থিক অস্তিত্ব নেই; জীব ও জগৎসংসার মিথ্যা; মায়াপ্রসূত অলীক ধারণাবশত আমরা এই বস্তুজগৎকে সত্য মনে করি; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হওয়া মাত্র এই ভ্রম স্বপ্ন ভাঙার মত দূর হয়ে যায়। রামমোহনের রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক— এই উভয় প্রসঙ্গেই তিনি শাংকর-বেদান্তের এই মূল তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বিশেষ তৎপর। তাঁর এই বিষয়ক বিবিধ উক্তি থেকে কিছু কিছু চয়ন করে নিম্নে দেওয়া গেল :

১. ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; যেমন মিথ্যা সর্প সত্যরজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়।[৬৯]

২. জীব মায়াঘটিত উপাধি হইতে দূর হইলে আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন এবং উপাধি জন্য সুখদুঃখের যে অনুভব হইতেছিল সে অনুভব আর হইতে পারে নাই।[৭০]

৩. যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায় বস্তুত সে রজ্জুই সর্প হয় এমৎ নহে সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম তেহোঁ মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক না হয়েন এই হেতু বেদান্তে পুনঃ২ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন।[৭১]

৪. …জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয়

হইবেক যে এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে...।[৭২]

৫. ··যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাহাকে এখন সত্য করিয়া জানিতেছ ইহাকেও মিথ্যা করিয়া জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়েতে মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল।[৭৩]

৬. একত্বমনুপশ্যতামস্মাকং আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তানি যাবন্তি নামরূপাণি মায়াকার্যাণি দিক্‌কালাকাশবৃত্তীনি পরিমিতানি সত্যাশ্রিতানি ভবন্তি কেবলং সদধ্যাসেন সত্যমিব প্রতীয়ন্তে, অতোহধ্যাসবলাৎ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।[৭৪]

৭. ···পরমার্থদৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা···কেবল এক ব্রহ্মমাত্র সত্য আর নাম-রূপময় জগৎকে মিথ্যা জানিবেন····।[৭৫]

৮. দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয়।[৭৬]

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দার্শনিক সিদ্ধান্তে রামমোহন শংকরের ন্যায় নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচারপ্রসঙ্গে তাঁকে জগৎসত্যত্ব সম্পর্কে দ্বৈতবাদী মধ্বমত খণ্ডন করে নির্বিশেষ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে দেখা যায়।[৭৬ক] তাঁর নিকট এই একতত্ত্ববাদের একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ এই ছিল যে এর স্বপক্ষীয় যুক্তিগুলির সাহায্যে তিনি তাঁর আজীবন পোষিত একেশ্বরবাদী ধর্মমতকে প্রতিপক্ষগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক একতত্ত্ববাদ তাঁর বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদের প্রধান পোষক হয়েছিল। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় প্রতিপক্ষগণের সহিত বিচার বিষয়ক তাঁর গ্রন্থগুলির প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। বেদান্তের শাংকর-ভাষ্য ভিন্ন অন্য কোনও ভাষ্যের নিকট হতে এই সাহায্য পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে সেগুলি ছিল সাম্প্রদায়িক ও সাকার দেবোপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অপর পক্ষে শংকর-কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েই রামমোহন তাঁর প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট বলতে পেরেছেন: "ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি বিকারভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমেশ্বরের বোধ করিবেক না যে হেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা হইতে পারে না।"[৭৭]

রামমোহনের উপর শংকরের গভীর প্রভাবের কারণগুলি অনুসন্ধান প্রসঙ্গে

উভয় মনীষীর চিন্তাধারায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, স্বরূপলক্ষণ এবং কর্মকাণ্ডের নিকৃষ্টতা সম্পর্কে রামমোহন শংকরের সঙ্গে একমত। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ও মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পার্থক্য নেই। মুক্তি সম্পর্কে রামমোহন বলেন: "....এই ভাবে মন অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্বব্যাপী অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণা করিবেন পরে মরণান্তে এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্যত্র গমন না হইয়া উপাধি হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।"[৭৮] এ উক্তি সম্পূর্ণ নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ-সম্মত। কিন্তু শংকরের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধাবান হয়েও বেদান্ত-ব্যাখ্যাতারূপে রামমোহন কয়েকটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে সেগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রাক্তন বেদান্তচার্যগণ, বিশেষত শংকর, বেদান্তকে ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রধানত যতির ধর্ম ও দর্শনরূপে। শংকর কর্ম স্বীকার করেন নি, তাঁর মতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য কর্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; আর এই সর্বোচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান একমাত্র সন্ন্যাসীরই লভ্য। ব্রহ্মসূত্র ৩. ৪. ২০ 'বিধির্বা ধারণবৎ'এর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ব্রহ্মসংস্থ অবস্থা একমাত্র সন্ন্যাস আশ্রমেই সম্ভবপর। এই স্তরে উপনীত হবার নিমিত্ত যে ব্রহ্মনিষ্ঠতার প্রয়োজন তা অর্জন করা গৃহস্থের সাধ্য নয়।[৭৯] সন্ন্যাস প্রাচীন ভারতের জীবনচর্যায় জীবনের চতুর্থ বা শেষ পর্ব রূপে অনুমোদিত। প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থাপকগণ কখনই সর্বসাধারণকে জীবনের যে কোনও পর্বে নির্বিচারে সন্ন্যাসগ্রহণের উপদেশ বা অনুমতি দেন নি। এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের ও ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ অতি স্পষ্ট। কৌটিল্য বলেন, স্ত্রী ও সন্তানগণের উপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করে যদি কেউ স্বয়ং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন বা তাঁর পত্নীকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করান, তাহলে সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হবেন। যাঁর পুরুষত্ব (অপত্য-উৎপাদন শক্তি) সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে কেবলমাত্র এমন ব্যক্তি রাজসরকারের অনুমতি নিয়ে তবে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারবেন। মনুসংহিতাতেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। মনু স্পষ্ট বলেছেন চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যই হল শ্রেষ্ঠ আশ্রম; বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, সন্তানোৎপাদন প্রমুখ প্রথম তিন আশ্রমের কর্তব্যগুলি সম্পাদন না করে যদি কোনও দ্বিজ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন সেক্ষেত্রে তাঁর গতি হবে নরকে। এই

দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত একটি মতের উদ্ভব হয়েছিল যে, সত্তর বৎসর পার হলে তবেই সন্ন্যাস গ্রহণ কর্তব্য।[৭৯ক] অবশ্য উত্তরকালে এক বিশেষ বিধিও প্রচলিত হয়, মনে বৈরাগ্যের উদয় হলেই চতুরাশ্রমপারম্পর্য উপেক্ষা করে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করতে হবে (যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ)। কিন্তু এই নিয়ম সাধারণের জন্য নয়; যাঁদের অন্তরে প্রকৃত অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে—সর্বকালে অঙ্গুলীমেয় এমন এক গোষ্ঠীর প্রতিই একমাত্র তা প্রযোজ্য। অপরপক্ষে এই বিধির অপব্যবহার সমাজ-স্থিতির পক্ষে ক্ষতিকারক, কেননা সেক্ষেত্রে ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্বের মূলেই তা কুঠারাঘাত করবে। যথেচ্ছ-সন্ন্যাস-বিধির এই বিপজ্জনক দিকটি রামমোহনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। চতুরাশ্রমপরম্পরা সম্পর্কে তিনি যে সুসমঞ্জস মত পোষণ করতেন্ তা প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজ-শাস্ত্রিগণের মতেরই অনুরূপ। সন্ন্যাস আশ্রমকে তিনি অস্বীকার না করলেও বুদ্ধ বা শংকরের মত অহেতুক প্রাধান্য দেননি, এবং ব্রহ্মজ্ঞান যে একমাত্র সন্ন্যাসীরই লভ্য শংকরের এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন নি। জ্ঞানবিজ্ঞানসমৃদ্ধ আধুনিক জীবন এই একদেশদর্শিতার বিরোধী, কারণ এই জীবনদর্শনে মানুষের ঐহিক কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক মুক্তি তুল্য মর্যাদাসম্পন্ন। ব্রহ্মজ্ঞানকে মুষ্টিমেয় সংসারবিমুখ সন্ন্যাসীর সম্পত্তি জ্ঞান করা আধুনিক বিচারশীল মনের পক্ষে সম্ভব নয়। রামমোহন তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যায় তাই নির্ভীক ভাবে ঘোষণা করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানে কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর একচ্ছত্র অধিকার নেই; যোগ্য আধার হলে সন্ন্যাসী, গৃহস্থ সকলের পক্ষেই এই মহাসম্পদ সমানভাবে লভ্য। 'ঈশোপনিষদ'এর ভূমিকায় তাঁর উক্তি: "যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্রবিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্রসম্মত হয় কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থেরো কর্তব্য হয়; তাহার উত্তর; এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থেরো আত্মোপাসনা কর্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে।...কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমৎ নহে কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়।"[৮০] কোনও অদ্বৈত-বেদান্তীর পক্ষে এই মত সম্পূর্ণ বিপ্লবী। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহাসম্পদ জাতিধর্মগোষ্ঠী-আশ্রমনিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের প্রাপ্য ও লভ্য ঘোষিত হওয়া বেদান্তদর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম। নবযুগের সর্বতোমুখী জীবনদৃষ্টির সঙ্গে এই ব্রহ্মতত্ত্বব্যাখ্যার সম্পূর্ণ

সামঞ্জস্য আছে। আধুনিক কালে অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যা ও প্রচারে রামমোহনের পরে যে মনীষী জীবনী উৎসর্গ করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দের মত এ বিষয়ে কিন্তু রামমোহনের ঠিক বিপরীত। বিবাহ ও গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রতি স্বামীজীর প্রবল বিরাগ ছিল। তিনি স্পষ্টই বলেছেন গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান অলভ্য: "যারা বলে— এ সংসারও করব ব্রহ্মজ্ঞও হবো—তাদের কথা আদপেই শুনবি নি। ও-সব প্রচ্ছন্ন ভোগীদের স্তোক বাক্য।…ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, অশাস্ত্রীয়, অবৈদিক মত।… সন্ন্যাস না নিলে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের আর উপায়ান্তর নেই।"[৮১] আধুনিক যুগের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে এ সিদ্ধান্তের মৌলিক বিরোধ সহজেই লক্ষণীয়।

বেদান্তভাষ্যকাররূপে রামমোহনের মৌলিকতার দ্বিতীয় পরিচয় মায়াতত্ত্ব ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে তাঁর ভাবনায়। অদ্বৈত-বেদান্ত-মতানুসারে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ মিথ্যা। বস্তু-জগৎ সম্পর্কে যে প্রতীতি আমাদের আছে তা মায়াপ্রসূত। অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হওয়া মাত্র এই মায়া বা অজ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে এবং মায়াজনিত জগৎ-প্রতীতিও লোপ পায়। সে অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুইয়ের পার্থক্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়, একমাত্র নির্গুণ নির্বিশেষে ব্রহ্মই থাকেন—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। এই মায়ার স্বরূপ নিয়ে আবহমানকাল থেকে বৈদান্তিকগণ অনেক আলোচনা করেছেন। বিস্তারিতভাবে সে সবের অবতারণা না করে সংক্ষেপে বলা যায় অদ্বৈত-বেদান্ত মতে মায়া সৎও নয় অসৎও নয়—এর স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; সুতরাং বর্ণনা করতে গেলে একে বলতে হয় অনির্বচনীয়।[৮২] মায়া-প্রসূত দেশকালকার্যকারণগত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি অনিত্য ও অলীক প্রবাহ-মাত্র যা পূর্বেও ছিল না পরেও থাকবে না, কেবল মধ্যে কিছুকালের জন্য ব্যবহারের গোচর হয়েছে।[৮৩] কিন্তু জগতের এই সাময়িক গোচরীভূতত্বও ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই এই ভ্রম নিরাশ করতে সমর্থ। ব্রহ্মকে অবলম্বন করে এই যে মায়াময় জগৎ-কল্পনা সাময়িকভাবে সত্যরূপে প্রতিভাত হয় এই প্রক্রিয়া ব্রহ্মস্বরূপের কোনও বিকার ঘটায় না। ব্রহ্মকে এক, অদ্বিতীয় তত্ত্ব রূপে স্বীকার করলে সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ মায়ার ন্যায় কোনও একটি ধারণাকেও স্বীকার করা প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। অদ্বৈত-বেদান্তী হিসাবে রামমোহনকেও তাই মায়া-প্রত্যয়ে বিশ্বাসী হতে হয়েছে।[৮৪] কিন্তু

আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এতে একটু অসুবিধা আছে। মায়িক বস্তুজগৎকে মিথ্যা ঘোষণা করে প্রাক্তন অদ্বৈতিগণ বেদান্তকে বহুল পরিমাণে সংসারবিমুখ বৈরাগ্যশাস্ত্রে পরিণত করেছিলেন। ব্রহ্ম যদি একমাত্র নিত্য বস্তু হন ও ব্যবহারিক জীবনের সুখ, দুঃখ, সমাজবন্ধন, কর্তব্যাকর্তব্য যদি সবই ভ্রমাত্মক ভেদজ্ঞানপ্রসূত হয়, তাহলে একমাত্র পুরুষার্থ দাঁড়ায় যথাশীঘ্র এই মিথ্যা জগৎসংসারপাশ থেকে মুক্তিলাভ করে ব্রহ্মে লীন হওয়া। অবশ্য অদ্বৈতদৃষ্টিতে এই মায়িক জগতেরও ব্যবহারিক যথার্থতা আছে। কিন্তু রামমোহনের পূর্বে কোনও অদ্বৈতিকেই সে যাথার্থ্যের এতটুকু মর্যাদা দিতে দেখা যায় না—ব্রহ্মের সঙ্গে তাকে তুল্য জ্ঞান করা তো দূরের কথা। কিন্তু রামমোহন রেনেশাঁসের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ আধুনিক মানুষ, তাঁর দৃষ্টিতে জগৎসংসারের গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। সুতরাং জগৎ-প্রতীতি মায়াজনিত হলেও একে অবজ্ঞা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। টোলচতুষ্পাঠীতে অনুসৃত প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে অদ্বৈত-বেদান্তের অনুশীলন ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলে মায়াবাদ যে সমাজের উপর অবাঞ্ছনীয় প্রভাব বিস্তার করতে পারে আমহার্স্ট্‌কে লিখিত বিখ্যাত পত্রে এমন ইঙ্গিত তাঁকে করতে দেখা যায়। লোকশ্রেয়সাধন যাঁর জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র তাঁর পক্ষে এ আশঙ্কা বিচিত্র নয়। কোন্ শাস্ত্রীয় সূত্রে তাঁর পক্ষে মায়াবাদের সঙ্গে সামাজিক প্রগতির সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়েছিল এ জিজ্ঞাসা স্বভাবত মনে উদিত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়েছে ভারতীয় শাস্ত্রাদির মধ্যে তন্ত্র রাম-মোহনের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ধর্মমতকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।[৮৫] তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়কে প্রধানত দুই ভাগ করা যায়: ১. দর্শন ও ২. ক্রিয়া। তান্ত্রিক পূজা ও সাধনপদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে কতগুলি অর্থহীন ও বিশুদ্ধ নীতিমার্গের পরিপন্থী আচার ও ক্রিয়ার সমষ্টি বলে মনে হলেও এগুলিই তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রধর্মের সব নয়। তন্ত্রের একটি গভীর দার্শনিক ভিত্তি আছে এবং সিদ্ধান্তগত ভাবে উক্ত দর্শনের সঙ্গে অদ্বৈত-বেদান্তের কোনও প্রভেদ নেই। কুলার্ণব তন্ত্রের একটি উক্তিতেই তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে:

ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্যাদাত্মচিন্তনম্।
স সর্বং পাতকং হন্যাত্তমঃ সূর্যোদয়ো যথা।[৮৬]

তন্ত্রদর্শনের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন: "The

monistic philosophy of the Vedanta forms its backbone and we see that *Brahman* is regarded as the only true Principle in the world।"[৩৭] কেবলমাত্র তত্ত্বসিদ্ধান্তই নয় তন্ত্রের পূজা-পদ্ধতি পর্যন্ত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। অপর এক বিশেষজ্ঞের মতে: "The Tantra form of worship also serves as a course of practical training for the realization of the Vedanta ideal of the identity of the finite with the Infinite।"[৩৮] সুতরাং দেখা যাচ্ছে বেদান্তের মতো তন্ত্রও একটি তত্ত্বকেই স্বীকার করেছে। বৈদান্তিক একতত্ত্ববাদী রামমোহনের নিকট তাই এ শাস্ত্র যে বিশেষ আদরণীয় হবে তা স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে যা বিশেষ পর্যালোচনার যোগ্য তা হল সৃষ্টির মূলে তন্ত্রদর্শনও মায়াশক্তির কার্যকারিত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্ত-সম্মত মায়াবাদের সঙ্গে তন্ত্রব্যাখ্যাত মায়াভাবনার কিছু মৌলিক প্রভেদও লক্ষণীয়। প্রথমত অদ্বৈতিগণের ব্যাখ্যাত মায়া ব্রহ্মের রহস্যময়ী সৃজনীশক্তি হলেও তা সৎও নয় অসৎও নয়। কিন্তু তন্ত্রোক্ত মায়াশক্তি নিত্য, সৎ ও পরমাত্মস্বরূপেরই অংশবিশেষ। বেদান্তের মায়িক জগৎ যেখানে পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা, তন্ত্রব্যাখ্যাত মায়াশক্তিপ্রসূত জগৎ সেখানে নিত্য ও চিরন্তন। দ্বিতীয়ত বৈদান্তিক মায়া ব্রহ্মস্বরূপে আরোপিত শক্তিরূপে কল্পিত হলেও তা জড়শক্তি; কিন্তু তান্ত্রিক মায়া চিৎশক্তিরই রূপান্তর বা আবৃত চিৎশক্তি। বস্তুত তন্ত্রে ব্রহ্ম (শাক্ততন্ত্রের পরিভাষায় শিব) ও মায়াকে একই তত্ত্বের স্থির ও চঞ্চল দুই প্রকাশ রূপে গণ্য করা হয়েছে।[৩৯] মায়া-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক পার্থক্যের জন্য বেদান্ত ও তন্ত্রের মধ্যে বস্তুজগৎ সম্পর্কেও মনোভাবের পার্থক্য এসেছে। অদ্বৈত-বেদান্ত মায়িক জগৎকে অলীক জ্ঞান করে স্বভাবত বৈরাগ্যের উপর জোর দিয়েছে; তন্ত্র মায়াপ্রসূত জগৎকে নিত্য ও সত্য ধারণা করেছে ও সেই হেতু অনিবার্যভাবেই এই দর্শনে এসেছে এক বলিষ্ঠ জীবনস্বীকৃতি। জনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিতের ভাষায়: "...বৈদিক সাধকের ন্যায় তান্ত্রিক সাধকের সংসারে নরক দর্শন করিতে হয় না। বৈদিক সাধকগণ স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, ভৃত্য পরিজনময় সংসারের যে ঘৃণিত বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা শুনিলে স্বাভাবিক পুরুষেরও ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তান্ত্রিক সাধকগণ সেই সংসারেই ব্রহ্মানন্দ তরঙ্গ দেখিয়া সংসারের কার্যকারণ

প্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষরূপে সাধনার সোপান পরম্পরা বলিয়া…দেখাইয়া দিতেছেন।"[২০] অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক রূপে রামমোহন মায়াবাদকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করলেও আধুনিক যুগোপযোগী সমাজকল্যাণাদর্শের সঙ্গে তাকে সমন্বিত করবার সমস্যা তাঁর ছিল। টোলচতুষ্পাঠীতে প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির বেদান্ত-চর্চায় এর কোনও সমাধান খুঁজে পাওয়াও সম্ভব ছিল না। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন তাঁর মতে অবশ্য সর্বোত্তম প্রতিষেধক। কিন্তু সে তো শাস্ত্রীয় সমাধান নয়। শাস্ত্রব্যাখ্যাতারূপে শাস্ত্রীয় সমন্বয়ের প্রয়োজনও তাঁর নিশ্চয় ছিল। তাঁর চিন্তায় তন্ত্রদর্শনের গভীর প্রভাবের কথা স্মরণ রাখলে এমন অনুমান অবশ্যই করা চলে যে তন্ত্রপ্রদত্ত মায়াবাদের অভিনব ব্যাখ্যা তাঁকে ব্রহ্মের *সৃষ্টিশক্তিরূপে* মায়ার ঋণাত্মক *মিথ্যাত্ব* অপেক্ষা তার সৃষ্টিশীলতার উপর বেশি পরিমাণে জোর দিতে প্রণোদিত করেছিল। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদকে ত্যাগ না করেও তিনি তান্ত্রিক শক্তিবাদের দ্বারা তাকে বহুল পরিমাণে মার্জিত ও যুগোপযোগী করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অদ্বৈত-বেদান্তিরূপে রামমোহনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মোপাসনার প্রতি অসীম গুরুত্ব আরোপ। শংকরের মতে উপাস্য-উপাসকের পরস্পর-সম্বন্ধ ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।[২১] সুতরাং মায়িক ভেদ-জ্ঞানের জগৎ অতিক্রম করে জীব অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলে আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু রামমোহন শংকরের মতো অদ্বৈতজ্ঞানভিত্তিক মুক্তিকে সাধনার চরম লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নিলেও খুব জোর দিয়েই বলেছেন যে ব্রহ্মোপাসনাই চরম মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় এবং মোক্ষপ্রাপ্তির পরেও উপাসনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বাদশ সূত্র 'আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্' এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাঁর উক্তি স্মরণীয়: "মোক্ষ পর্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক, জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার ত্যাগ করিবেক না যেহেতু বেদে মুক্তি পর্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক এমত দেখিতেছি।"[২২] এই সূত্রভাষ্য ছাড়া 'গায়ত্রীর অর্থ' (১৮১৮), "প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩), 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্' (১৮২৭), 'ব্রহ্মোপাসনা' (১৮২৮), 'অনুষ্ঠান' (১৮২৯), 'ক্ষুদ্রপত্রী' শীর্ষক পুস্তিকাগুলিতেও রামমোহন তাঁর উপাসনা সম্পর্কিত মতামত বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন। এই-সব আলোচনা থেকে দেখা যায় তাঁর মতে উপাসনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুটি

অঙ্গ আছে। ব্যক্তিগত উপাসনাতে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণই অবলম্বনীয়। স্বরূপচিন্তন সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ: "পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন।" এই সূত্রে আরও বলা হয়েছে, "ইন্দ্রিয়দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়।"[৩] এই উপাসনার লক্ষ্য নির্বিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ এবং এর জন্য প্রয়োজন শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি সাধনসম্পদ্।[১৪] সমষ্টিগত বা সামাজিক উপাসনা সম্পন্ন করতে হবে সগুণ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ অনুশীলনের মাধ্যমে: "পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে আপনার আয়ুর এবং দেহের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন এবং তাঁহাকে, ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্বদা তাঁহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্বদা কর্তব্য যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।"[১৫] ব্রহ্মোপাসকের লোকব্যবহারের মান কী হবে এ বিষয়েও রামমোহনের নির্দেশ সুস্পষ্ট। আত্মোপাসক ও আত্মজ্ঞানী ভুলতে পারেন না তিনি সামাজিক জীব। সুতরাং যুক্তি ও ন্যায়সম্মত লোকব্যবহার তাঁর অবশ্য কর্তব্য: "বশিষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন আর রাজনীতি এবং গৃহস্থব্যবহার করিয়াছিলেন ইহা যোগবাশিষ্ঠ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান কৃষ্ণ অর্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অর্জুনও ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞানশূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।"[১৬] অপর পক্ষে সামাজিক উপাসকগণের সম্পর্কে রামমোহনের দুটি অনুশাসন: ১. সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রাতৃভাবে প্রীতিপূর্ণ আচরণ কর্তব্য;[১৭] ২. "অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয় সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না।"[১৮] মনে রাখতে হবে রামমোহনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনা পরস্পরের পরিপূরক, একটিকে ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। সামাজিক

উপাসনা দ্বৈতভূমির অন্তর্গত, এর মধ্যে ভক্তি ও অনুরাগের বিশিষ্ট স্থান আছে; কিন্তু ব্যক্তিগত আত্মোপাসনা বা সাধনের লক্ষ্য অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা সম্পন্ন সামাজিক সগুণ উপাসনা প্রথমাধিকারীর জন্য; তা অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন।[৯৮ক] এইভাবে রামমোহন তাঁর উপাসনার ধারণায় দ্বৈতাদ্বৈতক্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাস্কর ও মধ্ব-প্রদত্ত ৩.৩.৪. সংখ্যক ব্রহ্মসূত্র 'সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ' রামমোহন নিজ ভাষ্য-গ্রন্থে কেন গ্রহণ করেছিলেন তা হয়তো কিছুটা বোঝা যায়। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'সমুদ্রেতে যেমন সকল (জল) প্রবেশ করে সেইরূপ সকল উপাসনার তাৎপর্য ঈশ্বরে হয়।'[৯৯] উপাসনার এই ক্রমদ্বয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যায় সূত্রটি তাঁর সহায়ক হয়েছিল। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখা গেল উপাসনাতত্ত্বের ব্যাখ্যায় রামমোহন শংকরমত হতে বহু দূরে সরে এসেছেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনার ক্রমদ্বয়কে মিলিয়ে তিনি জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়স্থাপনেরও প্রয়াস পেয়েছেন। এদেশের শংকরের পরবর্তী অদ্বৈতবাদী বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে এমন সমন্বয়ের আভাস কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। শ্রীধর স্বামী তাঁর বিষ্ণুপুরাণ, গীতা ও ভাগবতের উপর সুবিখ্যাত টীকাত্রয়ে শংকরের সমস্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করেও বলেছেন ভক্তিই অদ্বৈত-মুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। স্বয়ং চৈতন্যদেবের গুরুপরম্পরায় মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, এবং কেশব ভারতীও এই প্রকার ভক্তিবাদী শংকরপন্থী ছিলেন এমন কথা মনে করবার কারণ আছে। এ ছাড়া চতুর্দশ শতকে বিদ্যারণ্য, ষোড়শ শতকে মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতিগণও উপাসনা ও ভক্তিকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বিদ্যারণ্যের মত যেন রামমোহনেরই প্রতিধ্বনি: "উপাসনার সামর্থ্যবশত মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; অতএব জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর উপায়ান্তর নেই, শাস্ত্রের এই উক্তির সঙ্গে উপাসনার কোনও বিরোধ নেই।"[১০০] রামমোহনের শাস্ত্রালোচনামূলক গ্রন্থগুলি অনুশীলন করলে এই প্রতীতিও জন্মায় যে তাঁকে এ বিষয়েও প্রভাবিত করেছিল ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র।[১০১] কিন্তু উপাসনা-তত্ত্বে রামমোহনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য সর্বপ্রকার প্রতীক-বর্জনে। প্রতীকে আত্মদৃষ্টি না করবার প্রেরণা তিনি শংকরের নিকট পেয়েছিলেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অপর পক্ষে অদ্বৈতবেদান্তই হোক বা তন্ত্রই হোক, প্রচলিত প্রতিমাপূজাকে কেউ বর্জন

করে নি। এমন কি, একতত্ত্ববাদী শংকর পর্যন্ত এ জাতীয় পূজার্চনাকে গুরুত্ব না দিলেও সেগুলির ব্যবহারিক যথার্থতা অস্বীকার করতে চান নি। রামমোহন কিন্তু এখানে অধিকতর একনিষ্ঠ। তর্কের খাতিরে পুরাণ-তন্ত্র-প্রোক্ত প্রতিমা-পূজাকে নিম্নাধিকারিগণের জন্য প্রদত্ত বিধান বলে স্বীকার করে নিলেও তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন, প্রচলিত প্রতিমাবদ্ধ দেবোপাসনায় দেবদেবীতে ঈশ্বরভাব আরোপ করবার পরিবর্তে উপাসকগণ সর্বপ্রকার তামসিক মানুষীভাবের আরোপই সর্বত্র করে থাকেন। হিন্দুসমাজের প্রচলিত উপাসনাবিধিতে নামরূপে ব্রহ্মের আরোপের পরিবর্তে ব্রহ্মে নামরূপারোপেরই প্রাধান্য।[১০১ক] সুতরাং যা নামে প্রতীকোপাসনা তা পরিণামে হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থূল জড়োপাসনা। ঈশোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় তিনি এর সামাজিক ও নৈতিক কুফল সম্পর্কে অতি নিপুণ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১০২] সুতরাং তাঁর পরিকল্পিত নির্গুণ আত্মোপাসনা ও সগুণ সামাজিক উপাসনা উভয়ই অনিবার্যভাবে এই জাতীয় প্রতীকের সর্বসংস্রববর্জিত। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে বিচারে তাঁর অন্যতম বক্তব্য ছিল, সগুণ উপাসনার অর্থ সাকার উপাসনা নয়।[১০৩] সর্বশেষে বলা যায় সামাজিক উপাসনার কেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মসভাকে তিনি যে সর্বসম্প্রদায়ের মিলনভূমিরূপে কল্পনা করেছিলেন এ ছিল তাঁর সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টি। এমন স্বপ্ন দেখা প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণের সাধ্যাতীত ছিল।

বেদান্তব্যাখ্যাতারূপে রামমোহনের চতুর্থ ও শেষ বৈশিষ্ট্য সমাজকল্যাণের আদর্শের সঙ্গে ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্যবিধান করা। এই সমাজমুখীন দৃষ্টি তিনি লাভ করেছিলেন মুখ্যত আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মাধ্যমে এ কথা সর্বথা স্বীকার্য। খ্রীষ্টধর্মের জনসেবা ও মানবপ্রীতির আদর্শও তাঁর সামনে সে যুগে খুব বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল। মরমী ফার্সী কবি সাদির যে বাণীটি তাঁর অতি প্রিয় ছিল তা এই: "মানবসেবাই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।" এই মানবিকতাবাদের মনোভাব তাঁর বেদান্তব্যাখ্যাতেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত 'পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ' (৩.৩.৫৩) সূত্রটির ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন: "পরমেশ্বর এবং তাঁহার জনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি আর তাদ্বিধ্য অর্থাৎ প্রীত্যনুকূল ব্যাপার এই দুই মুখ্য উপাসনা হয়।"[১০৪] ঈশ্বরপ্রীতিকে ব্যক্তিস্তরে আবদ্ধ না রেখে তাঁর সৃষ্ট সর্বপ্রাণীর মধ্যে সম্প্রসারিত

করে দেওয়া এবং এই প্রেমের দ্বারা লোকব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশের মধ্যেই লোকসেবার আদর্শটি রূপ পেয়েছে। সার্বভৌম প্রীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ মানব-কল্যাণের এই আদর্শ নূতন যুগের নূতন মন্ত্র। এই উত্তরাধিকার রামমোহন রেখে গিয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণের জন্য। পরবর্তী এক শতাব্দীরও অধিক কাল এই সেবাদর্শ নানা রূপে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রচিত ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" (ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্যসাধনই তাঁর উপাসনা) বা স্বামী বিবেকানন্দের "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"—উক্ত মূল বাণীরই বিভিন্ন রূপ। সাধারণ মানুষের প্রতি এই অনুরাগকে রামমোহন নানা স্থানে 'প্রীতি' 'স্নেহ'[১০৭] 'দয়া'[১০৮] ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে তিনি তাঁর শাস্ত্রবিচারমূলক প্রথম গ্রন্থেই (১৮১৫) এই প্রত্যয়টিকে তাঁর বৈদান্তিক তত্ত্বসিদ্ধান্তের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। এ ব্যাখ্যা অনন্য। এই উদার মানবপ্রীতির মন্ত্রে কোনও প্রাক্তন বেদান্তভাষ্যকারই দীক্ষিত ছিলেন না। শংকর বা অন্য কোনও ব্যাখ্যাতাই আলোচ্য সূত্রের এমন অর্থ করেন নি।

বেদান্তভাষ্যকার ও বৈদান্তিক রূপে রামমোহনকে মূল্যায়নের যে প্রচেষ্টা করা গেল তাতে সম্ভবত প্রমাণিত হচ্ছে যে তিনি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত ধারার শেষ বেদান্তভাষ্যকার ও সেই সঙ্গে আধুনিক কালে এদেশে বৈদান্তিক চিন্তাধারার যুগোপযোগী নবরূপায়ণের অগ্রদূত। পূর্বেকার অতি ক্ষীণ বেদান্তচর্চার ধারাকে গণ্ডিবদ্ধ রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি প্রবল স্রোতস্বিনীতে পরিণত করেন। আচার্য শংকরের পরম ভক্ত হয়েও তিনি তাঁর অন্ধ অনুসারী নন। অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষায় এ তত্ত্ব যে সর্বদা সামাজিক প্রগতির উপযোগী হয় না এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাই নূতন পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সমন্বিত করে বেদান্ত অধ্যাপনার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নূতন শিক্ষায়তন। গৃহী, সন্ন্যাসী সকলের জন্য নির্বিচারে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার উন্মুক্ত করে সামাজিক জীবনে বেদান্তকে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনিই অগ্রণী। বেদান্তের ব্রহ্মবাদকে আশ্রয় করে উদার অসাম্প্রদায়িক নিরাকার উপাসনা-পদ্ধতির স্রষ্টাও রামমোহন যার মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় উপাসনারই

ক্রমানুসারে স্থান আছে। সর্বোপরি মানবপ্রেম ও সেবাধর্মকে ব্রহ্মবাদের অন্তর্ভুক্ত করে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর নব মানবিকতাবাদের ভিত্তিও স্থাপন করেছেন বেদান্ত-দর্শনে যা কোনও প্রাক্তন আচার্যের দ্বারা সম্ভব হয় নি। বৈদান্তিক হিসাবে তাঁর এই কীর্তিসমূহের কথা স্মরণে রাখলে বোঝা সহজ হয় কেন তাঁর সমকালীন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন তাঁকে তাঁর সময়কার অদ্বিতীয় বেদান্তজ্ঞ জেনে শংকরাচার্যের কালনির্ণয়ের প্রশ্নে সমকালীন প্রাচীনপন্থী দেশীয় পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন;[১০৭] আর কেনই বা তাঁর মৃত্যুর পর, 'সমাচার-দর্পণ' পত্রিকা—যা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি সর্বদা প্রসন্ন ছিল না--১ মার্চ, ১৮৩৪ সংখ্যায় এক শোক-গাথা প্রকাশ করে লিখেছিল :

"বেদান্তশাস্ত্রের অন্ত নিতান্ত এবার।
স্তব্ধ হইয়া শব্দশাস্ত্র করে হাহাকার।"[১০৮]

প্রমাণপঞ্জী :

১. বিভিন্ন যুগে রচিত এই সাম্প্রদায়িক বেদান্তভাষ্যগুলির তালিকা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য J. N. Farquhar, *An Outline of Religious Literature of India*, Oxford, 1920, p. 287 ; S. Radhakrishnan, *The Brahma Sutra* London, 1960, p. 27 ; যে ধর্মসম্প্রদায়গুলির নিজস্ব বেদান্তভাষ্য ছিল না তাঁরা ক্রমশ অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন ও অবলুপ্তির পথে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যাঁরা বেদান্তভাষ্য রচনা করেন নি তাঁরাও প্রয়োজনমত নিজ নিজ মতের বৈদান্তিক ব্যাখ্যা দিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এর অন্যতম উদাহরণ অধুনালুপ্ত সূর্যোপাসক সৌর সম্প্রদায়। এঁদের কোনও স্বতন্ত্র বেদান্তভাষ্য ছিল বলে জানা নেই, কিন্তু আনন্দগিরি প্রণীত 'শংকরবিজয়' গ্রন্থের ত্রয়োদশ প্রকরণে বর্ণিত শংকরাচার্যের সঙ্গে সৌরগণের বিচারপ্রসঙ্গে সৌরগণকে বেদান্তমত প্রকাশ করতে দেখা যায়। পূর্বপক্ষে তাঁদের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে : "সূর্যই পরমাত্মা ও জগৎকারণ।...আমরা সূর্যের সর্বাত্মত্ব ও পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করে থাকি" ('সূর্য এব পরমাত্মা জগৎকারণং বর্ততে।...আত্মাং হি সূর্যস্য সর্বাত্মত্বং অস্যৈব চ পরব্রহ্মত্বং প্রতিপাদিতং ভবতি'—'শংকরবিজয়', জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৬৮, পৃ. ১০)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিজস্ব বেদান্তভাষ্যের অভাবে দীর্ঘকাল সর্বভারতীয় বৈষ্ণবসমাজে পূর্ণ মর্যাদা পান নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য রচনা করে

এই অভাব দূর করেন, দ্রষ্টব্য S. K. De. *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal* (1st ed.) Calcutta, 1942. p. 17

২. স্বর্গত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক তাঁর 'Rabindranath as Vedantist' প্রবন্ধে উদ্ধৃত ; দ্রষ্টব্য *Visva Bharati Quarterly* Tagore Birthday Number, May-October, 1941, p. 81

৩. *The Father of Modern India*, Raja Rammohun Roy Centenary Commemoration Volume, Calcutta, 1935, Part II, p. 162

৪. চন্দ্রশেখর দেব, 'Reminiscences of Rammohun Roy.' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃ. ১৩৯-৪০

৫. Collet, p. 459

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ১৬), পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৬৩

৭. Collet, p. 460

৮. *Ibid*

৯. *Ibid*. pp. 458-59 ; আমহার্স্টকে লিখিত রামমোহনের শিক্ষাবিষয়ক পত্রখানি পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সূচকরূপে কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু এই পত্রে দেশে সংস্কৃত-শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে তিনি ইঙ্গিতে যে সুচিন্তিত প্রস্তাব করেছিলেন তাঁর শিক্ষা-চিন্তার আলোচনাপ্রসঙ্গে তা বিশেষ উল্লিখিত হতে দেখা যায় না। একসময়ে দেশের টোল-চতুষ্পাঠীসমূহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা ভূস্বামী প্রভৃতি সমাজের বিত্তশালী সম্প্রদায়। আধুনিক যুগে ধীরে ধীরে এই সমর্থন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে শাসক-সম্প্রদায় যেটুকু সাহায্য দিতে অগ্রসর হলেন তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ফলে সংস্কৃতচর্চার এই প্রকৃত প্রাণকেন্দ্রগুলির শক্তি প্রায় নিঃশেষিত ও স্ব স্ব বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতসম্প্রদায়ও অবলুপ্তির পথে। রামমোহন-প্রস্তাবিত পথে যথাসময়ে সরকারের সংস্কৃত-শিক্ষানীতি নির্ধারিত হলে প্রাচীন সংস্কৃত-শিক্ষাপদ্ধতির ও সংস্কৃতচর্চার এ দুরবস্থা হত না। সাম্প্রতিক কালের সংস্কৃত-গবেষকগণের মধ্যে এ-সম্পর্কে রামমোহনকে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করেছেন সম্ভবত একমাত্র পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দ্রষ্টব্য "বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা", বাঙালীর সারস্বত অবদান, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ৩১৬, পাদটীকা ৭

১০. Collet. p. 189 ; আশ্চর্যের বিষয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রামমোহন রায়' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা) গ্রন্থে কুত্রাপি রামমোহন কর্তৃক এই বেদান্ত-বিদ্যালয়-স্থাপন-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি। সাধারণভাবে বর্তমানে যাঁরা রামমোহনের শিক্ষাসংস্কার-নীতির আলোচনা করে থাকেন তাঁদের অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার-কল্পে রামমোহনের চিন্তা ও কার্যাবলীর উল্লেখ করলেও তাঁর বেদান্ত-বিদ্যালয় সম্পর্কে নীরব।

১১. ভারতপথিক রামমোহন রায়, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৩৬৬, পৃ. ৭৪

১২. W. Ward. *Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos*, Vol. I Baptist Mission Press, Serampore, 1811, p. 198

১৩. *Ibid*, p. 199

১৪. *Ibid*, p. 339

১৫. সংক্ষিপ্ত 'বিবরণ' নামটি থেকে সঠিক অনুমান করা কঠিন, কোন্ গ্রন্থটির উল্লেখ এখানে অভিপ্রেত। এই প্রসঙ্গে নৃসিংহাশ্রম মুনি প্রণীত 'পঞ্চপাদিকা'র টীকা 'বিবরণতাৎপর্যপ্রকাশিকা' শীর্ষক গ্রন্থখানির নামও মনে পড়ে।

১৬. W. Ward, A *View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos* (Second Edition), Vol. I, Serampore, 1818, Chapter VI (Of the present State of Learning among the Hindoos), Section II (Colleges), pp. 588-94 ;

১৭. William Adam, *Reports on the State of Education in Bengal (1835 and 1838)* ed A. Basu, University of Calcutta, 1941 pp, 16-23, 50-51, 57-58, 70-73, 75-82, 85-86, 92, 95-96, 103-04, 106-07, 112-14, 119-22, 166-84, 253-77

১৮. *Ibid* pp, 180-81

১৯. Montgomery Martin, *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India* Vol II (London, 1838) p. 718

২০. *Ibid*, Vol. III London, 1838, pp. 133, 505

২১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস ; প্রথম খণ্ড : ১৮২৪-১৮৫৮, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃ. ২২-২৪, ৪০

২২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাগবাজারে অবস্থিত তাঁর নিজস্ব চতুষ্পাঠীতে বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন ; দ্রষ্টব্য—'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৫২, পৃ. ২৬-২৭। কিন্তু সমকালীন সাক্ষ্য থেকে জানা যায় মৃত্যুঞ্জয় চতুষ্পাঠীতে ন্যায় ও স্মৃতির অধ্যাপনাই করতেন, বেদান্তের নয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশনের পাদ্রী ওয়ার্ড তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে লিখেছেন কলিকাতার তদানীন্তন টোল-চতুষ্পাঠীগুলিতে প্রধানত ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রই পড়ানো হত এবং এই ন্যায় ও স্মৃতির অধ্যাপকগণের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় অন্যতম ছিলেন। তাঁর বাগবাজারের চতুষ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করত ("The following among the college are found in Calcutta and in these the nyayu and smritee shastrus are principally taught :...Mrityunjuyu Vidyulunkaru of Bagbazar, fifteen ditto." W. Ward. *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos*, Second Ed., Vol I, Serampore, 1818, pp. 592-93)। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশনের যাজকগণ মৃত্যুঞ্জয়কে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন—তাই ওয়ার্ডের উক্তি মিথ্যা হবার কোনও কারণ

নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুঞ্জয় সমকালীন কলিকাতার অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতো ন্যায় ও স্মৃতির অধ্যাপনাই করেছেন ; বেদান্তের সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকলেও তিনি যে কদাচ বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন এ বিষয়ে প্রমাণাভাব।

২৩. 'কবিতাকারের সহিত বিচার'—গ্রন্থাবলী-২, পৃ. ৬৮ ; 'ঈশোপনিষৎ'এর ভূমিকার 'অনুষ্ঠান' অংশেও রামমোহনকে এই বলে আক্ষেপ করতে দেখা যায়, বিরোধীপক্ষ তাঁর বেদান্তের বাংলা ভাষ্যকে অশাস্ত্রীয় আধুনিক মত আখ্যা দিয়ে পাঠকগণকে তার অনুশীলন থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করছেন—দ্রষ্টব্য 'ঈশোপনিষৎ' গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২০৪

২৩. (ক). 'পাষণ্ডপীড়ন'—গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ৫৬ ; 'পথ্যপ্রদান',—গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ১৪১

২৪. 'বেদান্তচন্দ্রিকা', গ্রন্থাবলী ১, পৃ ১৩১

২৫. তদেব, পৃ. ১৪২

২৬. 'কবিতাকারের সহিত বিচার', গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৭১

২৭. Collet, pp. 8-9

২৮. Collet, pp. 14-15,412 ; এলাহাবাদ কেন্দ্রীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত 'বেনারস কমিশনার দফ্‌তর'এর Miscellaneous Revenue Records-এ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই মাসের কর্মরত কর্মচারিগণের তালিকায় রামমোহন রায়ের নাম উল্লিখিত আছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীস্টিফেন. এন, হে. অনুগ্রহপূর্বক এই তথ্যটি বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন। অবশ্য এই উল্লেখ খুব স্পষ্ট না হলেও ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের কোনও সময়ে যে রামমোহন কাশীর সরকারী রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী ছিলেন এতে তা প্রমাণিত হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন সিভিলিয়ান জন ডিগবির অধীনে কর্মগ্রহণ করেন ও যথাক্রমে তাঁর সঙ্গে রামগড়, যশোর, ভাগলপুর ও রংপুরে অবস্থান করেন। এর মধ্যে তাঁর রংপুর-প্রবাস (১৮০৯-১৮১৫) দীর্ঘতম। ১৮০৩ থেকে ১৮০৫ তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব স্পষ্ট নয়। এই সময়ের মধ্যে পুনর্বার কাশী-গতায়াতের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, রামমোহনের সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার বহুল পরিমাণে তাঁর গুরুস্থানীয় অন্তরঙ্গ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূতের নিকট প্রাপ্ত শিক্ষার ফল। চোদ্দ বৎসর বয়সে নিজগ্রাম রাধানগরে রামমোহন এঁর সঙ্গে পরিচিত হন (রামমোহন রায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, পৃ. ১৩)। আজীবন রামমোহন এঁকে অসীম শ্রদ্ধা ও এঁর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করে এসেছেন। সন্ন্যাসজীবনে হরিহরানন্দও কাশীবাসী হয়েছিলেন, যদিও রংপুরে ও কলিকাতায় ইনি রামমোহনের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। হরিহরানন্দের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল ন্যায় এবং তন্ত্রশাস্ত্রদ্বয়ে। রামমোহন তাঁর নিকট বিশেষভাবে তন্ত্রশাস্ত্রই অধ্যয়ন করেছিলেন। ইনি যে রামমোহনের বেদান্তের আচার্য ছিলেন এমন প্রমাণ নেই। (দ্রষ্টব্য Collet, pp. 101-02 ; নগেন্দ্রনাথ পৃ. ৭০৬-০৮ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩১-৩২)।

২৯. রামমোহন রচিত ও প্রকাশিত 'গীতা'র পত্তানুবাদ বর্তমানে যে পাওয়া যায় না তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান 'গীতা'র মর্মার্থ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কী ছিল তা জানতে স্বভাবত কৌতূহল হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'সহমরণ বিষয়' গ্রন্থে তিনি স্বকৃত গীতানুবাদের উল্লেখ করেছেন: "সহমরণাদিরূপ কাম্য কর্মের নিন্দা ও নিষেধের ভূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদ্‌গীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে…।" (গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ৫৬)। মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবত পুরাণ, একাদশ স্কন্ধের এক বঙ্গানুবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে রামমোহন-কৃত গীতা-অনুবাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন (বিবিধার্থ-সংগ্রহ, আষাঢ় ১৭৮০ শক, পৃ. ৭২)। আরও দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা) পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৯৬-৯৭। 'গীতা'কে রামমোহন সর্বশাস্ত্রসার জ্ঞান করতেন (দ্রষ্টব্য "…এবং সকল স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসের সার যে ভগবদ্‌গীতা তাহাতে লিখিতেছেন…", সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ, ১৮১৮, গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ৭), এবং অনেক সময়ে বন্ধুদের বলতেন, "গীতার কথা শুনেনা যে, তার কথা শুনবে কে?" (নগেন্দ্রনাথ, পৃ. ৩৪৬)। আমাদের নবজাগরণের চিন্তাধারার সঙ্গে ভগবদ্‌গীতার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, বঙ্কিমচন্দ্র, টিলক, অরবিন্দ, গান্ধীজি প্রভৃতির গীতাভাষ্যই তার প্রমাণ। রামমোহন এক্ষেত্রে এঁদের পূর্বসূরী।

৩০. রামমোহন প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্রের শাংকর ভাষ্যের সংস্করণ বর্তমানে অতি দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে এর দুইখানি আছে (*Catalogue of Sanskrit Books in the Government Sanskrit College Library, Calcutta*, Vedanta Nos, 239 and 240)।

৩১. রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, ১৮৮০, পৃ, ৮১২

৩২. চন্দ্রশেখর বসু, বেদান্ত-প্রবেশ (কলিকাতা, ১২৮২), পৃ. ১৫০-৫১

৩৩. 'গোস্বামীর সহিত বিচার'—গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫৭ : *The Rights of Hindus over Ancestral Property* (1830) গ্রন্থেও তিনি এই বচন উদধৃত করেছেন, সেখানে প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষাংশের পাঠ—'ন কর্তব্যোহর্থনির্ণয়ঃ: দ্রষ্টব্য, *English Works*, Pt. I, p. 20n

৩৪. The English Translation of the Kenopanishad—Introduction—*English Works* Part II, p. 15 ; এই সম্পর্কে মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উক্তি স্মরণীয়: "Simultaneously with the restoration of his theistic faith came a new view of the meaning and purpose of scriptural authority. He declared that the light of individual reason had to be reconciled with the authority of the scripture as repositories of the collective wisdom of the race. Neither reason nor authority is sufficient for the guidance of life, in the uncertainties and

weaknesses of man's moral and intellectual equipment, and the reconciliation of the two can alone furnish such guidance as is available to man. *Rammohun The Universal Man*, (1st ed. Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta) p. 18

৩৫. Carpenter, *Last Days* p. 98

৩৬. ব্রাহ্মণ সেবধি, সংখ্যা ২ : গ্রন্থাবলী ৫. পৃ. ১৫. ১৬ ; এ ক্ষেত্রে রামমোহনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শংকরাচার্যের মতের সম্পূর্ণ মিল। ব্রহ্মসূত্রের 'স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ' (২. ১. ১,) শীর্ষক সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শংকর বলেছেন, "বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে ; পুরুষবচসাংতু মূলান্তরাপেক্ষং বক্তৃস্মৃতিব্যবহিতঞ্চেতি বিপ্রকর্ষঃ।" মর্মার্থ : 'সূর্যালোক যেমন রূপবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায় তেমনি বেদ স্বতঃপ্রমাণ, কিন্তু পুরুষবাক্য (স্মৃতির বচন) মূলসাপেক্ষ (শ্রুতিনির্ভর) এবং (সেই হেতু) দূরাবস্থিত (অর্থাৎ পরোক্ষ) জ্ঞানের জনক'। অন্যত্র ব্রহ্মসূত্রের, 'অপিসংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্,' (৩. ২. ২৪.) শীর্ষক সূত্রের ব্যাখ্যায় শংকর 'প্রত্যক্ষ' অর্থে শ্রুতি এবং 'অনুমান' অর্থে স্মৃতি ধরেছেন (প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ)। এই সূত্রের নিজকৃত ভাষ্যে রামমোহনও শংকরকে অনুসরণ করে বলেছেন, "সংরাধনে অর্থাৎ সমাধিতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয় এইরূপ প্রত্যক্ষে অর্থাৎ বেদে এবং অনুমানে অর্থাৎ স্মৃতিতে কহেন।"—'বেদান্তগ্রন্থ' গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৭৩ ; মীমাংসা শাস্ত্রে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির প্রামাণ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম বিচার আছে, দ্রষ্টব্য K. C. Sarkar *Mimansa Rules of Interpretation* (Calcutta 1909) pp. 231-39

৩৭. 'মাণ্ডূক্যোপনিষৎ' : ভূমিকা গ্রন্থাবলী ১. পৃ. ২৪৪ ; 'সে কেবল বেদশিরোভাগ উপনিষদ্ হয়েন' উক্তি রামমোহনের নিজের ব্যাখ্যা, মূলে নেই। রামমোহন এর যথাযথ অনুবাদও অন্যত্র করেছেন, দ্রষ্টব্য, 'মুণ্ডকোপনিষৎ' : গ্রন্থাবলী ১, পৃ.২৬০, আরও দ্রষ্টব্য 'চারি প্রশ্নের উত্তর' : গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ১০

৩৮. শংকর : অধ্যাসভাষ্য : "দেহেন্দ্রিয়াদিষহংমমাভিমানহীনস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ন হি ইন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্যক্ষাদি-ব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণ ইন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারঃ সম্ভবতি। ন চানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতস্মিন সর্বস্মিন্নসতি অসঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি। তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি।...শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি বুদ্ধিপূর্বকারী নাবিদিত্বাত্মনঃ পরলোকসম্বন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি ন, বেদান্তবেদ্যমশনায়াদ্যতীতমপেতব্রহ্মক্ষত্রাদিভেদমসংসার্যাত্মতত্ত্বমধিকারেঽপেক্ষ্যতে অনুপযোগাদধিকারবিরোধাচ্চ।" বৈদিক কর্মকাণ্ড-ভিত্তিক পূর্বমীমাংসা দর্শনের প্রবক্তাগণের সঙ্গে জ্ঞানমার্গাবলম্বী শংকর ও তাঁর অনুগামিগণের এই বিষয়ে দীর্ঘকাল তীব্র বাদানুবাদ চলেছিল। শংকর-শিষ্য সুরেশ্বর তাঁর 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে মীমাংসকগণের মত খণ্ডনপূর্বক জ্ঞানমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনে প্রযত্ন করেছেন, উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১।৫৪, ৯৯

৩৯. শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩. ৪. ৩৬. (অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ) ; ৩, ৪. ৩৭, (অপি চ স্মর্যতে) ; রামমোহন এই দুই সূত্রের ভাষ্যে শংকরকেই অনুসরণ করেছেন, যথা "...আশ্রমের ক্রিয়া বিনাও জ্ঞান জন্মে ; রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এমত নিদর্শন বেদে আছে। স্মৃতিতেও আশ্রম বিনা জ্ঞান জন্মে এমত নিদর্শন আছে।"—বেদান্তগ্রন্থ : গ্রন্থাবলী ১. পৃ. ৯৬

৪০. 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৯৮

৪১. বেদান্তগ্রন্থ : ভূমিকা : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৩ ; আরও দ্রষ্টব্য, কবিতাকারের সহিত বিচার, গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৮৪ ; A Defence of Hindoo Theism in reply to the Attack of an Advocate for Idolatry at Madras : *English Works* Pt. II, p. 85 ; English Translation of the Kenopanishad ; Introduction *English Works* Pt. II, p. 14.

৪২. ঈশোপনিষৎ : ভূমিকা ; গ্রন্থাবলী ১. পৃ. ১৯৫-৯৬ ; রামমোহন রায়, উপনিষদ (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, ১৯৭০) পৃ. ২০, ২৩ ; আরও দ্রষ্টব্য, বেদান্তগ্রন্থ : ভূমিকা : গ্রন্থাবলী ১, পৃ, ৬ : মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ভূমিকা ; গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৪৪-৪৫

৪৩. ব্রাহ্মণ সেবধি—সংখ্যা ২ , গ্রন্থাবলী ৫, পৃ. ১৪-১৫ ; আরও দ্রষ্টব্য, গোস্বামীর সহিত বিচার : গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৪৯-৫০ : পথ্যপ্রদান : গ্রন্থাবলী ৬, পৃ, ১৩২-৩৩ ; কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার. গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ১৮৪ ; পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়েও এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

৪৪. ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ : গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৩৩

৪৫. গোস্বামীর সহিত বিচার : গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫২ ; আরও দ্রষ্টব্য, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তকের ও নিবর্তকের সম্বাদ : গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ৫, ৮ ; সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ : গ্রন্থাবলী ৩, পৃ, ৩১-৩৩

৪৬. এই উক্তি সাধারণভাবে আদি ভাষ্যকারগণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। উত্তরকালে এ দের নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত অনুবর্তিগণ কোনও কোনও স্থলে কিছু অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করেছেন, যেমন অদ্বৈতবেদান্তে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি ছাড়াও স্বীকৃত হয়েছে অর্থাপত্তি, উপমান ও অনুপলব্ধি (দ্রষ্টব্য, ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র কৃত বেদান্তপরিভাষা, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। তা ছাড়া রামানুজ তাঁর গীতাভাষ্যে (১৫. ১৫) ইঙ্গিত করেছেন, যোগলব্ধ আত্মানুভূতি জ্ঞানের অন্যতম আকর (...সর্বস্য ভূতজাতস্য চ সকলপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিমূলজ্ঞানোদয়দেশে হৃদি সর্বং মৎসংকল্পেন নিয়চ্ছন্ অহমাত্মতয়া সন্নিবিষ্টঃ। ...অতো মত্তঃ এব সর্বেষাং স্মৃতিঃ জায়তে ; স্মৃতিঃ পূর্বানুভূতবিষয়মনুভবসংস্কারমাত্রজং জ্ঞানম্। জ্ঞানমিন্দ্রিয়লিঙ্গাগমযোগজো বস্তুনিশ্চয়ঃ সোঽপি মত্তঃ)। রামমোহন তাঁর বেদান্ত সম্পর্কিত রচনাসমূহে প্রমাণ নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। তাই বর্তমান প্রসঙ্গে এই সব বিতর্কের মধ্যে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

৪৭ শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ২. ১. ২৭. : "শব্দমূলং ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং, তদ্যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যম্ ।...লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈ-

চিত্ত্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্যবিষয়া দৃশ্যন্তে তা অপি তাবদুপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে…কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণো রূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যেত।" উক্ত সূত্রের ভাষ্যপ্রসঙ্গে রামানুজ বলেছেন, সাধারণ অভিজ্ঞতার রাজ্যের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে ব্রহ্মের পার্থক্য এই যে ব্রহ্মকে (তর্কের সাহায্যে) প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করা সম্ভব নয় ('ন সামান্যতো দৃষ্টং সাধনং দূষণং বার্হতি ব্রহ্ম'—শ্রীভাষ্য : ২. ১. ২৭.)।

৫৮. শ্রীভাষ্য : ২. ১. ৮.: "অবশ্যং চ শাস্ত্রস্য অনন্যাপেক্ষস্যাতীন্দ্রিয়ার্থগোচরস্যাপি তার্কোঽনুসরণীয়ঃ। যতঃ সর্বেষাং প্রমাণানাং কচিৎকচিদ্বিষয়ে তর্কানুগৃহীতানামেবার্থনিশ্চয়-হেতুত্বম্। তর্কো হি নামার্থস্বভাববিষয়েণ বা সামগ্রীবিষয়েণ বা নিরূপণেনার্থবিশেষে প্রমাণং ব্যবস্থাপয়ত্তদিতিকর্তব্যতারূপমূহাপরপর্যায়ং জ্ঞানম্। তদপেক্ষা চ সর্বেষাং প্রমাণানাং সমানা। শাস্ত্রস্য তু বিশেষেণাকাঙ্ক্ষাসংনিধিযোগ্যতাজ্ঞানাধীনপ্রমাণভাবস্য সর্বত্রৈব তর্কানুগ্রহাপেক্ষা"।

৫৯. রামমোহন-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ১. ৩. ২৮; ৩. ২. ২৪; ৪, ৪. ২০, ইত্যাদি, দ্রষ্টব্যঃ বেদান্তগ্রন্থ : গ্রন্থাবলী ১. পৃ. ২৮, ৭৩, ১১৩; কিন্তু প্রত্যক্ষ বা অনুমান বিষয়ে শংকর বা রামমোহন স্বতন্ত্র আলোচনাতে বড় একটা উৎসাহী ছিলেন না। অবশ্য শংকর ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে শ্রুতিপ্রমাণ হতে ভিন্ন দুটি স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ যে না করেছেন তা নয়, যেমন, "ন চ পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপত্বেঽপি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বম্।…ন চানুমানগম্যং শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ যেনান্যত্র দৃষ্টং নিদর্শনমপেক্ষতে'—শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ১. ১, ৪; কিন্তু তাঁর দৃষ্টি মুখ্যত শ্রুতিনিবদ্ধ ছিল বলেই তিনি তাঁর ভাষ্যের কোনও কোনও স্থলে সাধারণ অর্থে শ্রুতিপ্রমাণকে প্রত্যক্ষ (direct knowledge) আর স্মৃতিকে অনুমান (indirect knowledge) রূপে বর্ণনা করেছেন; দ্রষ্টব্য, পাদটীকা ৩০। রামমোহন এ ক্ষেত্রে তাঁর অনুগামী। শংকর-পরবর্তী অদ্বৈতবেদান্তিগণই বেদান্তের প্রমাণ-অংশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং প্রত্যক্ষ (perception) ও অনুমান (inference)-কে বেদান্তদর্শনের দুই স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের 'বেদান্তপরিভাষা' (রচনাকাল আনুমানিক খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) অদ্বৈত-বেদান্তের প্রমাণতত্ত্ব বিষয়ক এই শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। রামমোহন তাঁর ভাষ্যে বা অন্যত্র বেদান্তের এই প্রমাণতত্ত্বের দিকটি নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি, কেননা বিচারে তাঁর প্রতিপক্ষগণ কেউই এ-সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের অবতারণা করেন নি।

৬০. রামমোহন-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ২. ১. ১১; দ্রষ্টব্য : গ্রন্থাবলী ১. পৃ. ৭৮; এ সিদ্ধান্ত শংকর-মতেরই প্রতিধ্বনি, দ্রষ্টব্য, "ইতশ্চ নাগমগম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্তি, উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ' —শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ২. ১. ১১

৬১. 'গোস্বামীর সহিত বিচার': গ্রন্থাবলী ২. পৃ. ৫৭; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কৃত সমালোচনার প্রত্যুত্তরস্বরূপ নিজের সম্পর্কে তাঁর উক্তিতেও অনুরূপ মনোভাব পরিস্ফুট : "আর একজন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষাবিবরণ করিয়া

লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে আপনার অনুভবের দ্বারা ও বেদসম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ… ।"—'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৮৯

৫১. (ক) বৃহদারণ্য উপনিষৎ, শাংকরভাষ্য, ভূমিকা।

৫২. *Works of Sir William Jones*, Vol. VI (G. G. and J. Robinson, London, 1799) pp. 423-25 ; ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জোন্সের গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হলেও এই অনুবাদ করা হয়েছিল আরও কয়েক বৎসর পূর্বে ১৭৯৩ অথবা ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ; দ্রষ্টব্য : G. H. Cannon. Jr., *Sir William Jones, Orientalist, An Annotated Bibliography of His Works* (Honolulu, 1952) p. 58 ; পাশ্চাত্য জগৎকে হিন্দুদের বৈদিক সাহিত্যের কিছু নিদর্শন দেবার উদ্দেশ্যে জোন্স বেদের অন্ত কয়েকটি অংশের সহিত এই উপনিষদখানি অনুবাদ করেন।

৫২. (ক) দ্রষ্টব্য, H. T. Colebrook *Miscelleneous Essays* Vol I, London, 1837,

pp. 47-53 ; আরও দ্রষ্টব্য, তাঁর *Essays on the Religion and Philosophy of the Hindus* New Edition, London. 1858, pp. 26-30 ; 'On the Vedas or Sacred Literature of Hindus ' শীর্ষক কোলব্রুকের প্রবন্ধটি আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল 'এসিয়াটিক রিসার্চেস্'এ ; দ্রষ্টব্য, *Asiatick Researches* Vol VIII (1805) pp. 369-476

৫৩. William Carey, *A Grammar of the Sungskrit Language* (Mission Press Serampure, 1806) Book V. Chapter II. pp. 903-06 ; জোন্সের পূর্বপ্রকাশিত অনুবাদ কেরীকে বিষয়-নির্বাচনে অনেক পরিমাণে প্রণোদিত করেছিল সন্দেহ নেই। এখানে উল্লেখ্য কেরী তাঁর গ্রন্থে ইংরেজি অনুবাদসহ ভাগবত পুরাণের প্রথম অধ্যায় ও বাইবেল থেকে সন্ত ম্যাথিউ লিখিত গসপেলের প্রথম তিন অধ্যায়ের সংস্কৃত অনুবাদও ঈশোপনিষদের পাশাপাশি সংযোজিত করেছেন। এই তিনটি সংস্কৃত রচনা মুদ্রণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে এগুলি exercises in parsing বা সংস্কৃত বাক্যের অন্বয় অভ্যাস করবার নিমিত্ত প্রদত্ত পাঠাবলী। ঈশোপনিষদের অনুবাদ ও মুদ্রণের পশ্চাতে তাঁর কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল না। শংকর বা অন্য কোনও ভাষ্যকারের উল্লেখ তিনি করেন নি।

৫৪. ঈশোপনিষৎ : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২০৪

৫৫. তদেব : "…তবে ভগবদ্গীতা যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিন্দোস্থানি ভাষায় কয়েকজন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে…ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য উঠিয়া যায়।"

৫৬. গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১১, ১৩, ১৮৭, ১৯৫, ২১২, ২৪৭ ; রামমোহনের বৈষ্ণব প্রতিপক্ষ তাঁকে শংকরপন্থী আখ্যা দিয়ে বিদ্রূপ করলে প্রত্যুত্তরে রামমোহন লেখেন, "আমাদের প্রতি আচার্যমতাবলম্বী বলিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের শ্লাঘা সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব" 'গোস্বামীর সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫৫-৫৬

৫৭. 'বেদান্ত-গ্রন্থ' ভূমিকা : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৬, ১৩ ; 'গোস্বামীর সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫০

৫৮. রামানুজ-ধৃত সূত্রসংখ্যা ৫৪৫; ভাস্করের ৫৪১; মধ্বের ৫৬৪; বল্লভের ৫৫৪; বিজ্ঞানভিক্ষুর ৫৫৫; এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের ৫৫৮। এর মধ্যে বলদেবের সঙ্গে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তের কোনও মিল না থাকলেও তাঁর আলোচিত সূত্রগুলির মোট সংখ্যা রামমোহন-ভাষ্যের মোট সূত্রসংখ্যার সঙ্গে মেলে।

৫৯. শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৪. ৩. ১৪: "তাবেতৌ দ্বৌ পক্ষাবাচার্যেন সূত্রিতৌ। গত্যুপপত্ত্যাদিভিরেক: মুখ্যত্বাদিভিরপর:। তত্র গত্যুপপত্ত্যাদয়: প্রভবন্তি মুখ্যত্বাদীনাভাসয়িতুং ন মুখ্যত্বাদয়ো গত্যুপপত্ত্যাদীন্ ইত্যাদ্য এব সিদ্ধান্তো ব্যাখ্যাত:। দ্বিতীয়স্তু পূর্বপক্ষ:।... কেচিৎ পুন: পূর্বাণি পূর্বপক্ষসূত্রাণি ভবন্ত্যুত্তরাণি সিদ্ধান্তসূত্রাণীত্যেতাং ব্যবস্থামনুরুধ্যমানা: পরবিষয়া এব গতিশ্রুতী: প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি।"

৬০. বেদান্ত-গ্রন্থ: গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৭৬; রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত 'রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী' (কলিকাতা ১৮৮০)তেও (পৃ. ৭৭) এই মুদ্রণ-প্রমাদটি স্থান পেয়েছে। সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস নির্বিচারে সেই ভুলপাঠেরই পুনর্মুদ্রণ করেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'বেদান্ত-গ্রন্থ'এর দুষ্প্রাপ্য প্রথম সংস্করণেরও আলোচ্য পাঠ 'শরবচ্চ তন্নিয়ম:' (দ্রষ্টব্য 'বেদান্ত-গ্রন্থ', প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮১৫, পৃ. ১০৪), অর্থাৎ এই মুদ্রণ-প্রমাদ প্রথম সংস্করণ থেকেই চলছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোনও সম্পাদকই এ পর্যন্ত অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে প্রকৃত পাঠ নির্ধারণের চেষ্টা করেন নি। এস্থলে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত ও অনূদিত শাংকরভাষ্য ও বাচস্পতি মিশ্র কৃত ভামতী টীকা সমেত ব্রহ্মসূত্রের সুবিখ্যাত সংস্করণেও আলোচ্য সূত্রটিতে (৩. ৩. ৩.) 'সববচ্চ তন্নিয়ম:'এর স্থলে ছাপা হয়েছে 'সরবচ্চ তন্নিয়ম:': দ্রষ্টব্য, কালীবর বেদান্তবাগীশ বেদান্তদর্শনম্, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৬০) পৃ. ১৭১; এই প্রমাদ পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের ন্যায় বিচক্ষণ সম্পাদকেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

৬১. আশ্চর্যের বিষয়, আচার্য শংকরের প্রতিভাকে বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত করবার রামমোহনের এই প্রয়াস আধুনিক কালে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায় নি। শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থের আলোচন'-পরিধি যদিও আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তথাপি রামমোহন-কৃত বেদান্ত-ভাষ্য (১৮১৫) ও রামমোহন সম্পাদিত ও প্রকাশিত শাংকর-ভাষ্যের সম্পূর্ণ সংস্করণ সেখানে অনুল্লিখিত; দ্রষ্টব্য 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস' দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথম ভাগ (কলিকাতা, ১৩৭২), পৃ. ২২৯-৩০; দ্বিতীয় ভাগ (কলিকাতা, ১৩৭১), পৃ. ৫৫৭-৮০

৬২. শাংকরভাষ্য, বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২, ৪. ১০.

৬৩. *Indian Philosophy* (Indian Edition, 1940) Vol. II. p. 449; আপাতদৃষ্টিতে এর ব্যতিক্রম শংকরের নামে প্রচলিত 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ভাষ্য'। এই ভাষ্যে, বিশেষ করে এর ভূমিকায়, বিষ্ণু, বিষ্ণুধর্ম, ব্রহ্ম, লিঙ্গ, শিবধর্মোত্তর প্রভৃতি বহু পুরাণের বচন সবিস্তারে উল্লিখিত দেখা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে এই ভাষ্য প্রকৃতপক্ষে

শংকরের রচনা বলে অনেক পণ্ডিতই মনে করেন না। শংকরের দশোপনিষদ্‌ভাষ্যের উপর যিনি টীকা রচনা করেছিলেন সেই আনন্দগিরির উক্ত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌-ভাষ্যের উপর লিখিত কোনও টীকা পাওয়া যায় নি। এতেও এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ হয়।

৬৪. S. N. Dasgupta, A *History of Indian Philosophy*, Vol. III (Cambridge, 1940), p. 482

৬৫. Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol, V. (Cambridge, 1955) p. 91

৬৬. *Ibid* p. 181

৬৭. 'গোস্বামীর সহিত বিচার'; গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৪৯-৫১

৬৮. 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার', গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৪, ২০, ২৩, ৩৭ ইত্যাদি; 'গোস্বামীর সহিত বিচার', গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫১-৫২; 'চারিপ্রশ্নের উত্তর', গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ১৪; 'পথ্যপ্রদান', গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ৯৫ ইত্যাদি।

৬৯. 'বেদান্তগ্রন্থ', গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১১

৭০. তদেব, পৃ. ১৫-১৬

৭১. 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার': গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৬৪

৭২. 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ: ভূমিকা': গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৩৭

৭৩. তদেব, পৃ. ২৫৫

৭৪. 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার': গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৬

৭৫. 'কবিতাকারের সহিত বিচার': গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৭৪

৭৬. 'ব্রহ্মসংগীত'; গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫৯

৭৬. (ক) 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার': গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ২৩-২৫

৭৭. 'কবিতাকারের সহিত বিচার': গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৭৯, ৯২; এই উপলক্ষে রামমোহন ব্রহ্মসূত্র ৪. ১. ৪., 'ন প্রতীকেন হি সঃ' উল্লেখ করেছেন। শংকর এই সূত্রের ভাষ্যে বলেন: 'ন প্রতীকেষাত্মমতিং বধ্নীয়াৎ। ন হ্যুপাসকঃ প্রতীকানি ব্যস্তান্যাত্মত্বেনাকলয়েৎ।... বিকারস্বরূপোপমর্দেন হি নামাদিজাতস্য ব্রহ্মত্বমেবাশ্রিতং ভবতি। স্বরূপোপমর্দে চ নামাদীনাং কুতঃ প্রতীকত্বমাত্মগ্রহো বা। ন চ ব্রহ্মণ আত্মত্বাৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্যুপদেশেষাত্মদৃষ্টিঃ কল্প্যা কর্তৃত্বাদ্যনিরাকরণাৎ। কর্তৃত্বাদিসর্বসংসারধর্মনিরাকরণেন হি ব্রহ্মণ আত্মত্বোপদেশঃ, তদনিরাকরণেন চোপাসনাবিধানম্। অতশ্চোপাসকস্য প্রতীকৈঃ সমত্বাদাত্মগ্রহো নোপপদ্যতে। ন হি রুচকস্বস্তিকয়োরিতরেতরাত্মত্বমস্তি, সুবর্ণাত্মনৈব তু ব্রহ্মাত্মনৈকত্বে প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গমযোচাম। অতো ন প্রতীকেষাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে।"—শংকরের এই সূত্রটির ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে প্রতীকোপাসনা সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। প্রতীকোপাসনা-বিরোধী রামমোহন যে শংকরের এবংবিধ সিদ্ধান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন সে আর আশ্চর্য কী?

৭৮. মাণ্ডুক্যোপনিষৎ: ভূমিকা: গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৩৭

৭৯. শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩, ৪, ২০: 'ব্রহ্মসংস্থ ইতি হি ব্রহ্মণি পরিসমাপ্তিরনন্য-ব্যাপারতারূপং তন্নিষ্ঠত্বমভিধীয়তে। তচ্চ ত্রয়াণামাশ্রমাণাং ন সম্ভবতি, স্বাশ্রমবিহিতকর্মানুষ্ঠানে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। পরিব্রাজকস্য তু সর্বকর্মসন্ন্যাসাৎ প্রত্যবায়ো ন সম্ভবত্যননুষ্ঠাননিমিত্তঃ।'

৭৯. (ক) কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ২. ১. ১৪ : 'পুত্রদারমপ্রতিবিধায় প্রব্রজতঃ পূর্বঃ সাহসদণ্ডঃ, স্ত্রিয়ং চ প্রব্রাজয়তঃ। লুপ্তব্যবায়ঃ প্রব্রজেদাপৃচ্ছ্য ধর্মস্থান্ অন্যথা নিয়ম্যেত' (গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১৫-১৪); মনু, ৩. ৭৭-৭৮; ৬. ৩৩, ৩৫-৩৭; বৌধায়ন ধর্মসূত্র, ২. ১০. ৬ : 'সপ্তত্যা ঊর্ধ্বং সন্ন্যাসমুপদিশন্তি'।

৮০. ঈশোপনিষৎ : ভূমিকা, গ্রন্থাবলী ১. পৃ. ১৯৮-৯৯

৮১. 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড (শতবার্ষিকী সংস্করণ), পৃ. ৪৮, ৪৯, ৫০

৮২. 'অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি'—সদানন্দকৃত বেদান্তসার, ১৩ (কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৪৫-৪৭): শংকরাচার্যের নামে প্রচলিত 'সর্ববেদান্তসারসংগ্রহ' গ্রন্থেও সংক্ষেপে মায়া বা অজ্ঞানের সুন্দর সংজ্ঞানির্ণয় করা হয়েছে :

সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যমজ্ঞানং ত্রিগুণাত্মকম্
বস্তুতত্ত্বাববোধৈকবাধ্যং তদ্ভাবলক্ষণম্। শ্লোক ৩০৪

সর্ববেদান্তসারসংগ্রহ : (প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত ও অনূদিত, কলিকাতা, ১৩৩৬), পৃ. ১২১

৮৩. প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মায়াবাদ (বিশ্বভারতী, ১৩৫০) পৃ. ৩৩-৩৪

৮৪. এ বিষয়ে রামমোহনের কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট উক্তি পূর্বেই উদ্‌ধৃত হয়েছে, দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩ ও ৭৪; এগুলি ছাড়া তিনি মায়াবাদ সম্পর্কে তাঁর রচনার অন্যত্র কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন; দ্রষ্টব্য 'ব্রাহ্মণ সেবধি', প্রথম সংখ্যা : গ্রন্থাবলী ৫, পৃ. ৬-১০, সম্প্রতি কেউ কেউ বলেছেন, রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে উক্ত মায়াবাদ-ব্যাখ্যা অদ্বৈত-বেদান্তসম্মত হলেও এ তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত না হতেও পারে, কেননা এখানে রামমোহন সাধারণভাবে খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি তাবৎ হিন্দু দর্শনপ্রস্থান ও শাস্ত্রের স্বপক্ষে নিরপেক্ষভাবে তাঁর যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। এই সমালোচকগণ উদাহরণস্বরূপ সাধারণত লর্ড আমহার্স্ট্‌কে লিখিত রামমোহনের শিক্ষাবিষয়ক পত্রে বৈদান্তিক মায়াবাদ সম্পর্কে রামমোহনের কিছু আপাত-বিরূপ মন্তব্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। কিন্তু তর্কের খাতিরে 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র উক্তি সম্পর্কে এঁদের মত যদি মেনেও নেওয়া যায়, তা হলেও প্রশ্ন থাকে তাঁর উপনিষদ্-ভূমিকা, ব্রহ্মসংগীত ও বিচারগ্রন্থগুলিতেও কি রামমোহন ব্রহ্মতত্ত্ব ও মায়া সম্পর্কে তাঁর স্বীয় মত প্রকাশ করেন নি? এই কারণেই 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র উক্তি বাদ দিয়ে রামমোহনের অন্যান্য রচনা থেকেই তত্ত্বসিদ্ধান্তবিষয়ক তাঁর উক্তি নির্বাচন করা হয়েছে। আমহার্স্টকে লিখিত তাঁর পত্রই বেদান্তবিষয়ক উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য প্রবন্ধমধ্যে ইতিপূর্বে

প্রসঙ্গত করেছি। রামমোহনের উক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে কোনও মত তাঁর উপরে আরোপ করাও এক ধরণের অধ্যাস।

৮৫. বিস্তারিত প্রমাণপঞ্জীর জন্য পরবর্তী (চতুর্থ) অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮৬. কুলার্ণব তন্ত্র ৯. ৩২, Tantric Texts Series, Vol. V. London, 1917, p. 127

৮৭. Surendranath Dasgupta, "General Introduction to Tantra Philosophy", *Sir Ashutosh Mukerjee Silver Jubilee Volume*, Vol. III. Part I, p. 255

৮৮. Chintaharan Chakrabarty, 'Tantra and Vedanta', *Kalyana Kalpataru*, vol. III, No. I, p. 176

৮৯. A. K. Raychoudhuri, *The Doctrine of Maya*, p. 180; তন্ত্রের মায়া-ভাবনা সম্পর্কে প্রামাণিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Sir John Woodroffe, *Shakti and Shakta*, London, 1918, pp. 53-109

৯০. শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, তন্ত্রতত্ত্ব, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ, কাশী, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.৮১

৯১. শাংকরভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ১. ২. ৪; 'তথা উপাস্যোপাসকভাবোঽপি ভেদাধিষ্ঠান এব'।

৯২. রামমোহন-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৪. ১. ১২ : বেদান্তগ্রন্থ : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১০১

৯৩. 'অনুষ্ঠান', গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৬৯

৯৪. 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ'-ভূমিকা : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৩৯

৯৫. 'ব্রহ্মোপাসনা', গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫১

৯৬. 'বেদান্তগ্রন্থ : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৫-৬; 'ঈশোপনিষৎ'-ভূমিকা : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২০১; মাণ্ডুক্যোপনিষৎ : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৪৭

৯৭. 'প্রার্থনাপত্র' : গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ২৭-২৮

৯৮. 'ব্রহ্মোপাসনা' : গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫১

৯৮. (ক) ভট্টাচার্যের সহিত বিচার : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৬৫

৯৯. বেদান্তগ্রন্থ : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৬; এক্ষেত্রে মধ্ব অনেকটা একরকম কথা বললেও উপাসনার স্থলে বেদোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক বচন অর্থ করেছেন : 'যথা সর্বং সলিলং সমুদ্রং গচ্ছতি এবং সর্বাণি বচনানি ব্রহ্মজ্ঞানার্থানীতি নিয়মঃ'। রামমোহনের ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সরল ও উদার। মধ্ব এই প্রসঙ্গে বেদের শাখাসমূহ ও অগ্নিপুরাণের নজির যে ভাবে টেনে এনেছেন তা অনাবশ্যক ও কষ্টকল্পিত মনে হয়; দ্রষ্টব্য, মধ্বভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩. ৩, ৪; ও তার উপর জয়তীর্থ রচিত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকা।

১০০. 'উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ।
নান্যঃ পন্থা ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুধ্যতে॥
পঞ্চদশী ৯. ৭৪ (আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-কৃত সংস্করণ. পৃ. ৫৬৬-৬৭)।

১০১. এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১০১. (ক) গোস্বামীর সহিত বিচার : গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫৯

১০২. *English Works* Part II, pp. 44-47

১০৩. 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১২৪-৬৫

১০৪. রামমোহন-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩. ৩. ৫৩ : বেদান্তগ্রন্থ, গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৮৮-৮৯। এই সূত্রে খ্রীষ্টের দুটি অমূল্য উপদেশ মনে পড়ে : Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbour as thyself. (Mathew, xxii. 37. 38 39)। রামমোহনের পূর্বোক্ত সূত্রব্যাখ্যার সঙ্গে এর ভাবসাদৃশ্য চমকপ্রদ। প্রসঙ্গত বলা যায় খ্রীষ্টের এই উপদেশদ্বয় রামমোহনের অতি প্রিয় ছিল, তিনি তাঁর খ্রীষ্টবাণীসংগ্রহে এগুলি চয়ন করেছিলেন ও খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কে এগুলির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছিলেন ; দ্রষ্টব্য 'The Precepts of Jesus' *English Works*, Part V, p. 38 ; 'Second Appeal to the Christian Public', *English Works*, Part VI, pp. 2-3

১০৫. 'ব্রহ্মোপাসনা' : গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫১

১০৬. 'Brahmunical Magazine, No. IV, *English Works*, Part II, p. 189

১০৭. H. H. Wilson, *Dictionary Sanscrit and English*, Calcutta, 1819, Preface, pp. xv-xvi ; পঞ্চম অধ্যায়ে রামমোহন ও উইলসনের পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও তৃতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১০৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, (চতুর্থ মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৮৪) পৃ. ৪৮৯

চতুর্থ অধ্যায়

রামমোহন রায় ও পুরাণ-তন্ত্র

রামমোহন রায় মুখ্যত ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তকরূপে সুপরিচিত হলেও তাঁর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসাধনা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা এখনও হয় নি। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমত পরবর্তী কালে সুদীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এর আদিরূপের সঙ্গে উত্তরকালীন রূপের বিস্তর প্রভেদ। ধর্মসমাজ ও ধর্মসম্প্রদায় সমূহের ইতিহাসে কোনও ধর্মের আদি ও অন্ত্য পর্বদ্বয়ের মধ্যে এই জাতীয় রূপভেদ বিরল নয়। আদিম খ্রীষ্টধর্ম ও বর্তমান খ্রীষ্টধর্ম, মূল বৌদ্ধধর্ম ও পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম, আদি পর্বের শিখধর্ম ও উত্তরকালের শিখধর্ম[১] প্রভৃতির পারস্পরিক তুলনায় এ সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। সুতরাং কোনও ধর্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত ধর্মের নেতৃস্থানীয়গণের ব্যক্তিগত ধর্মমত স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করে দেখবার একটি বিশেষ প্রয়োজন ও মূল্য আছে। তার ফলে কেবল যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে ব্যক্তিবিশেষের পরিচয় জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে তাই নয়, সাম্প্রদায়িক মতবিবর্তনের ইতিহাসে নির্দিষ্ট দেশকালে অভিব্যক্ত তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাধারার কতটা রক্ষিত ও কতটা বর্জিত বা উপেক্ষিত হয়েছে সেটি নির্ধারণ করাও সহজ হয়। রামমোহন সম্পর্কে এমন একটি ধারণা এক সময়ে প্রচলিত ছিল, এবং হয়তো কোনও কোনও মহলে এখনও আছে,—যে রামমোহন কেবল উপনিষদ-বেদান্ত আশ্রয় করেছিলেন বলেই তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়প্রচেষ্টা একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে; ভারতীয় সভ্যতার উপনিষদোত্তর অধ্যায়গুলিকে তিনি বুঝতে পারেননি বা বুঝবার চেষ্টা করেন নি।[২] একমাত্র রামমোহনের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের সর্বাত্মক বিশ্লেষণের দ্বারাই এসব সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব। সুতরাং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে শাস্ত্র ও শাস্ত্রপ্রমাণ সম্পর্কে রামমোহনের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ও তৃতীয় অধ্যায়ে বেদান্তবিদ্‌রূপে তাঁর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয়েছে তার

পরিপূরকরূপে বর্তমানে রামমোহনের ধর্মচিন্তার অপর এক বৈশিষ্ট্যের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রামমোহনের বেদান্ত-অনুশীলন বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে তিনি ধর্মত্যাগী ও সমাজদ্রোহী বলে যতই নিন্দিত হয়ে থাকুন না কেন, ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তত্ত্ববিদ্যা হিসাবে বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্বে নিঃসংকোচ বিশ্বাস তাঁর চিন্তাধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। এই দর্শন ভারতবর্ষীয় জীবনচর্যাকে নানা দিক দিয়ে অতি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। তথাপি এ কথাও স্বীকার্য স্বীয় অভিব্যক্তির পথে ভারতীয় চিন্তা আদি বৈদিক কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি ; তার সীমানা অতিক্রম করে উত্তরকালে নব নব রূপে বিকশিত হয়েছে। অনেক নূতন ধারা ও নূতন মাত্রা কালক্রমে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলির উৎস শাস্ত্রীয়, কতকগুলির লৌকিক। হিন্দুধর্মের এই উত্তরকালীন পর্যায়ের দুই অঙ্গ হল পুরাণ ও তন্ত্র। রচনার প্রাচীনত্ব, উৎকর্ষ ও সৌষ্ঠব, তত্ত্বের গভীরতা ও আধ্যাত্মিক মর্যাদার বিচারে এগুলি অবশ্যই বেদবেদান্তের সঙ্গে তুলনীয় নয় ; কিন্তু বিষয়বস্তুর বিস্তার, বৈচিত্র্য ও জনমানসে গভীর প্রভাবের দিক থেকে পুরাণ-তন্ত্রের স্থান হিন্দুধর্মের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ-দুটিকে বাদ দিয়ে হিন্দু সংস্কৃতির সমগ্র ও চলিষ্ণু রূপটিকে ধারণা করা সম্ভব নয়। যদি রামমোহন পুরাণ ও তন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যা ও আলোচনাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন তাহলে শাস্ত্রমীমাংসক রূপে তাঁর কীর্তি সুনিশ্চিতরূপেই হত অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। কেবল রামমোহন নন, তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত বেদান্ত-ভাষ্যকারগণকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন প্রস্থানত্রয় ও সুপরিচিত স্মৃতিগ্রন্থগুলি ছাড়াও তাঁদের সামনে রয়েছে সুবিশাল পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্য, লোকচিত্তে যার প্রভাব বিপুল, এমন কি শ্রুতিস্মৃতি অপেক্ষাও বহুগুণে অধিক। সুতরাং এগুলিকে তাঁরা কোনও ক্রমেই উপেক্ষা করতে পারেন নি। তবে পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। পুরাণ সম্পূর্ণরূপে বৈদিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত ও অনুগামী ; অপরপক্ষে সকল তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ্যত বেদবিরোধী না হলেও, সমগ্রভাবে তন্ত্র এমন এক সাধনমার্গ ও পূজাপদ্ধতির স্রষ্টা যা বহুল

পরিমাণে বৈদিক ঐতিহ্যের প্রতিস্পর্ধী। এই কারণেই ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বেদান্তিগণ পুরাণের মর্যাদা স্বীকার করলেও তন্ত্রমতের প্রতি বিমুখ ছিলেন। পুরাণ সম্পর্কে এঁদের পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য থাকলেও সে দৃষ্টির সামান্য লক্ষণ এই যে, তা সশ্রদ্ধ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রসঙ্গত এর কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরাণকে বেদের সমকক্ষ মনে না করলেও শাস্ত্রহিসাবে তাকে এঁরা কমবেশী যে মর্যাদা দিয়েছেন, তন্ত্রকে কখনই তা দেন নি। বেদান্তের বেদশ্রুতিভিত্তিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র স্বীকার করে নেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শংকর[৩], রামানুজ[৪], প্রমুখ বেদান্তাচার্যরা স্পষ্টত শৈব, পাশুপত, কাপালিক প্রমুখ তন্ত্রগোষ্ঠীভুক্ত সম্প্রদায়গুলিকে অবৈদিক গণ্য করেছেন। আনন্দগিরি রচিত 'শংকরবিজয়' গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ প্রকরণে শংকরাচার্যের সঙ্গে কাপালিকসম্প্রদায়ের মতসংঘর্ষ-প্রসঙ্গে কাপালিকগণকে 'শ্রুতিবিরুদ্ধ আচারে তৎপর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৫] অবশ্য শৈবসম্প্রদায়গুলির মধ্যেও কালক্রমে একটি বেদান্তমতের উদ্ভব হয়েছিল ও একাধিক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যও রচিত হয়েছিল; কিন্তু সে সব ভাষ্যকারেরা শিবমাহাত্ম্যসূচক পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকার করলেও তন্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন নি। এঁদের মধ্যে শ্রীপতি তন্ত্রনামধেয় দু'একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সেগুলিকে সাম্প্রদায়িক তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা চলে কিনা সন্দেহ। তান্ত্রিক ও বৈদান্তিক শৈবমতদ্বয়ের মধ্যে এখানে মৌলিক প্রভেদ আছে। তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাববস্তুকে নিরপেক্ষভাবে বিচার ও বেদান্তমতের সঙ্গে সমন্বিত করে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার প্রচেষ্টা আধুনিক কালেই আরম্ভ হয়েছে। রামমোহনের চিন্তাধারায় এর সূত্রপাত। তিনি প্রাক্তন বেদান্তাচার্যদের পন্থা অনুসরণ করে যেমন পৌরাণিক সাহিত্যের অনুশীলন ও শাস্ত্রসমন্বয়ের ভূমিতে তার উপযুক্ত স্থাননির্দেশ করতে অগ্রসর হয়েছেন, তেমনি উল্লেখযোগ্য পূর্বদৃষ্টান্ত না থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্য সাহসিকতার সঙ্গে তন্ত্রমতকেও যুক্তি ও সহানুভূতির সাহায্যে বিচার করে তার সারভাগকে নিজ বেদান্তভিত্তিক দর্শনের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। শাস্ত্রমীমাংসক রূপে এ কাজ করবার তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি তাঁর কালে বাঙ্‌লা দেশে তথা পূর্বভারতে বেদবেদান্তের চর্চা সামান্যই ছিল। শাস্ত্রবিচারে তাঁর প্রতিপক্ষগণের প্রধান অবলম্বন ছিল পুরাণ

ও তন্ত্র। বস্তুত সমকালীন হিন্দুধর্ম ও আচারের লোকপ্রচলিত রূপ ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পুরাণ-তন্ত্রনির্ভর। সুতরাং এই শাস্ত্রদ্বয়ের অনুশীলন ও মূল্যায়ন তিনি অবশ্যকর্তব্য বিবেচনা করেছিলেন ও নিষ্ঠার সহিত সে কর্তব্যপালনে ত্রুটি করেননি।

সংস্কৃত পুরাণসাহিত্যের পরিধি বিপুল। সনাতন দৃষ্টিতে পুরাণ অতি প্রাচীন শাস্ত্র, বেদ ও মহাভারতের রচয়িতা ব্যাস কলিযুগের প্রারম্ভে এই শাস্ত্র রচনা করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু প্রচলিত আকারে পুরাণনামধেয় যে গ্রন্থগুলি আমাদের সম্মুখে আছে সমগ্রভাবে তা কখনই এত প্রাচীন নয়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, প্রচলিত পুরাণসমূহের মধ্যে যেগুলি সত্যই সার্থক-নামা অর্থাৎ পুরাতন, খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের মধ্যে সেগুলির রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু পৌরাণিক সাহিত্য এর পরবর্তী যুগেও সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে-ও উত্তরকালের ভারতীয় জীবনচর্যার বহু বিচিত্র উপাদান কালক্রমে এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রায় মহাভারতসদৃশ বিপুলায়তন প্রচলিত স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডের 'রেবাখণ্ড' শীর্ষক তৃতীয় ভাগে স্পষ্টত মধ্যযুগীয় দেবতা সত্যনারায়ণের মহিমা কীর্তিত;[৬] ব্রহ্মপুরাণে ওড়িশার সুবিখ্যাত কোণার্কক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে,[৭] —যে কোণার্ক সূর্যমন্দির নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে; এক কিংবদন্তী অনুসারে সুপরিচিত ভাগবত পুরাণের রচয়িতা ব্যাস নন, 'মুগ্ধবোধ' রচয়িতা বৈয়াকরণ বোপদেব, যাঁর জীবিতকালও সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী,[৮] এবং এই লোকশ্রুতি সত্য হোক বা মিথ্যা হোক এর দ্বারা প্রমাণ হয় ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এই পুরাণের প্রাচীনত্ব সর্বসম্মত নয়, তা নিয়ে বিবাদ ছিল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্পর্কে তো বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট উক্তিই বর্তমান: 'ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী মনসারও কথা আছে'।[৯] এই জাতীয় বহু উদাহরণ প্রচলিত পুরাণগ্রন্থগুলি থেকে আহরণ করা যায়। অপর পক্ষে পুরাণসাহিত্যের এই বিপুল ও ক্রমবর্ধমান অর্বাচীন অংশকে বাদ দিলেও এর মধ্যে এমন বহু উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে যা সত্যই অতি পুরাতন। নানা বৈদিক উপাখ্যান, রূপক, প্রাচীন রাজবংশাবলীর বর্ণন, বেদ-বর্ণিত মুনিঋষির কাহিনী, প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব, সাংখ্যযোগ, বেদান্ত, প্রভৃতি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে। বৈদিক

সাহিত্যে যা অনেক সময়ে সূত্রাকারে কথিত বা বিমূর্ত চিন্তায় ব্যক্ত, পুরাণের বর্ণনায় তা প্রায় সর্বক্ষেত্রে অতিপল্লবিত ও রক্তমাংসসংযোজনে মূর্তিময়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে পুরাণসম্পর্কে সুপরিকল্পিত ও উল্লেখযোগ্য গবেষণা সর্বপ্রথম করেন হোরেস হেম্যান উইলসন ; এ বিষয়ে তাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য : 'The theogony and the cosmogony of the Purāṇas may probably be traced to the Vedas.··· The scheme of primary and elemental creation they borrow from the Sankhya philosophy which is probably one of the oldest forms of speculation on man and nature amongst the Hindus.···It is evident too that their accounts of secondary creation or the development of the existing forms of things, and the disposition of the universe, are derived from several and different sources ; and it appears very likely that they are to be excused of some of the incongruities and absurdities by which the narrative is disfigured in consequence of having attempted to assign reality and significance to what was merely metaphor and mysticism. There is however, amidst the unnecessary complexity of description a general agreement amongst them as to the origin of things, and their final distribution ; and in many of the circumstances there is a striking concurrence with the ideas which seem to have pervaded the whole of the ancient world, and which we may therefore believe to be faithfully represented in the Purāṇas'[১০]। সুতরাং প্রাচীন-অর্বাচীন বহু বিচিত্র উপাদানের সম্মিলনে বহু যুগ ধরে গড়ে ওঠা সুবিস্তীর্ণ পৌরাণিক সাহিত্য হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির এক বিশ্বকোষে পরিণত হয়েছে। এর এক প্রান্ত স্পর্শ করে আছে বৈদিক যুগকে ; বৈদিক ভাবধারাকে প্রকৃতপক্ষে এর ভিত্তিভূমি বলতে হয় ; অপর সীমানা ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন কালকে অতিক্রম করে মধ্যযুগে সম্প্রসারিত। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রচলিত লৌকিক রূপটি পুরাণে যতখানি

অকৃত্রিমভাবে পরিস্ফুট, বৈদিক সাহিত্যে তেমন নয়, একথা নিঃসংকোচেই বলা যায়।

হিন্দুধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু বা সমাজসংস্কারক-কারও নিকটই পুরাণ উপেক্ষণীয় নয়, প্রধানত কয়েকটি কারণে :

১. পুরাণ-সাহিত্য স্পষ্টত শ্রুতিভিত্তিক। পুরাণের তত্ত্বচিন্তা ও সামাজিক দৃষ্টি সম্পূর্ণ বৈদিক ঐতিহ্যের অনুগামী—বলতে গেলে বৈদিক চিন্তার সম্প্রসারণ। পুরাণের দার্শনিক অংশগুলিতে বেদানুসারী ব্রাহ্মণ্য আস্তিক দর্শনপ্রস্থানসমূহের মধ্যে বেদান্ত ও সাংখ্য-যোগই মুখ্যত আলোচিত। তবে বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় পুরাণে নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী ধারার সাক্ষাৎ প্রায় পাওয়াই যায় না। এখানে ঝোঁকটা প্রায় সর্বত্র কোনও না কোনও আকারে জগৎ-স্বীকৃতির উপর। বেদান্ত ব্যাখ্যাব ক্ষেত্রে চরম অদ্বৈতবাদী শংকরের পুরাণবিমুখতার (যার উল্লেখ পূর্বাধ্যায়ে করা হয়েছে) এটি অন্যতম কারণ হতে পারে। অপর পক্ষে যে-সকল বৈদান্তিক বস্তুজগৎকে মিথ্যাজ্ঞান করেন নি, যেমন ভাস্কর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বিজ্ঞানভিক্ষু, বলদেব, প্রভৃতি,—তাঁরা স্বীয় স্বীয় মতস্থাপনে বহুস্থলের পুরাণের বচন উদ্ধৃত করেছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণের (অষ্টাদশ শতাব্দী) আবির্ভাবের পূর্বে তো গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ভাগবত পুরাণকেই বেদান্তের প্রকৃত ভাষ্য গণ্য করে—স্বতন্ত্র ব্রহ্মসূত্রভাষ্যই রচনা করেন নি। পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব মুখ্যত সাংখ্যদর্শনকেই অনুসরণ করেছে। সুতরাং ভারতীয় দার্শনিক ব্রহ্মতত্ত্ব পর্যালোচনাকালে পুরাণগুলিকে বাদ দিলে চলে না।[১১] অপর পক্ষে হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম আকর হিসাবেও পুরাণসাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সুস্পষ্ট স্বীকৃতির উপরই পুরাণগুলির ভিত্তি স্থাপিত ও নানাপ্রসঙ্গে বর্ণাশ্রমের কাঠামোটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় লাভ করতে হলে স্মৃতিনিবন্ধ ইত্যাদির মত পুরাণসাহিত্যেরও দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন উপায় নেই। এখানে উল্লেখ্য যে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিভাষ্যকার ও নিবন্ধকারগণ পুরাণবচনকে অন্যতম প্রমাণ গণ্য করে বার বার নিজ নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থনে বিভিন্ন পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

২. হিন্দুধর্মের সাম্প্রদায়িক ও স্মার্ত পঞ্চোপাসনার অন্যতম প্রধান অবলম্বন পুরাণ-সাহিত্য। বেদোত্তর কালের হিন্দু দেবপূজক সম্প্রদায়গুলিকে সাধারণত বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত

করা হয়; এঁদের উপাস্য দেবতা যথাক্রমে, বিষ্ণু, শিব, শক্তি (বা দেবী), সূর্য ও গণেশ। এইসব সম্প্রদায়ভুক্তগণ যেমন বিশেষভাবে নিজ নিজ ইষ্ট দেবদেবীর উপাসনা করতেন, তেমনি স্মৃতিশাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত হিন্দুসমাজে একত্র এই পঞ্চদেবতার পূজারও প্রচলন ছিল।[১২] প্রচলিত পুরাণ সমূহের অধিকাংশের মধ্যেই উক্ত কোনও না কোনও দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজাপদ্ধতি বিশেষ ভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত। বিষ্ণু, ভাগবত, পদ্ম, নারদীয়, গরুড়, ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণের প্রধান আরাধ্য বিষ্ণু; বায়ু, শিব বা লিঙ্গ পুরাণের মুখ্য বিষয়বস্তু শিবমাহাত্ম্য; ভবিষ্যপুরাণের প্রধান দেবতা সূর্য। উপপুরাণগুলিও এই সাম্প্রদায়িক হস্তাবলেপ থেকে মুক্ত নয়। এগুলির মধ্যে নরসিংহ, বিষ্ণুধর্মোত্তর, পুরুষোত্তম প্রভৃতি মুখ্যত বৈষ্ণব; শাম্বপুরাণ সূর্যমাহাত্ম্যসূচক; দেবীপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মহাভাগবতপুরাণ প্রভৃতির বিষয়বস্তু শক্তি-উপাসনা। এছাড়া বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি থেকেও অধুনালুপ্ত একাধিক সাম্প্রদায়িক উপপুরাণের অস্তিত্ব জানা যায়।[১৩] সুতরাং পুরাণকে স্বচ্ছন্দে প্রচলিত হিন্দুধর্মের সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র বলা যেতে পারে। বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্যসূচক সুপরিচিত পুরাণগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টির আর একটি লক্ষণও ধরা পড়ে। কোনও বিশেষ সম্প্রদায় ব্যবহৃত গ্রন্থে কেবল যে সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে তাই নয়, তুলনায় প্রায়শ অন্যসকল দেবতার মাহাত্ম্যকেও সুপরিকল্পিত ভাবে খর্ব করা হয়েছে। বৈষ্ণব পুরাণগুলিতে শিব প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের মুখে বিষ্ণুস্তুতি আরোপিত; তেমনি শৈব পুরাণে বিষ্ণুর মুখে শোনা যায় শিববন্দনা; আবার শাক্ত পুরাণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি সকলেই দেবী বা মহাশক্তির শরণাগত। পুরাণ-সাহিত্যের এসব অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সম্প্রদায়গুলির ঐতিহাসিক বিকাশের ধারাটিকে অনুসরণ করতে হলে অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে পুরাণের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই।

৩. বর্তমান হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্ম ও পূজাপদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু বেদমন্ত্র ব্যবহৃত হলেও এর কাঠামোটি প্রায় সম্পূর্ণ পৌরাণিক ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্যই এর মধ্যে বহুল পরিমাণে দেশাচার ও লোকাচারের মিশ্রণ আছে এবং এই সকল আচারের এক বিরাট অংশকে আর্যসভ্যতা বা আর্যশাস্ত্রের দান বলে কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে তন্ত্রের কথাও আসে

এবং তা যথাস্থানে উত্থাপিত হবে। আপাতত মনে রাখা প্রয়োজন, চলিষ্ণু ও ক্রমসম্প্রসারমান পৌরাণিক সাহিত্যের সমগ্র আয়তন প্রায় মহাসাগরতুল্য; বিভিন্ন অঞ্চলে ও কালে রচিত বহু অর্বাচীন গ্রন্থ ক্রমশ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সব মিলিয়ে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্বসীমা যেমন বৈদিক ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত, তেমনি প্রসারিত সম্মুখভাগ প্রায় আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তকে স্পর্শ করেছে। এই বিপুল প্রসার এর সঞ্চয়ের ভাণ্ডারকেও বিপুল করেছে এবং লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারাগুলিকে আত্মসাৎ করতে এর কোথাও আটকায় নি। প্রচলিত প্রতিমাপূজা ও তৎসংক্রান্ত সর্ববিধ সংস্কার এই পৌরাণিক হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ; বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্মের পক্ষে তা অপরিহার্য নয়। মূল বৈদিক ধর্মের সঙ্গে প্রতিমাপূজার কোনও সংস্রব আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি।

কিন্তু পৌরাণিক সাহিত্য ও ঐতিহ্যের এই সর্বলোলুপ অথচ স্থিতিস্থাপক চরিত্র শাস্ত্রহিসাবে পুরাণের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেনি। অবশ্যই ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে শ্রুতিপ্রমাণের আসন সর্বোচ্চ। স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র মান্য হলেও প্রামাণিকতা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে সেগুলি কখনই বেদের তুল্য নয়। বেদান্ত মুখ্যাত শ্রুতিভিত্তিক দর্শন হলেও ব্রহ্মসূত্রকার একাধিক স্থলে প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত স্মৃতির উল্লেখ করেছেন।[১৪] এ সকল স্থলে ভাষ্যকারগণ সাধারণ ভাবে স্মৃতিপ্রমাণের আলোচনা ছাড়া বিশেষ ভাবে গীতার সাক্ষ্যকেই অবলম্বন করেছেন যে কারণে গীতা বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান রূপে গণ্য হয়েছে। প্রসঙ্গত তাঁরা মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণের বচন কখনও কখনও উদ্ধার করেছেন। কিন্তু সূত্রকার কোথাও স্পষ্টত পুরাণের উল্লেখ করেন নি, ইঙ্গিতও করেছেন কিনা সন্দেহ। শংকর ও রামমোহনের ভাষ্য অনুযায়ী মাত্র একটি সূত্রে (৩. ১. ১৫) পৌরাণিক মতের উল্লেখ সূত্রকারের অভীপ্সিত ছিল।[১৫] ব্রহ্মসূত্রকারের এই পুরাণবর্জন সম্ভবত ভাষ্যকার শংকর প্রদর্শিত পৌরাণিক মত ও সাক্ষ্যের প্রতি উপেক্ষার অপর এক কারণ; আর এক্ষেত্রে রামমোহন তাঁর ভাষ্যে শংকরকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু স্বীয় সূত্রব্যাখ্যায় পুরাণের সাহায্য গ্রহণ না করলেও এবং শ্রুতির তুলনায় পুরাণকে নিম্নপর্যায়ের শাস্ত্র মনে করলেও শংকর একথা স্পষ্টই বলেছেন—ইতিহাস-পুরাণ বেদমূল এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ব্যাসাদি ঋষিগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতিজনিত অভিজ্ঞতার উপর এর

সত্য প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং দেবগণের অস্তিত্ব ও দেবদর্শনের যাথার্থ্য প্রমাণের পক্ষে ইতিহাস-পুরাণের সাক্ষ্য অভ্রান্ত।[১৬] সাম্প্রদায়িক বিষ্ণূপাসক রামানুজ তাঁর বেদান্তভাষ্যে শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবচনের পাশাপাশি বহুস্থলে বিষ্ণুপুরাণের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন; কিন্তু তিনিও শাস্ত্ররূপে পুরাণকে শ্রুতির সমকক্ষ মনে করেন নি। পাতঞ্জল-যোগসিদ্ধান্ত খণ্ডন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুরাণপ্রবক্তা হিরণ্যগর্ভ দেহধারী হওয়ায় স্বয়ং যেমন রজঃ ও তমোগুণ থেকে মুক্ত নন, তাঁর রচিত পুরাণশাস্ত্র তেমনি রজঃ ও তমোমূলক—সুতরাং যোগস্মৃতির মতই পুরাণের মধ্যেও ভ্রান্তির অবকাশ আছে।[১৭] কিন্তু রামানুজের (খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী) পর থেকেই সাম্প্রদায়িক বেদান্তভাষ্যকারগণের মধ্যে পুরাণপ্রামাণ্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রসঙ্গত এর কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। শংকর বা রামানুজ পুরাণকে শাস্ত্ররূপে গণ্য করেও তার শ্রুতিসমকক্ষতা স্বীকার করেন নি। কিন্তু পরবর্তী বৈদান্তিকগণ শাস্ত্র-হিসাবে শ্রুতি ও পুরাণের মধ্যে প্রভেদ তো করেনই নি, অধিকন্তু সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলিকে প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত শ্রুতির ঊর্ধ্বে স্থান দিতেও তাঁদের দ্বিধা ছিল না। দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্যের মতে (খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ বলতে বুঝতে হবে—ঋগাদি চতুর্বেদ, পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র, মহাভারত, রামায়ণ, ব্রহ্মসূত্র, পাঞ্চরাত্রাত্মক বৈষ্ণব পুরাণসমূহ এবং এই সকলের প্রতিকূল না হলে মনু প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ।[১৮] দেখা যাচ্ছে রামানুজের মনে পুরাণপ্রামাণ্য সম্পর্কে যে দ্বিধাটুকু ছিল মধ্ব তা কাটিয়ে উঠেছেন। তাঁর বিবেচনায় পুরাণশাস্ত্র প্রমাণরূপে বেদের মতই মান্য—তবে যে কোনও পুরাণ নয়, পাঞ্চরাত্রানুসারী বৈষ্ণব পুরাণগুলিরই কেবল এই মর্যাদা প্রাপ্য। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে তাঁর অবিমিশ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টির প্রকাশ লক্ষণীয়। অনুরূপ মনোভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্যগণের মতবাদে। এই সম্প্রদায়ের প্রধানতম তত্ত্বব্যাখ্যাতা জীবগোস্বামী আলোচনাপ্রসঙ্গে জ্ঞানের উৎপত্তিস্থলরূপে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় সাধারণ ভাবে স্বীকৃত অন্য সকল প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে একমাত্র শব্দপ্রমাণকেই মান্য করেছেন;[১৯] কিন্তু শব্দপ্রমাণ বলতে, শংকর, ভাস্কর বা রামানুজ প্রভৃতির ন্যায় তিনি একমাত্র শ্রুতিসাক্ষ্যকে বোঝেন নি। তাঁর মতে বর্তমান যুগে শ্রুতি বা বেদ অধিগত

করা সহজ নয় ; বেদভাষ্যকারগণের পরস্পরের মধ্যেও মতের মিল নেই ; সুতরাং বেদের অর্থনির্ণয় করতে হলে আমাদের ইতিহাস-পুরাণের সাক্ষ্যকে শব্দ-প্রমাণের মর্যাদা দিতে হবে ; বেদের অন্তর্নিহিত অর্থকে সম্পূর্ণতা দান করবার জন্যই পুরাণের সৃষ্টি।[২০] অতঃপর তিনি আরও অগ্রসর হয়ে মৎস্যপুরাণের বচন উদ্ধৃত করে পুরাণসমূহকে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও সংকীর্ণ এই চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে এর মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণগুলি বিষ্ণুমাহাত্ম্য সূচক, রাজসিক শ্রেণীতে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য বর্ণিত, তামসিক পুরাণসমূহের আরাধ্য শিব ও সংকীর্ণ গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য দেবী সরস্বতী ও পিতৃগণের মহিমা কীর্তন[২১]। কিন্তু এই ভাবে বৈষ্ণব পুরাণগুলির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হলেও জীব তা যথেষ্ট মনে করেন নি। তিনি তার পরেও বলতে চেয়েছেন, বৈষ্ণব-পুরাণসমূহের মধ্যে, এমন কি সর্বশাস্ত্রের মধ্যে, ভাগবতপুরাণই সাত্ত্বিকতম ও প্রমাণ হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ; ব্যাস ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা বটে, কিন্তু এই সূত্র সর্ব-সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত নয় ; তাছাড়া এগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এর ব্যাখ্যা সম্পর্কেও মতভেদ আছে ; সুতরাং প্রমাণরূপে বেদ, ইতিহাসপুরাণ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রের সারস্বরূপ একটি অপৌরুষেয় পুরাণগ্রন্থকেই মান্য করা বিধেয় ; এমন এক গ্রন্থ 'সর্বপ্রমাণচক্রবর্তী' ভাগবতপুরাণ ; ব্যাস ব্রহ্মসূত্র ও বিবিধ পুরাণগ্রন্থ রচনা করেও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারেননি—সেই হেতু তিনি সমাধিমগ্ন হয়ে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে ভাগবতপুরাণ প্রণয়ন করেছেন ; সুতরাং ভাগবত পুরাণেই সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়।[২২] এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক মতে প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগের প্রকাশ যথেষ্ট থাকলেও ঐতিহাসিক বিচারবোধের পরিচয় অল্পই ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্যগণ ভাগবত পুরাণের প্রতি তাঁদের অপরিসীম শ্রদ্ধাসত্ত্বেও কিন্তু সর্বদা প্রকাশ্যে এতটা নিরংকুশ হতে পারেন নি। রাধাদামোদর ও তাঁর শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণের রচনা বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাধাদামোদর তাঁর "বেদান্ত-স্যমন্তক" গ্রন্থে স্বীকার করেছেন পরবর্তী যুগের ঋষিগণের মধ্যে প্রায়শ সিদ্ধান্তগত মতভেদ লক্ষ্য করা যায় ; তাই তাঁদের উক্তিকে প্রমাণস্বরূপ গণ্য করা চলে না ; অপর পক্ষে শ্রুতির মধ্যে কোনও অন্তর্বিরোধ নেই—শ্রুতিই একমাত্র আদি অকৃত্রিম প্রমাণ।[২৩] বলাবাহুল্য পুরাণকারগণ এই পরবর্তী ঋষিকুলেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু

কার্যত রাধাদামোদর নিজেকে সর্বত্র তাঁর শ্রুতিশ্রেষ্ঠত্ববাদে নিবদ্ধ রাখতে পারেন নি। ঐ একই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় তিনি জীব গোস্বামীর অনুকরণে পুরাণসমূহকে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত করে তথাকথিত সাত্ত্বিক (অর্থাৎ বৈষ্ণব) পুরাণগুলির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করবার জন্য সচেষ্ট।[২৪] এই স্ববিরোধ বলদেবের রচনাতেও (অষ্টাদশ শতাব্দী) লক্ষণীয়। তিনি বেদের শ্রেষ্ঠত্বে ও সর্বোচ্চ প্রামাণিকতায় বিশ্বাসী এবং তাঁর মতে শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নেই, পুরাণ-ইতিহাস শ্রবণই তার পক্ষে বিধেয়। এমন কি তিনি বলেন, যেহেতু শূদ্রগণের মুক্তি পুরাণাদি শ্রবণের ফলেই সম্ভব, সেই কারণে তারা এই উপায়ে মুক্তিলাভ করলেও তাদের অর্জিত মুক্তি বেদাধিকারী ব্রাহ্মণাদি তিন উচ্চবর্ণের লভ্য মুক্তি অপেক্ষা নিম্নস্তরের।—অর্থাৎ মুক্তির ভূমিতেও বর্ণবিভাগ আছে।[২৫] কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় স্বরচিত ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যের মঙ্গলাচরণে (তৃতীয় শ্লোকে) ভাগবতপুরাণের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি এবং 'সূক্ষ্মা'শীর্ষক ঐ অংশের নিজকৃত টীকায় এই মর্মে উক্তি যে বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ সমস্ত বেদান্তের সারভূত শ্রীমদ্‌ভাগবতের আনুগত্যেই তিনি ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করছেন।[২৬] জীব-গোস্বামীর প্রভাব তিনিও এড়াতে পারেন নি। অপর পক্ষে শ্রীপতি, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি রচিত সাম্প্রদায়িক শৈব বেদান্তভাষ্যগুলিতে অনুরূপভাবেই শিবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করা হয়েছে; বলা হয়েছে,—শিবই পরব্রহ্ম; বেদের সমস্ত বচনই শিবের গৌরবসূচক; শৈব আগম শিবপুরাণ সর্বাধিক প্রামাণিক শাস্ত্র; এবং বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক পুরাণগুলি শাস্ত্র হিসাবে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট।[২৭] বীরশৈব ভাষ্যকার শ্রীপতি স্পষ্টত পুরাণ-ইতিহাসের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন —এবং এই শ্রেণীভুক্ত যে-সব গ্রন্থের বচন তিনি প্রমাণরূপে ভাষ্যে উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক শৈবশাস্ত্রেরই সুনিশ্চিত প্রাধান্য—যথা শিবগীতা, শিবপুরাণ, শিবপুরাণের অন্তর্গত বায়বীয় সংহিতা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ঈশান-সংহিতা, শিবধর্ম, বাতুলতন্ত্র, অনুভবসূত্র, বীরাগম, মহিম্নস্তোত্র, ইত্যাদি।[২৮]

এ পর্যন্ত পুরাণের তাৎপর্য ও পৌরাণিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং ক্রম-অভিব্যক্তি সম্পর্কে যা বলা হল সেই প্রেক্ষাপটটি মনে রাখলে পুরাণ সম্পর্কে

রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী ও উক্তিগুলির তাৎপর্য বিচার করা সহজ হবে। সংস্কৃত ও বাঙ্‌লায় রচিত তাঁর বিচারগ্রন্থগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সর্বসমেত তাঁকে পুরাণ-ইতিহাস পর্যায়ের[২৯] ছাব্বিশ খানি গ্রন্থের উল্লেখ করতে দেখা যায়: (১) ভাগবতপুরাণ (৮৯ বার);[৩০] (২) বিষ্ণুপুরাণ (৬ বার);[৩১] (৩) পদ্মপুরাণ (১৯ বার);[৩২] (৪) গরুড়পুরাণ (৮ বার);[৩৩] (৫) কালিকা (কালী) পুরাণ (৮ বার);[৩৪] (৬) স্কন্দপুরাণ (১৮ বার);[৩৫] (৭) ভবিষ্যপুরাণ (২ বার);[৩৬] (৮) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (৬ বার);[৩৭] (৯) নরসিংহপুরাণ (১ বার);[৩৮] (১০) শিবধর্ম (১ বার);[৩৯] (১১) কূর্মপুরাণ (১২ বার);[৪০] (১২) বরাহপুরাণ (২ বার);[৪১] (১৩) শিবপুরাণ (৫ বার);[৪২] (১৪) লিঙ্গপুরাণ (৩ বার);[৪৩] (১৫) শাম্বপুরাণ (১ বার);[৪৪] (১৬) মার্কণ্ডেয়পুরাণ (৫ বার);[৪৫] (১৭) ব্রহ্মপুরাণ (৪ বার);[৪৬] (১৮) বিষ্ণুধর্মোত্তর (১ বার);[৪৭] (১৯) নারদীয়পুরাণ (১ বার),[৪৮] (২০) মৎস্যপুরাণ (২ বার):[৪৯] (২১) দেবীপুরাণ (৩ বার);[৫০] (২২) মহাভারত (৩১ বার);[৫১] (২৩) রামায়ণ (২ বার);[৫২] (২৪) হরিবংশ (২ বার);[৫৩] (২৫) যোগবাশিষ্ঠ (রামায়ণ) (১৫ বার);[৫৪] এবং (২৬) অধ্যাত্ম রামায়ণ (৩ বার);[৫৫]। এই কিঞ্চিৎ বিস্তারিত সমীক্ষা থেকে সহজেই যে সিদ্ধান্ত করা যায় তা এই: রামমোহন হিন্দুধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে নিজেকে মাত্র বৈদিক সাহিত্যের জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে—অর্থাৎ উপনিষদ্‌-বেদান্তে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এই প্রচলিত সংস্কার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বেদোত্তর সুবিশাল পৌরাণিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল খুবই গভীর এবং সুবিস্তীর্ণ। হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের কাজ যে পৌরাণিক (ও তান্ত্রিক) ঐতিহ্যের উপযুক্ত বিচার ছাড়া সম্ভব হতে পারে না এই বোধও তাঁর চিত্তে খুবই স্পষ্ট। এই কারণেই প্রথম থেকে তাঁকে তাঁর বাঙলা ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে শাস্ত্রহিসাবে পুরাণ-তন্ত্রের গুরুত্বের প্রসঙ্গটিকে একাধিক বার আলোচনা করতে দেখা যায়। এ-সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে[৫৬] বিস্তারিত ভাবে যা বলা হয়েছে পুনরুক্তি না করে, সংক্ষেপে তার সারমর্ম এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে: রামমোহনের মতে পুরাণ ও তন্ত্রকে অবশ্যই শাস্ত্র বলে গণ্য করতে হবে, এবং শ্রুতিবিরোধী না হলে এদের সাক্ষ্য নিশ্চয় প্রমাণরূপে মান্য। শ্রুতিপ্রমাণ প্রসঙ্গে তিনি সমগ্র শ্রুতির যে

একবাক্যতা স্বীকার করেছেন।[৫৭] পুরাণ-তন্ত্র সংক্রান্ত আলোচনায় সেই তত্ত্বকেই তিনি কিছু সম্প্রসারিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে পুরাণ-তন্ত্রের সাক্ষ্য নানা স্থানে বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরোধী ; পুরাণে ও তন্ত্রে সাকার উপাসনার বিস্তারিত উপদেশ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ (এবং প্রায়শ স্থূল) বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এ-সম্পর্কে রামমোহনের বক্তব্য, বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাখ্যাত একতত্ত্ববাদী ও একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তের সঙ্গে এগুলির একবাক্যতা স্থাপন করে সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। এই সমস্ত তথাকথিত সাকারোপাসনা বাচক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উক্তিসমূহ প্রকৃতপক্ষে বহুদেববাদী সিদ্ধান্ত নয় ; এক অখণ্ড ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের উপাসনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাই এগুলির অভিপ্রায়। ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে যারা অসমর্থ সেই সব দুর্বল অধিকারীর উপাসনার জন্য ঈশ্বরের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপগুলি কল্পনা করা হয়েছে। উপাসনার এই অপেক্ষাকৃত সহজ প্রণালী সামনে না থাকলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে, ধর্মভয়শূন্য নাস্তিক ও দুষ্কৃতিকারীর সংখ্যা বাড়বে এবং লোকস্থিতি বিপন্ন হবে। কথাটি রামমোহন একাধিকবার অতি স্পষ্ট করেই বলেছেন : "......তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে কিন্তু সে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপে করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্মে প্রবর্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক (।) পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।"[৫৮] অন্যত্র : "বাস্তবিক যে যে বচনে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, শতভুজ, সহস্রভুজ ইত্যাদি রূপেতে ব্রহ্মারোপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেই সকল বচনের সহিত বেদান্তসূত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ ঋষিরা বা গ্রন্থকর্তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে সেই সকল আকার কল্পনা মাত্র, যাবৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হয় তাবৎ ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয় কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পর কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না......।"[৫৮ক] এই অধিকারিভেদ স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে[৫৯] রামমোহন খুব জোর দিয়েই বলেছেন, পুরাণ-তন্ত্র কথিত পরমেশ্বরের রূপকল্পনা কল্পনামাত্রই, তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই ; এগুলি যে কোনও সৃষ্ট বস্তুর মত

উৎপত্তি-বিনাশশীল। প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের মত পুরাণতন্ত্রাদিরও প্রতিপাদ্য এক অখণ্ড পরমব্রহ্ম। দুর্বল উপাসকের চিত্ত পৌরাণিক রূপকল্পনার মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞানের ভূমিতে আরোহণ করতে সক্ষম হলেই সকল রূপকল্পনা অন্তর্হিত হয়। এই বক্তব্যের প্রমাণে তাঁর বিচারগ্রন্থগুলিতে বিষ্ণু, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ এবং কুলার্ণব, মহানির্বাণ প্রভৃতি তন্ত্র থেকে একাধিকবার তিনি বহু বচন উদ্ধার করেছেন।[৬০] বেদের জ্ঞানকাণ্ডেও যে একই পদ্ধতিতে দুর্বল অধিকারীর উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ উপাসনার বিধান দেওয়া আছে এই প্রসঙ্গে রামমোহন সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নি। এই উপাসনাসমূহ দুটি ধারায় বিভক্ত: (১) 'প্রণব' জপের দ্বারা উপাসনা; (২) ব্রহ্মা, সূর্য, অগ্নি, প্রাণ, মন, আকাশ ইত্যাদি সৃষ্ট বস্তুকে ব্রহ্ম জ্ঞানে উপাসনা।[৬১] বাহ্যত এই দ্বিতীয়োক্ত বৈদিক বিশেষ উপাসনা ও পৌরাণিক সরূপ উপাসনার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য এই যে পুরাণ-তন্ত্রে সরূপ উপাসনা বলতে সাকার উপাসনা বা প্রতিমাপূজাই বিহিত, বৈদিক যুগে উপাসনায় প্রতিমা মাধ্যমের উদ্ভব হয় নি। উভয়ত্র কিন্তু মূল তত্ত্বটি এক: দুর্বল অধিকারীর চিত্ত স্থির করবার জন্য ও লোকস্থিতি রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই বেদে ও পুরাণে রূপকল্পনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপাস্য বা জ্ঞেয় কিন্তু সর্বদা ও সর্বত্র পরব্রহ্ম। বেদের সঙ্গে পুরাণের একবাক্যতা স্থাপনে তাই কোনও বাধা নেই। এই একবাক্যতা স্বীকার করে নিলেই সমগ্রভাবে শাস্ত্রের একটি সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব। পুরাণশাস্ত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রামমোহনের এই বিস্তারিত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে বেদান্তদর্শনে তাঁর গুরুস্থানীয় শংকরের সঙ্গে তাঁর মতের কয়েকটি সাদৃশ্য ছিল। প্রথমত শংকরের মত তিনি শ্রুতিপ্রমাণকে পুরাণতন্ত্রাদির সাক্ষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞান করেছেন এবং শ্রুতিসম্মত এবং শ্রুতির অনুগত হলে তবেই পুরাণ-তন্ত্রের বচনকে শাস্ত্রের মর্যাদা দান করেছেন। দ্বিতীয়ত শংকরের মতই তিনি তাঁর বেদান্তভাষ্যে বা 'বেদান্তসার' প্রভৃতি বেদান্তবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে পুরাণতন্ত্রাদির বচনকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন নি। অপর পক্ষে শাস্ত্রহিসাবে বেদ ও পুরাণতন্ত্রাদির একবাক্যতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি যেরকম বিস্তারিত, তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন, শংকরের রচনায় তার নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাধারণভাবে পুরাণের বেদমূলত্ব স্বীকার করা ছাড়া শংকর তাঁর সুবিস্তীর্ণ রচনাবলীর মধ্যে

কোথাও প্রচলিত পুরাণগুলির উল্লেখমাত্রও করেন নি। তাঁর নামে প্রচলিত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ-ভাষ্যভূমিকাতে একাধিক পুরাণের বচন উদ্ধৃত হয়েছে বটে, কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি অনেক পণ্ডিত এই ভাষ্যকে শংকরের রচনা মনে করেন না।[৬২]

পুরাণকে শাস্ত্ররূপে স্বীকার করে সজাগ ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দিলেও রামমোহনের বিচারশীল আধুনিক মনের পক্ষে পৌরাণিক সাক্ষ্যের দুর্বলতা ও স্ববিরোধগুলি আবিষ্কার করা কঠিন হয় নি। তাঁর বিস্তারিত আলোচনায় এ বিষয়ে তিনি যে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন সেগুলি এখানে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে :

১. পুরাণ (ও তন্ত্র) শাস্ত্রের পরিধি বিপুল। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগের অবসান (এমন কি আধুনিক যুগের আরম্ভকাল) অবধি পুরাণ-তন্ত্রাদি শ্রেণীর গ্রন্থরচনা অব্যাহত আছে। সুতরাং এই শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থাদির প্রামাণ্য বিচারের প্রশ্নে আমাদের প্রতিপদে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং যে গ্রন্থ অর্বাচীন প্রমাণিত হবে তার সাক্ষ্য বর্জন করতে হবে। এই গ্রহণ-বর্জন ব্যাপারে রামমোহন যে মানদণ্ড অবলম্বন করেছিলেন তৃতীয় অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হয়েছে,[৬৩] ক্রমরক্ষার নিমিত্ত এখানে সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করলেই চলবে। রামমোহনের মতে পুরাণ-তন্ত্র শ্রেণীর কেবলমাত্র সেই গ্রন্থগুলিই শাস্ত্ররূপে মান্য—যে গুলির টীকা আছে এবং যেগুলির বচন পূর্বাচার্য ও নিবন্ধকারগণ উদ্ধৃত করেছেন। এই সতর্কতার কারণটি তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন : "···এদেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এবং সুলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণের ন্যায় বচনের রচনা হইতে পারে···।"[৬৪] তাই দেখা যায় যেখানে তিনি পুরাণ বা তন্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেখানে আকরস্বরূপ হয় মূল গ্রন্থ নতুবা কোনও সুপরিচিত প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থের উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তাঁর প্রতিপক্ষগণকেও আলোচনাকালে তিনি বার বার গ্রন্থপ্রামাণ্য বিচারের এই মূল নীতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তা লঙ্ঘিত হতে দেখলে তীব্র সমালোচনা করেছেন। অর্বাচীন পুরাণ-তন্ত্র শ্রেণীর গ্রন্থ এবং কল্পিত পুরাণবচন রচনা করে নিজ সিদ্ধান্তের পক্ষে শাস্ত্রীয় সমর্থন আদায় করবার চেষ্টা যে কত হাস্যকর তার কয়েকটি দৃষ্টান্তও তিনি দিয়েছেন। বিচারে তাঁর প্রতিপক্ষ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন চৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রমাণ

করবার উদ্দেশ্যে "অনন্ত-সংহিতা" নামক গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করলে রামমোহন তাঁর পূর্বোক্ত আদর্শের মাপকাঠিতে 'অনন্ত-সংহিতা'কে প্রামাণ্যহীন অর্বাচীন গ্রন্থ ঘোষণা করেন এবং কতকটা কৌতুকের বশবর্তী হয়েই দেখান যে অনুরূপ একখানি অর্বাচীন গ্রন্থ 'তন্ত্ররত্নাকর'এর উক্তির ভিত্তিতে চৈতন্যসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করাও চলে, কিন্তু এই রকম দুর্বল প্রমাণ ব্যবহার করা পণ্ডিতজনোচিত নয় ("এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা নাই এ সকল বচন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে এ নিমিত্ত আমাদের ও তাবৎ পণ্ডিতদের নিয়মানুসারে এ সকল বচনকে লিখিতে বাসনা ছিলনা...")।[৬৫] অন্যত্র: "...এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে [বেদান্ত] ভাষ্য করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্র গরুড় পুরাণ বলিয়া বচন রচনা করিয়াছেন, আর দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্ম যাহাদের এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ এমৎ নবীন নবীন ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন লিখেন সেইরূপ কোনো কোনো শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবতরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণীয় বচনের প্রকাশ করেন।[৬৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে সম্প্রসারমান পৌরাণিক সাহিত্যে পরবর্তীকালীন অংশের অর্বাচীনত্ব সম্পর্কে রামমোহন যথেষ্ট সচেতন। বঙ্কিমের মত তিনিও জানতেন সন্ধান করলে এই বিপুলায়তন সাহিত্য থেকে যেমন বেদমূল ধ্যান-ধারণার সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি এ-সবের মধ্যে সত্যনারায়ণ, ষষ্ঠী-মনসার কাহিনীরও অপ্রতুল নেই। সুতরাং বেদ-বেদান্তের সঙ্গে পুরাণের দার্শনিক অংশের একবাক্যতা স্থাপন করেও পৌরাণিক সাক্ষ্যকে নির্বিচারে মেনে নেওয়ার বিপদ সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক থাকতে হয়েছিল। এইখানে রামমোহনের দৃষ্টি বিচারশীল ও আধুনিক।

২. বর্তমান অধ্যায়ের ভূমিকায় পুরাণ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি পুরাণ হিন্দুধর্মের সাম্প্রদায়িক ও স্মার্ত পঞ্চোপাসনার অন্যতম প্রধান অবলম্বন। শংকরোত্তর সাম্প্রদায়িক বেদান্তভাষ্যকারগণও বহুল পরিমাণে সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলির সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেছেন, এমন কি কেউ কেউ পরোক্ষে এগুলির স্থান শ্রুতির উপরে নির্দেশ করতেও দ্বিধা করেন নি। শংকরশিষ্য আধুনিকমনা রামমোহনের পক্ষে এই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। অপর পক্ষে তাঁর প্রতিপক্ষগণের

মধ্যে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী এবং কিছু পরিমাণে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছাড়া আর প্রায় সকলেই মুখ্যত এই সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলিকে অবলম্বন করে তাঁর সঙ্গে তর্কে নেমেছিলেন। বৈষ্ণব গোস্বামী (নাম অজ্ঞাত), কবিতাকার (নাম অজ্ঞাত), উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কেউই এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নন।[৬৭] উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের প্রশ্ন ছিল, 'কৃষ্ণ' ও 'ব্রহ্ম' শব্দ দুটি যখন একার্থবাচক, তখন রামমোহন তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে[৬৮] কৃষ্ণকে সূর্য, বায়ু, মহাদেব (রুদ্র) প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত করে পরব্রহ্মের চেয়ে নিম্নভূমিতে স্থাপন করেছেন কোন যুক্তিতে ?[৬৯] এই বিচারে উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েক বার উত্তর-প্রত্যুত্তর বিনিময় হয়েছিল। রামমোহন তাঁর উত্তরে সর্বত্র পুরাণ-তন্ত্রাদি বহু গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব পুরাণগুলি যেমন বিষ্ণুকে একমাত্র উপাস্য সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে বর্ণনা করে শিব, শক্তি, সূর্য, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবদেবীকে তাঁর অনুগত নিম্নপর্যায়ের দেবতা গণ্য করেছেন, তেমনি শৈব ও শাক্ত পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে আবার বিষ্ণুর মাহাত্ম্য খর্ব করে শিব বা শক্তিকে সর্বোচ্চ আরাধ্য বা আরাধ্যা ঘোষণা করা হয়েছে। এই ভাবে শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করলে কোনও মীমাংসাই সম্ভব হয় না, সাম্প্রদায়িক কলহ বেড়ে চলে মাত্র ; সকল উপাসনার মধ্যে তাই অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনই শ্রেষ্ঠ ; তা ভিন্ন অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন করার দ্বিতীয় পন্থা নেই (তত্ত্বতস্তু সকলশাস্ত্র-সৎতর্কবিরুদ্ধমিব ভাতি অবিদ্যাবন্ধনলক্ষণৈকরোগস্য তত্ত্বজ্ঞানরূপৈকভেষজং বিনা অন্যৌষধবিরহাৎ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়)।[৭০] উৎসবানন্দের মত রামমোহনের পূর্বকথিত অপর তিন প্রতিপক্ষও ছিলেন বৈষ্ণব। এঁদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিযুক্তি দেবার কালে রামমোহন তাঁর এই বক্তব্যটিকেই আরও বিশদ্ ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। গোস্বামীর প্রতি প্রযুক্ত তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিটিকে এই বিষয়ক যুক্তির নির্যাস গণ্য করা যেতে পারে: "আপনি··লিখিয়াছেন যে গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণেতে সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাকার যে কৃষ্ণ কেবল তেঁহো সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন।···আপনকার কথা তবে গ্রাহ্য হইতে পারিত যদি সাকার সকলের মধ্যে কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম করিয়া কহিতেন (।) কিন্তু আপনারা যেমন গোপালতাপনী শ্রুতি ও ভাগবতকে প্রমাণ করিয়া কৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহেন সেইরূপ শাক্তেরা

দেবীসূক্ত ও অন্য অন্য উপনিষৎকে প্রমাণ করিয়া কালিকাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া থাকেন এবং কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদ্রী ও শিবপুরাণ প্রভৃতি শ্রুতি স্মৃতিতে মহেশ্বরকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন (।) এইরূপে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মা, সূর্য, প্রাণ, গায়ত্রী, মন আকাশ ইত্যাদিকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন এবং পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তাররূপে বর্ণনা করেন সেইরূপ শিবপুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালীপুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকেও শাম্বপুরাণ প্রভৃতিতে সূর্যকে বিশেষরূপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন এবং মহাভারতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনকেই ব্রহ্ম করিয়া কহেন (।) অতএব তাপনী ও ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এই প্রমাণের বলে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণবিগ্রহকে কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মানা যায় তবে ব্রহ্মা, সদাশিব, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি যাঁহাদিগ্যে বেদে এবং পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া স্বীকার কেন না কর"।"[১] পৌরাণিক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই যুক্তিই ছিল রামমোহনের ব্রহ্মাস্ত্র। তাঁকে প্রধানত বৈষ্ণবদের সঙ্গে তর্ক করতে হয়েছিল বলেই তর্কটি এখানে আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণব-বিরোধী রূপ নিয়েছে। সন্দেহ নেই, যদি সাম্প্রদায়িক শৈব বা শাক্তগণ তাঁর প্রতিপক্ষ হতেন তাহলে এই যুক্তিটি ঘুরিয়ে তাঁদের প্রতি প্রয়োগ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না।

৩. রামমোহনের প্রতিপক্ষগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলেই—পুরাণ অবলম্বনে তাঁদের সঙ্গে রামমোহনের তর্ক বিশেষ ক্ষেত্রে আরও কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিল। বর্তমান অধ্যায়ের ভূমিকায় আমরা রেখেছি রামানুজের পর থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আচার্যগণ প্রকাশ্যভাবেই পুরাণপক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেছেন এবং এ-বিষয়ে সর্বাধিক অগ্রসর হয়েছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক পুরাণগুলি এঁদের প্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল এবং সেসবের মধ্যে জীব গোস্বামীর মতে ভাগবতপুরাণ হল 'সর্বপ্রমাণচক্রবর্তী', তার স্থান বেদবেদান্তেরও উর্ধ্বে। বলদেব কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীতে গৌড়ীয় সাম্প্রদায়িক ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচিত হবার পূর্বে এঁরা বিশ্বাস করতেন ভাগবত পুরাণ প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বেদান্তভাষ্য। জীব গোস্বামীর পরবর্তী দুই আচার্য রাধাদামোদর ও বলদেব বিদ্যাভূষণ এতদূর না গেলেও বৈষ্ণব পুরাণগুলির বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করেছেন এবং সেগুলির উপর প্রায় প্রতি পদে

নির্ভর করেছেন। রামমোহনের প্রতিপক্ষগণের মধ্যে বৈষ্ণব গোস্বামী এই সাম্প্রদায়িক মতগুলি নিয়েই রামমোহনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। গোস্বামীর গ্রন্থ পাওয়া যায় নি, কিন্তু রামমোহনের উত্তর আমাদের সামনে আছে। প্রধানত এই গ্রন্থখানি এবং গৌণত কবিতাকার ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকে প্রদত্ত তাঁর উত্তরগুলি থেকে ('কবিতাকারের সহিত বিচার,' 'চারি প্রশ্নের উত্তর' ও 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থত্রয়ে লিপিবদ্ধ) আমরা গৌড়ীয় সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব মতের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিগুলির পরিচয় পাই। রামমোহনকৃত পুরাণ-অনুশীলনের সমীক্ষার ফলে জানা যায়—বিচার-প্রসঙ্গে ভাগবতপুরাণের ব্যবহারই তিনি করেছেন সর্বাধিক। এর দুটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান হিসাবে এই গ্রন্থের সহিত তাঁর পরিচয় প্রথম থেকেই ছিল গভীর; দ্বিতীয়ত তাঁর বৈষ্ণব প্রতিপক্ষগণের, বিশেষত বৈষ্ণব গোস্বামীর, নিকট ভাগবতের মর্যাদা ছিল অতি উচ্চ। সুতরাং বিতর্কে এই গ্রন্থের প্রসঙ্গ যে বার বার উত্থাপিত হবে তা অতি স্বাভাবিক। রামমোহনের রচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে খণ্ডন করেছেন : (১) বেদ-বেদান্ত আলোচনা করা নিষ্ফল, কেননা তা এত দুরূহ যে মানববুদ্ধির অগম্য; বেদার্থনির্ণায়ক ঋষিগণের বাক্য পরস্পর বিরোধী; সুতরাং পুরাণ-ইতিহাসকেই বেদ গণ্য করা উচিত; (২) পুরাণগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পুরাণগুলি সাত্ত্বিক এবং এই কারণে রাজসিক ব্রহ্মাদির মাহাত্ম্যসূচক পুরাণ ও তামসিক শৈবপুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; (৩) এর মধ্যেও আবার ভাগবতপুরাণ সর্বশ্রেষ্ঠ; তা একাধারে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থস্বরূপ : (৪) ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণমূর্তি এবং সেই আকার মায়িক নয়, আনন্দরূপ, তা কেবলমাত্র ভক্তজনের দৃষ্টি-গোচর। সিদ্ধান্তগুলিতে স্পষ্টত জীবগোস্বামীর মত প্রতিফলিত। এগুলির বিরুদ্ধে রামমোহন যথাক্রমে যে প্রতিযুক্তি দিয়েছেন তা সংক্ষেপে এই রকম : (১) বৈদিক ঋষিগণের বা বেদব্যাখ্যাতাগণের বাক্য পরস্পর বিরোধী, এ যুক্তি পুরাণ-ইতিহাস সম্পর্কেও খাটে; কেননা বিভিন্ন পুরাণের মধ্যেও প্রচুর পরস্পর বিরোধী উক্তি দেখা যায়। বেদ মানববুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য এ সিদ্ধান্তও যুক্তিগ্রাহ্য নয়, কারণ গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশ সংস্কার প্রকৃতি ব্রাহ্মণগণ এখন পর্যন্ত বেদমন্ত্রের সাহায্যেই জপ ও অনুষ্ঠান করে থাকেন। পুরাণাদি বেদমূল;

বেদার্থকেই সাধারণ মানুষের পক্ষে (যাদের বেদশ্রবণ শাস্ত্রে নিষেধ) সহজভাবে ব্যক্ত করেছে মাত্র। এই জন্যই এগুলিকে শাস্ত্রপদবাচ্য মনে করা হয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থ কখনও বেদের সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না; (২) সত্ত্ব, রজ তম গুণের ভিত্তিতে পুরাণগুলির শ্রেণীবিভাগ, এবং শিবমাহাত্ম্যসূচক পুরাণকে তামস শ্রেণীভুক্ত করবার পক্ষেও কোনও যুক্তি নেই। পুরাণমাত্রকে যদি ব্যাসবাক্য বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে বৈষ্ণব পুরাণ উচ্চ এবং শৈবপুরাণ নিম্ন পর্যায়ভুক্ত এমন কথা বললে ব্যাসবচনের একবাক্যতা রক্ষা হয় না। দেখা যাচ্ছে শৈবপুরাণসমূহে ও মহাভারতের অনেক স্থলে শিবকে সর্বোচ্চ দেবতা বলা হয়েছে এবং বিষ্ণুর মুখে শিবস্তুতি বসানো হয়েছে। সুতরাং পুরাণমাত্রেরই সমান মান্যতা; সেখানে উচ্চনীচ শ্রেণীবিভাগ করা অর্থহীন স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর; (৩) ভাগবতপুরাণকে কোনও যুক্তিতেই বেদান্তভাষ্যরূপে গণ্য করা চলে না। ব্রহ্মসূত্রের সাড়ে পাঁচশ সূত্রের মধ্যে একটিও সূত্রের ব্যাখ্যা বা উল্লেখ ভাগবতে কোথাও পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ভাগবত পুরাণে করা হয়েছে, সেই সকল লোকবিরুদ্ধ আচরণেব সঙ্গে ব্রহ্মসূত্রের সংস্রবমাত্রও কল্পনা করা যায় না। বৈষ্ণবাচার্যরা যেমন কৃষ্ণপক্ষে বেদান্তের ব্যাখ্যা করে থাকেন, শৈবাচার্যরা তেমনি শিবপক্ষে ঐরূপ করেছেন; এমন কি কোনও শাক্ত কর্তৃক স্বয়ং ভগবত পুরাণকে কালীপক্ষে ব্যাখ্যা করার নিদর্শনও আছে। এই সব সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যায় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য কখনও ধরা পড়ে না। বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, সাকার গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ নন। ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রে এবং মানবধর্মশাস্ত্রে যে যে স্থলে বেদান্তমতের উল্লেখ আছে সেখানেও এই কথাই বলা হয়েছে। ভাগবত পুরাণ যে অন্যান্য সকল পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন সিদ্ধান্তেরও কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নেই। অন্যান্য পুরাণ ইতিহাস রচনার পর পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হওয়ায় সর্বশেষে ব্যাসদেব সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগবত পুরাণ রচনা করেছেন, এ যুক্তিও দাঁড়াচ্ছে না; কেন না অষ্টাদশ পুরাণের তালিকায় ভাগবতের স্থান পঞ্চম, সনাতন ঐতিহ্য অনুসারে তার পরেও আরও তের খানি পুরাণ রচিত হয়েছিল। ভাগবত পুরাণের শেষে ভাগবতকে যে সর্বোত্তম বলা হয়েছে তার থেকেও কিছু প্রমাণ হয় না, এটি মামুলী প্রশংসাবাক্য মাত্র; অনুসন্ধান করলে দেখা

যায় প্রত্যেক পুরাণের শেষেই সেই বিশেষ পুরাণকে অন্য পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে ; (৪) ব্রহ্ম সাকার আনন্দরূপ কৃষ্ণমূর্তি যা কেবল মাত্র ভক্তজনের দৃষ্টিগোচর, বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রামমোহনের বক্তব্য, রূপক বা কল্পনার মাধ্যমে বিমূর্ত আনন্দের ধারণা করা যেতে পারে, কিন্তু আনন্দের মূর্তিমান মনুষ্যাকৃতি হস্তপদবিশিষ্ট রূপ শাস্ত্র, অনুভব, প্রত্যক্ষ— সকল প্রকার প্রমাণের বিরোধী। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মনোগত (subjective) এর কোনও বিষয়গত (objective) ভিত্তি নেই। বেদে বা পুরাণে তো নিম্নাধিকারীর উপাসনার জন্য সূর্য, বায়ু, অগ্নি, অন্ন, শিব, কালিকা প্রভৃতি নানা শক্তি, বস্তু বা দেবদেবীকে বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্ম বলা হয়েছে ; কৃষ্ণকে ব্রহ্মস্বরূপ ও আনন্দমূর্তি স্বীকাব করলে, এঁদের ভক্তদের দৃষ্টিতে এঁদেরও সাবয়ব আনন্দমূর্তি স্বীকার করতে হয়। এবিষয়ে শাস্ত্রসিদ্ধান্তের প্রকৃত তাৎপর্য, এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ, এই ব্রহ্মানন্দের কোনও মূর্ত বিগ্রহ শ্রুতি স্বীকার করেন না।[৭২]

বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কবিতর্ক উপলক্ষে তাঁর উত্থাপিত সব কটি যুক্তিই রামমোহন এই ভাবে অনায়াসে ও নিপুণতার সহিত খণ্ডন করেছেন। এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য রামমোহনের প্রতিপক্ষ জীব গোস্বামীর যুক্তিগুলিকেই প্রধানত অবলম্বন করেছেন, পরবর্তী বৈষ্ণব বৈদান্তিক রাধাদামোদর বা বলদেব বিদ্যাভূষণের উল্লেখ করেন নি ; তাই রামমোহনকেও তাঁদের প্রসঙ্গ তুলতে হয়নি।

এই বাদানুবাদ পাঠে আমাদের স্বভাবত মনে হয় মনীষায় ও পাণ্ডিত্যে উক্ত প্রতিযোগী রামমোহনের সমকক্ষ ছিলেন না। বিতর্কে যে সব প্রশ্ন উঠেছিল সেগুলিও নিতান্তই সাময়িক, আজকের মননজগতে তার বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই। কিন্তু আলোচনাপ্রসঙ্গে রামমোহনের চিন্তার কিছু সূত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই যার স্থান নিছক সাময়িকতার ঊর্ধ্বে এবং যা বৈষ্ণবধর্ম সংক্রান্ত বর্তমান গবেষণায় অবলম্বিত কয়েকটি বিশেষ অনুসন্ধানধারার কথা মনে করিয়ে দেয়। গোস্বামীর প্রশ্নোত্তরে তাঁকে ভাগবতপুরাণের সুদীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল, ভাগবত পুরাণে যদিও সাকার কৃষ্ণোপাসনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে—তা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ।[৭৩] ভাগবতে যেমন দেখা যায় কৃষ্ণ কোথাও নিজেকে ব্রহ্ম বলেছেন, তেমনি এই গ্রন্থেরই তৃতীয় স্কন্দস্থ

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে কপিলও নিজেকে সর্বব্যাপী পরমাত্মা বলে বর্ণনা করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬৯ অধ্যায়ে দেখা যায় কৃষ্ণ কখনও সন্ধ্যা করছেন, কখনও বা ব্রহ্মমন্ত্র জপ করছেন, আবার কখনও পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন আছেন ; ভাগবতে অন্যত্র উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কেবল কৃষ্ণকে নয়, তাবৎ বিশ্ব-চরাচরকে ব্রহ্ম বলে জানবে ; দশম স্কন্ধের ৮৫ অধ্যায়ে পিতা বসুদেবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি : আমি, তুমি বলদেব, দ্বারকাবাসী সকল নরনারী, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম এই সব কিছুকেই ব্রহ্ম বলে জান। সুতরাং ভাগবতের কৃষ্ণ এক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ, তিনি বা তাঁর বিগ্রহ একমাত্র ব্রহ্ম নন।[৭৪] যে অর্থে তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে সে অর্থে চরাচরের সকল ব্যক্তি বা বস্তুকেই ব্রহ্ম বলা যেতে পারে—কেন না অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে সব কিছুই ব্রহ্মস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে রামমোহন ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৩।১৭।৬) উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন শ্রুতিতে প্রাপ্ত কৃষ্ণের এই প্রাচীনতম উল্লেখে তাঁকে অঙ্গিরসগোত্রীয় ঘোর নামক ঋষির নিকট পুরুষযজ্ঞ বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ গ্রহণরত শিক্ষার্থীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে (তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচা-পিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলাযামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি···)। ভাগবতে যে কৃষ্ণকর্তৃক ব্রহ্মমন্ত্রজপের উল্লেখ আছে সেটি এই বিশেষ শ্রুতির অনুসরণ। এই শ্রুতির ইঙ্গিত অনুসারে, আদৌ কৃষ্ণ ব্রহ্ম নন, দেবতাও নন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষ মাত্র। বর্তমান কৃষ্ণ-গবেষণায় এ তথ্য মোটামুটি স্বীকৃত যে ভাগবত ধর্মের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ মূলত ক্ষত্রিয় বৃষ্ণিকুলজাত এক বীরপুরুষ, ব্রহ্মবিদ্ ও ধর্মপ্রবক্তা। ছান্দোগ্যোপনিষদে অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর ঋষির শিষ্যরূপে তাঁর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ; উত্তরকালে ভারতবর্ষের অপরাপর অনেক মহাপুরুষের মত তিনি ক্রমশ উপাস্য দেবতার মর্যাদা লাভ করেছেন।[৭৫] বর্তমানে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং ইতিহাস-পুরাণে বর্ণিত দেবকীপুত্র কৃষ্ণ একই ব্যক্তি। সম্ভবত আধুনিক-যুগে সর্বপ্রথম মূল কৃষ্ণচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে রামমোহন নিজের অলক্ষ্যে আধুনিক কৃষ্ণ-গবেষণার উক্ত মূল্যবান সূত্রটি পণ্ডিতসমাজকে ধরিয়ে দিয়েছেন। এর থেকে আর একটি সিদ্ধান্তও করা চলে। কৃষ্ণ কাহিনী বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের মাধ্যমে যে ভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে তার মধ্যে কৃষ্ণের দুটি স্বতন্ত্র রূপ

আমরা দেখতে পাই : এক দিকে উপনিষদে ও মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্র, যেখানে কৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্, ধর্মপ্রবক্তা, কূটনীতিজ্ঞ, রণপণ্ডিত ও আশ্রিতবৎসল ; অপর দিকে হরিবংশ-পুরাণাদিতে বর্ণিত কৃষ্ণ যিনি প্রেমিক, ভক্তসখা ও গোপীজন-বল্লভ। রামমোহন স্পষ্টত ব্রহ্মজ্ঞ ও ধর্মপ্রবক্তা মানব কৃষ্ণের পক্ষপাতী। লক্ষ্য করবার বিষয়, গীতা রামমোহনের অতি শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় গ্রন্থ। তিনি এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন ও অসংখ্যবার বিভিন্ন স্থানে গীতার কৃষ্ণোক্তি তাঁকে উদ্ধৃত করতে দেখা যায়। বৃন্দাবনলীলার নায়ক ব্রজগোপাল কৃষ্ণকে তাঁর আধুনিক মন প্রত্যাখ্যান করেছিল। আলোচনায় দেখা গেছে ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণকেও তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ রূপেই গ্রহণ করেছেন। এই ভাবে রামমোহন সম্ভবত এক্ষেত্রেও নিজের অলক্ষ্যে আধুনিক কৃষ্ণগবেষণার আর একটি ধারার সূত্রপাত করেছেন। বর্তমানে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন উপনিষদ্-মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণজীবনের কাঠামোটির অতিরঞ্জন সত্ত্বেও একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে ; সে তুলনায় বৃন্দাবনের কাহিনী অর্বাচীন, উত্তরকালের সংযোজন।[৭৬] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র'তে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে অনৈতিহাসিক জ্ঞানে বর্জন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি রামমোহনের নাম কোথাও না করলেও শেষোক্তের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা নিজের অলক্ষ্যে যে প্রভাবিত হননি এমন কথা জোর করে বলা চলে না।

ভাগবত পুরাণের আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন যেটিও পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি চৈতন্যদেবকেন্দ্রিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব-পরম্পরা বিষয়ক। উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুর (ষোড়শ শতাব্দী) বা বলদেব বিদ্যাভূষণের (অষ্টাদশ শতাব্দী) মতানুসারে চৈতন্য সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যের দ্বৈতবাদী মাধ্ব বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই শাখা।[৭৭] কিন্তু শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একটি প্রাচীনতর ঐতিহ্য অনুযায়ী চৈতন্য-সম্প্রদায়ের পূর্বসূরীরা সকলেই শংকরপন্থী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী এবং এই পরম্পরার আদি পুরুষ স্বয়ং শংকরাচার্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আধুনিক আলোচনাকারীদের মধ্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম এই তথ্যের প্রতি বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৈষ্ণব গোস্বামীর প্রশ্নোত্তরে তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি স্মরণীয় : 'যদ্যপিও ভগবান আচার্যের [শংকরাচার্যের] কৃত ভাষ্যকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলেরি দুষ্কৃতের কারণ হয় তথাপি বিশেষ করিয়া

চৈতন্যদেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবেক, যেহেতু পূজ্যপাদ ভগবান ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশবভারতী ছিলেন (।) সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন (।) আর শ্রীধরস্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের সর্বথা মান্য, এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন(।) আর সেই শ্রীধরস্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে—ভাষ্যকার-মতং সম্যক তদ্‌ব্যাখ্যাতুর্গিরস্তথা-ইত্যাদি। ……অতএব ভগবান আচার্যের মত মোহের কারণ হয় এমৎ কহিলে চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগো মুগ্ধ করিয়া স্বীকার করিতে হইবেক আর আচার্য মতানুসারে যে সকল শ্রীধরস্বামীর টীকা তাহারি বা কি প্রকারে মান্যতা হইতে পারে। অতএব আচার্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগের ধর্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়।"[৭৮] রামমোহন এখানে দু'জন শংকরপন্থী সন্ন্যাসী কেশব ভারতী ও শ্রীধরস্বামীকে চৈতন্যের সাম্প্রদায়িক উর্ধ্বতন গুরুপরম্পরার অন্তর্গত গণ্য করে চৈতন্যকে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। শ্রীধর (চতুর্দশ শতাব্দী), বিষ্ণুপুরাণ, গীতা ও ভাগবতের উপর তাঁর সুবিখ্যাত টীকাত্রয়ে শংকরের সমস্ত সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও এই কথাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে ভক্তিই মুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বৈষ্ণব-ধর্মের আধুনিক গবেষকগণের মধ্যে অধ্যাপক সুশীল কুমার দে বৈষ্ণব সাহিত্য ও ঐতিহ্যের অতি নিপুণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে চৈতন্যদেব ও তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যগণ শাংকর অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে যতই বিরূপতা প্রদর্শন করে থাকুন চৈতন্য মূলতঃ শংকরপন্থী দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-ভুক্তই ছিলেন এবং তাঁর গুরুপরম্পরার মধ্যে মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী এবং কেশব ভারতীও পূর্বোক্ত শ্রীধরের মত ভক্তিবাদী শংকরপন্থী ছিলেন এমন মনে করবার কারণ আছে।[৭৯] সর্বস্বীকৃত হোক বা না হোক আধুনিক গবেষণাক্ষেত্রে ডঃ দে'র এই মতটি সুচিন্তিত ও প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু তিনি উল্লেখ না করলেও একথা স্বীকার্য তাঁর শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন রামমোহন রায়।

বৈষ্ণব পুরাণের আলোচনা মাধ্যমে রামমোহন আর একটি সিদ্ধান্তে আসেন যা তাঁর পরবর্তী উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল এবং যার রেশ বর্তমানকালের গবেসণাক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও অনুভব করা যায়।

বৈষ্ণব গোস্বামী ব্যাখ্যাত সাকার কৃষ্ণোপাসনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "পূর্বে যে সকল অধিকারী দুর্বল ছিলেন তাঁহারা মনস্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন সেই রূপকে পরব্রহ্মপ্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন, কিন্তু সেই পরিচিত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্যধামবাসী যাহা বেদ এবং যুক্তি এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয়, এমৎ জানিতেন না (।) পরন্তু সেই কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে·····"।[৮০] এখানে রামমোহন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত ও সিদ্ধ বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে কৃষ্ণের সাকার রূপ এবং নরলীলার প্রতিটি অনুপুঙ্খ প্রত্যক্ষ, নিত্য এবং বাস্তব; তা রূপক বা কল্পনা নয়। বেদ-বেদান্ত পুরাণতন্ত্র দুর্বল অধিকারীর জন্য রূপকল্পনার মাধ্যমে উপাসনার ব্যবস্থা দিলেও বার বার উক্ত কল্পিত রূপসমূহকে নশ্বর বলেছেন,—যা ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। সুতরাং এর সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের মৌলিক প্রভেদ আছে। সর্ব-সাধারণের জন্য এই প্রত্যক্ষ মূর্ত লীলায় বিশ্বাসের বিধানের পরিণাম অবশ্যম্ভাবী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপর্যয়। আধ্যাত্মিক জগতে তা জড়পূজাকে প্রশ্রয় দেয়;[৮১] এবং ভাগবতাদি পুরাণ বর্ণিত কৃষ্ণের লোকবিরুদ্ধ আচরণগুলিকে এই বিশেষ দৃষ্টিতে আদর্শ বলে ধারণা করলে সমাজে ব্যাপক নৈতিক বিশৃঙ্খলা ঘটে।[৮২] বস্তুত বৈষ্ণব ধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গী ধর্ম ও নীতির মধ্যে এক চিরন্তন বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে। রামমোহনের এই মনোভাবের পিছনে হয়তো উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় প্রটেস্টান্ট্ খ্রীষ্টধর্মের নীতিবাদ কিছুটা সক্রিয়। ঐ শতাব্দীতে তাঁর পরবর্তী যুগেও শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধে এই নৈতিক আপত্তি দীর্ঘকাল বজায় ছিল। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও যে এই দ্বিধা ছিল তার প্রমাণ আছে। তিনি পুরাণ বর্ণিত কৃষ্ণলীলাকে বার বার পরিমার্জনের চেষ্টা করেছেন। প্রথমত তাঁর মতে এই কৃষ্ণচরিত্রে এই ব্রজলীলা এক অনৈতিহাসিক প্রক্ষিপ্ত পর্ব—"এ সকল পুরাণকারের কল্পিত উপন্যাস মাত্র।" দ্বিতীয়ত তিনি স্বীকার করেন, পুরাণ বর্ণিত কৃষ্ণের গোপীপ্রেমকাহিনীর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব গভীর হলেও "লোকে তাহা বুঝিল না। তাঁহার রোপিত ভগবদ্ভক্তিপঙ্কজের মূল, অতল জলে ডুবিয়া গেল—উপরে কেবল বিকশিত কামকুসুমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে—তলায় না,

তাহারা কেবল সেই কুসুমদামের মালা গাঁথিয়া ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম প্রস্তুত করিল।......এতকাল আমাদের জন্মভূমি সেই মদনধর্মোৎসবভারাক্রান্ত।"[৮৩] এই মনোভাবের পিছনে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকরী একথা কল্পনা করলে অন্যায় হবে না। সাম্প্রতিক কালে মুক্ত মনে ও সুগভীর পাণ্ডিত্য সহকারে যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেছেন এমন একজন গবেষকের সিদ্ধান্তও প্রায় অনুরূপ: "It cannot be said that Krishna as conceived by the emotional Bengal faith, is fully ethicised ......The precarious Rādhā-Krishna legend, on which its whole system of devotion is based, is taken not as a symbol but as a reality, not as religious myth but as religious history. A strenuous attempt is, therefore, made to explain and fit in all its details and implications; ......the detailed working out of the Vrindāvana-lilā, both in the theological and poetical works of the sect, clearly shows that it is never taken in the sense of an allegory......but in a vivid literal sense,...It is a delightful devotional fancy, but it is wholly unethical ......The Krishna of Vrindāvana alone counts; the Krishna of Kurukshetra is deliberately effaced, ...The glorification of the sex-impulse is supreme. ...The spiritual foundation is too flimsy for its overwhelming excess of eroticism ......the conception and attitude, inspite of scriptural and metaphysical justification, possess dangerous possibilities or demoralising tendencies."[৮৪]। বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কিত এই বিশিষ্ট চিন্তাসূত্রটির জন্য আধুনিক যুগ রামমোহনের নিকট ঋণী।

উপরি উক্ত আলোচনার ফলে দেখা যাচ্ছে পুরাণ সম্পর্কে রামমোহনের মনে কোনও অহেতুক বিরাগ বা বিরূপতা ছিল না। পুরাণকে তিনি শাস্ত্র বলে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন এবং শ্রুতির সঙ্গে তার একবাক্যতা স্থাপন করে শ্রুতির অনুগত প্রমাণ রূপে শাস্ত্রবিচারেও তাকে স্থান দিয়েছেন। তবে উত্তর কালে পুরাণসাহিত্যে যে স্ববিরোধ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করেছিল

তার সমালোচনাতেও তিনি নির্ভীক। এই সাহিত্যের অর্বাচীন অংশকে তিনি গ্রহণ করেন নি এবং পুরাণ-তন্ত্রকে কোন্ মানদণ্ডে শাস্ত্রপদবাচ্য স্বীকার করা যায় তাও নির্দেশ করেছেন। সর্বোপরি পুরাণাশ্রিত কয়েকটি সমস্যার আলোচনায় তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত তার মধ্যে পরোক্ষে উত্তর কালের চিন্তা ও গবেষণার কয়েকটি সূত্র আভাসিত। সাম্প্রতিক কালের এক পণ্ডিতকে বলতে শুনি, "All the religious reformers from Rammohan Roy to Dayananda Sarasvati had condemned the *Purānas* as products of a degenerate age."।[৮৫] এই উক্তি পুরাণের প্রতি অন্তত রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করে না।

তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রধর্মের দ্বারা রামমোহনের প্রভাবিত হবার দুটি সম্ভাব্য সূত্র ছিল। তাঁর মাতৃবংশ ছিলেন শাক্ত তান্ত্রিক এবং শৈশবে তিনি তাঁর মাতামহ ঘোর তান্ত্রিক শ্যাম ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অবশ্য এই সংযোগ শিশু রামমোহনের মনকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা সঠিক জানবার উপায় নেই, তবে তান্ত্রিকমহলে এই যোগাযোগের উপর খানিকটা গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রচলিত দু'একটি কিংবদন্তী থেকে তা বুঝতে পারা যায়।[৮৬] দ্বিতীয়ত একথা সুনিশ্চিত যে রামমোহন তন্ত্রমতের দ্বারা গভীর রূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন তৎকালীন সুবিখ্যাত তান্ত্রিক কৌল সন্ন্যাসী হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূতের সঙ্গে তাঁর আজীবন অন্তরঙ্গতার ফলে। রামমোহনের চোদ্দ বৎসর বয়সে তাঁর সঙ্গে হরিহরানন্দের প্রথম পরিচয় হয় এবং ক্রমশ তা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়ে আজীবন স্থায়ী হয়। ইনি রংপুরে এবং পরে কলিকাতায় দীর্ঘকাল রামমোহনের সঙ্গে বাস করেছিলেন। কলিকাতায় বাসকালে ইনি 'কুলার্ণবতন্ত্র' প্রকাশ করেন এবং 'মহানির্বাণ-তন্ত্রের' উপর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। রামমোহন এঁর কাছে তন্ত্রশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন।[৮৭] কেউ কেউ বলেছেন হরিহরানন্দ রামমোহনের গুরু ছিলেন, তবে এ সম্পর্কে মনে রাখা উচিত যে গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় শীর্ষক বৈষয়িক মামলায় রামমোহনের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় হরিহরানন্দ রামমোহনের সঙ্গে তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতার উল্লেখ করলেও তাঁকে শিষ্য বলে অভিহিত করেন নি; যদি চ ঐ প্রসঙ্গে তিনি সাধারণ ভাবে তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের উল্লেখ করেছেন।[৮৮] যাই

হোক, প্রচলিত অর্থে হরিহরানন্দ রামমোহনের গুরু হয়ে থাকুন বা না থাকুন, রামমোহন যে তাঁকে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও মান্য করতেন তা সুনিশ্চিত। কলিকাতায় বাসকালে হরিহরানন্দ রামমোহনের মাণিকতলার বাড়ীতেই থাকতেন এবং রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়-সভার অধিবেশনে যোগ দিতেন। তাই রামমোহনের চিন্তা ও কার্যপ্রণালী হরিহরানন্দের সান্নিধ্যহেতু তন্ত্রপ্রভাবিত হবার বিশেষ সুযোগ ছিল।

সাধারণ অর্থে তন্ত্র বলতে যে কোনও শাস্ত্রকে বোঝালেও এর একটি বিশেষ অর্থ আছে। "উপাসনাবিশেষ প্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষ" অর্থে শব্দটি আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি।[৮৯] তন্ত্র ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ও জীবনচর্যার এক বিশিষ্ট ধারা। এর উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত আছে, সে-সবের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। সাধারণভাবে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। পণ্ডিতগণের মতে তন্ত্রের অনেকটাই মূলত এসেছে অবৈদিক অনার্য চিন্তাধারা ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রসঙ্গত বলেছি এর আলোচ্য বিষয়কে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়: (১) দর্শন (২) ক্রিয়া। পরবর্তী যুগে অবশ্য এই ভাবধারা আর্য সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং ক্রমশ পরিণতি লাভ করে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। হিন্দুধর্মের বর্তমানে প্রচলিত দেবদেবীপূজা বা অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান তন্ত্রের দ্বারা অতি ব্যাপক ও গভীর ভাবে প্রভাবিত। উপাস্য দেবতা ও উপাসনাপদ্ধতির বিভেদ অনুসারে তান্ত্রিক উপাসকগণ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, স্বায়ম্ভুব, কালমুখ প্রভৃতি নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। বাংলা দেশে শৈবশাক্ত মতবাদের মধ্যে আবার দিব্য, বীর, পশু, বাম, চীন, দক্ষিণ, সময়, কুল প্রভৃতি বিভিন্ন আচার বা উপাসনা-পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়।[৯০] তৃতীয় অধ্যায়ে রামমোহনের বেদান্তমত আলোচনা প্রসঙ্গে তন্ত্রের আচার ও দর্শন সম্পর্কে আমরা বলেছি, তান্ত্রিক পূজা ও সাধনমার্গে কিছু নীতিবিরোধী আচার ও ক্রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটলেও এই বাহ্য আবরণের অন্তরালে তন্ত্রশাস্ত্রের একটি গভীর তাত্ত্বিক ভূমি আছে; তন্ত্রদর্শনের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তগত কোনও প্রভেদ নেই।[৯১] এর পূজাপদ্ধতিও অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। এ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে উল্লিখিত জনৈক বিশেষজ্ঞের মত কিঞ্চিৎ সবিস্তারে উদ্ধার করা যেতে পারে:

"The Tantra form of worship also serves as a course of practical training for the realization of the Vedanta ideal of the identity of the finite with the Infinite, of the individual soul with the Supreme Soul. The various parts of worship—*Bhutasuddhi* and the different *Nyasas*—all aim at this realization. The worshipper has to conceive his body as the seat of the deity at the time of offering worship. On the occasion of 'internal worship' (*antaryaga*) which is the ideal and more preferable form of worship, this process is carried a step further. Here the worshipper has to make attempts to realize the identity of the deity not only with himself but also with all the objects of worship. It would thus appear that inspite of differences in doctrinal details the Tantras had the same ideal in view as the Vedanta."।[১২]

তত্ত্বগত ভাবে বেদান্ত ও তন্ত্রের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হলেও তন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় তার উপাসনাপ্রণালীতে। অদ্বৈতবেদান্তে উপাসনার স্থান খুব উচ্চ নয়। জীব-ব্রহ্ম-অভেদজ্ঞানের উদয় হলেই অদ্বৈতমতানুসারে উপাসনার প্রয়োজন শেষ হয়; তার পূর্বে মুখ্যত চিত্তশুদ্ধির জন্যই উপাসনার প্রয়োজন স্বীকৃত। কিন্তু তন্ত্রে ব্রহ্ম, বৈষ্ণবধর্মের ঈশ্বরের মতই উপাস্য এবং আরাধ্য। এই অর্থে ব্রহ্মোপাসনা তান্ত্রিক ধর্মসাধনার এক বিশিষ্ট অঙ্গ। মহানির্বাণতন্ত্রে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে :

ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে।[১৩]

"মুক্তিলাভের জন্য সেই ব্রহ্ম ভিন্ন ধ্যেয়, পূজ্য এবং সুখারাধ্য আর কেউ নেই।"

ব্রহ্মোপাসনাকে আশ্রয় করে ভক্তি তন্ত্রসাধনায় অতি উচ্চ আসন লাভ করেছে। কুলার্ণব-তন্ত্র বলেন :

ভজনাৎ পরয়া ভক্ত্যা মনোবাক্‌কায়কর্মভিঃ।
ভরত্যখিলদুঃখানি তস্মাদ্‌ভক্ত ইতীরিতঃ।[১৪]

এইভাবে অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিক সাধক তাঁর সাধনা ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

জ্ঞান-ভক্তির এক সমন্বয় সাধন করেছেন। শঙ্করের পরবর্তী অদ্বৈতবাদী বেদান্তাচার্যগণের কারও কারও মধ্যে এমন সমন্বয়ের আভাস যে দেখা যায় নি তা নয় ; এই প্রসঙ্গে শ্রীধর, মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী, বিদ্যারণ্য, মধুসূদন সরস্বতীর নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি।[২৭] কিন্তু এই প্রচেষ্টা অনেকটা ব্যক্তিগত প্রবণতানির্ভর, তন্ত্রের মত এমন সার্বিক নয়। কঠোর শঙ্করপন্থী অদ্বৈতিগণের দৃষ্টিতে ভক্তি, আরাধনা, উপাসনা প্রভৃতি উপাস্য-উপাসক ভেদজ্ঞানের স্তরেই নিবদ্ধ, অভেদজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা দূর হলে এসবেরও বিলুপ্তি।

সাধনপ্রণালীর ক্ষেত্রেও বেদান্ত ও তন্ত্রের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। অদ্বৈত বেদান্ত মায়িক জগৎ ও জীবনের সুখদুঃখকে মিথ্যা জ্ঞান করে সাধককে সংসারবিমুখ হয়ে মোক্ষসাধনায় আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দেয়। ব্রহ্ম ও মায়াশক্তির (শাক্ততান্ত্রিক পরিভাষায় শিবশক্তির) সমন্বয়েই তান্ত্রিক অদ্বৈতবাদের পূর্ণতা ; মায়িক জগৎ এই দৃষ্টিতে ব্রহ্মের মতই নিত্য সত্য, মিথ্যাও নয় অপাঙ্‌ক্তেয়ও নয়। তন্ত্রোক্ত পঞ্চ 'ম'কার সাধন, ষট্‌কর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তন্ত্রশাস্ত্র এই সংসারকে এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছে। মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক ভোগবাসনানিচয়কে মোক্ষপথের চরম বিঘ্ন জেনে নিবৃত্তি-মার্গের উপদেশ দেওয়ার পরিবর্তে উক্ত প্রবৃত্তিসমূহকে আশ্রয় করে সেগুলির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মোক্ষ লাভের চেষ্টা তন্ত্রসাধনার প্রধান লক্ষ্য। সেইজন্য অদ্বৈতবেদান্তের জীবনবিমুখতার স্থলে তন্ত্রে আমরা দেখি এক বলিষ্ঠ জীবন-স্বীকৃতি, যদিচ উভয়ের মূল উদ্দেশ্য এক। তৃতীয় অধ্যায়ে সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের যে উক্তি আমরা উদ্ধৃত করেছিলাম, এই প্রসঙ্গে তা আবার স্মরণ করা যেতে পারে, "তান্ত্রিক সাধকগণ সেই সংসারেই ব্রহ্মানন্দতরঙ্গ দেখিয়া সংসারের কার্যকারণপ্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষরূপে সাধনার সোপান-পরম্পরা বলিয়া দেখাইয়া দিতেছেন··· ।"[২৮]

সামাজিক ক্ষেত্রে তন্ত্রমত বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা উদার ও প্রগতিশীল। প্রাচীন যুগে যেমনই হোক পরবর্তীকালে বৈদিক সংস্কৃতির সামাজিক দৃষ্টি ছিল অনুদার ও সংকীর্ণ। নারী ও শূদ্রের বেদাধ্যয়ন এমন কি বেদশ্রবণের উপরেও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছিল। ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার

যেমন ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে নিবদ্ধ হল তেমনি স্ত্রী-শূদ্র রইল বৈদিক দীক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রই বোধকরি সর্বপ্রথম এই কৃত্রিম বিধিনিষেধের বেড়ি ভাঙ্‌বার জন্য এগিয়ে আসে এবং আচণ্ডাল স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মন্ত্রদীক্ষার অধিকার প্রসারিত করে। গৌতমীয়তন্ত্রের আরম্ভেই দেখা যায় ঋষি গৌতম বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করছেন :

> যেন সর্বফলাবাপ্তিঃ সর্বেষাং বন্ধুরেব যঃ
> সর্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ
> তং ব্রূহি ভগবন্মন্ত্রং মম সর্বার্থসিদ্ধয়ে।[৯৭]

'যে মন্ত্র সর্বফলদাতা, সকলের বন্ধু, যে মন্ত্রে সর্ববর্ণের সমান অধিকার এবং যে মন্ত্র নারীদের যোগ্য, ভগবান্ সর্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই মন্ত্র আমাকে বলুন।" মহানির্বাণতন্ত্রে স্পষ্টত চণ্ডাল ও যবনদের পর্যন্ত সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।[৯৮] ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই সমদৃষ্টি তন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রামমোহনের বিচারগ্রন্থগুলি খুঁটিয়ে দেখলে তাঁর তন্ত্রশাস্ত্রালোচনার একটি সমগ্র রূপ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তিনি সর্বসমেত উনিশ খানি তন্ত্র বা তন্ত্রজাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন ও এগুলির অধিকাংশ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : (১) কুলার্ণবতন্ত্র (৩৪ বার);[৯৯] (২) মহানির্বাণতন্ত্র (২২ বার);[১০০] (৩) তন্ত্রসার (৪ বার);[১০১] (৪) নির্বাণতন্ত্র (৭ বার);[১০২] কুলাবলী (কৌলাবলী) তন্ত্র (৪ বার);[১০৩] (৬) কুলার্চনচন্দ্রিকা (২ বার);[১০৪] (৭) কুলতন্ত্র (৩ বার)[১০৫]; (৮) কুলার্চনদীপিকা (৭ বার)[১০৬]; (৯) কুব্জিকাতন্ত্র (১ বার)[১০৭]; (১০) সময়াতন্ত্র (২ বার)[১০৮]; (১১) কামাখ্যাতন্ত্র (২ বার)[১০৯]; (১২) নিরুত্তর-তন্ত্র (২ বার)[১১০]; (১৩) কালীবিলাসতন্ত্র (৪ বার)[১১১]; (১৪) কালীকল্পলতা (৩ বার)[১১২]; (১৫) অনন্তসংহিতা (২ বার)[১১৩]; (১৬) তন্ত্ররত্নাকর (২ বার)[১১৪]; (১৭) কালিকোপনিষৎ (২ বার)[১১৫]; (১৮) সিদ্ধলহরীতন্ত্র (২ বার)[১১৬]; (১৯) চীনতন্ত্র (২ বার)[১১৭]। এই হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে রামমোহন বাঙ্‌লাদেশে প্রচলিত শৈবশাক্ত মতের অন্তর্গত কৌলতান্ত্রিক সাহিত্যই বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর মাতৃকুল ছিলেন শাক্ত এবং তাঁর তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী স্বয়ং ছিলেন বামাচারী কৌল সন্ন্যাসী।

এ দুটি কথা মনে রাখলে কৌল সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই প্রবণতা অস্বাভাবিক মনে হবে না। তবে শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত দিব্যাচার, পশ্বাচার, বামাচার, সময়াচার, দক্ষিণাচার প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতিরও যে তিনি খবর রাখতেন, তা তাঁর সময়াতন্ত্রের, এবং রচনাবলীর বিভিন্ন স্থানে, অন্যান্য বিধিগুলির উল্লেখ থেকেই প্রমাণিত হয়।[১১৮] তন্ত্রমত যে বাঙ্‌লাদেশে বহুল প্রচলিত এ সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন, এবং 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন: 'তন্ত্রমতবিমুখ ব্যক্তি প্রায় এদেশে অপ্রাপ্য'।[১১৯] উপরের তালিকা থেকে একথাও স্পষ্ট হয় যে, পুরাণের মত তন্ত্রশাস্ত্রেও রামমোহনের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। মাত্র বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদের মধ্যে তিনি আপনাকে নিবদ্ধ রাখেন নি।

এর পর স্বভাবত প্রশ্ন উঠবে শাস্ত্রহিসাবে রামমোহন তন্ত্রকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর বেদান্তমত ও বর্তমান প্রসঙ্গে পুরাণ সংক্রান্ত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনাকালে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়েছে। আমরা দেখেছি, পুরাণ ও তন্ত্রকে তিনি শাস্ত্র বলে স্বীকার করেছেন প্রাচীন শাস্ত্রকারদের পন্থায়, শ্রুতির সঙ্গে তাদের একবাক্যতা স্থাপন করে। পুরাণের মত তন্ত্রে যেখানে প্রতিমাপূজার বিধান ও তৎসংক্রান্ত খুঁটিনাটি ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা আছে-সেই অংশগুলিকে তিনি দুর্বলচিত্ত উপাসকদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ ব্যবস্থা বলে গণ্য করেছেন। পুরাণের মত তন্ত্রেরও মূল প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান; ব্রহ্মজ্ঞানের স্তরে উপনীত হলে উপাসকের চিত্ত থেকে দেবদেবীর রূপকল্পনা অন্তর্হিত হয়। সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলির সিদ্ধান্তের মত সাম্প্রদায়িক তন্ত্রগুলির সাক্ষ্যও রামমোহনের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিগুলি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক মতের বিরুদ্ধে সমভাবে প্রযোজ্য। শাস্ত্রহিসাবে বিবেচনা ও বিচারের যোগ্য তন্ত্রগ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও রামমোহন সর্বদা সজাগ এবং সতর্ক। অর্বাচীন পুরাণের মত অর্বাচীন তন্ত্রও তাঁর নিকট একই যুক্তিতে অগ্রাহ্য। মাত্র সেই সব তন্ত্রগ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য তিনি মানতে প্রস্তুত যার টীকা আছে এবং যার বচন নিবন্ধাদি সুপরিচিত সংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধৃত।

নিজ শাস্ত্রালোচনায় ব্যবহৃত অন্য সকল তন্ত্রগ্রন্থগুলির প্রামাণ্য বিচারে শেষোক্ত কঠোর মানদণ্ড যদিও রামমোহন প্রয়োগ করেছিলেন তথাপি আপাতদৃষ্টিতে এর একটি ব্যতিক্রম ছিল মনে হয়। সেটি হল মহানির্বাণ-

তন্ত্র। বর্তমান আকারে এই বহুল প্রচলিত তন্ত্রগ্রন্থখানিকে প্রাচীন বলে মনে হয় না। এর খুব পুরাতন পুথিও পাওয়া যায় নি; এবং কোনও প্রসিদ্ধ নিবন্ধগ্রন্থে এর থেকে কোনও উদ্ধৃতি আছে এমন কথাও আমাদের জানা নেই। তা সত্ত্বেও রামমোহন অতি যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে গ্রন্থখানি পাঠ করেছিলেন এবং নিঃসন্দেহে এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আর্থার আভেলন (স্বর্গত সার্ জন উড্রফ্) তাঁর সম্পাদিত মহানির্বাণতন্ত্রের ভূমিকায় এ বিষয়ে লিখেছেন: "The Tantra has been subject of commentary by Hariharananda The manuscript of the commentary which is with the editor, is almost entirely in the Raja's handwriting. In the beginning of each chapter of the commentary the Raja writes "Om namo Brahmane" and in the beginning of the commentary to the 9th chapter there is in addition to the above, the following invocation "Shri shri-nātha-padāmbhoje niyatam. matirastu me." ২০। মহানির্বাণতন্ত্রকে রামমোহনের তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী অতি উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। কেউ কেউ এমন ইঙ্গিতও করেছেন যে বর্তমানে প্রচলিত মূল 'মহানির্বাণতন্ত্র' খানিই হরিহরানন্দের রচিত অথবা তাঁর দ্বারা পরিমার্জিত। শেষোক্ত মত সত্য কি না তা সুনিশ্চিতভাবে বলবার উপায় নেই, কিন্তু গ্রন্থখানি যে প্রাচীন নয় একথা সম্ভবত ঠিক। হয় তো বা হরিহরানন্দ এবং তাঁর রচিত টীকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত রামমোহন এই গ্রন্থখানির প্রামাণ্যনির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁর প্রখর বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত করা কঠিন। তবে এইটুকু মনে রাখা যেতে পারে সেযুগে রামমোহনের প্রতিপক্ষীয় কোনও পণ্ডিত মহানির্বাণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আধুনিকত্বের অভিযোগ আনেন নি। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অভিযোগ করেছিলেন রামমোহন মাত্র কুলার্ণব ও মহানির্বাণের বচনের উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য, কেননা তা শ্রুতি, স্মৃতি ও অপর তন্ত্রাদির বক্তব্যের বিরোধী।[২১] এর উত্তরে রামমোহন নানা প্রমাণ উপস্থিত করে দেখান যে কুলার্ণব ও মহানির্বাণ এই কৌল আগমদ্বয়ের শিক্ষা শ্রুতিবিরোধী নয়, সুতরাং এ দুখানি

সদাগম।[১২২] তাঁর পক্ষে আরও বলবার ছিল যে তিনি এ দুটি ছাড়া অন্য তন্ত্রগ্রন্থের বচনও যথেষ্ট উদ্ধৃত করেছেন। যাই হোক এই তর্ক মহানির্বাণতন্ত্রের অর্বাচীনত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়।

পুরাণ ও তন্ত্রের শাস্ত্রত্ব প্রতিষ্ঠায় একই প্রণালী এবং একই যুক্তি অনুসরণ করলেও রামমোহন এই দুই শাস্ত্রকে ঠিক এক দৃষ্টিতে দেখেন নি। তাঁর বিচার গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'দর্শন' ও 'আচার' এই দুই ক্ষেত্রেই তন্ত্রের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব অধিক। তাঁর চিন্তা ও কর্মে পুরাণের কোনও স্বতন্ত্র প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় না ; কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই তন্ত্রের প্রভাব তাঁর উপর গভীর। পুরাণের মত তন্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক অংশকেই তিনি প্রধানত মান্য করতেন। বিভিন্ন হিন্দুসম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রতীকোপাসনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তান্ত্রিক মন্ত্র ও ক্রিয়ানুষ্ঠানকে স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করা একেশ্বরবাদী রামমোহনের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তবে ব্রহ্মজ্ঞানবাচক অংশের সঙ্গে একবাক্যতা স্থাপনের দ্বারা দুর্বল অধিকারীর জন্য প্রদত্ত বিধান হিসাবে এগুলির ব্যাখ্যা করে তিনি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন। তন্ত্রোক্ত মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি তথাকথিত কার্যে সিদ্ধিপ্রদ ষট্‌কর্মেও তাঁর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না।[১২৩] তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি রামমোহন আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রথমত এই কারণে যে তার মধ্যে তিনি তাঁর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। একথা খুব দৃঢ়ভাবেই তিনি একাধিক স্থানে বলেছেন, যেমন : "শিষ্টপরিগৃহীত প্রসিদ্ধাগমোক্তাত্মতত্ত্বশ্রবণমননাদেনিঃশ্রেয়সাবাপ্তিরৈকান্তিকীতি পরমারাধ্যস্য মহেশ্বরস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপি সফলাসীৎ। আত্মানাত্মনোঃ সত্যানৃতত্বে প্রদর্শয়ন্তো লোকানাত্মশ্রবণমননিদিধ্যাসনেষু প্রবর্ত্তয়ন্তো বেদান্তগ্রথিতশব্দা যথা নিঃশ্রেয়সহেতবো ভবন্তি তথৈব তমেবার্থং প্রবদতাং স্মৃত্যাগমপ্রভৃতীনাং তত্তচ্ছ্রোতৃভ্যো নিঃশ্রেয়সপ্রদাতৃত্বং যুক্তম্‌....।"[১২৪] বস্তুত তত্ত্বগত ভাবে তন্ত্র সম্পূর্ণ অদ্বৈতমতাবলম্বী। এ বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তারপর আর কিছু বলা বাহুল্য।[১২৫] তা ছাড়া আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছি অদ্বৈতবেদান্তের মায়াতত্ত্ব সম্পর্কে রামমোহনের চিন্তা যে বহুলাংশে তন্ত্রের মায়াশক্তিতত্ত্বের দ্বারা পরিমার্জিত ছিল এমন মনে করারও যথেষ্ট কারণ আছে।[১২৫ক] এই দিক দিয়ে দেখলে রামমোহনের বেদান্তকে স্বচ্ছন্দে তান্ত্রিক বেদান্ত আখ্যা দেওয়া যেতে

পারে। বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্বের সমর্থন ও মায়াতত্ত্বের পরিমার্জন ছাড়া অন্য যে তত্ত্বের জন্য তিনি তন্ত্রের নিকট বিশেষভাবে ঋণী তা হল ব্রহ্মোপাসনা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বেদান্ত সম্পর্কিত আলোচনা সূত্রে আমরা দেখেছি অদ্বৈতবাদের সঙ্গে উপাসনাতত্ত্বের সংমিশ্রণ বৈদান্তিকরূপে রামমোহনের বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে শ্রীধর, বিদ্যারণ্য মধুসূদন সরস্বতী, (এবং সম্ভবত চৈতন্যদেবের গুরুপরম্পরার অন্তর্গত মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী ও কেশব ভারতী) প্রভৃতি তাঁর কয়েকজন বৈদান্তিক পূর্বসূরী থাকলেও এ কথা জোর করেই বলা যায় মুখ্যত তন্ত্রের উপাসনাতত্ত্বের প্রভাবেই রামমোহনের চিন্তা এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছিল। 'ব্রহ্মোপাসনা' শীর্ষক পুস্তিকাতে তিনি 'মহানির্বাণতন্ত্র' থেকে যে ব্রহ্মস্তোত্রটি তাঁর উপাসনাপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, সেটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়।[১২৬] তা ছাড়া 'গায়ত্রীর অর্থ,' 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্' ও 'অনুষ্ঠান' পুস্তিকাত্রয়ে ব্রহ্মোপাসনা প্রসঙ্গে তিনি বেদবেদান্তের সঙ্গে একাধিকবার তন্ত্রশাস্ত্রের প্রমাণ দিয়েছেন।[১২৭] তাঁর উপাসনাপদ্ধতিতে রামমোহন বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রকে অতি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন ও বিভিন্ন গ্রন্থে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে এর দ্বারা ব্যক্তিগত উপাসনা করবার নির্দেশ দিয়েছেন।[১২৮] এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, তন্ত্রশাস্ত্রে গায়ত্রীর স্থান অতিশয় উচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ। শ্রুতিসম্মত হিন্দুধর্মীয় পূজাদিতে যেমন উত্তরকালে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দেখা যায়, তেমনি তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মেও কালক্রমে কিছু কিছু বেদমন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে।[১২৯] এই জাতীয় বেদমন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী তন্ত্রশাস্ত্রে এত প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল যে শেষপর্যন্ত নানা তন্ত্রোক্ত বহু দেবতার নামের সঙ্গে এই মন্ত্র যুক্ত হয়ে তা নানা সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁর 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে এই শ্রেণীর বিভিন্ন দেবতার নাম-সংযুক্ত গায়ত্রীমন্ত্রের এক তালিকা দিয়েছেন।[১৩০] গায়ত্রীমন্ত্রের মাহাত্ম্য সূচক 'গায়ত্রীতন্ত্র' শীর্ষক একখানি স্বতন্ত্র তন্ত্রগ্রন্থও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্র গায়ত্রীকে 'ব্রহ্মমন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন এবং উক্ত গ্রন্থে এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করবার বিধান দেওয়া হয়েছে। রামমোহন তাঁর 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্' গ্রন্থে নানা শ্রুতিস্মৃতি আলোচনার পর এই মহানির্বাণতন্ত্রের মত উদ্ধার করেই গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দিয়েছেন।[১৩১] সুতরাং একথা না মেনে উপায় নেই, তন্ত্রশাস্ত্রালোচনার ফলে এই বেদমন্ত্রটির প্রতি রামমোহনের

আস্থা ও শ্রদ্ধা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই, যে ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব তিনি তন্ত্রের ভাবধারা অনুশীলনের ফলে লাভ করেছিলেন, গায়ত্রীকে তার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গের উপসংহারে স্মরণীয়, সামাজিক উপাসনার ক্ষেত্রে উপাস্যের ঐশ্বর্য বর্ণনা রামমোহনের উপাসনা-প্রণালীর অংশ বিশেষ : ..."অগ্নি বায়ু সূর্য ইঁহাদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি যব ঔষধি ও ফলমূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তিদ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন।"[১০২] 'ব্রহ্মোপাসনা' পুস্তিকাতে সন্নিবিষ্ট মহানির্বাণ-তন্ত্রোক্ত 'নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়', বিতরণার্থ 'ক্ষুদ্রপত্রী'তে মুদ্রিত 'বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণম্" এবং 'শাশ্বতমভয়মশোকম্' প্রভৃতি এই প্রণালীর উদাহরণ। স্বকীয় উপাসনাপ্রণালীর এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তিনি উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত 'স্বরূপ-আরাধনা' পদ্ধতির প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁকে "আরাধনা" শব্দটিও ব্যবহার করতে দেখা যায়।[১০৩] সামাজিক উপাসনাকে রামমোহন এই ভাবে জ্ঞানাশ্রিত ভক্তির ভিত্তিতে স্থাপন করবার প্রয়াসী ছিলেন। এই ভক্তিতত্ত্ব রামমোহন আহরণ করেছিলেন তন্ত্রশাস্ত্র থেকে, বৈষ্ণবশাস্ত্র থেকে নয়। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। বৈষ্ণব ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রই ভক্তিবাদ এবং সাকার উপাসনাকে অবলম্বন করেছে; কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল। সিদ্ধান্তে তন্ত্র সর্বদা নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী, অপরপক্ষে বৈষ্ণব শাস্ত্রের কোনও প্রচলিত শাখাই নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করে নি। সাকার বা সরূপ উপাসনাকে অবলম্বন করে উভয়ত্র ভক্তিবৃত্তি অভিব্যক্ত হলেও তন্ত্র দেবদেবীর এই সাকার রূপসমূহকে দুর্বল অধিকারীদের জন্য বিহিত ও কল্পনা-ভিত্তিক বলে স্বীকার করে; বৈষ্ণবশাস্ত্র বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র সাকার বিগ্রহ এবং দেবতার নরলীলার প্রতিটি অনুপুঙ্খকে নিত্য ও বাস্তব গণ্য করে, এগুলিকে কদাচ রূপক বা কল্পনাশ্রিত বলে না। অদ্বৈতবাদী ও একেশ্বর-বাদী রামমোহনের নিকট তাই স্বভাবত তান্ত্রিক উপাসনাতত্ত্ব বৈষ্ণব উপাসনাতত্ত্ব অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। এই উপলক্ষে একাধিক স্থলে তাঁকে দুটি বচন আত্মপক্ষ সমর্থনে উদ্ধার করতে দেখা যায়। একটি হল :

চিন্ময়াস্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

এটি তিনি রঘুনন্দন উদ্ধৃত যমদগ্নির উক্তিরূপে উল্লেখ করলেও কুলার্ণবতন্ত্রেও শ্লোকটি আছে।[১৩৪] দ্বিতীয়টি মহানির্বাণতন্ত্র বচন :

এবং গুণানুসারেণ রূপানি বিবিধানি চ
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্।[১৩৫]

বৈষ্ণব সাকারবাদ ও তদ্‌ভিত্তিক ভক্তি তত্ত্বের এই রূপক ও কল্পনাকে আশ্রয় করে নি।

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক হওয়া সত্ত্বেও যে সন্ন্যাসবিরোধী মনোভাব রামমোহনের বৈশিষ্ট্য ছিল তাও অনেকাংশে তান্ত্রিক প্রভাবজাত এমন মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সংসারকে তার সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ, বাধা, প্রলোভন, সমেত সর্বতোভাবে স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে যাওয়াই তান্ত্রিক সাধানার লক্ষ্য। কুলার্ণবতন্ত্রে এই আদর্শ অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত :

ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ পাতকং সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্মে কুলেশ্বরি ॥

মৃত্যুর্বৈদ্যায়তে দেবি সাক্ষাৎ স্বর্গায়তে গৃহম্।
স্বর্গঃ সাক্ষাৎ গৃহায়তে কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥[১৩৬]

মহানির্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণগুলির বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে গার্হস্থ্যধর্মকে "সকল মানবের আদি এবং ধর্মজনক" বলা হয়েছে।[১৩৭] ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনই ছিল রামমোহনের আদর্শ। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' শীর্ষক একখানি পুস্তিকাও তিনি প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকায় অবশ্য তন্ত্রগ্রন্থ থেকে কোন উদ্ধৃতি নেই, বৈদিক সাহিত্য ও মনুস্মৃতির উপরই শাস্ত্রসমর্থনের জন্য নির্ভর করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ কথা সাধারণ ভাবে ধরে নেওয়ার পক্ষে যুক্তি আছে যে রামমোহন তাঁর বলিষ্ঠ জীবন-স্বীকৃতির অনুপ্রেরণা অনেক পরিমাণে তন্ত্রদর্শন থেকে পেয়েছিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতি তাঁর আকর্ষণের মূলসূত্র এখানেই খুঁজতে হবে।

ধর্মসাধনা ও ঈশ্বরোপাসনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বজনীন উদার দৃষ্টির জন্যও যে রামমোহন কতকাংশে তান্ত্রিক ভাবধারার নিকট ঋণী একথাও অস্বীকার করা যায় না। দেশজাতিধর্মনির্বিশেষে ব্রহ্মোপাসকগণের জন্য একটি সর্বজনীন উপাসনালয় স্থাপন করা রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর সময়কার ব্রাহ্ম-সমাজ সেই আদর্শেরই রূপায়ণ। ব্রাহ্মসমাজের ন্যাসপত্রে এই আদর্শের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—এই সমাজগৃহ "to be used, occupied enjoyed, applied and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of peoples without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober, religious and devout manner for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable, and Imumtable being…।" আমরা পূর্বে দেখেছি রামমোহন কর্তৃক আলোচিত শাস্ত্রাদির মধ্যে এক তন্ত্রেই ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকল বর্ণ, নারী এমন কি যবন পর্যন্ত সকলেরই পূর্ণ আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বৈদিক ও বৈদান্তিক ঐতিহ্যে এই সমদৃষ্টির একান্ত অভাব। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রামমোহনের চিত্তে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রভাবের কথা মনে রেখেও তন্ত্রমতের প্রভাব সম্পর্কে আমরা সম্ভবত নিঃসন্দেহ হতে পারি। এটুকুও বর্তমান প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখযোগ্য যে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সঙ্গে সুপরিচিত হবার পূর্বেই ভারতীয় চিন্তাধারায় নিষ্ণাত রামমোহনের মনের জমিটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই সূত্রে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের "ব্রাহ্ম" বিশেষণটির উৎপত্তি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। আদি নামটি যে ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও 'ব্রহ্মসভা' নামক এর একটি বিকল্পও প্রচলিত ছিল।[১৩৮] ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা (১৮২৮)-র পূর্বে উপাসকমণ্ডলীবিশেষের বাচ্যার্থে 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রাহ্ম' শব্দের দুটি প্রয়োগের কথা আমাদের জানা আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ মরমী সাধক দাদূ হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সমকালীন সকল ধর্মসম্প্রদায়কে একত্র মিলাবার জন্য যে উদার সাধকগোষ্ঠীর পত্তন করেন তার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' বা 'পরব্রহ্মসম্প্রদায়'।[৩৯] রামমোহন দাদূপন্থিগণ সমেত মধ্যযুগের ভক্তিবাদী সন্ত-সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং এঁদের আধ্যাত্মিক পূর্বসূরী গণ্য করতেন।[১৪০] নিজস্ব মণ্ডলীর নামকরণের বেলায় এই অভিধাটি

তাঁর স্মরণে আসা বিচিত্র নয়। কিন্তু খাস 'ব্রাহ্ম' শব্দটিকেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায় মহানির্বাণতন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে তত্ত্বচক্রের বর্ণনায় ঐ চক্রের অধিকারিগণের প্রসঙ্গে :

পরব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মতৎপরাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শান্তাঃ সর্বপ্রাণিহিতে রতাঃ ॥
নির্বিকারা নির্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যসংকল্পকা ব্রাহ্ম্যাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ ॥[১৪১]

এই 'ব্রাহ্ম' বা 'ব্রাহ্ম্য' শব্দটি যে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার অন্তত দশ বৎসর পূর্ব হতে রামমোহনের মণ্ডলী সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়ে আসছিল তার প্রমাণ আছে। ১১ এপ্রিল, ১৮১৯ তারিখের 'ক্যালকাটা জার্নাল'এ রামমোহনের তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনাপূর্ণ একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। সেই পত্রে তিনি রামমোহনের মণ্ডলীকে Brahmyu or Unitarian Hindu community বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪২] এরও দুই বৎসর পূর্বে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মোপাসক অর্থে রামমোহন স্বয়ং শব্দটি ব্যবহার করেছেন মাণ্ডূক্যোপনিষদের ভূমিকায়। অন্যত্রও তিনি এবং তাঁর প্রতিপক্ষ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনপন্থী ব্রহ্মোপাসকগণকে ঐ নামে চিহ্নিত করেছেন।[১৪৩] স্বয়ং হরিহরানন্দ ও রামমোহনের উক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, প্রধানত মহানির্বাণবর্ণিত তত্ত্বচক্রের 'অধিকারি'গণের নামবিশেষের অনুকরণে রামমোহন-গোষ্ঠী ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই 'ব্রাহ্ম' বা 'ব্রাহ্ম্য' নামে সুপরিচিত ছিলেন। 'ব্রাহ্মসমাজ' সেই অভিধারই স্মৃতি বহন করছে। বর্তমান প্রসঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখা উচিত, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নারীজাতিকে পুরুষের সমতুল্য আধ্যাত্মিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার মত অনুপ্রেরণা রামমোহন বহুলাংশে তন্ত্রশাস্ত্র থেকে পেয়েছিলেন। রামমোহনের পৌত্রী (রাধাপ্রসাদ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা) চন্দ্রজ্যোতি দেবী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সাক্ষ্য দিয়েছেন : "রাজা ভেঙে দিয়ে গেলেন কুলগুরু প্রথা, শিখিয়ে গেলেন নিজের ঘরের মেয়েদের ব্রহ্মমন্ত্রে উপাসনা, গায়ত্রী জপ। তাঁর ছোট পুত্রবধূ রমাপ্রসাদের পত্নী দ্রবময়ী দেবীকে ভোর রাত্রি থেকে মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত

ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য শ্লোকগুলি আওড়াতে ইদানীং আমরা নিজের কানে শুনেছি। গায়ত্রী জপও করতেন দ্রবময়ী দেবী রীতিমত। যে গায়ত্রী মেয়েদের কানে শোনাও ছিল নিষিদ্ধ, রাজা এনে দিলেন তাকে ঘরের মেয়েদের আয়ত্তের মধ্যে; ধর্মসংস্কারে মেয়েদের বড অধিকার পাওয়ার পথ খুললো প্রথম।"[১৪৪]

সামাজিক ও ব্যক্তিগত মতামত ও আচরণেও রামমোহন যে তন্ত্রের মত ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন প্রমাণও উদ্ধার করা যায়। মহানির্বাণতন্ত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সতীদাহ নিষেধ করা হয়েছে (ভর্ত্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্)।[১৪৫] সতীদাহ আন্দোলনের নায়ক রামমোহনকে যে এই জাতীয় শাস্ত্রবচন যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে থাকবে তা সহজেই ধরে নেওয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন রামমোহন করেছেন অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় সহমরণ বিষয়ক তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে।[১৪৬] এই প্রসঙ্গে আমরা মনে রাখতে পারি মহানির্বাণতন্ত্রের উক্তি "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীযাতিযত্নতঃ।"[১৪৭] দু'খানি বিচারগ্রন্থে রামমোহন মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত শৈববিবাহের আদর্শকে সমর্থন করেছেন। এই বিবাহে জাতিবর্ণধর্মগত কোনও বাধা নেই, কেবলমাত্র পত্নী সপিণ্ডা বা সধবা না হলেই যথেষ্ট।[১৪৮] সর্বশেষে এ কথা বলা যেতে পারে মাংসাহার ও পরিমিত সুরাপান সম্পর্কে রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রের নির্দেশকেই প্রামাণিক মনে করতেন এবং এর সমর্থনে বিস্তারিতভাবে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন।[১৪৯]

রামমোহন চিন্তায় ও কর্মে যে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রমত কর্তৃক বিশেষরূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা দেখা গেল। একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায়। তন্ত্রমতের বৈশিষ্ট্য তার নিজস্ব সাধনপদ্ধতি। রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে কি তান্ত্রিক সাধনাও করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মত উপাদান আমাদের হাতে নেই; রামমোহনের একটি গভীর সাধকজীবন ছিল এমন ইঙ্গিত তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেকে দিয়েছেন। এই সাধনার প্রকৃতি ও পদ্ধতি কি ছিল তা জানবার উপায় নেই। রামমোহনের জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন, রামমোহন তরুণ বয়সে (সম্ভবত তাঁর ধর্মমত পরিবর্তিত হবার পূর্বে) বহু অর্থ ব্যয় করে বাইশবার পুরশ্চরণ করেছিলেন।[১৫০] পুরশ্চরণ তান্ত্রিক উপাসনার একটি বিশেষ অঙ্গ; তন্ত্রমতানুযায়ী এই ক্রিয়ার দ্বারা মন্ত্রশক্তি বর্ধিত ও মন্ত্র ফলপ্রসূ হয়।[১৫১] কৌলতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই

মর্মে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত যে রামমোহন তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এর দু'একটি নিদর্শন উল্লেখ করা যাচ্ছে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে চুঁচুড়ার অন্তর্গত কঁ্যাকৃশিয়ালি গ্রামবাসী মদন কামার নামক এক তান্ত্রিকের উল্লেখ করেছেন : "তাঁহার গৃহপ্রাচীরে রাজা রামমোহন রায়ের একখানি প্রতিমূর্তি লম্বমান থাকিত। মদন প্রত্যহ প্রাতঃকালে রুদ্রাক্ষের মালা হস্তে করিয়া রাজার প্রতিমূর্তিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিত। মদনের প্রতিবাসী প্রবন্ধ লেখকের জনৈক বন্ধু, তাঁহাকে এইরূপ প্রণামের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল যে, রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।"[১৫২] ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মথুরাভ্রমণ কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে এক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ জানতে পারেন তিনি শবসাধক তান্ত্রিক। মহর্ষি লক্ষ্য করেছিলেন, এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর পুস্তকাদি সমস্তই রামমোহন রায়ের গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ।[১৫৩] পরে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৭ সালে দিল্লী ভ্রমণ কালের একটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন : "এখানে সুখানন্দ নাথ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসক হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য।...সুখানন্দ স্বামী বলিলেন যে আমিও রামমোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য; রামমোহন রায় আমার মত তান্ত্রিক ব্রাহ্মাবধূত ছিলেন।"[১৫৪] এই সমস্ত সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধক ও সিদ্ধপুরুষ রূপে রামমোহনের একটি পরিচয় ছিল। এই প্রসিদ্ধির মূলে কোনও সত্য আছে কিনা তা নিশ্চিত বলবার উপায় নেই।

শাস্ত্রালোচনার ফলে নিজস্ব মূল বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদকে নমনীয় করে জ্ঞানভক্তির সমন্বয় সাধন করবার মত দুটি মার্গ রামমোহনের নিকট উন্মুক্ত হয়েছিল—পৌরাণিক বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও তান্ত্রিক উপাসনাতত্ত্ব। এর মধ্যে তিনি দ্বিতীয়টিকেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। কি পরিবেশে এবং কোন যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন তা আমরা আলোচনা করেছি। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে এ ঐতিহ্য কতটা রক্ষিত হয়েছে? এর উত্তরে বলতে হয়, প্রায় কিছুই হয় নি। ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী নায়ক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন কর্তৃক আহরিত এবং "ব্রহ্মোপাসনা" পুস্তিকায় সন্নিবেশিত মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তোত্রটি ("নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়")

কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে তাঁর ব্রাহ্মধর্ম নামক সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।[১৫৫] স্তোত্রটির পরিমার্জিত সংস্করণে ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথ এর নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদমূলক বর্ণনাত্মক বিশেষণগুলি বর্জন করেছিলেন। তন্ত্রের গুরুবাদ, সাকারোপাসনা প্রভৃতি আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মগণের নিকট অপকৃষ্ট মনে হলেও তন্ত্র যে মূলত ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক উচ্চ শ্রেণীর ধর্মশাস্ত্র সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন।[১৫৬] শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ১৮৪৪-৪৫ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মসমাজে মহানির্বাণতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী দীক্ষাদানের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। ১৮৫০ এর পর তা বর্জিত হয়।[১৫৭] কিন্তু ক্রমশ তন্ত্রের প্রতি এই অবশিষ্ট শ্রদ্ধাটুকুও ব্রাহ্মসমাজে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং ব্রাহ্মসমাজ নিজ সমন্বয়াদর্শ থেকে তান্ত্রিক ব্রহ্মবাদ ও উপাসনাতত্ত্বকে প্রায় নির্বাসিত করে দেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রচারক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রবীণ শাস্ত্রবিদ্ গৌরগোবিন্দ রায় কৃত "গায়ত্রী ষট্চক্রের ব্যাখ্যান ও সাধন" ও "শ্রৌতাচারের পুনরাবৃত্তি" নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধ দুটি ছাড়া দেবেন্দ্রনাথোত্তর যুগের ব্রাহ্মসমাজের নায়কবৃন্দের তন্ত্র-সম্পর্কিত অন্য কোনও আলোচনা বর্তমান লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়নি।[১৫৮] কেশবচন্দ্রের যুগ থেকে মুখ্যত খ্রীষ্টীয় ও বৈষ্ণব ভাবভক্তির ঘরে ব্রাহ্মসমাজের যাওয়া আসা।

তন্ত্রশাস্ত্রে রামমোহনের গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা পূর্বে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ যে করেনি তা নয়। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সার জন উড্রফ্, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রামমোহনের প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[১৫৯] এঁদের আলোচনার প্রধান ত্রুটি সেগুলির একদেশদর্শিতা। তাঁরা তিনজনেই বলেছেন রামমোহন সম্পূর্ণ তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তিতেই ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন এবং সে মতবাদও তিনি পেয়েছিলেন একমাত্র মহানির্বাণতন্ত্রের কয়েকটি সর্গ থেকে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা অন্য কোনও তন্ত্রগ্রন্থের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। এই সিদ্ধান্ত একটি দুর্বল অতিশয়োক্তি মাত্র। রামমোহনের চিন্তাধারার গঠন ও পরিণতির উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব যেমন উপেক্ষণীয় নয় তেমনি তাকে অতিরঞ্জিত করবারও কোনও সার্থকতা নেই। তন্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে মহানির্বাণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করলেও দেখা যাবে রামমোহন সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন কুলার্ণবের

সাক্ষ্য। তা ছাড়া কৌল শাস্ত্রে তাঁর অধ্যয়ন ছিল সুবিস্তীর্ণ, কেবলমাত্র কুলার্ণব-মহানির্বাণ-ভিত্তিক নয়। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে তিনি বেদ-বেদান্তকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন এবং পুরাণ-তন্ত্রাদির প্রামাণ্য স্বীকার করলেও সেগুলিকে বেদ-উপনিষদ অপেক্ষা নিম্নস্তরের স্থান করেছেন। শ্রুতির সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে পুরাণ-তন্ত্রের একবাক্যতা স্থাপনের প্রয়াস থেকেই তা প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনায় প্রথম থেকেই শ্রুতির অর্থাৎ বেদ-উপনিষদের প্রাধান্য ছিল, তন্ত্রশাস্ত্রের কোনও স্থান তার মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। যে তন্ত্রবচন রামমোহন তাঁর 'ব্রহ্মোপাসনা' পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন তা সম্ভবত তাঁর সময়ে ব্যক্তিগত উপাসনাতেই ব্যবহৃত হত, সামাজিক উপাসনাতে নয়। রামমোহন ছিলেন আদৌ বৈদান্তিক, তন্ত্রশাস্ত্রদ্বারা তাঁর দার্শনিক এবং সামাজিক চিন্তা ও কর্ম প্রভাবিত হলেও, তন্ত্র তাঁর নিকট বেদান্তের পরিপূরক ছিল, যেমন পরিপূরক ছিল পুরাণ; যদিও পুরাণের ব্রহ্মবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক অংশগুলি তাঁর জীবনদর্শনে তন্ত্রের মত কোনও অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করে নি। উক্ত লেখকত্রয়ের মত অনেকটা কিংবদন্তী-নির্ভর এবং সেই কারণে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় সভ্যতার গতিশীল চরিত্রটি রামমোহন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বেদ-উপনিষদকে আশ্রয় করেও নিজেকে তার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। গভীর মনীষা শ্রদ্ধা ও বিচারবুদ্ধি সহকারে পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের পরবর্তী অধ্যায়গুলিরও অনুশীলন করেছিলেন। তাঁর বিচারশীলতা এক্ষেত্রে তাঁকে অন্ধ আনুগত্য থেকে রক্ষা করেছে; এবং পুরাণ-তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ অংশকে অবজ্ঞা করবার বিপদ থেকে মুক্ত করেছে। এই ভাবেই প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত শাস্ত্রধারার নানা বৈপরীত্য ও বিরোধের মধ্যেও একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ভূমি খুঁজে পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

প্রমাণপঞ্জী :

১. শিখধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের এই বিষয়ে পারস্পরিক সাদৃশ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে সম্ভবত সার্থকতম। জনৈক বিখ্যাত আধুনিক ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের এই দুই সমন্বয়মূলক ধর্মাদর্শের স্বভাব-বৈপরীত্যের উপর অতিমাত্রায় জোর দিয়েছেন (দ্রষ্টব্য Arnold J. Toynbee *A Study of History* Vol. V p. 106)। যদি তর্কের খাতিরে তাঁর মত স্বীকার করেও নেওয়া যায়, তাহলেও এ কথা সত্যই থাকে যে এই পরস্পর "সম্পূর্ণ বিপরীত" দুটি ধর্মের ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র ভাবে উভয়ের আদি ও উত্তরকাণ্ডের প্রভেদ সমানভাবে স্পষ্ট।

২. উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', কলিকাতা ১৩৫৫, পৃ: ৪৬

৩. দ্রষ্টব্য, শাংকর ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ২, ২, ৩৭: 'সা চেয়ং বেদবাহ্যেশ্বরকল্পনানে-কপ্রকারা।...মাহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে-কার্যকারণযোগবিধিদুঃখান্তাঃ পঞ্চপদার্থাঃ পশুপতিনেশ্বরেণ পশুপাশবিমোক্ষায়োপদিষ্টাঃ। পশুপতিরীশ্বরো নিমিত্তকারণমিতি বর্ণয়ন্তি'।

৪. দ্রষ্টব্য, শ্রীভাষ্য, ২, ২, ৩৫: '...ইদানীং পশুপতিমতস্য বেদবিরোধাদসামঞ্জস্যাচ্চ অনাদরণীয়তোচ্যতে। তন্মতানুসারিণশ্চতুর্বিধাঃ কাপালিকাঃ, কালমুখাঃ, পাশুপতাঃ শৈবাশ্চ-ইতি। সর্বে চৈতে বেদবিরুদ্ধাং তত্ত্বপ্রক্রিয়াম্ ঐহিকামুষ্মিকনিঃশ্রেয়সসাধনকল্পনাঞ্চ কল্পয়ন্তি'।

৫. শংকরবিজয় (জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৬৮) পৃ: ১৪০

৬. স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্যখণ্ড, রেবাখণ্ড, অধ্যায় ২৩৩-৩৬ (আবন্ত্যখণ্ড, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ: ৩৬৬০-৬৭)

৭, ব্রহ্মপুরাণ, ২৮ ৯ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ: ১৩২)

৮. Winternitz, *A History of Indian Literature* Vol. III, Part II (English Translation by Subhadra Jha, 1967) p. 445,

৯. কৃষ্ণচরিত্র—দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।

১০. *The Vishnu Purana* English Translation, by H. H. Wilson (Reprint, Calcutta, 1961) Preface, p. vii.

১১. অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিষ্ণু, বায়ু, মার্কণ্ডেয় নারদীয়, কূর্ম ও ভাগবত পুরাণগুলির দার্শনিক অংশসমূহের স্বতন্ত্র আলোচনা করে পুরাণ-সাহিত্যকে এ বিষয়ে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করেছেন; দ্রষ্টব্য *A History of Indian Philosophy* Vol III (Cambridge 1940) Chapter xxiii, pp. 496-511; Vol. IV (Cambridge, 1955) Chapter xxiv, pp. 1-50.

১২. এ বিষয়ে বাঙলা ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত পঞ্চোপাসনা (কলিকাতা, ১৩৬০)।

১৩. পুরাণ-সাহিত্যের সাম্প্রদায়িক চরিত্র সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Winternitz *A History of Indian Literature* (English Translation) Vol. I Calcutta, 1927 pp. 517-86; Farquhar *An Outline of the Religious Literature of India* London 1920,

pp. 137-40, 179; উপপুরাণগুলি সম্পর্কে এ পর্যন্ত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রকাশন ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা প্রণীত *Studies in the Upapuranas* Vol I (Calcutta 1958), Vol II (Calcutta 1963)। এর প্রথম খণ্ডে সৌর ও বৈষ্ণব উপপুরাণ ও দ্বিতীয়টিতে শাক্ত ও অন্যান্য উপপুরাণ সম্পর্কে অতি গভীর ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৪. ব্রহ্মসূত্র ১. ২. ৬.; ১, ২. ১৯; ১. ২. ২৫; ১. ৩. ২৩; ১. ৩. ২৮; ১. ৩. ৩৮; ২. ১. ১; ২. ৩. ৪৫; ২. ৩. ৪৭; ৩. ১. ১৪; ৩. ১, ১৯; ৩. ২. ১৭; ৩. ২. ২৪; ৩. ৩. ৩২; ৩. ৪. ৩০; ৩. ৪. ৩৭; ৩. ৪. ৩৮; ৩. ৪. ৪১; ৩. ৪. ৪২; ৩. ৪. ৪৩; ৪. ১. ১০; ৪. ১. ১৬; ৪. ২. ১৪; ৪. ২. ২১; ৪. ৩. ১১; ৪. ৪. ২০ (সূত্রসংখ্যা শাংকর ভাষ্য অনুসারে উল্লিখিত)।

১৫. ব্রহ্মসূত্র ৩. ১. ১৫: 'অপি চ সপ্ত' এর ভাষ্য প্রসঙ্গে শংকর বলছেন: 'অপি চ সপ্ত নরকা রৌরবপ্রমুখা দুষ্কৃতফলোপভোগভূমিত্বেন স্মর্যন্তে পৌরাণিকৈঃ, তাননিষ্টাদিকারিণঃ প্রাপ্নুবন্তি কুতস্তে চন্দ্রং প্রাপ্নুয়ুরিত্যভিপ্রায়ঃ।' রামমোহন তাঁর ব্যাখ্যায় শংকরকে অনুসরণ করেছেন: 'পাপীদিগের নিমিত্তে পুরাণেতে সকল নরককে সপ্তবিধ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন…।' (বেদান্তগ্রন্থ: গ্রন্থাবলী ১, পৃঃ ৬৭)।

১৬. ব্রহ্মসূত্র, শাংকরভাষ্য, ১. ৩. ৩৩: 'ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্মন্ত্রার্থমূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্রহাদি প্রপঞ্চয়িতুম্। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি হ্যস্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম্। তথা চ ব্যাসাদয়ো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্যতে। …তস্মাদ্ধর্মোৎকর্ষবশাচ্চিরন্তনা দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজহ্রুরিতি শ্লিষ্যতে। …ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেনোপমাতুং যুক্তম্। তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণম্। লোকপ্রসিদ্ধিরপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্বনাধ্যবসাতুং যুক্তা'।

১৭. ব্রহ্মসূত্র, শ্রীভাষ্য, ২. ১. ৩: '…বক্তুর্হিরণ্যগর্ভস্যাপি ক্ষেত্রভূতস্য কদাচিৎ রজস্তমোহভিভবসম্ভবাচ্চ যোগস্মৃতিরপি তৎপ্রণীতরজস্তমোমূলপুরাণবৎ ভ্রান্তিমূলা ইতি ন তয়া বেদান্তোপবৃংহণং ন্যায্যমিতি'। প্রশ্ন উঠতে পারে, বিষ্ণুভক্ত রামানুজ নিজভাষ্যে একাধিকবার বিষ্ণুপুরাণের বচন ব্যবহার করেও এবং বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য স্বীকার করেও (দ্রষ্টব্য-শ্রীভাষ্য, ২.২. ৪১-৪২) কেন সাধারণভাবে পুরাণকে রজঃ ও তমোগুণসমন্বিত ভ্রান্তিমূল শাস্ত্র গণ্য করলেন? এর উত্তর সম্ভবত এই যে, রামানুজ তাঁর সাম্প্রদায়িক বিষ্ণুভক্তিকে বেদভিত্তিক সনাতন ব্রাহ্মণ্য আচারের সীমানার মধ্যেই রাখতে প্রয়াসী ছিলেন: সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রকেই শ্রুতির সমপর্যায়ভুক্ত জ্ঞান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ তাঁর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি তাঁকে বিষ্ণুপুরাণ ও পাঞ্চরাত্রের পক্ষপাতী করেছিল—এটুকু দুর্বলতা ও স্ববিরোধ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

১৮. 'ঋগাদয়শ্চত্বারঃ পঞ্চরাত্রঞ্চ ভারতম্
মূলরামায়ণং ব্রহ্মসূত্রং মানং স্বতঃ স্মৃতম্।

বৈষ্ণবানি পুরাণানি পঞ্চরাত্রাত্মকত্বতঃ
প্রমাণান্যেব মন্বাদ্যাঃ স্মৃতয়োঽপ্যনুকূলতঃ।

মধ্বকৃত 'মহাভারততাৎপর্যনির্ণয়ঃ' ১. ৩০. ৩২ (নির্ণয়সাগর প্রেস সং, বোম্বাই ১৮৯২, পৃঃ ২)

১৯. জীব গোস্বামী 'প্রমাণ' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তদীয় 'ষট্সন্দর্ভ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'তত্ত্বসন্দর্ভ' শীর্ষক প্রথম ভাগে; দ্রষ্টব্য, 'তত্ত্বসন্দর্ভঃ' নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, (কলিকাতা ৪৩৩ চৈতন্যাব্দ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ) পৃঃ ১৪, ২৫, তাঁর রচিত 'তত্ত্ব' 'ভগবত' ও 'পরমাত্ম' সন্দর্ভত্রয়ের ব্যাখ্যাপুস্তক 'সর্বসংবাদিনী'তেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে; দ্রষ্টব্য, 'সর্বসংবাদিনী', রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত (কলিকাতা ১৩২৭) পৃঃ ৫-২২; 'তত্ত্বসন্দর্ভ' গ্রন্থে যা কিছু সংক্ষেপে বলা হয়েছে 'সর্বসংবাদিনী' শীর্ষক ব্যাখ্যায় তা বিস্তারিত ভাবে বোঝানো হয়েছে। এখানে জীব গোস্বামী সর্বসমেত দশটি প্রমাণের আলোচনা করেছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভাবনা, ঐতিহ্য ও চেষ্টা। তাঁর বক্তব্য, এগুলির মধ্যে শব্দ প্রমাণ ছাড়া অপর নয়টি ত্রুটিপূর্ণ ও সেই হেতু অগ্রাহ্য। একমাত্র 'শব্দ'ই প্রমাণ হিসাবে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

২০. তত্ত্বসন্দর্ভঃ ১২ (পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃঃ ৩৬): 'তত্র চ বেদশব্দস্য সম্প্রতি দুষ্পারত্বাদ্দুরধিগমার্থত্বাচ্চ তদর্থনির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পরবিরোধাদ্ বেদরূপো বেদার্থনির্ণায়কশ্চেতিহাসপুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচারণীয়ঃ। তত্র চ যো বা বেদশব্দো নাত্মবিদিতঃ সোঽপি তদ্দৃষ্ট্যানুমেয় এবেতি সম্প্রতি তস্যৈব প্রমোৎপাদকত্বং স্থিতম্। ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি, ন হ্যপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রপুণা পূরণং যুজ্যতে। নন্ন যদি বেদশব্দঃ পুরাণমিতিহাসঞ্চোপাদত্তে তর্হি পুরাণমপ্যন্যদন্বেষণীয়ম্। যদি তু ন, ন তর্হীতিহাসপুরাণয়োরভেদো বেদেন'।

২১. তত্ত্বসন্দর্ভঃ ১৭ (পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃঃ ৬৫); এই শ্রেণীবিভাগের ইঙ্গিত জীব গোস্বামী প্রণীত 'ষট্সন্দর্ভ'এর 'ভগবৎসন্দর্ভ' নামক দ্বিতীয় খণ্ডেও দেখা যায়। এখানে স্কন্দ প্রভৃতি কতগুলি পুরাণকে স্পষ্টত তামসিক ও ভ্রমাত্মক বলা হয়েছে—'যদত্র স্কান্দাদৌ কচিদ্ভ্রামকমস্তি, তত্তু তত্তৎপুরাণানাং তামসকল্পকথামযত্বাত্তত্তৎকল্পেষু চ ভগবতা স্বমহিমাবরণাদ্ যুক্তমেব তাদৃক্তি'।—ভগবৎসন্দর্ভঃ ৩১ (সত্যানন্দ গোস্বামী সম্পাদিত সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৩৩, পৃঃ ৬৩)।

২২. তত্ত্বসন্দর্ভঃ ১৮, ১৯ (পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃঃ ৬৮, ৭০): '...সাত্ত্বিকমেব পুরাণাদিকং পরমার্থজ্ঞানায় প্রবলমিত্যায়াতম্। তথাপি পরমার্থেঽপি নানাভঙ্গ্যা বিপ্রতিপদ্যমানানাং সমাধানায় কিং স্যাৎ? যদি সর্বস্যাপি বেদস্য পুরাণস্য চার্থনির্ণয়ায় শ্রীভগবতা ব্যাসেন ব্রহ্মসূত্রং কৃতং তদবলোকনেনৈব সর্বোঽর্থো নির্ণেয় ইত্যুচ্যতে, তর্হি নান্যসূত্রকারমুন্যনুগতৈর্মন্যেত। কিঞ্চাত্যন্তগূঢ়ার্থানামল্পাক্ষরাণাং তৎসূত্রাণামন্যার্থত্বং কশ্চিদাচক্ষীত ততঃ কতরদিবাত্র সমাধানম্? তদেব সমাধেয়ম্, যদ্যেকতমমেবপুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং শাস্ত্রং সর্ববেদেতিহাসপুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপং স্যাৎ।

সত্যামুক্তম্, যত এব চ সর্বপ্রমাণানাং চক্রবর্তিভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতং ভবতা। যৎ খলু পুরাণজাতমাবির্ভাব্য ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধিলব্ধমাবির্ভাবিতম্। যস্মিন্নেব সর্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে'। ভাগবতপুরাণই যে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য এ সম্পর্কে জীব উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ভগবান ব্যাসের মনে প্রথমে তা সূক্ষ্মভাবে আবির্ভূত হয়—সংক্ষেপে তিনি একে (ব্রহ্ম)সূত্রাকারে প্রকাশ করেন—পরে বিস্তারিত আকারে একে রূপ দেন, এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থই ভাগবতপুরাণ। সুতরাং এই পুরাণই প্রকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, অন্যান্য অর্বাচীন ভাষ্যকারগণের স্ব-স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা একমাত্র ভাগবতপুরাণের অনুগত হলেই তবে গ্রাহ্য হবে ('পূর্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্যাবির্ভূতং তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃপ্রকটিতং পশ্চাদ্বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতমিতি, তস্মাৎ ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্বাচীন-মন্যদন্যেষাং স্বস্বকপোলকল্পিতং তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে।—তত্ত্বসন্দর্ভঃ ২১, পূর্বোক্ত সংস্করণ পৃঃ ৮০)। ভাগবতপুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন প্রচেষ্টায় জীবের ক্লান্তি ছিল না। 'ভগবৎ-সন্দর্ভ' শীর্ষক খণ্ডেও তিনি স্পষ্ট উক্তি করেছেন, বিশেষরূপে ঈশ্বরাকর্ষকবিভারূপ হওয়ায় এই গ্রন্থ সর্বশাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ('তস্মাদত্রকাণ্ডত্রয়রহস্যস্য প্রব্যক্তপ্রতিপাদনাদের্বিশেষত-ঈশ্বরাকর্ষিবিভারূপত্বাচ্চ ইদমেব সর্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্'।—ভগবৎসন্দর্ভঃ ৯৪, সত্যানন্দ গোস্বামী সম্পাদিত সং, পৃঃ ২১৪)।

২৩. 'বেদান্ত-স্যমন্তক', উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত সংস্করণ, লাহোর ১৯৩০, পৃঃ ৪ 'তদেবং সর্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যে শব্দস্য স্থিতে তত্ত্বনির্ণায়কত্ত্বং শ্রুতিলক্ষণ এব ন ত্বার্ষলক্ষণোঽপি…। ঋষীণাং মিথো বিবাদদর্শনেন তদ্বাক্যানাং তত্ত্বনির্ণায়কত্বাসম্ভবাৎ।'

২৪. 'বেদান্ত-স্যমন্তক', দ্বিতীয় কিরণ, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃঃ ১০-১১

২৫. ব্রহ্মসূত্র, গোবিন্দভাষ্য ১. ৩. ৩৮: শূদ্রাদীনাং বোধস্তু পুরাণাদিশ্রবণজ্ঞানাৎ সম্ভবিষ্যতি। ফলে তু তারতম্যং ভাবি'। এই তারতম্যের স্বরূপ যে কি তার ব্যাখ্যা বলদেব করেছেন ভাষ্যের এই অংশের উপর তাঁর স্বপ্রণীত 'সূক্ষ্মা' টীকাতে: 'তারতম্যমিতি আনন্দোৎ-কর্ষাপকর্ষরূপমিত্যর্থঃ'—অর্থাৎ, মুক্তির আনন্দগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষই এই তারতম্যের স্বরূপ। শ্রুতিশ্রবণ লব্ধ তত্ত্বজ্ঞান যে আনন্দের আস্বাদন এনে দেয়, বলদেবের মতে পুরাণাদি শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত শূদ্রের আনন্দানুভূতি অপেক্ষা তা উচ্চস্তরের বস্তু।

২৬. গোবিন্দভাষ্য, মঙ্গলাচরণ, তৃতীয় শ্লোক: 'বেদান্তার্থমমন্দরেণ মথিতাস্তত্তীর্ণশিরাঃভূয়ৎ যতঃ শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যনির্জরভরঃ সৎসূত্ররত্নোৎকরঃ…' ইত্যাদি; এবং ঐ অংশের 'সূক্ষ্মা' শীর্ষক টীকা: "অথ সর্ববেদেতিহাসাদিমহার্ণবমন্থনোত্থিতমীমাংসাপরনামধেয়ব্রহ্মসূত্রাণি বেদব্যাস-সমাধিলব্ধতদকৃত্রিমভাষ্যভূতসর্ববেদান্তসারশ্রীমদ্ভাগবতানুগ……" ইত্যাদি।

২৭. বীরশৈব আচার্য শ্রীপতি পণ্ডিত কৃত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীকরভাষ্য, ১. ১. ৩: "শাস্ত্রং ঋগ্বেদাদি, তস্য যোনিঃ কারণং শিবঃ 'শিবোমামেবপিতরঃ' ইতি শ্রুতেঃ। অতএব নিগমাগ-মানাং প্রামাণ্যম্। অতো জগজ্জন্মাদিহেতুশ্শিব"। উক্ত 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীপতি বহু যুক্তি দিয়ে 'শিবপুরাণ'-এর সাত্ত্বিকতা এবং বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব পুরাণগুলির তুলনায়

প্রমাণ হিসাবে তার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন—দ্রষ্টব্য শ্রীকরভাষ্য, সি. হয়বদন রাও সম্পাদিত দ্বিতীয় খণ্ড, বাঙালোর, ১৯৩৬, পৃঃ ৩৭-৪৪ ;

২৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য হয়বদন রাও সম্পাদিত শ্রীকরভাষ্য প্রথম খণ্ড, বাঙালোর ১৯৩৬, পৃঃ ৬৭-৭৮। ব্রহ্মসূত্র ১. ১. ২ (জন্মাদ্যস্য যতঃ)-এর উপর ভাষ্য প্রসঙ্গে শ্রীপতি বলেছেন সকল শাস্ত্রই শিবকে পরব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলাতে শিবের জগৎকারণত্ব প্রতিপন্ন হচ্ছে (…"হরিবংশে কৃষ্ণং প্রতি শিববচনাচ্চ জৈমিনিভট্টভাস্করাদি-বৈদিকৈশ্চতুর্বেদতাৎপর্যানুসারেণ শিবস্যৈব পরব্রহ্মত্বব্যবস্থাপনাৎ ভগবতা ব্যাসেনাপি সূতসংহিতায়াং সর্ববেদান্ততাৎপর্যেণ শিবে পরব্রহ্মত্বনির্দেশাচ্চ ব্রহ্মলক্ষণজগৎজন্মাদিকারণত্বং নিষ্প্রত্যূহং")। শৈবাচার্য শ্রীকণ্ঠ তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১. ১. ২) বলেছেন ভব, শর্ব, ঈশান, পশুপতি, রুদ্র প্রভৃতি শিবের সব নামগুলিই পরব্রহ্মবাচক (অষ্টাভিধানাধিকরণমিতি ভবশর্বেশানপশুপতিরুদ্রোগ্রভীমমহাদেবাভিধানাষ্টকস্যাধিকরণং বাচ্যং পরং ব্রহ্ম)। এই শ্রীকণ্ঠই ব্রহ্মসূত্রে ২. ২. ৩৮ ('অন্তবত্ত্বমসর্বজ্ঞতা বা')এর ভাষ্যে শিবপুরাণের অন্তর্গত বায়ু বা বায়বীয় সংহিতার প্রামাণ্যবলে সিদ্ধান্ত করেছেন, ব্রহ্ম একযোগে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ("…ইত্যাদ্যাগমপ্রামাণ্যাচ্চ পরমেশ্বরস্য জগদুভয়কারণত্বমিত্যনবদ্যমিতি)।

২৯. ইতিহাস পর্যায়ের 'মহাভারত', 'হরিবংশ', 'রামায়ণ' 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ', ও 'অধ্যাত্ম-রামায়ণ' গ্রন্থগুলিকে এই তালিকাভুক্ত করেছি ; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'গীতা' মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হলেও এই তালিকায় নেই, কেননা বেদান্তশাস্ত্রের স্মৃতিপ্রস্থান রূপে এর মর্যাদা স্বতন্ত্র : ভারতীয় দৃষ্টিতে এই গ্রন্থকে পুরাণরূপে গণ্য করা হয় না। রামমোহন গীতা, থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং বিচার প্রসঙ্গে নানা ভাবে 'গীতা'র সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে সর্বত্র তিনি মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণগ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র ভাবে 'গীতা'র উল্লেখ করেছেন।

৩০. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার পৃঃ ১৭৯-৮০, ঈশোপনিষৎ-ভূমিকা, পৃঃ ১৯৬ ; মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-ভূমিকা, পৃঃ ২৪৩ ; উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৬, ১৮, ৩৭, ৩৮ (দুইবার) ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৯ (নয় বার), ৫০ (চার বার), ৫১ (তিন বার), ৫২ (দুই বার), ৫৩ (বারো বার), ৫৫, ৫৭ (দুই বার), ৫৮ (তিন বার), ৬০ (দুই বার), ৬১ (চার বার), ৬২ (দুই বার) ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৭০ (দুই বার), ৮০ ; প্রবর্তক-নিবর্তক দ্বিতীয় সংবাদ, পৃঃ ৩৪ (দুইবার) ; সহমরণ বিষয়, পৃঃ ৫২, ৫৯ : পথ্যপ্রদান ভূমিকা পৃঃ ৮৩, ১০৬ (দুই বার), ১১০, ১১৩ (দুই বার), ১১৬, ১২২ (তিন বার), ১২৩-২৪, ১২৫, ১৩১ (চার বার), ১৩২, ১৬০ (ছয় বার), ১৬৩ (তিন বার), ১৭৫ (তিন বার) ১৭৬। (এখান থেকে রামমোহনের বিভিন্ন গ্রন্থের যে উল্লেখ আছে তার সবগুলিই সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ রামমোহন-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত, পৃষ্ঠাঙ্কও সেই সংস্করণের। তাই প্রতিবার স্বতন্ত্রভাবে 'গ্রন্থাবলী'র উল্লেখ করা হয় নি।)

৩১. ঈশোপনিষৎ-ভূমিকা, পৃঃ ১৯৬ ; উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার,

পৃঃ ১৮ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৩ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৮ ; অনুষ্ঠান, পৃঃ ৭২ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৪৯

৩২. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৮ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৭, ৫০ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৯৬, ৯৯ (দুই বার), ১০০, ১০৫ (দুই বার), ১১১, ১৪৬, ১৫৬, ১৬১, ১৬৮, ১৬৯ (চার বার), ১৭২ ; এখানে উল্লেখ্য, পদ্মপুরাণের প্রচলিত সংস্করণ সুবৃহৎ গ্রন্থ : এর কেবলমাত্র 'ক্রিয়াযোগসার' শীর্ষক খণ্ডটি রামমোহনের কালে সুলভ ছিল, অন্যগুলি পাওয়া যেত না ; রামমোহন 'পদ্মপুরাণ' প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য 'পথ্যপ্রদান', পৃঃ ১৬৯) ।

৩৩. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৮ (তিন বার), ৪৯ (চার বার) ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৭৪

৩৪. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫০, ৫৮ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮২ ; সহমরণ বিষয়, পৃঃ ৫৪ ; চারিপ্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ১৭ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৬১ (দুই বার), ১৭৪

৩৫. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৫, ১৯, ৩৭, ৩৮ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫০ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯ ; প্রবর্তক-নিবর্তক দ্বিতীয় সংবাদ, পৃঃ ২৭, ৩০ (দুই বার), ৪০ ; চারিপ্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ১২, ১৫ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৯৯, ১১৬, ১৬৮, ১৬৯ (দুই বার), ১৭৫ ; (উল্লেখ্য যে, কোন কোন স্থলে রামমোহন স্কন্দপুরাণের নাম না করে তার অধ্যায়বিশেষ, যথা 'কাশীখণ্ড', 'উৎকলখণ্ড' প্রভৃতির স্বতন্ত্রভাবে নাম করেছেন) ।

৩৬. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫০ ; সহমরণ বিষয়, পৃঃ ৫৪

৩৭. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৩ (দুই বার) ; পথ্যপ্রদান পৃঃ ৯২, ১৪৬, ১৬৩ (দুই বার) ।

৩৮. সহমরণ বিষয়, পৃঃ ৫৩

৩৯. প্রার্থনাপত্র, পৃঃ ২৭

৪০. পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৬৭, ১৬৯ (তিন বার), ১৭০ (তিন বার), ১৭২, ১৭৩, (দুই বার), ১৭৫ (দুই বার) ।

৪১. পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৭০ (দুই বার) ।

৪২. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৯, ৩৭, ৩৮ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, ৫৭, ৫৮

৪৩. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৯, ৩৮ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৩

৪৪. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৮

৪৫. ঈশোপনিষৎ-ভূমিকা, পৃঃ ১৯৭, ২০২ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৫ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮৩ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৫০ ; উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্য' অংশটিকে কোথাও কোথাও স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।

৪৬. প্রবর্তক-নিবর্তক প্রথম সংবাদ, পৃঃ ৪ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৯২, ১৫৮, ১৭৪

৪৭. সহমরণ বিষয়, পৃঃ ৫১

৪৮. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৩

৪৯. প্রবর্তক-নিবর্তক দ্বিতীয় সংবাদ, পৃঃ ৪৩ ; চারিপ্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ১৭

৫০. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ২৩ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৬৭ (দুই বার)।

৫১. বেদান্তগ্রন্থ, পৃঃ ১০ ; ঈশোপনিষৎ, পৃঃ ২০১, ২০২ ; মাণ্ডূক্য উপনিষৎ, পৃঃ ২৪০ ; উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৪, ১৯, ৩৭, ৩৮ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৬, ৪৭ (দুই বার), ৪৮ (তিন বার), ৫৮, ৫৯, ৬০ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৭, ৭০ (দুই বার), ৮৩ ; প্রবর্তক-নিবর্তক দ্বিতীয় সংবাদ, পৃঃ ৪৪ ; সহমরণ বিষয় (পরোক্ষ উল্লেখ) পৃঃ ৫৫ ; ব্রাহ্মণ সেবধি (দ্বিতীয় সংখ্যা) পৃঃ ১৬ ; চারিপ্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ৮, ১২ (তিন বার) ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১০৬ (দুই বার), ১৬২

৫২. ব্রাহ্মণ সেবধি (২), পৃঃ ১৫ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৬২

৫৩. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৫ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৩১ : এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'হরিবংশ' বর্তমানে প্রচলিত 'মহাভারত'এর অন্তর্ভুক্ত হলেও অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা বলে স্বীকৃত, সুতরাং তুলনায় অর্বাচীন। 'ইতিহাস' অপেক্ষা পুরাণগোত্রীয় গ্রন্থাবলীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশী। এই জন্য এ গ্রন্থ সাধারণত স্বতন্ত্রভাবেই উল্লিখিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রামমোহনও তাই করেছেন।

৫৪. ঈশোপনিষৎ পৃঃ ২০১ ; মাণ্ডূক্য উপনিষৎ পৃঃ ২৪৭ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৭৫ ; চারিপ্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ৭ (দুই বার), ৯ (তিন বার), পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১০০, ১০২ (তিন বার), ১০৪ (দুই বার), ১০৭

৫৫. কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯, ৭১ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৫০

৫৬. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, 'রামমোহন রায় ও বেদান্ত', পৃঃ ১১১-১৩

৫৭. তদেব, পৃঃ ১০৯-১১

৫৮. ঈশোপনিষৎ, ভূমিকা, পৃঃ ১৯৫ ; আরও দ্রষ্টব্য, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃঃ ১৭০ ; ইত্যাদি।

৫৮ক. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯

৫৯. মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, ভূমিকা, পৃঃ ২৪৪ ; আরও দ্রষ্টব্য ভট্টাচার্যের সহিত বিচার পৃঃ ১৭০, ১৭৫, ১৭৮ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৭-৪৮ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ-৮২-৮৩ ; ব্রাহ্মণ সেবধি-সংখ্যা ২, পৃঃ ১৪, ইত্যাদি।

৬০. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃঃ ১৭৯-৮০ ; ঈশোপনিষৎ, ভূমিকা, পৃঃ ১৯৫-৯৮ ; মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, ভূমিকা, পৃঃ ২৪৩-৪৪ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৬১-৬২ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯-৭১, ৮১-৮৩ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১০৬, ১১৩ ; ইত্যাদি।

৬১. 'প্রণবমন্ত্র' সম্পর্কে দ্রষ্টব্য-মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, ভূমিকা, পৃঃ ২৩৮-৩৯ : "মাণ্ডূক্যো-

পনিষৎ প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত কিরূপে দুর্বলাধিকারি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন...”। আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, বেদান্তসার, পৃঃ ১২২ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৮ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮৪-৮৫ ; ইত্যাদি।

৬২. দ্রষ্টব্য—তৃতীয় অধ্যায়, 'রামমোহন রায় ও বেদান্ত'—প্রমাণপঞ্জীর অন্তর্গত উল্লেখ 'ও৩', পৃঃ ১৪৬-৪৭

৬৩. দ্রষ্টব্য—তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১১২ ; তত্রস্থ প্রমাণপঞ্জীর অন্তর্গত উল্লেখ '৪৩', পৃঃ ১৪৩

৬৪. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৯

৬৫. কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পাষণ্ডপীড়ন, গ্রন্থাবলী পৃঃ ৫২ ; রামমোহনের উত্তর, পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৩২-৩৪

৬৬. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৯-৫০

৬৭. রামমোহনের সতীদাহ বিষয়ক রচনাগুলি এই হিসাব থেকে আপাতত বাদ দিয়েছি, কেননা সেখানে তর্কের প্রধান অবলম্বন স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ নয়। পুরাণ-তন্ত্র মুখ্যত ব্যবহৃত হয়েছিল ধর্মবিষয়ক বাদানুবাদে।

৬৮. বেদান্তসার পৃঃ ১২২

৬৯. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৩

৭০. তদেব, পৃঃ ৩৯

৭১. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৭-৫৮

৭২. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৫-৫৯ , কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৭৭, ৮২-৮৪, ৮৯ , পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১২৩-২৫, ইত্যাদি।

৭৩. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৬১

৭৪. তদেব, পৃঃ ৫৮, ৬১-৬২

৭৫. রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ব্যুলের, রিখার্ট্ গার্বে, জর্জ গিয়ার্সন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরগোবিন্দ রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সকলেরই এই সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, *Materials for the Study of the Early History of the Vaishnnava Sect* (Second Ed. Calcutta 1936) pp. 51-59 ; ব্রহ্মজিজ্ঞাসু কৃষ্ণ ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্তি অনুসারে তাঁর ব্রহ্মবিদ্যার আদিগুরু ঘোর ঋষির নিকট যে তত্ত্ব শিক্ষা করেছিলেন, গীতায় উক্ত তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীতেও তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়—*Ibid.* pp. 81-84.

৭৬. সুশীলকুমার দে *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal* (Calcutta 1942) p. 6

৭৭. দ্রষ্টব্য বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত 'গোবিন্দ-ভাষ্য' (পাণিনি আফিস, এলাহাবাদ, ১৯১২) ভূমিকা, পৃঃ ১-২ ; এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত বলদেব কৃত 'প্রমেয়রত্নাবলী',

ভূমিকা, পৃ: ৩-৪ ; এই সমস্তার আলোচনা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য—সুশীলকুমার দে *Op. cit.* pp. 11-12.

৭৮. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ: ৫৫ ; এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হোরেস হেম্যান উইলসনকে লিখিত ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ তারিখের একখানি পত্রে রামমোহনকে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতীর মাধ্যমে চৈতন্যদেবের গুরুপরম্পরাকে অতীতে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা করতে দেখা যায়। বর্তমান লেখক রামমোহনের এই পত্রখানি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারস্থ উইলসনের কাগজপত্রের মধ্য থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন,—দ্রষ্টব্য *Bengal Past and Present* Vol. xcii Part ii No 174 (July-December 1973) pp. 125-47.

৭৯. সুশীলকুমার দে *Op. Cit.* pp. 10-18

৮০. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ: ৬৩

৮১. ঈশোপনিষৎ ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা—*English Works* Pt. ii. pp. 44-47 ; পথ্যপ্রদান, পৃ: ১৩১-৩২

৮২. গোস্বামীর সহিত বিচার পৃ: ৫০-৫১

৮৩. কৃষ্ণচরিত্র—দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ। বঙ্কিম 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন পুরাণেতিহাসে কৃষ্ণচরিতে আরোপিত 'প্রক্ষিপ্ত' পাপোপাখ্যানগুলির অমূলকত্ব প্রমাণের ও কৃষ্ণের আদর্শ মানব-চরিত্র ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। বৈষ্ণব মধুররস-সাধনার সামাজিক কুফল সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মতও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ ছিল (দ্রষ্টব্য—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—শতবার্ষিকী সংস্করণ, নবম খণ্ড, পৃ: ৪২৭-২৯)।

৮৪. সুশীলকুমার দে *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal* pp. 417-19

৮৫. বিমানবিহারী মজুমদার *Krsna in History and Legend* (Calcutta 1969) p. 249

৮৬. নগেন্দ্রনাথ, পৃ: ৬০২ পাদটীকা: উল্লেখযোগ্য যে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের মধ্যে রামমোহন তাঁর মাতৃবংশের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর সুপরিচিত আত্মজীবনীমূলক পত্র দ্রষ্টব্য, Collet, pp. 496-98

৮৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী' (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৯), পৃ: ৪৬-২৭

৮৮. *Letters and Documents* p. 174

৮৯. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'তন্ত্রকথা', (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), ভূমিকা।

৯০. তদেব, পৃ: ২৬-৩৫

৯১. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, 'রামমোহন রায় ও বেদান্ত' পৃ: ১৩০-৩১, এবং প্রমাণপঞ্জী, উল্লেখ '৮৭' ও '৮৮'

৯২. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 'Tantra and Vedanta' *Kalyana-Kalpataru* Vol. III. No 1. p. 176

৯৩. মহানির্বাণতন্ত্র ২.৫২ (বঙ্গবাসী সং পৃঃ ১০)

৯৪. কুলার্ণবতন্ত্র ১৭.২৯ (Tantric Text Series Vol V, London 1917 p. 257).

৯৫. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৩৪

৯৬. শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, 'তন্ত্রতত্ত্ব' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ, কাশী ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮১ ; আরও দ্রষ্টব্য, H. V. Guenther *Yuganaddha* : *The Tantric View of Life* (Chowkhamba Sanskrit Series Studies Vol. III) Introduction, p. ii

৯৭. গৌতমীয় তন্ত্র, ১. ৭-৮ (বসুমতী সং, পৃঃ ২)

৯৮. মহানির্বাণতন্ত্র ১৪. ১৮৫-৮৬ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৮৭)

৯৯. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃঃ ১৭০, ১৭১, ১৭৫; ঈশোপনিষৎ পৃঃ ১৯৬, ১৯৭ ; মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, পৃঃ ২৪৫, ২৪৬-৪৭ ; উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৩৮ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৬০ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯-৭০, ৭০, ৭৯, ৮৩, ৮৯-৯০ ; প্রবর্তক-নিবর্তক দ্বিতীয় সংবাদ পৃঃ ৪০-৪১ ; গায়ত্রীর অর্থ পৃঃ ৩ ; চারিপ্রশ্নের উত্তর পৃঃ ১৭, ১৮, ১৯ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৯২, ৯৩, ১০১-১০২, ১৪০, ১৫২, ১৬১, ১৬৪, ১৬৬-৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১ (দুইবার) ১৭২, ১৭৬

১০০. ঈশোপনিষৎ, পৃঃ ১৯৬ ; মাণ্ডুক্যোপনিষৎ পৃঃ ২৪৫ ; উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৩৮ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮১, ৯১ ; গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা-বিধানম্, পৃঃ ৪০ ; ব্রহ্মোপাসনা, পৃঃ ৫২-৫৩ ; অনুষ্ঠান পৃঃ ৭১ ; ব্রাহ্মণ সেবধি (২) পৃঃ ১৪ ; চারিপ্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৯২, ১০০, ১৬৪, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬

১০১. ঈশোপনিষৎ, পৃঃ ২০৩ ; ব্রাহ্মণ সেবধি (২) পৃঃ ১৬ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১০৯, ১১৪

১০২. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৯, ২১, ৩৭ (দুইবার) ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৬০ ; কবিতাকারের সহিত বিচার পৃঃ ৯১

১০৩. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৪ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৯২, ১৩৭ (দুইবার) ।

১০৪. পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৯২, ১৫৪

১০৫. তদেব, পৃঃ ১০০, ১৫২, ১৬৬

১০৬. তদেব, পৃঃ ১৪৬, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭

১০৭. তদেব, পৃঃ ১৫৪

১০৮. তদেব, পৃঃ ১৬১, ১৬৭

১০৯. তদেব, পৃঃ ১৬২, ১৬৩

১১০. তদেব, পৃঃ ১৬৫

১১১. তদেব, পৃঃ ১৬৫ (চার বার) ।

১১২. তদেব, পৃঃ ১৬৫ (দুই বার), ১৬৬

১১৩. তদেব, পৃঃ ১৩২-৩৩ ; ১৪১-৪২

১১৪. তদেব, পৃঃ ১৩৩-৩৪, ১৭৫

১১৫. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৮, ২৩, গোস্বামী সহিত বিচার পৃঃ ৫৫

১১৬. পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৬১-৬২, ১৬৩

১১৭. তদেব, পৃঃ ১৬৭ (দুই বার)

১১৮. 'সময়াতন্ত্র' সম্পর্কে দ্রষ্টব্য-পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৬১. ১৬৭ ; অন্যান্য বিধি সম্পর্কে-ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃঃ ১৭৪ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৩৬, ১৫৪, ইত্যাদি।

১১৯. পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৭৫

১২০. *Maha-Nirvana-Tantram* edited by Arthur Avalon, Introduction pp. vii-viii : রামমোহনের হস্তলিখিত হরিহরানন্দ-কৃত মহানির্বাণতন্ত্রের এই টীকাটির পাণ্ডুলিপি বর্তমানে কোথায় আছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

১২১. পাষণ্ডপীড়ন (রামমোহন-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য-পরিষদ্ সংস্করণ) পৃঃ ৭৩-৭৪

১২২. পথ্যপ্রদান পৃঃ ১৬৪-৭৭ ; মহানির্বাণতন্ত্রকে শাস্ত্রহিসাবে শ্রদ্ধা ও সমাদরের বস্তু মনে করবার দৃষ্টান্ত রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজে একালেও একেবারে বিরল নয় ; দ্রষ্টব্য, মহানির্বাণ-তন্ত্র, বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ-পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের ভূমিকা ; আধুনিক বিচারশীল পণ্ডিতদের মধ্যেও কেউ কেউ এই গ্রন্থকে সম্পূর্ণ অর্বাচীন বলতে দ্বিধা করেছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চোপাসনা (কলিকাতা ১৩৬০) পৃঃ ২৬৩

১২৩. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃঃ ১৬৮

১২৪. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, পৃঃ ৯৮ ; আরও দ্রষ্টব্য,'পথ্যপ্রদান' পৃঃ ৯৩, ইত্যাদি।

১২৫. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায় পৃঃ ১৩০-৩১ ; Woodroffe, *Shakti and Shakta* pp. 21-22 ; লক্ষ্য করা যেতে পারে, কুলার্ণবের পূর্বোল্লিখিত (তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৩০) "ক্ষণং ব্রহ্মাহস্মীতি......" নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক শ্লোকটি রামমোহন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন (পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৯৩) ।

১২৫ ক. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায় পৃঃ ১৩১-৩২

১২৬. ব্রহ্মোপাসনা পৃঃ ৫২-৫৩ ; মহানির্বাণতন্ত্র ৩. ৫৯-৬৩ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ১৫-১৬)।

১২৭. গায়ত্রীর অর্থ, পৃঃ ৩-৪, ৫ ; আরও দ্রষ্টব্য, 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্' পৃঃ ৪০ ; অনুষ্ঠান, পৃঃ ৬৯, ৭১, ৭৩

১২৮. 'গায়ত্রীর অর্থ' ; 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' পৃঃ ৩২-৩৩ ; 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা-বিধানম্' ; অনুষ্ঠান, পৃঃ ৬৯, ইত্যাদি।

১২৯. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, "তান্ত্রিক কার্যে বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগ", সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৫৯শ খণ্ড ১ম-২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৫-৩৭

১৩০. তন্ত্রসার (বসুমতী সংস্করণ) পৃঃ ৮২-৮৩

১৩১. মহানির্বাণতন্ত্র ৩. ১০৫-১১৪ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৯) ; 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্' পৃঃ ৪০-৪১

১৩২. অনুষ্ঠান পৃঃ ৬৯

১৩৩. ব্রহ্মোপাসনা পৃঃ ৫২-৫৩ ; ক্ষুদ্রপত্রী পৃঃ ৭৫-৭৬ ; অনুষ্ঠান, পৃঃ ৬৮

১৩৪. ঈশোপনিষৎ, পৃঃ ১৯৫ , কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮১ , কুলার্ণবতন্ত্র ৬. ৭২ (Tantrik Texts Series Vol V p. 88) ; কুলার্ণবের পাঠে 'উপাসকানাং কার্যার্থং'এর স্থানে 'সাধকানাং হিতার্থায়' দেখা যায়।

১৩৫. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃঃ ১৭৮ , ঈশোপনিষৎ, পৃঃ ১৯৬ , কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮১ , মহানির্বাণতন্ত্র ১৩. ১৩ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৫১-৫২)। রামমোহন এই ভাব-প্রকাশক বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে দুটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১৩৬. কুলার্ণবতন্ত্র ২. ২৪ ; ৯. ৬৩ (Tantrik Texts Series Vol V pp. 19, 131)

১৩৭. মহানির্বাণতন্ত্র ৮. ২২ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৭২), এই তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসের পরবর্তী শ্লোকগুলিতে গার্হস্থ্যধর্মের লক্ষণ বর্ণিত।

১৩৮. এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Collet, pp. 289-42

১৩৯. ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৫) পৃঃ ৮৯ ; দাদূ (বিশ্বভারতী ১৩৪২), পৃঃ ৪২-৪৩

১৪০. বেদান্তগ্রন্থ, পৃঃ ১১ , প্রার্থনাপত্র, পৃঃ ২৭

১৪১. মহানির্বাণতন্ত্র ৮. ২০৬-০৭ (বঙ্গবাসী সং পৃঃ ৮৫)।

১৪২. *Progressive Movements* pp. 112-14

১৪৩. মণ্ডুক্যোপনিষৎ, পৃঃ ২৪৩ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৭৩ ; কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-পাষণ্ডপীড়ন (গ্রন্থাবলী) পৃঃ ৫৬ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৮৫

১৪৪. হেমলতা দেবী "ঘরোয়া ব্যাপারে রামমোহন" Rammohun Roy Centenary Commemoration Volume Part II pp. 282-84

১৪৫. মহানির্বাণতন্ত্র ১০. ৭৯ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১১৯)

১৪৬. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ, পৃঃ ৪৫

১৪৭. মহানির্বাণতন্ত্র ৮. ৪৭ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৭৪)।

১৪৮. চারিপ্রশ্নের উত্তর পৃঃ ১৯-২০ ; পথ্যপ্রদান পৃঃ ১৫৫-৫৪ ; মহানির্বাণতন্ত্র ৮. ১৭৭-৮১ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৮৩-৮৪)।

১৪৯. চারিপ্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ১৭-১৯ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৪৩-৫২ ১৫৯-৭৮ , 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' পুস্তিকায় এ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণও দেওয়া হয়েছে।

১৫০. নগেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৫ ; Collet p. 6

১৫১. জীবহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ
পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

তন্ত্রসার, বসুমতী সং, পৃঃ ৩৫

এ সম্পর্কে আরও দ্রষ্টব্য, হরকুমার ঠাকুর, পুরশ্চরণবোধিনী পৃঃ ৩ , পুরশ্চরণরত্নাকর (মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য সংকলিত) দ্বিতীয় সং, কলিকাতা, ১৩৮৩, পৃঃ ৫-৭

১৫২. নগেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৬০১-০২ পাদটীকা

১৫৩. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৬২) পৃঃ ১৭৯-৮০

১৫৪. তদেব পৃঃ ১৮১; শিল্পী শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ভারতের নানাস্থান পর্যটন করেছিলেন। বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বর তীর্থে ইনি এক তান্ত্রিক ভৈরবীর সাক্ষাৎ পান যাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনাকালে রামমোহনের কথা ওঠে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য অনুসারে, রামমোহনের সঙ্গে তন্ত্রসাধনার যোগবিষয়ে ভৈরবী ইঙ্গিত করেন, ('তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ', প্রথম খণ্ড, অষ্টম মুদ্রণ, ১৩৮৬, পৃঃ ২৮২; এটি ১৯১৫-১৬ সালের কথা—তদেব, পৃঃ ১৬৩)। দেখা যাচ্ছে রামমোহনের তন্ত্রসাধনাবিষয়ক ঐতিহ্যটি একাল পর্যন্ত চলে এসেছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য মনে রাখা দরকার। রামমোহনের সমকালীন এবং অনুরাগী শিষ্য দীর্ঘজীবী আনন্দচন্দ্র বসু কথিত এক কাহিনী অনুসারে রামমোহনের সঙ্গে একবার এক ব্রাহ্মণের তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে কোনক্রমে রামমোহন জানতে পারেন উক্ত ব্রাহ্মণটি মদ্যমাংসসেবী শাক্ত তান্ত্রিক। ব্রাহ্মণের এই পরিচয় পাওয়ার পর রামমোহন নিজের উদ্যানবাটীতে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে রামমোহনের আলাপকালে আনন্দচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। বর্ণিত কাহিনীটি সত্য হলে স্বীকার করতে হয় তন্ত্রের নামে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার রামমোহন তীব্র বিরোধী ছিলেন; তন্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপাদক অংশ এবং এই শাস্ত্রের উদার সামাজিক দৃষ্টির একান্ত অনুরাগী হলেও তিনি তন্ত্রসাধনের সঙ্গে জড়িত কিছু কিছু জুগুপ্সিত আচার সমর্থন করেন নি (দ্রষ্টব্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রাবণ, ১৮০২ শক পৃঃ ৭৬)।

১৫৫. ব্রাহ্মধর্মঃ, নবম সং, কলিকাতা ১৯৩৭, পৃঃ ১২-১৩

১৫৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৭৯০ শক, পৃঃ ২১৯-২০

১৫৭. *History of the Brahmo Samaj* (Seoond Ed. Caloutta, 1974) pp.62-63

১৫৮. গৌরগোবিন্দ রায়, হিন্দুধর্ম-বিজ্ঞান (কলিকাতা ১৯৬৯) ২০৫-৩৮

১৫৯. ভূদেব মুখোপাধ্যায় "রাজা রামমোহন রায় ও তন্ত্রশাস্ত্র", বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় সং, চুঁচুড়া ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৪৩-৪৯; Arthur Avalon (ed.) *Mahanirvana Tantram* p. vii; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত অ্যাভেলনের মহানির্বাণতন্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সমালোচনা, সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩২০, পৃঃ ৩৬৩-৬৮; এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের সংক্ষিপ্ত উক্তিও উল্লেখযোগ্য: "বাংলার তান্ত্রিক সাধন অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তের আশ্রয়েই গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজা [রামমোহন] এই তান্ত্রিক সাধনেরই লোক ছিলেন" (নবযুগের বাংলা, কলিকাতা ১৩৬২, পৃঃ ৩৯)।

পঞ্চম অধ্যায়

রামমোহন রায় ও সমকালীন ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সমাজ

রামমোহনের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ও সমকালীন ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনকারী পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়টি এখন পর্যন্ত কোনও জিজ্ঞাসু বা গবেষকের দৃষ্টি যথোপযুক্তভাবে আকর্ষণ করে নি, এবং এর আনুপূর্বিক আলোচনা এখনও হয় নি। উনবিংশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগৃতির উপর ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রভাব সম্পর্কে বিদেশী অনুসন্ধিৎসার একটি নিদর্শন সম্প্রতি দেখা গেছে ;[১] কিন্তু সেখানে রামমোহন বা উক্ত নবজাগৃতির অন্যান্য নেতৃস্থানীয়গণের এই বিষয়ক কীর্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। গ্রন্থকার ডেভিড কফের মূল বক্তব্য, নবযুগের বিশিষ্ট মূল্যবোধগুলি বাঙ্গলাদেশে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞগণের গবেষণার মাধ্যমে। ১৮৩০-৪৫ এর মধ্যে মেকলে ও তাঁর অনুবর্তী ইংরেজ রাজপুরুষগণের উদ্যমে যখন শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে প্রাচ্যপন্থী বা 'ওরিয়েন্টালিস্ট' পক্ষের পরাজয় ঘটল তারপর থেকে একক ভাবে কখনও রামমোহন, কখনও বা ডিরোজিও প্রমুখ ভারতীয় মনীষিগণকে নবযুগের প্রধান নায়করূপে চিত্রিত করবার প্রবণতা দেখা গেল। ধর্মসংস্কারকরূপে রামমোহনের প্রতিষ্ঠার মূলে, তাঁর মতে রয়েছে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত কিশোরীচাঁদ মিত্র রচিত "রামমোহন রায়" প্রবন্ধ। তেমনি ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫ পর্যন্ত পনর বৎসরের মধ্যেই ডিরোজিও হয়ে উঠেছেন 'ভারতীয় সোক্রাতেস' (It was just at the crossroads between the defeat of Orientalism and the ultimate triumph of Macaulayism in India [during the years 1830-45] that the apologetic mythification of the historiography of the Bengal renaissance begins.······During these fifteen yeass, a Eurasian youth

named Derozio was hailed as the Indian Socrates. Rammohun's image as Hindu Reformer can probably be traced to Debendranath Tagore who while revitalizing the idea of a *Brahmo Samaj* in 1840-42, promptly re-edited the Raja's works and popularised his 'message" on reformation from within. Rammohun's historical role as progenitor, in which he appears all things to all men, can be traced back to K. C. Mitra's biographic article in the *Calcutta Review* of 1845. From then on, Rammohun was regularly credited as the source for all that was modern in India.)।[২] একটু আশ্চর্য লাগে, এত কথা বলা সত্ত্বেও লেখক রামমোহনের সঙ্গে সমকালীন ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞগণের যোগাযোগ বা ভাববিনিময় সম্পর্কে কোনও অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা পর্যন্ত তাঁর গ্রন্থে করেন নি। তাঁর দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাইএর জন্যই এটুক সম্ভবত তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল। গ্রন্থকারের আর একটি সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত উল্লেখও এই সঙ্গে করে রাখা যাচ্ছে, কেন না বর্তমান প্রসঙ্গে এটির কিছু আলোচনার প্রয়োজন হবে। তাঁর মতে, রামমোহনের আদর্শ ছিল অতীতের 'বৈদিক স্বর্ণযুগ' : তাঁর জীবনব্যাপী প্রয়াসের দ্বারা তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বিত করে সেটিকেই কালোপযোগী রূপে পুনঃস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন মুখ্যত দুই ইংরেজ প্রাচ্যতত্ত্ববিদের নিকট যাঁরা হলেন উইলিয়ম জোন্‌স ও কোলব্রুক; অপর পক্ষে রামমোহন বা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপক্ষ বুদ্ধিজীবিমহলের প্রেরণাদাতা ছিলেন হোরেস হেম্যান উইলসন যিনি তাঁর গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেন ভারত-ইতিহাসের 'মধ্যযুগীয়' (medieval) হিন্দু সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলিকে বর্জন করবার কোনও প্রয়োজন নেই-আধুনিক জীবনের সঙ্গে এগুলিকে সমন্বিত করেই প্রগতির পথে যাত্রা করা সম্ভব। এই অনুপ্রেরণার ফলেই উত্তর কালে ক্রমশ শিক্ষিত বাঙালী ও ভারতবাসী ব্রাহ্ম-সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বেদান্তভিত্তিক সংস্কারকর্মসূচীকে বিজাতীয় বলে ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন (In fact it was this kind of reasoning that led more and more Indians later in the century to

conclude that instead of reforming the Hindu religion, Vedantic-inspired organisations like the *Brahmo Samaj* were actually "denationalising" Indian culture) ।[৩]

ইউরোপীয় রেনেশাঁসের সঙ্গে উনবিংশ শতকীয় বাঙ্‌লার নবজাগৃতির প্রকৃতিগত পার্থক্য যতই থাকুক, এই দুটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বাহ্যত এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচীন যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিক যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে সে-সবের পুনরনুশীলনের প্রতি এক প্রচণ্ড আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। রেনেশাঁসের নূতন জীবনাদর্শ উভয়ত্র প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক মানসের এই নব পরিচয় থেকে গভীর প্রেরণা লাভ করেছিল। ইউরোপীয় রেনেশাঁসের মূলে ছিল গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের নূতন, গভীর ও ব্যাপক চর্চা। প্রাচীন গ্রীক জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য-সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং যুক্তিনিষ্ঠা মধ্যযুগীয় অন্ধ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ আচার ও বিশ্বাসের মোহপাশ থেকে ইউরোপীয় চিত্তকে ক্রমশ মুক্ত করেছিল। নূতন বিদ্যাচর্চার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ-সৃষ্টি হবার পর ইউরোপের ক্লাসিকাল অতীতই হয়ে দাঁড়িয়েছিল নূতন প্রজন্মের পথ-প্রদর্শক। এ-সম্পর্কে আমরা বুর্ক্‌হার্টের উক্তি মনে রাখতে পারি: "It was needful that noble and burgher should first learn to dwell together on equal terms, and that a social world should arise which felt the want of culture, and had the leisure and the means to obtain it. But culture as soon as it freed itself from the fantastic bonds of the Middle Ages, could not at once and without help find its way to the understanding of the physical and intellectual world. It needed a guide, and found one in the ancient civilisation, with its wealth of truth and knowledge in every spiritual interest. Both the form and the substance of this civilisation were adopted with admiring gratitude; it became the chief part of the culture of the age." ।[৪] বাঙ্‌লার ক্ষেত্রেও মুখ্যত প্রাচীন সংস্কৃত (বৈদিক ও বেদোত্তর ক্লাসিকাল), গৌণত (কিছুকাল পরে) প্রাকৃত-পালি

এবং মধ্যযুগে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত আরবী ও ফার্সীর আধুনিক বিচারশীল পদ্ধতি সম্মত চর্চা নব ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শিক্ষিত সমাজকে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিব অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য সম্পর্কে সচেতন করেছিল এবং তার মনে সঞ্চার করেছিল আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ। এখানে মনে রাখা আবশ্যক উভয় ক্ষেত্রে তুলনায় এ-বিষয়ে কিছু গরমিলও পাওয়া যাবে। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে যেমন গ্রীক্‌চর্চা প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল, ভারতবর্ষে সংস্কৃত, বা আরবী-ফার্সীর সে পরিণাম ঘটেনি। সীমিত বিশেষজ্ঞ মহলে গতানুগতিক পদ্ধতিতে এগুলি রীতিমত অনুশীলিত হত এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এ-সব চর্চার শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকেরও অভাব দেখা যায় নি।[৫ক] মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের ভাষারূপে আরবী ও রাজভাষা হিসাবে ফার্সীর বিশেষ মর্যাদা ছিল। কিন্তু এই চর্চার মধ্যে প্রাণশক্তি বা সৃষ্টিশক্তি বলতে কিছুই ছিল না, এর দ্বারা জনসাধারণের অন্তর্জীবন উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি যেমন জাতির প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার থেকে প্রেরণা আহরণ করেছিল তেমনি প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত করেছিল নূতন প্রাণশক্তি ও প্রয়োগ করেছিল আধুনিক বিচারশীল অনুসন্ধানপদ্ধতি। এই শেষোক্ত সূত্রে দেশে নবাগত ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বৃহৎ ও মহৎ ভূমিকা অবশ্য স্মরণীয়। প্রাচীন যুগ সম্পর্কে একালের অভিনব গবেষণাপদ্ধতি পশ্চিম থেকেই আমরা লাভ করেছি। এই পদ্ধতির সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়োগ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বার সুপরিকল্পিত ভাবে খুলে দিয়েছিলেন একদল পাশ্চাত্য জ্ঞানতাপস। নবযুগে ভারত-সংস্কৃতি বিষয়ক যে চেতনা শিক্ষিত প্রগতিশীল বাঙালী সমাজের চিত্তকে অনুরঞ্জিত করে নূতন জীবনদর্শনে একটি সামঞ্জস্যজ্ঞান এনে দিয়েছিল তার জন্য বঙ্গীয় নবজাগৃতি বহুলাংশে এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগোষ্ঠীর নিকট ঋণী। যুগসন্ধিক্ষণে এর প্রয়োজন ছিল। প্রথম অধ্যায়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, রামমোহনের মধ্যে এই ভারত-চেতনার একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, যার উৎস তাঁর সুবিস্তীর্ণ অধ্যয়ন ও প্রত্যক্ষ দেশপরিচয়। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, প্রভৃতি ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তির মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির প্রাণবস্তুর অন্বেষণে আজীবন রত ছিলেন। সুতরাং তিনি ও তাঁর সমকালীন পাশ্চাত্য ভারত-জিজ্ঞাসুমণ্ডলী যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হবেন তা খুবই স্বাভাবিক ও

প্রত্যাশিত। তাঁদের জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ভিন্ন হলেও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অনেকাংশে অভিন্ন ছিল।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে নবজাগ্রত ইউরোপের পৃথিবী আবিষ্কারের অভিযান শুরু হয়। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশ সাম্রাজ্যবাদের এরই মাধ্যমে গোড়াপত্তন। বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের ক্রমপ্রসারের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। স্থায়ী রাজশক্তি হিসাবে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক কারণেই একদল ইংরেজ রাজপুরুষকে ভারতবাসীর জীবন ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে এসেছিল। সুতরাং প্রথম যুগের ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ভারতবর্ষই বিশেষ ভাবে যাঁদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র তাঁদের অধিকাংশই যে ইংরেজ ও ভারতে ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত হবেন, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।[৫] অবশ্য এঁদের পূর্বেও ইউরোপীয় অনুসন্ধিৎসুগণের এই ক্ষেত্রে দু' এক টি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। কাশিমবাজার কুঠিতে নিযুক্ত জে. মার্শাল নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবত-পুরাণের এক ইংরেজি অনুবাদ করেন বলে প্রকাশ।[৬] তারও পূর্বে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে কর্মরত ওলন্দাজ ধর্মযাজক আব্রাহাম রজার প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের উপর নিজ ভাষায় Open-Deure tot het verborgen Hydendom (Open-Door to the Hidden Heathendom) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন; তিনি কবি ভর্তৃহরি রচিত কিছু শ্লোকও প্রকাশ করেছিলেন। আগ্রানিবাসী জার্মান মিশনারী হাইনরিশ রোট্‌ (মৃত্যু ১৬৬৮) সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে এই ভাষার এক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, যেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মালাবার অঞ্চলে নিযুক্ত জেসুইট ধর্মযাজক জোহান এরুন্‌স্ট্‌ হান্‌ক্সলেডেন লেখেন Grammatica Granthamia seu Samcrdumica যা হল এই যুগের বিদেশী রচিত অপর এক সংস্কৃত ব্যাকরণ। এ গ্রন্থও মুদ্রিত হয়নি, কিন্তু এটিকেই অবলম্বন করে প্রায় এক শতাব্দী পরে অষ্ট্রিয়া দেশীয় কার্মেলীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মযাজক ফ্রা পাওলিনো দু'খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভারত-সংস্কৃতি বিষয়ক আরও কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এঁরও কর্মক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চল এবং ভারতীয় ভাষা ও জীবনচর্যা সংক্রান্ত

জ্ঞানে ইনি ছিলেন পূর্ববর্তীদের চেয়ে অনেক অগ্রসর।[৬ক] অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ পণ্ডিতমণ্ডলীর ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের প্রাথমিক প্রচেষ্টাও আবদ্ধ ছিল অনেকটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত স্তরে। সর্বপ্রথম যাঁর চিন্তায় এই ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট নীতি বা পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায় তিনি ভারতের সেকালের বহুবিতর্কিত রাজপুরুষ প্রথম বড়লাট হেস্টিংস্। হেস্টিংসের শাসননীতিব কোনও কোনও দিক হয়তো সঙ্গতভাবেই ঐতিহাসিকদের নিন্দাভাজন হয়েছে। কিন্তু ভাবতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি এই বহুনিন্দিত ব্যক্তিটির মনে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ৪ অক্টোবর ১৭৮৪ তারিখে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন চেয়ারম্যান ন্যাথানিয়াল স্মিথের নিকট লিখিত পত্রে যদিও তিনি নিজেকে বিনয়বশত অশিক্ষিত (unlettered) বলে উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান ও রুচিসম্পন্ন পুরুষ।[৭] তরুণ বয়স থেকেই লাটিন ও ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। ভারতে অতিবাহিত সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ফার্সী, হিন্দুস্তানী ও বাঙ্‌লা ভাষা আয়ত্ত করেন। স্বয়ং সংস্কৃত না জানলেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। চার্লস্ উইলকিন্সকে তিনিই মহাভারত ইংবেজিতে অনুবাদ করতে উৎসাহ দেন এবং তাঁরই প্রস্তাবে এই অনুবাদের 'ভগবদ্‌গীতা' অংশটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খরচে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই কর্মব্যস্ত, শত্রু-পরিবেষ্টিত দুর্দ্ধর্ষ রাজপুরুষটি কলিকাতা থেকে পত্নীকে লিখিত ২০ নভেম্বর ১৭৮৪ তারিখের পত্রে পরম শ্রদ্ধাভরে গীতায় ব্যাখ্যাত নিষ্কাম কর্মযোগের আলোচনা করছেন ; এবং উইলকিন্স্ অনূদিত 'মহাভারত' থেকে সংগৃহীত রুরু ও প্রমদ্বরার উপাখ্যানটিকে ইংরেজি কাব্যরূপ দিয়ে পত্নীর মনোরঞ্জনার্থ পাঠাচ্ছেন।[৮] ন্যাথানিয়াল স্মিথকে লিখিত ৪ অক্টোবর ১৭৮৪ তারিখের প্রাগুক্ত পত্রে তিনি 'গীতা' সম্পর্কে নিজের যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তা উদ্ধৃতির যোগ্য : "......I hesitate not to pronounce the Geeta, a performance of great originality ; of a sublimity of conception reasoning and diction, almost unequalled ; and a single exception, among all the known religions of

mankind, of a theology accutely corresponding with that of Christian dispensation, and most powerfully illustrating its fundamental doctrines." ।* মাত্র এই ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি ; উক্ত পত্রে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, বিজিত জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুশীলনের মাধ্যমেই বিজেতা শাসকদের মনে বিজিতদের জীবনচর্যার প্রতি সেই প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জেগে উঠতে পারে যা বিদেশী শাসনকে তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত কম দুঃসহ করে তুলবে। এই প্রসঙ্গে দার্শনিকোচিত নির্বেদের পরিচয় দিয়ে এমন কথাও তিনি বলেছেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একদিন অবসান হবে, কিন্তু তার দীর্ঘকাল পরেও হিন্দু সাহিত্যের এই সব চিরন্তন সৃষ্টি বেঁচে থাকবে (Nor is the cultivation of language and science, for such are the studies to which I allude, useful only in forming the moral character and habits of the service. Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on right of conquest, is useful to the state : it is the gain of humanity ; in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections ; it lesssens the weight of the chain by which the natives are held in subjection ; and it imprints on the hearts of our countrymen the sense and obligation of of benevolence. Even in England, this effect of it is greatly wanting. It is not very long since the inhabitants of India were considered by many, as creatures scarce elevated above the degree of savage life ; nor, I fear is that prejudice yet wholly eradicated, though surely abated. Every instance which brings their real character home to observation will impress us with a more generous sense of feeling for their natural rights, and teach us to estimate

thereby the measure of our own. But such instances can only be obtained in their writings : and these will survive when the British dominion in India shall have long ceased to exist. and when the sources which it once yielded of wealth and power are lost to remembrance.)।[১০] এই পত্রে হেস্টিংস ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অনুশীলনের আলোকে শাসননীতির যে মার্জনের আভাস দিয়েছেন ভারতে তাঁর কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে সেটিকে রূপদানের প্রচেষ্টায় তাঁর বিরাম ছিল না। ইংরেজ রাজপুরুষগণের মধ্যে সম্ভবত তিনিই প্রথম অনুভব করেন, ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের শাসনকার্যের সুবিধা ও ভারতীয় জীবনচর্যার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ভারতীয় ভাষা (বিশেষত ফার্সী ও হিন্দুস্তানী) শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সী ভাষার অধ্যাপকের এক পদসৃষ্টির জন্য তিনি উদ্যোগী হন। কলিকাতায় ইসলামীয় বিদ্যাচর্চার সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র 'কলিকাতা মাদ্রাসা' স্থাপন তাঁরই কীর্তি (১৭৮০)। ভারতীয় হিন্দুরা যাতে আদালতে তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী বিচার লাভ করতে সক্ষম হয় এই অভিপ্রায়ে হেস্টিংসের উদ্যোগে এগার জন স্মার্ত পণ্ডিতের চেষ্টায় 'বিবাদার্ণবসেতু' নামক হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের এক প্রামাণিক সংকলন প্রস্তুত হয়; এরই ফার্সী অনুবাদ (১৭৭৫) থেকে ন্যাথানিয়াল ব্র্যাসি হ্যালহেড ১৭৭৬ সালে A Code of Gentoo Laws শীর্ষক এক ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালহেড কর্তৃক বাঙ্‌লা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ মুদ্রণ ও প্রকাশের পিছনেও হেস্টিংসের উৎসাহই কার্যকরী। বাঙলা ভাষাবিদ্‌, 'ইম্পে কোড' এর বঙ্গানুবাদক (১৭৮৫) ও উত্তরকালে বারাণসী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা (১৭৯১) জোনাথন ডান্‌কানেরও আদি পৃষ্ঠপোষক হেস্টিংস্‌। হেস্টিংসের সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করেই ফ্রান্সিস গ্ল্যাড্‌উইন প্রকাশ করেন তাঁর A Compendious Vocabulary English and Persian (১৭৮০) ও আবুল ফজল কৃত 'আইন-ই-আক্‌বরী'র ইংরেজি অনুবাদ (১৭৭৭-১৭৮৬)। চার্লস উইলকিন্সের সংস্কৃত-চর্চা যে অতি প্রত্যক্ষভাবেই হেস্টিংস্‌ কর্তৃক পোষিত তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই ভাবে প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার যে পরিবেশ হেস্টিংস্‌ গড়ে তোলেন তা একটি সাংগঠনিক

রূপ লাভ করেছিল ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক কলিকাতায় তৎকালীন প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র 'এসিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই ক্ষেত্রে জোন্সের কৃতিত্বকে কিছুমাত্র খাটো না করেও বলা চলে, এর পশ্চাতেও হেস্টিংসের প্রেরণা যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরী ছিল।[১১] প্রধানত এই এসিয়াটিক সোসাইটিকে অবলম্বন করেই প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞ রূপে জোন্স, কোলব্রুক ও উইলসনের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচ্য।

সৌভাগ্যবশত হেস্টিংসের ভারতত্যাগের পরেও (১৭৮৪) হেস্টিংস্ প্রণোদিত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার এই ধারাটি লুপ্ত বা ক্ষীণ হয়নি, বরং তা উত্তরোত্তর বিস্তারিত ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে থাকে। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে জোনাথন ডান্‌কান বারাণসীতে প্রতিষ্ঠা করলেন প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের অপর এক সরকারী কেন্দ্র বেনারস পাঠশালা বা সংস্কৃত কলেজ; এবং ১৮০০ সালে গভর্ণর জেনারেল ওয়েলেস্‌লীর উদ্যোগে কলিকাতায় স্থাপিত হল সুবিখ্যাত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে ও সহানুভূতির সঙ্গে পরিচালনা করবার জন্য এদেশে নবাগত ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যে প্রয়োজন হেস্টিংস্ অনুভব করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওয়েলেস্‌লী সেই নীতিকেই সাংগঠনিক রূপদান করতে চাইলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পাশাপাশি অল্পকালের মধ্যেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য চর্চার এক প্রধান ক্ষেত্ররূপে গড়ে উঠল। এই শিক্ষায়তন সংক্রান্ত ১৮ আগস্ট ১৮০০ তারিখে প্রদত্ত সুবিখ্যাত মন্তব্যলিপিতে ওয়েলেস্‌লী এর পরিকল্পনা ও পাঠক্রম সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।[১২] ভারতে আগত কোম্পানীর প্রতিটি সিভিলিয়ানের এখানে তিন বৎসর শিক্ষাগ্রহণ আবশ্যিক ছিল; এবং এখানকার দীর্ঘ পাঠ্যসূচীর তালিকায় ছিল, প্রাচ্য ভাষার মধ্যে আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, হিন্দুস্তানী, বাঙলা, তেলুগু, মারাঠী, তামিল, কানাড়ী; হিন্দু ও মুসলমান আইন; নীতিশাস্ত্র, দেওয়ানী ব্যবহারবিধি (civil jurisprudence), বিভিন্ন দেশের আইন, ব্রিটিশ আইন, ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের সরকার পরিচালনের জন্য গভর্ণর জেনারেলের কাউনসিল প্রণীত আইন বা মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্ণরদ্বয়ের কাউনসিল প্রণীত আইন; অর্থনীতি, বিশেষত ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যসংক্রান্ত ও

স্বার্থবিজড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ, ভূগোল ও গণিতশাস্ত্র; আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহ, গ্রীক, লাটিন ও ইংরেজি ক্লাসিকাল সাহিত্য; প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা।[১৩] সরকারী শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ মূলত পরিকল্পিত হলেও সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ এর পাঠ্যসূচী এই প্রতিষ্ঠানকে নিছক ব্যবহারিক স্তর থেকে স্বাভাবিক ভাবেই এক সারস্বত সংস্থায় রূপান্তরিত করেছিল।[১৪] কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবে একই সময়ে ভারতীয় ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার অপর একটি ধারা এসে এই স্রোতের সঙ্গে মেলে। এর প্রধান স্রষ্টা সমকালীন শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশনের (স্থাপিত ১০ জানুয়ারী, ১৮০০) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক রেভাঃ উইলিয়ম কেরী, তাঁর সহযোগী রেভাঃ জোশুয়া মার্শম্যান ও রেভাঃ উইলিয়ম ওয়ার্ড্। ভাষাশিক্ষায় কেরীর সহজাত আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল এবং মাতৃভাষা ইংরেজি ব্যতীত জীবনে তিনি গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, ফরাসী, ওলন্দাজ, ইতালীয়, সংস্কৃত, ফার্সী, বাঙলা, হিন্দুস্তানী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তেলেগু, কানাড়ী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষা অল্পবিস্তর আয়ত্ত করেন। মার্শম্যান ইংরেজি ব্যতীত জানতেন গ্রীক, লাটিন হিব্রু, সিরিয়াক্, চীনা, বাঙলা ও কিছু সংস্কৃত। ওয়ার্ড এঁদের মত ভাষাবিদ্ না হলেও মুদ্রণের কাছে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর হয়ে ওঠে তৎকালীন বাঙ্লা দেশের তথা পূর্বভারতের প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যচর্চার এবং পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার স্বভাবত এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ও ভারতীয় জীবনচর্যার অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ ছিল নীতিগতভাবে তাঁদের কর্ম-পদ্ধতির অঙ্গ। বিভিন্ন প্রাচ্যভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশের সূত্রে সেই সব ভাষার গদ্যসাহিত্যের এঁরা যে উন্নতিসাধন করেছিলেন তা আজ সর্বস্বীকৃত, ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অদ্ভুতকর্মা কেরী রচনা করেছিলেন সংস্কৃত ভাষায় (মুগ্ধবোধভিত্তিক) পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ, বাঙ্লা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান, মারাঠী ব্যাকরণ ও অভিধান, পাঞ্জাবী ব্যাকরণ, তেলুগু ব্যাকরণ, কানাড়ী ব্যাকরণ এবং (মার্সম্যানের সহযোগিতায়) ভুটানী ব্যাকরণ। তাছাড়া তিনি সংস্কৃত ভাষার এক অভিধান ও তেরটি ভারতীয় ভাষার এক শব্দকোষ

(Polyglot Vocabulary)ও প্রস্তুত করেছিলেন যেগুলির পাণ্ডুলিপি অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়।[১৫] মার্সম্যানের সহযোগিতায় সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের আদি ও অযোধ্যা কাণ্ডের মূল সহ ইংরেজি অনুবাদ কেরী-মার্সম্যানের যুগ্ম বিরাট কীর্তি।[১৬] সমগ্র বেদ ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করবার পরিকল্পনাও তাঁদের ছিল, কিন্তু তা কাজে পরিণত হয় নি। কেরী পরিকল্পিত সাংখ্যদর্শনের অনুবাদও অপ্রকাশিতই থেকে যায়। সুবিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ হেন্‌রী টমাস কোলব্রুককে 'অমরকোষ' ও 'হিতোপদেশ' সম্পাদনেও কেরী উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছিলেন। ১৮০১ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত সংস্কৃত, বাঙ্‌লা ও মারাঠী ভাষাত্রয়ের অধ্যাপকরূপে কেরী ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮০৬ থেকে মৃত্যুবৎসর ১৮৩৪ পর্যন্ত তিনি এসিয়াটিক সোসাইটিরও সদস্য ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতিতেও কেরীর যথেষ্ট কৌতূহল ও অধিকার ছিল এবং ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এইগুলির চর্চায় তাঁকে অন্যতম পথিকৃতের সম্মান দেওয়া যেতে পারে। কেরী-মার্সম্যানের সহযোগী পাদ্‌রী উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশনের মুদ্রণ ও প্রকাশ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক এবং এঁর সুদক্ষ পরিচালনায় "শ্রীরামপুরে তদানীন্তন কালে এসিয়ার বৃহত্তম প্রাচ্যভাষাসমূহের ঢালাইখানা ও ছাপাখানা গড়ে ওঠে।...১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এখানে ২১২০০০ বই ছাপা হয়।"[১৭] প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ রূপে উত্তরকাল তাঁকে মনে রেখেছে Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos (চারখণ্ডে সম্পূর্ণ, ১৮১১) এবং এই পর্যায়ের A view of the History, Literature and Mythology of the Hindoos (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, ১৮১৮) গ্রন্থগুলির জন্য। হিন্দু জীবনচর্যা সম্পর্কীয় সমকালে প্রকাশিত গ্রন্থরাজির মধ্যে এগুলি নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পারে। এই সূত্রে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশনের এই আদিত্রয়ী কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কলেজের পরিকল্পনা সম্পর্কে জনৈক আধুনিক লেখক বলেছেন, "Here Carey's genius conceived the idea of a "Christian Benares" where Christian scholars would be steeped in oriental and western learning and Indians of all castes would have access to the best that

east and west could jointly provide" ।[১৮] কেরীর 'Christian Benares' গড়ে তুলবার স্বপ্ন সফল না হলেও তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমে প্রচ্যবিদ্যানুশীলনের গুরুত্ব যে স্বীকৃতি লাভ করেছিল তা বর্তমান প্রসঙ্গে মনে রাখার মত। কেরী-মার্সম্যান-ওয়ার্ড্ শ্রীরামপুরে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য, ভারতবাসীর জীবনচর্যা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রভৃতি অনুশীলনে যে মহৎ ঐতিহ্য স্থাপন করেছিলেন তাব সার্থক উত্তরসাধকরূপে দেখা যায় শ্রীরামপুর মিশনের পরবর্তী কর্মিদলকে যাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মার্সম্যান-পুত্র জন ক্লার্ক মার্সম্যান, কেরীপুত্র ফেলিক্স্ কেরী এবং রেভাঃ জন ম্যাক্।

এসিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন, রামমোহনের সমকালীন ভারতে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার এই তিনটি কেন্দ্রের পশ্চাতে যথাক্রমে যে আদর্শ ও প্রেরণা সমূহ কার্যকরী হয়েছিল সেগুলির একটি তুলনামূলক বিচার এখানে করা যেতে পারে। হেস্টিংস্ সৃষ্ট ধারা অনুসরণে উত্তরকালে মুখ্যত এসিয়াটির সোসাইটিকে আশ্রয় করে যাঁরা প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রামমোহনের সমসাময়িকরূপে চার জনের নাম স্মরণীয়—সাব উইলিয়ম জোন্স্ (১৭৪৬-১৭৯৪), সার চার্লস উইলকিন্স্ (১৭৫০-১৮৩৬), হেনরী টমাস কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৬) এবং হোরেস হেম্যান উইলসন (১৮৮৬-১৮৬০)। এঁরা সঙ্গে করে এনেছিলেন অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় ক্লাসিকাল বিদ্যাশিক্ষার ঐতিহ্য। তদানীন্তন ইউরোপে ও ইংলণ্ডে গ্রীক-লাটিন ভাষা ও সাহিত্যে কৃতবিদ্য হতে পারাটাই ছিল শিক্ষার উচ্চতম লক্ষ্য এবং এই দুই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির রসানুভূতির যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হওয়াটা ছিল সংস্কৃতিবান পুরুষের সর্বস্বীকৃত লক্ষণ। ভারতবর্ষে আসবার সুযোগ না ঘটলে এই সব মনীষীরা স্বদেশে নিজ নিজ কর্মজীবনের অবসরে হয় তো হোমার, ভার্জিল, এ্যাস্‌খুলস, ওভিদ আলোচনা করেই চিত্তবিনোদন করতেন। ভারতবর্ষে সদ্য উন্মুক্ত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্যভাণ্ডার তাঁদের কাছে সর্বাংশে নিজেদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক রুচির অনুকূল একটি জগৎরূপে প্রতিভাত হল। স্বর্গত সুশীলকুমার দে'র ভাষায়, "On coming to India they discovered a language as dead as ancient Greek and with far less influence on any existing society than the lauguage of Justinian. They discovered

verses as melodious as those of Homer, as skilful as those of Horace as grand as that of Aeschylus. They discovered a form of speech unrivalled even by Greek in the complexity of its grammatical forms, and in the susceptibility of its words to the most delicate subtleties of meanings. They approached their discovery in the spirit of a literary critic and a grammarian, If Sir William Jones and Henry Colebrooke had passed their lives in England as leisured country gentlemen they would have probably translated Virgil or Ovid, or have edited one or two Greek dramatists, or have done part of the work of Jelf or Buttman or Donaldson. As it was, they fortunately saw in the study of Sanskrit an analogy of Greek and Latin. They investigated and interpreted the Institutes of Manu and the old Sanskit plays and poems with that keenness of perception, that patience in research and that accuracy and caution which they would have applied to the fragments of the Twelve Tables or to the choruses of Sophocles"।[১৯] এটি রেনেশাঁসো--ত্তরযুগীয় ইউরোপীয় বিদ্যাবত্তার চরিত্রলক্ষণ। সংস্কৃত ও সংস্কৃতভাষার-আধারে রক্ষিত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন এই জ্ঞানতাপসদের বুদ্ধি ও রসবোধকে পরিতৃপ্ত করেছিল, এবং এই তৃপ্তিই ছিল তাদের এই নূতন সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। হেস্টিংসের মনোভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার প্রতি আমরা যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয় পাই শ্বেতাঙ্গ শাসকজাতি ও গোঁড়া খ্রীষ্টান সুলভ আত্মশ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস সত্ত্বেও এঁরা সকলেই ছিলেন অল্পবিস্তর তার উত্তরাধিকারী।

ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার যে পরিমণ্ডলটি গড়ে উঠেছিল তার পরিকল্পক ওয়েলেসলী এ বিষয়ে হেস্টিংস-নীতিরই অনুসরণ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, ইউরোপীয় ক্লাসিকাল বিদ্যার অনুরাগী। এই প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক পাঠ

গ্রহণ করে কোম্পানীর সিভিলিয়ানরা ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতবাসীর জীবনচর্যার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির অধিকারী হয়ে উঠবেন এবং সেই সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ শাসননীতিতে প্রতিফলিত হবে এমন প্রত্যাশা তাঁর মনে ছিল। কিন্তু কোম্পানী কর্তৃপক্ষের প্রথম থেকেই দেখা যায় এ বিষয়ে উৎসাহ ও সহানুভূতির অভাব। তাঁদের দৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠান শাসননীতির ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি ভাষাশিক্ষার বিদ্যালয় ব্যতীত আর কিছু ছিল না। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অতি হীন ধারণার পরিপোষক ও ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারতবাসীকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার প্রয়াসী চার্ল্‌স গ্র্যান্টের উদ্যোগে কোম্পানী ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের হাইলেবেরিতে ভারত-প্রবাসের পূর্বে নিজ কর্মচারি-বৃন্দের শিক্ষার জন্য এক কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই কলিকাতায় ফোর্ট্‌ উইলিয়ম কলেজের গুরুত্ব কমতে আরম্ভ করে। পরে বেণ্টিংকের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত পাশ্চাত্যপন্থীদের জয়লাভের ফলে এর অবশিষ্ট প্রভাবটুকুও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়।[২০] শাসন ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে এই অভ্যন্তরীণ মতদ্বন্দ্বের জন্য ফোর্ট্‌ উইলিয়ম কলেজ সংক্রান্ত ওয়েলেস্‌লীর স্বপ্ন সর্বাংশে সফল হতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচ্য-বিদ্যা এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষ গৌরবপূর্ণ। প্রথম যুগে ফোর্ট্‌ উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন কোলব্রুক (সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র) জে. বি. গিলক্রাইস্ট্‌ (হিন্দুস্তানী), এন্‌. বি. এডমনস্টোন্‌, ফ্রান্সিস গ্ল্যাড্‌-উইন (ফার্সীভাষা ও সাহিত্য), জন বেইলি (আরবী, ফার্সী ও মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্র), প্রভৃতি।[২১] এঁদের অনেকেরই চিত্ত প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি হেস্টিংস্‌-ওয়েলেস্‌লী সৃষ্ট নিরপেক্ষ ও সশ্রদ্ধ ঐতিহ্যে লালিত। এই প্রতিষ্ঠানটি অন্যদিকে ছিল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞ সুধীবৃন্দ ও শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কেরী-মার্সম্যান প্রমুখ বহুভাষাবিদ্‌ মনীষিবর্গের মিলিত কর্মক্ষেত্র। সংস্কৃত গ্রন্থাদির সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট্‌ উইলিয়ম কলেজ কাউনসিলের যৌথ উদ্যোগে এক সংস্থা গঠিত হয় এবং এরই ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয় কেরী-মার্সম্যানের রামায়ণের অনুবাদ, কোলব্রুক সম্পাদিত 'অমরকোষ', 'হিতোপদেশ (দণ্ডীর 'দশ-

কুমারচরিত' ও ভর্তৃহরির শতকত্রয়সহ) ইত্যাদি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার আরও অনেক গ্রন্থ। আরবী, ফার্সী, বাঙ্‌লা, হিন্দুস্তানী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষাসমূহে, এমন কি চীনাভাষাতেও ফোর্ট্‌উইলিয়ম কলেজের পক্ষ থেকে যে অতি ব্যাপক ও অনেকাংশে সফল প্রকাশন-কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল, সেটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২২] উইলিয়ম কেরীর তত্ত্বাবধানে এবং ফোর্ট্‌ উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাঙ্‌লা গদ্যরীতির যে উন্নতি সাধিত হয় তা অবশ্য স্বীকৃতিযোগ্য।[২৩] শুধু এইটুকু দুঃখের বিষয়, সরকারী শাসননীতির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে প্রাচবিদ্যা-চর্চার এমন সম্ভাবনাময় কেন্দ্রটি স্থায়ী বা জাতীয় জীবনে অধিকতর প্রভাবশালী হতে পারে নি। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ধানের পরে ভারতে প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের ধারাটি প্রধানত এসিয়াটিক সোসাইটিকে আশ্রয় করেই পুষ্টিলাভ করে।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কর্মসূচীতে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা প্রথমাবধি প্রাধান্য পেলেও এই সংঘের প্রধান আদর্শ ও লক্ষ্য স্বভাবত ছিল ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভারতীয় ও অন্যান্য প্রাচ্যভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ। কেরী-মার্সম্যান-ওয়ার্ড প্রমুখ এই সংস্থাভুক্ত যে সব সুধী প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের এই লক্ষ্য থেকে কখনও চ্যুত হন নি। তাঁদের দ্বারা প্রাচ্যবিদ্যা যে পরিমাণ সমৃদ্ধ হয়েছে সেটুকুকে তাঁদের এই খ্রীষ্টধর্মপ্রচাররূপ মূল উদ্দেশ্যের অঙ্গরূপেই দেখতে হবে। নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টীয় প্রচারক হিসাবে ভারতবাসীর হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করা এঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং তাঁদের এই অশ্রদ্ধা সর্বদা তাঁরা গোপন করেও চলেন নি। হেস্টিংসের ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি সশ্রদ্ধ ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের সঙ্গে এখানেই তাঁদের পার্থক্য। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য উইলিয়ম কেরীর অন্তরে এই প্রসঙ্গে স্ববিরোধ ছিল বলে মনে হয়। তাঁর যেন দুটি সত্তা। এক দিকে দেখা যায় তিনি ইউরোপীয় রেণেশাঁসের আদর্শনিষ্ণাত বহুভাষাবিদ্‌, বিজ্ঞানে কুতূহলী ও ক্লাসিক্‌স-রসিক। ভারতে আগমনের অল্পকাল পরেই মূল সংস্কৃত মহাভারত পাঠ করে ১৭৯৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি কোনও বন্ধুকে লিখছেন, "I have read a considerable part of the 'Mahabharata' an epic poem witten in most beautiful language, and much on a par with Homer.

And were it, like Homer's 'Iliad' only considered as a great work of human genius I should think it one of the finest productions in the world ।"[২৪] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অন্য সময়ে এই উচ্ছ্বাসের কণ্ঠরোধ করেছে তাঁর মিশনারী সত্তা। ১৭ মার্চ ১৮০২ তারিখে লিখিত অপর এক পত্রে তিনি এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হিন্দুধর্ম ও ধর্মসাহিত্যের তীব্র নিন্দা করে লিখছেন, "……the most worthless productions that ever was published. I should think it time lost to translate any of them. An idea, however, of the advantage which the friends of Christianity may obtain by having these mysterious sacred nothings…exposed to view, has induced me, among other things, to write the Sangskrit Grammar, and to begin a dictionary of that language. I sincerely pity the poor people, who are held by the chains of an implicit faith in the grossest of lies ; and can scarcely help despising the wretched infidel who pleads in their favour, and try to vindicate them ।"[২৫] দেখা যাচ্ছে মিশনারী কেরী হিন্দুশাস্ত্রকে মিথ্যা কুসংস্কারের আগার মনে করতেন এবং খ্রীষ্টান দুনিয়ার সামনে এই মিথ্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যেই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধান রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বের ফলে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ-অভিধানকাররূপে তাঁর সাফল্যের তুলনায়, বিশুদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌রূপে তাঁর কীর্তি যথেষ্ট ফলপ্রসূ হতে পারে নি।[২৬] বলা বাহুল্য কেরীর সহযোগী মার্সম্যান এবং ওয়ার্ডের মধ্যেও উক্ত সংকীর্ণ মনোভাবের পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপটিস্ট্ মিশনের পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে এক দল কেরী প্রভৃতির প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার বিরোধী ছিলেন এই যুক্তিতে যে এ সবের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও বাইবেল অনুবাদের মূল কাজটি বিঘ্নিত হচ্ছে।[২৭]

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার বর্ণিত ধারাগুলির মধ্যে প্রেরণা, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীগত সূক্ষ্ম পার্থক্য যতই থাক এই যুগের ইংরেজ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ সমগ্রভাবে একটি মহৎ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। উইলকিন্স্, জোন্‌স, কোলব্রুক, উইলিয়ম কেরী, গিলক্রাইস্ট্, গ্ল্যাড্‌উইন, বেইলি প্রমুখ পণ্ডিতগণ কেবল যত্নপূর্বক সংস্কৃত, ফার্সী,

বাঙ্‌লা, হিন্দুস্তানী, মারাঠী প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার ধারক-বাহক প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাই করেন নি, তাঁরা এই সকল অনুশীলনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক, বিচারশীল আধুনিক প্রণালীর প্রবর্তন করে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চাকে ক্রমশ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অবিরাম চেষ্টিত থেকেছেন। মুখ্যত এঁদেরই সাধনায় আধুনিকালের ভারতচর্চা শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়েছিল। দেশীয় পণ্ডিত ও মুন্‌শীদের সাহায্যে ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের চর্চা করলেও তাঁরা অর্জিত বিদ্যার প্রতি প্রয়োগ করেছিলেন ইউরোপীয় রেনেশাঁস প্রসূত বিষয়মুখী বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গী।

পাশ্চাত্য সারস্বতসমাজ যখন এই ভাবে আধুনিক প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ভিত্তিস্থাপনে উদ্যোগী, তখন এ পথে আর এক নিভৃত পদসঞ্চরণের ধ্বনি শোনা যায়; আর এক মহৎ জিজ্ঞাসা ও সাধনা একই সময়ে অগ্রসর হয়েছিল একই দুর্গম যাত্রায়; এ দেশের মাটিতে উদ্ভূত, নিঃসঙ্গ ও তৎকালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই তপস্যার লক্ষ্য ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত-সংস্কৃতির স্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করা এবং নবযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে নূতন করে তার মূল্য যাচাই করা। এই একক যাত্রী রামমোহন। তাঁর জ্ঞান-সাধনার প্রথম পর্বে তিনি ইংরেজি শেখেন নি; তাঁর আরবী-ফার্সী-সংস্কৃত অধ্যয়ন দেশীয় পদ্ধতিতে মাদ্রাসা-চতুষ্পাঠীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক গবেষণাদি এ-সময়ে তাঁকে সাহায্য করে নি। তাই প্রাচ্যবিদ্যায় তাঁর প্রাথমিক অভিজ্ঞতার জগৎটি দেশীয় পণ্ডিত ও মৌলভীদের পরিমণ্ডল থেকে বস্তুত অভিন্ন। কিন্তু শেষোক্ত যাঁদের মধ্যে সে-যুগে চিরাচরিত পদ্ধতিতে সংস্কৃত-আরবী-ফার্সীর চর্চা অব্যাহত ছিল—তাঁদের কাছে পাঠ গ্রহণ করলেও প্রথম থেকেই তাঁদের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। যৌবনে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করবার পর তিনি ভারতীয় বিদ্যার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিচারশীল দৃষ্টি ও আলোচনাপদ্ধতি নিজস্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অনেকাংশে তাকে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই, কেননা তিনি নিজেও ছিলেন নবযুগের নূতন বিশ্ববীক্ষা ও জীবনজিজ্ঞাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু প্রাচ্য সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ভারত-গবেষকগণের মনোভাবের

সঙ্গেও তাঁর সর্বাংশে মিল ছিল না। এই জন্যই প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের ক্ষেত্রে রামমোহনের আসন সমকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজদ্বয়ের মধ্যবর্তী—এর কোনটির সঙ্গেই তাঁকে সম্পূর্ণ একাত্ম করে দেখা চলে না। উভয় পক্ষকেই তিনি শ্রদ্ধা করেছেন, এবং তার একাধিক নিদর্শনও আছে। পাশ্চাত্য ভারত-গবেষকগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করতে চলেছি। তার পূর্বে এখানে দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ ধারণার দু'একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। 'ব্রাহ্মণ-সেবধি'র প্রথম সংখ্যার (১৮২১) ভূমিকায় খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণকে সম্বোধন করে রামমোহন বলছেন, "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে।"[২৮] লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত শিক্ষাবিষয়ক তাঁর সুপরিচিত পত্রখানিতেও তিনি পম্পরাগত সংস্কৃত বিদ্যা সংরক্ষণের জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক পরিচালিত তৎকালীন চতুষ্পাঠীগুলিকে সরকারী সাহায্যদানের প্রস্তাব করেছেন।[২৯] তবে মাদ্রাসা-চতুষ্পাঠীতে গতানুগতিক পদ্ধতিতে অর্জিত বিদ্যাকে স্থলবিশেষে আধুনিক পাশ্চাত্য বিচারশীল পদ্ধতি দ্বারা শোধন করে নেওয়ার প্রয়োজন এবং হিতকারিতাও তাঁকে স্বীকার করে নিতে দেখা যায়। প্রাচীন হিন্দু আইন অনুসারে নারীজাতির সম্পত্তিতে অধিকার সংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থে প্রসঙ্গত তিনি মন্তব্য করেছেন: "At the time of the decennial settlement in the year 1793, there were among European gentlemen so very few acquainted with Sanskrit and Hindu law that it would have been hardly possible to have formed a committee of European oriental scholars and learned Brahmans capable of deciding on points of Hindu law. It was therefore, highly judicious in Government to appoint Pandits in the differnt Zillah Courts of Appeal, to facilitate the proceedings of Judges in regard to such subjects. But as we can now fortunately find many European gentlemen capable of investigating

legal questions with but little assistance from learned Natives, how happy would it be for the Hindu community, both male and female, were they to enjoy the benefits of the opinion of such gentlemen, when disputes arise, particularly on matters of inheritance."।[৩০] এখানে দেশীয় পণ্ডিতদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া অপেক্ষা আধুনিক দৃষ্টি সম্পন্ন সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয়ের সাহায্যকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করা হয়েছে। এই মনোভাবের আরও স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ১৮৩১ সালে ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত তাঁর Some Remarks in vindication of the Resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the Practice of Female Sacrifices in India শীর্ষক পুস্তিকায়, যেখানে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে তিনি বলছেন: "If we look further into the consequenecs arising from the successful exertions of European Orientalists, in translating Sanskırt works in various branches of literature into the English language, we find that the public is no longer entirely at the mercy of the Brahmans in the interpretation of the Hindoo law and Religious doctrine"।[৩০ক] সুতরাং পাশ্চাত্য ভারত-জিজ্ঞাসুগণের গবেষণার প্রতি রামমোহনের চিত্ত যে সপ্রশংস ও অনুকূল ছিল সে-সম্পর্কে প্রমাণের অভাব নেই। এই স্বীকৃতি জানাতে পেরে রামমোহন তৃপ্ত ও আনন্দিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই; কেন না লোকভাষায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রচাররূপ 'গুরুতর অপরাধ'এর জন্য তাঁকে তীব্র অশালীন বিদ্রূপ করে চলেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ প্রতিপক্ষীয় রক্ষণশীল পণ্ডিতবর্গ।[৩০খ] রামমোহন ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-সকলেই লোক-ভাষায় ব্রহ্মবিদ্যা ও অন্যান্য প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করেছেন। এমন কি উইলিয়ম কেরীকে ঈশোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ করবার কাজে তাঁর অন্যতম সহায়কও ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। উইলিয়ম জোন্স্, কোলব্রুক প্রভৃতিও প্রয়োজনমত দেশীয় পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করতেন। রামমোহনকে লোক-ভাষায় শাস্ত্রপ্রচারের জন্য গালাগালি করলেও শ্বেতাঙ্গ মনিবগণকে একই যুক্তিতে

তিরস্কার করবার নৈতিক সাহস মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখ দেশীয় পণ্ডিতবর্গের ছিল না। এই 'ম্লেচ্ছ'দের শাস্ত্রানুবাদে সাহায্য করবার বিনিময়ে অর্থোপার্জনেও তাঁরা ছিলেন দ্বিধাহীন।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভারতীয় শাস্ত্রানুসন্ধান সম্পর্কে রামমোহন আগ্রহী হলেও ভারতের অতীতপ্রসঙ্গে প্রতীচ্য বুধমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিকোণের যে পার্থক্য ছিল সেটুকু এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। পরিণত বয়সে অর্জিত ইংরেজিজ্ঞানের সাহায্যে রামমোহন যখন ইউরোপীয় জ্ঞানরাজ্যের সন্ধান পেলেন তার পূর্বেই বিস্তীর্ণ অধ্যয়ন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতির ক্লাসিকাল ও লৌকিক উভয় ধারার সঙ্গেই তাঁর গভীর পরিচয় ঘটেছে ও প্রাচ্য চিন্তাধারা তার জীবন-দর্শনের ভিত্তিভূমি নির্মিত হয়ে গেছে। যে তীক্ষ্ণ বিচারশীলতা আগাগোড়া রামমোহনের মানসপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তা তিনি সর্বপ্রথম আহরণ করেন ইসলামীয় তর্কশাস্ত্র থেকে। তাঁর সম্বন্ধে ব্লোয়ার বিশপ আবে গ্রেগোয়ার লিখেছিলেন, রামমোহন "prepared himself for his polemical career from the Logic of the Arabians which he regards as superior to every other।"[৩১] 'তুহ্ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন'-এর প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় যে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে।[৩২] এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ এবং বিচারমূলক দৃষ্টিও সুনিশ্চিত ভাবেই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল কিন্তু তা মূল প্রেরণা রূপে নয়, পরিপূরক রূপে। পরিণত বয়সে যখন পাশ্চাত্য বিদ্যার দ্বার তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়, তখন প্রাচ্য চিন্তাধারা ও জীবন-দর্শনের অভিজ্ঞ ও যোগ্য প্রতিনিধিরূপেই তিনি ইউরোপীয় মনন-জগতে প্রবেশ করেছিলেন। জীবনের এই পর্ব থেকে ধীরে ধীরে ভারত-বিশেষজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে থাকে, যেহেতু অনেক স্থলে তাঁদের জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল অভিন্ন। এঁদের কারও কারও সঙ্গে রামমোহনের ব্যক্তিগত পরিচয় এবং আলোচনার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদানও হয়েছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ভারত-গবেষণাকে তিনি অকুণ্ঠ-ভাবে স্বাগতও জানিয়েছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য ভারত-জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাদের কাছে এ চর্চা ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনেরই অঙ্গ, সম্পূর্ণ বুদ্ধি ও বিচাররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; সেখানে যেটুকু শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়

তা সম্পূর্ণ বিচারশাসিত, তার উৎসমূল মস্তিষ্ক। রামমোহনের বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা তাঁর ভারত-জিজ্ঞাসাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধির জগতে আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। বিচারবুদ্ধিকে কখনও বিসর্জন না দিয়েও তিনি ভারত-সংস্কৃতিকে নিজের জীবনচর্যার অঙ্গরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্য মাত্র বিচার-বিশ্লেষণের বস্তু নয়,—এ এক মহৎ উত্তরাধিকার ; নূতন যুগোপযোগী ব্যাখ্যার দ্বারা জাতীয় জীবনে এর নব-রূপায়নের প্রয়োজন আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত-সংস্কৃতির প্রাণবস্তুর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রামমোহনের রচনায় যে এক দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও স্থানে স্থানে একটি গর্ববোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, একথা প্রথম অধ্যায়ে দৃষ্টান্ত সহকারে সবিস্তারে বলা হয়েছে।[৩৩] রামমোহন পণ্ডিত হলেও এবং তাঁর নানা শাস্ত্রবিষয়ক রচনাবলী অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক গবেষণাকে সাহায্য করলেও, সেগুলি চরিত্রত গবেষণাকর্ম নয়। ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞগণের সঙ্গে তাঁর জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র বহু সময়েই এক ; কিন্তু সে জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ভিন্ন। পরম্পরাগত ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে তাকে মার্জিত ও পরিশীলিত করে বর্তমানের অধঃপতিত জাতি ও সমাজকে আত্মসচেতন ও রূপান্তরিত করাই তাঁর প্রাচ্য-শাস্ত্রচর্চার উদ্দেশ্য। এক কথায় তাঁর পাণ্ডিত্য মাত্র বুদ্ধিবিলাস নয়, তার আধার হল সম্পূর্ণ মানবজীবন। এই কারণে তাঁর এই গোত্রভুক্ত রচনাগুলিতে পাণ্ডিত্য ও মননের গভীরতার সঙ্গে পূর্ববর্ণিত যে হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করা যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচনায় সাধারণত তা নেই।

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তদানীন্তন বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার পূর্বকথিত তিনটি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত পণ্ডিতবর্গের অনেকের সঙ্গেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকের মধ্যে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল। আনুমানিক ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওহাহিদিন' প্রকাশিত হবার পর থেকে আরবী-ফার্সী ভাষাদ্বয়ে ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি বিদ্বৎসমাজের, বিশেষত মুসলিম আলিমমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৩৪] ১২ অক্টোবর ১৮০৯ তারিখে লর্ড মিণ্টোকে লিখিত রামমোহনের পত্র ও ১৮১০ সালের ৩১ জানুয়ারী 'বোর্ড্ অব্ রেভিনিউ'কে লিখিত জন ডিগ্‌বীর পত্র থেকে খবর পাওয়া যায়, তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান কাজী

(কাজী-উল্-কাজ্জাৎ) এবং ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের ফার্সী বিভাগের মুখ্য মুন্শী ও উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের অন্যান্য মুখ্য পদাধিকারিগণ (other principal officers) রামমোহনের চরিত্র, শিক্ষা ও যোগ্যতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।[৩৫] শেষোক্তদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক একাধারে সংস্কৃত, ফার্সী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্লা ভাষায় কৃতবিদ্য সুপ্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ্ হেন্‌রী টমাস কোলব্রুক ও তত্রস্থ হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক, অধিকন্তু ফার্সী ও সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন, জন বর্থ্উইক গিল্‌ক্রাইস্ট। কোলব্রুক ছিলেন সে-যুগের বিদেশী সংস্কৃতজ্ঞগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব্যসাচী। প্রাচীন হিন্দুগণের বেদ, ব্যাকরণ, ব্যবহারশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, বিভিন্ন দর্শন, কাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁকে অমর করে রেখেছে। তিনি ও রামমোহন ছিলেন একে অপরের গুণমুগ্ধ। এঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে যথাস্থানে কিছু বিস্তারিত ভাবে বলতে হবে এবং এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে সে-কথা আসবে। 'A Dictionary of English and Hindoostanee' (দুই ভাগে সম্পূর্ণ, কলিকাতা ১৭৮৭-৯০), A Grammar of the Hindoostanee Language (কলিকাতা ১৭৯৬), The Hindee Story-Teller, A Collection of Dialogues, English and Hindoostanee (কলিকাতা, ১৮০৪), A New Theory and Prospectus of the Persian Verbs (লণ্ডন, ১৮৩১) প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ও The Hindee Moral Preceptor (কলিকাতা ১৮০৩) ও The Oriental Fabulist (কলিকাতা ১৮০৩) শীর্ষক দেশীয় পণ্ডিতগণ রচিত গ্রন্থদ্বয়ের সম্পাদক গিল্‌ক্রাইস্ট্ ছিলেন সে-যুগে ভারতস্থ কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে হিন্দুস্তানী (বা উর্দু) ভাষা ও সাহিত্যে সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ১৮০৪ সাল পর্যন্ত ইনি ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। অনুমান করা যায়—এই সময়ের মধ্যে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। ফার্সী-সংস্কৃত-হিন্দী-উর্দুতে রামমোহনের অসামান্য ব্যুৎপত্তি যে এই ঘনিষ্ঠতার সূত্র এবিষয়ে সন্দেহ নেই। রামমোহন গিল্‌ক্রাইস্টের রচনাবলীর অনুরাগী ছিলেন এবং উত্তরজীবনে গিল্‌ক্রাইস্ট যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক লণ্ডনে হিন্দুস্তানীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত তখন তাঁদের পত্রবিনিময় হত।

১৮২৬ সালের ২১ জুন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কোম্পানীর প্রোপাইয়েটরবর্গের এক সভায় গিল্‌ক্রাইস্টকে রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে দেখা যায়।[৩৬] এমন মনে করবারও কারণ আছে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্‌ মিশনের প্রাণপুরুষ সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় সুপণ্ডিত উইলিয়ম কেরীর সঙ্গেও তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে ফোর্ট্‌ উইলিয়ম কলেজেরই মাধ্যমে,[৩৭] কেন না ১৮০১ সাল থেকেই কেরী সেখানে সংস্কৃত ও বাঙ্‌লার শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন ও ১৮০৭ সালে তিনি অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন।[৩৮] কেরী ও তাঁর শ্রীরামপুরের সহযোগী মিশনারীবৃন্দের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা পরবর্তী-কালে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি ঘটে উভয়পক্ষের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক সুদীর্ঘ বিতর্কে। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিতর্কের যেটুকু প্রাসঙ্গিকতা আছে তা যথাস্থানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য। রামমোহন ও ডিগ্‌বীর পূর্বোল্লিখিত পত্রদ্বয়ের সাক্ষ্য অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট্‌ ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কর্মচারীদের আরও অনেকের সঙ্গেই রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু সে-সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ফোর্ট্‌ উইলিয়ম কলেজের গৌরবের যুগে নিজ পাণ্ডিত্য ও মনীষার জন্য তিনি যে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকমহলে সুপরিচিত ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ফোর্ট্‌ উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্‌ মিশনের সঙ্গে যুক্ত প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞগণের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও এদেশে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার অপেক্ষাকৃত পুরাতন কেন্দ্র এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের কোনও প্রমাণ নেই। আপাতদৃষ্টিতে একে এক রহস্য মনে হতে পারে, কেননা, ফোর্ট্‌ উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সেই আমলে এসিয়াটিক সোসাইটির যোগাযোগ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ এবং শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী ও প্রাচ্যতত্ত্ব-বিদ্‌ মহলের প্রায় একই ব্যক্তিবর্গ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সোসাইটির সভ্যপদ ভারতীয়গণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। তার পরেও পূর্ণ এক বৎসর কাল রামমোহন কলিকাতায় বাস করেছেন এবং সমকালীন ভারতীয়গণের মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্যখ্যাতি তখন তুঙ্গে। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ দেওয়া হয়নি। এই রহস্যের সমাধান সম্ভব; সে-প্রসঙ্গ যথাস্থানে।

সুপ্রীম কোর্ট্‌ ও ফোর্ট্‌ উইলিয়ম কলেজের মুসলিম বিদ্বন্মণ্ডলীর সঙ্গে

রামমোহনের যোগাযোগের একটি চিত্তাকর্ষক পরিণতি এখানে উল্লেখ্য। রামমোহনের 'তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন' তার প্রখর যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির জন্য ধর্মক্ষেত্রে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আক্রোশের কারণ হয়ে ওঠে। জরথুষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে 'তুহফাৎ'এর বক্তব্যকে তীব্র আক্রমণ করে একটি রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। এটি পাওয়া যায় না, কিন্তু এর উত্তর বা 'জবাব'স্বরূপ মুদ্রিত 'তুহফাৎ'এর পক্ষ অবলম্বন করে লিখিত 'জবাব-ই তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন' নামক এক ক্ষুদ্র বেনামী ফার্সী পুস্তিকা বর্তমান রয়েছে যার প্রকাশকাল অনুমান করা হয় ১৮২০। কারও কারও মতে এই পুস্তিকার লেখক স্বয়ং রামমোহন। কিন্তু এটির অনুবাদ-প্রসঙ্গে এর আভ্যন্তর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে বর্তমান লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রামমোহন এর লেখক হতে পারেন না, লেখক খুব সম্ভবত রামমোহনের কোনও ঘনিষ্ঠ মুসলমান বন্ধু। যদি এই অনুমান সত্য হয়—তাহলে এমন সিদ্ধান্ত করা বোধ করি অসঙ্গত হবেনা, কলিকাতার পূর্বকথিত মুসলিম বিদ্বৎ-গোষ্ঠীভুক্ত রামমোহনের কোনও অন্তরঙ্গ এ কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। চতুর্থ পরিশিষ্টে বিষয়টির সম্পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন উইলিয়ম কেরী ও তাঁর সহযোগিবৃন্দের সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, এমন কথা মনে করবার কারণ আছে। পরবর্তী দশ-বার বৎসরে এই যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশনের পাদ্রীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আবশ্যকীয় মনে করতেন। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতিতে রামমোহনের ব্যুৎপত্তি এবং তাঁর খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক অনুসন্ধিৎসা তাঁকে স্বভাবত এঁদের প্রতি আকৃষ্ট করে। আমরা দেখতে পাই ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনারী মহলে পণ্ডিত ও মনীষী রূপে রামমোহনের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত। এঁদের মধ্যে স্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ রেভাঃ উইলিয়ম ইয়েট্সের মতে রামমোহন "is one of the most learned men in Sanskrit and Arabic in Calcutta"।[৩৩] অন্যত্র ইয়েট্স রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের বিবরণ প্রসঙ্গে আগস্ট ১৮১৬ তারিখের এক পত্রে লিখছেন, "When I first knew him

he would talk only of metaphysical subjects such as the eternity of matter, the nature and qualities of evidence etc. but he has lately become much more humble, and disposed to converse about the Gospel," ।[৪০] শ্রীরামপুর মিশনের ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে রামমোহন সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে সেখানেও একধারে প্রাচ্যভাষাবিশারদ ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী মনীষীরূপেই তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে : "Rama-Mohana-Raya, a very rich Rahree Brahmun of Calcutta is a respectable Sanskrit scholar and so well-versed in Persian that he is called Mouluvee Rama-Mohana-Raya : he also writes English with correctness and reads with ease English mathematical and metaphysical works" ।[৪১] সে-সময়ে রামমোহন এঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য শ্রীরামপুর যাতায়াত করতেন, এবং উইলিয়ম কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টাস কেরীকে এক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য একখণ্ড জমিও তিনি দান করেছিলেন ।[৪২] এই এই অন্তরঙ্গতা শেষ পর্যন্ত পরিণত হল বাদানুবাদে যখন ১৮২০ সালে রামমোহন প্রকাশ করলেন যীশুর উপদেশ-সংকলন The Precepts of Jesus, the Guide to peace and Happiness । রামমোহন এর কিছুকাল পূর্ব হতেই খ্রীষ্টধর্মের তাৎপর্য সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে নিবিষ্টচিত্তে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রানুশীলন শুরু করেছিলেন ।[৪৩] প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের ত্রিতত্ত্ববাদ যীশুর ঈশ্বরত্ব ও তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, যীশুকর্তৃক সর্বমানবের পাপভার গ্রহণ ও তার জন্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে যুক্তিগ্রাহ্য মনে না হওয়াতে তিনি উক্ত তত্ত্বসমূহকে বর্জন করে সর্বসাধারণের জন্য যীশুর নিজমুখের অমূল্য নীতি-উপদেশগুলির এই সংগ্রহটি নিজব্যয়ে প্রকাশ করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যাপটিস্ট্‌দের মনঃপূত হয়নি, খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বভাগকে বাদ দিয়ে যীশুর নীতি-উপদেশগুলির স্বতন্ত্রীকরণ তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের অবমাননা গণ্য করলেন; তাঁদের মুখপত্র Friend of Indiaতে রামমোহনের গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হল। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে ডঃ মার্সম্যান রামমোহনকে "an intelligent Heathen"—এই সুমধুর সম্বোধনে অভিহিত করেন। এইখান থেকেই সেই দীর্ঘ বিতর্কের শুরু যে উপলক্ষে রামমোহনকে আত্মপক্ষ সমর্থন

করে An Appeal to the Christian Public (১৮২০), Second Appeal to the Christian Public (১৮২১) এবং Final Appeal to the Christian Public (১৮২৩) শীর্ষক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করতে হয়েছিল।[৫৪] এই বিতর্ক প্রসঙ্গে রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও মনীষা প্রাচ্যবিদ্যার এমন একটি ক্ষেত্রে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় যেখানে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে আজ পর্যন্ত তিনি অনন্য হয়ে আছেন এবং যে বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ প্রতিযোগী ভারতবর্ষের সমকালীন ইউরোপীয় মহলেও খুঁজে পাওয়া যায় না। বিষয়টি হল মুখ্যত হিব্রু ও গ্রীক ভাষাদ্বয়ের আধারে রক্ষিত মূল ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্মশাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব এবং ইতিহাসে তার অভিব্যক্তি। এই বিষয়ক অনুশীলনকে প্রাচ্য বিদ্যা আখ্যা দিতে আমাদের সংকুচিত হবার কোনও কারণ নেই। আদৌ ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মদ্বয়ের উদ্ভব প্রাচ্যভূমিতেই, যদিও তাদের ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্র কালক্রমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য জগতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের সংজ্ঞা যদি সংকীর্ণ অর্থে 'ভারত-গবেষণা'তে সীমিত না রেখে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করা যায় তাহলে এগুলির মূল-তত্ত্বানুসন্ধানের উদ্যম অনেকটা তার কোঠাতেই পড়বে। এর জন্য রামমোহনকে হিব্রু, গ্রীক, লাটিন ও সিরিয়াক ভাষায় কার্যকর জ্ঞান আহরণ করতে হয়েছিল। উক্ত ভাষাগুলির মধ্যে হিব্রুই তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল সর্বাধিক, এবং জীবনের শেষ পর্বেও হিব্রুর চর্চা তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ইংলণ্ডগমনে একই জাহাজে সহযাত্রী জে. সি. সাদারল্যাণ্ডের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় রামমোহন জাহাজে দিনের অধিকাংশ সময় সংস্কৃত এবং হিব্রু গ্রন্থাদি পাঠ করে কাটাতেন।[৫৫] সমসাময়িক সূত্রে শোনা যায়, জনৈক সুপণ্ডিত ইহুদী শিক্ষকের নিকট ছয় মাসের মধ্যে তিনি হিব্রুভাষা আয়ত্ত করেন।[৫৫ক] হিব্রুতে অধিকার অর্জন তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল, কেননা তিনি ছিলেন আরবীতে ব্যুৎপন্ন এবং সেমিটিক গোত্রভুক্ত এই দুই ভাষার পরস্পর-সম্বন্ধ অতি নিকট। Second Appeal গ্রন্থে একস্থলে ভাষাদ্বয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে তিনি আরবীকে বলেছেন 'refined Hebrew'।[৫৬] 'Final Appeal' গ্রন্থটি পাঠ করলে দেখা যায় জন পার্কহার্স্টের হিব্রু অভিধান[৫৬ক] ছিল তাঁর নিত্যসহচর। উল্লিখিত অন্যান্য ভাষাগুলিতে, তাঁর দখল ছিল অপেক্ষাকৃত সীমিত, ঐগুলিতে

লেখা ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মদ্বয়ের প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ এবং টীকাভাষ্য পাঠ করবার পক্ষে উপযোগী। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার The Times পত্রিকার সম্পাদক ম. দা'কোস্তা রামমোহনের জীবনীর যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তদনুযায়ী রামমোহনের লাটিন শিক্ষক ছিলেন প্রিচার্ড্ (Pritchard) নামক জনৈক ইংরেজ স্কুলশিক্ষক।[৩৮খ] দুর্ভাগ্যবশত তাঁর গ্রীক-শিক্ষকের নাম জানা যায় না। বাইবেলের প্রাচীন ভাগ (Old Testament) মূল হিব্রুতে তিনি স্বচ্ছন্দে পাঠ করেছিলেন; এবং সেই সঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব যুগে 'সেপ্ট্যুয়াজান্ত্' (Septuagint) নামক এই গ্রন্থের গ্রীকে যে অনুবাদ হয়েছিল গ্রীক ভাষার মাধ্যমে তার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। বাইবেলের নবীনভাগ (New Testament) তিনি মূল গ্রীকে অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত বাইবেলের ইংরেজি সংস্করণ প্রধানত দুটি,—রাজা প্রথম জেম্সের রাজত্বে প্রকাশিত প্রামাণিক ইংরেজি অনুবাদ (Authorised Version), এবং ইংরেজ ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক রেভাঃ টমাস বেল্শাম সম্পাদিত Improved Version of the New Testament (১৮০৮)। ইহুদী স্মৃতিশাস্ত্র 'তালমুদ' (Talmud) রামমোহন ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন বলে মনে হয়। হিলেল (Hillel), ওন্কেলস্ (Onkelos), জোনাথন (Jonathan) প্রভৃতি প্রাচীন ইহুদী শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ও শাস্ত্রানুবাদক-(শাস্ত্রের 'তর্জুম্' নামক অংশের প্রণেতা)গণের মূল রচনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং সে-সব আকরগ্রন্থ থেকে তাঁকে বার বার উদ্ধৃতি দিতে দেখি। এই সূত্রে জোনাথন প্রণীত 'তর্জুম' (Targum)-এর সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত যে দুর্লভ সংস্করণটি তিনি ব্যবহার করেছেন তা হল The Targum of Jonathan, the original Hebrew Text, together with the Septuagint, Syriac and Arabic translations each accompanied with a Latin interpretation (published by Thomas Roycroft. London 1656)।[৪৬গ] এই ভাবে নিজের প্রয়োজনমত প্রতিক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি ইহুদী এবং খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র পাঠ করেছেন; "Second Appeal' ও 'Final Appeal' গ্রন্থদ্বয়ে-এর অসংখ্য নিদর্শন ছড়ানো আছে।[৩৭] খ্রীষ্টধর্মসংঘের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট অগ্রসর, এবং এই বিষয়ে যে গ্রন্থখানির তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সেটি হল মোশেইম রচিত

Ecclesiastical History।[৪৮] এই প্রসঙ্গে না হলেও ডঃ টাইট্লারের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত আর এক বিতর্কে (১৮২৩) তাঁকে ব্যঙ্গচ্ছলে গিবনের Decline and Fall of the Roman Empire-এর উল্লেখ করতে দেখা যায়।[৪৮ক] গ্রন্থখানি তাঁর অধীত ছিল এবং গিবনকৃত খ্রীষ্টধর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকার সমালোচনা এক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিকে প্রভাবিত করেছিল, একথা সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া বাইবেলের একালের যে সকল টীকাকার ও ব্যাখ্যাতার উল্লেখ তিনি করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিশপ মিড্লটন যাঁর Doctrine of the Greek Article applied to the Criticism and Illustration of the New Testament (প্রকাশ, লণ্ডন, ১৮০৮) তিনি ভাল করেই পড়েছিলেন;[৪৯] গ্রীস্‌বাখ (Griesbach);[৫০] মিখায়েলিস (Michaelis);[৫১] নিউকোম (Newcome);[৫২] ব্রাউন (Brown);[৫৩] জোন্স্ (Jones);[৫৪] জন লক্ (John Locke);[৫৫] সার্ল (Serle) এবং তাঁর গ্রন্থ 'Horae Solitariae;[৫৬] প্রিড্যুক্স্ (Prideaux) ও তৎপ্রণীত গ্রন্থ 'Connection';[৫৭] লিণ্ড্সে (Lindsey) ও তৎপ্রণীত গ্রন্থ Sequel to the Apology;[৫৮] ডঃ ক্যাম্পবেল (Campbell) ও তৎকৃত 'গসপেল'চতুষ্টয়ের অনুবাদ;[৫৯] সলোমন হার্শেল (Solomon Hirschell) ও তৎসম্পাদিত ইহুদী প্রার্থনাপুস্তক (হিব্রু) এবং জাস্টিন্‌স (Justins), বার্নেট (Barnet) ও জোসেফ Joseph)-কৃত তার ইংরেজি অনুবাদ;[৬০] ডড্রিজ (Doddridge;[৬১] হুইটবি (Whitby);[৬২] শ্লিউস্‌নের (Schleusner) ও তৎকৃত Lexicon on the New Testament;[৬৩] ডঃ ওয়েন (Owen);[৬৪] রাফেলিউস (Raphelius);[৬৫] এবং জেম্‌স ম্যাক্‌নাইট (James Macknight)।[৬৬]

এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা থেকে ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র এবং তৎসক্রান্ত প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমোহনের অধ্যয়নের বিষয় ও পরিধি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়। রামমোহনের যুগ ও পরিবেশ বিবেচনা করলে এতে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের ত্রিতত্ত্ববাদ (Trinitarianism) তথা যীশুর ঈশ্বরত্ব (deity), সর্বমানবের পাপের জন্য যীশুর প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান (atonement), যীশু সম্পাদিত তথাকথিত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ (miracles), প্রমুখ মত ও বিশ্বাস তিনি অনায়াসে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে

খণ্ডন করেছেন। ইহুদী শাস্ত্র, ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট থেকে ডঃ মার্সম্যান কর্তৃক ত্রিতত্ত্ববাদ নিষ্কাশন করবার প্রচেষ্টাকে Second Appeal গ্রন্থে নিরাকরণ করতে তাঁকে মোটেই বেগ পেতে হয় নি।[৬৭] 'নিউ টেস্টামেণ্ট' বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে Second Appeal ও Final Appeal গ্রন্থদ্বয়ে গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পঙ্‌ক্তি বিচারের মাধ্যমে অর্থসঙ্গতি স্থাপনের (historical exegesis) আশ্চর্য ক্ষমতা। Independent and Non-Conformist পত্রিকার সম্পাদক (১৮৯০-৯২) রেভাঃ এফ. হারবার্ট্ স্টেড্ যিনি শ্রীমতী কলেটকৃত অসম্পূর্ণ রামমোহন-জীবনী সম্পূর্ণ করেছেন, এ-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "the methods of exposition of the Hindu are more modern than those of his Christian opponent......the acquaintance which he shows with Hebrew and Greek and with expository literature is considering his antecedents little less than marvellous।"[৬৮] সাম্প্রতিক একজন অ্যামেরিকান গবেষকের সমালোচনাতেও প্রায় একই সুর শোনা যায় :..."It was Rammohun's use of biblical critical principles, rather in advance of his time and unusual for the context in which he was living, which brought a keen use of rational technique to his work।"[৬৯] রামমোহনের খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের পঙ্‌ক্তিবিচার ও অর্থসঙ্গতি নির্ণয়পদ্ধতির সঙ্গে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমকালীন একতত্ত্ববাদী (Unitarian) খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতদের গবেষণা-পদ্ধতির কিছু সাদৃশ্য আছে। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা ১৮১৮ সাল থেকে ইংলণ্ডের ও ১৮২১ থেকে আমেরিকার ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল।[৭০]

কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে তিনজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদের কীর্তির প্রতি রামমোহন বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তাঁরা হলেন সার উইলিয়ম জোন্স্, হেন্‌রী টমাস কোলব্রুক ও হোরেস হেম্যান উইলসন। এঁদের মধ্যে জোন্স্‌কে ব্যক্তিগতভাবে জানবার সুযোগ তাঁর হয়নি ধরে নেওয়া চলে, কেননা তিনি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জোন্সের মৃত্যু হয়। নিজ রচনার কয়েক স্থলে তিনি জোন্সের গবেষণার সাহায্য নিয়েছেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত A Translation into English of a Sunskrit Tract inculcating the Divine Worship পুস্তিকার উপসংহারে তিনি জোন্স্ কৃত গায়ত্রীমন্ত্রের ইংরেজি অনুবাদটি যথেষ্ট প্রশংসা সহকারে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন ও এই সূত্রে জোন্সের পাণ্ডিত্য ও মনীষার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।[৭১] Essay on the Rights of the Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal (প্রকাশিত ১৮৩০) গ্রন্থে তিনি জোন্স্‌কৃত মনুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রয়োজনমত ব্যবহার করেছেন এবং ভূমিকায় এই অনুবাদের নিকট কৃতজ্ঞতার সহিত ঋণ স্বীকার করেছেন। ১৮৩১ সালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত সতীদাহবিরোধী পুস্তিকা Some Remarks in Vindication of the Resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the Practice of Female Sacrifices in India গ্রন্থের ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম অনুচ্ছেদেও জোন্সের উক্ত অনুবাদ ও তৎসংক্রান্ত মন্তব্য শ্রদ্ধার সহিত উদ্ধৃত।[৭২] অপিচ লক্ষণীয় পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভূমিকাস্বরূপ লিখিত Preliminary Remarks—Brief Sketch of the Ancient and Modern Boundaries and History of India (১৮৩২) অংশে তিনি জোন্স্‌কৃত মনু, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদ কুল্লূকভট্টের টীকার সাহায্যে সংশোধন করতে দ্বিধা করেন নি। শ্লোকটি এই :

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥

এক্ষেত্রে জোন্সের ইংরেজি অনুবাদ: "As far as the eastern and as far as the western oceans, between the two mountains just mentioned, lies the tract which the wise have named Aryavarta।" রামমোহন লক্ষ্য করেছেন, এতে শ্লোকার্থ পরিষ্কার হয়নি। টীকাকার কুল্লূক মূল শ্লোকের "তয়োরেবান্তরং গির্য্যোঃ' অংশটিকে স্পষ্ট করবার উদ্দেশ্যে 'এব' 'স্থলে 'চ' প্রয়োগ করে ব্যাখ্যা করেছেন 'হিমবদ্বিন্ধ্যয়োশ্চ যন্মধ্যম্'। রামমোহন জোন্সের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: In his translation of this passage Sir William Jones by omitting

to refer to the commentary, which substitutes the copulative 'cha' for 'eba' has thus translated the passage·· ·· This rendered the passage obscure if not wholly unintelligble। তিনি স্বয়ং যে সংশোধিত অনুবাদ দিয়েছেন তা এই : The lands lying as far as the eastern and as far as the western oceans and between the mountains just mentioned (Himalaya and Vindhya) are known to the wise by the name of Aryavarta।[৭৩] সন্দেহ নেই এই অনুবাদ অপেক্ষাকৃত মূলানুগ ও স্পষ্ট। এর থেকে প্রমাণ হয় প্রাচীন গ্রন্থপাঠে রামমোহন অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শী, এবং পাশ্চাত্য গবেষণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও তিনি তার অন্ধ অনুসারী নন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অভিনেত্রী ফ্যানি কেম্ব্‌লের সঙ্গে রামোহনের আলাপ ও অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল এবং শ্রীমতী কেম্বলকে ভারতীয় নাট্যরচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ তিনি উইলিয়ম জোন্স্‌ কৃত কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌'এর ইংরাজি অনুবাদ উপহার পাঠিয়েছিলেন; এর পূর্বে শ্রীমতী কেম্বলের নিকট থেকে তিনি পেয়েছিলেন শেক্‌সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস'-শেক্‌সপীয়ারের নাটকাবলীর মধ্যে যা তখন পর্যন্ত রামমোহনের অপঠিত ছিল।[৭৪] প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে জোন্সের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব সম্ভবত ইন্দো-ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত ভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ঘোষণা। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে : "The *Sanscrit* Language whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the *Greek*, more copious than the *Latin* and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar than could possibly have been produced by accident; so strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source which perhaps no longer exists····"।[৭৫] জোন্সের এই ভাষণ সংস্কৃত ভাষার মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিশ্বের পণ্ডিত সমাজকে সচেতন করে ও সংস্কৃত সাহিত্য ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বচর্চায় নূতন পথের

ইঙ্গিত দেয়। রামমোহনের সংস্কৃতচর্চা অগ্রসর হয়েছিল দেশীয় ধারায়, যে পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন ; কিন্তু তবুও জোন্সের উক্তির প্রেরণা তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। এর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় সংস্কৃত ভাষা সংক্রান্ত তাঁর দুটি উক্তিতে। ডঃ টাইট্‌লারের সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলছেন: "...thanks to the Goddess of Wisdom we have still a philosophical and copious language of our own, which distinguishes us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners.।"[৭৬] অন্যত্র তিনি সংস্কৃতকে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন: "one of the purest and most regularly formed languages in the world।"[৭৭] সংস্কৃত সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতে এই আত্মসচেতন মনোভাব সেদিন কোনও দেশীয় পণ্ডিতে সম্ভব ছিল না। এ দৃষ্টি আধুনিক,-এটি জ্ঞানরাজ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন একদল পাশ্চাত্য জিজ্ঞাসু, উইলিয়ম জোন্‌স যাঁদের অগ্রণী।

কোলব্রুকের সঙ্গে রামমোহনের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল এবং তাঁদের যোগাযোগ ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই স্থাপিত হয়েছিল, এমন অনুমানের পক্ষে যুক্তি আছে সে কথা পূর্বেই বলেছি। এই সম্পর্ক রামমোহন আমৃত্যু বজায় রেখেছিলেন। সে-যুগে ভারত-গবেষকগণের মধ্যে কোলব্রুককে নির্বিবাদে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। এই ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য কেবল যে সর্বতোমুখী তা নয়, অধিকন্তু তাঁর বহুবিস্তীর্ণ গবেষণা প্রায় সর্বত্র রোমাণ্টিক কল্পনামুক্ত এক বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর, বিচারশীল মনের স্পর্শে সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ। এই কারণে প্রথম যুগের ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে তাঁকেই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভারত-গবেষণার ভিত্তি-ভূমিনির্মাতা গণ্য করা যায়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'এসিয়াটিক রিসার্চেস্' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বেদ'সম্পর্কে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধ উত্তরকালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বৈদিক গবেষণার পথিকৃত।[৭৮] কিন্তু কোলব্রুকের গবেষণার সিংহভাগের বিষয়বস্তু বেদোত্তর ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র। দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর তত্ত্বানুসন্ধান ও কৃতকর্মের মাহাত্ম্যকে যথার্থ স্বীকৃতি দিয়েও একথা বলতে হবে যে হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক গবেষণাতেই কোলব্রুকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা

সম্ভবত তুঙ্গ স্পর্শ করেছিল। উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে বিভিন্ন পণ্ডিতের সহায়তায় পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সংকলিত হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রের 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' শীর্ষক বিরাট সংস্কৃত নিবন্ধগ্রন্থের 'A Digest of Hindu Law on Contracts and Successions with a Commentary by Jagannath Tarkapanchanan' নামক চার খণ্ডে সম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ (১৭৯৮) এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেন জীমূতবাহন কৃত সুবিখ্যাত দায়ভাগ গ্রন্থের ও বিজ্ঞানেশ্বর কৃত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির সুপ্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা টীকার 'দায়' অংশের ইংরেজি অনুবাদ। বস্তুত কোলব্রুকের এই সটীক ও সমন্তব্য সুনিপুণ অনুবাদগুলি হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রকে আধুনিককালে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে এতদূর সাহায্য করেছে যে ম্যাক্সম্যূলের তাঁকে legislator of India আখ্যা দিয়েছেন।[৭১] ১৮০৭ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন; ইংলণ্ড প্রত্যাগমনের পর নিজের চেষ্টায় ও সমমর্মী বন্ধুবর্গের সহযোগিতায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে স্থাপন করেন Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland যা ক্রমশ হয়ে দাঁড়ায় ইংলণ্ডে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। মৃত্যুকাল (১৮৩৭) পর্যন্ত কোলব্রুক এই সংস্থার Director বা অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমসাময়িক পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদ্‌গণের মধ্যে কোলব্রুকের প্রতিই রামমোহনের শ্রদ্ধা ছিল সর্বাধিক এবং ভিন্ন ক্ষেত্রে কোলব্রুকের গবেষণাসমূহের মধ্যে তাঁর হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক কাজকেই তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মনে করতেন। তাঁর নিজস্ব হিন্দু আইনসংক্রান্ত Essay on the Rights of the Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal (১৮৩০) ও ইংলণ্ডে প্রকাশিত Some Remarks in Vindication of the Resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the Practice of Female Sacrifices in India (১৮৩১) শীর্ষক গ্রন্থ দু'খানিতে তিনি যত্নসহকারে কোলব্রুকের দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার ইংরেজি অনুবাদ ব্যবহার করেছেন—যদিও কুত্রাপি সংস্কৃত-মূলকে অবজ্ঞা করেন নি। কিন্তু এখানেও লক্ষণীয় প্রথম গ্রন্থখানির পরিশিষ্টে তিনি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতির দুটি টীকার

সাহায্য নিয়ে কোলব্রুককৃত দায়ভাগের অনুবাদে ব্যক্ত অনুবাদকের একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন।[৮০] কোলব্রুকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তিনি সর্বত্র অন্ধভাবে তাঁর অনুবাদের উপর নির্ভরশীল নন। কোলব্রুকের প্রতি রামমোহনকে প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা যায় লণ্ডনে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির দশম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে। ১১ মে ১৮৩৩ অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এদিন উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কোলব্রুককে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাবটি তিনিই উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে সে-অধিবেশনের বিবরণে যা পাওয়া যায় তা এই: The Raja Rammohun Roy in rising to propose the vote of thanks to Henry Thomas Colebrooke Esqr, director of the Society, said that he could not allow himself to do so without stating his high opinion of Mr. Colebrooke's talents and character; he might indeed say, that he never knew any person who stood higher in his estimation than that venerable gentleman. It had long been the opinion of learned Hindus, the raja observed, that it was impossible for Europeans to acquire a profound and accurate knowledge of the Sanskrit language and it was Mr. Colebrooke's translations of the *Dāyabhāga* and the *Mitācsharā*, the two most esteemed commentaries on Hindu law of inheritance, which first convinced him of the contrary and proved to him that it was possible for Europeans to acquire a knowledge of Sanscrit equally comprehensive and correct with that of the natives of India......the raja remarked, his [Colebrook's] works will live after him and he will leave behind him a reputation which will last for ages'।[৮১] কোলব্রুকের প্রতিভার যে মূল্যায়ন রামমোহন এখানে করেছেন, তার যাথার্থ্য আজ প্রায় দেড়শ বছর পরেও কেউ অস্বীকার করবেন না।

এই সূত্রে আর একটি তথ্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মে তারিখে রামমোহন লণ্ডনে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির দশম বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে, কেন না একমাত্র একজন সদস্যই অধিবেশনে কোনও প্রস্তাব তুলবার অধিকারী। সূত্রটি অবলম্বন করে বর্তমান লেখক লণ্ডনস্থ রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির দফ্‌তরে অনুসন্ধান করেন, কোন সময় থেকে রামমোহন এই সারস্বত সংস্থার সভ্য মনোনীত হন। প্রশ্নের উত্তরে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়েছেন, রামমোহন ১৮২৪ সাল থেকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সোসাইটির সহকারী সম্পাদিকা শ্রীমতী জিল ডেভিস ১৭ মে, ১৯৭৪ তারিখে বর্তমান লেখককে যে পত্র লেখেন তার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হল: "Roy became a non-resident member of the Society in 1824 and continued as such until 1830. In 1832 and 1833, he is listed as a member. Unfortunately I cannot find the member's list for 1831; I assume that as he came to England then, he probably changed his membership from non-resident to ordinary membership in 1831.।" দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ডে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৎসর থেকেই (১৮২৪) রামমোহনকে তার বিদেশী (non-resident) সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ইংলণ্ডে উপনীত হবার পর তিনি স্বভাবত সাধারণ সদস্যরূপে গৃহীত হয়েছিলেন। সুতরাং ১৮২৪ থেকে ১৮৩৩ পর্যন্ত রামমোহনকে আমরা রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরূপে দেখতে পাচ্ছি। রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও মনীষার প্রতি কোলব্রুক ও ইংলণ্ডে এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় তাঁর সহযোগিবর্গের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাই তাঁদের এই ভারতীয় মনীষীকে সভ্যপদে বরণ করে নিতে প্রণোদিত করেছিল সন্দেহ নেই। এর কিছু পরোক্ষ প্রমাণও আছে, যথাস্থানে তা উপস্থিত করা হবে। যতদূর জানা যায় রামমোহনই প্রথম ভারতবাসী যিনি এই সম্মান লাভ করেন।[৮২] প্রসঙ্গত বলে রাখা উচিত শ্রীমতী ডেভিসের পত্রানুসারে সোসাইটির ১৮৩১ সালের সভ্যতালিকা খুঁজে না পাওয়া গেলেও রামমোহন যে সে-বছরেও উক্ত সংস্থার সভ্যপদে ছিলেন তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে লণ্ডনে

চার্লস্ উইলিয়ম উইনকে লিখিত তাঁর ১৬ এপ্রিল. ১৮৩২ তারিখের পত্র থেকে যেখানে রামমোহন উল্লেখ করেছেন, বিগত বৎসরে (১৮৩১) অনুষ্ঠিত রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির ভোজসভায় তিনি প্রথম মিঃ উইনের সঙ্গে পরিচিত হন।[৮৩]

সমকালীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অপর যাঁর সঙ্গে রামমোহনের এক কালে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তিনি হোরেস হেম্যান উইলসন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিকিৎসক হয়ে প্রথম উইলসন ভারতে আসেন ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং উত্তর কালে কলিকাতা মিণ্টের 'ডেপুটি এসে-মাস্টার' পদ লাভ করেন। দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর ভারতে বাস করে উইলসন পূর্বসূরী উইলকিন্স্, জোনস্, কোলব্রুক প্রভৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করেন ও ক্রমশ সংস্কৃত সাহিত্যের নানা শাখায় স্বকীয় গবেষণা দ্বারা ভারততত্ত্বজ্ঞরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। দীর্ঘকাল তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৩২ সালে তিনি অক্স্‌ফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রথম বোডেন অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৩৬এ ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারিকপদে যোগ দেন। ইংলণ্ডে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল (১৮২৩) থেকেই উইলসন তার সভ্য ছিলেন ও ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কোলব্রুকের মৃত্যুর পর তিনি ঐ সংস্থার Director বা অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছিলেন। কলিকাতায় সরকারী মহলে শিক্ষাবিদ্‌রূপেও উইলসনের প্রতিষ্ঠা ছিল। ১৮২৩ সালে স্থাপিত General Committee of Public Instructon-এর তিনি ছিলেন সম্পাদক এবং এই সূত্রে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের পরিচালন ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। উইলসনের গবেষণা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বৈদিক ও বেদোত্তর ক্লাসিক্যাল—দুটি পর্বেই সম্প্রসারিত, যদিও একথা স্বীকার্য ক্লাসিক্যাল পর্বের প্রতি তাঁর আসক্তি ও প্রবণতা ছিল সমধিক। তিনি সংস্কৃত কাব্যনাটকের রীতিসঙ্গত আলোচনা করেন, পুরাণসাহিত্যের অনুবাদে (বিষ্ণুপুরাণ) ও বিশ্লেষণে (বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্ম ও পদ্ম পুরাণগুলির) মনোযোগী হন কহ্লনকৃত 'রাজতরঙ্গিণী' অবলম্বন করে কাশ্মীরের ইতিহাস বর্ণনা করেন, কোনও কোনও হিন্দু দর্শনপ্রস্থানের অনুবাদ ও হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়গুলির বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং ভারতীয় ক্ষোদিত লিপি ও

মুদ্রারও চর্চা করেন। বৈদিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কাজ সায়নের ভাষ্য অবলম্বনে তিন খণ্ডে ঋগ্বেদসংহিতার ইংরেজি অনুবাদ। উইলসনের সংস্কৃতবিদ্যায় কোলব্রুকের গভীরতা ও বিচারশীলতা না থাকলেও ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। অনুশীলনের অপরাপর ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে উইলসনের আগ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তাঁকে রামমোহনের ঘনিষ্ট করে তুলেছিল।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলসনের বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রানুবাদের কাজে রামমোহন এই অভিধানখানি ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। একথা তিনি শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করেছেন, ঈশোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায়, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের পরিশিষ্টে এবং ২৯ সেপ্‌টেম্বর ১৮১৯ তারিখে উইলসনকে লিখিত এক পত্রে।[৮৪] প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের নানা শাখার মধ্যে রামমোহনের সর্বপ্রধান আলোচ্যবস্তু ছিল ব্রাহ্মণ্য দর্শন, বিশেষত বেদান্তশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয়-উপনিষদ্‌ গীতা ও ব্রহ্মসূত্র। তৃতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে দেখানো হয়েছে, জোন্স, কোলব্রুক ও কেরীর দু'একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা বাদ দিলে সুচিন্তিত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে উপনিষদের আলোচনায় তিনি আধুনিক কালে সমগ্র বিশ্বে অগ্রগামী,—এবং ব্রহ্মসূত্রচর্চায় তো তাঁর কালে অদ্বিতীয়। তাই সঙ্গত কারণেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী রামমোহনকে বেদান্ত-শাস্ত্রে তাঁর সময়কার সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিতরূপে মেনে নিয়েছিলেন। উইলসনও এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নন। তাঁর সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের ভূমিকায় অদ্বৈত-দর্শনের শ্রেষ্ট প্রবক্তা শংকরাচার্যের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে তাঁকে দু'বার রামমোহনের নিকট ঋণ স্বীকার করতে দেখা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি বলছেন: Dr. Taylor thinks that if we allow him about 9 [?] 00 years we shall not be far from the truth, and Mr. Colebrooke is inclined to give him an antiquity of about 1000 years; this last is the age which my friend Rammohun Roy, a diligent student of S´ancara's works and philosophical teacher of his doctrines, is disposed to concur in and he infers that "from a calculation of the spiritual generations of the

followers of S´ancara Swami from his time up to this date, he seems to have lived between the seventh and eighth centuries" ।[৮৫] অন্যত্র শংকর কর্তৃক তথাকথিত বৌদ্ধ-নির্যাতনের কাহিনী প্রসঙ্গে উইলসন এই বিষয়ে নিজজ্ঞানের অল্পতা ও রামমোহনের পাণ্ডিত্য স্বীকার করে বলছেন : "Although the popular belief attributes the origin of the *Bauddha* persecution to S´ancara Acharya yet in this case we have some reason to distrust its accuracy; opposed to it we have the mild character of the reformer who is described as uniformly gentle and tolerant, and speaking from my own limited reading in Vedanti works and more satisfactory testimony of Rammohun Roy, which he permits me to adduce, it does not appear that any trace of his being instrumental to any persecution, are to be found in his own writings... ।[৮৬] এই উক্তিগুলিই প্রমাণ করছে শংকর প্রসঙ্গে রামমোহনের সিদ্ধান্তকে উইলসন কত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিছুকাল পূর্বে ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত উইলসনের কাগজপত্রের মধ্যে তাঁকে লেখা রামমোহনের দু'খানি পত্র বর্তমান লেখকের আবিষ্কার করবার সৌভাগ্য হয়। আলোচ্য বিষয়ের উপর পত্রদ্বয় কিছু আলোকপাত করে। ৯ আগস্ট ১৮১৯ তারিখের পত্রে দেখা যাচ্ছে, রামমোহন উইলসনকে আশ্বাস দিচ্ছেন, শীঘ্রই শংকরাচার্যের কাল সম্পর্কে নূতন উপাদানের সাহায্যে উইলসনের সন্দেহভঞ্জন করতে পারবেন বলে তিনি মনে করছেন। উইলসনের অপর দুই প্রশ্নের উত্তরে তিনি ব্রহ্মসূত্র-শংকরভাষ্যে ব্যবহৃত 'জৈন' ও 'অর্হৎ' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ কোথায় আছে তার পত্রাংক ও পঙ্‌ক্তি নির্দেশ করে দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য শংকরভাষ্যের যে সংস্করণ নির্দিষ্ট হয়েছে সেটি রামমোহন কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রথম সংস্করণ। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ তারিখে লিখিত দ্বিতীয় পত্রে শংকরাচার্যের কালনির্ণয়ের প্রশ্নটির কিছু বিস্তারিত বিচার আছে। রামমোহন এখানে বলছেন গুরুপরম্পরার ভিত্তিতে বৎসর গণনাই এই সমস্যা পূরণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়; শংকরাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্যগণের পরম্পরার যে দুটি তালিকা সে-সময়ে তাঁর হাতে ছিল—তা পরস্পর-বিরোধী

সুতরাং নির্ভরের অযোগ্য ; কাশীতে তাঁর এক বন্ধুর সংগ্রহ থেকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য আচার্যতালিকা উইলসনকে শীঘ্রই আনিয়ে দেবেন এমন আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, সাম্প্রতিক কালে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের কালক্রম বিচারের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় আচার্যপরম্পরা ও পৌরাণিক রাজপরম্পরার সাক্ষ্য অল্পবিস্তর সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন এফ. ই. পার্জিটার (Ancient Indian Historical Tradition, London 1922), সীতানাথ প্রধান (Chronology of Ancient India, Calcutta 1924), হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (Political History of Ancient India, 1st. ed. Calcutta 1923), অনন্ত সদাশিব অলটেকর (Presidential Address, Archaic Section, Third Session of the Indian History Congress, Proceedings, Calcutta, 1939 pp. 33-77) প্রমুখ কয়েকজন বিচারশীল পণ্ডিত। আচার্য শংকরের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে রামমোহনকৃত তাঁর শিষ্যপরম্পরার তুলনামূলক যুক্তিনিষ্ঠ বিচারে এই প্রণালী আভাসিত। এটুকুও মনে রাখতে হবে উইলসন রামমোহনের নিকট হতে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুসরণ করে শংকরের আবির্ভাবকাল স্থির করেছিলেন ৭৮৮-৮২০ খ্রীষ্টাব্দ। এপর্যন্ত পণ্ডিতমহলে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তই স্বীকৃত। কোলব্রুকও এই প্রসঙ্গে রামমোহনকে স্মরণ করেছেন: The most distinguished scholiast of these sutras [Brahmasutras] in modern estimation is the celebrated S´ancara Acharya the founder of a sect among the Hindus which is yet the most prevalent. I have had a former occasion of discussing the antiquity of the eminent person ; and the subject has been since examined by Rāma Mohen Rāya and by Mr. Wilson।"[৮৮]

প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত মনীষীরূপে রামমোহনের খ্যাতি সেকালে মাত্র ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডেই সীমিত থাকেনি, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও পৌঁছেছিল। তার কিছু সমকালীন সাক্ষ্য সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সামনে আছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহনের Translation of an Abridgment of the Vedant ('বেদান্তসার'এর ইংরেজি অনুবাদ)

জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে ১৮১৭ সালে Auflosung des Wedant নামে জেনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[৮৯] প্রাচ্যশাস্ত্রবিদ রূপে ইউরোপখণ্ডে রামমোহনের পরিচিতির এখানে সূত্রপাত। ইংলণ্ডে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার এক বছর আগে (১৮২২) ফ্রান্সের রাজধানী পারিতে প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের অনুরূপ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্' (Socie´te´ Asiatique)। এই সংস্থার সমকালীন কার্যবিবরণে দেখা যায়, এর ৭ জুন ১৮২৪ তারিখের অধিবেশনে ইসলামশাস্ত্রবিদ্ বার্ঁ দ্য সাসি ও ল্যা কোঁৎ দওত্যারিভ রামমোহনকে সংস্থার সম্মানিত বিদেশী সদস্য (associé correspondant) মনোনীত করবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। প্রস্তাবটি নিয়ে সভায় আলোচনা হবার পর রামমোহনের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা আছে কি না এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য তৎকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ্, L'Introduction a l'histoire de Bouddhisme Indien শীর্ষক গ্রন্থের লেখক, ভাগবত পুরাণের ফরাসী অনুবাদক, বৈদিক ও জরথুশ্ত্রীয় ভাষা সাহিত্যে পারঙ্গম উ্যঝ্যান বুর্নুফ, ককেসাস অঞ্চলের ভূগোল, ভাষাতত্ত্ব ও সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, 'মাগজাঁ আসিয়াতিক্' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও Asia Polyglotta(১৮২৩)-এর লেখক হাইনরিষ্ জুলিয়ুস্ ক্লাপরোট ও ম. ল্যাঁজুয়ানে কর্তৃক গঠিত এক বিচারকমণ্ডলী (commission) নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী ৫ জুলাইএর অধিবেশনে বিচারকসমিতির পক্ষ থেকে ক্লাপরোট এ বিষয়ে সমিতির অভিমত জ্ঞাপন করেন। সমিতি একবাক্যে রামমোহনকে 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর সম্মানিত সদস্যপদ লাভের যোগ্য ঘোষণা করেন এবং রামমোহনকে ঐ পদে মনোনীত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্'এর জুলাই ১৮২৪ সংখ্যায় সংবাদটি এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিল: 'বৈদেশিক সদস্যপদের জন্য প্রস্তাবিত পণ্ডিত রামমোহন রায়ের বিদ্যাবত্তাবিষয়ক যোগ্যতা সম্পর্কে বিচারকমণ্ডলীর পক্ষে ম. ক্লাপরোট এক বিবরণ পেশ করেন। ঐ বিবরণে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল সেগুলি অধ্যক্ষসভার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হয় এবং রামমোহন রায়কে বৈদেশিক সদস্য উপাধিতে ভূষিত করা হয় (M. Klaproth au nom d'une commission fait un rapport sur les titres litteraires du Pandit Rammohun Roy presente´ pour etre associe´ corres-

pondant. Les conclusions de ce rapport sont soumises a la de´liberation du consiel, et le titre d' associé correspondant est de´cerne´ a Rammohun Ray).[২০] সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮২৪ সালটি রামমোহনের প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ রূপে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৎসর তিনি ইংলণ্ডের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন এবং ফ্রান্সের 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক'এরও সম্মানিত বিদেশী সদস্য পদ লাভ করেন। কিন্তু ফ্রান্সে রামমোহনের এই সংবর্ধনার ইতিহাস জানতে হলে আমাদের আরও পিছনে তাকাতে হবে। সে দেশে রামমোহনের পাণ্ডিত্যখ্যাতি বিস্তারের শুরু উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ থেকে। সর্বপ্রথম ১৮১৯ সালে পারির 'ক্রোণিক রেলিজিউজ্' নামক সাময়িকপত্রে আবে গ্রেগোয়ার সংকলিত রামমোহনের জীবন, গ্রন্থাবলী ও সম্প্রদায় সংক্রান্ত এক দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।[২০ক] অতঃপর 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক' শীর্ষক অপর এক ফরাসী সাময়িকপত্রের ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সপ্তম খণ্ডে রামমোহন রচিত আটখানি গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত হতে দেখা যায়। তারপর দেখতে পাই 'জুর্নাল এ্যাসিয়াতিক্'এর আগস্ট ১৮২৩ সংখ্যায় রামমোহন রচিত একাদিক্রমে চোদ্দখানি গ্রন্থের এক তালিকা মুদ্রিত হয়েছে। ঐ পত্রিকার পরবর্তী অক্টোবর ১৮২৩ সংখ্যায় ম. ল্যাঁজুয়ানে 'Observations sur quelques Ouvrages de Rammohun Roy' (রামমোহন রায় রচিত কতিপয় গ্রন্থের আলোচনা) শীর্ষক এক বিস্তারিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[২০খ] 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর সদস্য ম. ল্যাঁজুয়ানের এই রচনা রামমোহন সম্পর্কে ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতসমাজের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে এবং তাঁরা সে বিষয়ে যথারীতি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এরই ফলশ্রুতি তিন সদস্য বিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলী গঠন ও রামমোহনকে 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'এর সম্মানিত বিদেশী সদস্য পদে মনোনয়ন। ম. ল্যাঁজুয়ানের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ যখন রচিত হয় তখন পাশ্চাত্য জগতে চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ সবেমাত্র ভারতীয় দর্শন, বিশেষত উপনিষদ্-বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত উপনিষদ বা ব্রহ্মসূত্রের কোনও প্রামাণিক সংস্করণ বা অনুবাদ (জোন্স, কোলব্রুক, কেরী বা ইউরোপখণ্ডে অথমার ফ্রাঙ্ক[২১] প্রভৃতির উপনিষদ্ অনুবাদের দু'একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া) পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হয়নি। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে

সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকোহ্ কিছু কিছু হিন্দু সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতের সহযোগিতায় 'সিরুর-উল-আকবর' বা 'সিরুর-উল-আস্রার নামে বাহান্নখানি উপনিষদের এক ফার্সী গদ্যানুবাদ সংকলন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী পণ্ডিত ও সাধক আঁক্যতিল্ দ্যু পেরোঁ এই ফার্সী সংস্করণের 'উপনেখত' (Oupanek'hat) শীর্ষক এক লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ল্যাঁজুয়ানের প্রবন্ধ পাঠে মনে হয় রামমোহন রায় কর্তৃক উপনিষদের সংস্করণ ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার পূর্বে ত্রুটিপূর্ণ এই লাটিন সংস্করণখানিই ভারত-জিজ্ঞাসু ফরাসী সুধীসমাজের প্রায় একমাত্র অবলম্বন ছিল। লেখক প্রায় প্রতিপদে দ্যু পেরোঁর অনুবাদের সঙ্গে রামমোহনের অনুবাদের তুলনা করে চলেছেন। এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে দেখা যায়, ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ অবলম্বন করায় সমকালীন ফরাসী পণ্ডিতগণের উপনিষদ ও সাধারণ ভাবে ভারতীয় দর্শন সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে নানা ভুলভ্রান্তি ছিল। রামমোহনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন উপনিষদ অনুবাদ ও বেদান্তদর্শনের আলোচনা ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের যথার্থ পরিচয় পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত করে ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের এই সব ভুলত্রুটি সংশোধনে সহায়ক হয়েছিল এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করেছিল সন্দেহ নেই। শাস্ত্রালোচনার অন্যতম আধুনিক পথিকৃৎরূপেই তিনি ফরাসী বিদ্বৎসমাজের ও বিদ্বৎসভার স্বীকৃতি লাভ করেন। রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও মনীষা সম্পর্কে ফরাসী বুধমণ্ডলীর যে সশ্রদ্ধ মনোভাব 'সোসিয়েতে আসিয়তিক্'-এর সম্মানিত বিদেশী সদস্যরূপে তাঁর নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত, তার আর একটি সমকালীন পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে পূর্বোক্ত 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্' পত্রের ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখ্যায়; এখানে ম. পথিয়ে নামক এক পুরাতত্ত্ববিশারদ রামমোহনের Translation of Several Principal Books, Passages and Texts of the Veds and of some controversial works on brahmanical theology (প্রকাশিত, লণ্ডন, ১৮৩২) গ্রন্থখানির উপর এক সুদীর্ঘ সমালোচনা-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[২২] তা ছাড়া অন্ততপক্ষে আরও দুজন সমসাময়িক ফরাসী প্রাচ্য-তত্ত্বজ্ঞের কীর্তি সম্পর্কে যে রামমোহনের প্রগাঢ় কৌতূহল এবং এঁদের একজনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সে বিষয়ে সুনিশ্চিত প্রমাণ আছে।

শেষোক্ত জন হলেন আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিত ও ইসলামবিশেষজ্ঞ ম. গার্সঁ্যা দ্য তাসী। এঁর সঙ্গে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে পারিতে রামমোহনের সাক্ষাৎ হয় এবং তার পূর্ব হতেই দুজনের মধ্যে ইংরেজি ও হিন্দুস্থানী ভাষায় পত্র-বিনিময় চলত একথা দ্য তাসী স্বয়ং উল্লেখ করেছেন ফরাসী ভাষায় রচিত তাঁর সুবিখ্যাত হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে।[২৩] ইসলামী সংস্কৃতিতে ও হিন্দী-উর্দু ভাষায় বিশেষজ্ঞ দ্য তাসীর সঙ্গে ইসলামের মর্মজ্ঞ রামমোহনের ঘনিষ্ঠতার কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। লক্ষ্য করবার বিষয় উল্লিখিত গ্রন্থে দ্য তাসী রামমোহন সম্পর্কে যে বিবরণ রেখে গিয়েছেন সেখানে রামমোহনকে তাঁর সমকালীন ইংরেজ বন্ধু ও অনুরাগীদের একাংশের মত খ্রীষ্টান প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা নেই। তাঁর দৃষ্টিতে রামমোহনের ধর্মমতের অসাম্প্রদায়িকত্ব ও সার্বভৌমত্ব নির্ভুল ভাবেই ধরা পড়েছিল। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ করে সূফী মরমীয়াদের সঙ্গে রামমোহনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন একথাও প্রণিধানযোগ্য। সম্ভবত রামমোহন ও দ্য তাসীর মধ্যে পত্র-মাধ্যমে ইসলাম ও সূফীদর্শন সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকবে, কেন না দ্য তাসী ছিলেন ইসলাম-বিশেষজ্ঞ এবং সূফীসম্প্রদায়ের প্রতি রামমোহনের অকৃত্রিম অনুরাগ ও ফার্সী সূফীসাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সুবিদিত। দুঃখের বিষয় একখানি ভিন্ন এই পত্রনিচয় আজও অনাবিষ্কৃত। এর মধ্য থেকে দ্য তাসী তাঁকে ইংলণ্ড থেকে লেখা রামমোহনের ১ আগস্ট, ১৮৩১ তারিখের একখানি পত্র উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী বা উর্দু রচনাশৈলীর নিদর্শন হিসাবে তাঁর হিন্দুস্তানী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের স্বতন্ত্র প্রকাশিত পরিশিষ্টে মুদ্রিত করেছেন।[২৪] এই পত্রে সূফীধর্ম প্রসঙ্গ নেই, কিন্তু এখানে একটি অতিরিক্ত সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ইংলণ্ডে পৌছাবার অল্পদিনের মধ্যেই রামমোহন ফ্রান্সে গিয়ে দ্য তাসীর মধ্যস্থতায় সুবিখ্যাত ফরাসী মনীষী ও সংস্কৃতজ্ঞ আঁতোয়ান লেওনার্ দ্য শেজির সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী ছিলেন। শেজি ছিলেন ইউরোপখণ্ডে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ, ফ্রান্সের রাজকীয় বিদ্যালয়ে (Collège Royal de France) সংস্কৃতের সর্বপ্রথম অধ্যাপক। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের সংস্করণ ও ফরাসী অনুবাদ এবং অমরুশতকের ফরাসী অনুবাদ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কীর্তি। শেজির প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খবর রামমোহন রাখতেন এবং স্বভাবত তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্য উৎসুক হয়েছিলেন।

কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল কিনা সন্দেহ। কেন না ফ্রান্সে তিনি শেষ পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন অতি অল্পদিনের জন্য ১৮৩২ সালের শেষ ভাগে। ঐ সালেই শেজির মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দ্য তাসীকে লিখিত উল্লিখিত পত্রখানি রামমোহন প্রেরণ করেছিলেন ফার্সী ও হিন্দুস্তানী ভাষায় তৎকালীন সুপরিচিত ইংরেজ পণ্ডিত ডান্‌কান ফর্ব্‌সের মাধ্যমে। এঁর সঙ্গে দ্য তাসী ও রামমোহন উভয়েরই ঘনিষ্টতা ছিল। ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞ-মণ্ডলীর সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগের বিষয়টি সানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে প্রথম পরিশিষ্টে।

প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞরূপে ফ্রান্স ছাড়া ইউরোপখণ্ডের অন্যত্রও যে রামমোহনের খ্যাতি প্রসারিত হয়েছিল সে বিষয়েও দু'একটি প্রমাণ আছে। তাঁর Abridgment of the Vedanta-এর জার্মান সংস্করণে (প্রকাশ জেনা, ১৮১৭) অনুবাদকের যে বিশেষ ভূমিকাটি সংযোজিত হয়েছে সেটির কিয়দংশের ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গত উদ্ধার করা গেল : This very novel treatise is by Rammohun Roy, a learned Brahmin who understands English to such an extent that he was in a position to write in that language......No further explanation is necessary to show how much more genuine this Indian presentation written for Europe, must be than anything having been made known on the subject by Europeans, of the religion of a country which has gained the first place in the most universal and deep contemplation of world and of God।"[৩৫] তা ছাড়া লণ্ডন থেকে ১৮৩২ সালে প্রকাশিত রামমোহনের পূর্বোল্লিখিত Translation of Several Principal Books, Passages and Texts of the Veds শীর্ষক গ্রন্থাবলীর এক সমালোচনা প্রকাশ করেন গিল্ড্‌মীস্টের ১৮৪৭ সালে বন থেকে প্রকাশিত তাঁর Bibliothecae Sanskritae sive recensus librorum Sanskritorum hucusque typis vel lapide exscriptorum critici specimen শীর্ষক গ্রন্থে।[৩৬] রামমোহনের উক্ত গ্রন্থখানির রূর্ডা ফান এনসিঙ্গা কৃত ওলন্দাজ অনুবাদ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কাম্পেন থেকে। অনুবাদক এই

সংস্করণে যে মন্তব্য সংযোজন করেছেন ইংরেজিতে তা এই : I consider the translation of this work necessary and even a duty, because it does not only serve for the diffusion of the still so much imperfect knowledge about the Hindus in general, but also for the promotion of the extension of Chritsianity in particular ; because the missionary or clergyman will be in a position to dispute with success the various systems of the Brahmins, and also to make a favourable use of their good and exalted writings.।"[১৭] লক্ষ্য করবার বিষয় উদ্ধৃত মন্তব্যদ্বয়ের দ্বিতীয়টিতে মুখ্যত ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেখকের আগ্রহ স্পষ্ট হয়ে উঠলেও তদানীন্তন ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞগণের আলোচনার তুলনায় রামমোহনের শাস্ত্রানুবাদ ও শাস্ত্রব্যাখ্যা যে ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা ও দর্শনের প্রকৃত পরিচয় বহন করে এই চেতনা দুই লেখকের মধ্যেই বর্তমান।

প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতগণের গবেষণামূলক গ্রন্থাদি ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে পাশ্চাত্য লেখকগণের রচনাও রামমোহন যত্নপূর্বক অনুশীলন করেছিলেন। পার্লামেণ্টের সিলেক্ট্ কমিটির প্রশ্নোত্তরে তিনি ভারতবর্ষের রাজস্ব ও বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে যে বিবরণ দাখিল করেন, তার ভূমিকায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ভূগোল ও ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যে সব লেখককে তাঁদের গ্রন্থসহ উল্লেখ করেছেন[১৮] তাঁরা হলেন জন ব্রুস ('Annals of the East India Company from their establishment by the Charter of Queen Elizabeth 1600 to the union of the London and the English East India Company 1707-8', 3 Volumes, London 1810) ; ডেভিড ম্যাকফার্সন ('Annals of Commerce, Fisheries and Navigation.... From the earliest Accounts to the Meeting of the Union Parliament in 1801, embodying the essence of Anderson's History of Commerce', Four volumes, 1805) ; সার টমাস রো (মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায় প্রেরিত ব্রিটিশ রাজদূত—'Journal

and Letters'; সম্ভবত রামমোহন ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে চার্চিল কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণটি ব্যবহার করেছিলেন); আলেকসাণ্ডার ডাও ('History of Hindostan'- Three Volumes 1768-72); রবার্ট ওর্ম ('Historical Fragments of the Mogul Empire, of the Morattoes, and of the English Concerns in Indostan from 1659', Second Edition, 1805); সার জন ম্যালকম ('Political History of India from 1784-1823', 1826; 'Memoir of Central India'- Two Volumes, Third Edition, 1832); গুইলম টমাস ফ্রাঁসোয়া রেনাল ('A philosophical and political history of the settlements and trade of Europeans in the East and West Indies—translated from the French by J. Justamond to which is added a set of maps···A new edition with ··corrections and improvements', Edinburgh 1776—5th edition, London 1783); জেম্‌স মিল ('History of British India'; Second Edition, Six Volumes, London 1820)। প্রচলিত অর্থে এঁরা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ নন; কেউ বা ঐতিহাসিক, কেউ বা বিবরণকারমাত্র। কিন্তু সমগ্রদৃষ্টি প্রসূত ভারত-ইতিহাস রচনার উৎকৃষ্টতর কোনও নিদর্শন তখন রামমোহনের সামনে ছিল না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই তালিকার মধ্যে History of Indiaর লেখক সুবিখ্যাত মাউণ্ট্‌স্টুয়ার্ট্‌ এলফিন্‌স্টোনের নাম নেই। কিন্তু এলফিন্‌স্টোনের সঙ্গে রামমোহনের যে পরিচয় ছিল অন্যত্র তার প্রমাণ আছে। ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত এলফিন্‌স্টোনের কাগজপত্রের মধ্যে বর্তমান লেখকের দু'খানি পত্র আবিষ্কার করবার সৌভাগ্য হয়েছে: তার একটি (তারিখ ১৯ মে, ১৮৩৩) রামমোহন কর্তৃক অজ্ঞাতনামা কোনও ব্যক্তিকে লিখিত; অপরটি (তারিখ ১২ অক্টোবর ১৮৩৩) জনৈক জন (?) ষ্ট্যাচি কর্তৃক স্বয়ং এলফিন্‌স্টোনকে লিখিত। দুটি পত্র থেকেই প্রমাণিত হয়, রামমোহন ও এলফিন্‌স্টোন পরস্পরকে ভাল ভাবে জানতেন। পত্র দু'খানি তৃতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। অবশ্য এলফিন্‌স্টোনের সুপরিচিত 'History of India' রামমোহনের মৃত্যুর পর ১৮৪১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'An Account of the Kingdom of Caubul and its dependencies

in Persia, Tartary and India' শীর্ষক গ্রন্থের সঙ্গে রামমোহন সম্ভবত পরিচিত ছিলেন, যদিও উপরিউক্ত তালিকায় তিনি এটির উল্লেখ করেন নি। তাছাড়া ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত পত্রে তাঁকে আলেক্‌সাণ্ডার হ্যামিলটন রচিত 'A New Account of the East Indies' (Two Volumes, 1727, Secod Edition 1744) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিতে দেখা যায়।[৯৯] পাশ্চাত্য ইতিবৃত্তকারদের রচনা তিনি কত যত্নসহকারে অনুশীলন করেছিলেন তার এই জাতীয় বহু নিদর্শন তাঁর গ্রন্থাবলী ও পত্রাবলীতে ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা উচিত সংস্কৃত ও ফার্সীতে ব্যুৎপন্ন হওয়ার দরুণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্য উদ্ধারের কাজে রামমোহনের পক্ষে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য লেখকগণের রচনার উপর নির্ভরশীল হবার প্রয়োজন ছিল না। মূল আকরগ্রন্থগুলির পৃষ্ঠাতেও তিনি আবশ্যকমত অবাধে সঞ্চরণ করতে পারতেন।

দেখা যাচ্ছে তৎকালীন পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে ধর্মবেত্তা ও ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে পরিচিতি ছাড়া প্রাচ্যবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত রূপে রামমোহনের একটি অতিরিক্ত পরিচয় ছিল। এ মহলে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি বলে গণ্য হতেন। এর দু'একটি নিদর্শনের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রশিল্পী শ্রীমতী এস. সি. বেল্‌নস্ লণ্ডন থেকে তাঁর সুবিখ্যাত চিত্রসংগ্রহ গ্রন্থ (album) 'Twenty-four Plates Illustrative of Hindoo and European Manners in Bengal' প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানিতে শিল্পীকর্তৃক সমসাময়িক বাঙালী ও বাঙলার জীবনযাত্রার পাথরে আঁকা পঁচিশখানি (২৪+১) এক রঙ্গা ছবির প্রতিলিপি সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ স্থান পেয়েছে। চিত্রগুলি লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে সুবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সার গ্রেভস চ্যাম্পনে হটন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয় মতামত জানবার জন্য সেই সময়ে লণ্ডনে উপস্থিত রামমোহনকে শিল্পী তাঁর চিত্রসংগ্রহ উপহার দিয়েছিলেন এবং বিনিময়ে পেয়েছিলেন রামমোহনের নিকট হতে সপ্রংশস স্বীকৃতি জ্ঞাপক এক পত্র। চিত্রগ্রন্থখানির ১৮৩২ সালের লণ্ডন সংস্করণে হটন ও রামমোহন উভয়ের বিবৃতিই মুদ্রিত হয়েছিল।[১০০] এই সূত্রে রামমোহনের সঙ্গে হটনের সৌহার্দ্যের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ্য। হটন ছিলেন এককালীন ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের ছাত্র, আরবী, ফার্সী, হিন্দুস্তানী, সংস্কৃত ও বাঙলায় পারঙ্গম, হাইলেবেরী কলেজে সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা ভাষার প্রধান অধ্যাপক (১৮১৯-২৭) 'মনুসংহিতা'র সম্পাদক, Rudiments of Bengali Grammar (১৮২১), Bengali Selections with Translations and a Vocabulary (১৮২২), A Glossary of Bengali and English (১৮২৫), Dictionary Bengali and Sanskrit explained in English (১৮৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা এবং লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অন্যতম। অন্যান্য সমকালীন ইউরোপীয় ভারতজিজ্ঞাসুর মত ইনিও যে রামমোহনের প্রতি আকৃষ্ট হবেন তা মোটেই আশ্চর্য নয়। স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত হটনকে লিখিত রামমোহনের ২৭ আগস্ট ১৮৩৩ তারিখের একখানি পত্র বর্তমান লেখকের সংগ্রহ করবার সৌভাগ্য হয়েছে। সেখানে দেখা যায় রামমোহন হটনের মাধ্যমে তাঁর পূর্বপরিচিত বন্ধু লর্ড মুন্‌স্টারকে স্বরচিত প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিষয়ক একখানি গ্রন্থ (নাম অনুক্ত) উপহার পাঠাচ্ছেন। রামমোহনের এই পত্রখানি তৃতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। এছাড়া রামমোহনের আরও দু'খানি পত্রে দেখা যায়, আলেক্‌সাণ্ডারের ভারত-অভিযান কালে ভারতবাসীর ধর্মবিশ্বাস কি ছিল, এই বিষয়ে তিনি একটি "অনূদিত নিবন্ধ" (translation) তাঁর বন্ধুদের পাঠাচ্ছেন। প্রথম পত্রখানি ২২ আগস্ট ১৮৩৩ তারিখে লণ্ডন থেকে মিঃ উডফোর্ড্‌কে লেখা; দ্বিতীয়খানির (তারিখ ২৫ আগস্ট ১৮৩৩) উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অজ্ঞাতনামা।[১০১] দ্বিতীয় পত্রে 'পুরাতত্ত্ব' সম্পর্কে রামমোহনের আগ্রহ অতি স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত (As every person of a reflecting turn of mind feels interested about antiquities, I have the pleasure of sending the accompanying translation which gives an account of the system of religion prevailing in Central India at the time of Alexander the Great and beg your acceptance of it)। রামমোহন প্রেরিত এই translationটি যে কিসের কার কৃত অনুবাদ তা জানবার উপায় নেই। যদি এটি আলেক্‌সাণ্ডারের সঙ্গীদের বা উত্তরকালীন মেগাস্থেনেস প্রমুখ লেখকগণের মূল গ্রীক বিবরণ থেকে রামমোহন কৃত অনুবাদ হয় তাহলে রামমোহনের গ্রীকচর্চার একটি অতিরিক্ত নিদর্শন হিসাবে

এটিকে নিশ্চয় গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এবিষয়ে জোর করে কিছু বলা চলে না। তবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বন্ধুবর্গের পুরাতাত্ত্বিক কৌতুহল রামমোহনকে যে অনেক সময়ে নিবৃত্ত করতে হত, পত্রদু'খানি সেই সাক্ষ্য অবশ্যই দেয়।

এইখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠবে। রামমোহনের বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হবার পর থেকেই (১৮১৫-১৬ সাল থেকে যার শুরু)—বিশেষত ১৮১৬তে Abridgment of the Vedant মুদ্রিত হবার পর—সংস্কৃত শাস্ত্রে রামমোহনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ক্রমশ দেশে-বিদেশে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে ছড়িয়ে পড়ে।[১০২] ক্রমশ কোলব্রুক, উইলসন প্রমুখ খ্যাতনামা প্রাচ্যবিশারদগণ তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষায় অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং আমরা দেখেছি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়ত্র এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করেন। খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা এবং তৎসংক্রান্ত নানা ভাষানুশীলনও সমকালীন পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। কিন্তু ১৮১৪-১৫ সাল থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করা সত্ত্বেও এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জ্ঞানানুশীলনে ব্রতী থেকেও তিনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যরূপে গৃহীত এমন কি প্রস্তাবিত পর্যন্ত হলেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের তৎকালীন অভ্যন্তরীণ চিত্রটি চোখের সামনে রাখতে হবে। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্ট এই সংস্থায় ভারতীয়রা সভ্যরূপে সর্বপ্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করেন ১৮২৯ সালে। তার পূর্বে এর সঙ্গে সভ্যরূপে নয়, কর্মচারিরূপে সংশ্লিষ্ট একমাত্র ভারতীয় ছিলেন রামকমল সেন যিনি সুদীর্ঘ কাল এই সংস্থার 'নেটিভ সেক্রেটারী'র কাজ করেছিলেন।[১০৩] কাজটি ছিল মুখ্যত চাঁদা আদায়ের এবং হিসাবপত্র রাখার। ১৭৮৪ থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ছিল সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গদের প্রতিষ্ঠান এবং এঁদের মধ্যে সরকারী প্রধানদেরই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও শাসক-সুলভ শ্রেষ্ঠত্ববোধ, দম্ভ ও উন্নাসিকতা যে শাসিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের প্রবেশাধিকার দিতে দীর্ঘকাল ইতস্তত করবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটির দরজা খুলে দেওয়া হল, এবং এই প্রতিষ্ঠানের হস্তলিখিত কার্যবিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে ৪ মার্চ ১৮২৯ তারিখে সভ্যপদ পেলেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, শিবচন্দ্র দাস,

রসময় দত্ত এবং রামকমল সেন ;[১০৩] ৬ মে, ১৮২৯ এলেন মহারাজা বৈদ্যনাথ রায় ;[১০৪] ১ জুলাই ১৮২৯ কাশীনাথ মল্লিক ;[১০৫] ২ সেপ্টেম্বর ১৮২৯—যথাক্রমে মহারাজা বনোয়ারীগোবিন্দ রায়, আশুতোষ দে, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজচন্দ্র দাস, হরচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্যামলাল ঠাকুর ;[১০৭] ৭ নভেম্বর ১৮৩২—রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ;[১০৮] এবং ৯ জানুয়ারী ১৮৩৩ রাজা রাধাকান্ত দেব।[১০৯] ১৯ নভেম্বর ১৮৩০ রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ৪ মার্চ ১৮২৯ থেকে তাঁর বিদেশযাত্রার সময় পর্যন্ত তের জন ভারতীয় কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামকমল সেনের মত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং নানা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা থাকলেও রামমোহনের মত নানা ভাষাবিদ্‌, বহুশ্রুত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী একজনও ছিলেন না। বেশ কয়েক জন তো ছিলেন শুধুমাত্র প্রচুর ধনৈশ্বর্যের অধিকারী, রাজা-জমিদার পর্যায়ভুক্ত, সরকারী মহলের অনুগ্রহ-ভাজন, শিক্ষাদীক্ষায় অতি সাধারণ স্তরের মানুষ, এসিয়াটিক সোসাইটির মত একটি বিশেষ প্রকৃতির গবেষণা-সংস্থার সভ্য হবার কোনও যোগ্যতাই ধরতে গেলে যাঁদের ছিল না। রামমোহনের কলিকাতায় উপস্থিতি কালে তাঁকে বাদ দিয়ে এই শ্রেণীর মানুষদের এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচন করবার মূল কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানে দুই ব্যক্তির প্রভাব। এঁরা হলেন সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক উইলসন ও তাঁর বিশেষ অনুগ্রভাজন রামকমল সেন। উইলসন ১৮২৯ সালে সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভ্য নির্বাচনের ব্যাপারে স্বয়ং অগ্রণী হয়েছিলেন।[১১০] আলোচনাপ্রসঙ্গে ইতিপূর্বে দেখা গেছে রামমোহনের পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং ১৮১৯ সাল পর্যন্ত তিনি রামমোহনকে my friend ও আধুনিক কালে শাংকর দর্শনের প্রবক্তা বলে যথেষ্ট সমীহ সহকারে উল্লেখ এবং নিজের গবেষণায় তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এর পর থেকে তিনি উত্তরোত্তর রামমোহন-বিরোধী ধর্মসভা গোষ্ঠীর (বিশেষ ভাবে রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেবের) অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন এবং ফলত রামমোহনের সঙ্গে তাঁর আত্মিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়। রামমোহন ও উইলসনের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দুটি প্রশ্নকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছিল : শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে রামমোহন পাশ্চাত্যপন্থী—সরকারী ব্যয়ে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধী, উইলসন ছিলেন প্রাচ্যপন্থি-

দলের প্রধান স্তম্ভ এবং সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সমর্থক। অপর সমস্যাটি হল সতীদাহ, যে বিষয়ে দু'জনের মধ্যে ছিল দুই মেরুর তফাৎ। রামমোহন সতীদাহ, বিরোধী আন্দোলনের নায়ক, অপর পক্ষে উইলসন মনে করতেন সতীদাহপ্রথা হিন্দুশাস্ত্রসমর্থিত ও হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গ—এবং সেই কারণে এর অমানুষিকতা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষে এই প্রথায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এই ক্ষেত্রে রামকমল-রাধাকান্ত-ভবানীচরণ অধ্যুষিত ধর্মসভাগোষ্ঠীর যুক্তি দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। ২৫ নভেম্বর ১৮২৮ তিনি সতীদাহ বিষয়ে তাঁর মতামত জ্ঞাপন করে বেন্টিংকের সামরিক সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন বেনসনকে যে পত্র লেখেন তাতে তিনি সরকারী সতীদাহ-উচ্ছেদ পরিকল্পনার স্পষ্ট বিরোধিতা তো করেছিলেনই তা ছাড়া সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টির জন্য প্রাক্তন বন্ধু রামমোহনকে খোঁচা দিতেও ছাড়েন নি : "One or two individuals in Calcutta who have signalised themselves by dissenting from many of the practices and principles of the religion, may hold a different persuation [সতীদাহ বিরোধী মনোভাব] but the vast body of the population will concur in the same impression and the Government has to legislate not for a handful of sectaries but for the Hindus at large.।"[১১১] দেখা যাচ্ছে উইলসন এখানে প্রকাশ্যে ধর্মসভাচক্রের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন,—রামকমল-রাধাকান্ত-ভবানীচরণের মতন তাঁরও দৃষ্টিতে রামমোহন বিধর্মী এবং তাঁর সতীদাহ-বিরোধী মনোভাব বৃহত্তর হিন্দুজনমতকে প্রতিফলিত করে না। কিন্তু এখানেই তিনি থামেন নি। এত সব সত্ত্বেও সতীদাহ-বিরোধী আইন যখন পাশ হয়ে গেল তখন ধর্মসভার উদ্যোগে ১৪ জানুয়ারী ১৮৩০ আটশ স্বাক্ষর সংবলিত এক প্রতিবাদপত্র গভর্নর জেনারেলকে পাঠানো হল। আশ্চর্যের বিষয় এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রামমোহনের বিশেষ স্নেহভাজন তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নামও দেখা যায়। উল্লিখিত ক্যাপ্টেন বেনসনকে লিখিত জেম্‌স ক্যালডারের একখানি তারিখহীন পত্রের (১৮৩০ জানুয়ারী মাসের কোনও সময়ে লিখিত) কয়েক পঙ্‌ক্তি এই রহস্যের উপর কিছুটা আলোক-পাত করে : "I am sorry to say that Ramchandra Surma the

head pandit of the College [সংস্কৃত কলেজ] who is of Rammohun Roy's school and was expected to sign the address of the abolitionists has been prevailed upon to sign the anti-abolition Petition but I am assured his real sentiments are with the abolitionists. Ramcomul sen is leading away all those connected with the Colleges (sic) to oppose the abolition out of compliment to H. H. Wilson to whom he owes everything. ।"[১১২] অর্থাৎ সতীদাহের ব্যাপারে চাপ দিয়ে রামমোহনের দল থেকে লোক ভাঙ্গানোরূপ পুণ্যকর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেন উইলসন। তাহলে মোটামুটি ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত উইলসনকে দেখতে পাচ্ছি সতীদাহ প্রশ্নে রামমোহন-বিরোধী ধর্মসভাগোষ্ঠীর সক্রিয় সমর্থক রূপে। বিশেষ ভাবে তিনি ছিলেন রামকমল সেনের মুরুব্বী। অনুমান করা যেতে পারে এই যোগাযোগের সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র ছিল এসিয়াটিক সোসাইটি যার সঙ্গে উইলসনের সম্পর্ক আরম্ভ হয় ১৮১০ থেকে এবং রামকমল ছিলেন যে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের কর্মচারী। সুতরাং এই উইলসন-রামকমলচক্র যে ১৮২৯-৩০ সালে রামমোহনের সোসাইটির সভ্যপদপ্রাপ্তির অন্তরায় হবে তা খুবই স্বাভাবিক। জিজ্ঞাস্য হতে পারে,—দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমারের মত সতীদাহ-বিরোধী রামমোহনগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করবার বেলায় সেক্ষেত্রে আপত্তি হয়নি কেন? এর উত্তরে বলা যায়, রামকমল সেন প্রমুখ রামমোহনের রক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণের দৃষ্টিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি রামমোহনের অন্তরঙ্গ সহযোগিগণ তাঁদের রামমোহন-সংসর্গরূপ মহাপাপ সত্ত্বেও কিছুটা ক্ষমার্হ ছিলেন, কেননা তাঁরা নিজ নিজ পরিবারে সনাতন দৈবকর্ম, পিতৃকর্ম, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি সবই বজায় রেখেছিলেন; কিন্তু রামমোহনকে তাঁরা মনে করতেন হিন্দুধর্মবিরোধী কালাপাহাড় যিনি উক্ত সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম ও পূজাপার্বণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিলেন। ধর্মসভার মুখপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকা' অতি স্পষ্ট ভাষায় রামমোহনের সঙ্গে তাঁর সহচরবৃন্দের বিশ্বাস ও আচারগত এই মৌলিক প্রভেদ বর্ণনা করেছেন।[১১৩] হিন্দু সনাতনপন্থীদের এই মনোভাব তাঁদের আচরণেও প্রতিফলিত। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভায় এঁদের ঘোরতর

My dear Benson

I am sorry to say that Ramchundra Surma - the head Pundit of the College who is of Rammohun Roy's School & was expected to sign the address of the Abolitionists has been prevailed upon to sign the Anti Abolition Petition - but I am assured his real sentiments are with the Abolitionists - Ramcomul Sen is leading away all those connected with the Colleges to oppose the abolition & [illegible] Compliment to H. H. Wilson - when the [illegible] over any thing - I think it would be desirable for his Lordship to converse with Ramchundra Surma of whose views on the Suttee question I shall let you know more on Monday - I don't recollect

ক্যাপ্টেন বেনসনকে লিখিত জেম্স ক্যান্ডারের পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা।
পাণ্ডুলিপি বিভাগ, নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, নটিংহাম, ইংলণ্ড।

প্রতিবাদের ফলে রামমোহন কোনও দিনই প্রবেশাধিকার পেলেন না, কিন্তু উত্তর কালে রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তাঁর কার্যাবলীর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে এই পরিচালক মণ্ডলীতে গ্রহণ করতে তাঁদের আপত্তি হয়নি। এসিয়াটিক সোসাইটির দেশীয় সভ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও হিন্দু কলেজের উক্ত ঘটনার একটি ছোটখাট পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। লক্ষ্য করবার বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই মাথার উপর উইলসন। এটুকু বিনা দ্বিধায় বলা চলে কোলব্রুক বা হটনের মত নিরপেক্ষ সুধী যদি এই সময়ে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির কর্ণধার থাকতেন তাহলে এই বিচারবিভ্রাট ঘটত না। দুর্ভাগ্যের বিষয় কোলব্রুকের সোসাইটির সভাপতি থাকাকালীন (১৮০৭-১৮১৫) রামমোহন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও মনীষীরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি, তখন একমাত্র 'তুহ্ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন্' এর লেখক হিসাবেই তাঁর প্রধান পরিচয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতির সূত্রপাত, কিন্তু সেই বৎসরই কোলব্রুক ভারত ত্যাগ করেন। সুদূর ইংলণ্ড থেকে তিনি রামমোহনের পরবর্তী পাণ্ডিত্যকীর্তির সংবাদ ভালভাবেই রেখেছিলেন এবং তার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৎসরই তিনি ও তাঁর সহযোগিবর্গ রামমোহনকে এর সদস্য শ্রেণীভুক্ত করে নেন।

এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা আমেরিকান লেখক ডেভিড কফের ব্রিটিশ পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার সঙ্গে বঙ্গীয় নবজাগৃতির যোগসূত্র বিষয়ক যে সিদ্ধান্তদ্বয়ের উল্লেখ করেছি সেগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করবার আগে সমকালীন প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রাচ্যশাস্ত্রালোচনার কোন্ কোন্ দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব নেওয়া যেতে পারে :

(১) রামমোহনের উপনিষদ্-বেদান্ত প্রকাশ আলোচনা ও ব্যাখ্যা প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাঁর পূর্বে দু'একটি উপনিষদের বিচ্ছিন্ন অনুবাদ ছাড়া ব্রিটিশ পুরাতত্ত্ববিদ্ মহলে উপনিষদ্ সম্পর্কে কোনও সুপরিকল্পিত গবেষণা আরম্ভ হয় নি। ইউরোপখণ্ডে উপনিষদের আঁক্যতিল দ্যু পেরোঁ কৃত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ (ফার্সী থেকে) লাটিন অনুবাদই পণ্ডিত সমাজের একমাত্র অবলম্বন ছিল। রামমোহন আধুনিক যুগে ব্রহ্মসূত্রের

প্রথম ভাষ্যকার (১৮১৫); তাছাড়া তিনি ব্রহ্মসূত্রের উপর রচিত সমগ্র শাংকর ভাষ্যেরও প্রথম প্রকাশক (১৮১৮)। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে উপনিষদ্ গ্রন্থমালার প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৮৪৯ থেকে; 'ব্রহ্মসূত্র'এর প্রকাশিত হতে শুরু হয় ১৮৫৪ থেকে।

(২) চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, আধুনিক দৃষ্টিতে পুরাণ-তন্ত্রের আলোচনাতেও উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনই অগ্রণী। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ এর মধ্যেই তাঁর পুরাণ-তন্ত্রবিষয়ক মন্তব্য সংবলিত শাস্ত্রালোচনাগুলি প্রকাশিত হয়। উইলসন কর্তৃক পুরাণসমূহের বিশ্লেষণ শুরু হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এবং বিষ্ণুপুরাণের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ হয় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি পুরাণ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন ১৮৫৫ থেকে। তন্ত্রের গূহ্য আচার ও ক্রিয়াকলাপ বাদ দিয়ে এর অদ্বৈততত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব প্রভৃতি দার্শনিক মতকে পরিমার্জিত করে আধুনিক কালে রামমোহনই প্রথম সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তদানীন্তন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহলে তন্ত্র সম্পর্কে জুগুপ্সার মনোভাবই ছিল।[১১৪] সার জন উড্রফ্ (আর্থার এভেলন)-এর উদ্যোগে পশ্চিমে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে।

(৩) খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গে ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় এই প্রাচ্যধর্মদ্বয়ের মূলানুসন্ধানের জন্য হিব্রু ও গ্রীক (এবং কিছু পরিমাণে লাটিন, সিরিয়াক) ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে রামমোহন যে প্রয়াস করেছিলেন ইতিহাস-জ্ঞানের গভীরতা ও পঙ্‌ক্তি বিচারনৈপুণ্যের দিক দিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে পরোক্ষত তা এক গবেষণাকর্মেরই রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং সেই ভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। হিন্দু মুসলমান ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং এগুলির মধ্যে একটি সর্বজনীন ভূমি আবিষ্কারের প্রয়াসের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্‌স তাঁকে তুলনামূলক ধর্মবিদ্যার জনকরূপে অভিহিত করেছেন (Probably Rammohun Roy was the first earnest minded investigator of the science of comparative religion that the world has produced)।[১১৫]

(৪) সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনকে রক্ষণশীল হিন্দু প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল—তা পরিচালিত হয়েছিল প্রধানত ব্রাহ্মণ্য

স্মৃতিশাস্ত্রের কতকগুলি বচনকে অবলম্বন করে। এই বিতর্কে রামমোহনকে আমরা দেখতে পাই প্রধানত এক তীক্ষ্ণধী স্মার্ত রূপে।[১১৬] সতীদাহ সমর্থকগণ প্রধানত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর বিজ্ঞানেশ্বর (একাদশ শতাব্দী) প্রণীত মিতাক্ষরা টীকায় এবং রঘুনন্দনের (ষোড়শ শতাব্দী) শুদ্ধিতত্ত্বে উদ্ধৃত বিষ্ণু, ব্যাস, অঙ্গিরা, শংখ, হারীত প্রভৃতি স্মৃতিকারদের নির্দেশ ও ব্রহ্মপুরাণের বচনের উপর তাঁদের সিদ্ধান্তকে দাঁড় করিয়েছিলেন। রামমোহন স্মার্তগণের ঐতিহ্যগত বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করেই এঁদের, অর্থাৎ বকলমে বিজ্ঞানেশ্বর ও রঘুনন্দনের, মত খণ্ডন করেছেন প্রধানত মনুস্মৃতির (৫. ১৫৭) বচন উদ্ধৃত করে এবং এই বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রবিচারের ঐতিহ্যানুসারে অন্যান্য স্মৃতিকারদের উপর মনুবচনের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করে। দুর্ভাগ্যবশত মনুস্মৃতির উক্ত শ্লোকের উপর ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রদত্ত সতীদাহবিরোধী তীক্ষ্ণ যুক্তিগুলির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না ; কেননা মেধাতিথির পঠনপাঠন বাঙ্‌লাদেশে সে-সময়ে প্রচলিত হয়নি। কিন্তু মেধাতিথির মতই শ্রুতিবচন উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন যে শাস্ত্রানুসারে আত্মহত্যা মহাপাপরূপে নিষিদ্ধ ; এবং শ্রুতিস্মৃতিতে সর্বত্র সহমরণ বা অনুমরণের ন্যায় কাম্যকর্ম এক বাক্যে নিন্দিত। এই বিচারপ্রসঙ্গে রামমোহনের প্রদত্ত দুটি মন্তব্য আধুনিক গবেষকের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ : (১) তাঁর প্রতিপক্ষ কমলাকরের 'নির্ণয়সিন্ধু'তে উদ্ধৃত মনুবচন সতীদাহর পক্ষে প্রমাণস্বরূপ দাখিল করলে রামমোহন বলেন এই বচন জাল ; কেননা বিজ্ঞানেশ্বর তাঁর মিতাক্ষরা টীকায় সতীদাহ-সমর্থনে এটি উদ্ধৃত করেন নি ; দ্বিতীয়ত রঘুনন্দন তাঁর গ্রন্থে প্রাচীন নির্ণয়সিন্ধুর উল্লেখ করলেও সহমরণপ্রকরণে উক্ত মনুবচন সম্পর্কে নীরব। "ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে এ অশ্রুত অদৃশ্য বচন রচনা করিয়া নবীন কোন স্ত্রীবধেচ্ছু ব্যক্তি প্রাচীন নির্ণয়সিন্ধুতে অর্পণ করিয়া থাকিবেন।"[১১৭] এই পদ্ধতিতে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্য ও কাল নির্ণয়ের প্রয়াস আধুনিক বিচারশীল দৃষ্টিপ্রসূত। রামমোহনের এই সিদ্ধান্ত যে যথাযথ তা বর্তমানে প্রমাণিত। কমলাকর কৃত যে 'নির্ণয়সিন্ধু' বর্তমানে প্রচলিত তা স্পষ্টত রঘুনন্দনের পরবর্তী, কেন না সে গ্রন্থে রঘুনন্দনের উল্লেখ বর্তমান ; (২) প্রতিপক্ষ সতীদাহ সমর্থনে একটি ঋগ্বেদ মন্ত্র (১০. ১৮. ৭) উদ্ধৃত করেছিলেন যেটির প্রকৃত পাঠ এই "ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোহনমীবাঃ

সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥ কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শেষ তিনটি শব্দ পাঠ করেছেন 'জনয়ো যোনিমগ্নেঃ।'[১১৮] এই ভুল পাঠের উৎস রঘুনন্দনের 'শুদ্ধিতত্ত্ব', যে গ্রন্থ ছিল বঙ্গীয় রক্ষণশীল স্মার্ত পণ্ডিত-সমাজের সতীদাহ সমর্থনের প্রধান অবলম্বন।[১১৯] আশ্চর্যের বিষয় সতীদাহের ন্যায় নৃশংস প্রথার শ্রৌত সমর্থন সম্পূর্ণরূপে এই পাঠবিকৃতির উপরই নির্ভরশীল ছিল। মূল ঋগ্বেদের পাঠ (জনয়ো যোনিমগ্রে) এবং তার উপর সায়নকৃত ভাষ্য (তা অগ্রে সর্বেষাং প্রথমত এব যোনিং গৃহমারোহংতু। আগচ্ছংতু॥) পরীক্ষা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় এই মন্ত্র সতীদাহবাচক নয়। রঘুনন্দনের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হতেই সহমরণ-সমর্থকগণ সুকৌশলে এই পাঠ পরিবর্তন করেছিলেন।[১২০] রামমোহনের কালে বাংলাদেশে মূল ঋগ্বেদ ও সায়ন ভাষ্যের পঠনপাঠন প্রচলিত ছিল না, সুতরাং মন্ত্রটির পাঠ মেলাবার সুযোগ তাঁর ছিল না। কিন্তু শাস্ত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে তিনি ধরতে পেরেছিলেন, মন্ত্রটি সতীদাহবাচক নয়। 'সহমরণ বিষয়' গ্রন্থে (১৮৩০) তাই তিনি প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট বলেছেন: "'ইমানারীরবিধবা' ইত্যাদি মন্ত্রে সহমরণের বিধি নাই, সে কেবল পুরোবর্তী নারীদের অগ্নিক্রিয়াবাদ মাত্র।" এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদে মন্ত্রটির তৎকালীন প্রচলিত পাঠের বিস্তারিত অর্থ বিশ্লেষণ করেও তিনি তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন এবং সেই সঙ্গে এই পাঠ যে প্রকৃত না হতেও পারে এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতও করেছেন [This passage (if genuine) … … does not ……. enjoin widows to offer themselves as sacrifices…]।[১২১] দেশীয় পণ্ডিতগণের তুলনায় রামমোহনের শাস্ত্রদৃষ্টি যে কত গভীর এবং মন যে কতখানি গতানুগতিকতামুক্ত ও বিচারশীল এই বিশেষ আলোচনায় তা প্রতিফলিত। বস্তুত এখানে রামমোহন নিছক দেশীয় স্মার্ত পণ্ডিত নন, তাঁর দৃষ্টি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আধুনিক গবেষকের। উত্তরকালীন অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত উক্ত ঋগ্বেদমন্ত্রের বিশুদ্ধ পাঠ ও তৎসংক্রান্ত সায়নভাষ্য রামমোহনের ইঙ্গিতকে সত্য প্রমাণ করেছে। রামমোহনের গ্রন্থপ্রকাশের ছাব্বিশ বছর পরে (১৮৫৬) উইলসন এই ঋগ্বেদমন্ত্রটির বিশুদ্ধ পাঠ অবলম্বন করে এটি যে সতীদাহবাচক নয় তা প্রতিষ্ঠিত করেন।[১২২] দুঃখের

বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পূর্বসূরী রামমোহনের নামটি উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন।

বর্তমান অধ্যায়ের ভূমিকাস্বরূপ ডেভিড কফের যে সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করা হয়েছিল সেগুলির কিছু আলোচনা করে এই প্রসঙ্গের ছেদ টানা যেতে পারে। কফের British Orientalism and the Bengal Renaissance গ্রন্থখানির পাঠকের কাছে এটি কিঞ্চিৎ আশ্চর্য না লেগেই পারে-না যে, রামমোহনের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যাগবেষকগণের যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্যগুলি প্রায়ই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। অথচ এ বিষয়ে তথ্যের অভাব ছিল না। রামমোহন পাশ্চাত্য ভারত-গবেষণাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনমত স্বীকৃতিসহ ব্যবহারও করেছিলেন, যদিও অন্ধভাবে নয়; কেন না দৃষ্টিভঙ্গীতে ও উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য গবেষকগণের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল। অপর পক্ষে তাঁর ভাষাজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রচর্চা, শাস্ত্রের অনুবাদ ও প্রচার সমকালীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন বেদান্ত ও পুরাণ-তন্ত্রের পর্যালোচনায় রামমোহন পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজের অগ্রগামী এবং ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের বিচারের ক্ষেত্রে তৎকালীন নবজাগৃতির নায়কগণের মধ্যে একক। প্রাসঙ্গিকতা থাকা সত্ত্বেও ডেভিড কফের আলোচনায় এ-সবের কোনও উল্লেখ নেই। তার পরিবর্তে তিনি বঙ্গীয় নবজাগৃতির উপর ব্রিটিশ পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার প্রভাবের চিত্রটি যে ভাবে উপস্থিত করেছেন তা এই: উইলিয়ম জোন্স্ ও কোলব্রুক তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন বৈদিক সভ্যতার কাল ছিল ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। এই যুগে ধর্মে একেশ্বরবাদ ছিল, মূর্তিপূজার অস্তিত্ব ছিল না, সমাজব্যবস্থা সতীদাহর ন্যায় নিষ্ঠুর প্রথার দ্বারা কলঙ্কিত হয় নি, ইত্যাদি। তাঁদের নিকট থেকে এই "বৈদিক আদর্শ" গ্রহণ করেছিলেন রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তিগণ। অপর পক্ষের উইলসনের গবেষণার বিষয়-বস্তু প্রধানত ভারতবর্ষের বেদান্তোত্তর "মধ্যযুগ"; তিনিই প্রথম 'পুরাণ' সমূহের নিয়মিত আলোচনা করেন এবং সমগ্রভাবে তাঁর গবেষণা ভারতবর্ষের এই "মধ্যযুগীয়" সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকেই বাঙালীমানসে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল। রামকমল-রাধাকান্ত-মৃত্যুঞ্জয়-ভবানীচরণ প্রমুখ রামমোহন-প্রতি-

পক্ষগণ আধুনিক কালে এই নব-"মধ্যযুগীয়" মানসিকতার প্রতীক। বঙ্গীয় নবজাগৃতির ক্ষেত্রে রামমোহনের 'বৈদিক' আদর্শ অপেক্ষা উইলসন প্রতিষ্ঠিত এই 'পৌরাণিক' মধ্যযুগীয় আদর্শই সমধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। নবজাগ্রত বাঙালী-মানস এরই সঙ্গে অধিকমাত্রায় একাত্ম হতে পেরেছিল (The Jones-Colebrooke portrayal of the Vedic age to which a Müller would add the finishling touches, and which to-day is widely accepted, depicted, a people believed to have behaved very differently form present-day Hindus. It was the first reconstructed golden age of the Indian renaissance.[১২৩] ...With Wilson the older Orientalist pre-occupation with Vedic India came to an end and a new era of scholarly interest in "medieval" India began···Wilson's broad interests in the whole range of post-Vedantic (sic) Indian history not only encouraged regional middle-period studies but paved the way for the discoveries of Maurya and Gupta India[১২৪] ······The critical point is that H. H. Wilson···did in fact offer Hindus a form of dynamic classicism far more palatable to them than the Vedic ideal transmitted by Jones and Colebrooke to Rammohun Roy.... it was to become increasingly difficult to convince Bengalis, whose known cultural origins and achievements were an integral part of "medieval "Indian history, that their true identity lay with the remote culture of the Indo-European invaders.)।[১২৫]

সিদ্ধান্তগুলির পর্যালোচনাপ্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষণীয় ভারত-ইতিহাসের যুগবিভাগ সম্পর্কে লেখকের ধারণা অতি অস্পষ্ট। তাঁর মতে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির পথে বৈদিক যুগ পর্যবসিত হয়েছিল "মধ্যযুগ"-এ। পণ্ডিতগণ কিন্তু বৈদিক যুগের সমাপ্তি টানেন মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর অবসান ও খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ইতিহাসে যে পর্বের শুরু

তাকে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে বলা যেতে পারে 'ক্লাসিকাল' যুগ। ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন যুগটি কিন্তু এই বৈদিক ও ক্লাসিকাল উভয় পর্ব নিয়েই কল্পিত। কেউ কেউ এর সীমারেখা টেনেছেন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যম ভাগে; আবার কোনও কোনও মতে এই (বৈদিক-ক্লাসিকাল) প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের অবসান পর্যন্ত সম্প্রসারিত। সে যাই হোক, বৈদিক যুগ-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে মধ্যযুগের আরম্ভ এমন অদ্ভুত কল্পনা আজ পর্যন্ত কেউ করেন নি। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এ কালে যে সব পাশ্চাত্য পণ্ডিত গবেষণা করেছেন তাঁরা পর্যায়ক্রমে সমগ্র প্রাচীন যুগের দুটি বিভাগ স্বীকার করেন বৈদিক ও ক্লাসিকাল। এই দুই পর্বে সংস্কৃত ভাষারও বৈদিক এবং ক্লাসিকাল দুটি রূপ প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ভাষার মূলত এক হলেও গঠনে, বিন্যাসে ও ব্যাকরণে তার এই দুই রূপের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ। বৈদিক যুগের অবসানের কাল থেকে 'ক্লাসিকাল' সংস্কৃত ভাষা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে, সপ্তম-অষ্টম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিকাশধারা অব্যাহত থাকে। পরবর্তীকালে নানা আঞ্চলিক ভাষা ক্রমশ গুরুত্ব অর্জন করতে থাকলেও 'ক্লাসিকাল' সংস্কৃত পণ্ডিতমহলে শাস্ত্রচর্চা ও বিবিধ জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে নিজের স্থান ছাড়েনি। পূর্বের কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা প্রথাসম্মত স্থিরীকৃত রূপে তার চর্চা অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে সমগ্র মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক কাল পর্যন্ত। সুতরাং ভাষাগত ভাবে বৈদিক ও ক্লাসিকাল সংস্কৃতের যুগ ইতিহাসের প্রাচীন (বৈদিক-ক্লাসিকাল) ও মধ্য যুগবিভাগের সমার্থবাচক নয়। ভাষার অভিব্যক্তির দিক দিয়ে ক্লাসিকাল সংস্কৃতের সংগঠন ও বিকাশ বেদোত্তর যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের অবসান) থেকে আরম্ভ হয়ে ইতিহাসের প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক কালকে অধিকার করে আছে। ডেভিড কফ্ শুধু যে ইতিহাসের যুগবিভাগ ও ভাষাবিবর্তনের পর্ববিভাগকে একত্র মিশিয়ে ফেলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, এই সূত্রে ব্যবহৃত post-Vedantic range of Indian history উক্তিটি তাঁর অভিপ্রেত অর্থকে আরও দুর্বোধ্য করে তুলেছে। বেদ আর বেদান্ত এক বস্তু নয়, সুতরাং post-Vedic (বেদোত্তর) ও post-Vedantic (বেদান্তোত্তর) শব্দ দুটির তাৎপর্যও পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান উপনিষদ্ বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ; প্রধান উপনিষদগুলি বৈদিক

ভাষায় বৈদিক যুগে রচিত। কিন্তু বেদান্তের ন্যায়প্রস্থান (ব্রহ্মসূত্র) এবং স্মৃতিপ্রস্থান (গীতা) প্রাচীন ক্লাসিকাল যুগের সৃষ্টি ও ক্লাসিকাল সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তা ছাড়া এই প্রস্থানত্রয়কে অবলম্বন করে বেদান্তদর্শনের আলোচনার পরম্পরা ও ঐতিহ্যগত ধারা ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণের জীবৎকাল (অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) পর্যন্ত সম্প্রসারিত, যাকে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করবেন মধ্যযুগের অবসানকাল রূপে। সুতরাং বেদান্ত বলতে সাধারণভাবে একটি বিশেষ দর্শনপ্রস্থানের এই সমগ্র অভিব্যক্তির ধারাটিকে বুঝতে হবে যদি না কেউ এর দেশকালগত কোনও বিশেষ অর্থ নির্দেশ করে দেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক কোথাও সে চেষ্টা করেন নি। এই দিক দিয়ে তাঁর post-Vedantic range of Indian history উক্তিটি অর্থহীন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জোন্স্-কোলব্রুক-উইলসনের গবেষণা বিষয়ক কফের মন্তব্যগুলিকে বিচার করলে ধরা পড়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি প্রায়শ বস্তুভিত্তিহীন। উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার হিসাব নিলে দেখা যাবে বিপুলায়তন বৈদিক সাহিত্যের মাত্র সাতটি অতি ক্ষুদ্র নির্বাচিত অংশের অনুবাদ ছাড়া তাঁর অন্যান্য প্রধান অনুবাদ ও আলোচনাগুলির বিষয়বস্তু ক্লাসিকাল যুগের সংস্কৃত সাহিত্য। 'ঋতুসংহার' 'গীতগোবিন্দ', 'শকুন্তলা', 'হিতোপদেশ', 'মনুসংহিতা' প্রভৃতির অনুবাদ এবং সংস্কৃত ক্ষোদিতলিপি ও অনুশাসন বা হিন্দু চান্দ্রমাসের আলোচনা,—এগুলির কোন্‌টি বৈদিক সাহিত্যের কোঠায় পড়ে? এর কোন্‌টির মধ্যেই বা কফ জোন্সের বৈদিক স্বর্ণযুগের কল্পনা খুঁজে পেয়েছেন? জোন্স্‌কৃত বৈদিক সাহিত্যের অনুবাদগুলি সম্পর্কে বক্তব্য—এগুলির মাধ্যমে তথাকথিত বৈদিক স্বর্ণযুগের কোনও আভাস দেওয়ার চেষ্টা নেই, ভূমিকা বা মন্তব্য ছাড়াই জোন্স এগুলি প্রকাশ করেছিলেন। ক্লাসিকাল যুগসংক্রান্ত তাঁর রচনাবলীর তুলনায় রচনাকটির সংখ্যা মাত্র সাত এবং আয়তন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র—ছয়টি বিরাট খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থাবলীর মাত্র চোদ্দটি পৃষ্ঠাতেই সম্পূর্ণ।[১২৬] প্রকাশক সংযোজিত ভূমিকা থেকে জানা যাচ্ছে এগুলি consist of translations of passages in the Vedas and "appear to be materials selected by Sir W. Jones for the elucidation of a dissertation 'On the primitive religion of the Hindus'. It was intended to remove the veil from the supposed

mysteries of the primitive Indian religion."। এই পরিকল্পিত গ্রন্থ জোন্স্ লিখে যেতে পারেন নি। অনুবাদগুলির মধ্যে আছে গায়ত্রী মন্ত্র, ক্ষুদ্রকায় ঈশোপনিষদ্, রাত্রিসূক্ত, যজুর্বেদের কয়েক পঙ্ক্তি, এবং আর তিনটি ক্ষুদ্র স্তোত্র। অনুবাদ সর্বত্র ত্রুটিহীন নয়। এগুলির মধ্যে রামমোহন শুধুমাত্র জোন্সের গায়ত্রীর অনুবাদের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি এর জন্য জোন্সের কাছে কোনও ভাবেই ঋণী নন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানরূপে তিনি বাল্যকাল থেকে (উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে) গায়ত্রী জপে অভ্যস্ত। অপর পক্ষে জোন্স্ রচিত যে গ্রন্থ তিনি প্রয়োজনমত ব্যবহার করেছেন, তা ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মনুসংহিতার অনুবাদ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব ঘোষণা জোন্সের অন্যতম কীর্তি সন্দেহ নেই; কিন্তু সে উক্তির মধ্যেও বিশেষ করে বৈদিক যুগ সম্পর্কে কোনও উচ্ছ্বাস নেই। বস্তুত জোন্সের জীবদ্দশায় বৈদিক গবেষণার সূত্রপাতই হয়নি। এর ভিত্তিস্থাপন করেন কোলব্রুক তাঁর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত On the Vedas or Sacred Writings of the Hindus শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের দ্বারা।[১২৭] কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটিকে বাদ দিলে কোলব্রুকের বাকী বিপুল পরিমাণ গবেষণার সমস্তটাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্য ভিত্তিক। সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত (ক্লাসিকাল) ও প্রাকৃত ভাষা, কাব্য, অলঙ্কার, সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, মাহেশ্বর, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র প্রমুখ দর্শনপ্রস্থান, স্মৃতিশাস্ত্র, গণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারিত এবং সমগ্রভাবে পরিমাণে বৈদিক সাহিত্য সংক্রান্ত তাঁর নিবন্ধটি অপেক্ষা বহুগুণে বিরাটতর। এখানে উল্লেখ্য 'বেদ' সংক্রান্ত কোলব্রুকের প্রবন্ধটি প্রাথমিক যুগের বৈদিক গবেষণার ক্ষেত্রে দিকচিহ্নস্বরূপ হলেও বৈদিক যুগ সম্পর্কে তাঁর কিন্তু কোনও উচ্ছ্বাস বা রোমান্টিক কল্পনা ছিল না। কথিত নিবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদটিই তার প্রমাণ: "They [the Vedas] are too voluminous for a complete translation of the whole and what they contain would hardly reward the labour of the reader much less that of the translator. The ancient dialect in which they are composed

and especially that of the first three *Vedas*, is extremly difficult and obscure, and though curious as the parent of a more polished and refined language (the classical Sanskrit) its difficulties must long continue to prevent such an examination of the whole *Vedas* as would be requisite for extracting all that is remarkable and important in those voluminous works. But they well deserve to be occasionally consulted by the Oriental scholar।"[১২৮] এই সংযত নিরুত্তাপ উক্তি যে মনোভাবের প্রকাশক তার মধ্যে আর যাই হোক কোনও অতীত স্বর্ণযুগের কল্পনা নেই। সমগ্র বেদের পঠন-পাঠন বা অনুবাদের বিশেষ কোনও উপযোগিতাও লেখক স্বীকার করেন নি। দেখা যাচ্ছে বেদের ভাষার তুলনায় ক্লাসিকাল সংস্কৃত তাঁর দৃষ্টিতে অধিকতর শিষ্ট ও মার্জিত। এই নিবন্ধটি যে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করেছিল এমন প্রমাণ নেই। কোলব্রুকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, ঋণ স্বীকারেও (এমন কি প্রতিপক্ষের কাছেও) তিনি কৃপণ ছিলেন না। কিন্তু আলোচ্য রচনাটির উল্লেখ তাঁর গ্রন্থাদিতে কোথাও নেই। কোলব্রুক অবশ্য আলোচনাপ্রসঙ্গে এখানে দেখিয়েছেন বৈদিক ধর্মের আপাত-বহুদেববাদের অন্তরালে একেশ্বরবাদী চিন্তা লুকিয়ে আছে। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই ইসলামের প্রভাবে রামমোহন তাঁর একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ; ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহ্ ফাৎ-উল্-মুওহাহ্হিদিন্'এ তা ব্যক্ত। জোন্স্-কোলব্রুকের (এবং কেরীর) উপনিষদ অনুবাদের দৃষ্টান্ত রামমোহনের সামনে অবশ্য ছিল, কিন্তু তার দ্বারা রামমোহন কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা শক্ত। তাঁর উপনিষদ চর্চা ও সভাষ্য অনুবাদ সম্পূর্ণ ভারতীয় দৃষ্টিপ্রসূত—পাঠ বা শ্রবণের সঙ্গে যেখানে অবশ্য অনুষ্ঠেয় মনন ও নিদিধ্যাসন। "কেবল ইতিহাসের ন্যায়" উপনিষদ্ পাঠের নিষ্ফলতার প্রতি 'ঈশোপনিষৎ'-এর বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় তাঁর সুস্পষ্ট অঙ্গুলীনির্দেশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[১২৯] বেদান্ত সমেত হিন্দুদর্শনের আলোচনা কোলব্রুক আরম্ভ করেন রামমোহনের বেশ কয়েক বছর পরে। কোলব্রুক রচিত On the duties of a Faithful Hindu Widow শীর্ষক ১৭৯৫ সালে প্রকাশিত নিবন্ধটির[১৩০] উল্লেখ করে কফ

বলতে চেয়েছেন রামমোহনের সতীদাহবিরোধী শাস্ত্রালোচনার মূল প্রেরণা এই রচনার মধ্যে নিহিত। রামমোহন (যিনি সতীদাহ বিরোধী নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থনে ক্ষেত্রান্তরে তাঁর প্রতিপক্ষ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মত উদ্ধৃত করতেও দ্বিধা করেন নি),[১৩১] —কিন্তু, প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রালোচনায় কোলব্রুকের উক্ত রচনা সম্পর্কে নীরব। উক্ত প্রবন্ধে কোলব্রুক আলোচনাপ্রসঙ্গে হিন্দু বিধবার পালনীয় কর্তব্য সংক্রান্ত বেদ-পুরাণ-ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে প্রদত্ত বিধানগুলি নিপুণতার সঙ্গে একত্র করেছেন; তিনি নিজে বিশেষ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তাঁর সংগৃহীত শাস্ত্রবচনগুলি পরীক্ষা করে দেখলে মনে হবে এক্ষেত্রে সতীদাহের পক্ষেই শাস্ত্রপ্রমাণের পাল্লা ভারী; ক্বচিৎ কোথাও ব্যতিক্রম বা বিকল্পব্যবস্থার উল্লেখ আছে। এবং কোলব্রুক স্পষ্টই বলেছেন দু'একটি ব্যতিক্রম সত্ত্বেও হিন্দু শাস্ত্রকারগণ মোটের উপর সতীদাহের স্বপক্ষেই বিধান দিয়েছেন। সবচেয়ে চোখে পড়ে মনুস্মৃতি প্রদত্ত বিধবার আজীবন ব্রহ্মচর্য বিধানের অনুল্লেখ যার উপর রামমোহন সর্বাধিক নির্ভর করেছিলেন।[১৩১ক] পূর্বালোচিত ঋগ্বেদ মন্ত্র 'ইমা নারীরবিধবাঃ' কোলব্রুক সতীদাহবাচক অর্থেই অনুবাদ করেছেন, 'অগ্রে' থেকে 'অগ্নেঃ' পাঠপরিবর্তনের কারচুপি তিনি ধরতে পারেন নি। আমরা দেখেছি, রামমোহনকে এই সিদ্ধান্ত পরে খণ্ডন করতে হয়েছিল। সুতরাং কোলব্রুকের আলোচ্য নিবন্ধটি রামমোহন লক্ষ্য করে থাকলেও সতীদাহ সংক্রান্ত শাস্ত্র-বিচারে সেটি তাঁর কোনও কাজে লাগেনি। উক্ত নিবন্ধের বিষয়বস্তু বিচারের যোগ্যতা না থাকায় এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটি ডেভিড কফ ধরতে পারেন নি। বরং রামমোহনের রক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণ ইংরেজি জানলে আত্মপক্ষ সমর্থনে এটি ব্যবহার করতে পারতেন। নিজের অজ্ঞাতসারে শ্রুতিপ্রমাণের ব্রহ্মাস্ত্র কোলব্রুক তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে সর্বাধিক প্রামাণিক 'মনুসংহিতা'র সাক্ষ্যকে অবজ্ঞা করেও তাঁদের কম সাহায্য করেন নি। কোলব্রুকের রচনাবলীর মধ্যে তাঁর হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের (ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, বৈদিক সাহিত্যের নয়) অনুবাদগুলিকেই রামমোহন সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন। যত্ন সহকারে তিনি এগুলি ব্যবহার করেছেন এবং এর জন্য অনুবাদককে যে প্রকাশ্যে অভিনন্দিত করেছিলেন আলোচনাপ্রসঙ্গে তা দেখা গেছে। জোন্স-কোলব্রুকের গবেষণাকে বৈদিক যুগে সীমাবদ্ধ করলেও তাঁদের মাধ্যমে রামমোহনের উপর উক্ত যুগের "স্বর্ণরশ্মি" বিচ্ছুরণের

কল্পনাকে প্রশ্রয় দিলে তাই হিমালয়পরিমাণ বিরুদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রতি চোখ বুজে থাকতে হয়।

অপরপক্ষে উইলসনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমহলে বৈদিকযুগ-সংক্রান্ত অনুসন্ধিৎসায় ইতি এবং "মধ্যযুগ" সম্পর্কিত গবেষণার সূত্রপাত এমন উক্তিও অজ্ঞতারই পরিচায়ক। উইলসনের গবেষণাও বৈদিক ও ক্লাসিকাল উভয় যুগেই সম্প্রসারিত। তিনি যেমন ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'মেঘদূত' ও সংস্কৃত নাটকাবলীর অনুবাদ করেছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করেছেন, কল্‌হণকৃত 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাচীন ক্ষোদিত লিপি (inscription)-র অনুবাদ ও মুদ্রার তালিকা করেছেন, ধারাবাহিক ভাবে পুরাণসাহিত্যের আলোচনা করেছেন, সাংখ্যকারিকার অনুবাদ করেছেন, তেমনি সায়নভাষ্যের অনুসরণে ঋগ্বেদের তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন এবং স্টিভেনসন সংকলিত মূল সামবেদ ও তার ইংরেজি অনুবাদ নিজ সম্পাদনায় প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া পরবর্তী জীবনে ইংলণ্ড থেকে পত্র লিখে তিনিই কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিকে বৈদিক সাহিত্যের 'শতপথ ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি প্রকাশ করবার জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৮৪৮ থেকে এসিয়াটিক সোসাইটি ধারাবাহিক ভাবে বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ করেন।[১৩২] ডেভিড কফ উইলসনের গবেষণাকর্মকে সম্পূর্ণ "মধ্যযুগ"ভিত্তিক প্রমাণ করবার জন্য উইলসনের ঋগ্বেদ-অনুবাদ ও সামবেদ সম্পাদনের উল্লেখমাত্রও তাঁর গ্রন্থে করেন নি। তার উপর Wilsons broad interests in the whole range of post-Vedantic Indian history—এই উক্তি দ্বারা তিনি আপন বক্তব্যকে পুরোপুরি হেঁয়ালীর রূপ দিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি ঐতিহ্যগত ভাবে বেদান্তদর্শনের ধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত। সুতরাং ভারত-ইতিহাসে বেদান্ত কোন্ যুক্তিতে যুগ-বিভাজক রেখা গণ্য হতে পারে, বেদান্তোত্তর যুগ বলতে কি বোঝায় এবং এই যুগ সম্পর্কে উইলসনের আগ্রহ কি ভাবেই বা মৌর্য ও গুপ্ত যুগের ইতিহাস উদ্ধারে সহায়ক হল তা বুঝতে পারা কঠিন।

আলোচনার ফলে দেখা গেল জোন্স-কোলব্রুক-উইলসনের কীর্তিমণ্ডিত ভারত-গবেষণার যুগটিকে বেদভিত্তিক ও মধ্যযুগভিত্তিক (বা 'বেদান্তোত্তর' যুগ

ভিত্তিক।) অভিধেয় স্বতন্ত্র পর্বে ভাগ করবার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই, কেননা এঁদের কারও অনুসন্ধিৎসা ভারত সংস্কৃতির একটি কোনও বিশেষ শাখায় নিবদ্ধ থাকে নি। জোন্স্-কোলব্রুক যথেষ্ট ক্লাসিকাল সাহিত্যের চর্চা করেছেন, উইলসনও কম বেদচর্চা করেন নি। একথা মেনে নিতেও বাধা নেই সমগ্রভাবে এই প্রাচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞগণের অনুসন্ধানের ফলে ভারত-সংস্কৃতির বস্তুরূপটি অস্পষ্টতার আবরণ মুক্ত হয়ে দেশীয় শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টির সম্মুখে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজিনবীশ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মচেতনার পরোক্ষ প্রেরণার উৎসরূপেও এই পুরাবৃত্তচর্চার নিশ্চয় একটি ভূমিকা আছে। কিন্তু রামমোহন তাঁর জীবনদর্শনের সবটুকুই লাভ করেছিলেন জোন্স্-কোলব্রুকের গবেষণা থেকে বা মুখ্যত উইলসনের প্রেরণাই রামমোহন-ডিরোজিওর প্রতিপক্ষগণের কর্মকাণ্ডের মূলে প্রধানত কার্যকরী এমন সিদ্ধান্ত করলে ঐতিহাসিক সত্যরক্ষা হয় না। রামমোহনের সঙ্গে ইউরোপীয় গবেষকগণের যোগাযোগপ্রসঙ্গ আলোচনাসূত্রে আমরা দেখেছি, এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পার্থক্য ছিল, এবং যে সকল ক্ষেত্রে রামমোহনের চিন্তার মূলে জোন্স্-কোলব্রুক প্রভৃতির প্রেরণা কল্পিত হয়েছে তার অনেকগুলি সম্পর্কেই এমন সিদ্ধান্ত তথ্যসমর্থিত নয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সে-যুগের রক্ষণশীল প্রধানগণ উইলসনকে মুরুব্বী পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভারতে উইলসনের কর্মজীবনের প্রথম থেকে নয়। প্রথম পর্বে দেখি তিনি রামমোহনের বন্ধু, তাঁর সঙ্গে বেদান্ত-আলোচনায় নিযুক্ত। এরপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের পরিবর্তন হয়েছিল এবং তিনি ধর্মসভাগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ এবং পরোক্ষে রামমোহনের প্রতিপক্ষ হয়েছিলেন। এই অন্তরঙ্গতা গবেষণার ভিত্তিতে স্থাপিত হয় নি। শিক্ষানীতি, সতীদাহপ্রশ্ন ইত্যাদিতে দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য এর মূলে ছিল। কিন্তু সনাতনপন্থী পণ্ডিতবর্গ (যাঁরা সাধারণত ইংরেজি জানতেন না) বা রাধাকান্ত-রামকমল-ভবানীচরণ প্রমুখ ধর্মসভা-নেতৃবৃন্দের পক্ষে তাঁদের রক্ষণশীল মত-পোষণের জন্য কোনও পাশ্চাত্য গবেষণার প্রয়োজন হয় নি। পরম্পরাগত ভাবে সংস্কৃতবিদ্যার চর্চা এদেশে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে এসেছে এবং এই বিদ্যার নানা শাখায় পারঙ্গম পণ্ডিতের অভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছিল না। শাস্ত্রচর্চায় বা সামাজিক প্রশ্নের বিচারে রাধাকান্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল সমাজপতি

গণের প্রধান সহায় ও নির্ভর ছিলেন তাঁদের পোষিত এই পণ্ডিতসমাজ। সতীদাহ-সংরক্ষণ, বিধবা-বিবাহ সমর্থন, শব্দকল্পদ্রুম সংকলন-সর্বক্ষেত্রেই এই সহযোগিতা দৃশ্যমান। ডেভিড কফ যাকে কতকটা অযৌক্তিক ও অস্পষ্ট ভাবে 'মধ্যযুগীয়' ভারত-সংস্কৃতির ধারা আখ্যা দিয়েছেন, তার দ্বারা যদি স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রবাহিত ঐতিহ্য বোঝায় তাহলে একথাও স্বীকার্য যে দেশীয় পণ্ডিতগণের পক্ষে তার পাঠ নেবার জন্য উইলসনের গবেষণার দ্বারস্থ হবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বরং কথাটি উলটে বলা যেতে পারে, নিজমতের সঙ্গে এই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে উইলসন স্বয়ং ক্রমশ এঁদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর এককালীন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্রমাবসানের মধ্যেও স্পষ্টত এই ইঙ্গিত বর্তমান।

উইলসনের তথাকথিত 'মধ্যযুগীয়' গবেষণাকে উত্তরকালীন বঙ্গীয় নবজাগৃতির মূল প্রেরণা বলেই ডেভিড কফ ক্ষান্ত হন নি। তাঁর মতে উইলসন প্রণোদিত এই নবজাগৃতির ভাবাদর্শের অন্যতম প্রবক্তা হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার: His *Vedanta chandrika* which was aimed directly against Rammohun's own view of the *Vedanta* contained the germ of renaissance (sic) in which Mrityunjoy sought to challenge the puritanical image of a Vedic golden age।[১৭৩] আবার সেই হেঁয়ালী! জোন্স্-কোলব্রুক প্রচার করলেন বৈদিক স্বর্ণযুগের আদর্শ: তাঁদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করলেন রামমোহন। রামমোহনের বেদান্তমতের বিরুদ্ধে বেদান্তচন্দ্রিকা প্রণয়ন করে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহন প্রচারিত বৈদিক (আবার সেই বেদ-বেদান্তের মিশ্রণ!) স্বর্ণযুগের ধারণাকে নিরাকৃত করলেন এবং সেই সূত্রে রেণেশাসের (?) ভাবধারাও প্রতিষ্ঠিত করলেন। উক্তিগুলি পাঠককে প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। মৃত্যুঞ্জয় ইংরেজি জানতেন না; উইলসন বা অন্য কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের তথাকথিত 'মধ্যযুগভিত্তিক' গবেষণা দ্বারা তাঁর প্রভাবিত হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিলনা। জোন্স্-কোলব্রুক বৈদিক স্বর্ণযুগের কোনও কল্পনা করেন নি, রামমোহনও তাঁদের কাছে এমন কোনও ভাবাদর্শ ধার করেন নি। রামমোহন প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতি ও নিজের ভারতীয় সত্তা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ও সচেতন ছিলেন এবং প্রয়োজনমত বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্র সব

শাস্ত্রের সাক্ষ্যই নিজ বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু চিরায়ত ভারতীয় মূল্যবোধগুলিকে তাঁর জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত করে নেওয়া সত্ত্বেও তিনি দৃষ্টিতে কখনই অতীতচারী ছিলেন না। সে দৃষ্টি ছিল সর্বদা ভারতবাসীর ও মানবজাতির ভবিষ্যতে নিবদ্ধ। মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন তাঁর সময়ের একজন প্রথম সারির শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, ন্যায়, স্মৃতি ও অলঙ্কারের অধ্যাপক ;[১৩৪] বেদান্তে তাঁর কিছু প্রবেশ থাকলেও এ শাস্ত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫) এবং 'বেদান্তসার' (১৮১৫)-এর প্রতিবাদে তিনি 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) কোনও ইউরোপীয় কৃত An Apology for the Present System of Hindoo Worship নামক ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা, এর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের সচেতন রেণেশাঁস-দৃষ্টি প্রতিফলিত এমন কল্পনা হাস্যকর। মৃত্যুঞ্জয়ের মত সে-কালের রক্ষণশীল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়হীন কোনও পণ্ডিতের নিকট তাঁর গভীর শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও—এমন মনোভাব প্রত্যাশিতও নয়। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে মৃত্যুঞ্জয়ের উক্ত গ্রন্থখানি প্রচার খুবই সীমিত ছিল। ১৮৪৫ সালে Calcutta Review পত্রিকায় 'Vedantism—What is it?' শীর্ষক নিবন্ধে যুগ্মলেখক রেভাঃ উইলিয়ম ইয়েট্‌স ও রেভাঃ আলেক্‌জাণ্ডার ডাফ এই প্রসঙ্গে বলেছেন : "Of the work itself only two hundred and fifty copies were originally struck off ; and there has been no second edition ; it has long been difficult if not impossible to obtain a copy ; indeed we have never seen one except that which has fallen into our possession"।[১৩৫] ১৮১৭ সালে যে গ্রন্থ মাত্র আড়াইশখানি ছাপা হয়েছিল, যার কোনও দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি এবং ১৮৪৫-এই যা প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে, তার দ্বারা উত্তর কালে রেণেশাঁসের আদর্শ কোন মন্ত্র বলে প্রসারিত হল তা ডেভিড কফ কোথাও ব্যাখ্যা করেন নি। কিন্তু এই আমেরিকান লেখকের পরের উক্তিটি পড়ে একেবারে হতবুদ্ধি ও নির্বাক হতে হয় :..."the *Chandrika* is extremely important in the historiography of the Indian renaissance because it contained a crude form of the same kind of Hindu revivalism

that Vidyasagar and Vivekananda would express so meaningfully in prose and oratory at a later date।[১০৬] তা হলে আমরা শিখলাম, যাকে এতকাল উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি (বা রেনেশাঁস) বলে মনে করে এসেছি তা আসলে Hindu revivalism বা হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবন মাত্র (নূতন যুগোচিত ব্যাখ্যা নয় !) ; এর সূত্র নিহিত ছিল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' গ্রন্থে (যে গ্রন্থ ১৮১৭ সালে আড়াইশ খানি মাত্র ছাপা হয়ে, সেই শতকের চল্লিশের দশকে প্রায় বিস্মৃত) ; এবং এই 'বেদান্ত'সম্মত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদই আরও তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগরের গদ্যে ও বিবেকানন্দের বক্তৃতায়। তথ্যনিষ্ঠ না হয়ে মৌলিক হবার চেষ্টা করলে গবেষণার এমন করুণরসোদ্দীপক পরিণতিই ঘটে ! ডেভিড কফ খবর রাখতে ভুলে গেছেন, বঙ্গীয় নবজাগৃতির অন্যতম প্রধান নায়ক বিদ্যাসাগর কোনও অর্থেই হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী ছিলেন না ; এবং বিশেষ করে বেদান্ত (এবং সাংখ্য) দর্শনের প্রতি তাঁর তীব্র বিরূপতা ছিল। এগুলিকে তিনি প্রকাশ্যে ভ্রান্ত দর্শন আখ্যা দিয়েছিলেন। এমন কি বেদান্তমতের সঙ্গে বাহ্যত কিছু সাদৃশ্য থাকায় তিনি ইউরোপীয় দর্শনক্ষেত্রে সুপরিচিত ভাববাদী বার্কলের গ্রন্থও সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্তিতে আপত্তি করেন। এ-বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে Council of Education-এর সম্পাদক ডঃ মোয়াটকে লেখা তাঁর ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ তারিখের পত্রস্থ কয়েক পঙক্তি সুপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে (With regard to Bishop Berkley's Inquiry I beg leave to remark that the introduction of it as a class book would beget more mischief than advantage. For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute...Whilst teaching these in the Sanscrit course we should oppose them by sound Philosophy in the English course to counteract their influence. Bishop Berkley's Inquiry which has arrived at similar or identical conclusions

with the Vedanta or Sankhya and which is no more considered in Europe as a sound system of Philosophy will not serve that purpose. On the contrary, when, by the perusal of that book, the Hindu students of Sanscrit will find that the theories advanced by the Sankhya and Vedanta system are corroborated by a Philosopher of Europe, their reverence for these two systems may increase instead of being diminished)।[১৩৭] কিন্তু সাংখ্য-বেদান্তের উপর এমন হাড়ে-চটা বিদ্যাসাগর অপর এক মনীষী প্রসঙ্গে নিরপেক্ষভাবে বেদান্তের উল্লেখ করেছেন। ডেভিড কফের দুর্ভাগ্যবশত তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নন, রামমোহন রায়ঃ "১৮৩১ (যথোক্ত) খৃঃ অব্দে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি কোম্পানি সংক্রান্ত অনেক সম্ভ্রান্ত কর্ম করিয়াছিলেন; সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দু, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, ইঙ্গরেজী, ফরাসি. এই নয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও বিলক্ষণ বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, এবং স্বদেশীয় লোকদিগকে দেবদেবীর আরাধনা হইতে বিরত করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদিত পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন।······রামমোহন রায় এ দেশের একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন সন্দেহ নাই"।[১৩৮] এ বিষয়ে অন্য কোনও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বিবেকানন্দপ্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য-তিনি যদিও নব্য হিন্দু-আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও প্রভাবশালী নায়ক, কিন্তু তিনিও কোনও অর্থেই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী নন, আধুনিক যুগচেতনায় প্রবুদ্ধ এক প্রবল ব্যক্তিত্ব। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য, তিনি বেদান্ত অবলম্বন করেই জগৎসমক্ষে হিন্দুধর্মের বাণী প্রচার করেন। কিন্তু তাঁর সুবিস্তীর্ণ রচনাবলীর কুত্রাপি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামোল্লেখ নেই; এ নাম তিনি কখনও শুনেছিলেন কিনা সন্দেহ। অন্যপক্ষে তাঁর বৈদান্তিক প্রেরণার উৎস সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার জবানীতে তাঁর নিজেরই স্বীকৃতি আছে। ১৮৯৮ সালের মে মাসে নৈনিতালে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতার যে আলাপচারী হয় তার বর্ণনপ্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেন: "It was here too that we heard a long talk on Rammohun Roy, on which he [স্বামী বিবেকানন্দ] pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of

the Vedanta, his preaching of patriotism and the love that embraced the Mussulman equally with the Hindu. In all these things he [বিবেকানন্দ] claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohun Roy had mapped out.[১৩৯] দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচার কর্মসূচীর মধ্যে স্বামীজীর নিজস্বীকৃতি অনুসারে রামমোহনের প্রভাবই কার্যকরী। এর উপরও বোধ করি অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ডেভিড কফের অপর যে দুটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ আমরা বর্তমান অধ্যায়ের প্রথমে করেছিলাম সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিচার করে বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করা যেতে পারে। প্রথমত তাঁর মতে অধিকাংশ আত্মসচেতন ভারতবাসীর কাছে কোলব্রুকের বেদান্তোত্তর (কফের উক্তির সর্বত্রই এই বেদ-বেদান্তের মিশ্রণ লক্ষণীয়!) যুগ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি (···his harsh judgment on all post-Vedantic developments in Hinduism were culturally unsatisfying to most articulate Indians.).[১৪০] অপর পক্ষে উইলসনের 'মধ্যযুগভিত্তিক' গবেষণার মধ্যে বঙ্গবাসী আত্ম-আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিল কেননা ভারত ইতিহাস ও সংস্কৃতির 'মধ্যযুগ'এর সঙ্গেই বাঙালীর উৎপত্তি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ জড়িত। এই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রমশ ভারতবাসী অধিক সংখ্যায় উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে, ব্রাহ্মসমাজের মত বৈদান্তিক প্রেরণাজাত সংস্থাগুলি হিন্দুধর্মের সংস্কার না ঘটিয়ে ভারত-সংস্কৃতির মধ্যে বিজাতীয় প্রেরণা সঞ্চারিত করছে।[১৪১] কোলব্রুক উইলসনের গবেষণাকর্মকে যথাক্রমে "বৈদিক" ও "মধ্যযুগীয়" নামধেয় দুটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে ভাগ করবার পক্ষে যে কোনও যুক্তি নেই তা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গ বাদ দিলেও দেখা যাবে তাঁর আলোচনায় কফ্ 'ভারতবাসী' ও 'বাঙালী' অভিধা দুটিকে নির্বিচারে গুলিয়ে ফেলেছেন। বাঙালী সংস্কৃতির যদি কোনও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য থাকে, এবং অবশিষ্ট উত্তর-ভারতীয়গণের থেকে বাঙালীর যদি পৃথক কোনও জাতিসত্তা স্বীকার করতে হয়, তাহলে 'বাঙালী' ও 'ভারতবাসী' শব্দদুটির প্রয়োগ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। একটি পাদটীকায় তিনি ইঙ্গিত করেছেন শাক্ত ঐতিহ্য, সহজিয়া আন্দোলন, বৈষ্ণবধর্ম প্রভৃতির সঙ্গেই বাঙালী চিত্তের

যোগ সমধিক; অবশিষ্ট উত্তর-ভারতে বদ্ধমূল ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতিধারা তাকে স্পর্শ বা প্রভাবিত করেছে খুবই কম।[১৪২] সেক্ষেত্রে ইন্দো-ইউরোপীয় বেদ-বেদান্তের ঐতিহ্য কাদের কাছে বিজাতীয় প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক বা সম্ভব? বাঙালী না ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত উত্তর-ভারতবাসী? কফ একবার বলেন ভারতবাসী, একবার বলেন বাঙালী! কফের যুক্তি অনুসরণ করলে কিন্তু সিদ্ধান্ত করতে হয় একে বাঙালীরা 'বিজাতীয়' মনে করলেও অবশিষ্ট বৈদিক ঐতিহ্যে লালিত উত্তর-ভারতবাসীর তা মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য গবেষণার ক্ষেত্রে জোন্স্-কোলব্রুক-উইলসনের একাধিপত্যও আর ছিল না। এঁদের পদ্ধতি সিদ্ধান্ত ও যুক্তি বহুস্থলে পরিত্যক্ত খণ্ডিত ও সংশোধিত হয়েছিল; বহু নূতন ক্ষেত্রে গবেষণা অগ্রসর হয়েছিল; ইংলণ্ড, ইউরোপখণ্ড ও আমেরিকার বহু প্রতিভাশালী পণ্ডিত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। সুতরাং কোলব্রুক-উইলসনের প্রবর্তিত ধারাই উত্তর-প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালী বা ভারতবাসীর মানসিকতা নির্ণয়ে প্রধানত কার্যকরী হয়েছে এমন কথা বলা কিছুটা দুঃসাহসিক বৈ কি! উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকে পাশ্চাত্য ভারত-জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে যে নামটি কিছুকাল শিক্ষিত বাঙালীর মন জুড়ে বসেছিল সেটি কোলব্রুক বা উইলসন নয়, ফ্রিড্রীখ্ ম্যাক্স্‌মূ্যলের। মেকী "আর্যামী"র গর্বে আত্মচেতনাকে স্ফীত করবার সেদিনকার প্রবণতাটি ম্যাক্স্‌মূ্যলেরের বেদ-গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করবার সঙ্গত কারণ থাক বা না থাক, অন্তত কিছুদিনের জন্য যে তা তাঁর নামজড়িত হয়ে পড়েছিল এ তো ঐতিহাসিক সত্য। ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির মূলে বৈদান্তিক চিন্তাধারার প্রেরণা ছিল বলেই জনমানসে সেগুলি 'বিজাতীয়' প্রতিভাত হয়েছিল এ উক্তিও তথ্যসমর্থিত নয়। বরং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যাঁরা যত্ন করে পড়েছেন তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন রামমোহন প্রবর্তিত বৈদান্তিক ধারা থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর থেকেই ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষিত আত্মসচেতন বাঙালী মানস থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দিক থেকে ব্রাহ্মসমাজে হিন্দু পরিবেশ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন ঘটল কেশবচন্দ্রের কাল থেকে। তিনি ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মসমাজকে প্রটেস্টান্ট্‌ খ্রীষ্টধর্মের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে এলেন। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে ১৮৬৬ সালে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর "চৈতন্যের প্রভাবের আবির্ভাব পর্যন্ত কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত ব্রাহ্মগণ যীশু খ্রীষ্টকে লইয়া কিছু কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। বড়দিনের সময় যীশুর ধ্যানে দিন যাপন করা যীশুর নামে সঙ্গীত রচনা করা, উঠিতে বসিতে যীশু কীর্তন করা, অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র অধিক অনুশীলন করা প্রভৃতি চলিয়াছিল। সুতরাং লোকের ও প্রকার সংস্কার [ব্রাহ্মধর্মকে প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টধর্ম মনে করা] স্বাভাবিক।"[১৪৩] গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ কেশব-নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজকে প্রভাবিত করবার পরও খ্রীষ্টধর্মের উপর এই ঝোঁকটি মন্দীভূত হবার লক্ষণ দেখা যায় নি ; কেননা কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের একটি মৌলিক উপাদান ছিল 'পাপবোধ', যার প্রসঙ্গ তিনি বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করেছেন তাঁর নিজমুখবিবৃত আত্মজীবনতত্ত্বমূলক গ্রন্থ 'জীবনবেদ'এ।[১৪৪] হিন্দুধর্মে এই সেমিটিক পাপতত্ত্ব নেই ; তাই হিন্দু সাধনার চেয়ে খ্রীষ্টীয় সাধনা অনেকাংশে তাঁর প্রকৃতির অনুকূল ছিল। সামাজিক দৃষ্টিতেও কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত মনে করেন নি। ১৮৭২ সালের বিশেষ বিবাহবিধি প্রণয়ন কালে—আইনের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মগণ হিন্দু নন—একথা বলতেও তাঁর আপত্তি ছিল না।[১৪৪ক] এই ধারাটিকে আরও সম্প্রসারিত করেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর Faith and Progress of the Brahmo Samaj গ্রন্থে যেখানে তিনি ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন, সেখানে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের হয়ে একথা বলতে দ্বিধা করেন নি The Brahmo Samaj believes Jesus Christ to be the chief of all prophets and teachers'।[১৪৫] অবশ্য কেশবচন্দ্র তাঁর নববিধানের ভূমিতে সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে প্রবীণ শাস্ত্রবিদ্‌ গৌরগোবিন্দ রায় প্রবর্তিত হিন্দুশাস্ত্রচর্চার একটি ধারাও বর্তমান ছিল। প্রতাপচন্দ্রের খ্রীষ্টধর্ম নিষ্ণাত চিন্তা ও শেষোক্তগণের হিন্দু ভাবধারার মধ্যে তীব্র সংঘাতও কেশোবোত্তর নববিধানমণ্ডলীর ইতিহাসে একটি অধ্যায়।[১৪৬] কিন্তু গৌরগোবিন্দ রায়, কালীশঙ্কর কবিরাজ, দ্বিজদাস দত্ত প্রভৃতির অনুশীলিত প্রাচ্য

ভাবধারা শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। সাধারণের মনে ব্রাহ্মধর্ম প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টধর্ম—এমন ধারণা (সত্য হোক বা মিথ্যা হোক) থেকেই গেল। উত্তরাধিকারসূত্রে এই অপবাদের ভাগী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও হয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং এটি উপলব্ধি করে লিখেছেন : "The last and most characteristic defect, as noted by outside observers, is the greater appreciation that the members of this [Sadharan Brahmo] Samaj have shown for Western ideals and methods than those which are their own as Hindus. It is thus that the Brahmo Samaj has come to be regarded by the outside public, by Hindus specially, as Christianity in another guise. There lies the root perhaps of the present aversion of our countrymen against the Brahmo Samaj. And with the spread of Hindu revival movement that aversion is daily strengthening.... It is time that the attention of our members should be directed to the spiritual resources of our own country and our own people"।[১৪৭] দেখা যাচ্ছে জনমানস থেকে ব্রাহ্মসমাজের দূরে সরে যাওয়ার এবং সাধারণের দৃষ্টিতে বিজাতীয় প্রতিভাত হওয়ার অন্যতম কারণ ডেভিড কফ কথিত এর বৈদান্তিক ভিত্তি নয়—তার ঠিক বিপরীত, সেই বৈদান্তিক বা ভারতীয় হিন্দু ভাবধারা থেকে বিচ্যুতি। এরপর ডেভিড কফকে শুধু মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, ব্রাহ্মসমাজের মত বেদ-বেদান্ত অনুপ্রাণিত সমস্ত সংস্থাই ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতীয় ভাবধারা থেকে স্খলিত হয়েছে এই মর্মে তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন সেটিও বস্তুভিত্তিহীন। বিবেকানন্দের বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম প্রচার বা আর্যসমাজের বেদভিত্তিক হিন্দুধর্ম সংস্কার ভারতীয় হিন্দুর আত্মবিশ্বাস ও জাতীয়তাবাদকে যে সংহত ও অনেকাংশে পরিপুষ্ট করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সর্বশেষে ডেভিড কফের এই সিদ্ধান্তটিরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন যে শিক্ষাক্ষেত্রে ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫ এর মধ্যে প্রাচ্যপন্থী প্রভাব অপসারণ ও মেকলে-নীতির প্রতিষ্ঠার ফলেই পরবর্তী ইতিহাসে বঙ্গীয় নবজাগৃতির এক নূতন

কাল্পনিক ব্যাখ্যা স্বরু হয় (apologetic mythification of the historiography of the Bengal Renaissance)।[১৬৬ক] এই পনর বছরের মধ্যেই ডিরোজিওকে জ্ঞানরাজ্যের তুঙ্গে প্রায় সোক্রাতেসের আসনে বসানো হয়। হিন্দু সংস্কারকরূপে রামমোহনের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য দায়ী হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এর গোড়াপত্তন হল ১৮৪০-৪২ সালে যখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে নূতন শক্তিসঞ্চারের ব্রত গ্রহণ করলেন এবং রামমোহন-গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনই সর্ববিধ প্রগতিমূলক প্রচেষ্টার উৎস এবংবিধ সংস্কারের মূল হল Calcutta Review পত্রিকায় ১৮৪৫ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্র কর্তৃক রামমোহনের জীবনী প্রকাশ। কফের এই উক্তিগুলির মধ্যে বিভ্রান্ত চিন্তার একাধিক সূত্র জট পাকিয়ে যে গ্রন্থির সৃষ্টি করেছে তার উন্মোচন শ্রমসাপেক্ষ।

প্রথমত, এই প্রসঙ্গে ডিরোজিওর নাম কি কারণে উত্থাপিত হল তা বোঝা দুঃসাধ্য। ডিরোজিও তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে স্বীয় মনীষার উপযুক্ত কোনও গ্রন্থ রচনা বা গবেষণা করে যান নি। তাঁর অসামান্য প্রভাব ছিল মুখ্যত শিক্ষাগুরুরূপে তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র ও ভাবপরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে ওঠা সমকালীন তরুণসমাজের মনে। হিন্দু কলেজে তার পাঁচ বছর অধ্যাপনা কাল ১৮২৬ থেকে ১৮৩১-এর মধ্যে এই প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে কলকাতার মধ্যবিত্ত হিন্দু শিক্ষিত সমাজে এক ভাববিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। ডিরোজিওর অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলী গুরুর শিক্ষার ও প্রত্যক্ষ সংস্রবের ফলে দুটি বিষয়ে দীক্ষিত হয়েছিলেন—সর্বসংস্কারমুক্ত যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী ও নৈতিক মূল্যবোধ। এমন গুরুকে তাঁরা দেবতুল্য শ্রদ্ধাভক্তি করবেন ও তাঁর শিক্ষায় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য চেষ্টিত হবেন, তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলেনীতির জয়ের সঙ্গে ছাত্রদের মনে ডিরোজিওর প্রভাব সঞ্চারের কার্যকারণসম্পর্কটা কোথায়? ১৮২৬ থেকে ১৮৩১-এর মধ্যে তো শিক্ষানীতি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। ডিরোজিওর ছাত্রগণ গুরুকে সোক্রাতেসের আসনে বসিয়ে থাকুন আর নাই থাকুন গুরুর প্রতি তাঁদের অসাধারণ শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হতে স্বরু হয়েছিল হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর অধ্যাপনার কাল থেকেই। ডিরোজিওর শিক্ষায় ওঁদের মানসবিপ্লবেরও এই পর্ব থেকেই আরম্ভ। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫-এর মধ্যে এই মনোভাবই অটুট

ছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলে-নীতির প্রতিষ্ঠার ফলে নূতন করে গুরুপূজা তাঁরা আরম্ভ করেন নি। উত্তর কালে তাঁদের মনোভাব (গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও) যেটুকু সংশোধিত হয়েছিল তার মূলে ছিল মেকলের নয়, রামমোহনের প্রভাব। সপ্তম অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এর পর বাকী থাকে রামমোহন-প্রসঙ্গ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র কার্যত রামমোহনের উত্তরকালীন কাল্পনিক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী এমন সিদ্ধান্তের মূলেও ডেভিড কফের তথ্যজ্ঞানের অভাব। তিনি একটু ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছেন, রামমোহনের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অনতিপরে মনীষী বা সংস্কারকরূপে তাঁর তেমন কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল না; শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্যপন্থী প্রভাব বিদূরণের পর উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে। এটাই তাঁর মতে mythification বা রমন্যাস সৃষ্টি। ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণের সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ সংক্রান্ত আলোচনাটি যাঁরা এ পর্যন্ত ধৈর্যসহকারে পাঠ করেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন এমন ধারণার কোনও ভিত্তি নেই। পণ্ডিত ও মনীষীরূপে রামমোহনের খ্যাতি তাঁর জীবদ্দশাতেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৮২৪ সালে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এসিয়াটিক সোসাইটিদ্বয়ের সদস্যপদ দ্বারা সম্মানিত। তা ছাড়া ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ এবং মানবমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধারূপেও জীবিতকালেই তিনি বিদেশে স্বীকৃত। এ বিষয়ে অসংখ্য সমকালীন সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে দুটি এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে: রামমোহন ইংলণ্ডে পৌঁছাবার পর সেখানে ইউনিটারিয়ানদের আয়োজিত সর্ব-সম্প্রদায়ের এক সভায় তাঁকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় (১৮৩১) সেই উপলক্ষে ডঃ জন বাওরিং বলেন: "I ought not to say all we feel and hope, for I am sure that it is impossible to give expression to those sentiments of interest and anticipation with which his advent here is associated in all our minds. I recollect some writers have indulged themselves with inquiring what they should feel if any of those time-honoured men whose names have lived through vicissitudes of ages, should appear among them. They have endeavoured

to imagine what would be their sensations if a Plato or a Socrtes, a Milton or a Newton were unexpectedly to honour them with their presence......It was with feelings such as they underwent, that I was overwhelmed when I stretched out in your name the hand of welcome to the Rajah Rammohun Roy."।[১৪৮] রামমোহন আমেরিকা যান নি কিন্তু তাঁর খ্যাতি সে দেশে পৌঁছেছিল। তাঁর সঙ্গে তদানীন্তন আমেরিকার ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবিমহলের যোগাযোগের অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। শ্রীমতী এড্রিয়েন মূর তাঁর Rammohun Roy and America গ্রন্থে বহু পরিশ্রমে সেগুলিকে সংগ্রহ করে নিপুণভাবে সাজিয়েছেন। ডেভিড কফের গ্রন্থে কুত্রাপি শ্রীমতী মূরের গ্রন্থের উল্লেখ তো দেখলাম না। এখান থেকে একটি মাত্র উদাহরণ তুলছি। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৩ এর মধ্যে কোনও সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে দাসপ্রথা-বিরোধিগণের একটি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের কোনও সভ্য Address to the Members of Congress on the Abolition of Slavery নামক এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহারে তিনি ছদ্মনামে স্বাক্ষর করেন 'রামমোহন রায়', এবং ব্যাখ্যাস্বরূপ মন্তব্য জুড়ে দেন: "In closing this address allow me to assume the name of one of the most enlightened and benevolent of the human race now living, though not a white man. Rammohun Roy.।[১৪৯] সমসাময়িক বিদেশী মহলে রামমোহনের ভাবমূর্তি কি ধরণের ছিল বহু সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্য থেকে সে বিষয়ে দু'টি মাত্র দৃষ্টান্ত চয়ন করে দেশের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে।

১৮১৪-১৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত রামমোহন স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করেছিলেন; বঙ্গীয় নবজাগৃতির ক্ষেত্রে তাঁর স্থায়ী কীর্তির ভিত্তিস্থাপনও হয় এই পর্বে। ১৮১৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আত্মীয় সভা এবং বেদান্তসংক্রান্ত তাঁর প্রকাশনগুলিরও তখন থেকেই সুরু। সমকালীন সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্মবেত্তা ও সমাজসংস্কারক রূপে রামমোহন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'বেদান্তসার (১৮১৫)-এর ইংরেজি অনুবাদ (১৮১৬) এবং জার্মান অনুবাদ (১৮১৬)

এবং উপনিষদাবলীর ইংরেজি অনুবাদ সমকালীন পাশ্চাত্য জগতে কি পরিমাণ সাড়া জাগিয়েছিল তার কিছু আভাস পূর্বে দেওয়া হয়েছে। ১৮১৯ সালের মধ্যেই তিনি বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতারূপে উইলসন কর্তৃক যে বিশেষভাবে স্বীকৃত সে-প্রসঙ্গও বর্তমান অধ্যায়ভুক্ত। আত্মীয় সভা নামক যে গোষ্ঠীটি রামমোহনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম থেকেই সেটি ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলনের ধারক রূপে সমকালীন জনজীবনে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সমসাময়িক দেশী ও বিদেশী পত্রপত্রিকায় এর যথেষ্ট প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। 'এসিয়াটিক জার্নাল', 'মিশনারী রেজিস্টার', 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল', 'ইণ্ডিয়া গেজেট' প্রভৃতি থেকে এই সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণগুলি যত্নসহকারে একত্র করেছেন শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।[১৫০] এগুলির মধ্যে কয়েকটি নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করলে আত্মীয় সভা কেন্দ্রিক রামমোহন গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে। ১৮১৬ সালের 'মিশনারী রেজিস্টার' রামমোহন ও আত্মীয়-সভা সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ দিয়ে লিখছেন, "The Brahmins had twice attempted his life, but he was fully on his guard।[১৫১] 'ইণ্ডিয়া গেজেট'এ (১৮ মে, ১৮১৯ সংখ্যা এসিয়াটিক জার্নাল এ উদ্ধৃত) পাওয়া যায়: We learn with great satisfaction that the meritorious exertions of Rammohun Roy, have already produced a most powerlul effect on the Hindoos of Calcutta and its vicinity. An intelligent Correspondent has assured us that an assembly of the followers of the Vedantic Doctrines [আত্মীয় সভা] took place on Sunday the 9th instant, at the house of Kishun Mohun and Brij Mohun, sons of the late Radha Churn Majumdar... There is no question that the leaven of religious reformation is now strongly fermenting and that liberality of sentiment on general subjects, is making most rapid progress amongst the natives of all classes. At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing rules respecting

the intercourse of several castes with each other, and of the restrictions on diet, etc. were freely discussed. and generally admitted—the necessity of an infant widow passing her life in a state of celebacy-the practice of polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands were condemned as well as all the superstitious ceremonies in use amongst idolaters. Select passages from the Oppunishuds of the Veds, in support of the pure Theistical system of worship were read and explained; and Hymns or songs were sung expressive of the faith of the audience in the doctrines there taught"।[১৫২] রামমোহনের Humble Suggestions to his Countrymen শীর্ষক গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে ১৫ মার্চ, ১৮২৩ সংখ্যা 'ক্যালকাটা জার্নাল' বলেছেন, "The author himself, it would appear, is of the sect of the Vedanties who have rejected the popular polytheistical notions of the Hindus; a sect which is said to have been increasing rapidly in Bengal of late years..."।[১৫৩] এমন উদাহরণ অসংখ্য দেওয়া যায়। এই আত্মীয়সভার মাধ্যমে বিকশিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের ঐতিহ্য অবশেষে সম্পূর্ণ রূপায়িত হয় ১৮২৮ সালে স্থাপিত 'ব্রাহ্মসমাজ' নামক প্রতিষ্ঠানে। রামমোহনের সমকালীন শিক্ষিত সমাজে এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার হিসাব সে যুগের সংবাদপত্রে ও লোকসাক্ষ্যে ভালভাবেই পাওয়া যায়। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে তাকে একটি সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত করা সমাজসংস্কার ক্ষেত্রে রামমোহনের সর্বপ্রধান কীর্তি। এই কাজে নেমে তাঁকে যথেষ্ট নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল, গুপ্তঘাতকের হাতে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছিল। কলিকাতার সমসাময়িক প্রগতিশীল জনমত কিন্তু রামমোহনের জীবিতকালেই এ-বিষয়ে তাঁর ভূমিকাকে অভিনন্দিত করতে ভোলেনি। প্রিভি কাউনসিলে রাধাকান্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সতীদাহ-উচ্ছেদ বিরোধী আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হলে এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে ১০ নভেম্বর ১৮৩২ জোড়াসাঁকোস্থ ব্রাহ্মসমাজ ভবনে কলিকাতার ভারতীয়

ও ইউরোপীয় নাগরিকবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে সতীদাহবিরোধী সংগ্রামের সেনাপতি রামমোহনকে সতীদাহ-উচ্ছেদ-কল্পে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং সাধারণ ভাবে কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনকেও অভিনন্দিত করা হয়েছিল।[১৭৪] বিদেশে রামমোহনের মৃত্যুর পর স্বদেশে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেও দেখা যায় রামমোহন বিস্মৃত তো ননই, বরং তাঁর অবর্তমানে তাঁর কীর্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যেন স্বদেশবাসী (কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর বিরোধীরা পর্যন্ত) আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রকাশিত; সম্পাদনার ভার মিশনারীদের হাতে থাকলেও এটির পরিচালনা ও রচনার কাজে দেশীয় পণ্ডিতদের যথেষ্ট সাহায্য নেওয়া হত। এঁদের কোনও পক্ষই রামমোহনের বন্ধু ছিলেন না। এই পত্রিকার ১৯ ফাল্গুন, ১২৪০ (১ মার্চ, ১৮৩৪) সংখ্যায় রামমোহনের মৃত্যু প্রসঙ্গে এক শোকগাথা প্রকাশিত হয় যার রচনায় কোনও দেশীয় পণ্ডিতের হাত ছিল বলে সহজেই অনুমান করা যায়ঃ

কুমারিকা খণ্ড মধ্যে বিদ্যাসিন্ধু ছিল।
কালরূপ ভাস্করের হাতে স্থখাইল ॥
বেদান্তশাস্ত্রের অস্ত নিতান্ত এবার।
স্তব্ধ হইয়া শব্দশাস্ত্র করে হাহাকার ॥
অলঙ্কার হইলেন আকার রহিত।
দর্শন দর্শিতহীন হইল নিশ্চিত ॥
বেদ উপনিষদের ঘুচিল স্থচনা।
যন্ত্রণা যন্ত্রিত অন্য অন্য শাস্ত্র নানা ॥
ইংলণ্ডীয় শাস্ত্রে আর আরবি পারসি।
না রহিল পারদর্শি অন্য এতাদৃশি ॥
ব্রহ্ম উপাসকগণ আচার্যবিহীন।
হায় হিন্দুস্থান দেশ হইল নেত্রহীন ॥
পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যার সর্বশাস্ত্রে অতি।
রাজা রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি ॥

যা হতে প্রকাশ দেশে নানা বেদ বিধি।
হরিলেক কালচোর হেন গুণনিধি ॥[155]

একদিকে যেমন এক বিরোধীপক্ষ রামমোহনের মৃত্যুতে হিন্দুস্থানকে 'নেত্রহীন' মনে করছেন, অপর পক্ষে দেখা যায় রামমোহনের গুণগ্রাহীরা ৫ এপ্রিল ১৮৩৪ টাউন হলে এক শোক-সভা আহ্বান করেছেন যার বিজ্ঞপ্তি চোদ্দজন ভারতীয় এবং তেইশজন ইউরোপীয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত।[156] ভারতীয় স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, হরচন্দ্র লাহিড়ী, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রুস্তমজি কাওয়াসজি, মথুরানাথ মল্লিক, রমানাথ ঠাকুর ও রাজচন্দ্র দাস। এই সভার পূর্ণ বিবরণ, প্রদত্ত ভাষণাদির বয়ানসহ রক্ষিত হয়েছে।[157] সভায় রামমোহনের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং এই উদ্দেশ্যে আট হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হয় ; ১৯ বৈশাখ, ১২৪১ (৩০ এপ্রিল ১৮৩৪) সংখ্যা 'সমাচার-দর্পণ'-এ চাঁদা-স্বাক্ষরকারীদের নাম-তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল।[158] লর্ড্ উইলিয়ম বেণ্টিংক্ এই স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পাঁচশ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করেন।[159] সমসাময়িক কাগজপত্রে এই সংক্রান্ত একটি অতিরিক্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে। রামমোহনের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য এই উপলক্ষে হিন্দু কলেজ রামমোহনের নামে এক অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করবার প্রস্তাব হয়েছিল। ২০ এপ্রিল, ১৮৩৪ তারিখে স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক জেম্‌স্ ইয়ং বেণ্টিংক্‌কে লিখিত এক পত্রে এই প্রস্তাব করেন (if the means could be collected to endow a Ram Mohan Roy professorship in the Hindu College, it would be a better project perhaps than an obelisk or even a statue.)।[160] বেণ্টিংক্ এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে প্রথম কিস্তিতে পাঁচশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন, এবং প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত হলে আরও অর্থ সাহায্য করবেন বলে জানান।[161] দুঃখের বিষয় প্রস্তাবটি শেষপর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নি। এর কারণ ইয়ংএর পূর্বোল্লিখিত পত্রে আভাসিত। তিনটি গোষ্ঠী ছিলেন রামমোহনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরোধী—উইলসন পোষিত রাধাকান্ত-রামকমল-ভবানীচরণ প্রমুখ প্রভাবিত রক্ষণশীল গোষ্ঠী (বিলাতবাসী উইলসন তখন পর্যন্ত এই দলের প্রধান মুরুব্বী)

যাঁরা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভায় রামমোহনের অন্তর্ভুক্তির তীব্র ও সফল বিরোধিতা করেছিলেন। বিশপ উইলসন ও রস ডোনেলী ম্যাঙ্গল্‌স্ প্রভাবিত গোঁড়া খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় রামমোহনের স্বাধীন খ্রীষ্টধর্মশাস্ত্র আলোচনায় যাঁরা ছিলেন বিক্ষুব্ধ (ইয়ং-এর পত্রের ভাষায় Horace Wilson with his Hindu bigots and Mangles writh his Christian bigots); এবং উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের একটি ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী (ইয়ং-এর ভাষায় old-civilian party) কৃষ্ণাঙ্গ রামমোহনের স্বাধীন-চিন্তায় যাঁরা ছিলেন মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ (ইয়ং-এর ভাষায় –"To all such R M. Roy who is the sort of impersonation of the Indian march of intellect, is peculiarly hateful. They cannot endure the thought of the black sadhu coming in contact with the white [man], pretending to equality, often evincing superiority, mortifying and hateful. Does your Lordship know that R. M. R. once *called out* a civil servant for some personal indignity and made him apologise ?")।[১৬২] প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হলে হয়তো হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় অধ্যক্ষ সভা থেকে রামমোহনকে বাদ দেওয়ার অপরাধের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হত। কিন্তু এই প্রয়াস ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও উনিশ শতকের তিরিশের দশকে মধ্যবিত্ত প্রগতিশীল চিত্তে রামমোহনের স্মৃতি অম্লান ছিল। ১৮৩৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী ও ১৫ ডিসেম্বর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে কলিকাতায় যে দুটি ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, দুটি উপলক্ষেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য রামমোহনের সংগ্রাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে উদ্যোক্তারা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[১৬৩] ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫-এর মধ্যে দেশে-বিদেশে রামমোহনের গ্রন্থাদি প্রকাশও অব্যাহত ছিল। ১৮৩৯ সালে তাঁর সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা গ্রন্থাবলীর এক সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করেন তাঁর শিষ্য ও আত্মীয় সভার সদস্য অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৮৪৮এ এর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ১৮৩২ সালে তাঁর তেরখানি প্রধান ইংরেজি গ্রন্থেরও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় লণ্ডন থেকে; ১৮৪০এ দেখা যাচ্ছে কাম্পেন থেকে এই গ্রন্থাবলীর একটি ওলন্দাজ সংস্করণের প্রকাশ। এই সংক্রান্ত ডেভিড কফের উক্তি, চল্লিশের

দশকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্বর রামমোহনের গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও প্রচার করার ফলে রামমোহনের প্রতিষ্ঠা তরান্বিত হয়,—ভিত্তিহীন। রামমোহনের ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর কিছু কিছু গ্রন্থের সারমর্ম বা চূর্ণক প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ বাংলা বা ইংরেজি গ্রন্থাবলীর সংকলন তিনি কখনও সম্পাদন করেন নি। বাঙলা গ্রন্থাবলী রাজ নারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরেজি গ্রন্থাবলীর ভারতীয় সংস্করণ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় দুই খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে ১৮৮৬ ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। এখানেও কফ তথ্যনিষ্ঠ হতে ভুলে গেছেন। অপর দিকে রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস ১৮৩৪ সালে সাময়িকভাবে ব্যাহত হলেও, ১৮৪২-৪৩ সালে তাই নিয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলন করেন 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'। ঐ পত্রিকার জুলাই ১৮৪২ ও ১৬ জুলাই ১৮৪৩ এবং ২৪ আগস্ট ১৮৪৩ সংখ্যার সম্পাদকীয় ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য থেকে এ বিষয়ে কিছু খবর পাওয়া যায়।[১৬৪] জুলাই ১৮৪২ সংখ্যা প্রস্তাব করেন স্মৃতিরক্ষা সমিতি সংগৃহীত আট হাজার টাকা দিয়ে রামমোহন-গ্রন্থাবলীর কয়েক খণ্ডে এক সংস্করণ প্রকাশ করা হোক, এবং স্মৃতিভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত অর্থে ও ঐ গ্রন্থাবলীর বিক্রয়লব্ধ অর্থে একদল প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের দ্বারা বাঙলা ভাষা অনুশীলনের কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা করা হোক। উল্লিখিত পরবর্তী সংখ্যা জানাচ্ছেন 'বেঙ্গল হরকরা', 'ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া' এবং 'চার্চ অব্ ইংলণ্ড ম্যাগাজিন' এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। ২৪ আগস্ট ১৮৪৩ সংখ্যাতে বলা হচ্ছে রামমোহনের দেহাবশেষ ব্রিস্টলস্থ আর্নোজ্ ভেলে যেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে তার উপর হিন্দুস্থাপত্য রীতিতে এক স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য ভারতবর্ষ থেকে কিছু টাকা পাঠানো হয়েছে। রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ১৮৪২ সালে তাঁর প্রথমবার ইংলণ্ড যাত্রা কালে এই কাজের ভার নিতে অনুরোধ করা হয়েছিল।[১৬৪ক] অনুমান হয় তিনি ইংলণ্ডে এ কাজে যে অর্থব্যয় করেছিলেন তা প্রধানত ১৮৩৪ সালে সংগৃহীত এই স্মৃতিভাণ্ডারের গচ্ছিত টাকা।[১৬৫] ডেভিড কফ খবর রাখেন না, রামমোহনের ধারাবাহিক জীবনীপ্রকাশে কিশোরীচাঁদ মিত্রের আগে উদ্যোগী হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪২ সালে তাঁর ও প্রসন্নকুমার ঘোষের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বিদ্যাদর্শন' নামক পত্রিকায় মাসিক-

পত্রের পৃষ্ঠায়।[১৬৬] রামমোহনের বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যুর পর সংগঠন হিসাবে ব্রাহ্মসমাজ দুর্বল হয়ে পড়লেও রামমোহন প্রবর্তিত বেদান্তভিত্তিক একেশ্বরবাদী মনোভাব যে শিক্ষিত সমাজে ক্রমসম্প্রসারমান ছিল তার সমকালীন, নিদর্শন পাওয়া যাবে। জেম্‌স ইয়ং তাঁর ১৮৩৪ সালে বেন্টিংক্‌কে লিখিত পূর্বোক্ত পত্রে রামমোহন-গোষ্ঠী সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন, "which I rejoice to say gains ground daily among the rising and educated generation"।[১৬৭] ১৮৩৬ অক্টোবর সংখ্যা 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং ১ জুলাই ১৮৩৭ তারিখের সমাচার দর্পণও 'ব্রহ্মসভা'র মতবাদকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতই লক্ষ্য করেছিলেন।[১৬৮] এই পর্বে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠানগত দুর্বলতার কারণ রামমোহনের মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যতীত অন্যান্য বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকগণের এর সংস্রবত্যাগ ও অর্থসাহায্য প্রত্যাহার। কিন্তু রামমোহন প্রবর্তিত ভাবধারার মধ্যবিত্ত সমর্থন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল এটা লক্ষ্য করবার মত। তাই এই পর্বে রামমোহনসৃষ্ট ভাবপরিমণ্ডলের পরিধি ক্ষীণবল ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। শিক্ষিত জনচিত্ত থেকে রামমোহন কখনই মুছে যান নি, পণ্ডিত, মনীষী, উদার ধর্মবেত্তা, মানবপ্রেমিক ও সমাজসংস্কারকরূপে তাঁর খ্যাতি জীবদ্দশাতেই দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং শিক্ষার প্রসারহেতু ক্রমশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনের মুক্তি অধিক পরিমাণে সাধিত হওয়ায় তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাবধারা বিকাশের পক্ষে পরিবেশও ক্রমশ অনুকূল হয়ে উঠছিল। উইলসন পোষিত ধর্মসভাগোষ্ঠী, গোঁড়া খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বা উদ্ধত বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীদের বিরোধিতা তার পথরোধ করতে পারে নি। ধর্মান্ধ উদ্ধত রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে রামমোহনের স্মৃতিকে মুছে দেওয়ার ও তাঁর সৃষ্ট ঐতিহ্যের পথরোধ করবার এই সচেতন প্রচেষ্টাই পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে, রামমোহন সমকালীন সমাজে তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা দ্বারা এমন একটি গতিশীলতার সঞ্চার করেছিলেন যা তিরিশের দশকেও অব্যাহত থেকে এই প্রতিপক্ষদলগুলিকে ভীত করে তুলেছিল। বিগত শতকের চল্লিশের দশকে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজকে যখন এক শক্তিশালী সংগঠনরূপে দাঁড় করালেন তখন তিনি প্রায় সব কটি সমসাময়িক প্রগতিশীল গোষ্ঠীকেই সঙ্গে পেয়েছিলেন। তার পিছনে ছিল রামমোহনের জীবিতকাল থেকে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের

মিলন মুহূর্ত পর্যন্ত রামমোহন-ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। কিশোরীচাঁদ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় যে রামমোহন জীবনী লেখেন তার প্রস্তুতিপর্বের আভাস পাওয়া যাবে পূর্ববর্তী বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ও 'বিদ্যাদর্শন'-এর পৃষ্ঠায়, এবং ১৮৪৩ সালে রামমোহনের আদর্শে কিশোরীচাঁদের নিজেরই প্রতিষ্ঠিত Hindu Theophilanthropic Society-র কর্মসূচীতে। দেবেন্দ্রনাথ বা কিশোরীচাঁদকে শূন্য থেকে কোনও কাল্পনিক myth সৃষ্টি করতে হয় নি; একটি পরিচিত, প্রবহমান প্রগতিশীল ঐতিহ্যের ধারা তত্ত্ববোধিনী সভা ও Hindu Theophilanthropic Society-র মধ্যে পূর্ণ বিকাশলাভ করেছিল।

প্রমাণপঞ্জী

১. David Kopf *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835.*

২. *Ibid* pp 288-89.

৩. *Ibid* p. 176.

৪. J. Burckhardt *The Civilisation of the Renaissance of Italy* (English Translation), Phaidon Press, London. 1945, p. 107.

৪ক. এ বিষয়ে J. A. Symonds-এর উক্তি—"Greek was hardly less lost to Europe than Sanskrit in the first half of the eighteenth century" (*Renaissance in Italy: the Revival of Learning* London 1904. p. 48) গ্রহণযোগ্য নয়। তুলনাটি খাটে না।

৫. লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আধুনিককালে প্রাচ্যভূমির যে অংশে যে পাশ্চাত্য জাতি যখন অধিকার স্থাপন করেছে সেই অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার প্রথম যুগে সাধারণত সেই পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীই অগ্রণী হয়েছেন। ভারতীয় বিদ্যায় যেমন সম্মিলিতভাবে আদৌ ইংরেজগণ অগ্রণী তেমনি নেপোলিয়নের মিশর-অভিযানের ফলে মিশরের পুরাবৃত্তচর্চার প্রথম যুগে ফরাসী পণ্ডিতদেরই প্রাধান্য। ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ওলন্দাজ ও ফরাসী পণ্ডিতদের ভূমিকা সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। পাশ্চাত্য দেশগুলির সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে তাদের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ ছিল। লক্ষণীয় যে সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ে ঔৎসুক্য এবং এই বিষয়ক গবেষণায় উৎকর্ষের ক্রমশ অভাব ঘটছে।

৬. S. C. Sanial, "More Echoes from Old Calcutta" *Calcutta* Review

No 270 (October 1912) pp 396-97 ; এই প্রবন্ধটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬ক. দ্রষ্টব্য M. Winternitz *A History of Indian Literature* (English Translation) Vol. I, Calcutta 1927, pp. 8-9.

৭, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় রনেসাঁসে পাশ্চাত্যবিভার ভূমিকা, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃ: ৮-৯

৮. *The Letters of Warren Hastings to his Wife* (Introduced and Annotated by S. C. Grier) Edinburgh and London 1905, pp. 269-70, 273, 364-65, 387-88.

৯. Charles Wilkins *The Bhagavat-Geeta or Dialogues of Kreeshna and Arjoon in Eighteen Lectures with Notes translated from the original, in the Sanskreet or Ancient Language of the Brahmans* C. Nourse, London 1785, p. 10 ; উইলকিন্স্ কৃত ভগবদ্‌গীতার এই অনুবাদের ভূমিকাস্বরূপ হেস্টিংসের সুদীর্ঘ পত্রখানি মুদ্রিত হয়েছিল (pp. 5-16)।

১০. *Ibid* pp. 12-13

১১. "If not the founder of the Asiatic Society, he [Warren Hastings] was one of its earliest and most zealous promoters ; and he made way for Sir William Jones in the President's chair, simply because he felt that there was not at his command leisure sufficient to do justice to the office." G. R. Gleig *Memoirs of the Life of the Right Honorable Warren Hastings, First Governor General of India* Vol. III, London 1841, p. 155.

১২. T. Roebuck *The Annals of the Fort William College* (Calcutta 1819) গ্রন্থের ভূমিকায় ওয়েলেস্‌লীর এই মন্তব্যলিপি (Minute) খানি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে (pp. i-xxvii)।

১৩. *Ibid* pp. xvii-xviii

১৪. ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জন যাঁদের প্রধান লক্ষ্য কোম্পানীর সেই ডিরেক্টরবর্গ কিন্তু ওয়েলেস্‌লীর এই ব্যয়বহুল সাংস্কৃতিক উদ্যমকে সুনজরে দেখেন নি এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে উঠিয়ে দেবার কড়া নির্দেশ ১৮০২ সালেই বড়লাটকে পাঠিয়েছিলেন। এর উত্তরে ওয়েলেস্‌লী ৫ আগস্ট ১৮০২ তারিখে কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে কলিকাতা থেকে এক সুযুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ পত্র লিখে ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা সমর্থন করেন এবং কলেজ তখনকার মত রক্ষা পায়। ওয়েলেস্‌লীর পত্রখানির জন্য দ্রষ্টব্য Roebuck *Op. Cit.* pp. xxvii-liii, ওয়েলেস্‌লী হেস্টিংসের মতই সংস্কৃতিপ্রেমী ছিলেন।

১৫. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর পরিজন,

কলিকাতা, ১৩৮১, পৃ: ১৭২-৭৪ ; সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৬৯, পৃ: ১২২, ১৫২

১৬. *The Ramayuna of Valmeeki in the Original Sungskrit with a Prose Translation and Explanatory Notes,* by Willam Carey and Joshua Marshman Vol. I (The First Book) Serampore 1806 ; Vol. II (The Second Book) Serampore 1808 ; Vol. III (The Second Book) Serampore 1810. এই গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশের পাণ্ডুলিপি অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়। সম্প্রতি এক গবেষক লিখেছেন কেরী ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ খণ্ডে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (E. Daniel Potts *British Baptist Missionaries in India 1793-1837* Cambridge 1967 pp. 97-98)। কিন্তু তথ্যটি ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে কেরী কৃত্তিবাস রচিত বাঙলা রামায়ণের এক সংস্করণ ১৮০২ সালে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেন। তিনি মূল সংস্কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করেন নি।

১৭. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৮৯

১৮. A. Mayhew *Christianity and the Government of India,* London 1929, p. 162 ; সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় রণেসাঁসে পাশ্চাত্যবিদ্যার ভূমিকা, পৃ: ৪৮

১৯. Sushil Kumar De 'Western Contribution to Sanskrit Scholarship' *Presidency College Magazine.* Silver Jubilee Number, March 1939, p. 293.

২০. চার্লস গ্র্যান্টের হিন্দু সংস্কৃতি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর উপযুক্ত বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য Eric Stokes The *English Utilitarians and India* Oxford 1959, pp. 29-35 : কিন্তু লেখকের পরবর্তী মন্তব্য" "The Evangelical view stood in complete contrast to the East India Company's traditional attitude. From motive of expediency the Company had always manifested the most scrupulous regard for Indian religions, laws, institutions and customs" (p. 35)—সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেছে হেস্টিংসের আমলে নিছক শাসনকার্যের সুবিধার জন্যই কেবল ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার উপর হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বিত হয়নি। এর মূলে প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি একটি মৌলিক শ্রদ্ধাবোধও ছিল। এই ঐতিহ্য প্রভাবিত প্রথম আমলের ইংরেজ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণও এই সশ্রদ্ধ দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন ; দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য, ইংলণ্ডের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির ১৫ মার্চ ১৮২৩ তারিখের অধিবেশনে কোলব্রুকের ভাষণ *Miscelleneous Essays* Vol. I, London 1837 pp, 2-3 ; কোলব্রুক এখানে স্পষ্টই বলেছেন প্রাচ্য সভ্যতার নিকট ইউরোপেরও কিছু শিক্ষণীয় আছে।

২১. Roebuck *The Annals of the College of Fort William* Appendix IV, pp. 53-54.

২২. *Ibid* Appendix III pp. 21-45.

২৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা); সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৬৯, পৃঃ ১৭৩-২২৩

২৪. সজনীকান্ত দাস কর্তৃক উদ্ধৃত, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', পৃঃ ৮৫

২৫. সজনীকান্ত দাস কর্তৃক উদ্ধৃত, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১১২-১৩

২৬. প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌রূপে কেরীর কীর্তির এক মূল্যায়ন করেছিলেন হোরেস হেম্যান উইলসন তাঁর 'Remarks on the Character and Labours of Dr. Carey as an Oriental Scholar and Translator' শীর্ষক প্রবন্ধে। কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্‌টেস্ কেরী রচিত *Memoir of William Carey* (London 1836) গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে (pp. 587-610) এটি প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি বাঙলা ও অন্যান্য আধুনিক ভাষার ক্ষেত্রে কেরীর গবেষণাকে যথোচিত প্রশংসা করেও মন্তব্য করেছেন "Dr. Carey never engaged to any considerable extent in the prosecution of Hindu literature unconnected with philological research" (p. 593); এবং তিনিও লক্ষ্য করেছেন বাইবেল অনুবাদ ও প্রচার ছিল কেরীর প্রধান কাজ—তাঁর অন্যান্য গবেষণা ছিল এর কাছে গৌণ (These various pursuits were however secondary to the main end of multiplying and disseminating translations of Holy Scriptures) (p. 605)। উইলসনের মতে কেরীরচিত সংস্কৃত ব্যাকরণখানি (১৮০৬) আধুনিক কালে কোনও আধুনিক ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত ব্যাকরণ, এবং সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পক্ষে অতি উপযোগী গ্রন্থ (pp 561-92)। কেরী-মার্শম্যানের রামায়ণের আংশিক অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, এর মূল অংশটি অতি যত্নে সুচারুরূপে মুদ্রিত হলেও, অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য যথাযথ প্রকাশ পায়নি (p. 594)।

২৭. রামায়ণ অনুবাদের অন্যতম সহায়ক জশুয়া মার্শম্যানের দৃষ্টিতে এই অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা শুধু এইটুকু, যে এর দ্বারা সরকারী মহলে মিশনারীদের প্রতিপত্তি কিছু বাড়বে এবং এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের সাহায্যে বাইবেল-অনুবাদের কাজ ত্বরান্বিত হবে। উইলিয়ম ওয়ার্ড্ তাঁর চার খণ্ডে সম্পূর্ণ *Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos*-এর মত তথ্যপূর্ণ এবং নিষ্ঠা, যত্ন ও পরিশ্রমের পরিচয়বহ গ্রন্থে (Serampore, 1811) এক সুদীর্ঘ মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বলেছেন, হিন্দুদের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কত অসার, অনিষ্টকর ও কুসংস্কারপূর্ণ তাই উপযুক্তভাবে দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, পাশ্চাত্য কোনও কোনও সমকালীন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লেখকও হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন (Vol. I pp. 301-23)। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশনের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক এ্যান্‌ড্রু ফুলার মনে করতেন সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন বা প্রস্তাবিত 'বেদ' অনুবাদ প্রভৃতি, অতি জঘন্য কাজ (monstrous undertakings) এবং এর দ্বারা বাইবেল অনুবাদের কাজ বাধা পাবে। রামায়ণের মত তুচ্ছ অর্থহীন গ্রন্থের (something so full of 'puerility

and nonsense' as the Ramayana) অনুবাদ ও বিক্রয়ের ঔচিত্য সম্পর্কেও তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন (E. D. Potts *op. cit* pp. 91, 112)।

২৮. 'ব্রাহ্মণ সেবধি', গ্রন্থাবলী ৫, পৃ: ৪ ; এই উক্তির ইংরেজি সংস্করণ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 'The Brahmunical Magazine', *English Works* Pt, II p. 138

২৯. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ: ৯২-৯৩

৩০. 'Brief Remarks regarding modern encroachments on the ancient right of females according to the Hindu Law of Inheritance' *English Works* Pt. I p. 9

৩০ক, *The English Works of Raja Rammohun Roy* (Social and Educational) Centenary Edition, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta 1934, p. 74 ; Majumdar *Progressive Movements* p. 188 ; ১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত রামমোহন মৃত্যু-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে রামমোহন রচিত এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকাখানি লাহোরস্থ ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজের গ্রন্থাগারে আবিষ্কৃত হয়েছিল। শতবার্ষিকী উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন তার উল্লিখিত খণ্ডে পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয় (pp. 67-80)। ইংরেজি রচনাবলীর উক্ত সংস্করণের আর কোনও খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। উল্লিখিত খণ্ডটিও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। পুস্তিকাটি যতীন্দ্রকুমার মজুমদার তাঁর *Rammohun Roy and the Progressive Movements in India* গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত করেছেন (pp. 185-92)। আশ্চর্যের বিষয় পুস্তিকাটি কালিদাস নাগ ও দেবজ্যোতি বর্মণকৃত রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি। মূল পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালে লণ্ডন থেকে—প্রকাশক Nichols and Sons, Earl's Court, Cranbourn Street, Leicester Square, London।

৩০খ. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায় (রামমোহন রায় ও বেদান্ত), পৃ: ১০০-১০১

৩১. Carpenter *Last Days* p. 51

৩২. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ: ৫৪-৫৭, ৬২-৬৩

৩৩. দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃ: ১০-১৫

৩৪. অবশ্য সমকালীন মুসলমান সমাজে সর্বত্র রামমোহনের ইসলামগবেষণার প্রতিক্রিয়া সমান হয় নি। অপেক্ষাকৃত উদার মতাবলম্বী ও যুক্তিপন্থীরা যেমন তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচারপটুতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'জবরদস্ত্ মৌলভি' ; তেমনি শোনা যায় গোঁড়া রক্ষণশীলগণের পক্ষ থেকে তাঁর জীবননাশের চেষ্টাও হয়েছিল, দ্রষ্টব্য, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত', পৃ: ২৬

৩৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ: ২৯ ; *Letters and Documents* p. 48 ; ১৮০১ সাল থেকে ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের আরবী-ফার্সী বিভাগের প্রধান মুন্সী ছিলেন মৌলভি করম হসেন ; এ ছাড়া ১৮০০

থেকে ১৮১১ পর্যন্ত আরবী-ফার্সী বিভাগের বিভিন্ন পদে দ্বিতীয় মুন্সী ও সহকারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন যথাক্রমে মৌলভি আবদুর রহিম, মৌলভি জান আলি, শেখ আহমদ, মৌলভি বদর আলি, মৌলভি হুসেন আলি, তেঘ্ আলি, মৌলভি হিসাম-উদ-দীন, মিরজা নুর আলি, মৌলভি মৌলা বখ্শ, মৌলভি আব্বাস আলি, কুর্বান আলি, নাদির আলি, গঙ্গাবিষ্ণু, মিরজা হাসান আলি, মৌলভি সৈয়দ আজিম আলি, মৌলভি ফরহাৎ আলি, মৌলভি মুহম্মদ আলি, ও কুদ্রৎ আলি (Roebuck *Op Cit* Appendix III pp. 47-48)।

৩৬. *Asiatic Journal* July 1826, pp. 113-14 ; "He [Dr. Gilchrist] held in his hand a letter from a native gentleman, who understood the English language as well as he (Dr. Gilchrist) did himself. He was a man of exhaustive learning and well versed in the arts and sciences. He spoke of the justly celebrated Rammohun Roy. That individual wrote in the following terms : (the Hon. Proprietor here read extracts from two letters complimenting him (Dr. G.) on his works which he has presented to the writer). Here (continued Dr. G.) was a native of India writing in our own native language and expressing sentiments the force, truth and justice of which would do honour to any man in that court however enlightened he might be"। আমার অনুরোধে এই উল্লেখটি সন্ধান করে দিয়েছেন আমার ছাত্র শ্রীমৃণালকান্তি চন্দ।

৩৭. E. D. Potts *Op. Cit* p. 229.

৩৮. Roebuck *Annals* Appendix IV p. 54 ; সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে কেরীকে এখানে মারাঠী ভাষাও শিক্ষা দিতে হত (Roebuck' Appendix III p. 47)

৩৯. James Hobby *Memoir of William Yates of Calcutta* London 1847 p. 166.

৪০. Collet p. 114.

৪১. *Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society* Vol. VI (Bristol 1817), No. 31 (From June 1815 to January 1816) pp. 106-07.

৪২. *Ibid*, pp. 108n-109n.

৪৩. রামমোহনের খ্রীষ্টধর্মানুশীলন ঠিক কখন আরম্ভ হয় তা জানা না গেলেও, মনে করবার কারণ আছে তা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পরে নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মাধ্যমে সম্ভবত তিনি উইলিয়াম কেরীর সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে টমাস রামরাম বসু-কেরী-ফাউন্টেন অনূদিত এবং কেরী সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেস্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল (সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস' পৃঃ ১২৫) ; এবং এর পর ১৮০২ থেকে ১৮০৭-এর মধ্যে পর পর চার খণ্ডে প্রকাশিত হয় এঁদের ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদ (তদেব, পৃঃ ১৩৯)। এগুলি রামমোহন যে পাঠ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই,

কেন না উত্তরকালে এই সব অনুবাদ গ্রন্থের গদ্যশৈলীর তিনি বিরূপ সমালোচনা করতেন (Collet, pp. 122, 159)। এই পর্বে কেরীপ্রমুখ মিশনারীদের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না (Potts *Op. Cit.* p. 229)। ইংরেজি ভাষায় তাঁর জ্ঞান অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাইবেলের প্রামাণিক ইংরেজি অনুবাদ (Authorised Translation) যে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে অতি যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেছিলেন তাঁর খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক রচনাতে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্তমান। ব্যাপ্টিস্ট গোষ্ঠী ছাড়া সরকারী এ্যাংলিকান চার্চের বিশপ মিড্‌লটনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনা সম্ভবতঃ ১৮১৪ থেকেই আরম্ভ হয় (C. W. Le Bas *The Life of the Right Reverend Thomas Fanshaw Middleton* Vol. I, London 1831, pp. 72-73, 178-79, 420-21); যদিও শেষ পর্যন্ত এই সম্পর্কের অবসান ঘটেছিল মতভেদ সংক্রান্ত এক অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে (Collet pp. 125-26)। শ্রীরামপুর মিশনারীদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবার পূর্বে রামমোহন তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। মোট কথা The Precepts of Jesus (১৮২০) গ্রন্থখানি দীর্ঘদিনের সতর্ক অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল।

৪৪. এই বিতর্কে উভয় পক্ষের প্রকাশনগুলির মোটামুটি তালিকা এই: (১) রামমোহন *The Precepts of Jesus* (1820): রেভা: ডেওকার স্মিট ও ড: মার্শম্যানের সমালোচনা *Friend of India* (Monthly Series) Vol. III, No. 20 (February 1820), pp. 23-31; (২) রামমোহন *An Appeal to the Christian Public* (1820): ডঃ মার্শম্যানের সমালোচনা *Friend of India* (Monthly Series) Vol. III No. 23 (May 1820) pp. 133-39; (৩) রামমোহন *Second Appeal to the Christian Public* (1821); ডঃ মার্শম্যানের সমালোচনা *Friend of India* (Quarterly Series) Vol I. No 4 (June 1821) pp. 501-628, (৪) রামমোহন, *Final Appeal to the Christian Public*. (1823); ডঃ মার্শম্যান-এর পরেও রামমোহনের মতের বিরুদ্ধে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, দ্রষ্টব্য *Friend of India* (Quarterly Series Vol. III No. 9, pp. 89-186; No 11, pp. 393-592; কিন্তু এগুলি সমসাময়িক শিক্ষিত জনমতকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে নি। ১৭ মে ১৮২৪ তারিখের *India gazette* এই বিতর্ক সম্পর্কে মন্তব্য করেন: "...We owe it to common sense and the cause of truth, to declare that...the attack on Rammohun...appears to us to have been as injudicious and weak an effort as we ever heard of, The effect of that attack was to rouse up a most gigantic combatant in the Theological field—*a combatant who, we are constrained to say has not met his match here,*" (italics বর্তমান লেখকের) (Majumdar *Progressive Movements* No. 27, p. 72)। 'আলোচ্য বিষয়ে রামমোহনের তুল্য ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি এদেশে নেই'—এই মন্তব্যে তা স্বীকৃত। উল্লেখ করা যেতে পারে রেভাঃ উইলিয়ম ইয়েট্স ও রেভাঃ টি. স্কট রামমোহনের প্রথম দুটি *Appeal*-কে সমালোচনা করে ১৮২২ সালে *Essays in defense of important Scripture Doctrines*

in reply to the two Appeals নামক বারটি অধ্যায় সমন্বিত (পাঁচটি ক্যাটের রচিত, বাকী সাতটি ইয়েট্সের) এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থকেও সেই সময়ে কেউ কোনও গুরুত্ব দেননি (দ্রষ্টব্য উইলিয়ম ইয়েট্সকে লিখিত উইলিয়ম এ্যাডামের ৫, ১৮২৪ তারিখের পত্র—Majumdar—*Progressive Movements* No. 28, p. 56)। রামমোহনের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁর মোহমুক্ত যুক্তিনির্ভর খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রবিচারের প্রভাবে ১৮২১ সালে ব্যাপটিস্ট্ গোষ্ঠীভুক্ত রেভা: উইলিয়ম এ্যাডাম প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ (Trinitarianism) ত্যাগ করে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় মতবাদ (Unitarianism) গ্রহণ করেন। ফলে তিনি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশন থেকে বিতাড়িত হন (*Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society of* 1822, London 1822, p. 8)। ঘটনাটি যে মিশনারী পক্ষকে কতদূর বিচলিত করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে স্যামুয়েল হোপকে লিখিত রেভা: উইলিয়ম ওয়ার্ডের ৭ নভেম্বর, ১৮২১ তারিখের পত্রভুক্ত এই আর্তনাদে : "The heathen Rammohun Roy converting a Missionary! How we are fallen! O Lord, help or we perish!" (Potts *British Baptist Missionaries in India 1793-1837* p. 234)।

৪৫. পুনর্মুদ্রিত *The Calcutta Review*, October 1935, p. 61.

৪৫ক. নগেন্দ্রনাথ, পৃ: ৫০৪

৪৬. 'Second Appeal', *English Works* Pt. VI p. 52

৪৬ক. জন পার্কহার্স্ট্ (১৭২৮—৯৭) প্রণীত *An Hebrew and English Lexicon .. to which is added a Methodical Hebrew Grammar* প্রকাশিত হয় ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তী কালে এর অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছিল। রামমোহন কোন সংস্করণ ব্যবহার করেছিলেন তা জানা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রামমোহন পার্কহার্স্ট্ রচিত *A Greek and English Lexicon to the New Testament* (1769) গ্রন্থখানিও ব্যবহার করেছেন। এই অভিধানটিও তাঁর *Final Appeal* এ উল্লিখিত ; দ্রষ্টব্য *English Works* (G) Vol II, p. 425

৪৬খ. *Chronique Religieuse* (Paris) Vol III (1819), p. 390

৪৬গ. 'Second Appeal,' *English Works* VI p. 92n.

৪৭. দ্রষ্টব্য, 'Second Appeal', *English Works* Pt. VI. pp. 18, 19n, 27, 52, 53, 65n, 66-67, 75, 78, 85, 92-93, 94-95 ; 'Final Appeal', *English Works* (G) Vol II pp. 289n., 301 n., 313, 315, 316, 327, 329, 332-33, 334, 336n., 345, 355n., 366n., 368, 372-73, 374, 376n., 383-84, 397, 416n., 419, 425, 426, 427, 428, 433-34, 435n., 449n., 452, 454, 464-65, 466, 482, 484, 493n., 495, 496-98

৪৮. 'Second Appeal', *English Works* VI pp. 39-40, 55-57 ; 'Final Appeal', *English Works* (G) Vol II p. 500 ; মূল গ্রন্থটি ল্যাটিনে লেখা ; রামমোহন এখানির

ইংরেজি অনুবাদ ব্যবহার করেছিলেন ; শিরোনাম Johann Lorenz Mosheim *Ecclesiastical History ancient and modern from the birth of Christ to the beginning of the present century in which the rise and progress and variations of Church power are considered*—translated from original Latin accompanied with notes and chronological tables, by Archibald Maclaine, London 1790.

৪৮ক. *English Works* Pt. IV pp. 66, 72.

৪৯. 'Second Appeal', *English Works* VI p. 19 n ; 'Final Appeal', *English Works* (G) Vol II pp. 374, 464, 465n., 499

৫০. 'Second Appeal', *English Works* VI p. 53 ; অষ্টাদশ শতাব্দীর জেনা (Jena) নিবাসী জার্মান বাইবেল-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, পঙ্‌ক্তি-বিচারে (textual criticism) ও পাঠ-নির্ণয়ে সুদক্ষ।

৫১. *Ibid* p. 53 ; জোহন্‌ ডি. মিখায়েলিস-অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাইবেল-বিশেষজ্ঞ ; হল্যাণ্ড দেশীয় এই পণ্ডিত তুলনামূলক পদ্ধতিতে বাইবেলের ভাষা বিশ্লেষণ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

৫২. *Ibid*. p. 65 n. ; 'Final Appeal', *English Works* (G) Vol. II pp. 291n., 388n., 496n. ; 497n. ; ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাইবেল-ভাষ্যকার আর্চ্‌বিশপ উইলিয়ম নিউকোম (১৭২৯—১৮০০)। আলোচ্য প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় রামমোহন নিউকোমের দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ *An Attempt towards revising our English Translation of the Greek Scriptures* (1769) গ্রন্থখানি ব্যবহার করেছিলেন। এঁর অপর কয়েকখানি পুস্তক—*An Harmony of the Gospels* (1778) (পাঠান্তর সহ গসপেলের মূল গ্রীক সংস্করণ) ; *An Attempt towards an Improved Version…of…Ezekiel* (1778) ; *Attempt towards an Improved Version, A Metrical Arrangement and an Explanation of the Twelve Minor Prophets* (1785), ইত্যাদি। টমাস বেলসাম্‌ সম্পাদিত ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায়ের *Improved Version of the New Testam nt* প্রস্তুত করবার কাজে বিশেষ ভাবে নিউকোমের প্রথমোক্ত গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

৫৩. 'Second Appeal', *English Works* VI pp. 77, 78, 84 ; 'Final Appeal', *English Works* (G) Vol II p. 342 ; যে প্রসঙ্গে রামমোহন একাধিকবার এঁর নামোল্লেখ করে সমালোচনা করেছেন, সেই প্রসঙ্গটি বিচার করলে মনে হয় ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর স্কটল্যাণ্ড নিবাসী বাইবেল-ভাষ্যকার জন ব্রাউন (১৭২২—১৭৮৭), গ্রীক লাটিন ও হিব্রুতে এঁর পারদর্শিতা ছিল ; এঁর রচিত *A Dictionary of the Bible* (1769) ; *Self-interpreting Bible* (1778) ; *A Brief Concordance of the Holy Scriptures* (1783), এবং দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ *A General History of the Christian Church* (1777) আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রামাণিক বিবেচিত হয়।

৫৪. 'Second Appeal', *English* Works VI pp. 84, 86, 87 ; 'Final Appeal',

English Works (G) II pp. 342, 351, 360 ; জোন্স নামধের অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টধর্ম বিশেষজ্ঞ দু'জন লেখকের মধ্যে যে কোনও একজনের উল্লেখ এখানে রামমোহনের অভিপ্রেত হওয়া সম্ভব : (১) জেরেমায়া জোন্স্ (১৬৯৩—১৭২৪), যাঁর দু'খানি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ হল *A Vindicaiton of the Former Part of St. Mathew's Gospel* (1719) ; এবং *A New and Full Method of settling the Canonical Authority of the New Testament* প্রথম দুই খণ্ড (1726), তৃতীয় খণ্ড (1727) ; (২) উইলিয়ম জোন্স্ (১৭২৬-১৮০০) যিনি *The Catholic Doctrine of the Trinity proved from the Scriptures* (1756) গ্রন্থের লেখক ; এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (1767) 'A Letter to the Common People in Answer to some Popular Arguments against the Trinity' শীর্ষক একটি অধ্যায় যুক্ত হয়েছিল। আলোচ্য প্রসঙ্গ বিচারে মনে হয় দ্বিতীয় জন অর্থাৎ উইলিয়ম জোন্স্‌কেই সম্ভবত রামমোহন উল্লেখ ও সমালোচনা করেছিলেন, কেননা 'Final Appeal' -এ তিনি জোন্সের গ্রন্থকে Mr. Jones's work on the nature of Christ বলে বর্ণনা করেছেন—*English Works* (G) II p. 360.

৫৫. 'Second Appeal', *English Works* Vol. VI p. 89 ; 'Final Appeal', *English Works* (G) II pp. 321, 340, 342, 409-10, 413 501-02 ; রামমোহন ব্যবহৃত জন্ লকের বাইবেল-ভাষ্য সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ: ৭৬-৮০

৫৬. 'Second Appeal', *English Works* VI pp. 91, 92, 93 ; অ্যামব্রোজ সার্ল (১৭৪২-১৮১২) তাঁর *Horae Solitariae* গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ; এর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৭৮৭ সালে।

৫৭. *Ibid.* p. 94 ; হামফ্রে প্রিডুক্স্ (১৬৪৮-১৭২৪) *The Old and New Testament connected in the History of the Jews and Neighbouring Nations······to the Time of Christ* শীর্ষক তাঁর গবেষণাগ্রন্থ দু'খণ্ডে প্রকাশ করেন ১৭১৬-১৮ খ্রীষ্টাব্দে ; একই সময়ে ঐ গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ ছয় খণ্ডে The Connection শিরোনামে মুদ্রিত হয়। রামমোহন এই শেষোক্ত সংস্করণটি ব্যবহার করেছিলেন।

৫৮. 'Final Appeal', *English Works* (G) II pp. 291, 343n., 344n. 454.

৫৯. *Ibid.* pp. 377, 467 ; স্কটল্যাণ্ডের সুপণ্ডিত খ্রীষ্টধর্মযাজক ডঃ জর্জ্ ক্যাম্প্‌বেল (১৭১৯-১৭৯৬) ; তাঁর রচিত আলোচনা ও টীকাটিপ্পনী সহ *Translation of Gospels* (১৭৮৯) রামমোহন ব্যবহার করেছিলেন। বইখানির অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল—সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। রামমোহন অবশ্যই ১৮২৩-এর পূর্বে প্রকাশিত কোনও সংস্করণ পাঠ করেছিলেন। লেখকের অন্যান্য সুপরিচিত গ্রন্থ *Dissertation on Miracle* (1762), *Philosophy of Rhetoric* (1776), ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত *Lectures on Ecclesiastical History* (1800)।

৬০. *Ibid.* p. 358 ; গ্রন্থখানির প্রকাশক E. Justins (London, 1808)।

৬১. *Ibid.* pp. 425 469n. ; ফিলিপ ডড্রিজ (১৭০২-১৭৫১) প্রণীত ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ *Family Expositor* (1739-56) গ্রন্থখানির উল্লেখ এখানে রামমোহনের অভিপ্রেত কি ?

৬২. *Ibid.* p. 425 ; রামমোহন এখানে সম্ভবত ড্যানিয়েল হুইটবি (১৬৩৮-১৭২৬) প্রণীত *Paraphrase and Commentary on the New Testament* (দুই খণ্ডে প্রকাশিত, ১৭০৩) গ্রন্থখানি ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য প্রসঙ্গ বিচারে মনে হয় এই লেখকের ল্যাটিন গ্রন্থ *Tractatus de Vera Christ Deitate adversus Arii et Socini hareses* (১৬৯১), ও ইংরেজিতে লেখা *A Dissuasive from enquiring into the Doctrine of the Trinity* (১৭১৪) এবং *A Confutation of the Doctrine of the Sabellians* (১৭১৬) গ্রন্থ দু'খানিও রামমোহনের অপঠিত ছিল না।

৬৩. *Ibid.* p. 426.

৬৪. *Ibid.* p. 428 ; ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ববিদ ধর্মযাজক ডঃ জন ওয়েন (১৬১৬-১৬৮৩)। আলোচ্য-প্রসঙ্গ বিচার করলে দেখা যায় রামমোহন-প্রতিপক্ষ ডঃ মার্স‌্ম্যান এই বিতর্কে নিজসমর্থনে ওয়েনের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছিলেন। উত্তরে রামমোহনকে সেই মতের সমালোচনা করতে হয়। মার্স‌্ম্যান প্রসঙ্গত ওয়েন লিখিত খ্রীষ্টীয় একতত্ত্ববাদের (Unitarianism) সমালোচকমূলক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন (Dr. Owen whose work on Socinianism……ইত্যাদি)। এর থেকে অনুমান হয় এঁরা ডঃ ওয়েনের *A Brief Declaration and Vindication of the Doctrine of Trinity* (1676 : second ed. 1719) গ্রন্থখানিকে ভিত্তি করে তর্ক করেছেন।

৬৫. *Ibid.* p. 469n.

৬৬. *Ibid.* p. 425 ; সুপরিচিত বাইবেল-ভাষ্যকার ডঃ জেমস ম্যাকনাইটের (১৭২১-১৮০০) *A New Literal Translation of all the Apostolic Epistles……the Greek Texts and the Old Translation·· with a Commentary and Notes* (1795)—Four Volumes, (Second Ed. 1806-in Six Volumes) গ্রন্থখানি রামমোহন ব্যবহার করেছিলেন।

৬৭. ইহুদীধর্ম ইসলামের মতই কট্টর একেশ্বরবাদী। ইহুদীশাস্ত্রে ত্রিতত্ত্ববাদ (Trinitarianism) আবিষ্কারের চেষ্টা সেই কারণে ব্যর্থ হতে বাধ্য। মধ্যযুগে সাআদ্য (Saadya) প্রমুখ ইহুদী দার্শনিকরা খ্রীষ্টীয় ত্রিতত্ত্ববাদ খণ্ডন করবার জন্য অনেক যুক্তির অবতারণা করেছিলেন (দ্রষ্টব্য J. Epstein *Judaism-A Historical Presentation* 1959, pp. 199-200)। ইহুদী শাস্ত্রজ্ঞ রামমোহনের পক্ষে তাই এক্ষেত্রে মার্স‌্ম্যানের মত খণ্ডন সহজ হয়েছিল।

৬৮. Collet, p. 137

৬৯. Spencer Lavan *Unitarians and India : A Study in Encounter and Response* (Beacon Press 1977) p. 34

৭০. *Ibid.* pp. 33, 35-40

৭১. *English Works* Pt. II p. 80

৭২. *The English Works of Raja Rammohun Roy* (*Social and Educational*) Centenary Edition, Calcutta 1934, pp. 74-75

৭৩. *English Works* Pt III p. 4n

৭৪. Collet p. 327 ; S. N. Roy *Rammohun Roy and the English Intellectuals* Calcutta 1978, pp. 17-18 ; সংস্কৃত সাহিত্যে রামমোহন সম্ভবত কালিদাসের কাব্যনাটকের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। পূর্বোক্ত Preliminary Remarks নিবন্ধে ভারতবর্ষের উত্তর-সীমান্ত বর্ণনপ্রসঙ্গে তিনি 'কুমারসম্ভব'-এর প্রথম সর্গস্থ হিমালয়বর্ণনার প্রথম শ্লোকটির (ইংরেজি অনুবাদে) উল্লেখ করেছেন (*English Works* III p. 3n.)। ভর্তৃহরির প্রতিও সম্ভবত তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। দেখা যায় এঁকে মহাকবি আখ্যা দিয়ে এবং এঁর 'বৈরাগ্যশতক'-এর ৯০ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ করেছেন,—'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থাবলী-৬, পৃঃ ১২৫-২৬

৭৫. কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অধিবেশনে (২ ফেব্রুয়ারী. ১৭৮৬) জোন্স্ এই উক্তি করেন। অবশ্য তাঁর পূর্বে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত কিছু কিছু ভাষার বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন পাদ্রী টমাস স্টিফেন্স (ষোড়শ শতাব্দী), ফ্লোরেন্সের অধিবাসী ফিলিপ্পো সাসেত্তি (ষোড়শ শতাব্দী) ও ফরাসী পাদ্রী কারদ্যু (অষ্টাদশ শতাব্দী) ; (বিষয়টির সাম্প্রতিক সুচিন্তিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনে বিদেশী মনীষা' 'সারস্বত', শারদীয়া সংখ্যা, পৃঃ ১৩৪-৫০)।

৭৬. *English Works* Pt. IV p. 72

৭৭. 'On the possibility, practibility and expediency of substituting the Bengali language for the English', *Modern Review* December 1936, pp. 635-36 ; রামমোহনের এই রচনাটি তাঁর কোনও ইংরেজি গ্রন্থাবলীভুক্ত হয়নি।

৭৮. 'On the Vedas or Sacred Writings of the Hindus' *Asiatick Reseasrches* Vol. VIII (Calcutla 1805) pp 369-476 ; পুনর্মুদ্রিত Colebrooke *Miscellaneous Essays* Vol I, London 1837, pp 9-113

৭৯. F. Max Muller *Biographical Essays* London 1884, p. 261

৮০. *English Works* Pt. I pp 49-50

৮১. *Asiatic Journal* Vol. XI, New Series (May-August, 1833), pp. 222-25 রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির কার্যবিবরণ এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

৮২. একটু আশ্চর্যের বিষয়, সমসাময়িক ব্রিটিশ প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের এই প্রসঙ্গটি *British Orientalism and the Bengal Renaissance* এর লেখক শ্রীডেভিড কফের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

৮৩. *English Works* Pt. IV p. 104

৮৪. *Ibid.* Pt. II p. 41n ; Pt. I p. 55 ; উইলসনকে লেখা রামমোহনের উল্লিখিত পত্রটি তৃতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত।

৮৫. H. H. Wilson *Dictionary, Sanscrit and English* Calcutta 1819, p. xvi

৮৬. *Ibid* p. xvii

৮৭. পত্র দু'খানি তৃতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত।

৮৮. Colebrooke *Miscellaneous Essays* Vol 1, London 1837 p 332 ; পুনর্মুদ্রিত Colebrooke *Essays on the Religion and Philosophy of the Hindus* (New Edition), Indological Book House, Benares, 1972, Chapter IX, 'Vedanta', p 212

৮৯. দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পৃ: ১০৪

৯০. *Journal Asiatic* I Ser. Tome 5. (July 1824) p. 62 ; সবিস্তার আলোচনার জন্য প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৯০ক. *La Chronique Religeuse* Paris, Tome III (1819) : 'Notice sur la vie et les écrits de Rammohun-Roe savant bramine et sur la secte nouvelle qu'il a formée recemment dans. l'Inde', pp. 388-403

৯০খ. *Journal Asiatique*, Tome III (October 1823) pp. 243-49

৯১. ইনি উপনিষদ্ অনুবাদের ক্ষেত্রে রামমোহনের পরবর্তী ; তাঁর *Christomathia Sanscritica* (1820-21) ও *Vyasa uber Philosophie, Mythologie Literatur und Sprache der Hindu* (1826) গ্রন্থদ্বয়ে উপনিষদের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্বাচিত অংশের জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

৯২. *Revue Encyclopedique* December 1832 pp. 694-706 , প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৯৩. Garcin de Tassy *Histoire de la Literature Hindouie et Hindoustanie* Séconde Edition, Tome II, Paris 1870, p. 548

৯৪. Garcin de Tassy *Appendix aux Rudiments de la langue Hindoustanie* Paris, 1833, p. 31, No. 14 ; প্রথম পরিশিষ্টে পত্রখানি বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত।

৯৫. J. K. Majumdar, *Rammohun* Roy *and the World*, Calcutta 1975, p. 89

৯৬. *Ibid*. p. 91

৯৭. *Ibid*. p. 97

৯৮. *English Work* Pt. III p. 6n.

৯৯. রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের পত্রখানি সপ্তম পরিশিষ্টে মুদ্রিত।

১০০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'শত বৎসর পূর্বেকার বাঙালী জীবনের ছবি', প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৪৮-৬০ ; শ্রীমতী বেলনসকে লেখা রামমোহনের পত্রখানি এখানে মুদ্রিত হয়েছে ; পুনর্মুদ্রিত *English Works* Pt. IV pp. 103-04.

১০১. প্রথম পত্রখানির জন্য দ্রষ্টব্য, Collet, p 332 , *English Works* Pt. IV p. 93 ; দ্বিতীয়খানির আলোকচিত্র বর্তমান লেখক লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Oriental and African Studies-এর গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে (No. 92674) 'Collet' এর টীকায় মুদ্রিত করেছেন ; দ্রষ্টব্য Collet pp. 393-94

১০২. *Government Gazette* February 1, 1816, February 8, 1816 ; *Missionary Register*, London 1816 , *Calcutta Monthly Journal*, September 1817, December

1817, *Calcutta Journal* October 1817 প্রভৃতি সাময়িক পত্রে ভারতে, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় রামমোহনের *Translation of an abridgment of the Vedant, Munduck Opunishad, Mankookya Oopanishad, Ishopanshad, Cena Upanishad, A Defence of Hindoo Theism* প্রভৃতি গ্রন্থের সপ্রশংস আলোচনা দ্রষ্টব্য—Majumdar-*Progressive Movements* pp 3-17.

১০৩. রামকমল সেন কর্তৃক তাঁর উনত্রিশ বর্ষব্যাপী 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র নেটিভ সেক্রেটারী পদে কর্মের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ১ ডিসেম্বর ১৮৩২ তারিখে উইলসনকে লিখিত এক পত্র এসিয়াটিক সোসাইটির হস্তলিখিত কার্যবিবরণভুক্ত হয়েছে, দ্রষ্টব্য *Manuscript Proceedings of the Asiatic Society of Bengal* Vol. IV (4th July 1827 to 20th February 1833) pp. 143b-45

১০৪. Ms. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal Vol. IV p. 73

১০৫. *Ibid.* p. 77 ; ইনি পর বৎসর পদত্যাগ করেন (*Ibid* p. 101)।

১০৬. *Ibid.* p. 82b

১০৭. *Ibid.* p. 87

১০৮. *Ibid.* p. 139b

১০৯. *Ibid.* p. 157

১১০. *Ibid.* p. 68 ; উইলসনই ৭ জানুয়ারী ১৮২৯ তারিখের অধিবেশনে সদস্য পদের জন্য সর্বপ্রথম পাঁচজন ভারতীয়ের নাম প্রস্তাব করেছিলেন, প্রস্তাব সমর্থন করেন ডঃ গ্র্যান্ট্।

১১১. *Progressive Movements* No 75, pp. 133-37-এ উইলসনের পত্রখানি মুদ্রিত।

১১২. The Correspondence of Lord William Bentinck, Governor General of India 1828-1835 edited with an Introduction. by C. H. Philips, Vol I (1828-31), Oxford University Press, 1977, p. 377 ; মুদ্রিত পত্রখানির দু'একটি মুদ্রণপ্রমাদ লক্ষ্য করবার মত। মূলের 'Ramcomul' নামটি ভুল ছাপা হয়েছে 'Ramcomar' ; leading away all those...to oppose the abolition out of compliment to H. H. Wilson... 'ইত্যাদি অংশে মূলের "oppose" ক্রিয়াপদটি ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হয়নি। মূল পত্রের 'Rammohun Roy' নামটি ছাপা হয়েছে 'Ram Mohan Roy' বানানে; the address of the abolitionists' অংশে 'abolitionists' শব্দের আগে মূলের 'the' শব্দটি বাদ পড়েছে। ইংলণ্ডের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বেন্টিংকের কাগজপত্রের যে 'পোর্টল্যাণ্ড-সংগ্রহ' রক্ষিত, আলোচ্য মূল পত্রখানি তারই অন্তর্গত (পাণ্ডুলিপি সংখ্যা PW JF 451)। নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে বর্তমান লেখক এটির যে আলোকচিত্র সংগ্রহ করেছেন তারই সাহায্যে এই সংশোধন করা হল। সি. এইচ্. ফিলিপ্সের মত যোগ্য ব্যক্তির সম্পাদনায় বেন্টিংকের কাগজপত্রের যে বহুমূল্য সংস্করণটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক এত যত্নে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে মুদ্রণপ্রমাদ থাকা বিস্ময়কর ও দুঃখজনক। বিশেষত 'oppose' ক্রিয়াপদটি বাদ গেলে অর্থবৈপরীত্য ঘটে। এখানে উল্লেখযোগ্য রামকমল

সেনের মত শক্তিশালী রক্ষণশীল সমাজপতির সৃষ্ট প্রচণ্ড চাপের ফলে দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সাময়িক চিত্তদৌর্বল্য ঘটলেও তা স্থায়ী হয়নি। তিনি রামমোহনের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন এবং ইংলণ্ডযাত্রা কালে রামমোহন তাঁর হাতেই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পরিচালনের ভার দিয়ে যান। কিন্তু সনাতনপন্থীদের ক্রোধবহ্নি হতে সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক এই রামমোহন-শিষ্য অব্যাহতি পান নি। ১৮৩৫ সালে রামকমল সেন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক নিযুক্ত হবার পর কোনও এক মামলায় স্মৃতিশাস্ত্রের ভুল বিধান দেবার অভিযোগে তাঁকে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চাকরী থেকে সরানো হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের পর কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্-এর কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে রামচন্দ্র পুনর্বার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে বাহাল হয়েছিলেন (প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'আত্মীয়-সভার কথা' কলিকাতা ১৩৮১, পৃঃ ৭৮-৮৩)। রামমোহন ও উইলসনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখকের 'Rammohun Roy and Horace Hayman Wilson' *Bengal Past and Present* Vol. xcii, Part ii, no. 174 (July-December 1973) pp. 125-47

১১৩. 'সমাচার-চন্দ্রিকা', ৭ই কার্তিক ১২৩৮ বঙ্গাব্দ (১২ অক্টোবর ১৮৩১) সংখ্যা সমাচার দর্পণ কর্তৃক উদ্ধৃত—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (কলিকাতা, ১৩৮৫), পৃঃ ৪৮২-৮৩

১১৪. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য Colebrooke *Miscellaneous Essays* Vol- I, London 1837, pp. 111, 199.

১১৫. Monier Williams 'Indian Theistic Reformers' *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* New Series, Vol XIII (1881), p. 4 : রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির ১৫ নভেম্বর ১৮৮০ তারিখের অধিবেশনে অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ম্‌স আদৌ তাঁর উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করেন ; পুনর্মুদ্রিত Monier Williams *Religious Life and Thought in India* (Reprint, Calcuttu 1978), p. 479.

১১৬. Ramaprasad Chanda 'Raja Rammohun Roy's Tracts on Sati 1818-1831', *The English Works of Raja Rammohun Roy* (Social and Educational), Centenary Edition, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta 1934, notes at the end, pp. 1-12 ; সতীদাহ সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় বিচারের উপর সাম্প্রতিককালে যে-সব আলোচনা হয়েছে তৎপ্রসঙ্গে এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত নিবন্ধটি বিস্মৃত। রামমোহনের ইংরেজী রচনাবলীর এই সংস্করণটির অস্তিত্বও বর্তমানে অনেকের কাছে অজ্ঞাত।

১১৭. 'সহমরণ বিষয়' : গ্রন্থাবলী ৩, পৃঃ ৫৭

১১৮. 'বিধায়ক-নিষেধকের সংবাদ', গ্রন্থাবলী ৩, পৃঃ ১৭ ; 'জনয়ো' শব্দটি এখানে 'যাময়ো' মুদ্রিত হয়েছে।

১১৯. 'শুদ্ধিতত্ত্বম্' চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩২৬, পৃঃ ১৬, ৩৩ ; স্মৃতি-

শাস্ত্রের এই অংশগুলি আলোচনাকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুব্রতা সেন আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

১২০. অপরাদিত্য (দ্বাদশ শতাব্দী) যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর রচিত তাঁর 'অপরার্ক' টীকার উক্ত ঋগ্বেদমন্ত্রটি সতীদাহবাচক অর্থেই গ্রহণ করেছেন; দ্রষ্টব্য রমাপ্রসাদ চন্দ, প্রাগুক্ত আলোচনা (পাদটীকা ১১৬), পৃঃ ৬-৭

১২১. সহমরণ বিষয়: গ্রন্থাবলী ৩, পৃঃ ৫৭; *English Works* Pt. III pp. 132-38 ;

১২২. H. H. Wilson, "On the supposed Vaidik authority for the burning of the Hindu Widows and on the Funeral Ceremonies of the Hindus" *Journal of the Royal Asiatic Society* Vol. XVI (1856), pp. 201-14

১২৩. *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, p. 41

১২৪. *Ibid.* pp. 168-69

১২৫. *Ibid.* p. 176

১২৬. *Works of Sir William Jones* Vol. VI (London 1799) pp. 415-28

১২৭. *Asiatick Researches* Vol. VIII (1805) pp, 369-476; পুনর্মুদ্রিত Colebrooke *Miscellaneous Essays* London 1837, pp. 9-113

১২৮. Colebrooke *Miscellaneous Essays* Vol. I, London 1837, p. 113

১২৯. দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১১৭

১৩০. দ্রষ্টব্য *Asiatick Researches* Vol. IV, (1795), pp. 209-19; পুনর্মুদ্রিত Colebrooke *Miscellaneous Essays* Vol. I, London 1837, pp. 114-22

১৩১. *The English Works of Raja Rammohun Roy* (*Social and Educational*) Centenary Ed. Calcutta 1934, p. 73; *Progressive Movements* p. 188

১৩১ ক. রামমোহনের অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল যেখানে বিধবার আজীবন ব্রহ্মচর্যের পক্ষে মনুস্মৃতির প্রমাণ বর্তমান সেখানে মৃত স্বামীর চিতায় বিধবার প্রাণবিসর্জনের সমর্থক প্রমাণ অন্যান্য স্মৃতিপুরাণে থাকলেও তা অগ্রাহ্য; কেননা শাস্ত্রমতে যে-সকল স্মৃতি মনুবিরোধী সে-সবের প্রামাণ্য নেই—'মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।'

১৩২. দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'Rammohun Roy and Horace Hayman Wilson' *Bengal Past and Present* Vol. XCII, Pt. II, No. 174 (July-December 1973), p. 145, note 9; কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি বেদ সম্পাদনের ভার যাঁর উপর দিয়েছিলেন সেই E. D. Roer-কেই ইংলণ্ড থেকে পত্র লিখে উইলসন 'শতপথ ব্রাহ্মণ' প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। Roer এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক Dr. W. B. O'shaughuessy-র নিকট ৮ নভেম্বর ১৮৪৭ তারিখে লিখিত এক পত্রে একথা উল্লেখ করেছেন। Roer-এর সম্পূর্ণ পত্রখানির জন্য দ্রষ্টব্য *Journal of Asiatic Society of Bengal* Vol. XVI Pt. II (1847) pp. 1268-69; ডেভিড কফ্ কি Roer-এর এই পত্রখানির বিষয় অবগত নন?

১৩৩. Kopf *British Orientalism and the Bengal Renaissance* p. 206

১৩৪. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, প্রমাণপঞ্জী, উল্লেখ, ২২, পৃঃ ১৩৯-৪০

১৩৫. *Calcutta Review* Vol. IV, July-December 1845, pp. 41-44 ; ডেভিড কফের গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ দেখা গেল না, রামমোহন ১৮১৭ সালে 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'র মত খণ্ডন করে 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' ও 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'র ইংরেজি সংস্করণের প্রতিবাদে *A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas in reply to An Apology for the Present State of Hindoo Worship* গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করেছিলেন।

১৩৬. Kopf *Op. Cit.* p. 206

১৩৭. বিদ্যাসাগর-রচনাসংগ্রহ (পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা-দূরীকরণ সমিতি) প্রথম খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৮১, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৮

১৩৮. "বাঙ্গলার ইতিহাস", বিদ্যাসাগর-রচনাসংগ্রহ (উক্ত সংস্করণ), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২১-২২

১৩৯. Sister Nibedita *Notes on Some Wanderings with Swami Vivekananda* Third Ed. Udbodhan Office, Calcutta 1948, p. 16

১৪০. Kopf *Op. Cit.* p. 176

১৪১. *Ibid.*

১৪২. *Ibid.* p. 176, note 69

১৪৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃঃ ২৬৩

১৪৪. জীবনবেদ, সপ্তম সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৩৪, পৃঃ ৭-১৫, বিশেষভাবে তাঁর এই উক্তি স্মরণীয়ঃ "পাপবোধ আমার অনেক প্রবল ; অনেক জীবনে এত প্রবল নয়। পাপ কি, কি করিলে পাপ হয়, এ সকল বিচার করিয়া, আমার পাপবোধ হয় নাই। পাপ-দর্শনে পাপবোধ হইল ; সহজে পলকের মধ্যে পাপবোধ করিলাম। ...'আমি পাপী', 'আমি পাপী' মন কেবল এইরূপই বলিত। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া হৃদয় যদি কোন কথা বলিত, তাহা আর কিছুই নয়—কেবল বলিত, আমি পাপী।" (পৃঃ ৭)

১৪৪ ক. দ্রষ্টব্য Keshub Chunder Sen *National Marriage Reform: A Full Report of the Public Meeting at the Town Hall on the Brahmo Marriage* Bill Second Ed. Calcutta 1951, pp. 24-28 ; ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুসমাজ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠী কেশবচন্দ্র এ বক্তৃতায় খুব জোর দিয়েই সে কথা বলেছেন।

১৪৫. P. C. Mozoomdar *The Faith and Progress of the Brahmo Samaj*, Second Ed., Calcutta 1934, p. 88

১৪৬. ৭ জুন, ১৮৮৫ তারিখে *Liberal and New Dispensation* পত্রিকায় প্রকাশিত 'Our Return to the Vedanta' নিবন্ধে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-বিরোধী গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী ও সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত। কেশবের মৃত্যুর পর নববিধান ব্রাহ্মমণ্ডলী নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এ সবের কিছু বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Suresh

Chandra Bose *The Life of Protap Chunder Mozoomdar* Second Ed. Calcutta 1940, pp. 112-33; Sivanath Sastri *History of the Brahmo Samaj* Second Ed. Calcutta 1974, pp. 271-76; কেশব-শিষ্যগণের অন্তঃকলহের মধ্যে জনৈক আধুনিক লেখক লক্ষ্য করেছেন খ্রীষ্টপন্থা ও বৈষ্ণবপন্থার মধ্যে সংঘাত: "Majumdar had imagined himself to be Keshub's rightful successor to the pulpit... But Mazumdar must also have realised that his sympathy for the Unitarian conception of Christ and his intimacy with American Unitarians made him an unsuitable candidate to the ascetic faction. And sure enough, the largely Vaishnava clique barred his attempt to occupy Keshub's pulpit." David Kopf *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind* Princeton, 1979, pp. 284-85, নববিধান ব্রাহ্মসমাজের খ্রীষ্টপ্রীতি এতই প্রকট হয়েছিল যে ম্যাক্স্ মুলের প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে ১৫ জুন ১৮৯৯ তারিখে লিখিত এক পত্রের মাধ্যমে ব্রাহ্মগণকে প্রকাশ্যে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করতে আহ্বান করেন: পত্রখানির জন্য দ্রষ্টব্য Suresh Chandra Bose *Op. Cit.* pp. 267-78, এর উত্তরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেন, "A wholesale acceptance of the Christian name by the Brahmo Samaj is neither possible nor desirable within measurable time; it would lead to misconception which would only do harm. But the acceptance of the Christ spirit or as you term it the essential religion of Christ is not only possible, but an actual fact at the present, moment. Liberal souls in Christendom will have to rest content with this at least *now* and let the *name* take care of itself." অর্থাৎ প্রতাপচন্দ্র বলছেন, প্রকাশ্যে 'খ্রীষ্টিয়ান' নাম গ্রহণ করার ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটু অসুবিধা আছে—এতে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম যে খ্রীষ্টের মূল শিক্ষার আদর্শে গঠিত এতে কোনও সন্দেহ নেই।

১৪৭. Sivanath Sastri *History of the Brahmo Samaj*, Calcutta 1974, pp. 370, 372

১৪৭ ক. ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারেরও এমন একটা মত ছিল যে বঙ্গীয় নবজাগৃতির ইতিহাসে রামমোহনের অবদান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার অনেকটাই পরবর্তী কালে রামমোহন-ভক্তদের সৃষ্ট—Rammohan-myth (*On Rammohan Roy* p. 36)।

১৪৮. Carpenter *Last Days* p. 93

১৪৯. Adrienne Moore *Rammohan Roy and America* Calcutta 1942, p. 52

১৫০. দ্রষ্টব্য *Progressive Movements* এবং প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'আত্মীয়-সভার কথা', কলিকাতা ১৩৮১

১৫১. *Progressive Movements* p. 4

১৫২. *Ibid.* p. 18

১৫৩. *Ibid.* p 44

১৫৪. *Ibid.* p. 204

১৫৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ৪৮৯-৯০

১৫৬. তদেব, পৃঃ ৯০

১৫৭. *Calcutta Monthly Journal* Vol. V, New Series (May to August, 1834) 'First Memorial Meeting of *Raja* Rammohun *Ray*', pp. 253-66; সমাচার-দর্পণ ২৮ চৈত্র ১২৪০ (৯ এপ্রিল, ১৮৩৪) (সংক্ষেপসার)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ৪৯১

১৫৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৯২-৯৪

১৫৯. তদেব, পৃঃ ৪৯৪

১৬০. *The Correspondence of Lord William Bentinck 1828-35* ed. C. H. Philiphs, Vol. II, Oxford 1977, Letter No. 703, p. 1245

১৬১. ৮ আষাঢ় ১২৪১ (২১ জুন, ১৮৩৪) সংখ্যা 'সমাচার দর্পণ' ক্যালকাটা কুরিয়র থেকে এই মর্মে এক সংবাদ উদ্ধৃত করেছেন, "অবগত হওয়া গেল যে ৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণীয় কোন চিহ্ন নির্দ্ধার্যকরণার্থ যে চাঁদা হয় তাহাতে শ্রীল শ্রীযুত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব ৫০০ টাকা সহী করিয়াছেন এবং কথিত হইযাছে যে ঐ প্রসিদ্ধ ব্যাক্তর চিরস্মরণার্থ যদ্যপি বিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপকতা পদ নির্দ্ধার্যহওনের যে কল্প হইয়াছে তাহা সফল হইলে তাঁহার চাঁদায় ইহা অপেক্ষাও অধিক টাকা প্রদান করিবেন।" —সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ৪৯৪

১৬২. *Correspondence* II pp. 1245-46

১৬৩. *Calcutta Monthly Journal* Third Series, Vol. IV, 'Asiatic News' pp. 82-92

১৬৪. *Bengal Spectator* July 1842, (Vol. I, No. 5) pp. 49-50, 16th July, 1843 (Vol. II, No. 23) pp. 205-06; 24th August, 1843, (Vol. II, No. 25), p. 249

১৬৪ ক. Krishna Kripalani *Dwarkanath Tagore*; *A Forgotten Pioneer—A Life*, National Book Trust, New Delhi 1981, p. 141

১৬৫. Manmathanath Ghosh in *The Father of Modern India*: *Rammohun Roy Centenary Commemoration Volume 1933*, Pt. II, p. 218

১৬৬. বিদ্যাদর্শন', ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, ১৭৬৪ শক: 'মৃত রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত'—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (বিনয় ঘোষ সংকলিত ও সম্পাদিত) তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬৪, পৃঃ ৫৫০-৬৬

১৬৭. *Correspondence* II, p. 1246

১৬৮. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, আত্মীয়-সভার কথা, পৃঃ ৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়

রামমোহন রায়ের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তা : মূল প্রেরণা

প্রথম অধ্যায়ে রামমোহনের ভারত-চিন্তা সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগৃতির স্বরূপ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে হয়েছিল। রামমোহনের ধর্মীয় ও সমাজ চিন্তার প্রকৃতি বুঝতে গেলে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে। প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাঙলার উনবিংশ শতকীয় নূতন চিন্তাধারাকে 'রেণেশাঁস' আখ্যা দেওয়া চলে কি না—এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে একটি বিতর্ক সম্প্রতি বেশ জমে উঠেছে। কেউ কেউ উক্ত নবজাগৃতিপর্বকে 'রেণেশাঁস' বলতে স্পষ্টত অনিচ্ছুক। এঁদের মনে এই প্রসঙ্গে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় রেণেশাঁস তথা যুগ-পরিবর্তনের একটা তুলনা সর্বদা বর্তমান। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণের সাহায্যে এঁরা যখন দেখেন ইউরোপীয় রেণেশাঁস ঘটিত সর্বাত্মক পরিবর্তনের লক্ষণ আধুনিক বঙ্গীয় নবজাগরণপর্বের মধ্যে সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখনই এঁরা সিদ্ধান্ত করেন, এই যুগকে 'রেণেশাঁস' আখ্যা দেওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অপর পক্ষের অবশ্য এ ক্ষেত্রে 'রেণেশাঁস' শব্দটির প্রয়োগে আপত্তি নেই। বিতর্কটি খুবই সাম্প্রতিক। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে মনীষী ও বুদ্ধিজীবী মহলে এই দ্বিধা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী ও দ্রষ্টা অরবিন্দ প্রকাশ করেছিলেন ভাববাদী দৃষ্টিতে রচিত তাঁর ক্ষুদ্র কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ গ্রন্থ The Renaissance in India। ছাব্বিশ বছর পরে সুপরিচিত মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার রচনা করেন তাঁর Notes on the Bengal Renaissance (১৯৪৬)। অরবিন্দ-দর্শন ও মার্ক্সবাদের মধ্যে দুই মেরুর তফাৎ; আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে দুই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতেও তাই। কিন্তু প্রসঙ্গত 'রেণেশাঁস' শব্দটির ব্যবহারে দু'জনই দ্বিধাহীন। একটু তলিয়ে দেখলে পরিষ্কার হয়, আলোচ্য প্রসঙ্গে 'রেণেশাঁস' অভিধার প্রয়োগে আপত্তি উক্ত শব্দার্থ সম্পর্কে

এক সংকীর্ণ ধারণা প্রসূত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় রেনেশাঁস অবশ্যই ইতিহাসের একটি চিহ্নিত যুগ ; এবং ইউরোপীয় ইতিহাসে সাধারণ অর্থে 'রেনেশাঁস' শব্দটি এই যুগবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য ইতিহাসের নজির নিলে দেখা যাবে সেখানেও দেশকালগত কয়েকটি বিশেষ অর্থে ঐতিহাসিকগণ শব্দটি স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করেছেন। নবম শতাব্দীতে সম্রাট শার্ল্‌মান্‌-এর রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে জ্ঞানানুশীলনের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, মধ্যযুগ-বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকরা তাকে সাধারণভাবে আখ্যা দিয়েছেন Carolingian Renaissance ; তেমনি দশম শতাব্দীতে জার্মান সম্রাট প্রথম অটোর রাজত্বকালে দরবার পোষিত বিদ্যাচর্চার ধারাকেও কোনও কোনও ঐতিহাসিক Ottonian Renaissance বলতে দ্বিধা করেন নি। দ্বাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিত্তজাগরণকে 'রেনেশাঁস' আখ্যা দিয়ে এ সম্পর্কে তো হাস্‌কিন্স্‌ একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থই রচনা করেছেন।[২] বিংশ শতাব্দীতে নূতন চীনের বুদ্ধি-মুক্তির আন্দোলনকে 'রেনেশাঁস' সংজ্ঞা দিতে দ্বিধা করেন নি এই আন্দোলনেরই অন্যতম নায়ক হু শিহ্‌।[৩] ইতিহাস ঘেঁটে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত আরও উদ্ধার করা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বহু শব্দের মত 'রেনেশাঁস শব্দটিও ইতিহাসে ব্যবহার হয়ে আসছে সামান্য ও বিশেষ দুরকম অর্থে। সাধারণ ভাবে এটি বোঝায় ইউরোপীয় ইতিহাসের এক যুগান্তকারী পর্বাধ্যায়কে ; আর দেশকালগত বিশেষণ যুক্ত হয়ে এটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ বিশেষ দেশের বিভিন্ন সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যের বিকাশপর্ব বা বুদ্ধিমুক্তি-আন্দোলন সম্পর্কে। ইতিহাসে পৃথক দেশকালগত পরিবেশ প্রতিটি ঘটনার বিশিষ্ট চরিত্র নির্দিষ্ট করে। একটির লক্ষণ অপরটির সঙ্গে হুবহু মিলবে এমন প্রত্যাশা করা বৃথা। সুতরাং দেশ, কাল, চরিত্র ভিন্ন বলেই বা প্রভাবের দিক দিয়ে ইউরোপীয় রেনেশাঁসের মত সর্বাত্মক হয় নি বলেই বঙ্গীয় নবজাগরণকে রেনেশাঁস বলতে অস্বীকার করা ইতিহাসে দীর্ঘকাল প্রচলিত এক শব্দপ্রয়োগবিধিকে কতকটা অকারণে অবজ্ঞা করা ভিন্ন আর কিছু নয়।

তবু এ-কথা স্বীকার্য, বঙ্গীয় (বা অরবিন্দের ভাষায় ভারতীয়) রেনেশাঁসের আলোচনা প্রসঙ্গে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকীয় ইউরোপীয় রেনেশাঁসের প্রেক্ষাপট স্বভাবত মনে আসে। যদি কেউ সেই কারণেই পাশ্চাত্য রেনেশাঁসের লক্ষণগুলি নির্বিচারে উনিশ ,শতকের বঙ্গীয় নবজাগৃতির উপর আরোপ করতে

চান, তিনিও একটি সর্বস্বীকৃত ঐতিহাসিক বিচারপদ্ধতিকে অযৌক্তিক ভাবে অগ্রাহ্য করবার অপরাধে অপরাধী হবেন ; কেন না উভয়ের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে একান্ত গরমিল, সুতরাং চরিত্রেও মৌলিক প্রভেদ। পূর্বতন লেখকগণের মধ্যে অরবিন্দ এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত দুটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন : There is a first question, whether at all there is really a Renaissance in India. That depends a good deal on what we mean by the word...The word carries the mind back to the turning point of European culture to which it was first applied ; that was not so much a reawakening as an overturn and reversal, a seizure of Christianised, Teutonised feudalised Europe by the old Graeco-Latin spirit and form with all the complex and momentuous results which came from it. That is certainly not a type of renaissance that is at all possible in India. There is a closer resemblance to the recent Caltic movement in Ireland, the attempt of reawakened national spirit to find a new impulse of self expression which shall give the spiritual force for a great reshaping and rebuilding :...But even here the analogy is not complete.।"[৪] নিজস্ব কেল্টীয় (Celtic) সংস্কৃতির যুগোপযোগী পুনরুজ্জীবনের মধ্যে নবজাগ্রত আয়ার্ল্যাণ্ড নূতন করে আবিষ্কার করেছিল তার জাতিসত্তা ; উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত এই প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত আধুনিক আয়ার্ল্যাণ্ডের সেই চিত্তজাগরণ যা সৃষ্টি করেছে তার সাহিত্যে ইয়েট্স-লেডি গ্রেগোরী-জন মিলিংটন শিন্‌জ-লেনক্স রবিনসন-মারে-ওকেসী-জর্জ রাসেল-কলাম-ক্লার্ক্-ও'সুলিভান-গোগার্টি-হিগিন্স-পিয়ার্স্-ম্যাক্‌ডোনাগ্-জোসেফ মেরী প্লান্‌কেট প্রভৃতির কীর্তিমণ্ডিত নবযুগ। এর সঙ্গেই জড়িত আধুনিক আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রজাতন্ত্রভিত্তিক স্বাধীনতা আন্দোলন। অরবিন্দ সঙ্গত

ভাবেই লক্ষ্য করেছেন সাম্প্রতিককালে আয়ার্ল্যাণ্ডের এই আত্ম-আবিষ্কার-প্রক্রিয়ার সঙ্গে বঙ্গ-ভারতীয় রেণেশাঁসের সাদৃশ্য। কিন্তু কোনও ঐতিহাসিক তুলনাই যে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হতে পারেনা এ বিষয়েও তিনি সচেতন। তাঁর সাবধানবাণী মনে রেখে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রকৃতি বিচার প্রসঙ্গে আমাদের দু'দিকের আতিশয্যই বাদ দিতে হবে। এই নবজাগৃতিকে বিশেষ অর্থে রেনেশাঁস বলতে আপত্তি থাকবে না; একে ইউরোপীয় রেনেশাঁসের অবিকল প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করাও চলবে না।

বাঙ্‌লার উনবিংশ শতকীয় সংস্কার-আন্দোলনগুলির চরিত্র বুঝতে হলে, যে চিন্তাবিপ্লবকে বঙ্গীয় (বা ভারতীয়) রেণেশাঁস আখ্যা দেওয়া হয়েছে তার বিশেষ লক্ষণটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পাশ্চাত্য সংঘাত ও পাশ্চাত্য সংস্পর্শ যে প্রধানত এই নবচিন্তা ও নবদৃষ্টিভঙ্গীর মূলে এ বিষয়ে অবশ্য মতদ্বৈত নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে একটা কথা যেন একটু মাত্রাতিরিক্ত জোর দিয়েই ঘোষিত হয়ে চলেছে যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনই বাঙালী মধ্যবিত্ত মানসবিপ্লবের কারণ এবং উত্তর কালে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা কিছু সৃষ্টিশীল উদ্যম তা সবকিছুই এই একটি প্রেরণার উৎসমুখ থেকে সঞ্চারিত।[৪ক] কথাটার অনেকখানি সত্য, কিন্তু সবটুকু নয়; যদি হত তাহলে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে মেকলে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, ছিন্নমূল (এবং অবশ্যই ঔপনিবেশিক শাসনের তল্পিবাহক) যে একটি শ্রেণী গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন (তাঁর ভাষায় Indian in blood and colour but English in tastes, in opinions and in morals and in intellect), তা আমরা বাস্তবে রূপান্তরিত দেখতে পেতাম। উল্লিখিত রেণেশাঁসের প্রথম সারির কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায়,—যেমন, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ প্রভৃতি,—তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে কেবলমাত্র পাশ্চত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রবর্তনের দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীতে এঁদের আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করা চলে না। ভারতবর্ষের নিজস্ব একটি সুপ্রাচীন, পরম্পরাগত ঋদ্ধিবান সভ্যতা আছে। সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর অন্ধকারময় চিত্তশূন্যতার দুর্দিনেও তার প্রাণশক্তি ও আহরণোৎসুক্য নিঃশেষিত হয় নি,

মহৎ উত্তরাধিকারেরও বিলুপ্তি ঘটেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন চিন্তাজগতে রামমোহন রায়ের কাল থেকে যাঁরা নায়কত্ব করেছেন তাঁদের সকলেরই চিত্ত যে এই স্বদেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বদ্ধমূল ছিল এই বৈশিষ্ট্যটি প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার। এঁদের নিজ নিজ চিন্তায় ও কর্মক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে অনুপুঙ্খগত পার্থক্য যথেষ্ট ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু মৌলিক আত্মসংস্কৃতি-চেতনাতে এঁরা সকলেই এক ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। এই সমৃদ্ধ ও উর্বরা ভূমির উপর নূতন যুগের পাশ্চাত্য চিন্তার ধারাবর্ষণের ফলেই রেণেশাঁস-ফসলের জন্ম, প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য। বস্তুত রেণেশাঁসের প্রতিনিধিস্থানীয়গণ প্রত্যেকেই নিজস্ব ধরণে অতি সচেতন ভাবে যে লক্ষ্যসিদ্ধির প্রয়াস পেয়েছেন তার সামান্যলক্ষণ হল এই: দেশে নবাগত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে ভারতবর্ষের নিজস্ব চিরায়ত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে পরীক্ষা করে সমুচিত গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুগোপযোগী নূতন জীবনদর্শন গড়ে তোলা। এই প্রয়াস থেকেই আধুনিক বঙ্গীয় রেণেশাঁস তার বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণটি লাভ করেছে। একালের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এই অভিমত অতি স্পষ্টভাবে যদুনাথ সরকারের রচনায় অভিব্যক্ত। ভারতে ইংরেজ অধিকার ও তন্মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় চিত্তের সংস্পর্শ এই নব চিন্তালোড়নের জন্য দায়ী একথা তিনি যেমন জোর দিয়ে বলেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রিয়াশীল ভূমিকা:"

"The Indian Renaissance was possible only because a principle was discovered by which India could throw herself into the full current of modern civilisation in the outer world without totally discarding her past She could approach the temple of modern art and science not as a naked beggar, not as an utter alien, but as a backward and at present impoverished country cousin of Europe. She had a spiritual and intellectual heritage of which she need not be ashamed before the world. In fact India was not called upon to plume herself in the borrowed feathers of European civilisation, she had only to assimilate modern

thought and modern arts into her inner life without any loss of what she had long possessed."। [8] রামমোহনের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ক চিন্তা ও সংস্কারক হিসাবে তাঁর ভূমিকাকে এই স্বসংস্কৃতির পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অঙ্গস্বরূপ দেখলে তবেই সে সম্পর্কে সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা করা সম্ভব হবে।

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ভুক্ত আলোচনার ধারা যাঁরা অনুসরণ করেছেন তাঁরা মনে করতে পারবেন, তার মধ্যে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমত তাঁর বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবন বিদেশী-সংস্পর্শ-বর্জিত একান্ত ভারতীয় পরিবেশে অতিবাহিত হওয়ার এবং এই পর্বে যথেষ্ট পর্যটনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে তাঁর স্বদেশচেতনা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়; দ্বিতীয়ত তাঁর আদি শিক্ষাদীক্ষা, বিশেষত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষানুশীলন এবং হিন্দু-মুসলিম শাস্ত্রাধ্যয়ন সম্পন্ন হয়েছিল সম্পূর্ণ পরম্পরাগত দেশীয় পদ্ধতিতে, পাঠশালা-টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-মাদ্রাসার পাঠক্রম অনুসারে। হিন্দুশাস্ত্রে সে অনুশীলন মাত্র উপনিষদ্-বেদান্তে আবদ্ধ থাকেনি পুরাণ-তন্ত্র ভিত্তিক পরবর্তী কালের অধ্যাত্ম সম্পদ্‌কেও আত্মসাৎ করেছিল। আরবী-ফার্সীতে স্বচ্ছন্দ পারদর্শিতার ফলে ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে তাঁর জন্মেছিল অসাধারণ অধিকার। হিন্দী-উর্দু আয়ত্ত করায় ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের সঙ্গে তিনি চিত্তের গভীর যোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন এই পর্বে। যদি প্রচলিত কাহিনী সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে (মহাযান) বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের সিদ্ধান্ত সমূহ তাঁর একান্ত অপরিচিত ছিল না, যদিও এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলবার উপায় নেই। পঞ্চম অধ্যায়ে তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে, সমকালীন ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাগবেষণার সঙ্গে রামমোহনের যথেষ্ট পরিচয় থাকলেও তাঁর ভারতজিজ্ঞাসার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উক্ত কেতাবী গবেষণার সঙ্গে পরিচয় হবার পূর্বেই তাঁর ভারত-চেতনা ও ভারতজিজ্ঞাসার মৌল প্রকৃতিটি নিজস্ব পদ্ধতিতে নির্ণীত হয়ে গিয়েছিল। কোনও কোনও বিষয়ে যেমন বেদান্ত ও পুরাণ-তন্ত্রের আলোচনায় রামমোহনের অগ্রগামিত্ব এবং স্বকীয়ত্ব তথ্যের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। সুতরাং প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে যে আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান প্রসঙ্গে তার সারমর্ম আর একবার উদ্ধার করা

যেতে পারে: রামমোহন ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করবার পূর্বেই প্রাচ্য চিন্তার প্রভাবে তাঁর মন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। তাঁর চিন্তার বিচার ও মূল্যায়ন উপযুক্ত ভাবে করতে হলে তাঁর জীবনদর্শনের এই প্রাচ্য বুনিয়াদটি সম্পর্কে সচেতন থাকা বিশেষ প্রয়োজন। পরবর্তী জীবনে বহু সাধনায় পাশ্চাত্য বিদ্যায় যে পারদর্শিতা তিনি লাভ করেন তা ছিল এই মৌল প্রাচ্য চিন্তার পরিপূরক।[৬] প্রতীচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের নিকষে পরীক্ষিত ও পরিমার্জিত হয়েই তাঁর বিদগ্ধ প্রাচ্য সত্তা যুগোপযোগী নূতন জীবনচর্যার ভিত্তি অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়েছিল।

রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক চিন্তার আলোচনা ও মূল্যায়ন প্রচেষ্টার গোড়াতেই একটি প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক রামমোহন-চর্চার ক্ষেত্রে একটা কথা মাঝে মাঝে একটু উচ্চকণ্ঠে শোনা যায় যে, আপন স্বরূপে রামমোহনের প্রকৃতি ছিল আধ্যাত্মিকতাবিবর্জিত; সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি কাজে তিনি ধর্মকে প্রয়োজনীয় উপায় স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন, কেননা হিন্দু সমাজব্যবস্থা ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই কোন ধর্মের উৎকর্ষ-বিচারের সময় তিনি প্রধানত লক্ষ্য রাখতেন সেটি কতদূর জনকল্যাণের সহায়ক হতে পারে। সিদ্ধান্তটি কিন্তু নূতন নয়; যতদূর জানা যায় এটি সর্বপ্রথম চালু করেন কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত রামমোহন সংক্রান্ত তাঁর সুপরিচিত ইংরেজি নিবন্ধে। তাঁর দৃষ্টিতে রামমোহনকে কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে জড়িত করে দেখলে তাঁকে ভুল বোঝা হয়—এমন কি ধর্মের চিরন্তন তত্ত্বগুলি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাদানুবাদও নিষ্ফল: "All speculations as to his belief in the abstract truth of any religion founded on his advocacy of certain doctrines connected with it or his attendance at its place of worship, are obviously futile. For Rammohun Roy was a religious Benthamite and estimated the different creeds existing in the world not according to his notion of their truth or falsehood, but his notion of their utility; according to their tendency, in his view, to promote the maximization of human happiness and the minimization of human

misery...He was according to our humble opinion. essentially a theo-philanthropist।"[৭] রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কিশোরীচাঁদ লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর 'তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্'এ বিবৃত যুক্তিমূলক সার্বভৌম একেশ্বরবাদের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে কিশোরীচাঁদের সমকালীন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং একালে আবদুল ওয়াদুদের রচনাতেও অনেকাংশে অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত।[৮] সাম্প্রতিক কালে রামমোহনের ধর্মমত সংক্রান্ত আলোচনাতে এই পুরানো মতটির প্রতি কিছু বেশীমাত্রায় প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে অবশ্যই অনেকখানি সত্য আছে যার আলোচনা যথাস্থানে করবার প্রায়োজন হবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে রামমোহন আদৌ একজন গভীর অধ্যাত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট হলেও কিংবদন্তী ও তথ্যের সংযোগে তাঁর সত্তার অঙ্গীভূত অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার স্বরূপটি আমাদের কাছে গোপন থাকে না। একথা অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ নেই, তিনি জীবনের এই পর্বে পারিবারিক বৈষ্ণবধর্মে একান্ত বিশ্বাসী ও প্রচলিত বৈষ্ণবাচার পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন। মাতৃকুলের প্রভাবে শাক্ত তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাবও হয়তো তাঁর জীবনে এই সময় থেকেই সঞ্চারিত। ভাগবতের একটি অধ্যায় সমাপ্ত না করে জলগ্রহণ না করা, বর্ধমান জেলার পরমহংসর নিকট যাতায়াত, তান্ত্রিক পুরশ্চরণ ক্রিয়া পালনে উৎসাহ ইত্যাদি টুকরো টুকরো চিত্র একটি সিদ্ধান্তকেই নির্দেশ করছে : গতানুগতিক ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের মধ্যেই তিনি সে-সময়ে নিজ ধর্মজিজ্ঞাসার তৃপ্তি-অন্বেষণে রত। কিন্তু পূর্বতন বহু ব্যাকুলাত্মার মতই যখন তিনি অভ্যস্ত আচরণের গণ্ডীর মধ্যে জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন না তখনই আরম্ভ হল তাঁর নানা ধর্মশাস্ত্র মন্থন ও নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষের বিচিত্র আধ্যাত্মিক উপলব্ধির রাজ্যপরিক্রমা। রামমোহনের এই অধ্যাত্মচেতনা ও ধর্মজিজ্ঞাসা তাঁর অন্যতম মৌলিক চরিত্রবৈশিষ্ট্যরূপে বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রচুর তথ্য ও যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর দুই জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কলেট।[৯] পরবর্তী জীবনভাষ্যকারগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমুখেরও একই সিদ্ধান্ত। তরুণ বয়স থেকেই নানা ধর্মের মূল সত্য অন্বেষণের মধ্য দিয়ে রামমোহনের একটি উদ্দেশ্যই

পরিস্ফুট, নিজের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে একটি বিশুদ্ধ, সার্বভৌম ও যুক্তিসিদ্ধ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। এখানে তিনি ইতিহাসের অপরাপর সাধক ও ধর্মজিজ্ঞাসুগণেরই সগোত্র,—সকল বাহ্য স্থূলতার অন্তরালে উপনিষদের যুগ থেকে প্রবাহিত ভারতবর্ষের সর্বসংকীর্ণতামুক্ত উদার অধ্যাত্ম-সাধনার ধারারই অন্তর্ভুক্ত। এই সত্যটিই আমাদের ধরিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ যখন তিনি বলেন, "এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী"।[১০] রামমোহনের সমগ্র জীবনের ধর্মানুশীলন এই সাক্ষ্যই দেয়, ধর্ম তাঁর কাছে বিশুদ্ধ বুদ্ধির স্তরে আবদ্ধ বা মাত্র সমাজ-সংস্কারের অস্ত্রস্বরূপ ছিল না। তাঁর জীবনে 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন্‌'এর যুক্তিবাদ কালক্রমে নিজ গুরুত্ব না হারিয়েও অনেকখানি সংশোধিত হয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রের ও সাধনপদ্ধতির মাধ্যমে অভিব্যক্ত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছিল। তিনি জ্ঞান-ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাসমূলক ধর্মজীবন লাভ করেছিলেন। এই একান্ত ভগবদ্-বিশ্বাস ও নির্ভর তাঁর বহু উক্তিতে পরিস্ফুট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে চয়ন করা যেতে পারে। 'বেদান্তসার'এর ইংরেজি অনুবাদ Translation of an Abridgment of the Vedant (১৮১৬)-এর ভূমিকার উপসংহারে নিজ কর্ম সম্পূর্ণ ঈশ্বরকে নিবেদন করে তিনি লিখছেন: By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong...But these, however accumulated, I can tranquilly bear, trusting that a day will come when my humble endeavours will be viewed with justice,—perhaps acknowledged with gratitude. At any rate, whatever men may say, I cannot be deprived of this consolation: my motives are acceptable to that Being, who beholds in secret and compensates openly"।[১১] চূড়ান্ত নির্ভরস্থল এখানে মানুষের পরিবর্তে ঈশ্বর। এর পাশাপাশি পাঠ করা যেতে পারে কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় (১৮১৭) সংযুক্ত সেই প্রার্থনা: "হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ

হইতে বহির্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এবং সর্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর।"[১২] এ যাচ্ঞা ব্যাকুলাত্মা সাধকের। ১৬ জুলাই ১৮৩১ তারিখে উইলিয়ম আলেক্জাণ্ডারকে লিখিত পত্রে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নিভৃত হৃদয়ের আর এক চিত্র: "However I thank the Supreme Author and Ruler of the universe, that by a firm reliance on His goodness and overruling providence, which bring good out of evil, I have been enabled to survive and overcome these severe afflictions and to learn from them resignation to the Divine Will, of humility and distrust of human strength and the vain and transitory nature of all worldly affairs. "Whom the Lord Loveth He chasteneth;" by temporal calamities we are taught to withdraw the heart from things which are perishable and to fix it upon those which are eternal."।[১৩] এ উক্তি ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ ভক্তের যিনি সমস্ত দুঃখ ও নির্যাতন স্নিগ্ধ অন্তরে মাথায় তুলে নিয়েছেন এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে যে ঈশ্বর এ সবের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ তাঁকে আরও বেশী করে নিজের কোলে টেনে নিচ্ছেন। অন্যত্র এক কথোপকথন প্রসঙ্গে (১৮৩২) তিনি মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে বলেন,— "I would reflect how weak and poor and sinful I am, rather than how perfect in my morals and how pure and great and good I am become—Pride is not for man—Worm of Dust! he cannot think of himself too humbly."।[১৪] এই উক্তি প্রকৃত দীনাত্মার। এমন উদাহরণ আরও অনেক বাড়ানো চলে। উপাসনা ও প্রার্থনা রামমোহনের নিত্যকর্ম ছিল এমন নির্ভরযোগ্য দেশী ও বিদেশী সমকালীন সাক্ষ্য বর্তমান। তাঁর পরিচারকের উক্তি অনুসারে ঈশ্বর স্মরণ ও উপাসনা দিয়ে তাঁর দিন আরম্ভ হত।[১৫] ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী জ্যানেট হেয়ার ইংলণ্ডে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং মৃত্যুশয্যায় তাঁকে সেবা করেছিলেন; তাঁর সাক্ষ্য: "He was...in a constant habit of prayer and was not interrupted in

this by her presence; whether sitting or riding he was frequently in prayer. He told Miss H. that whenever an evil thought entered into his mind he prayed. She said, "I do not believe you ever have an evil thought!" He answered, O yes, we are all liable to evil thought"।[১৬] সুতরাং রামমোহনের ধর্মচিন্তা ও ধর্মসংস্কারের মূলে একটি ব্যক্তিগত বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রেরণা সারা জীবন বর্তমান ছিল এটি ধরে নিলে তাঁর সংস্কারকসত্তার সামগ্রিক মূল্যবিচার সহজ হয়। তাঁর রচনা থেকে কিছু কিছু নির্বাচিত অংশের উপর বা একটি কোনও বিশেষ গ্রন্থের উপর নির্ভর করলে এ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তে কিছুটা অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা থেকে যাবার সম্ভাবনা।

যদি রামমোহনের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা ও তৎসংক্রান্ত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন কেবলমাত্র এই ব্যক্তিগত সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকত তাহলেও ইতিহাসে তাঁর ধর্মচিন্তা ও শাস্ত্রব্যাখ্যার মৌলিকতার জন্য তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হতেন, যেমন তাঁর পূর্বে ভারতবর্ষে আরও অনেক মনীষী ও সাধক হয়েছেন। কিন্তু এঁদের সগোত্র হয়েও একটি ক্ষেত্রে ইনি এঁদের সকলের চেয়ে পৃথক ও মৌলিক। এ মৌলিকতার ভিত্তি তাঁর এই প্রত্যয় যে, ধর্ম যেমন একদিকে কতকগুলি নিত্য, অপরিবর্তনীয়, দেশকালোত্তীর্ণ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি অপরদিকে তার একটি সমাজবদ্ধ বা সামাজিক রূপ আছে; আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তার সামাজিক সত্তার মতই পরিবর্তনশীল এবং সমাজ-বিবর্তনের নিয়মের দ্বারা শাসিত। ধর্মের সঙ্গে সমাজের এই অবিচ্ছেদ্য যোগটি রামমোহন তাঁর অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সংস্কারের সমস্যাকে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিতে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। সে দৃষ্টি মাত্র ব্যক্তিতেই আবদ্ধ থাকেনি, সমষ্টিকেও নিজ পরিধিভুক্ত করেছিল। যে লোকশ্রেয়সের আদর্শ রামমোহনের জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু তার মূল এইখানে। বহুদিন পূর্বে অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর সম্পর্কে যে মূল্যবান উক্তি করে গেছেন আজও তার যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না: "রামমোহন রায়ের পূর্বে আমাদের দেশে কোন জ্ঞানী বা সাধক ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের এমন কি আইন প্রভৃতি লোকবিধিতত্ত্বের এমন যে

ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সেই জন্য বরাবর দেখা যায়, আমাদের দেশের ধর্মপ্রবর্তকগণ সমাজকে কোথাও ঘাঁটান নাই; সমাজকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার কৈলাস শিখরে তাঁহারা ভক্তবৃন্দকে লইয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় যেমন ধর্মের জঙ্গল সাফ করিতে লাগিয়া গেলেন, তেমনি সমাজের সঙ্গে ধর্মের সেতু বাঁধার কাজেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল। এ একেবারে আধুনিক কালের ভাব।"[১৭] রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্যের ফলে দেখা যায়, ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত দেশের পূর্বেকার প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তাঁর ধারণার মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। দেশবাসীর ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন আনবার চেষ্টা মধ্যযুগের জ্ঞানী সাধকরা যে করেননি তা নয়। তাঁদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-দর্শনের মধ্যে উদারতা ও গভীরতারও অভাব ছিলনা। রামমোহনের চিত্ত যে এঁদের দ্বারা কতকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল এমন প্রমাণের অভাব নেই এবং এ প্রসঙ্গের আলোচনাও যথাস্থানে প্রয়োজন হবে। কিন্তু রামমোহনের অনন্যতা হল ধর্ম ও সমাজের অচ্ছেদ্য যোগ বিষয়ক তাঁর বিদগ্ধ চেতনায়। ধর্মের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন বলতে তিনি বুঝতেন এক সুপ্রাচীন অট্টালিকার জোড়াতালি দেওয়া, মেরামতী কাজ নয়, হিন্দুধর্মের বহুযুগ সঞ্চিত অসংখ্য কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের একটির বা একাধিকের বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্ছেদ নয়; তা যুগপৎ ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন—যেমনটি ঘটেছিল পাশ্চাত্য রেণেশাঁস প্রভাবিত রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে। সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তা এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি এই বিষয়ে তাঁর চিত্তকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল।

ধর্মসংস্কার বিষয়ে ইউরোপীয় রিফর্মেশন আন্দোলনের পূর্বদৃষ্টান্ত যে তাঁর সামনে বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল তার নিদর্শন আছে। আলেক্‌জাণ্ডার ডাফের জীবনীকার জর্জ্‌ স্মিথের উক্তি অনুসারে রামমোহন কথাপ্রসঙ্গে ডাফের নিকট মন্তব্য করেছিলেন: "Having read about the rise and progress of Christianity in apostolic times and its corruption in succeeding ages and then of Christian Reformation which shook off these corruption and restored it to its primitive purity, I began to think that something similar might have

taken place in India and similar results might follow here from a reformation of popular iodlatry"।[১৮] এ কথা সুবিদিত যে ইউরোপীয় রিফর্মেশন আন্দোলনের মূল প্রেরণা আধ্যাত্মিক হলেও তার প্রভাব ও ফলাফল কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ধর্মজীবনে সীমাবদ্ধ ছিল না। বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্রবিন্যাস এর দ্বারা গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। অপরপক্ষে বলা যায় নূতন যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহের প্রভাব মানুষের ধর্মচিন্তা, ধর্মাচরণ ও ধর্মসংগঠনেরও উত্তরোত্তর রূপান্তর ঘটিয়েছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্যে ধর্মের সঙ্গে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধটি সুপরিস্ফুট ; টনীর ভাষায়—'It had obviously two sides. Religion influenced to a degree which to-day is difficult to appreciate, men's outlook on society. Economic and social changes acted powerfully on religion।"[১৯] ট্রোয়েল্‌টশ্, ম্যাক্স্ ভেব্যার, টনী প্রভৃতির গবেষণা ইদানীংকালে ইউরোপীয় ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্যের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। সামাজিকভাবে প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম যে আধুনিক কালে ধনতন্ত্রের সংগঠন এবং অর্থ নৈতিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিস্থাপনের অনুকূল মানসিকতা ও সংস্কারের জন্ম দিয়েছিল এ সত্য এখন প্রতিষ্ঠিত। কোনও বন্ধুকে লিখিত ১৮ জানুয়ারী ১৮২৮ তারিখের এক পত্রে হিন্দুধর্মসংস্কাররূপ সমস্যাটি সম্পর্কে রামমোহনের অনুরূপ সর্বাত্মক দৃষ্টিই প্রতিফলিত : I agree with you that in point of vices the Hindus are not worse than the generality of Christians in Europe and America ; but I regret to say that the present system of religion adhered to by them is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, intrdoucing innumerable divisions and sub-divisions of castes, has entirely deprived them of patriotic feeling, and multitudes of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise...It is I think, necessary

that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort." ।[২০] সংস্কারক রূপে রামমোহনের আধুনিকতার মৌলিক ভিত্তি এইখানে। ধর্মসংস্কার যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তরে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের পরিবর্তন নয়, তার যে একটি বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ভূমিকা আছে, রাজনৈতিক স্বৈরাচার ও সামাজিক শোষণের প্রতিষেধক রূপেই যে তার পূর্ণ সার্থকতা—এই সত্যের স্বীকৃতিই তাঁর চিন্তার বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত তাঁর পূর্বে আর কোনও অধ্যাত্মশাস্ত্রবিদ্ ধর্মনায়কের ভাষায় এ তত্ত্ব এমন স্পষ্ট ও সুতীক্ষ্ণ ভাবে প্রকাশ পায়নি যেমন আমরা লক্ষ্য করি তাঁর এই উক্তিতে: "The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers but between liberty and tyranny throughout the world, between justice and injustice and between right and wrong. But from a reflection on the past events of history, we clearly perceive that liberal principles in politics and religion have been long and steadily gaining ground notwithstanding the opposition of despots and bigots." ।[২১] সুতরাং রামমোহনের ঈপ্সিত ধর্মসংস্কারের তত্ত্বগত ভিত্তিটি ছিল সর্বাত্মক ও বিশ্বজনীন; তার প্রয়োগক্ষেত্র স্বভাবত ছিল ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যার ইতিহাস, সংগঠন ও বিধিব্যবস্থা ছিল শুধু তাঁর সুপরিচিত এবং সু-অধিগত নয়, তাঁর ব্যক্তিসংস্কারের অঙ্গীভূত; এবং তাঁর ভরসা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কের মত ইতিহাসের উপর, যেখানে তিনি পাঠ করেছিলেন মানবপ্রগতির স্বাক্ষর। কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহনকে 'ধর্ম জগতের বেন্থামপন্থী' (religious Benthamite) আখ্যা দিয়ে সাধারণ ভাবে সম্ভবত তাঁর সংস্কারকসত্তার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রামমোহনের ব্যক্তিগত গভীর ধর্মবিশ্বাসকে উপেক্ষা না করে ও অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে যদি নিরপেক্ষ ভাবে কিশোরীচাঁদের সিদ্ধান্ত বিচার করা যায় তাহলে তার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

রামমোহনের পত্র থেকে উদ্ধৃত দুটি অংশে যে ইঙ্গিত প্রকাশিত সেটিকে

অনুসরণপূর্বক তথ্য বিচার করলে দেখা যাবে, সমকালীন ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণে তাঁর দৃষ্টি গভীরলক্ষ্যচারী। ইউরোপীয় ইতিহাস তিনি আগ্রহ সহকারে পাঠ করেছিলেন। সম্ভবত তিনিই এযুগের প্রথম শিক্ষিত ভারতবাসী যিনি এর রেনেশাঁস থেকে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ব্যাপী অধ্যায়টির সামাজিক তাৎপর্য পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করেন। এই পর্বেই ইউরোপের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের ক্রমাবলুপ্তি ও সংগঠিত নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিরূপে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রম-অভ্যুত্থান। রামমোহন এই সর্বতোমুখী সামাজিক পট-পরিবর্তনের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কেবল যে সচেতন ছিলেন তা নয়—তাঁর কালের সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতির তাঁর মতে, এটি ছিল প্রধান উৎস। প্রথম অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত রামমোহনগোষ্ঠীর মুখপত্র Bengal Herald-এর ১৩ জুন ১৮২৯ তারিখে সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতে এই মনোভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত।[২২] দীর্ঘ রচনাটির পুনরুদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে উক্ত সম্পাদকীয় বক্তব্যকে সংক্ষেপে এই ভাবে বিশ্লেষণ করলে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝা যাবে: '(১) গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও বঙ্গদেশের সর্বত্র অর্থসম্পদের প্রচুর বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে; (২) অপরাপর কারণের মধ্যে এই সর্বাংগীণ শ্রীবৃদ্ধির তিনটি মুখ্য কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে: পূর্বাপেক্ষা জমির মূল্যবৃদ্ধি; অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন; এবং ক্রমশ অধিক সংখ্যায় ইউরোপীয়-সমাগম। জমির মূল্যবৃদ্ধির উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গত তিরিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় যে জমির দাম ছিল পনর টাকা, বর্তমানে (১৮২৯) সেই পরিমাণ জমির দাম কুড়ি গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে তিনশ টাকা; অনুপাতে মজুরীর হারও যথেষ্ট বেড়েছে: (৩) এই ভাবে জমির মূল্যবৃদ্ধি ও সাধারণভাবে মূল্যমানের উর্ধ্বগামিতার জন্য সমাজে এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে পূর্বে যার অস্তিত্ব ছিল না। এই নবগঠিত শ্রেণী অভিজাত সমাজ ও সাধারণ দরিদ্র মানুষের মধ্যবর্তী এবং এই শ্রেণীভুক্তদের প্রভাব সমাজে ক্রমবর্ধমান। উক্ত নূতন শ্রেণীর সংগঠিত হবার পূর্বে দেশের ধনসম্পদ অল্পসংখ্যক (অভিজাত) ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত ছিল, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ তাদেরই উপর নির্ভরশীল হয়ে দেহে মনে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করত। হিন্দু-সমাজের সর্বগ্রাসী নৈতিক অধঃপতনের এটিই ছিল মুখ্য কারণ; (৪) এই নূতন

মধ্যবর্তী (middling) শ্রেণীর আবির্ভাব এক নবযুগের সূচনা করেছে ; কেন না ইতিহাসে দেখা যায় যেখানেই এমন এক শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হয়েছে সেখানেই স্বাধীনতা (freedom) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; ইংলণ্ডের উদাহরণ নিলে দেখা যাবে নর্মান-বিজয়ের পর সেখানেও সমাজ প্রধানত ভূম্যধিকারী ও ভূমিদাস (serfs) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ; কিন্তু টিউডর যুগে এসে ধনবণ্টন অপেক্ষাকৃত সুষম হল এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ব্যবস্থা আরও অগ্রসর হওয়ায় অলিভার ক্রমওয়েল যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলেন তা পৃথিবীর সমীহ ও শ্রদ্ধা অর্জন করল ; সমাজে দুটি মাত্র শ্রেণী থাকার বিড়ম্বনা যে কি তার উদাহরণ স্পেন, যেখানে বিত্তশালী সম্প্রদায় উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনও ভূমিকা গ্রহণ না করে স্বচ্ছন্দ আলস্যে দিন কাটায়—এবং পোলাণ্ড, যেখানে ভূমিদাসরূপে জমির সঙ্গে কৃষকদেরও ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এই জাতীয় বহু ঐতিহাসিক উদাহরণ আমাদের সামনে থাকায় ধরে নেওয়া অন্যায় হবে না, বঙ্গদেশে সাম্প্রতিক কালে এই মধ্যবর্তী শ্রেণীর উদ্ভব দেশের পক্ষে সর্বাধিক আশার কথা।' প্রথম অধ্যায়ে প্রসঙ্গত বলেছি, এই নিবন্ধ রামমোহনের নিজস্ব রচনা কি না বলা কঠিন তবে এটি যে তাঁর এবং তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মতামত প্রতিফলিত করছে এতে সন্দেহ নেই। চতুর্ভাষী Bengal Herald আদিতে ছিল একান্ত ভাবেই রামমোহন-মণ্ডলীর মুখপত্র। উক্ত রচনাটি ইউরোপের আধুনিককালীন সামাজিক রূপান্তরের তাৎপর্য বিশ্লেষণে যেমন যথার্থ, রামমোহন নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর সংস্কারচিন্তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশেও তেমনি সার্থক। বোঝা যাচ্ছে রামমোহন ধর্ম বা সমাজ সংস্কারকে বিচ্ছিন্ন বা শৌখিন ব্যক্তিগত পুণ্যকর্মরূপে কল্পনা করেন নি ; তাঁর এবং তদীয় অনুবর্তিগণের মতে, পাশ্চাত্য সংঘাতজনিত নূতন ধনবণ্টন ব্যবস্থা সূচিত হওয়ার ফলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে রূপান্তর ঘটছে সেই অনিবার্য পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও লোকব্যবহার-সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাগুলিরও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কেন না নূতন সমাজবিন্যাসের ফলে যে শ্রেণী ক্রমশ সংগঠিত হচ্ছে ও প্রাধান্য লাভ করছে তা উত্তরোত্তর কামনা করবে সর্বক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই। এই বন্ধনমুক্তির আন্দোলন থেকেই আসবে অবশ্যম্ভাবী সংস্কার-আন্দোলন এবং তার নেতৃত্বও থাকবে এই নবোত্থিত শ্রেণীর হাতে। এই বিশ্লেষণ থেকে রামমোহনের সংস্কার-চেতনার দুটি লক্ষণ পরিস্ফুট হয় : প্রথমত

সংস্কার মূলত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা রূপে কল্পিত নয়, সামাজিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে এর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে; দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্য চিন্তালব্ধ ঐতিহাসিক দৃষ্টি দ্বারা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্র—এগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়—অতি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ এবং সেই কারণেই ধর্মসংস্কার সমাজসংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনও একসূত্রে বাঁধা; একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। লোক-কল্যাণের আদর্শ ভারতবর্ষে প্রাচীন বা মধ্যযুগে যে না ছিল এমন নয়। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে দানপুণ্যের আদর্শের সঙ্গে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করবার মত।

প্রথম অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, উত্তরকালে মার্ক্স ও এঙ্গেল্স ইতিহাসে বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন রামমোহন গোষ্ঠীর মুখপত্র Bengal Herald এর পূর্বকথিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রকাশিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার অংশত সিদ্ধান্তগত সাদৃশ্য আছে।[২৩] পাশ্চাত্য সংস্পর্শে ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় রূপান্তর তরান্বিত হয়ে দেশ দ্রুত মধ্য থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হবে এই বিশ্বাসই রামমোহন ও বঙ্গীয় রেনেশাঁসের পরবর্তী নায়কগণের মনোভাবকে সাময়িক ভাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুকূল করেছিল এতেও সন্দেহ নেই।[২৪] এ বিষয় মার্ক্সের চিন্তাসূত্রকে যদি আরও কিছুদূর অনুসরণ করা যায় তা হলে দেখতে পাব তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা সম্পর্কে প্রায় রামমোহনের সঙ্গে এক সুরেই কথা বলেছেন: "England it is true in causing a social revolution in Hindustan, was actuated only by the vilest interests and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not, whatever may have been the crimes of England she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution...

England has to fulfil a double mission in India: One destructive, the other regenerating—the annihilation of

old Asiatic society, and laying of the material foundations of Western society in Asia.

Arabs, Turks, Tartars, Moguls, who had successively overrun India, soon became *Hinduized*, the barbarian conquerors being by an eternal law of history, conquered themselves by the superior civilization of their subjects. The British were the first conquerors superior, and therefore, inaccessible to Hindu civilization. They destroyed it by breaking up the native communities, by uprooting the native industry, and by levelling all that was great and elevated in the native society. The historic pages of their rule in India report hardly anything beyond that destruction. The work of regeneration hardly transpires through a heap of ruins. Nevertheless it has begun.

The political unity of India, more consolidated, and extending farther than it ever did under the Great Moguls, was the first condition of its regeneration. That unity, imposed by the British sword, will now be strengthened and perpetuated by the electric telegraph. The native army, organized and trained by the British drill-sergeant, was the *sine qua non* of Indian self-emancipation, and of India ceasing to be the prey of the first foreign intruder. The free press, introduced for the first time into Asiatic society, and managed principally by the common offspring of Hindus and Europeans, is a new powerful agent of reconstruction. The zemindari and ryotwari themselves abominable as they are, involve two distinct forms of private property in land—the great desideratum of Asiatic

society. From the Indian natives, reluctantly and sparingly educated at Calcutta, under English superintendence, *a fresh class is springing up, endowed with requirements for government and imbued with European science.* (italics গ্রন্থকারের). Steam has brought India into regular and rapid communication with Europe, has connected its chief ports with those of the whole south-eastern ocean, and has revindicated it from the isolated position. The day is not far distant when by a combniation of railways and steam vessels, the distance between England and India, measured by time, will be shortened to eight days, and when that once fabulous country will thus be actually annexed to the Western world।[২৫] মার্ক্সের এই রচনা ১৮৫৩ সালের। তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: (১) তিনি ভারতীয় সভ্যতাকে মূলত হিন্দু সভ্যতা বলেই ধরে নিয়েছেন; তাঁর মতে পূর্বে আরব, তুর্ক, মুঘল প্রভৃতি যে সব গোষ্ঠী বিজেতারূপে ভারতে প্রবেশ করেছে তারা সকলেই ছিল সভ্যতায় ভারতীয়দের (তথা হিন্দুদের) চেয়ে নিকৃষ্ট এবং সেই কারণে হিন্দু সভ্যতার প্রভাব তাদের গ্রাস করেছে; ইংরেজরাই ইতিহাসে প্রথম ভারত-আক্রমণকারী যাদের সভ্যতা ভারতীয়দের (তথা হিন্দুদের) থেকে শ্রেষ্ঠ। আধুনিক ভারত-ইতিহাসে ইংরেজ শাসনের দুই ভূমিকা—একটি পূর্ণমাত্রায় ধ্বংসকারীর এবং শোষকের; অপরটি নবজাগরণ ও সমাজবিপ্লব (regeneration, social revolution) আনয়নকারীর: (২) এই দ্বিতীয় ভূমিকার যে কয়েকটি লক্ষণ মার্ক্স নির্দেশ করেছেন তা এই: ব্রিটিশ শাসনাধীনে স্থাপিত ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য; ব্রিটিশ শিক্ষাধীনে গঠিত পাশ্চাত্য রণকৌশলে অভ্যস্ত ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী; মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা; চিরস্থায়ী ও রাইয়ৎওয়ারী ভূমিব্যবস্থা, যেগুলি প্রজাশোষণমূলক হলেও জমিতে ব্যক্তিগত মালেকানার সূচনা করেছিল; পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে এবং শাসনতন্ত্রে শিক্ষিত (হিন্দু) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব; রেলপথ বাষ্পীয় জাহাজ টেলিগ্রাম ইত্যাদির প্রবর্তনের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি।

এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মার্ক্সের সিদ্ধান্ত,—ইংরেজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ তার নির্মম শোষণ ও লুণ্ঠন সত্ত্বেও আধুনিক যুগে ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক সমাজ-বিপ্লব আনয়নে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তিগণ ১৮২৯ সালে তাঁদের মুখপত্রে নিজস্ব ভাষায় সংক্ষেপে প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সে-সময়ে রেলপথ টেলিগ্রাম ইত্যাদি প্রবর্তিত হয় নি তাই তাঁদের পক্ষে সে-সবের উল্লেখ সম্ভব ছিল না। তা ভিন্ন পার্থক্য মাত্র একটি জায়গায় এবং তা ব্যক্তিগত। জড়বাদী মার্ক্স এই রূপান্তরকে স্বভাবত দেখেছেন ইতিহাসের এক অচেতন অথচ অমোঘ প্রক্রিয়ারূপে; তাঁর মতে ইংলণ্ড হল—'the unconscious tool of history in bringing about that revolution'। ঈশ্বরবিশ্বাসী রামমোহন ভারতে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের মধ্যে অনুভব করেছেন ইতিহাসে বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায়ের সিদ্ধি।[২৬] ইংরেজ শাসনকে যে তখনকার মত রামমোহন ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলজনক জ্ঞান করেছিলেন তার মূলে ছিল এই দৃষ্টি। নতুবা, ভারতের ইংরেজ রাজত্বের অন্ধকার দিকটি সম্পর্কে তাঁর চেতনার অভাব ছিল না। এ বিষয়ে রামমোহনের মন জানবার সুযোগ যাঁদের সর্বাধিক ছিল তাঁদের অন্যতম উইলিয়ম এ্যাডামের উক্তি স্মরণীয়: "He [রামমোহন রায়] saw—a man of his acute mind and local knowledge could not but see—the selfish, cruel and almost insane errors of the English in governing India, but he also saw that their system of government and policy had redeeming qualities not to be fournd in the native governments।[২৭] ভবিষ্যতে ভারত ইংরেজ শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন হবে এমন কল্পনাও যে তাঁর মনে ছিল প্রথম অধ্যায়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে তা দেখা গেছে।[২৮]

ধর্মসংস্কারকে রামমোহন এই ভাবে একটি সামগ্রিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর চিন্তায় ধর্মসংস্কার সামাজিক ও পরোক্ষত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসের নজিরে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুবিস্তীর্ণ অধ্যয়ন ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির পরিচায়ক হলেও এর একটি বিপদ আছে। এ রকম ক্ষেত্রে অনেক সময় এক দেশের সমাজ-বিবর্তনের সূত্রগুলিকে নির্বিচারে অপর কোনও দেশের

সমাজ-সভ্যতার ক্রম-অভিব্যক্তির স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করবার প্রলোভন দুর্বার হয়ে উঠতে পারে। প্রতিটি দেশের সভ্যতার ও তৎলালিত সমাজের কতকগুলি সম্পূর্ণ নিজস্ব দেশকালগত উপাদান থাকে। এগুলি অনিবার্যভাবেই পরিবেশের মৌলিক প্রভেদ ঘটায়। এক দেশের সামাজিক ইতিহাস সেই কারণেই দেশান্তরের সামাজিক ইতিহাসের অবিকল প্রতিরূপ হতে পারে না। জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসাধনার ফলে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার অন্তঃপ্রকৃতির যে প্রগাঢ় পরিচয় রামমোহন লাভ করেছিলেন তা তাঁকে এই জাতীয় প্রমাদ থেকে রক্ষা করেছে। সমাজ-বিবর্তনের সামান্য-লক্ষণগুলিকে মোটামুটি স্বীকার করলেও তিনি ইউরোপীয় ইতিহাসের সমগ্র কাঠামোটিকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় পরিবেশে স্থাপন করবার প্রচেষ্টা করেন নি। আমরা দেখেছি পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত হবার পূর্বেই ভারতবর্ষীয় ও ইসলামীয় জ্ঞানরাজ্যের উত্তরাধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন। স্বদেশের লৌকিক সংস্কৃতি ও লোকব্যবহারের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। এর ফলে ভারতীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিন্তা ও জীবনচর্যার শক্তি ও মহত্ত্ব সম্পর্কে যেমন তিনি সচেতন ছিলেন, তেমনি তার দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতার দিকটিও তাঁর অজানা ছিলনা। বস্তুত তাঁর মানস পাশ্চাত্য চিন্তাস্রোতে উত্তমরূপে নিষ্ণাত হবার পূর্বেই ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশ্নে তিনি ধর্মসংস্কার সম্পর্কিত তাঁর সুপরিচিত সিদ্ধান্তগুলিতে (যথা একেশ্বরবাদ, প্রতিমাপূজার অযৌক্তিকতা ইত্যাদি) উপনীত হয়েছিলেন, এমন ভাবলে খুব ভুল হবেনা। 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন (১৮০৩-০৪) বা 'বেদান্ত-গ্রন্থ' (১৮১৫) তে তাঁকে আবিষ্কার করা যায় একজন সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষিত সুপণ্ডিত শাস্ত্রকার ও নিপুণ তার্কিকরূপে যিনি পূর্ণমাত্রায় ঐতিহ্যগত প্রণালীতে শাস্ত্রব্যাখ্যায় নিযুক্ত, অথচ নানা দিক থেকে তাঁর ব্যাখ্যা, তর্কপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত মৌলিক, প্রচলিত সংস্কার বিরোধী, স্থানে স্থানে বিপ্লবী। পাশ্চাত্য ভাবধারা রামমোহনের চিত্তকে সমৃদ্ধ করেছিল তাঁর পূর্বগঠিত মতামতগুলি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ফলস্বরূপ সংশোধিত, মার্জিত ও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছিল একথা অবশ্য-স্বীকার্য। পাশ্চাত্য বিদ্যানুশীলনের ফলেই রামমোহন জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত তাঁর জ্ঞানরাজ্যের ও সত্যানুসন্ধানের পরিধি ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছিলেন এতেও কোনও সন্দেহ নেই। সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর

বৈশিষ্ট্য এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানরাজ্যে তাঁর মানস বিবর্তনের ক্রমগুলিকে যদি আমরা মনে রাখি তা হলেই তাঁর পরিণত ধর্মচিন্তা এবং সেই আধারে বিবর্তিত সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃতি বোঝা সহজ হয়।

ইতিহাসে যাঁরা সংস্কারের মাধ্যমে কোনও একটি ভাবধারা বা প্রতিষ্ঠানকে নূতন পথে অগ্রসর করার ভূমিকা নিয়ে থাকেন তাঁরা সর্বদা এবং সর্বত্র ঐতিহ্যের উপর সমধিক গুরুত্ব দেন। এই মনোবৃত্তিকে সংস্কারকচরিত্রের সামান্য-লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাঁদের মোটামুটি বলবার কথা এই : আমরা সম্প্রতি যা গড়তে যাচ্ছি তা প্রকৃতপক্ষে নূতন কিছু নয়, আমাদের লক্ষ্য প্রাসঙ্গিক মূল বস্তু বা প্রত্যয়টিকেই যুগসঞ্চিত আবর্জনা থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। আসলে সংস্কারকর্ম পূর্ণমাত্রায় নবীকরণ নয়, এর মূলে সর্বত্র বিদ্যমান ঐতিহ্যের বিশুদ্ধীকরণ-প্রক্রিয়া। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায়, "Both religious and secular innovators—at any rate those who have had most lasting success—have appealed, as far as they could, to tradition, and have done whatever lay in their power to minimize the elements of novelty in their system. The usual plan is to invent a more or less fictitious past and pretend to be restoring its institutions. In 2 kings xxii we are told how the priests "found" the Books of Law, and the kings caused a "return" to observance of its precepts. The New Testament appealed to the Prophets ; the Anabaptists appealed to the New Testament ; the English Puritans, in secular matters, appealed to the supposed institutions of England before the Conquest. The Japanese, in A, D. 645 "restored" the power of the Mikado ; in 1868, they 'restored' the constitution of A. D. 645. A whole series of rebels, throughout the Middle Ages and down to the 18 Brumaire "restored" the republican institutions of Rome. Napoleon "restored" the empire of Charlemagne,···These are only a few illustrations, selected at random, of the respect which even the grea-

test innovators have shown for the power of tradition."[২৯]। রাসেলের বিশ্লেষণের মধ্যে অনেকখানি সত্য থাকলেও, সম্ভবত একটু অতিরঞ্জনও আছে। ধর্মসংস্কারকগণ ঐতিহ্যের মূলানুসন্ধানী হয়ে সাধারণত পশ্চাদবলোকন করে থাকেন বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ধর্মের বিশুদ্ধ আদিরূপ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কল্পনাভিত্তিক নয়। বিশেষত আধুনিক যুগে যখন ইতিহাস পুনরুদ্ধারের বা শাস্ত্রব্যাখ্যার সুশৃঙ্খল যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, অতীত সম্পর্কে নিজ প্রত্যয়কে বুদ্ধিশাসিত না করে তাঁদের উপায় নেই। তবে যে অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আধুনিক প্রগতিকামী সংস্কারকগণেরও এত মনোযোগ দিতে হয় তার সম্ভবত অন্য কারণ আছে। ইতিহাসে মূল্যবোধের অগ্রগতি জৈব বিবর্তনের সূত্র মেনে চলে না। ধর্মরাজ্যে প্রায় দেখা যায় অতীতে কোনও দ্রষ্টা বা ধর্মগুরু বিশেষ দেশে ও কালে আত্মোপলব্ধ কোনও বিশেষ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে গেলেন যেটি দেশকালোত্তীর্ণ নিত্য সত্যের কোঠায় পড়ে। এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মসংগঠনের জন্ম হল। কালক্রমে উক্ত ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাসে কেন্দ্রীয় মূল সত্যটি নানা কারণে (যার মধ্যে পারমার্থিক ছাড়াও সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় পরিবেশগত কারণের প্রাচুর্য থাকবে) অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত ও নানা সংস্কারের বোঝায় ভারাক্রান্ত হবে। শেষ পর্যন্ত এমন সময় আসবে যখন সেই ধর্ম তার অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি হারাবে ও সেই সম্প্রদায় ক্রমশ সম্পূর্ণ জড়ীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। এক্ষেত্রে উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করলে দেখা যাবে উক্ত সম্প্রদায় বা জাতি বা গোষ্ঠী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তার আদি মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং সেটিকে আচ্ছন্ন করে কালক্রমে যে-সব আচার, অনুষ্ঠান, কুসংস্কার মাথা তুলেছে সেগুলিই ধর্মজীবনে তার প্রধান অবলম্বন হয়ে জাতীয় জীবনকে অচলায়তনে পরিণত করেছে। প্রকৃত ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা সংস্কারক এমনই সন্ধিক্ষণে নিযুক্ত হন ধর্মের সেই অন্তর্নিহিত মূল্যবোধটিকে উদ্ধার করতে। এখানে ঐতিহ্য বিশ্লেষণ ও পশ্চাদবলোকন ছাড়া তাঁর উপায় নেই। কিন্তু এইটুকুতেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয় না। জীবজগৎ এতদিনে ধর্মের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। তাই শাস্ত্র ও ঐতিহ্য মন্থন করে আবিষ্কৃত চিরায়ত মূল্যবোধটির নবযুগপরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্বক পুনঃপ্রতিষ্ঠাপনই হয় তাঁর প্রধান লক্ষ্য। মূল আধ্যাত্মিক প্রত্যয় অনুপ্রাণিত ভবিষ্যৎমুখী নূতন জীবন-

দর্শন গড়বার প্রেরণা সঞ্চার করাটাই তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ দিক। সর্বাংশে যাঁর মন অতীতচারী তাঁকে সেই জন্যই প্রকৃত অর্থে সংস্কারক বলা চলে না। রামমোহনের সংস্কারকর্ম এই অর্থে revivalism ছিলনা, বেদ-উপনিষদের ধর্মের প্রাচীন পরিবেশগত কাঠামোটিকে বা অতীতের কোনও কল্পিত স্বর্ণযুগকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করতে চান নি। ইউরোপীয় ইতিহাসের অনুশীলনের ফলে আধুনিক জীবনচর্যার পশ্চাতে যে সামাজিক শক্তি ক্রিয়াশীল তার স্বরূপ তিনি আবিষ্কার করেন। অপর দিকে দেখা যায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও জীবনচর্যা তাঁর কাছে পুঁথিগত তত্ত্বমাত্র নয়, সামগ্রিক জীবনবোধেরই অঙ্গীভূত। একযোগে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান এই চার ধর্মের শাস্ত্রে ও ঐতিহ্যে তাঁর মত পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি সেকালে বিরল। সমস্ত বিচার-বিতর্কের মধ্যে তিনি এই ঐতিহ্যপুঞ্জকে যথোচিত গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতে ভোলেন নি,—এমনকি যেখানে তিনি এর সমালোচনায় মুখর এবং বর্জনে দ্বিধাহীন, সেখানেও নয়। সেইকারণে ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে অবলম্বিত তাঁর পদ্ধতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ধর্মের পরম্পরাগত ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত মূল সত্যে গিয়ে পৌঁছানো। এই পশ্চাদ্দৃষ্টি দ্বারা তিনি সর্বক্ষেত্রে ধর্মের আদি বিশুদ্ধ প্রকৃতি থেকে তার উত্তরকালীন অর্বাচীন রূপকে পৃথক করেছেন। কিন্তু এই বিশুদ্ধ রূপটিকে আবিষ্কার করলেও তার সমকালীন দেশকালগত অতীত পরিবেশকে পুনরুজ্জীবিত করবার অসম্ভব ও হাস্যকর প্রয়াস তিনি কদাপি করেন নি। নবযুগের নূতন সামাজিক আদর্শের সঙ্গে তাকে সমন্বিত করে তদ্‌ভিত্তিক যুগোপযোগী নূতন জীবনদর্শনের সূচনা করতে চেয়েছেন। সংস্কারক হিসাবে তাঁর দৃষ্টি অতীতে নয় ভবিষ্যতে নিবদ্ধ। তাঁর সংস্কারপ্রচেষ্টা বিশুদ্ধীকরণ ও নবীকরণ—এই উভয় প্রক্রিয়ার এক সমন্বয়।

এই ভবিষ্যৎমুখী সংস্কার সাধনের জন্য পশ্চাদবলোকন করে ধর্মের মূলানুসন্ধানের প্রয়াস সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় 'তুহফাৎ-উল-মুওহাহিদিন্' (১৮০৩-১৮০৪)এ। এই গ্রন্থ ইসলামীয় বিদ্যার ভিত্তিতে রচিত এবং এটির রচনাকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বা ইতিহাস রামমোহনের চিত্তকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেনি। প্রচলিত ধর্মগুলি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে এখানে রামমোহন দেখেছেন সাধারণ ভাবে আস্তিক ধর্মগুলির অন্তর্নিহিত দুটি মাত্র

মূল প্রত্যয়কে গ্রহণ করা চলে—ঈশ্বরবিশ্বাস ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস; কিন্তু প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মসমূহ পরবর্তীকালের যুগসঞ্চিত অন্ধবিশ্বাস প্রত্যাদেশবাদ, কুসংস্কার, শোষণমূলক পুরোহিততন্ত্র প্রভৃতির সংস্পর্শে আবিল এবং সেই হেতু মিথ্যা ও বর্জনীয়।[৩০] উত্তরজীবনে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি সংক্রান্ত 'তুহফাৎ'এ অভিব্যক্ত কোনও কোনও সিদ্ধান্ত তিনি কিছু পরিমাণে সংশোধন করলেও এই মৌলিক সংস্কারদৃষ্টির পরিবর্তন করেন নি। ইংলণ্ডে অতিবাহিত জীবনের অন্তিম পর্বে লিখিত সুপরিচিত আত্মজীবনীমূলক পত্রে হিন্দুধর্মবিষয়ক তাঁর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ: "The ground which I took in all my controversies was, not that of opposition to Brahminism, but to a perversion of it; and I endeavoured to show that the idolatry of the Brahmins was contrary to the practice of their ancestors and the principles of the ancient books and authorities which they profess to revere and obey.।[৩১] তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে রামমোহনের শাস্ত্রালোচনার ধারাটিকে যে ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা অনুসরণ করলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-তন্ত্র বাহিত হিন্দু ব্রহ্মবিদ্যার ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করে এর মূল বিশুদ্ধরূপটি সমকালীন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর লক্ষ্য। সংস্কার সংক্রান্ত এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী সর্বপ্রথম তিনি কোন সূত্রে লাভ করেছিলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে সঙ্গত ভাবেই অনুমান করা যায়—তাঁর প্রেরণার পশ্চাতে ছিল, ইসলামের মুওহাহিদিন (বা ওয়্হাবি) সম্প্রদায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা। ইসলামের ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে; উগ্র পুনরুজ্জীবন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।[৩২] এঁদের আদর্শ ছিল ইসলামকে যুগসঞ্চিত অর্বাচীন আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার থেকে মুক্ত করে আদি বিশুদ্ধ রূপে ব্যক্তিজীবনে সমাজে ও রাষ্ট্রে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই সম্প্রদায়ের উগ্র অসহিষ্ণু, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক পুনরুজ্জীবনবাদী মনোভাব অবশ্যই রামমোহনের অনুমোদন পায়নি। বস্তুত 'তুহ্ফাৎ'এর যুগ থেকেই ইসলাম সম্পর্কে অনেক ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল হলেও এর পরমত অসহিষ্ণুতা সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্যে আপত্তি জানিয়ে এসেছেন।[৩৩] কিন্তু মুওহাহিদিন সম্প্রদায়ের ধর্মকে অর্বাচীন সংস্কার থেকে মুক্ত করে তার ভিত্তি-

স্বরূপ আদি মূল্যবোধটিতে ফিরে যাওয়ার মনোভাব যে অন্তত সংস্কারপ্রণালী হিসাবে ইসলামশাস্ত্রজ্ঞ রামমোহনকে প্রভাবিত করে থাকবে এতে আশ্চর্য কিছুই নেই। এর পর আসে ইউরোপীয় রিফর্মেশন বা খ্রীষ্টধর্মসংস্কার আন্দোলনের অনুপ্রেরণার প্রশ্ন। পাদ্রী ডাফের নিকট রামমোহনের উক্তি-সংক্রান্ত জর্জ স্মিথের প্রতিবেদন যদি যথার্থ হয় তাহলে মানতে হবে ইউরোপীয় সংস্কার আন্দোলনের আদর্শ রামমোহনের চিত্তের সচেতন স্তরে জাগ্রত ছিল। ইউরোপীয় রেণেশাঁস-সংস্কৃতি এবং খ্রীষ্টধর্ম ও সংঘের ইতিহাসের রামমোহনের ন্যায় আগ্রহী পাঠকের পক্ষে তা একান্ত স্বাভাবিক। ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম-সংস্কারকগণ যে অনেকাংশে ধর্মশোধনে পূর্ব-বর্ণিত বিশুদ্ধিমার্গ অবলম্বন করেছিলেন এটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুত তাঁর খ্রীষ্টের উপদেশ সংকলন বা মিশনারীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে একটি উদ্দেশ্যই পরিস্ফুট: সেটি হল উত্তরকালে খ্রীষ্টধর্মে প্রবিষ্ট নানা দুর্বোধ্য তত্ত্ব ও সংস্কারের কুহেলীজাল থেকে মুক্ত করে খ্রীষ্টের বিশুদ্ধ উদার গভীর ও সর্বজনীন শিক্ষাসমুচ্চয়কে লোকসমাজে স্থাপন। একই পদ্ধতি এখানেও কার্যকরী। ইসলাম ও হিন্দুশাস্ত্রে রামামাহনের পূর্বার্জিত অধিকারের কথা মনে রাখলে এক্ষেত্রেও ধরে নিতে হবে তিনি এই বিশিষ্ট সংস্কারপ্রণালী অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সর্বপ্রথম ইসলামীয় প্রভাবে এবং এটিকে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছিলেন সাধারণভাবে 'তুহ্ফাৎ' গ্রন্থে ও পরবর্তী স্তরে হিন্দুশাস্ত্রালোচনায়। এই পূর্বাধিগত পদ্ধতি আরও দৃঢ়ীকৃত ও মার্জিত হয়েছিল ইউরোপীয় সংস্কার-আন্দোলনের অনুপ্রেরণায়। ইহুদী ধর্মশাস্ত্রেও রামমোহন ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর সমকালে জার্মান ইহুদী ধর্মনেতা ডেভিড ফ্রীডলাণ্ডের (১৭৫৬-১৮৩৪) কর্তৃক ইহুদী ধর্মসংস্কারের যে সূচনা হয়[৩৪] তার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ স্থাপিত হয়েছিল কি না জানা যায় নি।

ধর্মের সঙ্গে সমাজের অচ্ছেদ্য যোগ রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন বলে তাঁর সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনা স্বভাবত ধর্মাশ্রয়ী। এই দৃষ্টিভঙ্গী ভারতবর্ষের মত দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল, কেননা ভারতীয় হিন্দু সভ্যতায় ধর্ম-চিন্তার সঙ্গে সামাজিক বিকাশের যোগ অতি নিবিড়। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে পরম্পরাগত ঐতিহ্যের বিচারভিত্তিক যে পশ্চাদ-বলোকনপদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম

হয় নি। এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তাঁর সতীদাহ সংক্রান্ত শাস্ত্রালোচনা। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিচারগ্রন্থগুলিতে তিনি প্রচলিত স্মৃতিবচন ও লোকব্যবহারের উপযুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন সতীদাহ প্রথার পশ্চাতে প্রকৃত শাস্ত্রসমর্থন নেই। এ জন্য তাঁকে কালস্রোতে উজান বেয়ে পৌঁছাতে হয়েছিল প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম মনুসংহিতাতে; খণ্ডন করতে হয়েছিল প্রাসঙ্গিক ঋগ্বেদবাক্যের প্রচলিত ব্যাখ্যা ও স্থাপন করতে হয়েছিল এটির সতীদাহনিরপেক্ষ তাৎপর্য; কাম্য কর্মের উপর নিষ্কাম কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্বারস্থ হতে হয়েছিল প্রাচীন স্মৃতি-পুরাণ ছাড়াও শ্রুতি-প্রমাণের অর্থাৎ বেদ-উপনিষদ্-গীতার; এবং সতীদাহসমর্থক কিছু কিছু প্রচলিত শাস্ত্রবাক্যের অর্বাচীনত্ব প্রমাণেও হতে হয়েছিল তৎপর। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রামমোহনের সমাজদৃষ্টি এক্ষেত্রে আরও গভীরগামী। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, প্রাচীন হিন্দু স্মৃতিকারগণ (যেমন, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, নারদ, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, ব্যাস প্রভৃতি) নারীর (কন্যা এবং পত্নীর) সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালের টীকাকর্তা ও নিবন্ধকারগণ (রামমোহনের বর্ণনায়-the moderns) সেই অধিকার থেকে হিন্দুনারীকে বঞ্চিত করেছেন। এর ফলে বর্তমান সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের এককালীন কর্ত্রী বিধবা পত্নীকে সম্পূর্ণ পুত্র ও পুত্রবধূর উপর নির্ভরশীল হতে হয়; বহুবিবাহপ্রথার জন্য বিশেষত কুলীন সমাজে প্রচলিত একপুরুষের অসংখ্যপত্নীত্বহেতু এই অসহায়া পরনির্ভরশীলাদের সংখ্যা এ দেশে প্রচুর। পুত্র, পুত্রবধূদের (ক্ষেত্রবিশেষে সৎপুত্রবধূদের) লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও উৎপীড়ন সহ্য করে এঁদের দিন কাটে। এই অবস্থায় এঁদের সামনে তিনটি পথ খোলা থাকে : (১) সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে নীরবে ক্রীতদাসীর (as entire slave to others) জীবন যাপন; (২) পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করা; (৩) স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন। তৃতীয় পথটিই তাঁরা অধিকাংশ সময় বেছে নেন: It is not from religious prejudices and early impressions only, that Hindu widows burn themselves on the piles of their dead husbands, but also from their witnessing the distress in which widows of the same rank in life are involved, and the insults and slights to which they are daily subjected, that

they become in a great measure regardless of their existence after the death of their husbands; and this influence, accompanied with the hope of future reward held out to them, leads them to the horrible act of suicide।"[৩৫] কেবল সতীদাহই নয়, রামমোহন যুক্তিসহকারে দেখিয়েছেন, উত্তরকালীন শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতারা এই ভাবে নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ক্রমশ সংকুচিত করায় হিন্দুসমাজে আর এক কুপ্রথা—বহুবিবাহ—কি বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সতীদাহ প্রসারের সঙ্গে এর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহের ঢালাও অধিকার স্বীকার করা হয় নি; বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন স্ত্রী সুরাসক্তা, ব্যভিচারিণী বা বন্ধ্যা হলে) প্রায় ব্যতিক্রম হিসাবেই সে অধিকার দেওয়া হয়েছে। রামমোহনের মতে কোনও পুরুষের যদি এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য রাজদ্বারে দরখাস্ত করা বাধ্যতামূলক হয় এবং কোনও ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষ যদি প্রতিক্ষেত্রে তদন্ত করে কেবল প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র-সম্মত কারণ থাকলে তবেই পুনর্বিবাহের অনুমতি দেন, তাহলে সমাজের বহুবিবাহব্যাধির উপশম হতে পারে এবং নারীজাতির দুর্দশারও লাঘব হয়।[৩৬] সমগ্রভাবে এই যুক্তিধারার মধ্যে প্রাচীন শাস্ত্রে অভিব্যক্ত আদি সামাজিক মূল্যবোধের উদ্ধার প্রয়াস লক্ষণীয়।

দেখা যাচ্ছে, পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও সংস্কার রামমোহনের চিন্তায় অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। যেখানে তিনি হিন্দুসমাজের প্রচলিত ঐতিহ্যকে সমালোচনা করেছেন বা প্রচলিত ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কারের উচ্ছেদকল্পে আন্দোলন করেছেন সেখানেও তিনি পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ভারতীয় জীবনচর্যা ও পরম্পরাগত সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের কারণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও তর্কপ্রণালী এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তর্কের ক্ষেত্রে এই মার্গ অবলম্বন করায় তাঁকে অনেক সময় পরম্পরার বিশুদ্ধির সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়েছে; একাধিক পরম্পরার মধ্যে কোনটি যথার্থ ঐতিহাসিক ও প্রাচীন, কোনটি বা কল্পিত ও অর্বাচীন, এ প্রশ্নের মীমাংসা প্রথমে না করে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। তাঁর রচনায় এ-রকম একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রতিমাপূজার পক্ষে অনাদিপরম্পরাপ্রসিদ্ধির যুক্তি দিলে রামমোহন

উত্তরে বলেন, 'সুবোধ নির্বোধ সর্বকাল হইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক মতপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে (।) বরঞ্চ পূর্বকালে একাল অপেক্ষা করিয়া প্রতিমাপূজার অল্পতা ছিলো (।) ইহার এক প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই হিন্দোস্থানের যে কোনো স্থানের চতুর্দিকে ২০ ক্রোশের মণ্ডলীতে ভ্রমণ করিয়া যদি কেহ দেখেন তবে আমরা অভিপ্রায় করি যে ওই মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিবেন আর উনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা দেখিবেন (।) বস্তুত যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রটি হইবেক সেই সেই দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।"[৩৭] 'সহমরণ' বিষয়ক প্রথম 'সংবাদ'-এ অর্বাচীন পরম্পরার প্রসঙ্গটি আবার উঠেছে: "তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে···তাহা কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্প দেশ যে এই বাঙ্গালা ইহাতেই কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন (।) এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরম্পরার মান্য করিলে বনস্থ এবং পর্বতীয় লোক যাহারা পরম্পরায় দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছে তাহাদিগো নির্দোষ করিয়া মানিতে হয়।"[৩৮] প্রাচ্যতত্ত্ববিদ উইলসনকে লিখিত ৯ আগস্ট ১৮১৯ ও ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ তারিখের দু'খানি পত্রে শংকরাচার্যের কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গেও রামমোহনকে দেখেছি অতি সতর্কতার সহিত দুটি আচার্য-পরম্পরার দোষগুণ বিচার করতে।[৩৯] বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখা যায়, প্রকৃত প্রাচীন পুরাণ-পরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে অর্বাচীন পুরাণ নামধেয় রচনাগুলিকে তিনি বাতিল করেছেন। বস্তুত পুরাণ-তন্ত্রের পরম্পরা রক্ষার জন্যই তাঁকে বলতে হয়েছিল, যে পুরাণ বা তন্ত্রগ্রন্থের টীকা নেই বা প্রাচীন নিবন্ধকারগণ যার বাক্য উদ্ধৃত করেননি—সে-সব গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না।[৩৯ক]

ভারতবাসীর সামগ্রিক জাতীয় জীবনে ঐতিহ্য ও লোকব্যবহারের গুরুত্ব এত অধিক অনুভব করেছিলেন বলেই রামমোহন তাঁর সংস্কারচিন্তায় ও সংস্কারকর্মে জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছাকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। হিন্দু ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত তাঁর আলোচনার মধ্য থেকে এর একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত নির্বাচন করা যেতে পারে। বাঙ্‌লা দেশে দীর্ঘকাল

প্রচলিত হিন্দু আইনের প্রামাণিক গ্রন্থ জীমূতবাহন কৃত 'দায়ভাগ' অনুসারে পৈত্রিক (ও স্বোপার্জিত) সম্পত্তিতে বাঙালী হিন্দুর সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং সে-সম্পত্তি তাঁরা ইচ্ছানুসারে দান-বিক্রয় করতে পারেন। এই ব্যবস্থা ভারতের অন্যত্র হিন্দুসমাজে প্রচলিত যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকর্তা বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত 'মিতাক্ষরা'য় ব্যাখ্যাত উত্তরাধিকার আইনের বিরোধী। শেষোক্ত মতে জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই পুত্রের পৈত্রিক সম্পত্তিতে পিতার সঙ্গে সমান স্বত্ব জন্মায়, সুতরাং পিতা তখন তাঁর সম্পত্তি অবাধে দানবিক্রয় করতে পারেন না। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে এক মকদ্দমায় কলিকাতা সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন, মিতাক্ষরা শাসিত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাঙ্লার হিন্দু সমাজেও পুত্র থাকলে সে পিতার সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তিতে সমান স্বত্বভোগী হবে। ১৮২৯-৩০ সালে সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যার চার্ল্স এড্ওয়ার্ড্ গ্রে কয়েকটি মকদ্দমারও অনুরূপ বিচার করেন। এরই প্রতিবাদে রামমোহন রচনা করেন তাঁর Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal (১৮৩০)। এই গ্রন্থে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রামমোহনের অন্যতম যুক্তি হল, এই দায়ভাগবিধি বহু শতাব্দী যাবৎ বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে; সুতরাং জাতীয় জীবনের সঙ্গে এই ব্যবস্থার ঐতিহ্যগত যোগ স্মরণে রেখে আদালতের পক্ষে বঙ্গীয় হিন্দু জীবন সংক্রান্ত মামলায় একে যথোচিত মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া কর্তব্য, বিশেষত যখন জীমূতবাহন প্রদত্ত বিধির মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা দেখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ন্যায়বিচার, যুক্তি ও দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সবকিছুরই বিরোধী (The principles of law as it exists in Bengal has been for ages familiar to the people, and alienations of landed property by sale, gift, mortgage or succession having been for centuries conducted in reliance on the legalily and perpetuity of the system, a sudden change in the most essential part of those rules cannot but be severely felt by the community at large; and alienations being thus subjected to legal contests, the

courts will be filled with suitors and ruin must triumph over the welfare of a vast proportion of those who have their chief interest in landed property....any being capable of reasoning would not, I think, countenance the investiture, in one person, of the power of legislation with the office of the judge....Experience shows that unchecked power often leads the best men wrong, and produces general mischief···Any one possessed of landed property whether self-acquired or ancestral, has been able under the long established law of the land, to procure easily, on the credit of that property, loans of money to lay out on the improvement of his estate, in trade or in manufactures whereby he enriches himself and his family and benefits the country.)।[৪০]

যদি মিতাক্ষরামতে পৈত্রিক সম্পত্তিবিভাজন সমৃদ্ধিশালী বঙ্গদেশে চালু হয় তাহলে জমির মালিকরা তাদের আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসাবাণিজ্যে অর্থলগ্নী বন্ধ করতে বাধ্য হবে এবং ফলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণও হ্রাস পাবে। জমির পুঁজিতে (capital) রূপান্তর-প্রক্রিয়া এর দ্বারা ব্যাহত হবে। এই প্রস্তাবের মধ্যে রামমোহনের ভবিষ্যৎমুখী সংস্কারদৃষ্টির একটি দিক যেমন প্রতিফলিত হচ্ছে, তেমনি দেখা যাচ্ছে আইনের সঙ্গে জাতীয় জীবন ও জাতীয় ঐতিহ্যের সম্বন্ধকে তিনি যথেষ্ট প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে ব্যবহারবিদ্ মহলে এই সম্বন্ধ-বিচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও রামমোহনের সমকালে কিন্তু ইউরোপেও এ সম্পর্কে ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। রামমোহনের সঙ্গে সমসাময়িক ইংরেজ দার্শনিক ও ব্যবহারতত্ত্ববিদ্ জেরেমি বেন্থামের ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং যথাস্থানে দেখা যাবে বেন্থামের চিন্তা তাঁকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রভাবিতও করেছিল। আলোচ্য ক্ষেত্রে কিন্তু রামমোহনের মত বেন্থামের মতের বিপরীত। বেন্থাম ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর কাছে আবেদন করলেই তিনি পৃথিবীর যে কোনও দেশের জন্য এক সম্পূর্ণ আইন-ব্যবস্থা (code) প্রস্তুত করে দেবেন।[৪১] সে ব্যবস্থা প্রধানত হবে

বেন্থামের নিজস্ব বিমূর্ত ব্যবহার-ভাবনা ও নীতি-প্রত্যয়ের ভিত্তিতে গড়া। সেই বিশেষ দেশের জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠা বিধিব্যবস্থা ও লোকচর্যার সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেখানে বিচারের মুখ্য বিষয় হবে না। প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামমোহনের প্রতিবাদ সফল হয়েছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিচারপতি গ্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অপর এক মামলায় রায়দান প্রসঙ্গে লেখেন, "I have frequently expressed my opinion on this very point, both in the present, and in other cases within the last two years, but the opinion I am now prepared to retreat.।" তিনি আরও বলেন: "The district of Benares being situated far inland, is more agricultural than Bengal in which is the conflux of all the great rivers with the sea, and where consequently the pursuits of the more wealthy part of the population are of a mercantile character; consequently there are many important differences between the doctrines of the Benares and the Bengal Schools, the later generally favouring alienation of property and thereby facilitating mercantile speculations.।"[৪২] এই উক্তি রামমোহনের মতের প্রতিধ্বনি।

ঐতিহ্য-চেতনা থেকে রামমোহন সংস্কারসংক্রান্ত তাঁর আর একটি ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন যে, কোনও সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করবার প্রকৃষ্টতম উপায় লোকশিক্ষা, আইনগত ব্যবস্থা নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, কতগুলি সংস্কার জাতীয় মানসে এতই বদ্ধমূল যে সেগুলির সহসা বিলোপের জন্য আইন করলে সংস্কারপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। অতীতের সঙ্গে এই আকস্মিক বিচ্ছেদ সহ্য করবার মানসিক প্রস্তুতি বা স্থৈর্য ভারতবাসীর তখনও আসে নি। শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্রমবিস্তারের দ্বারা মানুষের অন্ধ সংস্কার ধীরে ধীরে দূর হলে জনসাধারণের মধ্য হতেই ক্রমশ শুভকর সামাজিক পরিবর্তনের প্রেরণা আসবে। আইনের বলে শিক্ষাহীন সাধারণ মানুষের উপর কোনও ব্যবস্থা চাপিয়ে দিলে তারা যদি তৎক্ষণাৎ কোনও প্রকাশ্য প্রতিবাদ নাও করে, তাদের মনোগত বিরুদ্ধ সংস্কার সে ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ হতে দেয় না।

পরিবর্তনের মূল প্রেরণা সমাজের সাধারণ স্তর থেকে উদ্‌গত হলে তবেই তার ভিত্তি দৃঢ় ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবার সম্ভাবনা। শোনা যায়, রামমোহন তাঁর শিষ্য রামচন্দ্র মৌলিককে উপদেশ দিয়েছিলেন, সমাজের নীচেরতলার উপেক্ষিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজকে তিনি যেন জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন, কেন না "হাঁড়ির তলায় আঁচ না দিলে রান্না হয় না"।[৪৩] বর্তমান প্রসঙ্গে উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রতিবেদন যদি যথার্থ হয়, তা হলে এটি রামমোহনের সমাজ-সংস্কার ও সামাজিক প্রগতি সংক্রান্ত ধারণার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করবে। তাঁর জাতিভেদ-প্রথা সম্পর্কিত মনোভাব বিশ্লেষণ করলেও এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জাতিভেদ-প্রথা যে অযৌক্তিক, পরম অনিষ্টকর, ভারতবর্ষের পরাধীনতার ও হিন্দুসমাজের অধঃপতনের কারণ, এ উপলব্ধি তাঁর ছিল এবং উনিশ শতকীয় রেনেশাঁস-নায়কগণের মধ্যে সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন।[৪৪] কিন্তু এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য কোনও আন্দোলন বা আইনের দাবী তিনি করেন নি। কেন না তিনি জানতেন, এই সংস্কারের মূল জাতীয় জীবনের এত গভীরে প্রসারিত যে তাঁর সমকালে এ জাতীয় আইন বা আন্দোলনের সফল হবার কোন আশা নেই। একমাত্র আধুনিক শিক্ষার প্রসারের দ্বারা জনসাধারণের বুদ্ধি ও মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারলে ভবিষ্যতে এই সংস্কারের মূলোচ্ছেদ ঘটবে। সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালন-ব্যাপারে রামমোহনের এই বিশিষ্ট মনোভাব সর্বাধিক পরিস্ফুট। এই আন্দোলনের নেতা হয়েও প্রথমে এর উচ্ছেদকল্পে আইন প্রণয়নের উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন, এবং বেণ্টিংককে ধীরপদে চলবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৪৫] এক্ষেত্রেও প্রথমে তাঁর আশঙ্কা ছিল, শাস্ত্রীয় সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও সতীদাহের পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও তজ্জনিত সংস্কার হিন্দুমানসে এত বদ্ধমূল যে আইনের দ্বারা তা রদ করতে গেলে সমগ্র সমাজদেহে হয়তো প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং আইন প্রণয়ণের মূল উদ্দেশ্যই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখনকার ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে মনে হয়, রামমোহনের উক্ত ধারণার মধ্যে খুব ভুল ছিল না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর অস্পৃশ্যতা নিবারক আইন পাশ হয়েছে কিন্তু হিন্দুসমাজে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে তাণ্ডব বন্ধ হয় নি, বরং নানা অঞ্চলে জাতপাতের লড়াই অন্য আকারে উগ্রতর রূপে আত্মপ্রকাশ

করেছে। ১৮২৯ সালে সতীদাহ আইন করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু জাতীয় জীবন থেকে আজ দেড়শ বছর পরেও এই অনিষ্টকর সংস্কারের সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ হয় নি। ১৯৮০ সালেও রাজস্থানে প্রকাশ্যে মহা সমারোহে শত শত গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে ও তাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে অনুষ্ঠিত শ্রীমতী সরস্বতী দেবী ও শ্রীমতী সুগর কানওয়ারের স্বেচ্ছাকৃত সহমরণ[৪৬] এবং রাজধানী দিল্লীতে সতীমন্দির স্থাপন উপলক্ষে জনসাধারণের প্রবল উৎসাহ—এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। রামমোহন সংস্কার-ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে আইন-প্রয়োগের বিরোধী হলেও এ বিষয়ে তাঁর কোনও গোঁড়ামি ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে প্রাথমিক দ্বিধাসত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত যখন উচিত মনে করেছেন তখন সমাজিক অমঙ্গল দূরীকরণার্থ আইনপ্রয়োগকে স্বাগত জানাতে পশ্চাৎপদ হন নি। সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা এই রকম একটি দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি এই ভূমিকা নিয়ে কিছু বাদবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তাই এ সম্পর্কে একটু খুঁটিনাটির মধ্যে যেতে হচ্ছে। সতীদাহ যে প্রথা হিসাবে অতি নৃশংস এবং বর্জনীয়, এ চেতনা রামমোহনের পূর্বে সরকারী মহলে এসেছিল এবং কি ভাবে এর বিলুপ্তি সাধন করা যায় সে সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা এবং লেখালেখিও আরম্ভ হয়েছিল। এর ফলে সতীদাহ ব্যাপারটাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার চেষ্টা সরকারী তরফে হয়েছিল বটে কিন্তু তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। জনসাধারণের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসারে এই প্রথা উচ্ছেদকল্পে কোনও চেষ্টা কোম্পানি সরকার তখন করেন নি। সরকারের ধারণা ছিল এতে জনবিক্ষোভ হয়ে শাসনকার্যে অসুবিধা ঘটতে পারে। প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে সতীদাহ উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করেন রামমোহন। এর জন্য তিনিটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন: (১) বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থরচনা করে সতীদাহ প্রথাকে অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করা; (২) সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় আন্দোলন করা; (৩) শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে স্বামীর চিতায় আত্মহননেচ্ছু বিধবাদের প্রতিনিবৃত্ত করবার প্রচেষ্টা চালানো।[৪৭] ছাপার অক্ষরে সতীদাহকে নৈতিক আদর্শানুযায়ী সমর্থনের অযোগ্য ও বলপূর্বক বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারাকে অশাস্ত্রীয় বলে প্রথম তিনি নিন্দা করেন ১৮১৮

খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas নামক গ্রন্থে।[৩৮] তাঁর সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল সম্ভবত এরও কয়েক বৎসর আগে।[৩৯] ১৮১৭ সালের পর থেকেই রামমোহন প্রকাশ্য আন্দোলন আরও সংগঠিত করবার দিকে মন দেন। সম্ভবত ১৮১৮ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতার প্রগতিশীল হিন্দু নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে বড়লাট মার্কুইস অব্ হেষ্টিংসের কাছে এই প্রথা বন্ধ করবার জন্য এক আবেদন করা হয়।[৪০] রামমোহনের সতীদাহ-বিরোধী গ্রন্থগুলিও পর পর প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি এ বিষয়ে ১৮১৮ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত বাঙলায় তিনখানি ও ইংরেজিতে চারখানি (শেষখানি ইংলণ্ডে প্রকাশিত), সর্বসমেত সাতখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সঙ্গে সংবাদপত্রকেও (বাঙ্গাল গেজেটি ও সংবাদ কৌমুদী) আন্দোলনের মাধ্যম করা হয়। বলা বাহুল্য এর জন্য রামমোহনকে যথেষ্ট সামাজিক লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্তু সে-সব অগ্রাহ্য করে দীর্ঘকালের পরিশ্রমে তিনি সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য জনমনকে প্রস্তুত করেন। ব্যাপটিস্ট্ ধর্মযাজক ডঃ যশুয়া মার্শম্যান এ সম্পর্কে ১৫ জানুয়ারী ১৮২৪ বিশপ হেবারকে যা বলেছিলেন তার মর্ম এই: The Brahmins he says, have no longer the power and popularity which they had when he first remembers India, and among the laity many powerful and wealthy persons agree and publicly express their agreement, with Rammohun Roy, in reprobating the custom, which is now well known to be not commended by any of the Hindoo sacred books though some of them speak of it as a meritorious sacrifice"।[৪১] সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজমনে আন্দোলনের মাধ্যমে চেতনা সঞ্চার করাটাই এ ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রধান ও মহৎ কীর্তি। সতীদাহ-বিরোধী সংগ্রামের নায়করূপে ভারতীয়গণের মধ্যে ১৮২৮-২৯ সালে এই ভাবে তিনি এক চিহ্নিত পুরুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য আইন-প্রণয়নের পূর্বে বেণ্টিংক্ স্বভাবত তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। রামমোহন যে পরামর্শ দেন তা বেণ্টিংক্ ৮ নভেম্বর ১৮২৯

লিখিত সতীদাহ সংক্রান্ত সুপ্রসিদ্ধ 'মিনিট্'এ এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: "I must acknowledge that a similar opinion as to the probable excitation of a deep distrust of our future intentions was mentioned to me in conversation by that enlightened native Ram Mohun Roy, a worm advocate for the abolition of *suttees*, and of all other superstitions and corruptions, engrafted on Hindu Religion, which he considers originally to have been a pure Deism. It was his opinion that the practice might be suppressed, quietly and unobservedly by increasing the difficulties and by the indirect agency of the police. He apprehended that any public enactment would give rise to general apprehension, that the reasoning would be, 'While the English were contending for power, they deemed it politic to allow universal toleration, and to respect our religion, but having obtained the supremacy their first act is a violation of their professions, and the next will probably be, like the Mohammadan conquerors, to force upon us their own Religion' "।[৪২] দেখা যাচ্ছে রামমোহন বেন্টিংক্কে এক্ষেত্রে সরাসরি আইন-প্রণয়নের স্থলে প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং পুলিশী হস্তক্ষেপকে ক্রমশ আরও জোরদার করে সতীদাহ বন্ধ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এমন উপায় অবলম্বন করবার পক্ষে যুক্তিও উপস্থিত করেছিলেন। এখানে বেন্টিংকের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ পদ্ধতিগত; সতীদাহ উচ্ছেদ করা যে অত্যাবশক এ বিষয়ে দু'জন একমত।[৪৩] বেন্টিংক্ অবশ্য রামমোহনের পরামর্শ গ্রহণ করলেন না, সতীদাহ-উচ্ছেদ আইন পাশ হল (৪ ডিসেম্বর ১৮২৯)। আইন-প্রণয়নের পূর্বে দেখা গিয়েছিল আইনের ফলাফল ও জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রামমোহন কিছু দ্বিধাগ্রস্ত ও সন্দিহান, কিন্তু বেন্টিংক্ সে-সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আইন চালু হওয়ার পর দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। এখন থেকে ১৮৩২ সালে ইংলণ্ডের প্রিভি কাউনসিল কর্তৃক রক্ষণশীল গোষ্ঠীর

সতীদাহ-উচ্ছেদ বিরোধী আবেদন নাকচ করে দেওয়া পর্যন্ত রামমোহন বেণ্টিংক প্রবর্ত্তিত আইনের সমর্থনে অটল এবং নিয়ত সংগ্রামরত। তাঁর পূর্বের দ্বিধা তিনি সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু বেণ্টিংক্? তিনি যেন এখন কতকটা আশংকাগ্রস্ত ও বিচলিত।

আইন চালু হওয়ার পরই রক্ষণশীল গোষ্ঠী প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। ধর্মসভা গঠিত হল। ১৪ জানুয়ারী ১৮৩০ এঁদের তরফে বেণ্টিংকের কাছে পৌঁছাল বহু স্বাক্ষর সংবলিত এক প্রতিবাদপত্র। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের এই প্রতিক্রিয়া বেণ্টিংক্ ও তাঁর সরকারী পরামর্শদাতাদের যে আশংকিত করেছিল এতে সন্দেহ নেই। এই সংকটে তাঁরা যাঁর পরামর্শের উপর নির্ভর করেছিলেন, তিনি রামমোহন রায়। এর পরোক্ষ প্রমাণস্বরূপ ইংলণ্ডের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে রক্ষিত বেণ্টিংকের কাগজপত্রের মধ্য থেকে বেণ্টিংকের মিলিটারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন বেনসনকে ও স্বয়ং বেণ্টিংক্‌কে রামমোহন লিখিত ১৪ই জানুয়ারী ১৮৩০ তারিখের দুখানি ক্ষুদ্র পত্র বা note দাখিল করা যায়। বেনসনকে লিখিত পত্রখানি (পাণ্ডুলিপি সংখ্যা PWJF 2616/VI) থেকে দেখা যাচ্ছে রক্ষণশীল দলের কোন্ কোন্ মুখপাত্রের সঙ্গে বড়লাট কোথায় কখন দেখা করবেন সে ব্যবস্থা করবার জন্য তিনি বেনসনের মাধ্যমে রামমোহনকেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, এবং এঁদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা কখন আসবেন রামমোহনই তা স্থির করে দেন (Pursuant to your requisition I have intimated to the native gentlemen to attend the Government House at 12 O'clock this instant)। রামমোহন জানাচ্ছেন এই প্রতিনিধিদলে থাকবেন গোপীমোহন দেব, তৎপুত্র রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল মল্লিক, রামকমল সেন, কাশীনাথ মল্লিক, ভবানী চরণ মিত্র এবং দু'তিন জন পণ্ডিত। তা ছাড়া তিনি সতর্ক করে দেন, বেশী লোক বা একটি জনতা যেন এই উপলক্ষে লাটভবনে ঢুকে না পড়ে (Be pleased to take measures to prevent a mob or people getting into the Govt. House)। এই পত্রের সঙ্গে প্রেরিত (enclosure) বেণ্টিংককে লিখিত পত্রখানি (পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১৮৮৯) যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় সেটির বক্তব্য সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে: I have just found the enclosed by which your Lordship will perceive how your

Predecessors were politicians and how cautiously they acted —The design of this is merely to repeat my opinion that you may without hesitation promulgate the Regulations recommended and in virtue thereof I assume that you will settle the point against all sorts of impediments and save yourself harmless and send my friends satisfied—If your immediate shortness of time may not allow you, you can lay the Petition under consideration till your return from your circuit—।[৫৪] এই চিঠি থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে যা পূর্বে জানা ছিলনা : (১) রক্ষণশীল হিন্দুদের উত্তেজনায় ও প্রতিবাদে সরকার কিছু বিচলিত বোধ করেন। এমন কি এক জনতা লাটভবনে অভিযান করতে পারে এমন আশংকাও ছিল। এই সংকটে রামমোহনই ছিলেন বেণ্টিংকের কর্তব্যাকর্তব্যের পরামর্শদাতা ; (২) রামমোহন বেণ্টিংকের কাছে সরাসরি বলেছেন, আগেকার লাটসাহেবরা ছিলেন প্রধানত রাজনীতিবিদ্ ; শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তাঁরা সতীদাহ উচ্ছেদের প্রশ্নে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছেন ; (৩) রামমোহনের এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য বেণ্টিংক্‌কে প্রদত্ত তাঁর পূর্বপরামর্শের পুনরাবৃত্তি করা (merely to repeat my opinion) যেন বেণ্টিংক্ সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে সতীদাহ-নিবারক আইনটি চালু রাখেন এবং রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের তৎক্ষণাৎ বা পরে সুবিধামত বিদায় করে দেন। অর্থাৎ, বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার মুখে বেণ্টিংক্ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রামমোহনের পরামর্শ চাইলে রামমোহনই একাধিকবার তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, তিনি যেন কিছুতেই তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত না হন। পত্রস্থ 'repeat' ক্রিয়াপদটির দ্বারাই তাঁর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে রক্ষণশীল দল ধর্মসভা গঠন করে সতী-নিরোধ আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে প্রিভি কাউনসিলে আবেদন পাঠালেন। অন্যদিকে রামমোহনের মত কালাপাহাড়দের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবরকম ব্যবস্থা নেবার উদ্যোগ হল। প্রকাশ্য ব্যবস্থা অবশ্য এদের সমাজচ্যুত করা ;[৫৫] আর অপ্রকাশ্য উদ্যম রামমোহনকে একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। গুপ্তঘাতকের ভয়ে এই সময় রামমোহনকে কত সতর্কভাবে

অবস্থান করতে হত তার এক সমসাময়িক বিবরণ দিয়েছেন 'John Bull' পত্রিকা।[৫৬] এসবের মধ্যে অবিচল থেকে রামমোহন ও তাঁর বন্ধুবর্গ ১৬ জানুয়ারী ১৮৩০ বেণ্টিংককে সতীদাহ নিবারণের জন্য প্রকাশ্য অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু রামমোহন এখানেই থামেন নি। তাঁর সতীদাহ-বিরোধী সংগ্রামের শেষ-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইংলণ্ডে। এবং সেখানে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন একক যোদ্ধা। প্রিভি কাউন্সিলে দেওয়া বিরোধী পক্ষের আবেদনের বিরুদ্ধে এক বিবৃতি (Counter Petition) প্রস্তুত করে তিনি ইংলণ্ডে নিয়ে যান ;[৫৭] এবং পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কুইস অব্ ল্যান্স্‌ডাউনের মাধ্যমে হাউস অব্ লর্ড্‌সে সেটি দাখিল করেন।[৫৮] তার পাশাপাশি ইংলণ্ডের জনমতকে প্রভাবিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৩১এ সেখানে প্রকাশ করলেন সতীদাহ বিষয়ক তাঁর সর্বশেষ পুস্তক Some Remarks in vindication of the Resolution passed by the Government of Bengal in 1829, abolishing the Practice of Female Sacrifices in India।[৫৯] তার পর প্রিভি কাউন্সিলে সতী-প্রশ্নের তিন দিন শুনানীর সময়েও (২৫ জুন, ২ জুলাই ও ৯ জুলাই, ১৮৩২) দেখা যায় জাগ্রত প্রহরীর মত রামমোহন প্রতিদিন উপস্থিত।[৬০] এই রায় বেরবার পর তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। এ বিষয়ে ১৪ জুলাই ১৮৩২ লণ্ডন থেকে জন পয়েণ্ডারকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেন, "Pray accept my sincere thanks...for your hearty congratulation on the protection afforded by the Privy Council to the female community of India.—Thereby they have removed the odium from our character as a people. As we can be no longer guilty of female murder,, we now deserve every improvement, temporal and spiritual"।[৬১] এই দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস পদে পদে অনুধাবন করলে পরিষ্কার বোঝা যায় সতীদাহের মত দুরপণেয় জাতীয় কলঙ্ক উচ্ছেদ-কল্পে (সে সংস্কার জাতীয় চরিত্রে যতই বদ্ধমূল হোক) নিজস্ব ঐতিহ্যগত বিচারপ্রণালীর পরিবর্তে নৈতিক মূল্যবোধের সাক্ষাৎ প্রেরণাকে উচ্চতর স্থান দিতে রামমোহন দ্বিধা করেননি এবং এজন্য সর্ববিধ ত্যাগস্বীকারেও তিনি প্রস্তুত থেকেছেন।

এই প্রসঙ্গ আমাদের স্বভাবত নিয়ে আসে রামমোহনের ধর্ম ও নীতি

সংক্রান্ত মনোভাবের আলোচনায়। পূর্বে বলা হয়েছে, রামমোহন-মানসের মূল প্রেরণা ছিল আধ্যাত্মিক এবং তাঁর গভীর ধর্মপ্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য, ধর্মের শাশ্বত সত্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক রূপ সম্পর্কেও চেতনা। ধর্ম ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য যোগকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বলেই তাঁর ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার এক সূত্রে বাঁধা, এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে কোনও সূক্ষ্ম ভেদরেখা নির্দেশ করা যায় না। দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি। তাঁর চিন্তা ও জীবনের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখলে এই সমাজচিন্তার অপর এক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। তিনি হিন্দুসমাজে উচ্চ বর্ণে জন্মেছিলেন, সুতরাং স্বভাবত তাঁর সংস্কারকর্মের ক্ষেত্র ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর চিন্তার পরিধি অনেক বেশী ব্যাপক; তা বর্ণ, দেশ, জাতি সব কিছুর গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বমানবের জন্য সামাজিক সুবিচার ও সামগ্রিক ভাবে মানব-কল্যাণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল। এই বিশ্বজনীনতার প্রেক্ষাপটে রামমোহনের ধর্ম ও নীতি চিন্তাকে স্থাপন করলে সেগুলির তাৎপর্য বোঝা সহজ হয়।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহনের ধর্মমত গঠনে কি কি প্রভাব তাঁর জীবনের কোন্ কোন্ পর্বে কার্যকরী হয়েছিল তার কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করতে গেলে বলতে হয় জন্ম ও পারিবারিক সূত্রে লব্ধ তাঁর প্রথাগত ধর্মীয় সংস্কার নানা শাস্ত্র চর্চা ও বিচারের ফলে ক্রমশ ভিত্তিচ্যুত হয়; ইসলামীয় শিক্ষার ফলে একেশ্বরবাদে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়, ইসলামীয় ও ইউরোপীয় যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে তিনি এই পর্বে প্রত্যাদেশবিরোধী যুক্তিমূলক একেশ্বরবাদ বা Deismকে জীবনদর্শনরূপে গ্রহণ করেন; যদিও এই যুক্তিবাদের ভূমি তিনি উত্তর জীবনে কখনই সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন নি, তবু হিন্দু শাস্ত্র, বিশেষত বেদান্তদর্শন, গভীর ভাবে অনুশীলন করবার পর তাঁর প্রত্যয় জন্মায়, বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়;[৮২] তাঁর প্রথম জীবনের ধর্মীয় মতের প্রাখর্য এই বোধোদয়ের ফলে কিছু প্রশমিত হল এবং তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মজীবন এখন একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করল; এই পর্বে ধর্মবিশ্বাসের তিনটি উপাদান তিনি স্বীকার করেছেন, যুক্তি (reason), শাস্ত্র (scripture) এবং সহজ জ্ঞান (common sense); যুক্তির স্থান এখানেও সর্বাগ্রে, কিন্তু

পূর্বের ন্যায় শাস্ত্র উপেক্ষিত নয়। তাঁর এই পরিণত মতানুসারে সর্বদেশের ও সর্বকালের দ্রষ্টা ও ঋষিগণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার যে সঞ্চয় শাস্ত্রের আধারে রক্ষিত, সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংকটে তা অবশ্যই পথপ্রদর্শক।

আমরা দেখেছি অদ্বৈতবাদী হওয়া সত্ত্বেও রামমোহনের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ উপেক্ষা বা অনাদরের বস্তু ছিল না। আধুনিক অর্থে ধর্মের সঙ্গে সমাজের অঙ্গাঙ্গী যোগ তিনি স্বীকার করেছিলেন বলেই তাঁর দৃষ্টিতে সমগ্র সমাজদেহ ছিল এক অর্থে আধ্যাত্মিক চেতনার পরিধির অন্তর্গত। তাই রামমোহনের অধ্যাত্ম-দর্শন ছিল মানবকল্যাণ বা সমাজকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। এবং এই কারণেই তাঁর তত্ত্বচিন্তায় নীতিবোধের প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ধর্মসাধনা যদি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হত তা হলে তাঁর নৈতিক চিন্তার পক্ষে আমাদের দেশের অপরাপর সাধকগণের মত প্রধানত কায়মনোবাক্যে শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করবার অধিক অগ্রসর হবার প্রয়োজন ছিল না। সমগ্র সমাজের মঙ্গলকে তাঁর ধর্মচিন্তার অঙ্গরূপে দেখেছিলেন বলেই নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্ন নিয়ে তাঁকে এত বিচার করতে হয়েছিল, কেন না এ নীতি তো মাত্র ব্যক্তিনীতি নয় তার সঙ্গে সামাজিক প্রশ্নও জড়িত। রামমোহনের নীতিচিন্তা এই অর্থে তাঁর সমাজচিন্তার অঙ্গ।

হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী ও খ্রীষ্টান (এবং সম্ভবত অল্পপরিমাণে বৌদ্ধ ও জৈন) ধর্মসমূহের আলোচনাপ্রসঙ্গে রামমোহন এগুলির প্রত্যেকটির নৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গী বিচারের সুযোগ নিশ্চয় পেয়েছিলেন। সমকালীন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী চিন্তার তিনটি বিশিষ্ট ধারার সঙ্গে তাঁর চিত্তের গভীর যোগের বিষয়টিও এই সূত্রে স্মরণীয়। সংক্ষেপে বিচার করে দেখা যেতে পারে তাঁর নিজেস্ব নীতিচিন্তার অভিব্যক্তিতে এই প্রভাবগুলির কোন্‌টি কতদূর কার্যকরী হয়েছিল। ধর্মীয় নীতিশাস্ত্রের মধ্যে রামমোহন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা; এবং চূড়ান্ত বিচারে খ্রীষ্টের নীতি-উপদেশকেই যে তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের বিশুদ্ধি রক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এ কথা সুবিদিত। শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবের সঙ্গে কথোপকথন কালে তিনি উক্ত দুই ধর্মের এক সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিচার করেছেন: If religion consists of the blessings of self-knowledge and of improved notions of

God and his attributes and a system of morality holds a subordinate place, I certainly prefer the Vedas. But the moral precepts of Jesus are something most extraordinary. The Vedas contain the same lessons of morality but in a scattered form।"[৬৩] কিন্তু মূলত উৎকর্ষে সমান হলেও খ্রীষ্টনীতি তাঁর কাছে তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছিল এই কারণে যে, হিন্দুধর্মে নীতিতত্ত্ব বা 'a system morality'র স্থান অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় অপ্রধান (subordinate)। এই তুলনামূলক বিচারে দুই ধর্মের বিশিষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কে রামমোহন যথার্থ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরকালের হিন্দুতত্ত্বচিন্তায় নীতিধর্ম যদিও উপেক্ষিত নয় —তবু এর স্বতন্ত্র মূল্য সর্বদা যথোচিত স্বীকৃতি লাভ করেনি। ব্যক্তিগত ভূমিতে উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনলাভের উপায় রূপে নৈতিক বিশুদ্ধিকে প্রধানত অপরিহার্য মনে করা হয়েছে। তদুপরি ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনার প্রয়োজনে সীমিত এই নীতিবোধ বর্ণাশ্রম বিধানের দ্বারা খণ্ডিত। প্রথম তিন বর্ণের জীবনচর্যায় যে উচ্চ নৈতিক আদর্শ শাস্ত্রোপদিষ্ট, শূদ্ররা তার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। মনু স্পষ্টই বলেছেন, শূদ্রের কোনও ধর্মসংস্কার নেই, পাপপুণ্য নেই, বিধিনিষেধও নেই;[৬৪] অর্থাৎ শূদ্রের জীবন নীতিবির্জিত, এক হিসাবে তা পশুর সমান। মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকাররা উচ্চ তিন বর্ণের জন্য তবু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নৈতিক পুরুষার্থ অনুশীলনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী স্মৃতিকার ও ব্যবহারবিদদের হাতে সেগুলি হয়ে দাঁড়াল যান্ত্রিক, হৃদয়হীন ও বহুস্থলে অমানুষিক ধর্মাচারের অঙ্গীভূত। জীমূতবাহনের (দ্বাদশ শতাব্দী) মত সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিকার এমন কথা বলতেও দ্বিধা বা লজ্জা করলেন না যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র কন্যা বিবাহ এক গুরুতর পাতক তদ্দ্বারা তিনি জাতিচ্যুত হবেন; কিন্তু কোনও অবিবাহিতা শূদ্রা রমণীর সঙ্গে ব্যভিচার তেমন কিছু অপরাধ নয়, সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই সেখানে তাঁর অব্যাহতি।[৬৫] হিন্দু নীতিবাদের এই ঐতিহাসিক পরিণতি লক্ষ্য করেই রামমোহনকে বলতে হয়েছিল: Christians understand by works action of *moral merit,* where as Hindus use the term in their theology only to denote religious rites and ceremonies prescribed by Hindu lawgivers which are often irreconcilable with the commonly received

maxims of moral duty···।[৬৬] সুতরাং হিন্দুধর্মের মূল নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করলেও, এর বিশিষ্ট প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক পরিণতি লক্ষ্য করে, সামগ্রিক সমাজকল্যাণের উপায়স্বরূপ একে অবলম্বন করা রামমোহন সম্ভবপর মনে করেন নি। অথচ সামাজিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁর এমন একটি নৈতিক মানের প্রয়োজন ছিল যার উৎস হবে মানবচিত্তের আধ্যাত্মিকতা। এইখানেই খ্রীষ্টের উপদেশ তাঁকে গভীর প্রেরণা দিয়েছে। খ্রীষ্টের সাধনায় ঈশ্বরপ্রেমের সার্থক উপলব্ধি মানবপ্রেমের মধ্য দিয়ে: "Thou shall love the Lord thy God with all thy heart and all thy mind. This is the first and the great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbour as thyself।[৬৭] এই মানবপ্রেম বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট খ্রীষ্টের আরও একটি বাণীতে: তোমার নিজের প্রতি অন্যের যে আচরণ তোমার অভিপ্রেত অপরের প্রতি তুমিও সেই আচরণ কর।[৬৮] খ্রীষ্টের এই মূল উপদেশগুলিই তাই রামমোহন তাঁর নীতিদর্শনের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্ব-ভাগের প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ ছিল না। The Precepts of Jesus-এর ভূমিকায় এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত: "···a notion of the existence of a supreme suprintending power, the Author and Presever of this harmonious system, who has organised and who regulates such an infinity of celestial and terrestrial objects, and a due estimation of the law which teaches that man should do unto others as he should wish to be done by, reconcile us to human nature and tend us to render our existence agreeable to ourselves and profitable to the rest of mankind.।[৬৯] ব্রহ্মোপাসকের লোকব্যবহারসংক্রান্ত আলোচনায় এই খ্রীষ্টনীতি পুনরুল্লেখ করেছেন-রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাবৎসরে (১৮২৮): "পরস্পর সাধুব্যবহারে কালহরণের নিয়ম এই যে অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয় সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত করিব না।"[৭০]

মানবপ্রীতির ধারণাটিকে তিনি যে তাঁর বেদান্তভাষ্যেরও (১৮১৫) অঙ্গীভূত করেছিলেন তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্টান্ত সহকারে সে আলোচনা করা হয়েছে।[৭১]

তৎসাময়িক পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী চিন্তার ত্রিধারা প্রসূত বিশিষ্ট নীতিবিজ্ঞানের সূত্রগুলি রামমোহনকে কতদূর প্রভাবিত করেছিল সে প্রশ্নটিও বর্তমান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে উত্থাপন করা যেতে পারে। এই তিনটি ধারা যথাক্রমে হল: (১) অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদীপ্ত যুগের (Age of Enlightenment) প্রতিনিধিস্থানীয় চিন্তানায়কগণের নীতিবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী; (২) বেন্থাম, জেম্স মিল প্রমুখ উপযোগবাদী (utilitarian) দার্শনিকগণের বিশিষ্ট নীতিবিজ্ঞান; (৩) রবার্ট্ ওয়েন প্রবর্তিত নব্য সমাজতন্ত্রের নীতিবাদ। এই তিন চিন্তাধারার সঙ্গে রামমোহন যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন প্রথম অধ্যায়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা হয়েছে।[৭২] রুশোকে বাদ দিলে জ্ঞানবিভাসিত যুগের দার্শনিকগণের নীতিচিন্তার সামান্যলক্ষণ সম্ভবত হচ্ছে এই যে, তা স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের (empirical knowledge) উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক কালে এই empirical দর্শনের স্রষ্টা সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক জন লক্।[৭৩] তাঁর পাশাপাশি সমকালীন সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী নিউটন আবিষ্কার করেন, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি পারস্পরিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ভিত্তিতে গঠিত কয়েকটি আমোঘ নিয়মের সূত্রে বাঁধা। নিউটনের প্রভাবে ও লকের প্রযত্নে নীতিচিন্তার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের রাজত্ব কল্পিত হয় এবং ক্রমশ গণিতের মতই নীতিশাস্ত্রও একটি নিশ্চিত বিজ্ঞান (exact science) রূপে গণ্য হতে আরম্ভ করে। মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করে ডেভিড্ হার্ট্লে (১৭০৫-৫৭) গড়ে তুললেন তাঁর ভাবসংযোগবাদ (theory of association of ideas)। এর সিদ্ধান্ত হল মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি বিশ্বপ্রাকৃতিক নিয়মপ্রসূত, নিয়মানুগত এবং পরস্পরনির্ভর; সুতরাং মানুষের প্রবৃত্তি, স্মৃতি, বিবেক প্রভৃতি অন্তর্নিহিত সংস্কারগুলিও তাই। এই মতবাদ প্রমাণ করতে চাইল, নীতিবোধ বা নৈতিকতা বস্তুটি অলৌকিক বা ঈশ্বরপ্রেরিত কিছু নয়, এমন কি মানবসত্তার কোনও মৌলিক উপাদানও নয়; এ হল বাহ্য প্রকৃতি ও পরিবেশনির্ভর এক চরিত্রধর্ম। এই নব্য নীতিবাদের দৃষ্টিতে নীতিশাস্ত্র আর ধর্ম বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অঙ্গ রইলনা; অধিকন্তু

নৈতিক মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণাতেও এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এল। সুখ বা আরামকে মঙ্গল ও সুখাভাবকে অমঙ্গলের সঙ্গে সমার্থক মনে করবার প্রবণতা দেখা দিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বেন্থাম, জেম্‌স মিল প্রমুখ উপযোগবাদী (utilitarian) চিন্তানায়কগণের মধ্যে। সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর নব্য নীতিবাদ ও নব্য মনোবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত এই দার্শনিকদের দৃষ্টিতে মানুষের নীতিজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ নয়, নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনুমিত। জন স্টুয়ার্ট মিল প্রদত্ত উপযোগবাদের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নিম্নরূপ: "The creed which accepts as the foundation of morals, Utility or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure; by unhappiness, pain and the privation of pleasure।"[৭৪] বেন্থাম-জেম্‌স মিল ব্যাখ্যাত এই মতবাদ মানবমনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি কাল্পনিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) সর্বমানবের একমাত্র কাম্য সুখ বা আরাম; মানুষ স্বভাবত স্বার্থপর; (২) বিভিন্ন প্রকার সুখ বা আরামের মধ্যে কোনও মৌলিক গুণগত পার্থক্য নেই; কাব্যরসাস্বাদনের ও ফুটবল খেলার তৃপ্তি মূলত একজাতীয় উপভোগ; (৩) যে হেতু সব সুখ বা আরামই একজাতীয়, সে হেতু হিসাব করে সুখ বা আরামের যোগফল নির্ণয় করা চলে। এই পদ্ধতি অনুসারে সুখের (বা আরামের) পরিমাণ নির্ণয়ের দ্বারা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সুখসাধনই হল নীতিশাস্ত্রের আদর্শ। ইংলণ্ডে সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম প্রবর্তক রবার্ট ওয়েনের সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিও উল্লেখযোগ্য ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানবিভাসিত উদারনৈতিক (liberal) চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। এই দিক দিয়ে এক হিসাবে তাঁকে হেলভেসিয়াস্, গডুইন, বেন্থাম ও জেম্‌স মিল্-এর সগোত্র বলা যায়, যদিও সমাজ-পরিবর্তন সংক্রান্ত চিন্তায় পূর্বোক্তদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল।[৭৫] কিশোর বয়স থেকেই তিনি ধর্মে ও আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস হারান এবং ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে আসেন, মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণ তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। নৈতিক মূল্যবোধ মানবসত্তার কোনও ঈশ্বর-সৃষ্ট মৌলিক নিত্য উপাদান নয়;

এবং আপন কৃতকর্মের জন্ত মানুষের কোনও ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করবারও কিছু নেই।

আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, জীবনের বিভিন্ন পর্বে রামমোহন পাশ্চাত্য সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকীয় যুক্তিবাদী চিন্তার উল্লিখিত তিনটি স্রোতেই অবগাহন করেছিলেন।[৭৬] তাঁর প্রথম জীবনের ইসলামীয় সূত্রে আহরিত যুক্তিমার্গে গভীর বিশ্বাস উক্ত পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে বহুগুণে দৃঢ়, সমৃদ্ধ ও সুমার্জিত হয়েছিল, প্রসঙ্গান্তরে সে কথাও উল্লিখিত হয়েছে।[৭৭] যুক্তিবাদের সমর্থন ছাড়া রামমোহন সাধারণভাবে ইউরোপীয় চিন্তার পূর্ববর্ণিত ত্রিধারা থেকে নিজ চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর যে বৈশিষ্ট্যটি অর্জন করেন এক কথায় তার সংজ্ঞা দেওয়া চলে সমাজ-জিজ্ঞাসা। এই সমাজ-সমীক্ষণের ঝোঁকটি আমাদের দেশে নূতন। রেণেশাঁসোত্তর পাশ্চাত্য চিন্তা থেকেই এটি আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারায় সঞ্চারিত হয়েছিল। সপ্তদশ-ঊনবিংশ শতকীয় আলোচ্য নব্য ইউরোপীয় নীতিদর্শনের প্রেরণা এসেছিল নিউটন প্রবর্তিত নূতন জড়বিজ্ঞানের সূত্র ও প্রধানত লক ব্যাখ্যাত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক নূতন দার্শনিক প্রত্যয় (empiricism) থেকে। তাই এর বিভিন্ন ধারার মধ্যে সিদ্ধান্তগত যতই পার্থক্য থাকুক, সাধারণ ভাবে এর দৃষ্টি বহির্মুখী; ব্যষ্টিপর্যায়ে এর আধার মানুষের ইহজীবন, সমষ্টিপর্যায়ে মানবসমাজ। এই দৃষ্টিতে মানুষের ভালমন্দজ্ঞান ও তৎসম্মত আচরণের উদ্ভব ও নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে প্রধানত তার বাহ্য পরিবেশের উপর। রামমোহন যে নীতিচিন্তাকে ভারতীয়সুলভ দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবদ্ধ না রেখে সমাজসংস্কার ও মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেছিলেন তার মধ্যে এই পাশ্চাত্য প্রভাবের কার্যকারিত্ব অবশ্য লক্ষণীয়।

কিন্তু সমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে রামমোহনের নীতিদর্শনে সমাজ-কল্যাণের প্রশ্নটি এত বড় হয়ে দেখা দিলেও এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist)দের সঙ্গে তাঁর একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। নীতিবোধকে তিনি শুধু যে মানবসত্তার একটি মূল উপাদান গণ্য করতেন তা নয়, তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ছিল তার আধ্যাত্মিক চৈতন্যেরই প্রকাশ। এইখানে তিনি ছিলেন উপনিষদ্ ও খ্রীষ্টোপদেশ দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। আত্মচৈতন্যের একত্বদর্শী পুরুষের মন সর্বপ্রাণীর প্রতি প্রীতিতে অনুরঞ্জিত—উপনিষদের এই

শিক্ষা এবং ঈশ্বরপ্রেমের সার্থকতম প্রকাশ মানবপ্রেমের মধ্য দিয়ে—খ্রীষ্টের এই উপদেশ মূলত তাঁর নৈতিক দৃষ্টি গঠন করেছিল। সুতরাং তাঁর কাছে নীতিবোধ অধ্যাত্মচেতনারই অঙ্গ, মৌলিক এবং বিশ্লেষণাতীত। কর্মবাদ বা পাপপুণ্যের প্রচলিত ধারায় বিশ্বাস তিনি কোথাও স্পষ্টভাবে জ্ঞাপন করেন নি। খ্রীষ্টধর্মানুমোদিত মৌলিক পাপতত্ত্বকে যে তিনি অযৌক্তিক মনে করতেন তারও নিদর্শন আছে।[৭৮] কিন্তু সৎকর্মের যে আত্মতৃপ্তি বা সামাজিক কল্যাণ-সাধন ছাড়াও একটি গভীরতর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে—এমন চিন্তাও তাঁর রচনার কোথাও কোথাও আভাসিত; যেমন, "এরূপ স্ত্রীবধেতে একদেশীয় লোকের কি কথা? যদি তাবৎ দেশের লোক ঐক্য হইয়া করে, তথাপি বধকর্তারা পাতকী হইবেক, অনেকে ঐক্য হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারে না…।"[৭৯] অপিচ, "এরূপ বাক্য-কৌশল করিয়া কতিপয় মনুষ্য যাঁহারা স্ত্রীবধে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিলেন, কিন্তু বাক্যপ্রবন্ধবলে ঈশ্বরের বিচারে কি ত্রাণ হইতে পারে?"[৮০] এই প্রসঙ্গে 'বেদান্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা থেকে পূর্বোদ্ধৃত সেই অংশও পুনঃস্মরণীয় যেখানে এই বিশ্বাস প্রতিফলিত, জীবনের সকল কর্ম ঈশ্বরে নিবেদিত হয়েই চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করে এবং পরিণামে পরম প্রাপ্তিও আসে ঐশ সূত্রে।[৮১] সুতরাং এ সিদ্ধান্ত করতেই হয়, রামমোহনের নীতিবোধের উৎস তাঁর অধ্যাত্মবাদ। খ্রীষ্টোপদেশ ও সমকালীন পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ নীতিচিন্তা একে যথাক্রমে মানবমুখী ও সমাজমুখী করেছে, কিন্তু তার দ্বারা এর আধ্যাত্মিক চরিত্র ঢাকা পড়ে নি;—কৃতকর্মের চরম জবাবদিহির বেলা তিনি ঈশ্বরেরই ভরসা করেছেন, মানুষের নয়। একটি তুলনা স্বভাবত মনে আসে। অধ্যাত্মতত্ত্ব যে অর্থে যতদূর রামমোহনের অন্বিষ্ট বিদ্যাসাগরের তা নয়। শেষোক্ত মনীষী ছিলেন প্রখর বাস্তববুদ্ধি ও অমিত পৌরুষের অধিকারী, মানবপ্রেমী কর্মী পুরুষ। ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে জীবনে তিনি বিশেষ মাথা ঘামান নি, কাউকে ধর্মোপদেশও দিতেন না। কিন্তু স্বীয় কর্মের চূড়ান্ত নৈতিক দায়িত্ববিচার প্রসঙ্গে তিনি এক স্থানে রামমোহনের সঙ্গে প্রায় কণ্ঠ মিলিয়েছেন। কয়েকজন কল্যাণকর্মী বন্ধুর সহায়তায় বিদ্যাসাগর স্থাপন করেছিলেন হিন্দু পারিবারিক বৃত্তিভাণ্ডার (Hindu Family Annuity Fund)। কিছুকাল পরে এর পরিচালনা সম্পর্কে মতভেদ হওয়ায়

তিনি এর সংস্রব ত্যাগ করেন। এই উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬ তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে বলেছেন : "এই ফণ্ডের সহিত আর সংস্রব থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই ফণ্ডের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতেছি।"৮২ অবশ্য এখানে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের নীতিবোধের আপাত সাদৃশ্য সত্ত্বেও একটি পার্থক্য স্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের অন্তরে যদি প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে থাকে তাহলে মানতে হবে, তাঁর দৃঢ় ও মৌল নীতিবোধের মধ্যেই একমাত্র তিনি এর স্থির ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। অপর পক্ষে রামমোহনের নীতিবোধ ছিল তাঁর মৌল ব্রহ্মবাদ থেকে উৎসারিত।

দেখা যাচ্ছে, আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে স্বীকৃত intuitionist ও empiricist এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রামমোহনকে সাধারণভাবে প্রথমোক্তদের সগোত্র মনে করবার পক্ষেই যুক্তি প্রবল যদিও দ্বিতীয় ধারাটিও তাঁর নৈতিক দৃষ্টি গঠনে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করেছিল। নীতিবোধ এবং ভালমন্দ ধারণা মানুষের একটি মৌলিক বৃত্তি যা স্বতঃপ্রমাণ এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং এখানে intuitionist দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর মুখ্য সাদৃশ্য। কিন্তু পাশ্চাত্য intuitionist-রা নীতিবোধের ভিত্তিকে সর্বদা মানুষের অধ্যাত্মচৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত করেন নি। রামমোহনের নীতিবোধের দৃঢ় ভিত্তি ছিল তাঁর অধ্যাত্মপ্রত্যয়। এখানে ঔপনিষদ ও খ্রীষ্টীয় আত্মবাদ ছাড়া পাশ্চাত্য intuitionist-দের মধ্যে বিশপ বাট্‌লার প্রভৃতির মত বিশেষ করে যাঁরা খ্রীষ্টীয় নীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত তাঁদেরই সঙ্গে তাঁর চিত্তের আত্মীয়তা সমধিক। বেন্থাম ও জেম্‌স মিলের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা রামমোহনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। রবার্ট্ ওয়েনের ক্ষেত্রেও তাই। কেন না বেন্থাম, মিল, বা ওয়েন কেউই খ্রীষ্টধর্মে বা তৎপ্রসূত খ্রীষ্টীয় নীতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। বেন্থাম সুখ (happiness) ও আরাম (pleasure)-কে সমার্থক মনে করতেন; তাঁর ধারণা ছিল প্রত্যেক মানুষই স্বার্থপর এবং ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ আরাম (=সুখ) প্রতিটি ব্যক্তির বাঞ্ছিত ও অন্বিষ্ট; কিন্তু প্রতি ব্যক্তির সুখেচ্ছা চরিতার্থ করবার প্রয়াসকালে পরস্পরের

স্বার্থসংঘাত অবশ্যই ঘটতে পারে; সুতরাং সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষের সর্বোচ্চ সুখ বা আরামই কাম্য, এতে যদি অল্পসংখ্যক মানুষের সুখ বা আরাম বিসর্জন দিতে হয় তাহলে তাও বাঞ্ছনীয়। এই যুক্তিতে ধরে নেওয়া হচ্ছে সুখ বা আরাম বস্তুটি পরিমেয়, অন্য পাঁচটি জড় বস্তুর মত গাণিতিক পদ্ধতিতে হিসাব করে এর কমবেশী নির্ণয় করা চলে। রামমোহনের মত নীতিবোধকে যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনার এক মৌলিক বিকাশ বলে স্বীকার করেন তাঁদের কাছে এ মতবাদ নানা কারণেই গ্রহণীয় হতে পারে না। প্রথমত সুখকে আরামের সঙ্গে এক করে দেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের দৃষ্টিতে শ্রেয় এবং প্রেয় দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষার্থ। ব্যক্তিগত সুখ বা আরাম চরিতার্থ করা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এ সিদ্ধান্ত তাঁরা কিছুতেই মানবেন না। যান্ত্রিক ভাবে বহু ব্যক্তির আরাম বা সুখকে একত্র করে সুখের সর্বোচ্চ যোগফল বার করা যায় এ কথাও তাঁদের কাছে অশ্রদ্ধেয় বোধ হবে।[৮৩] তাঁরা নীতিজ্ঞানকে একটি স্থায়ী মূল্যবোধ ধরে সুখকে (দুঃখকেও) তার অন্যতম অনুষঙ্গরূপে দেখবেন। হবহাউসের ভাষায়, "We are happy in something and the something must be worthwhile. Take from it its intrinsic value and our happiness becomes an illusion. If we were happy in things valuable only as a means to our happiness they would cease to be means to our happiness. What we wish for those we love ~~is~~ not nearly that they should be happy on any terms, but also that thay should be and do what we think worthy"।[৮৪] রবার্ট ওয়েনের অধ্যাত্মবাদ-বিরোধী বহির্মুখী নীতিচিন্তার সঙ্গে নিজের মতপার্থক্য রামমোহন প্রকাশ করেছেন ওয়েন-পুত্রের নিকট লিখিত ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখের পত্রে। এখানে তাঁর বক্তব্য, খ্রীষ্ট ও হিন্দু ধর্ম স্বীকৃত বিশ্বজনীন প্রেম ও দাক্ষিণ্য (doctrine of universal love and charity) প্রমুখ চিরায়ত নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে অস্বীকার করার জন্যই ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় রবার্ট ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে।[৮৫] তবে একথা সর্বথা স্বীকার্য, জ্ঞানবিভাসিত যুগের চিন্তানায়কগণ, তথা বেন্থাম প্রমুখ উপযোগবাদীরা এবং সর্বশেষে ওয়েন প্রভৃতি তৎসাময়িক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তৃবৃন্দ নৈতিকসমস্যা

সংক্রান্ত তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক ইহমুখী চিন্তা দ্বারা রামমোহনের সামাজিক দৃষ্টিকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিলেন। রামমোহনের সমাজচিন্তার ক্রম-অভিব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও সমাধানের প্রস্তাব সমূহ পদে পদে এ কথা মনে করিয়ে দেয়। এক কথায় বলা যায় তাঁর নীতিচিন্তায় মূল intuitionist প্রত্যয়ের সঙ্গে empirical পদ্ধতির সমন্বয় ঘটেছিল। এর অনেক নিদর্শন আছে।

বেন্থামের চিন্তায় নীতিশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত। 'সর্বাধিক সংখ্যক প্রাণীর সর্বোচ্চ সুখসাধন'—উপযোগ-তত্ত্বের এই প্রাথমিক নীতি হল এই যোগাযোগের প্রধান সূত্র। এ বিষয়ে তাঁর An Intoduction to the Principles of Morals and Legislation (১৭৮৯) গ্রন্থখানি দিক্-নির্দেশক। কিন্তু এই যোগাযোগ স্বীকার করে নিয়েও বেন্থাম এই দুই শাস্ত্রের সূক্ষ্ম প্রভেদ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন। জন বাওরিং সম্পাদিত বেন্থাম-গ্রন্থাবলীর সংস্করণের জন হিল-বার্টন যে সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন সেখানে বিষয়টি এই ভাবে উপস্থাপিত: "There are two main objects in view in those of Bentham's works which are intended to influence human action—the direction of the Moral and the direction of the Legal Sanction. The one is to instruct the individual as to what he ought to do—the other is to instruct the legislator what he ought to enforce and restrict. Where the former has been the end in view, the science has been denominated Morals or Ethics····Where the latter end is held in view the science is called Politics or Political Philosophy and embraces within it the art and science of Legislation...Although the Greatest Happiness principle be the end of in view of all the author's writings whether they instruct men how to direct their own individual actions or teach them how to make rules for the action of others, yet there is a broad demarcation between these two subjects beginning

at the root of both of them...it may tend to the greatest happiness of society that a man should voluntarily follow a certain rule of action ; but it may be injurious to the happiness of the community in general to compel him to follow such a rule if his inclinations are against it।”[৩৬] ব্যক্তির নৈতিক সংস্কার অনুসারে ইচ্ছাসুখে সে যে কাজ করবে তাকে আইনের বলে সেই কাজ করাতে গেলে সেই বাধ্যবাধকতা সমগ্র সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। সম্ভবত এক্ষেত্রে বেন্থামের উক্ত গ্রন্থধৃত চিন্তা রামমোহনকে প্রভাবিত করেছিল। তবে বেন্থামে যা সূত্রাকারে বর্তমান, রামমোহন সেটিকে স্পষ্ট, সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিত রূপ দিয়েছেন বংশগত সম্পত্তিতে হিন্দুদের অধিকার সংক্রান্ত ১৮৩০ সালে রচিত তাঁর গ্রন্থে। বিচারপতি ম্যাকনাটেনের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত এক উক্তির প্রতিবাদে (we ought to make that invalid which was considered immoral) রামমোহন বলেছেন : “Let us however apply this principle to practice to see how far as a general rule, it may be safely adopted. To marry an abandoned female is an act of evil moral example. Are such unions to be therefore declared invalid and the offspring of them rendered illegitimate? To permit the sale of intoxicating drugs and spirits, so injurious to health and even sometimes destructive of life, on the payment of duties publicly levied, is an act highly irreligious and immoral: Is the taxation to be therefore, rendered invalid and payments stopped? To divide spoils gained in a war commenced in ambition and carried on with cruelty is an act immoral and irreligious. Is the partition therefore to be considered invalid and the property to to be replaced? To give a daughter in marriage to an unworthy man on account of rank and fortune, or other such consideration, is a deed of mean and immoral example. Is the union to be therefore considered

invalid and their children illegitimate? To destroy the life of a fellow-being is not only immoral but is reckoned by many as murder. Is not the practice tacitly admitted to be legal by the manner in which it is overlooked in courts of justice?"[৭] অবশ্য রামমোহন স্বীকার করেছেন, কতগুলি আচরণ আছে যা একাধারে দুর্নীতি ও অধর্ম বা দুর্নীতির প্রান্তঘেঁষা এবং সেগুলিকে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা সঙ্গত। কিন্তু নীতিবিরোধী অথচ আইনসম্মত আচরণ এবং নীতি ও আইন দুই মানদণ্ডেই নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য আচরণের মধ্যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করবার উপায় কি? সে ক্ষেত্রে রামমোহনের মতে প্রতি দেশের লোকপ্রচলিত আইন (comon law) এবং প্রতিষ্ঠিত লোক-ব্যবহার (established usage) সম্মত দুইএর মধ্যকার ভেদরেখাকেই মেনে নিতে হবে। রামমোহন তাঁর সমালোচনা ও ব্যাখ্যা শেষ করেছেন এই বলে যে বিচারপতি ম্যাকনাটেন আগে তাঁর স্বদেশ ইংলণ্ডের ব্যবহারবিদ্‌গণকে নীতি ও আইনের ভেদাভেদ বর্জন করতে রাজী করুন তার পরে বাঙ্গালী হিন্দুরা এ বিষয়ে তাঁর কথা শুনবে।[৮৮] নীতিশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রের স্ব স্ব পরিমণ্ডল, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির পার্থক্য বর্তমান ব্যবহারবিজ্ঞানে (Jurisprudence) সুনির্দিষ্ট ও সর্বস্বীকৃত।[৮৯] কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পাশ্চাত্য জগতেও স্পষ্ট ছিল না; দুই শাস্ত্রের সীমারেখার প্রশ্নে দার্শনিক ও ব্যবহারবিদ্‌গণ তখনও তর্কাতীত মীমাংসায় উপনীত হন নি। বেন্থাম, জেম্‌স্ মিল, অস্টিন প্রমুখ যে সব মনীষীর মৌলিক চিন্তা সমস্যাটিকে চূড়ান্ত সমাধানের পথে অগ্রসর করেছে তাঁদের মধ্যে রামমোহনের নামটিও গণ্য হওয়া উচিত।

নীতি ও ব্যবহারশাস্ত্রের সূক্ষ্ম প্রভেদ স্বীকার করলেও বেন্থাম এগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপরও জোর দিয়েছেন তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থে। সর্বোচ্চ লোক-কল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালপ্রচলিত (ইংলণ্ডের ও সমগ্র বিশ্বের) আইন ব্যবস্থাসমূহের যে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, তা হল ইতস্ততবিক্ষিপ্ত বিপুল বিচিত্র ব্যবহারবিধিকে সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট সংহিতার (code) আকারে বেঁধে দেওয়া। ইংরেজি ভাষায় codification শব্দটি বেন্থাম চালু করেন। বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রশাসক ও আইনপ্রণেতৃগণ দেশের আইনকে এই ভাবে

সংহিতার আকারে বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় হাম্মুরাব্বির সংহিতা, প্রাচীন গ্রীসে সোলোনের সংহিতা রোমান সম্রাট দ্বিতীয় থিওদোসিয়ুস ও জুস্তিনিয়ানের সংহিতাদ্বয়, একালে নেপোলিয়নের সংহিতা (Code Napoleon) প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগে মনুসমেত কুড়ি জন ধর্মশাস্ত্রকারও সেই কাজই করে গেছেন। বেন্থাম উপযোগবাদের দৃষ্টিতে এই সংহিতা-প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন কয়েকটি কারণে: (১) ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রচলিত আইন যুগযুগপুঞ্জীভূত নানা বিচিত্র উপাদানের ভারে এক বিপুল, বিশৃঙ্খল, ক্ষেত্রবিশেষে স্ববিরোধী, নানা প্রয়োগহীন, অপ্রচলিত নিয়ম-শাসিত ব্যবস্থায় পরিণত; (২) আইন না জানা অপরাধ, কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে প্রচলিত আকারে এই স্তূপীকৃত, অস্পষ্ট, বিশৃঙ্খল পরিভাষা-কণ্টকিত, জটিল আইনব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা অসম্ভব; (৩) আদালতের বিচারপদ্ধতি এত মন্থরগতি এবং ব্যয়বহুল, আইনজীবী ও বিচারকগণ এত অর্থগৃধ্নু, দীর্ঘসূত্রী, দায়িত্বজ্ঞানহীন, সহানুভূতিবর্জিত এবং স্থলবিশেষে মূর্খ যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের পক্ষে সুবিচার লাভ করা প্রায় অসম্ভব।[৮৯] এই কারণেই বেন্থাম প্রচলিত আইনকে সরল, যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত, স্বল্পমূল্য, সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য সংহিতাকারে প্রকাশ করবার স্বপক্ষে আজীবন আন্দোলন করেছেন। দেখা যাবে, পার্লামেন্টের সিলেকট্ কমিটির সামনে ভারতের বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে রামমোহন প্রথমেই প্রচলিত আইনকে একটি code বা সংহিতার আকার দেওয়ার আবশ্যকতার উপর জোর দিয়েছেন। এই সংহিতা দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই আইনেরই হওয়া প্রয়োজন এবং হিন্দু ও মুসলমান আইনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপরে তা প্রণয়নের ভার দেওয়া উচিত।[৯১] এর যুক্তি হিসাবে তিনি যা বলছেন তার সঙ্গে বেন্থামের অনুরূপ যুক্তির মিল আছে: "The Regulations published from year to year by the local Government since 1793 which serve as instructions to the courts, are so voluminous, complicated and in many respects either too concise or too exuberant, that they are generally considered not a clear and easy guide; and the

Hindu and Mahommedan laws administered in conjunction with the above regulations, being spread over a great number of different books of various and sometimes doubtful authority, the judges, as to law points, depend entriely on the interpretation of their native lawyers whose conflcting legal opinions have introduced great perplexity into the administration of justice।"[২২] বেন্থামের ব্যবহারচিন্তার সঙ্গে রামমোহনের দৃষ্টির এই সাদৃশ্যবিচারকালে দুটি কথা মনে রাখা উচিত। ব্যবহারশাস্ত্রের সংহিতা (code) এবং সংকলন বা সংগ্রহ (digest) প্রকাশের ঐতিহ্য ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন। সংস্কৃত সাহিত্যে মনু সমেত বিংশতি ধর্ম-সংহিতা ও অসংখ্য নিবন্ধগ্রন্থের অস্তিত্বই এর প্রমাণ। আইনের প্রামাণিক সংকলন প্রণয়নের ধারাটি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যে চলে এসেছিল তার দুটি নিদর্শন যথাক্রমে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে সংকলিত 'বিবাদার্ণবসেতু' (হ্যালহেড কর্তৃক ১৭৭৬ সালে ইংরেজিতে অনূদিত) এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সংকলিত 'বিবাদভঙ্গার্ণব' (কোলব্রুক কর্তৃক ১৭৯৮ সালে ইংরেজিতে অনূদিত)। রামমোহন হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এই ধারাবাহিক ঐতিহ্যটি অন্তরঙ্গভাবে জানতেন। ফার্সীতে অভিজ্ঞ হওয়ার দরুণ সম্রাট ঔরংজিবের আমলে সংকলিত ভারতে মুসলিম আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি'র সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল।[২৩] সুতরাং আইনসংহিতা প্রণয়নের উপযোগিতা সংক্রান্ত প্রেরণা তাঁর মূলত ভারতীয় সূত্র ও হিন্দু-মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্রের প্রচলিত উদাহরণগুলি থেকে এসেছিল এমন ধারণা স্বচ্ছন্দে করা চলে। বেন্থামের রচনা ও যুক্তি এক্ষেত্রে তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্যগত ধারণাকে পুষ্ট, মার্জিত এবং যুগোচিত লক্ষণমণ্ডিত করেছিল।[২৪] দ্বিতীয়ত বেন্থাম কতগুলি বিমূর্ত নীতি ও তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সর্বজনীন সংহিতাপ্রণয়ন-পরিকল্পনা (Codification Proposal) প্রস্তুত করেছিলেন এবং অনুরুদ্ধ হলে তদনুসারে পৃথিবীর যে কোনও দেশের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ আইনব্যবস্থা গড়ে দেবেন এমন প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে রামমোহনের মার্গ ছিল স্বতন্ত্র। তাঁর মতে কোনও দেশের আইনব্যবস্থার সঙ্গে সে দেশের ঐতিহ্য, ও জীবনচর্যার

বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ যোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। আমরা দেখেছি এই যুক্তিতে তিনি বাঙালী হিন্দুর উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে মিতাক্ষরা অপেক্ষা দায়ভাগের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। অন্যত্র ভারতের ফৌজদারী আইনকে সংহিতার আকার দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "A code of criminal law for India should be founded as far as possible on those principles which are common to and acknowledged by all the different sects and tribes inhabiting the country।"[১৫] সমাজে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যগত এই বিচিত্র লোকব্যবহার বা usage যদি আইনসংহিতায় স্বীকৃতি না পায়, তবে তা দেশবাসীর উপযোগী হবে না এই ছিল রামমোহনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। এখানে বেন্থামের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় যে সূত্রে বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের ব্যবহারশাস্ত্র ও বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত চিন্তার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় সেটি হল বিচারকদের যোগ্যতার প্রশ্ন। রামমোহন অনুভব করেছিলেন, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারকের অভাব ঘটেছে। তখনকার দিনে আইনের বিশেষ শিক্ষা না পেয়ে অতি অল্প বয়সে কোম্পানির ইংরেজ সিভিলিয়ানরা ভারতবর্ষে এসেই শাসন ও বিচারের কাজ আরম্ভ করতেন। সরকারী যুক্তি ছিল, অতি অল্প বয়সে এদেশে এলে এঁরা সহজেই এদেশের ভাষা আয়ত্ত করতে পারবেন। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে রামমোহনের বক্তব্য ছিল: (১) কোন একটি বিশেষ আইনপদ্ধতিতে শিক্ষিত না হলে অল্প-বয়সী, অনভিজ্ঞ, এদেশে নবাগত ইংরেজ বিচারকের পক্ষে এদেশের আইন ও বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সম্ভব নয়; সুতরাং তাঁর প্রস্তাব no civil servant should be sent to India under 24 or at least 22 years of age, and no candidate among them should be admitted into the judicial line of the service, unless he can produce a certificate from a professor of English law to prove that he possesses a competent knowledge of it. Because though he is not to administer English law, his proficiency therein will be a proof of his capacity for legal

studies and judicial duties, and a knowledge of the principles of jurisprudence as developed in one system of law will enable him to acquire more readily any other system.।[২৬] এ সম্পর্কে স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "এক দেশ ও এক কালের ব্যবহারশাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান যে অন্য দেশ ও ভিন্ন কালের ব্যবহারশাস্ত্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেয় রামমোহন রায়ের এ-কথার প্রমাণ ইংলণ্ডের নাম করা বিচারপতিরা প্রিভি কাউনসিলে হিন্দু আইনের বিচারপ্রসঙ্গে বারবার দিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষা না জেনে স্মৃতিকর্তা ও নিবন্ধকারদের পুঁথির অতি সামান্য অংশমাত্র অনুবাদের মারফত পরিচয় পেয়ে এই ইংরেজি ও রোমক আইনে অভিজ্ঞ ইংরেজ জজেরা স্মৃতি ও নিবন্ধকারদের মর্মকথা ও মূলসূত্রগুলি এমন চমৎকার ধরেছেন যে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। অপরপক্ষে অনেক ইউরোপীয়ই "ইণ্ডোলজিস্ট" সংস্কৃত ভাষা ভাল শিখে এবং বহু স্মৃতি ও নিবন্ধতত্ত্ব মূলে আদ্যোপান্ত পড়ে ওদের মধ্যে যে সর্বব্যবহারশাস্ত্রসাধারণ মূলতত্ত্বগুলি নিহিত রয়েছে—অনেক জায়গাতেই তা বুঝতে পারেননি, কারণ কোনও ব্যবহারশাস্ত্রের জ্ঞানই তাঁদের নেই,—নিজের দেশেরও নয়, পরের দেশেরও নয়।"[২৭] গুণগত এবং আইনজ্ঞানগত যোগ্যতাই বিচারক নিয়োগের একমাত্র মানদণ্ড হওয়া উচিত বেন্থামের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে এখানে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য লক্ষণীয়। তবে বেন্থাম যাঁর কঠোর সমালোচক ছিলেন সেই বিখ্যাত ইংরেজ ব্যবহারবিদ্ সার উইলিয়ম ব্ল্যাকষ্টোনের Commentaries on the Laws of England থেকেও রামমোহন এক্ষেত্রে নিজসিদ্ধান্তের সমর্থনে উদ্ধৃতি দিতে দ্বিধা করেন নি।[২৮] বিচারবিভাগীয় সংস্কার সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপারে নিজ অভিজ্ঞতার সমর্থন সম্ভবত বেন্থামের চিন্তা থেকে রামমোহন লাভ করেছিলেন। সেটি হল প্রচলিত বিচারব্যবস্থাকে সর্ববিধ জটিলতা ও দুর্নীতিমুক্ত এবং তার মন্থরতা ও ব্যয়বাহুল্যবর্জন করে তাঁকে জনসাধারণের আয়ত্তে এনে দেওয়া। বেন্থাম এ-সম্পর্কে ইংলণ্ডে বিশেষ আন্দোলন করেছিলেন। রামমোহন পার্লামেণ্ট সিলেকট্ কমিটির সামনে সাক্ষ্যদানকালে ব্রিটিশ ভারতের প্রচলিত বিচারপ্রথা প্রসঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য করেছেন তা প্রায় সর্বত্র বেন্থামকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[২৯] ভারতে জুরী (jury) প্রথা প্রবর্তনকে রামমোহন স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং

ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানের জুরী পদাধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এ-কথা সুবিদিত।[১০০] বিচারকদের স্বৈরাচার দমনের অস্ত্ররূপে বেন্থাম জুরীপ্রথাকে সোৎসাহ সমর্থন জানিয়েছিলেন বলেই সম্ভবত এক্ষেত্রেও রামমোহনের উপর বেন্থামের প্রভাব কল্পিত হয়েছে। কিন্তু দেখা যাবে রামমোহন জুরীপ্রথাকে ভারতবর্ষে আবহমান কাল প্রচলিত পঞ্চায়েত প্রথারই আধুনিক প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করেছেন (The principle of juries under certain modifications has from the most remote periods been well understood in this country under the name of punchayet)। অবশ্য বর্তমান জুরীপ্রথার সঙ্গে পঞ্চায়েতের পার্থক্য গুলিও তিনি নির্দেশ করেছেন এবং এই পঞ্চায়েত-জুরীপ্রথা বিচার ব্যবস্থায় যুগোপযোগী আকারে প্রযুক্ত হলে যে তা আদালতে প্রচলিত মিথ্যা সাক্ষ্যদান, জালিয়াতী ও অন্যবিধ দুর্নীতির প্রতিষেধক হতে পারে সে-কথাও স্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবেই বলেছেন।[১০১] এখানে তাঁর মূল প্রত্যয়টি ভারতীয় সূত্রেই আহরিত এবং বেন্থামের রচনায় তিনি আপন ভাবনার সমর্থন পেয়েছেন বলা যেতে পারে।

দেখা গেল স্বীয় নীতিচিন্তার ভিত্তি অধ্যাত্মচেতনার উপর স্থাপন করা সত্ত্বেও রামমোহন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ বহির্মুখী লোককল্যাণমূলক নীতিদর্শনের শিক্ষাদ্বারা যথেষ্ট অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন। উপযোগবাদের প্রবক্তা বেন্থামের নীতি ও ব্যবহারচিন্তার প্রভাব তাঁর মানসে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল, যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেন্থামের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ এবং মনোভাবের ভারতীয় প্রবণতাও লক্ষণীয়।

অষ্টাদশ শতকীয় ইউরোপীয় চিন্তা রামমোহনের মনে অপর যে প্রত্যয়টিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছিল তা হল 'স্বাধীনতা' (liberty)। 'স্বাধীনতা' রামমোহনের কাছে মাত্র একটি শৌখিন কেতাবী ধারণাই ছিল না, এটি ছিল তাঁর চিত্তের এক মৌলিক সর্বাত্মক প্রেরণা। এ বিষয়ে উইলিয়ম এ্যাডামের সাক্ষ্য মূল্যবান: "He [রামমোহন রায়] would be free or not be at all···Love of freedom was perhaps the strongest passion of his soul, freedom not of action merely, but of thought··· The tenacity of personal independence, this sensitive

jealousy of the slightest approach to an encroachment on his mental freedom was accompanied with a very nice perception of the equal rights of others even of those who differed most widely from him in religion and politics, still more remarkably, even of those whom the laws of nature and of society, subjected to his undisputed control." ।[১০২] এ্যাডাম এখানে রামমোহনের জীবনদর্শনের মর্মস্থানে আলোকপাত করেছেন। এই মূল প্রত্যয়টি ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁকে যেমন সে-যুগে ভারতীয়দের মধ্যে বিরল এক প্রখর আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী করেছিল,[১০৩] তেমনি তাঁর সমাজ, রাষ্ট্র এবং ধর্ম সম্পর্কীয় চিন্তাকেও সর্বত্র ভাস্বর করে তুলেছিল। ব্যক্তিগত স্তরে যে স্বাধীনতা ছিল তাঁর আত্মিক ধর্ম তা তিনি প্রয়োগ করেছিলেন সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় তাঁর সর্বপ্রকার চিন্তার ক্ষেত্রে। আমরা দেখেছি ইতিহাসে যে সামাজিক রূপান্তর আধুনিক যুগের সূচনা করেছিল সে সম্পর্কে রামমোহন সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং রামমোহন-গোষ্ঠীর মুখপত্রে স্পষ্ট করেই লেখা হয়েছিল, পৃথিবীর সর্বত্র এই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই নবোত্থিত মধ্যবর্তী (middling) শ্রেণীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সার্থকতা। তাঁর সংস্কারকর্মসূচীকে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই সেগুলির মূল লক্ষ্য। ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ধর্মের মূল তত্ত্বগুলির বিচার করবে এবং ধর্মজীবনের ভিত্তিস্বরূপ শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে যুক্তি ও সহজ জ্ঞান। সমাজসংস্কার-কর্মেও তাঁর মূল অবলম্বন অন্তরের মৌলিক নীতিবোধের শাসন ও যুক্তিমূলক শাস্ত্রবিচার। সতীদাহসংক্রান্ত তাঁর বাঙ্‌লা-ইংরেজি গ্রন্থগুলির প্রায় প্রতি ছত্রেই এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ লক্ষণীয়। নারীকে সমাজে তাঁর পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এই জন্যই সতীদাহবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন হিন্দুনারীর সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপনের প্রশ্নটিকে। মিতাক্ষরার চেয়ে দায়ভাগ সম্মত উত্তরাধিকার ব্যবস্থা সমাজে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা স্থাপনের অধিকতর উপযোগী তাঁর এই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তও এই প্রসঙ্গে বিচার্য। রাষ্ট্রব্যবস্থাসংক্রান্ত চিন্তায় আমরা প্রথমেই

লক্ষ্য করি রামমোহন তদানীন্তন জগতের প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের উৎসাহী সমর্থক; এবং প্রত্যেক মুক্তিসংগ্রামের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতিশীল। বাকিংহামকে লিখিত। ১১ আগষ্ট, ১৮২১ তারিখের পত্রে স্বাধীনতার শত্রু (enemies to liberty) এবং স্বৈরতন্ত্রের সমর্থকগণের (friends of despotism) প্রতি তাঁর ঘৃণা এবং ভবিষ্যতে মানবমুক্তি-সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কিত নিশ্চিত বিশ্বাস সুপরিস্ফুট।[১০৪] স্বদেশের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিদেশী-শাসনমুক্ত আত্মনিয়ন্ত্রিত ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের ছবি তাঁর কল্পনায় আভাসিত, যদিও জ্ঞানবিজ্ঞানশিল্পবাণিজ্যসমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সংযোগ ভিন্ন তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া অসম্ভববোধে তিনি কিছুকাল ভারতে বিদেশী শাসনরক্ষার পক্ষপাতী। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার প্রত্যয় শেষ পর্যন্ত তাঁকে যে প্রজাতন্ত্রে (republic) বিশ্বাসী করেছিল প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তা দেখা গেছে।[১০৫]

রামমোহনের সহজাত স্বাধীনতাবোধ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জ্ঞান-বিভাসিতযুগের চিন্তাদ্বারা লালিত ও মার্জিত হয়েছিল, ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে যে চিন্তার মূর্ত প্রকাশ। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর এই সংক্রান্ত মনোভাবের যে প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি তার সঙ্গে মনীষী বেন্থামের ভাবধারার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় যদিও উত্তরজীবনে বেন্থাম ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। রামমোহন প্রতিটি দেশ বা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন এবং এই সূত্রে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশ সমূহের স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে অভিনন্দিত করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সার্থক বিদ্রোহের নিদর্শন হিসাবে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এ-সংগ্রামও ছিল রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস। অপরদিকে দেখা যায় ফরাসী বিপ্লবের অনুরাগী না হয়েও বেন্থাম সিদ্ধান্ত করেছেন, কোনও অগ্রসর ইউরোপীয় শক্তির পক্ষে উপনিবেশস্থাপন নৈতিক দৃষ্টিতে এক গুরুতর অন্যায়; ফরাসী বিপ্লবী সরকারের জাতীয় প্রতিনিধিসভার (National Convention) উদ্দেশ্যে তিনি বলেন (১৭৯৩): "War thickens round you. I will shew you a vast resource. Emancipate your colonies···Justice, consistency, policy, economy, honour, generosity, all demand it of you.···Conquer, you are still,

but running the race of vulgar ambition; emancipate, the conquest is your own and made over yourselves. ...If hatred is your ruling passion and gratification of of it, your first object, you will still grasp your colonies. If the happiness of mankind is your object and the declaration of rights your guide, you will set them free—the sooner the better; it costs you a word; and by that word you cover yourselves with the purest glory."।[১০৬] বেন্থামের এই আবেগপূর্ণ উক্তি রামমোহনকে অনুপ্রাণিত করেছিল এ অনুমান সহজেই করা যেতে পারে, যদিও মনে রাখতে হবে দুই মনীষী সমস্যাটিকে দেখেছিলেন দুই বিপরীত দিক থেকে। রামমোহনের কাছে এক্ষেত্রে চরম পুরুষার্থ হল স্বাধীনতা বা liberty; বেন্থামের কাছে তা সর্বোচ্চ সুখ; রামমোহনের দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হওয়া বিজিতের অন্যতম অধিকার; বেন্থামের কাছে উপনিবেশকে স্বাধীনতা দেওয়া শাসকের নৈতিক দায়িত্ব—এতে উভয়পক্ষেরই সর্বাধিক সুখ। রামমোহনের মৌল স্বাধীনতাবোধের অপর এক প্রকাশ মুদ্রাযন্ত্রকে সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণমুক্ত করবার জন্য সংগ্রাম; বেন্থাম তাঁর উপযোগবাদ ও সর্বাধিক সুখবাদের দৃষ্টি থেকে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত "On the Liberty of the Press and Public Discussion নিবন্ধে যা তিনি এক বৎসর পূর্বে (১৮২০) নিবেদন করেছিলেন স্পেনের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে।[১০৭] মৌলিক প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে দুজনের পার্থক্য সত্ত্বেও ধরে নেওয়া যেতে থাকে বেন্থমের উক্ত নিবন্ধ থেকেও রামমোহন প্রেরণা লাভ করেছিলেন। রামমোহনের প্রজাতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসের সূত্র অন্বেষণ-প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের কথা। উভয় সংগ্রামের মধ্যেই ইতিহাসে প্রজাতন্ত্রের আদর্শ জয়যুক্ত হয়েছিল এবং মানবমুক্তিসংগ্রামের উক্ত দুই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত যে রামমোহনের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই।[১০৮] তা ছাড়া অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের ইংলণ্ডের লিবারালমহলেও আমেরিকা-ফ্রান্স প্রভাবিত প্রজাতন্ত্রী চিন্তার এক ধারা প্রবহমান ছিল যদিও কোনও প্রজাতন্ত্রী দল

(party) সেখানে গড়ে উঠেনি। টমাস পেইন্, উইলিয়ম গড়ুয়িন প্রমুখ মননশীল চিন্তানায়ক; ওয়ার্ড্সওয়ার্থ্, সাদি, কোলরিজ, ল্যাণ্ডর, শেলি, প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক এবং দর্শনিক জেরেমি বেন্থামের নাম এই সূত্রে করা যায়।[১০৯] এঁদের মধ্যে টমাস পেইন ও বেন্থামের চিন্তা রামমোহনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল এমন অনুমানের কারণ আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার ও উত্তরজীবনে বিপ্লবী ফ্রান্সের নাগরিক পেইনের প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাস ছিল নিশ্ছিদ্র এবং ধর্মবিশ্বাস ছিল শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর The Rights of Man এবং Age of Reason গ্রন্থদ্বয়ে যথাক্রমে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্যদ্বয় প্রতিফলিত। এই দুটি ক্ষেত্রে পেইনের মনের গড়নের সঙ্গে রামমোহনের মিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা ছাড়া সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা জানা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলিকাতার শিক্ষিত মহলে পেইনের রচনার চাহিদা ও চলন ছিল যথেষ্ট। বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিগত শতকের কুড়ির দশক থেকেই স্থাপিত। বেন্থাম তাঁর বিশ্বজনীন 'সাংবিধানিক সংহিতা' (Constitutional Code) (১৮২০ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে রচিত) গ্রন্থে অতি সুপরিকল্পিত ভাবে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে বিস্তারিত তুলনা করে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর মতে নিখাদ প্রজাতন্ত্র ছাড়া আর যে কোনও ধরণের শাসনব্যবস্থায়, এমন কি ইংলণ্ডের মত সাংবিধানিক রাজতন্ত্রেও, শাসনভারপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিরা জনসাধারণের শত্রু ভিন্ন আর কিছু নন (In a limited monarchy, limited by a representation of the people···the situation of the representative of the people is that of an enemy to the people.)। যেখানে জনপ্রতিনিধিমূলক শাসনের সঙ্গে রাজতন্ত্র যুক্ত হয় সেখানে 'সর্বাধিক-সংখ্যকের সর্বোচ্চ সুখসাধন' নীতি বিঘ্নিত হয়।[১১০] এখানেও মনে রাখতে হবে বেন্থামের 'সর্বোচ্চ সুখবাদ' নীতিগত ভাবে রামোহনের পক্ষে গ্রহণীয় ছিল না; রামমোহনের প্রজাতন্ত্রবাদ তাঁর মৌলিক স্বাধীনতাবোধেরই ক্রমবিকাশ যার আদি সূত্র অন্বেষণ করতে হবে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রপক্ষপাতিত্বে বেন্থাম ও রামমোহনের মতসাদৃশ্য

চমকপ্রদ। বেন্থামের রচনা রামমোহনের পূর্বগঠিত সিদ্ধান্তকে এক্ষেত্রে পুষ্ট করেছে ধরে নিলে অসঙ্গত হবে না।

বাকী থাকে ধর্মপ্রসঙ্গ। শুরুতেই বলা হয়েছে রামমোহন-মানসের মূল প্রেরণা ছিল আধ্যাত্মিক এবং তাঁর গভীর ধর্মপ্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মের নিত্য সত্যগুলির পাশাপাশি এর সামাজিক রূপ ও শক্তিকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দান। তিনি যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পুরুষার্থগুলিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন তারই ভিত্তিতে সর্বমানবের জন্য সামাজিক সুবিচার তাঁর কাম্য ছিল। কেবলমাত্র সামাজিক কল্যাণসাধনের উপায় রূপে তিনি ধর্মকে দেখেন নি বা কাণ্টের মত মৌলিক নীতিবোধের সরণী বেয়ে ধর্মবিশ্বাসের ভূমিতে উপনীত হবার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন নি। তাঁর নৈতিক প্রত্যয় ও সামাজিক দৃষ্টি তাঁর ধর্মবিশ্বাসেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের বিবরণ অনুসারে রামমোহনের ধর্মমতের অভিব্যক্তিতে নিম্নোক্ত কয়েকটি ক্রম লক্ষণীয় (১) প্রথম জীবনে ইসলামীয় শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে একেশ্বরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন; (২) ইসলামীয় ও ইউরোপীয় যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে সেই একেশ্বরবাদের প্রত্যাদেশ-বিরোধী সম্পূর্ণ যুক্তিমূলক deism-এর রূপগ্রহণ; (৩) ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র বিশেষত বেদান্ত অনুশীলনের ফলে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসঞ্চার ও ধর্মচিন্তায় যুক্তির (reason) পাশাপাশি শাস্ত্র (scripture) ও সহজ বুদ্ধি (common sense)র উপযোগিতা স্বীকার; এবং (৪) খ্রীষ্টের প্রেমধর্ম, সমসাময়িক ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য সমাজ-চিন্তা প্রভৃতির প্রভাবে মানবপ্রীতি ও মানবসেবাকে ব্রহ্মতত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গ্রহণ করা। এইভাবে বিবর্তিত হয়ে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা পরিণত বয়সে কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। উল্লিখিত পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ে এর কোনও কোনওটির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে এগুলির একটি সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে।

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে রামমোহন ক্রমশ সকলপ্রকার স্থূল বাহ্য পূজায় আস্থাহীন হয়ে পড়েন ও তাঁর উপলব্ধি জন্মায়—সকল ধর্মের সারবস্তু এক। পত্নী উমা দেবীকে এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে বলেছিলেন, বাহ্যত গাভীসমূহ নানা বর্ণের হলেও

তাদের কাছে যে দুধ পাওয়া যায় তার বর্ণ সর্বদা যেমন এক, তেমনি বিভিন্ন ধর্মের বাহ্যরূপ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সেগুলির অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্ব এক। দেখা যায় এই মূল তত্ত্ব সম্পর্কে 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন' রচনাকালেই তিনি একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন: যার বৈশিষ্ট্য হল (১) এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, এবং (২) আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। মানবপ্রীতি যে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ এমন প্রত্যয়ও 'তুহ্‌ফাৎ' গ্রন্থে স্পষ্টত আভাসিত।[১১১] খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবে উক্ত তৃতীয় সিদ্ধান্তটি উত্তরকালে পরিপুষ্ট হয়ে রামমোহনের ধর্মচিন্তায় আরও প্রাধান্য অর্জন করে। লক্ষ্য করবার বিষয় রামমোহনের ধর্মবিষয়ক এই সার্বভৌম সিদ্ধান্ত প্রধানত ঈশ্বরবিশ্বাসমূলক ধর্মগুলির পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মদ্বয় ঈশ্বরবর্জিত হওয়ার দরুণ স্বভাবত এর কোঠায় পড়বে না। উক্ত দুই ধর্মের সঙ্গে রামমোহনের কিছু পরিচয় ছিল এমন অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে এই পর্যন্ত বলা যাবে যে, বৌদ্ধধর্মের বর্ণাশ্রমবিরোধী সামাজিক দৃষ্টি রামমোহনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল (বজ্রসূচী অনুবাদের মধ্যে যা প্রতিফলিত) ; কিন্তু তাঁর ধর্মতত্ত্বসমন্বয়ের ভূমিতে এগুলির কোনও স্থান ছিল না। পরিকল্পিত সার্বভৌম ধর্মের উপাসনাপদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে রামমোহনকে যথেষ্ট চিন্তা করতে হয়েছিল। আমরা পূর্বে আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখেছি, মূলত অদ্বৈতবাদী হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন ব্রহ্মোপাসনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং জীবন্মুক্তের পক্ষেও উপাসনা বিহিত এমন মত প্রকাশে দ্বিধা করেন নি। তাঁর বেদান্তগুরু শংকরের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল।[১১২] নিজ রচনায় এই উপাসনাকে তিনি দুই অঙ্গে ভাগ করেছেন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক। ব্যক্তিগত উপাসনাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন 'সাধন' এবং সম্মিলিত সামাজিক ঈশ্বরার্চনার নাম রেখেছেন 'উপাসনা'। তাঁর ব্যাখ্যানুসারে ব্যক্তিগত 'সাধন' ধ্যানাত্মক ; এর লক্ষ্য নির্বিশেষ আত্মজ্ঞানলাভ এবং এর জন্য প্রয়োজন শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি সাধন-সম্পদ। প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্রাদির সাহায্যে নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণগুলির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা এই সাধন অনুষ্ঠেয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এই ব্যক্তিগত 'সাধনমার্গ অদ্বৈত-বেদান্তের পরিভাষায় বিবৃত করলেও রামমোহন একে সার্বভৌম ভিত্তির

উপরই স্থাপন করেছিলেন; অধ্যাত্মভূমিতে তিনি জাতিবর্ণ-দেশকালের গণ্ডী স্বীকার করেন নি। মনিয়ার উইলিয়ম্‌সের ভাষায়, "His idea of inspiration was that it was not confined to any age or any nation but a gift co-extensive with the human race. He believed it to be a kind of divine illumination or intuitive perception of truth granted in a greater or less degree to every good man in every country. Whatever was good in the Vedas, the Christian scriptures, in the Kuran, in the Zand Avasta or in any book of any nation anywhere, was to be accepted and assimilated as coming from God of truth and be regarded as revelation. The only test of the validity of any doctrine, was its conformity to the natural and healthy waking of man's reason and the intuitions and cravings of human heart"।[১১২ক] এই ব্যক্তিগত 'সাধন' ভিন্ন সামাজিক উপাসনা অসম্পূর্ণ। সমষ্টিগত উপাসনা করতে হবে সগুণ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ অনুশীলনের দ্বারা। এই সমাজিক উপাসনার দুটি বৈশিষ্টা রামমোহন তাঁর 'ব্রহ্মোপাসনা' (১৮২৮) গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে: "মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এক এই যে, সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা, দ্বিতীয় এই যে. পরস্পর সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।" এর পর এই দুটি লক্ষণ তিনি কিছু বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়েছেন: "পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে আপনার আয়ুর এবং দেহের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতি পূর্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তা করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা, শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্বদা তাঁহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্বদা কর্তব্য যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি। পরস্পর সাধু ব্যবহারে কাল হরণের নিয়ম এই যে অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় সেরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে

আমাদের অতুষ্টি হয় সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না।"[১১৩] এই দুই অঙ্গ পরস্পরের পরিপূরক, দুই-এ মিলে উপাসনা সম্পূর্ণ। সমবেত উপাসনার ভিত্তি উপাস্য-উপাসক ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; সেটি দ্বৈতভূমিতে অবস্থিত। ব্যক্তিগত সাধন অদ্বৈতজ্ঞানভিত্তিক। এই উপাসনাপ্রত্যয়ে মানবপ্রীতি সমবেত সামাজিক উপাসনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে সুনির্দিষ্ট। দেখা যাচ্ছে, নিজ উপাসনা-পরিকল্পনাতে রামমোহন নিপুণ ভাবে দ্বৈতাদ্বৈতক্রম নির্দেশ করেছেন ও আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের অতিপরিচিত দ্বৈত ও অদ্বৈতের বিবাদভঙ্গের প্রয়াসী হয়েছেন। এই ঝোঁকটি এবং সামাজিক উপাসনার সঙ্গে মানবপ্রীতি বা সমাজকল্যাণের আদর্শকে মেলানোর প্রয়াস তাঁর তুহফাৎ-উল-মুওহাহিদিন পর্বের পরবর্তী ধর্মচিন্তায় গোড়া থেকেই ছিল। প্রথমটিকে বলা যেতে পারে নূতন পরিণতি; দ্বিতীয়টি স্পষ্টত 'তুহ্ফাৎ' যুগের উত্তরাধিকার। ১৮১৫তে প্রকাশিত 'বেদান্তগ্রন্থ' পাঠ করলে এ-সম্পর্কে স্পষ্ট প্রতীতি হয়। এর ভূমিকাতে রামমোহন বলছেন: "আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।"[১১৪] আবার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের '৫৩' সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যায় লক্ষণীয় উপাসনা ও মানবপ্রীতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নির্দেশ: "পরমেশ্বর এবং তাঁহার জনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি আর তাদ্বিধ্য অর্থাৎ প্রীত্যনুকূল ব্যাপার এই দুই পরম মুখ্য উপাসনা হয়।" তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি উক্ত ব্রহ্মসূত্রের রামমোহনকৃত এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ মৌলিক।[১১৫]

দ্বৈতাদ্বৈতক্রমনির্দেশপ্রণালীকে সম্পূর্ণ হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে বিচার করলে মনে হবে শংকরমতের সঙ্গে রামমোহনের কোনও পার্থক্য নেই। ব্যবহারিক দ্বৈতভূমিতে শংকরও উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন এবং ব্যবস্থাও দিয়েছেন। তাঁর নামে প্রচলিত বহু দেবদেবীস্তোত্রও বর্তমান এবং এর অন্তত পক্ষে কয়েকটি যে প্রকৃত তাঁরই রচনা সে-সম্পর্কে আধুনিক পণ্ডিতগণ অযথা সন্দিহান নন। রামমোহন এগুলির অধিকাংশকে পরবর্তীকালের অর্বাচীন রচনা মনে করলেও যুক্তির দিক দিয়ে এজাতীয় ভক্তির উচ্ছ্বাসকে শংকরের লেখনীপ্রসূত

বলে মানতে তাঁর আপত্তি ছিল না।[১১৬] আর শংকরের সিদ্ধান্ত অনুসারে তো অদ্বৈতভূমিতে উপাস্য, উপাসক, দেবদেবী, ঈশ্বর কিছুই নেই, সেখানে একমাত্র তত্ত্ব বিশুদ্ধ চৈতন্য; সুতরাং ভেদজ্ঞানভিত্তিক উপাসনার প্রশ্নই সেখানে উঠছে না। এই নির্বিশেষ স্তরে উপনীত হবার একমাত্র মাধ্যম হল ব্যক্তিগত সাধনালব্ধ অনুভূতি। এরই পৃথক নাম রামমোহন দিয়েছিলেন 'সাধন'। এতদূরপর্যন্ত মোটামুটি শংকরমতের অনুসরণ করলেও অতিরিক্ত দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে রামমোহনের উপাসনাতত্ত্বে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়: এর প্রথমটি হল, ব্যবহারিক ভূমিতে সমবেত উপাসনার ধারণা, দ্বিতীয়টি পূর্ণাঙ্গ সমবেত উপাসনার সঙ্গে মানবপ্রীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই দুটি প্রত্যয়ের কোনটিই পূর্ববর্তী ভারতীয় সূত্র থেকে আহরিত নয়। হিন্দুধর্মের পূজা, উপাসনা ধ্যানধারণা ইত্যাদি সব কিছুই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভিত্তিতে পরিকল্পিত। এমন কি সন্ন্যাসীদের মঠ বা সংঘের অধিবাসীরাও (তাঁরা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন যে কোনও সম্প্রদায়েরই হন না কেন), সকলেই মূলত ব্যক্তিগত সাধক, তাঁদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ব্যক্তিগত নির্বাণমুক্তি। স্বর্গকামী গৃহীদের পূজানুষ্ঠান প্রভৃতিরও সেই একই চরিত্র। রামমোহন হিন্দুধর্মের এই ব্যক্তিগত সাধনার ঐতিহ্যটিকে গ্রহণ করলেও একে যথেষ্ট মনে করেন নি। আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি ধর্মের সামাজিক রূপের গুরুত্ব তাঁর কাছে ছিল অপরিসীম। মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় ধর্মদ্বয়ের সঙ্গে গভীর পরিচয়সূত্রে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এই দুই সম্প্রদায়ের সমবেত সামাজিক উপাসনা তাদের সামাজিক শক্তির উৎসরূপে ইতিহাসকে কতটা প্রভাবিত করেছে। অপরপক্ষে হিন্দুসমাজে প্রচলিত ব্যক্তিভিত্তিক বাহ্যপূজা (ও বর্ণভেদ) সমাজদেহে যে সংকীর্ণ ও তীব্র ভেদবৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িকতার সঞ্চার করেছে তার ফলে সমগ্র হিন্দুসমাজ নির্বীর্য ও যে কোনও জাতীয় প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সমবেত সামাজিক উপাসনার দৃশ্য রামমোহনকে সর্বদা মুগ্ধ করত। ডঃ ল্যাণ্ট্ কার্পেণ্টারের সাক্ষ্য অনুসারে আইজাক ওয়াট্‌স (১৬৭৪-১৭৪৮) রচিত সুবিখ্যাত খ্রীষ্টীয় স্তোত্রগ্রন্থের (Hymn-Book) নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি কটি রামমোহনের খুবই প্রিয় ছিল:

"Lord ! how delightful' tis to see
A whole assembly worship thee.

At once they sing, at once they pray ;

They hear of heaven and learn the way." ।[১১৭]

হিন্দু সমাজে এই সমবেত উপাসনার প্রবর্তন করে ধর্মকে সামাজিক সংহতির মাধ্যমে পরিণত করাই রামমোহনের অন্যতম স্বপ্ন ছিল। এক্ষেত্রে মুসলিম ও খ্রীষ্টীয় আদর্শ যে তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে, তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। সমবেত ভূমিতে মানবসেবা তথা সমাজকল্যাণের প্রত্যয়কে ধর্মাচরণের অঙ্গরূপে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেও খ্রীষ্টধর্মের মানবপ্রীতির আদর্শ ও সমকালীন পাশ্চাত্য লিবারাল চিন্তাধারার সমাজমুখীনতা বিশেষভাবে কার্যকরী ; হিন্দুধর্মের ব্যক্তিভিত্তিক বর্ণভেদখণ্ডিত নীতিচিন্তা সেখানে রামমোহনকে বিশেষ সাহায্য করে নি।

ধর্মসংস্কারকরূপে রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্রভাবে তাঁর উপাসনার এই বিশিষ্ট ধারণাকে একটি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করা। কাজটি তাঁর দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে খুব সহজ ছিল না। পরিকল্পিত সংস্থাটির ভিত্তি হবে একেশ্বরে বিশ্বাস ও তার চরিত্র হয়ে সার্বভৌম। রামমোহন হিন্দুসমাজের উচ্চতম বর্ণজাত, হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকেই এই পরীক্ষা স্থরু করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্থতরাং বাহ্যত এই প্রতিষ্ঠানের ভারতীয়ত্ব এবং হিন্দুত্ব বজায় রাখা তাঁর পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বাঙ্লা 'প্রার্থনাপত্র' পুস্তিকায় ও তার ইংরেজি সংস্করণ Humble Suggestions to his countrymen who believe in the One True God-এ তিনি হিন্দু পরিপ্রেক্ষিত অক্ষুণ্ণ রেখে সার্বভৌম একেশ্বরবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। উভয় রচনাতেই বৈদিক ব্রহ্মোপাসনায় বিশ্বাসী হিন্দুরূপে দেশী, বিদেশী সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর প্রীতি ও মৈত্রীর হস্ত সম্প্রসারিত।[১১৮] আদর্শকে সাংগঠনিক রূপদানের কাজে রামমোহন প্রধানত তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন: (১) সমবেত সামাজিক দ্বৈতবাদী উপাসনা ও ব্যক্তিগত অদ্বৈতবাদী সাধনের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য স্থাপন ; (২) এমন একটি ধর্মমণ্ডলী গঠন যার চরিত্র হবে একাধারে সার্বভৌম ও হিন্দু ; (৩) সমবেত উপাসনার একটি স্থসম্বদ্ধ প্রণালী আবিষ্কার যার কোনও নজীর হিন্দুধর্মে অবর্তমান। দুরূহ হলেও এই সমস্যাগুলির আশু সমাধান রামমোহনের কাছে প্রয়োজন ছিল, কেন না তিনি তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন,

হিন্দুধর্মের প্রচলিত স্থূল বাহ্যপূজা হিন্দুর সমাজদেহকে দুর্বল ও অকর্মণ্য করে ফেলেছে।

প্রথম সমস্যার সমাধানকল্পে রামমোহন যে প্রস্তাব করেছিলেন পূর্বে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর মতে সামাজিক উপাসনায় ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণগুলিকেই অবলম্বন করতে হবে। এই উপাসনা হবে আরাধনা ও ভক্তিমূলক এবং মুখ্যত উপাস্য-উপাসক ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সামাজিক উপাসনার অনিবার্য পরিপূরক রূপে তিনি নির্দিষ্ট করেছেন প্রত্যেক উপাসকের ব্যক্তিগত 'সাধন'কে যার ভিত্তি হবে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের অনুধ্যান এবং যার চরম লক্ষ্য উপাসকের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ সম্মত ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তি।[১১৯] ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণভিত্তিক সগুণ সামাজিক উপাসনা তত্ত্বগতভাবে এই ব্যক্তিগত নির্বিশেষ-সাধনের প্রস্তুতিমাত্র। এক্ষেত্রে রামমোহনের নির্দেশ অতি স্পষ্ট। সামাজিক উপাসনার হিন্দু পটভূমি বজায় রেখেও তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করবার সমস্যাটি ছিল আরও কঠিন। এই উদ্দেশ্যে রামমোহন তাঁর অবলম্বিত সামাজিক উপাসনাপ্রণালীকে সর্বপ্রকার সংকীর্ণ, বাহ্য, অর্থহীন আচারের নাগপাশ থেকে মুক্ত রেখে তাকে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের যে যে অংশে ব্রহ্মবাদ ও একেশ্বরবাদ ব্যাখ্যাত হয়েছে, যেমন উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, গীতা, ও পুরাণতন্ত্রাদির নির্বাচিত অংশ - সেগুলিই উপাসনার জন্য অবলম্বিত হল। উপাসনাকে সম্পূর্ণ একেশ্বরবাদভিত্তিক করবার উদ্দেশ্যে-এর সঙ্গে মূর্তি, চিত্র, প্রতীক প্রভৃতি সর্বপ্রকার সৃষ্টবস্তুর সংস্রব সযত্নে বর্জিত হল। সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় ধর্মগুরু ও ধর্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল এই উপাসনাপ্রণালীর অঙ্গ এবং উক্ত বিধি অনুসারে সর্বসম্প্রদায় ছিলেন এই উপাসনানুষ্ঠানে স্বাগত। সমসাময়িক সাক্ষ্যে পাওয়া যায় খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণও এতে যোগ দিয়েছেন এবং মধ্যে মধ্যে ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত বালকগণকে দিয়ে অনুষ্ঠানে স্তবগান গাওয়ানো হয়েছে।[১২০] কোনও শ্রেণীভেদ বা বর্ণভেদ উপাসনাকালে সাধারণভাবে মানা হত না, তবে এ বিষয়ে একটি ব্যতিক্রমও উল্লেখ্য। তখনকার দিনে কলিকাতায় বেদের মন্ত্রভাগ আবৃত্তি করতে সক্ষম ছিলেন একমাত্র দক্ষিণী তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়। তৎকালীন বাঙালী ব্রাহ্মণরা কেউ কেউ শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ডে বা উপনিষদে পারদর্শী হলেও সাধারণত বেদমন্ত্রে অজ্ঞ এবং সেই হেতু বেদপাঠে অনভ্যস্ত ও অপারগ

ছিলেন। সুতরাং বেদমন্ত্রআবৃত্তির ব্যাপারে এই বেদজ্ঞ তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণশ্রেণীর উপর নির্ভর করা ছাড়া রামমোহনের গত্যন্তর ছিল না; এবং এঁরা কোনও ক্রমেই অব্রাহ্মণসমীপে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে রাজী ছিলেন না। তাই এঁদের আবৃত্তিকালে সাধারণ উপাসকমণ্ডলীর অগোচর একটি স্বতন্ত্র আবৃত স্থানে এঁদের আসন দিতে হয়েছিল। কিন্তু রামমোহনের অনুবর্তী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি বাঙালী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এ বিষয়ে ছিলেন উদার। নিভৃতে তৈলঙ্গী বিপ্রগণের বেদমন্ত্র আবৃত্তি সমাপ্ত হলে উক্ত বাঙ্গালী পণ্ডিতরা নির্দ্বিধায় সর্বশ্রেণী ও সর্ববর্ণভুক্ত শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে প্রকাশ্যে শ্রুতি (উপনিষদ) পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন সনাতন বর্ণাশ্রমবিধিকে উপেক্ষা করে।[১২১] শূদ্রের বেদশ্রবণ শাস্ত্রমতে অকর্তব্য এই সনাতন নিষেধের মূলে এই ভাবে রামমোহন প্রবর্তিত সামাজিক উপাসনাপদ্ধতিতে প্রথম থেকেই আঘাত করবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, যদিও দক্ষিণী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার স্বীকৃতিহেতু এ ব্যবস্থা তাঁর কালে পূর্ণতা লাভ করে নি। ১৮৪১ সালে এই পূর্ণতা সম্পাদন করেন রামমোহনশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১২২]

সামাজিক উপাসনার সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতিসংক্রান্ত তৃতীয় সমস্যাটি ছিল সবচেয়ে জটিল, কেননা এই ব্যাপারেও হিন্দু পরিপ্রেক্ষিত রক্ষা করবার আবশ্যকতা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই ছিল, অথচ হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যে কোনও সর্বজনীন দৃষ্টান্ত রামমোহন খুঁজে পাননি। এর সমাধান তিনি পেয়েছিলেন প্রধানত খ্রীষ্টধর্মের ও খ্রীষ্টীয় উপাসনাপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় থেকে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইউনিটারিয়ান কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন এবং ১৮২৮ সালে প্রকাশ্যে তাঁর নিজস্ব ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করবার আগে তিনি এই একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় সংঘের নিয়মিত উপাসক ছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পদ্ধতি যে তাঁকে প্রভাবিত করবে তা খুবই স্বাভাবিক। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ব্রাহ্মসমাজে তাঁর প্রবর্তিত সামাজিক উপাসনাপদ্ধতির তিনটি ক্রমিক স্তর বেদমন্ত্রপাঠ, উপনিষদপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত খ্রীষ্টীয় উপাসনার তিনটি আনুপূর্বিক অঙ্গ—বাইবেলপাঠ, sermon বা উপদেশ ও সঙ্গীত এই তিন অঙ্গের সঙ্গে বাহ্যত সম্পূর্ণ মিলে যায়। কিন্তু এ কথা স্মরণীয়, এই সাদৃশ্য মাত্র বাহ্য অঙ্গবিন্যাসেই আবদ্ধ; আমরা দেখেছি, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে

রামমোহন হিন্দুধর্মের বৈদিক ঐতিহ্যকেই তাঁর সামাজিক উপাসনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় সূত্র ছাড়া উপাসনার আবশ্যিক অঙ্গরূপে লোকভাষা ও সঙ্গীতব্যবহারের অতিরিক্ত প্রেরণা এসেছিল নানকপন্থী, কবিরপন্থী, দাদূপন্থী প্রমুখ ভারতের মধ্যযুগীয় একেশ্বরবাদী কয়েকটি উপাসকসম্প্রদায়ের নিকট থেকে—যাঁদের সাধনার সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, এই মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়গুলির ভক্তিসঙ্গীতের ধারাকেও তিনি বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গেই জড়িত করেছেন। 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩) পুস্তিকায় তিনি যা বলেছেন সংক্ষেপে তার মর্ম এই : দশনামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে কোনও কোনও গোষ্ঠী, নানকপন্থী, কবিরপন্থী, দাদূপন্থী ও সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতিরাও সর্বজনীন একেশ্বরবাদী উপাসক এবং সেই হেতু "তাঁহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাবে আচরণ আমাদের কর্তব্য।" এঁরা লোকভাষায় উপদেশ দেন এবং লোকভাষায় রচিত সঙ্গীত এঁদের উপাসনার অঙ্গ—এতে কোনও দোষ নেই—কেন না স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যই বিধান দিয়েছেন, বেদগানে যাঁরা অসমর্থ তাঁরা অন্য যে কোনও প্রকার (লৌকিক) পারমার্থিক সঙ্গীত সাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ করতে পারেন ; এবং রঘুনন্দন শিবধর্মের বচনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেছেন শিষ্যের গ্রহণক্ষমতা অনুসারে সংস্কৃত, প্রাকৃত বা দেশভাষায় যিনি উপদেশ দেন তিনিই গুরুপদবাচ্য।[১২৩] সংগীতকে উপাসনার অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দান প্রসঙ্গে রামমোহন কিন্তু তাঁর অতিপরিচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় অবলম্বিত 'সংকীর্তন'কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। সাকার উপাসনা ও রূপানুষঙ্গ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ও সঙ্গীতের মজ্জাগত।[১২৪] রামমোহনের মত কট্টর নিরাকারবাদীর পক্ষে স্বীয় উপাসনার সঙ্গে তাকে যুক্ত করা সম্ভব ছিল না। সর্বশেষে পুনর্বক্তব্য মানবপ্রেম ও মানবকল্যাণসাধন এই সামাজিক উপাসনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে কল্পিত এটিকে বাদ দিলে রামমোহনের মতে উপাসনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বর্ণিত সামাজিক উপাসনাপ্রণালীকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রামমোহনের পরিকল্পনাটি ছিল হিন্দু পরিপ্রেক্ষিত সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক,—ধর্মক্ষেত্রে উদার সহিষ্ণুতা এর ভিত্তি ; এই উপাসনাস্থলে সর্বসম্প্রদায়ের ছিল সাদর আমন্ত্রণ। অপর পক্ষে তত্ত্বের ক্ষেত্রে এর বৈশিষ্ট্য এক সমন্বিত দৃষ্টি যা সমস্ত ধর্মের মূল সত্যগুলিকে মিলিয়ে সমবেত সাধনার এক ঐক্যভূমি

আবিষ্কারে আগ্রহী। প্রথম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কথা না বাড়িয়ে এখানে সংক্ষেপে এইটুকু পুনরাবৃত্তি করলেই যথেষ্ট হবে, রামমোহন এই সর্বজনীন উপাসনাপদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে এক বৃহত্তর জাতীয় সংহতি সাধনের স্বপ্নই দেখেছিলেন।[১২৫] 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩) পুস্তিকায় বা ১৮৩০ সালে সম্পাদিত ব্রাহ্মসমাজের ন্যাসপত্রে (Trust Deed) সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি যে প্রীতিপূর্ণ উদার দৃষ্টি প্রতিফলিত তার উৎস কি, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এর উত্তরে বলা যায় রামমোহন এ ক্ষেত্রে মূলত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হিন্দুধর্ম দ্বারা। অধ্যাত্মভূমিতে হিন্দুধর্মাপেক্ষা উদার, সহিষ্ণু ধর্ম আর নেই—যে কোনও পূজানুষ্ঠান বা সাধনপদ্ধতিকে এই সর্বলোলুপ ধর্ম স্বচ্ছন্দে আপন অঙ্গীভূত করে নিতে সক্ষম, এবং ইতিহাসে বার বার একে এই ভূমিকায় দেখা গেছে। ফলে স্থূল জড়োপাসনা থেকে উচ্চতম ব্রহ্মবাদ পর্যন্ত হিন্দুধর্মে সব কিছুই যথাযথ স্থান অধিকার করে বর্তমান। হিন্দুধর্মের এই চরিত্র ও ঐতিহাসিক ভূমিকা রামমোহনের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। অপর পক্ষে সেমিটিক গোষ্ঠীজাত ইহুদী, ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের নানা প্রশংসনীয় দিকগুলির অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও পরধর্মের প্রতি এদের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও জিঘাংসাত্মক মনোভাবের তিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক। 'তুহফাৎ-'এর যুগেই ইসলামের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি উচ্চকণ্ঠ এবং উত্তরকালে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় নি।[১২৬] খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়গুলির পরধর্মপীড়ন-স্পৃহা ইতিহাসে যে কত রক্তস্রোত প্রবাহিত করেছে—খ্রীষ্টীয় বিতর্কপ্রসঙ্গে একথা তিনি প্রতিপক্ষকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন।[১২৭] অপর পক্ষে সামাজিক দৃষ্টিতে অনুদার হলেও অধ্যাত্মভূমিতে হিন্দুধর্ম যে কত সহনশীল সে সম্পর্কেও তাঁর উক্তি অতি স্পষ্ট: "It is well known to the whole world that no people on earth are more tolerant than the Hindoos who believe all men to be equally within the reach of Divine beneficence, which embraces the good of every religious sect and denomination."।[১২৮] হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবের এই প্রশ্নের উত্তরে আলোচনাপ্রসঙ্গে রামমোহন তাঁকে বলেন: "...Hinduism is a religion of toleration and peace, which Christ indeed also taught his followers

and disciples, which his followers soon forgot....The Vedas teach the only religion which considers toleration to be a duty of man."।[১২৮] অবশ্যই হিন্দুধর্ম অনুপ্রাণিত তাঁর এই আধ্যাত্মিক উদারতার সমর্থন উত্তরকালে তিনি লাভ করেছিলেন সমকালীন ইউরোপীয় লিবারাল দর্শন, বিশেষত জন লকের চিন্তাধারা থেকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।[১২৯]

আমরা দেখেছি তত্ত্বভূমিতে রামমোহনের সমন্বিত দৃষ্টির বর্ণনাপ্রসঙ্গে মনিয়ার উইলিয়মস তাঁকে তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান (science of comparative religion)-এর জনক অভিধা দিয়েছিলেন। রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের তুলনাত্মক আলোচনা করেছেন নৃতাত্ত্বিক বা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, একালে যেমন দেখা যায় টাইলর, জেম্‌স ফ্রেজার বা উইলিয়ম জেম্‌সের রচনায়।[১৩১] উক্ত মনীষিগণ বিভিন্ন ধর্মের আচার, অনুষ্ঠান (ritual) বা অভিজ্ঞতার (experience) জগৎকে সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেছেন নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত ভাবে বাইরে থেকে। রামমোহন আধ্যাত্মিক জগতের অন্দরমহলের মানুষ, তাঁর বিভিন্ন ধর্মের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ধর্মসাধনার ও ধর্মাচরণের এক ঐক্যভূমি আবিষ্কার করা, যার ফলে প্রচলিত কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার অবসান ঘটবে ও মানুষ এক সার্বভৌম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভূমিতে মিলিত হতে পারবে। এ বিষয়ে তাঁর কালে পাশ্চাত্য জগতে তাঁর কোনও সহপথিক সহসা চোখে পড়ে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ধর্মচিন্তায় সাধারণত ধর্মজগৎকে সত্য ও মিথ্যা দুই ভাগে ভাগ করা হত, এবং খ্রীষ্টধর্মই গণ্য হত একমাত্র সত্যধর্মরূপে; হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রমুখ বাকী সব ধর্মই এই দৃষ্টিতে ছিল মিথ্যা।[১৩০] সম্ভবত এক্ষেত্রে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী এবং ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টধর্মের নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা ও সংগঠক জোসেফ প্রীস্ট্‌লে (১৭৩৩-১৮০৪)। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর A Comparison of the Institution of Moses with those of the Hindoos and Other Ancient Nations গ্রন্থখানিতে ইহুদী ও হিন্দুধর্মদ্বয়ের কিছু তুলনামূলক আলোচনার সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। কিন্তু রামমোহন যে এ-গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। প্রসঙ্গত এ কথাও বিবেচ্য, প্রীস্ট্‌লে

গ্রীক, লাটিন, হিব্রু ভাষায় পারঙ্গম হলেও সংস্কৃত জানতেন না এবং হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর যা কিছু সংগ্রহ তা ছিল উইলিয়ম জোন্স প্রমুখ তৎসাময়িক প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্গণের কৃত অনুবাদভিত্তিক। তাঁর উক্ত গ্রন্থপ্রকাশের, অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাইবেলের Old Testament-এর অন্তর্ভুক্ত মূষার (Moses) গ্রন্থপঞ্চক (Pentateuch) বেদপ্রভাবিত, উইলিয়ম জোন্সের এই মত খণ্ডন করা। তা ছাড়া মনীষা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রীস্ট্লে বাইবেল বর্ণিত খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের (miracles) প্রত্যেকটিকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য মনে করতেন এবং সেগুলিকেই খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি গণ্য করেছিলেন।[১৩১] এখানে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মৌলিক প্রভেদ ছিল। বস্তুত ১৮৫৬ সালে ম্যাক্স ম্যুলের রচিত Essay on Comparative Mythology প্রকাশিত হবার পূর্বে, বর্ণিত বিশেষ অর্থে তুলনাত্মক ধর্মালোচনার প্রতি স্পষ্ট প্রবণতা পাশ্চাত্য জগতে চোখে পড়ে না। অপর পক্ষে মধ্যযুগের ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার বিকাশধারাটিকে বিশ্লেষণ করলে শতবিধ দ্বন্দ্ব ও সংকীর্ণতার মধ্যেও এমন দু'একটি পর্ব দৃষ্টিগোচর হয় যার মধ্যে তুলনামূলক বা সমন্বিত ধর্মদৃষ্টি স্পষ্টত আভাসিত। প্রসঙ্গত বিভিন্ন ধর্মসমীক্ষার ভিত্তিতে সম্রাট আকবর কর্তৃক উদ্ভাবিত 'দিন্-ই-ইলাহি' নামক আধ্যাত্মিক একীকরণ প্রচেষ্টার (ষোড়শ শতাব্দী) কথা প্রথমেই মনে পড়ে। এই ধারারই অন্তর্গত শাসকশ্রেণীর মধ্যে আকবরের উত্তরসাধক শাহ্‌জাহানপুত্র দারা শুকোহ্, উপনিষদ্ ও গীতার ফার্সী অনুবাদ প্রকাশ ছাড়াও যিনি হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় রচনা করেন 'মাজমা-উল্-বাহ্‌রেইন' বা 'দুই সাগরের সঙ্গম' (সপ্তদশ শতাব্দী)। ইনি স্পষ্টই বলেছিলেন, হিন্দুশাস্ত্র উপনিষদ একেশ্বরবাদের সমুদ্রবিশেষ; এটিই হল জগতে প্রথম ঈশ্বরপ্রেরিত গ্রন্থ; এবং পবিত্র কুরাণে নিহিত বহু রহস্যের ব্যাখ্যাই উপনিষদে পাওয়া যায়।[১৩২] এই সূত্রে উল্লেখ্য, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সূফী সাধক মির্জা জানজানান মজ্‌হর শহীদ; দারা শুকোহ্‌র যেন প্রতিধ্বনি করেই ইনি লিখেছিলেন, 'সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর তাঁর অসীম করুণায় সৃষ্টি করেন চতুর্বেদ; হিন্দুধর্মের অন্তর্গত প্রতিটি সম্প্রদায়ই ভগবৎসত্তার ঐক্যে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়তত্ত্বে ও মানবাত্মার নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাসী; ইসলামী শরিয়তে অনুল্লিখিত হিন্দুধর্মের মত উৎকৃষ্ট আরও একাধিক ধর্ম জগতে আছে।'[১৩৩] এই প্রসঙ্গে

মুসলমান লেখক মোহ্‌সিন ফনির নামে প্রচলিত ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'দবিস্তান্‌ ই-মজহব' নামক ফার্সী গ্রন্থখানিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারও কারও মতে গ্রন্থখানি একজন জরথুস্ট্রীয় পুরোহিতের রচনা। এই গ্রন্থখানির বারটি অধ্যায়ে নিরপেক্ষ বিষয়মুখী দৃষ্টিতে হিন্দু, মুসলমান, জরথুস্ট্রীয়, ইহুদী, খ্রীষ্টান, শিখ, তিব্বতী, সূফী, আকবর প্রবর্তিত 'দিন-ই-ইলাহি' প্রভৃতি ধর্মের যে সমীক্ষা দেখা যায় তা একালের উইলসন বা অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৩৪] বিশেষত গ্রন্থকারের হিন্দুধর্মবিষয়ক আলোচনাটি অতি বিস্তারিত, এবং বিভিন্ন হিন্দু দর্শনপ্রস্থান ও শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক হিন্দুসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানের পরিচায়ক। এমন কি রামমোহন কর্তৃক একাধিকবার শ্রদ্ধাভরে উল্লিখিত একেশ্বরবাদী উদাসী বা বৈরাগী, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, দাদুপন্থী সম্প্রদায়গুলিকেও দবিস্তানের লেখক বাদ দেন নি।[১৩৫] রামমোহনের উক্ত সম্প্রদায়গুলির সশ্রদ্ধ উল্লেখেরও এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি গভীর তাৎপর্য আছে। মধ্য যুগের ভারতীয় ভক্তি-আন্দোলনের ধারাটি লৌকিক স্তরে হিন্দু-মুসলমান ধর্মতত্ত্বের পারস্পরিক প্রভাব সঞ্জাত যুক্ত সাধনার ফল। এই ভক্তিধর্মের ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছেন কবির, নানক, দাদু, রজ্জব প্রমুখ দুই শতাধিক সন্ত (পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী) যাঁদের বাণী বিশ্লেষণ করলে এই সাধনার কয়েকটি সামান্য-লক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে: (১) মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ বর্জন; (২) গৃহস্থাশ্রমে শ্রদ্ধা; (৩) জীবের প্রতি দয়া ও মানুষকে মানুষ হিসাবে প্রীতি ও মর্যাদা প্রদর্শন; (৪) যান্ত্রিক আচার পালনের ও ধর্মাচরণে কপটতার প্রতি কটাক্ষ; (৫) দুর্নীতির তীব্র নিন্দা; (৬) সাধুসঙ্গ ও বিশুদ্ধ জীবনচর্যার গুরুত্ব স্বীকার (৭) সর্বসম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতির সার গ্রহণ।[১৩৬] বস্তুত এই ভক্তিপন্থী আচার্যদের সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন উক্তি বিচার করলে রামমোহনের সার্বভৌম ধর্মসিদ্ধান্তের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য অবশ্যই চোখে পড়ে। বর্তমান কালে বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী তিনটি অনবদ্য নিবন্ধে[১৩৭] এবং রবীন্দ্রনাথ একাধিক গ্রন্থে;[১৩৮] যদিও এঁদের আলোচনার সূত্র ধরে অপর কেউ বিশেষ অগ্রসর হন নি। ফার্সী, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় রামমোহনের স্বচ্ছন্দ অধিকারের কথা এবং প্রথম জীবনে তাঁর ভ্রমণপ্রসঙ্গ মনে রাখলে এ অনুমান সঙ্গত ভাবেই করা চলে, অধ্যয়ন ও

প্রত্যক্ষ সংস্রবের মাধ্যমে ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মবিষয়ক উদার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। ধর্মক্ষেত্রে তাঁর সার্বভৌম দৃষ্টির ক্রম-অভিব্যক্তিতে এর প্রভাব যে কার্যকরী হবে তা একান্ত স্বাভাবিক।

দেখা গেল, সর্বজনীন সমবেত উপাসনার জন্য রামমোহন ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্ম-সমাজ শীর্ষক যে সংস্থা স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে পরস্পরনির্ভর দুটি আদর্শ সম্মিলিত ভাবে প্রতিফলিত-সার্বভৌম ঈশ্বরোপাসনা এবং মানবপ্রীতি ও মানব-সেবা। ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গরূপী এই 'মানবপ্রীতির' ধারণা প্রথম থেকেই তাঁর চিন্তার বৈশিষ্ট্য। 'তুহ্ ফাৎ' (১৮০৩-০৪) ও 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫) রচনাদ্বয়ে এর স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।[১৩৯] রামমোহন ও তাঁর মণ্ডলী অবলম্বিত সমাজ-সংস্কার-কর্মসূচী এই উৎস থেকেই উদ্ভূত এবং সার্বভৌম সামাজিক উপাসনার স্বাভাবিক পরিণতি রূপেই পরিকল্পিত। অধ্যাত্মিক জীবন গঠন সম্পূর্ণ হয় না যদি না উপাসকগণ সমস্ত বাধাবিপত্তি এমন কি প্রাণনাশের আশংকা পর্যন্ত তুচ্ছ করে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ, উদার ও প্রগতিশীল রূপ দেবার চেষ্টা না করতে পারেন। সমাজ-পরিবর্তন সম্পর্কে রামমোহনের চেতনা ছিল সর্বাত্মক। এই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন হিন্দুসমাজব্যবস্থার প্রায় এমন কোনও ব্যাধি ছিল না যার উপর তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি পড়ে নি।[১৪০] তবে পরিপার্শ্বিক বিবেচনা করেই হোক বা সময়াভাবেই হোক তার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে সমান ভাবে সংগ্রাম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সতীদাহপ্রথাকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য রূপে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারকর্মক্ষেত্রে তাঁর কীর্তি অবশ্যই মহৎ; কিন্তু তাঁর চিন্তা মহত্তর। এই চিন্তাসূত্র পরবর্তী যুগকে প্রেরণা দিয়েছে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নব অধ্যায় রচনা করবার।

এ-যাবৎ বর্তমান অধ্যায়ে যে আলোচনা করা হয়েছে সে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি রামমোহনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে প্রধানত দুটি প্রেরণা কার্যকরী: ব্রহ্মচেতনাসঞ্জাত সার্বভৌম মানবপ্রীতি এবং নবযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীস্বরূপ সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা। সমকালীন ইউরোপীয় লিবারাল চিন্তা নানা দিক দিয়ে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল ও প্রধান লিবারাল মূল্যবোধগুলি তিনি আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন এ

বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের স্বভাবত জানতে কৌতূহল হয়, যে বুর্জোয়া লিবারাল আদর্শ থেকে তিনি তাঁর প্রগতিশীল জীবনদর্শনের মূল প্রেরণাগুলি আহরণ করেছিলেন, জীবনে শেষ পর্যন্ত সে-আদর্শ ও তদনুপ্রাণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও অতৃপ্তি তিনি অনুভব করেছিলেন কি না; সে গুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি কোনও ভাবে সচেতন হয়েছিলেন কি না। বিষয়টির ধারাবাহিক আলোচনা করবার মত উপকরণ আমাদের হাতে না থাকলেও সমকালীন সূত্রে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মানবপ্রগতির ইতিহাসে লিবারাল চিন্তাধারার দান যে বিপুল এ বিষয়ে কোনও বিতর্ক বা সন্দেহ নেই। প্রথাগত লিবারাল চিন্তার কঠোর সমালোচক অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায়, The productive relations it [liberalism] made possible immensely improved the general standard of material conditions. The advance of science was only achieved through the mental climate it created. All in all, the advent of the middle class to power was one of the most beneficent revolutions in history····no one can move from the fifteenth to the sixteenth, still more to the seventeenth, century, without the sense of wider and more creative horizons, the recognition that there is a greater regard for the inherent worth of human personality a sensitiveness to the infliction of unnecessary pain, a zeal for truth for its own sake, a willingness to experiment in its service, which are all parts of a social heritage which would have been infinitely poorer without them, These were gains involved in the triumph of the liberal creed."।[১৫১] কিন্তু তা সত্ত্বেও এই চিন্তাসম্পদের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিকে পূর্বাপর অনুসরণ করলে এর কিছু কিছু সীমাবদ্ধতাও চোখে পড়বে। মধ্যযুগের অবসানে যে নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, লিবারাল চিন্তাধারা মুখ্যত তারই ফসল, বহুল পরিমাণে তারই প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত। বিমূর্ত তত্ত্বহিসাবে

এই ভাবধারার আবেদন অবশ্য সর্বজনীন; কিন্তু কার্যকরিতার ক্ষেত্রে দেখা যাবে আধুনিক যুগে কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানা ক্রমশ যে বুর্জোয়া শ্রেণীতে (রামমোহন-মণ্ডলীর ভাষায় a class of society…before unknown… placed between the aristocracy and the poor,…a most influential class…this middling class) হস্তান্তরিত হয়েছে লিবারাল দর্শন গড়ে উঠেছিল তারই প্রধান অবলম্বন রূপে। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় লিবারাল দর্শন সর্বদাই অগ্রণী হয়েছে কিন্তু পঞ্চদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের আরম্ভ পর্যন্ত এই নীতির প্রয়োগকালে প্রায় সর্বত্র দেখা যায়,—এ হচ্ছে প্রধানত এমন ব্যক্তির, যিনি নিজ স্বাধীনতার বিত্তমূল্য দিতে সমর্থ। সুতরাং নবযুগের ধনিকতন্ত্রের জীবনদর্শনরূপেই ইতিহাসে লিবারাল দর্শনের আত্মপ্রকাশ। রেনেশাঁস, ধর্মসংস্কার আন্দোলন, (Reformation), সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মননরাজ্যের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব কিছুর মধ্য দিয়ে আপন সত্তা ও প্রভাব অক্ষুন্ন রেখে এই মত চূড়ান্তভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে। কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধটুকু থেকেই গেল; লিবারাল মূল্যবোধগুলি রইল আবেদনে সর্বজনীন কিন্তু প্রয়োগে সীমাবদ্ধ। উৎপাদনব্যবস্থার উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন সম্পত্তির মালিক, সংখ্যালঘু, প্রভাবশালী, অগ্রসর এক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে এর ব্যবহার উক্ত বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থসীমা প্রায় কোথাও লংঘন করল না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানবিভাসিত যুগের চিন্তানায়কগণ প্রভাবিত অষ্টাদশ শতকের ফরাসী লিবারাল দর্শনই হোক বা উনবিংশ শতকের বেন্থাম, জেম্স মিল প্রভৃতি ব্যাখ্যাত ইংলণ্ডীয় লিবারাল মতবাদই হোক, এগুলির সীমাবদ্ধতা ইতিহাসপাঠকের চোখে না পড়েই পারে না। বুর্জোয়া শ্রেণীর বাইরে যে শ্রমিক, কারিকর, ক্ষুদ্র শিল্পী প্রভৃতি নিয়ে গঠিত সম্পত্তিহীন, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী সমাজে বর্তমান, লিবারাল চিন্তা কার্যত এর স্বার্থ ও অধিকারকে প্রায় কোনও স্বতন্ত্র মূল্যই দেয় নি, মধ্যবিত্ত মালিকশ্রেণীর তাঁবেদার রূপেই সমাজে এর অবস্থানকে মেনে নিয়েছিল। তৎকালীন ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে বুর্জোয়া অবাধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়জয়কার—অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায়, "It is true enough that economic liberalism lifted

the chains of state-servitude from the middle class; but it is not less true that it was a necessary outcome of its acceptance that the men so freed riveted those chains upon the workers who had helped them to their freedom." ।[১৪২] বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থসীমার বাইরে যারা রইল তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর লিবারাল চিন্তানায়কগণকে যে ভাবায়নি তা নয়; কিন্তু এর যে প্রতিকারের উপায় তাঁদের চিন্তাভাবনায় দেখা দিয়েছিল তাত্ত্বিক বিমূর্ততা এবং বিত্তবান সম্প্রদায়ের সামাজিক কর্তব্যবোধ ও দাক্ষিণ্যপ্রসূত কিছু সাময়িক ব্যবস্থার সুপারিশের বাইরে তা সাধারণত বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বঞ্চিত শ্রেণীর কোনও মৌলিক দাবী বা অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা এই গুরুতর সমস্যাটিকে সচরাচর বিশ্লেষণ করেন নি। অষ্টাদশ শতকীয় ইংলণ্ডের খ্রীষ্টীয় মানবসেবাদর্শ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। এই শতাব্দীতে ইংলণ্ডের দরিদ্র ও বঞ্চিত জনসাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টীয় জনসেবকমণ্ডলীগুলি চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের যে বিরাট কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছিলেন তা নানা দিক দিয়ে কল্যাণপ্রসূ হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু চার্চ্ প্রবর্তিত এই শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ ছিল এই যে, এর মাধ্যমে সচেতন ভাবেই সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীকে বিত্তবানদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করে অনুগত হয়ে চলবার প্রেরণা দেওয়া হত। ঐতিহাসিক ট্রেভেল্যানের ভাষায়, 'The new Charity Schools and Sunday Schools had the merit of trying to do something for all, but they had the demerit of too great an anxiety to keep the young scholars in their appointed sphere of life and train up a submissive generation···the Eighteenth Century fault carried over into the education of the early years of the Nineteenth was excessive emphasis on the difference of classes and the need for 'due subordination in the lower order' ". ।[১৪৩] সমাজে ক্রমবর্ধমান ধনী-দরিদ্রের এই বৈষম্যকে উপজীব্য করে এবং এ সম্পর্কে প্রচলিত লিবারাল দর্শনসঞ্জাত প্রতিকার ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে অষ্টাদশ

শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বঞ্চিত জনসাধারণকে অধিকার-সচেতন করবার ও উত্তরকালে তাদের দাবী পূরণের জন্য সংগ্রামের পথ অবলম্বন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপীয় চিন্তাজগতে যে মত ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে সেটি হল সমাজতন্ত্রবাদ বা socialism। বুর্জোয়া মালিকসম্প্রদায় নিয়ন্ত্রিত জগতে বিত্তহীন দরিদ্রের প্রতি সামাজিক কর্তব্যবোধ প্রদর্শনের পরিবর্তে এই মতবাদের প্রবক্তারা চাইলেন বাস্তবতার ভিত্তিতে সর্বসাধারণের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং এই উদ্দেশ্যে সমাজের আমূল পরিবর্তন। এমন প্রমাণ আছে রামমোহনের মনের জমিটি আদৌ পাশ্চাত্য লিবারাল চিন্তার আদর্শে গড়ে উঠলেও জীবনের শেষ পর্বে তিনি তৎসাময়িক ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব চরিত্রত এবং কার্যত বুর্জোয়া বিপ্লব হলেও এর মধ্যে অন্তঃসলিলা সমাজতন্ত্রবাদ অভিমুখী চিন্তার একটি ক্ষীণ প্রবাহের অস্তিত্ব হয়তো অনুভব করা যায়।[১৪৪] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ধারাটি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের অনুরাগী ও জ্ঞানবিভাসিত যুগের চিন্তাধারায় নিষ্ণাত হলেও রামমোহন যে ফ্রান্স বা ইউরোপখণ্ডের অন্য কোনও অঞ্চলে উদ্ভূত সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল মুখ্যত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের টমাস স্পেন্স্, চার্লস্ হল, টমাস হজ্স্কিন, রবার্ট ওয়েন প্রভৃতি ব্যাখ্যাত নবজাত ইংলণ্ডীয় সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে। এর অন্যতম প্রবক্তা রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথাও জানতে পারা যায়। এ যাবৎ ওয়েনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও তর্কবিতর্কের একটি বিবরণই মেরী কার্পেন্টারের জবানীতে আমাদের জানা ছিল। তদনুসারে ডঃ আর্নটের গৃহে এক নৈশ ভোজ উপলক্ষে এই যোগাযোগ ঘটে এবং ওয়েন রামমোহনকে তাঁর নিজস্ব সমাজতন্ত্রবাদী মতবাদে দীক্ষিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। প্রত্যক্ষদর্শী মিঃ রেকর্ডার হিল সাক্ষ্য দিয়েছেন,-বিতর্কের সময় দেখা গিয়েছিল রামমোহন নিখুঁৎ ও চমৎকার ইংরেজি বলছেন এবং সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে তাঁর বেশ ভালই জ্ঞান আছে (the Rajah who seemed to be well-acquainted with the subject, and who spoke our language in marvellous perfection…)।[১৪৫] এটুকু

থেকে মনে হতে পারে সম্ভবত রামমোহন ওয়েনের মতবাদকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান লেখক ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারস্থ কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের গ্রন্থাগারে ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের পাঁচ-খানি ও নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে ওয়েন-পুত্র রবার্ট্ ডেল ওয়েনকে লিখিত একখানি পত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। পত্রগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজালে সেগুলি ওয়েন-রামমোহনের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নূতন আলোকপাত করে। ওয়েনকে লিখিত প্রথম পত্রের তারিখ ১৫ মে ১৮৩১; এখানে রামমোহন সম্ভবত ডঃ আর্নটের গৃহে অনুষ্ঠিত পূর্বকথিত সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করে সেদিনকার ভুল বোঝাবুঝির জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন (I regret that you should have misunderstood me the other day) এবং ওয়েন ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে তাঁদের বাসভবনে সাক্ষাৎ করবার দিন ও সময় (this evening or Tuesday) স্থির করছেন। ২ জানুয়ারী ১৮৩২ তারিখের দেখতে পাই, তিনি যাতে ওয়েনের সভায় যেতে পারেন সেজন্য ওয়েনের পত্রের অপেক্ষা করছেন (I am still waiting for a few lines···that I may be able to have the honor of attending your meeting)। তিনি আরও জানাচ্ছেন, যদি ওয়েনের পরিকল্পনা খ্রীষ্টীয় নীতিভিত্তিক হয় তাহলে তিনি তার সাফল্য কামনা করেন (With my best wishes for the success of your system if founded upon the Precepts of Christianity···)। ৯ জানুয়ারী ১৮৩২-এর (তৃতীয়) পত্রে আছে ওয়েনের সঙ্গে সেই সন্ধ্যায় পূর্ব ব্যবস্থামত সাক্ষাৎ করতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং পরবর্তী সপ্তাহে তাঁর সান্ধ্য সম্মিলনীতে (private or public evening party) উপস্থিত হবার প্রতিশ্রুতি। ২০ জানুয়ারী ১৮৩২-এর পত্রে দেখতে পাচ্ছি অসুস্থতা নিবন্ধন ওয়েন-ভবনে এক প্রীতিসম্মিলনে (party) উপস্থিত না পারার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। পঞ্চম পত্রে (তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩২) রামমোহন দুঃখ প্রকাশ করছেন যে, যে হেতু ওয়েন খ্রীষ্টীয় নীতির উপর তাঁর পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করতে অনিচ্ছুক, সেই জন্য তিনি সেই সন্ধ্যায় ওয়েনের জনসভায় যাওয়া স্থগিত রাখলেন (I am sorry to feel myself under the necessity of foregoing the pleasure of attending your Publc Meeting

this evening)। ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে ওয়েন-পুত্র রবার্ট ডেলকে লিখিত পত্রখানি বোধ করি এক হিসাবে এই পত্রশ্রেণীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটিতে দেখা যায় ওয়েনের তীব্র ধর্মবিরোধিতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ-বর্জন রামমোহন মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলছেন বাস্তবতার দিক থেকে এর জন্য রবার্ট ওয়েনের সাফল্য বিঘ্নিত হয়েছে (I grieve to observe that by opposing Religion your most benevolent father has hitherto impeded his success)। দ্বিতীয় পত্রের মতই তিনি এখানেও বলছেন তিনি ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সর্বাংগীণ সাফল্য কামনা করেন বলেই উক্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন। (My desire to see you and your father crowned with success in your benevolent undertakings has emboldened me to make these observations, a freedom which I hope, you will in consideration of my motives, excuse)। সেই সঙ্গে রামমোহনের এই উক্তিও স্মরণীয় যে, ধর্মের তত্ত্বভাগ (ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি সম্পর্কীয় অংশ) যদি (ওয়েনের মত) কোনও যুক্তিবাদীর (free thinker) কাছে অগ্রাহ্যও হয়, (Admitting for a moment that the Truth of the Divinity of Religion cannot be established to the satisfaction of a freethinker···) তৎসত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম প্রভৃতি অনুমোদিত প্রেম (love) দাক্ষিণ্য (charity) প্রভৃতি চরম পুরুষার্থগুলি মানবজাতির কল্যাণসাধনে, রিপুদমনে ও পারস্পরিক প্রীতিসম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ। অর্থাৎ ওয়েন ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে এগুলির কোনও মৌলিক বিরোধ নেই। আলোচ্য ছয়খানি পত্র সপ্তম পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। অতএব দেখা যাচ্ছে ১৮৩১-৩৩ এর মধ্যে অর্থাৎ জীবনের অন্তিম পর্বে রামমোহন রবার্ট ওয়েন প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন এবং আন্তরিক ভাবে এই "নাস্তিক" সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করছেন যদিও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় এতটুকু বিচলিত হয় নি।

এমন মনে করবার কারণ আছে, তদানীন্তন ইংলণ্ডের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক পরিস্থিতির এক সুচিন্তিত মূল্যায়ন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর

এই পরিবর্তনের মূলে ছিল। ইংলণ্ডে যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন (এপ্রিল, ১৮৩১। তখন তাঁর চিত্ত সর্বতোভাবে ইউরোপীয় লিবারাল চিন্তা-নিষ্ণাত এবং তিনি ব্রিটিশ রিফর্ম্ বিল্-এর উৎসাহী সমর্থক। এমন উক্তিও তিনি প্রকাশ্যে করেছিলেন যে রিফর্ম্ বিল যদি পার্লিয়ামেণ্টে গৃহীত না হয় তাহলে তিনি চিরদিনের মত ইংলণ্ডের সঙ্গে সব সম্পর্ক রহিত করবেন।[১৪৬] কিন্তু সংস্কার-আইন পাশ হবার পর দেখা যায় যে এ-সম্পর্কে রামমোহনের প্রচণ্ড উৎসাহে স্পষ্টত ভাটা পড়েছে। ২২ আগস্ট ১৮৩৩ তারিখে মিঃ উডফোর্ড্‌কে লিখিত পত্রে তিনি পরিষ্কার বলছেন, "The reformed Parliament has disappointed the people of England.।" যে হুইগ্ মন্ত্রীসভার সদিচ্ছা সম্পর্কে তিনি এতকাল অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করে এসেছিলেন-এখন তারই তিনি হয়ে উঠলেন কঠোরতম সমালোচক। রামমোহনের মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণপ্রসঙ্গে স্যাণ্ডফোর্ড্ আর্নট লেখেন, "He had been an enthusiastic advocate of the Grey administration from his arrival in Europe till his departure for France...Whether it was that he imbibed some fresh light from Louis Philippe and his subjects, or that the First Refromed Parliament disappointed him··· he became most bitterly opposed to it...He was in the habit of inveighing against it in the strongest···terms"।[১৪৮] তৎকালীন ইংলণ্ডের জনজীবনের বাস্তব পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে এই মত-পরিবর্তনের কারণ বোঝা সম্ভবত কঠিন হবে না। এ-কথা ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাবে এই সময়ে ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটেছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে পার্লিয়ামেণ্ট-সংস্কার (reform) আন্দোলন এই পরিস্থিতিজাত। আন্দোলনে ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রবল উৎসাহে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু প্রথম রিফর্ম বিল পাশ হলে দেখা গেল তাদের লাভের ঘরে পড়েছে শূন্য, নূতন পরিস্থিতির সুযোগসুবিধাগুলি ষোল আনা দখল করেছে মধ্যবিত্ত মালিক শ্রেণী; এবং সরকারও সম্পূর্ণ এই শেষোক্তদের স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমগ্র দেশে ব্যাপক শ্রমিকবিক্ষোভ দেখা দিল

এবং ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন দ্রুত গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। তাঁর দীর্ঘ জীবনের এই পর্বে (১৮৩২-৩৪) রবার্ট্ ওয়েন ছিলেন দেশব্যাপী এই শ্রমিক-আন্দোলনের পুরোভাগে।[১৪৯] লক্ষ্য করবার বিষয় ঠিক এই সময়েই রামমোহনের সঙ্গে ওয়েনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সুতরাং রামমোহন কেন সমকালীন মধ্যবিত্ত সংস্কার-আন্দোলন সম্পর্কে হতাশ হয়েছিলেন আর কেনই বা ওয়েন ব্যাখ্যাত সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল তা অনুমান করতে অধিক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না, যদি ওয়েনকে লিখিত তাঁর পত্রগুলির সাক্ষ্য সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। এর সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, তদানীন্তন ইংলণ্ডের খ্রীষ্টীয় মানবিকতাবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতার কথা, যার প্রতি ঐতিহাসিক ট্রেভেল্যান আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মিশনারী জনকল্যাণের আদর্শ সমাজের এই উচ্চ-নীচ শ্রেণীবৈষম্য রক্ষা করবার চেষ্টাই করেছিল। খ্রীষ্টীয় নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার অন্তর্নিহিত এই স্ববিরোধ রামমোহনকে হতাশ করেছিল এমন অনুমানও অসঙ্গত নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাধানের প্রতি তাঁর আকর্ষণের এটিকে এক অতিরিক্ত কারণ গণ্য করা যেতে পারে। সমাজতান্ত্রিক কর্মপন্থার সঙ্গে খ্রীষ্টিয় নৈতিক মূল্যবোধকে মিলিয়ে তিনি সম্ভবত করে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের অসম্পূর্ণতা দূর করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

রামমোহন কর্তৃক ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উপর কৃত মন্তব্য সম্পর্কে দু'একটি বিষয় বিবেচ্য। পাশ্চাত্য লিবারাল দর্শনে দীক্ষিত রামমোহন এই নূতন পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর একটি ব্যক্তিগত দ্বিধা সত্ত্বেও যতখানি সহানুভূতি এবং গ্রহণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর সমকালীন ও পরিচিত সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লিবারাল চিন্তানায়কদ্বয় বেন্থাম ও জেম্‌স মিল তা পারেন নি। সমাজতন্ত্রবাদকে সহানুভূতি সহকারে বুঝবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা এর কর্মসূচীর প্রতি তাঁদের ছিল ভয়, সন্দেহ বা ঘৃণা। রবার্ট ওয়েন সম্পর্কে বেন্থাম স্বয়ং যে মত ব্যক্ত করেছেন তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য: "Robert Owen begins in vapour and ends in smoke. He is a great braggadoccio. His mind is a maze of confusion and he avoids coming to particulars. He is always the same—says

the same things over and over again. He built some small houses ; and people who had no houses of their own went to live in these houses—and he calls this success" ।[১০] আর নবাগত সমাজতন্ত্রবাদের পদধ্বনি জেম্স মিলকে করে তুলেছিল আতঙ্কিত। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ তারিখে লর্ড ব্রুহাম্কে লিখিত এক পত্রে তিনি বলছেন, "Nothing can be more mischievous than the doctrines which have been preached to the common people at Birmingham and elsewhere. At a late meeting of the Union, Attwood held on for hours, giving an exaggerated description of the misery of the people from low wages ; then telling them that the cause of low wages is the Government and whenever Government does its duty, wages will be high... The nonsense to which your Lordship alludes about the right of the labourer to the whole produce of the country, wages, profits and rent all included, is the mad nonsense···· of our friend Hodg(s) kin which he has published as a system and propagates with the zeal of fanaticism.···These opinions if they were to spread, would be the subversion of civilized society, worse than the overwhelming deluge of Huns and Tartars. This makes me astonished at the madness of people of another description who recommend the invasion of one species of property so thoroughly knavish and unprincipled that it can never be executed without extinguishing respect for the rights of property in the whole body of the nation and can never be spoken of with approbation without encouraging the propagation of those other doctrines which directly strike at the root of all property" ।[১১] অপর পক্ষে জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করার অপরাধে রামমোহন কর্তৃক হুইগ রাজনীতির তীব্র বিরূপ সমালোচনা ও ওয়েনের সমাজ-

তান্ত্রিক কর্মসূচীর, প্রতি তাঁর অনুকূল মনোভাব ইঙ্গিত করে বেন্থাম-মিল ব্যাখ্যাত উপযোগবাদ অপেক্ষা রামমোহনের মানবিকতাবাদ উদার, প্রশস্ত ও চলিষ্ণু। তিনি এক্ষেত্রে ওয়েন-পুত্রকে লিখিত পত্রে এইটুকু মাত্র সংশোধন-প্রস্তাব করেছেন-যে, এই কর্মকাণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম প্রভৃতি উপদিষ্ট, প্রেম করুণা ইত্যাদি বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে যেন বর্জন না করা হয়; কেননা এগুলি প্রগতির প্রতিবন্ধক নয়, সহায়ক; পত্রের ভাষায়, capable of furthering our happiness, facilitating our reciprocal transactions and curbing our obnoxious suspicions and feelings.।

এর থেকে আমরা কতদূর অনুমান করতে পারি? রামমোহন অবশ্যই সোস্যালিস্ট্ হয়ে যান নি। নবজাত সমাজতন্ত্রবাদকে তিনি অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণও করেন নি। একে তিনি মূল্যায়ন করেছিলেন আধ্যাত্মিক প্রত্যয় সঞ্জাত মানবিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে—সামাজিক সুবিচারসাধনের একটি মার্গ হিসাবে। এ ক্ষেত্রেও তাঁর সতর্কতা লক্ষণীয়। ওয়েন প্রবল ধর্মবিরোধী, খ্রীষ্টধর্মের কঠোর সমালোচক; তাঁর মতে মানুষের নীতিবোধ অন্তরের কোনও মৌলিক বৃত্তি নয়, সম্পূর্ণ বাহ্য পরিবেশনির্ভর; রামমোহন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে মানুষকে সহজাত বৃত্তি বলে গণ্য করতেন এবং এ-বিষয়ে তিনি কোন সস্তা আপোষরফার বা সমন্বয়ের পথে যান নি; যথেষ্ট সচেতন ভাবেই এই মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রসঙ্গত অতিরিক্ত দামী কথা যা তিনি বলেছেন তা এই যে, ধর্মের নিজস্ব তত্ত্বগুলিকে মেনে না নিতে পারলেও যে কোনও সমাজতন্ত্রবাদীর পক্ষে প্রেম, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ধর্মপ্রসূত পুরুষার্থগুলি ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করতে কোনও বাধা নেই; তা করলে সমাজতন্ত্রের পথ সুগমই হবে। অর্থাৎ নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন না দিয়েও তিনি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক মানবিকতাবাদের সহযোগিতার একটি সম্ভাব্য সূত্র নির্দেশ করেছেন। স্মরণ করা কর্তব্য, রামমোহনের পূর্বে ও পরে ইংলণ্ডের কোনও কোনও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মানব-প্রেমী ওয়েন-মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে জন মিন্টার মরগ্যান ও জন ফিঞ্চের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দেই মরগ্যান সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের ভবিষ্যৎ কল্যাণসাধনে ওয়েন মতবাদের

উপযোগিতা লক্ষ্য করেছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্মের উপর ওয়েনকৃত তীব্র আক্রমণের জন্য দুঃখ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু এই বিরোধ দূর করবার জন্য তাঁর প্রস্তাবিত প্রতিকার ছিল জনসাধারণকে প্রকৃত খ্রীষ্টীয় শিক্ষা (a truly Christian education) দেওয়া। তা ছাড়া তিনি যখন ওয়েনের প্রতি আকৃষ্ট হন তখন ওয়েন শ্রমিকনেতা রূপে রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হন নি, তাঁর আদর্শ রূপায়নের জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। উত্তরকালে মরগ্যানের সঙ্গে ওয়েনের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং মরগ্যান 'Church of England Self-Supporting Village Society' স্থাপন করে খ্রীষ্টসংঘাশ্রিত নিজস্ব জনকল্যাণপন্থা অবলম্বন করেন। জন ফিঞ্চ কর্মজীবনের প্রথম থেকে ওয়েন-মতবাদের অনুরাগী হলেও প্রথম দিকে সুরাপান-নিবারণ, ডক্-শ্রমিকদের মধ্যে সমবায়সমিতি স্থাপন ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত 'বিশুদ্ধ' জনকল্যাণমূলক কাজেই তাঁর উৎসাহ ছিল। ওয়েনের সঙ্গে তিনি সর্বতো-ভাবে যুক্ত হন ১৮৩৭ থেকে, যখন ওয়েন শ্রমিক-আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে ধর্মগুরুর মত ভবিষ্যৎ স্বপ্নে বিভোর এক মতবাদ (millenianism) ও সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও নেতা হয়ে দাঁড়ালেন। এই পর্বে ফিঞ্চ ওয়েনকে অবতারকল্প মহাপুরুষ গণ্য করে উচ্ছ্বসিত গুরুপূজায় মেতে ওঠেন। ওয়েনকে পত্রাদিতে তিনি পিতৃ-সম্বোধন করতেন, কখনও উল্লেখ করতেন 'Your most Sacred Highness' বলে।[১৪২] রামমোহনের বেলায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তিনি ওয়েনের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই ওয়েনের নূতন কর্মসূচীর সঙ্গে সহযোগিতার একটি পথ অন্বেষণ করছেন এবং ওয়েনপুত্র রবার্ট্ ডেলকে লিখিত পত্রে একটি পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সহজ সমাধানের দিকে তিনি যান নি। বস্তুত নিজস্ব গভীর ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও কল্যাণমী 'নাস্তিক' বা 'সন্দেহবাদী'দের চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পরিণত জীবনে রামমোহন অসুবিধাবোধ করেন নি। ধর্মে আস্থাহীন বেন্থাম ও জেম্‌স মিলের উপযোগবাদ ও নাস্তিক এবং খ্রীষ্টধর্মের নিন্দায় উচ্চকণ্ঠ ওয়েনের তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী উভয়কেই মানবিকতাবাদী হিসাবে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন; প্রথমটির ঘাটতি পূরণের সম্ভাবনা যে দ্বিতীয়টির মধ্যে থাকতে পারে এই বোধ তাঁর চিত্তে স্পষ্ট। বেন্থাম বা মিল জননেতা ছিলেন না; তাঁরা ওয়েনের মত প্রকাশ্যে জনসভায়

ধর্মের, বিশেষত খ্রীষ্টধর্মের তীব্র নিন্দা করতেন না। তাই তাঁদের সঙ্গে রামমোহনের পক্ষে ধর্মবিতর্কে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। ওয়েন যদি প্রকাশ্যে ধর্মকে আক্রমণ না করতেন তাহলে অনুমান করা যায়, রামমোহন স্বমতে অটুট থেকেও ওয়েনের ব্যক্তিগত নাস্তিকতা সম্পর্কে নীরব থাকতেন। মৌলিক মতভেদ সত্ত্বেও রামমোহনের সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আগ্রহই এখানে বড় কথা। তা ছাড়া উদ্ধৃত পত্রাবলীতে প্রকাশিত রামমোহন-ওয়েনের যোগাযোগের (১৮৩১-৩৩) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিও এই প্রসঙ্গে পুনঃ স্মরণীয়। সমসাময়িক হুইগ রাজনীতিতে রামমোহন তখন পূর্বের আস্থা হারিয়েছেন; রিফর্ম এ্যাক্টের পরেও ইংলণ্ডের প্রবঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশার তিনি সাক্ষী। খ্রীষ্টধর্মসংঘের পক্ষ থেকে অবলম্বিত সমাজের নীচের তলার মানুষের দুঃখমোচন ব্যবস্থাসমূহের মধ্যেও শ্রেণীবৈষম্য রক্ষা করবার উপর স্পষ্ট ঝোঁকও নিশ্চয় তাঁর মনঃপুত হয় নি। ঠিক এই সময়েই ইংলণ্ডের তদানীন্তন ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে জাতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ওয়েনের সাম্প্রতিক জীবনীকারের ভাষায়…"The sudden transcendence of these bounds was perhaps. the most remarkable achievement of Owenite enthusiasm. Owen emergse as a national leader, cc-operation provided a common porgramme and ideology, and at last a national organization was found in the shadowy Grand National Consolidated Trades Union।"[১৫৩]

এর মধ্যে যা লক্ষ্য করবার মত তা হল রামমোহনের মানবিকতাবাদ শেষ জীবনে বুর্জোয়া লিবারাল মতবাদের গণ্ডির মধ্যে আর যেন সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করছে না। এই সীমানা অতিক্রম করে যেন নবদিগন্ত অন্বেষণে ব্যাপৃত। সমাজতন্ত্রবাদের তখন শৈশবাবস্থা; কিন্তু তবু এরই মধ্যে যেন কিছু আশার ইঙ্গিত তাঁকে উৎসাহিত করছে। আজকের দিনে তিনি জীবিত থাকলে সমাজতন্ত্রবাদের বর্তমান আমূল পরিবর্তিত রূপ সম্পর্কে তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া হত সে-বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করে লাভ নেই। তবে এটুকু ন্যায্য-ভাবেই অনুমান করা যেতে পারে তাঁর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রত্যয়ে তিনি অটুট থাকতেন এবং লিবারাল চিন্তাসূত্র থেকে আহরিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার

প্রত্যয়ও বিসর্জন দিতে রাজী হতেন না। কোনও রাষ্ট্র বা দলের অন্ধ অনুগত্য স্বীকার তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও হয় তো প্রয়োজনমত সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতেও তাঁর মনে দ্বিধা থাকত না। হয় তো তিনি আর কিছুকাল বাঁচলে আমরা জন স্টুয়ার্ট মিলের পূর্বেই তাঁর মধ্যে দেখতে পেতাম স্বাধীনতার প্রত্যয়ের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের সমন্বয়। হয় তো বা তিনি বিংশ শতাব্দীর মানুষ হলে হব্‌হাউসের মত তাঁর কণ্ঠে আমরা শুনতাম, "If there be such a thing as a Liberal socialism·· it must clearly fulfil two conditions. In the first place it must be democratic. It must come from below, not from above. Or rather it must emerge from the efforts of society as a whole to secure a fuller measure of justice and a better organization of mutual aid. It must engage the efforts and respond to the genuine desires not of a handful of superior beings, but of great masses of men. And, secondly···it must be founded on liberty, and must make not for the suppression but for the development of personality।[১৫৪]

প্রথম চার অধ্যায়ের অলোচনাসূত্রের সঙ্গে বর্তমান অধ্যায়ের বক্তব্যকে মিলিয়ে উপসংহারে আমাদের সিদ্ধান্তগুলিকে সুতরাং আমরা এই ভাবে সাজাতে পারি: (১) দেশকালগত বিশেষ অর্থে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিত্তজাগরণকে 'রেণেশাঁস' আখ্যা দেবার কোনও বাধা নেই; উক্ত অভিধার এমন প্রয়োগের নজিরেও অভাব নেই; (২) যে চিত্তজাগরণ উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণ নামে পরিচিত তার সামান্যলক্ষণ হল একালের পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধগুলিকে বিশ্লেষণ করে এই সমন্বিত ভিত্তির উপর যুগোপযোগী নূতন ভবিষ্যৎমুখী জীবনদর্শন গড়বার প্রয়াস। রামমোহন থেকেই এই প্রক্রিয়ার আরম্ভ। রামমোহনের মনের জমিটি তৈরী হয়েছিল প্রাচ্যচিন্তার প্রভাবে। এর সঙ্গে পরবর্তী জীবনে অধিগত পাশ্চাত্য ভাবধারাকে সমন্বিত করে তিনি তাঁর বিশিষ্ট জীবনচর্যার ভিত্তি স্থাপন করেন; (৩) ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক

প্রেরণা রামমোহনের সংস্কারপ্রচেষ্টার মূলে ক্রিয়াশীল। ধর্মকে তিনি নিছক উপযোগবাদী (utilitarian) দৃষ্টিতে প্রগতিশীল সংস্কারসাধনের অস্ত্ররূপে দেখেন নি। অপর পক্ষে ধর্মের সামাজিক রূপটি যে সমাজবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে পরিবর্তনশীল এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। ইউরোপীয় ইতিহাস অনুশীলনের ফলে আধুনিক যুগপরিবর্তনের সর্বাত্মক চরিত্র তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর পরিকল্পিত ধর্ম তথা সমাজ সংস্কারের তাত্ত্বিক ভিত্তি সর্বাত্মক ও বিশ্বজনীন, যদিও তার প্রয়োগক্ষেত্র ছিল ভারতীয় হিন্দু সমাজ ; (৪) সমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তার ত্রিধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল—জ্ঞানবিভাসিত যুগের আদর্শ, বেন্থাম-মিল ব্যাখ্যাত ব্রিটিশ উপযোগবাদ এবং তৎসাময়িক নবজাত সমাজতন্ত্রবাদ। কিন্তু তাঁর মৌলিক ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রায় সর্বত্র তাঁর ধর্ম ও সমাজসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি মার্জিত। ভারতীয় জীবনদৃষ্টিই তাঁকে ঐতিহ্যসচেতন করেছিল এবং সেই কারণেই তাঁর চিন্তা ও সংস্কারকর্মের মধ্যে সর্বত্র ঐতিহ্যের বিশুদ্ধীকরণ ও নবীকরণ এই দুই প্রক্রিয়া সমন্বিত। ঐতিহ্যচেতনা থেকেই রামমোহনের এই বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল যে সংস্কার আইনের মাধ্যমে উপর থেকে জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিলে তার ফল সর্বদা শুভ হয় না। কিন্তু স্থলবিশেষে যেখানে তিনি সংস্কার অত্যাবশ্যক মনে করেছেন সেখানে এই মনোভাবের ব্যতিক্রম ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত সতীদাহবিরোধী আন্দোলন, যে ক্ষেত্রে প্রাথমিক দ্বিধা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত প্রাণ তুচ্ছ করে এই প্রথা-উচ্ছেদকারী আইনের স্বপক্ষে লড়েছিলেন ; (৫) সাধারণভাবে শাশ্বত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্য লিবারাল চিন্তাপ্রসূত স্বাধীনতার প্রত্যয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এক সমন্বয় তাঁর ধর্ম ও সমাজচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এমন মনে করবার কারণ আছে, জীবনের শেষ পর্বে সমকালীন পাশ্চাত্য লিবারাল চিন্তার ও খ্রীষ্টীয় মানবিকতাবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে রামমোহন ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিলেন এবং এই কারণে তৎকালীন সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তার প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়ছিল। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা সমাজতন্ত্রের সিদ্ধান্তগুলিকে সংশোধন করে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রমাণপঞ্জী

১. Sri Aurobindo *The Renaissance in India* (First Edition, Calcutta 1920); Amit Sen (অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকারের ছদ্মনাম) *Notes on the Bengal Renaissance* (Bombay 1946); স্বনামে পরিবর্ধিত নব সংস্করণ *On the Bengal Renaissance* (Calcutta, 1979); দুটি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধি-স্থানীয় হওয়ায় উদাহরণ দুটি অনেকগুলির মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে; বলা বাহুল্য উনিশ শতকীয় বাঙলার নবজাগৃতি সম্পর্কে 'রেণেশাঁস' অভিধাটি আরও অনেকে ব্যবহার করছেন।

২. C. H. Haskins *The Renaissance of the Twelfth Century* (1927).

৩. Hu Shih *The Chinese Renaissance* (1933).

৪. *The Renaissance in India* (Third Ed, Calcutta, 1946) pp. 2-3

৪.(ক) উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত একখানি প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি নেওয়া যেতে পারে: "If we have to choose one single factor which helped more than others in bringing about the great transformation in India in the nineteenth century we can without any hesitation point to the introduction of English education. The English education and the Western ideas which flowed along with it, formed the foundation of all the wonderful progress that we witness in Bengal during British rule." R. C. Majumdar ed. *British Paramountcy and Indian Renaissance* Part II (The History and Culture of the Indian People Vol. X) p. 31; এই ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য চিন্তা বঙ্গীয় রেণেশাঁসের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষগণকে আপন জাতীয় ও সাংস্কৃতিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন না করে সে বিষয়ে তাঁদের প্রতীতিকে স্বচ্ছতর ও দৃঢ়তর করে তুলেছিল কোন মন্ত্রবলে তা কিন্তু এই সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত হল না। একটি স্ফুলিঙ্গ অগ্নিকাণ্ড ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু তার জন্য ইন্ধনে যথেষ্ট পরিমাণ দাহ্যতাধর্ম থাকা প্রয়োজন। আমাদের রেণেশাঁসে ভারতের পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সেই দাহ্যতাধর্মবিশিষ্ট ইন্ধন।

৫. Jadunath Sarkar *Fall of the Mughal Empire* Vol. IV, Calcutta, 1950, p. 348.

৬. দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃ: ১৫

৭. Kishory Chand Mitra 'Rammohun Roy' *Calcutta Review* Vol. IV (December 1845) pp. 388-89.

৮. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ: ৮১-৮২

৯. নগেন্দ্রনাথের বাঙলা জীবনী এবং কলেট কৃত ইংরেজি জীবনী এই মূল প্রত্যয়ের ভিত্তিতেই রচিত। এই সুবৃহৎ গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে বহুস্থলে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট উচ্চারিত

এবং উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণদ্বারা সমর্থিত। রামমোহনের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবন-কাল সংক্রান্ত এই শ্রেণীর কাহিনীগুলি যত্নসহকারে সংগ্রহ করেছেন প্রধানত তাঁর বংশধর নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় (*Some Anecdotes from the Life of Raja Rammohun Roy* : মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা ১২৮৭, দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা ১২৯৮) এবং জ্ঞাতি-বংশধর মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি। পারিবারিক কিংবদন্তী ইতিহাসের মর্যাদা দাবী করতে পারে না, কিন্তু সমগ্রভাবে এইপ্রসঙ্গে কাহিনীগুলির ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। সর্বত্র রামমোহন তরুণ বয়স থেকে ধর্মবিশ্বাসী ও ধর্মজিজ্ঞাসুরূপে চিত্রিত।

১০. ভারত-পথিক রামমোহন রায়, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৬৬, পৃ: ১৬

১১. *English Works* Pt. II p. 61 ; তুলনীয় : "...it seems to me that I cannot better employ my time in an endeavour to illustrate and maintain truth, and to render service to my fellow labourers, confiding in the mercy of that Being to whom the motives of our actions and secrets of our hearts are well-known"—Translation of the Kuth-Opunished ; Preface *Ibid.* p. 24.

১২. 'কঠোপনিষৎ' গ্রন্থাবলী-১, পৃ: ২১২

১৩. রামমোহনের এই পত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয় *Christian Reformer or Unitarian Magazine* London Vol III (1836) p. 466 ; সেখান থেকে বর্তমান লেখক কর্তৃক সংগৃহীত ও পুন:প্রকাশিত *Bengal Past and Present* Vol XCI, Part I, No. 171 (January-June 1972), pp. 8-9.

১৪. রামমোহনের সঙ্গে তাঁর কোনও অজ্ঞাতনামা বন্ধুর সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের এই চিত্তাকর্ষক বিবরণটি ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত ; এর তারিখ ১৯ মার্চ্ ১৮৩২ ; দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায় পৃ: ২৫-২৬ ও তত্রস্থ প্রমাণপঞ্জী, পাদটীকা ৪৮। উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে। সমগ্র বিবরণটির জন্য ষষ্ঠ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৫. Collet p, 233

১৬. Carpenter *Last Days* p. 191

১৭. অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এলাহাবাদ, ১৯১৬, 'জীবনচিত্রের খসড়া' পৃ 'ঐ'

১৮. George Smith *The Life of Alexander Duff* Vol. I (London 1879) p. 118

১৯. R. H. Tawney *Religion and the Rise of Capitalism : A Historical Study* (Pelican Ed. 1942), Preface p. ix

২০. Collet p. 218 ; *English Works* Pt. II pp. 95-96

২১. ব্রাইটন-নিবাসিনী শ্রীমতী উড্‌ফোর্ড্‌কে লিখিত ২৭ এপ্রিল ১৮৩২ তারিখের পত্র *English Works* IV p. 91. ; তুলনীয় ১১ আগস্ট ১৮২১ তারিখে জেম্‌স বাকিংহামকে

লিখিত পত্রে তাঁর উক্তি : "Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful." *English Works* IV p. 89

২২. দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায় পৃ: ২২-২৩ ও তত্রস্থ প্রমাণপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ '৪১', পৃ: ৪৩

২৩. তদেব, পৃ: ২০

২৪. তদেব, পৃ: ১৬-১৯

২৫. Karl Marx and Frederick Engels *The First Indian War of Independence 1857-1859* Moscow 1968, pp. 20, 31-32 ; মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স *New York Daily Tribune* পত্রিকায় ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে কতগুলি ধারাবাহিক নিবন্ধ লেখেন। উল্লিখিত গ্রন্থে তাঁদের পরস্পরকে লিখিত প্রাসঙ্গিক কয়েকখানি পত্রাংশ সহ সেই নিবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে। উদ্ধৃত অংশগুলি মার্ক্‌স রচিত ; প্রথম অনুচ্ছেদটি ২৪ জুন ১৮৫৩ প্রকাশিত 'The British Rule in India' এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলি ৮ আগস্ট ১৮৫৩ প্রকাশিত 'The Future Results of British Rule in India' শীর্ষক নিবন্ধদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত।

২৬. এই প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে *Final Appeal to the Christian Public* গ্রন্থের উপসংহারে তাঁর উক্তি, 'I now conclude my Essay by offering up thanks to the Supreme Disposer of events of this universe for having kindly delivered this country from the long continued tyranny of its former Rulers and placed it under the government of the English—a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and politial liberty, but also interest themselves in promoting liberty and social happiness as well as free inquiry into literary and religious subjects, among those nations to which their influence extends," *English Works* (G) II p. 504

২৭. William Adam *A Lecture on the Life and Labours of Rammohun Roy* delivered at Boston, U.S.A. 1845 ; Second Ed. Calcutta 1977 p. 18

২৮. দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃ: ১৭-১৯ ; এবং পঞ্চম পরিশিষ্ট।

২৯. Bertrand Russell, *Power-A New Social Analysis* London 1939, p. 56

৩০. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ: ৪৯-৫৪

৩১. Collet p. 498 ; শ্রীমতী কলেট এই পত্রখানিকে জাল বলেছিলেন (p. 7n), কিন্তু কেন এটিকে তিনি জাল মনে করেন তার কোনও কারণ দেখান নি। সমকালীন সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই। পত্রখানি রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর এককালীন একান্তসচিব স্যাণ্ডফোর্ড্‌ আর্নট ৫ অক্টোবর ১৮৩৩ *Athenaeum* পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের তৎসাময়িক অন্যান্য পত্রিকাতেও এটি প্রকাশিত হয়েছিল। ইংলণ্ডে তখনকার কেউই এই পত্রখানির অকৃত্রিমতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। রামমোহনের অনুরাগী বন্ধু ডঃ ল্যাণ্ট্‌ কার্পেণ্টার এটিকে একখানি valuable and interesting

document বলে অভিহিত করেছেন (*A Review of the Labours Opinions and Character of Rajah Rammohun* Roy London and Bristol 1833, p. 52) ; মেরী কার্পেন্টারেরও সেই মত ছিল (*Last Days* p. 22)। কলেটের গ্রন্থ সম্পাদনকালে বর্তমান লেখক ভ্রমক্রমে মন্তব্য করেছিলেন, অক্টোবর ২৮, ১৮৩৩ তারিখের *Times* পত্রে জন হেয়ার পত্রখানিকে জাল ঘোষণা করেন (Collet p. 496)। কিন্তু পরে জন হেয়ারের সেই চিঠিখানি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল, হেয়ার আর্নট প্রকাশিত রামমোহনের আত্মজীবনীমূলক পত্রটিকে কোথাও জাল বলেন নি। তাঁর বক্তব্য ছিল, রামমোহনের উক্ত পত্র আর্নটকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয় ('.. I am enabled to assert positively that the letter in question was not addressed to that gentleman [স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট]', *Times* Monday, October 28, 1833, p. 1)। এর উত্তরে আর্নট ২৩ নভেম্বর ১৮৩৩ তারিখের *Times*-এ প্রকাশিত এক পত্রে বলেন (p. 3) : "The paper was originally written simply as a sketch of his life, and afterwards, at my suggestion...two or three lines were prefixed, and one or two added, to give it the form of a letter, which, so altered, he presented to me from his own hand ; and it was then given to others, only as the copy of a letter to a friend"। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের আত্মজীবনীমূলক পত্রখানি জাল এমন অভিযোগ কোনও সমসাময়িক ব্যক্তি করেন নি। আর্নটের চরিত্রে হয়তো বহু দোষ ছিল এবং ইংলণ্ডে রামমোহনের রোগপীড়িত ও অর্থাভাবগ্রস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁর কাছ থেকে অর্থশোষণের নানা ফন্দিফিকির তিনি করেছিলেন—কিন্তু সে-সবের সঙ্গে আলোচ্য পত্রখানির কোনও সম্পর্ক নেই। রামমোহনের মৃত্যুর পর এমন একখানি জাল পত্র প্রকাশ করায় আর্নটের কোনও নূতন স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং এ পত্রের সাক্ষ্য ব্যবহারে কোনও বাধা নেই। ইংলণ্ডের নিউ-কাসল-অন-টাইন থেকে শ্রীডারমট কিলিংগে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জন হেয়ার ও স্যাণ্ডফোর্ড আর্নটের উল্লিখিত পত্র-দুখানির প্রতিলিপি পাঠিয়ে এ-বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৬২. Hitti *History of the Arabs* pp. 546-49, 740-41

৬৩. *Tuhfat-ul-Muwahhidin* Eng. trans. pp. 18-19 ; 'Second Appeal to the Christian Public' *English Works* Pt. VI p 13

৬৩. J. Epstein *Judaism ; A Historical Presentation* (1959) pp 291 ff.

৬৪. 'Brief Remarks regarding modern encroachments on the Ancient Rights of Females'-*English Works* Pt. I pp. 4, 5 ; রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ সংক্রান্ত কর্মসূচীর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর হিন্দুসমাজে প্রচলিত এই ব্যবহারবিধির বিশ্লেষণ ও-তৎকালীন উত্তরাধিকারপ্রথার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি সতীদাহপ্রসারের কারণরূপে উপস্থাপন এ যাবৎ যথোচিত গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়নি।

৬৬. *Ibid* pp. 4-6

৬৭. 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ১, পৃঃ ১৭৬

৩৮. 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' গ্রন্থাবলী ৩, পৃ: ১০

৩৯. *Bengal Past and Present* July-December 1978, pp. 131-32, 134; তৃতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩৯.ক দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পৃ· ১১২ ; চতুর্থ অধ্যায়, পৃ: ১৬৫-৬৬

৪০. 'Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal' *English Works* Pt. I pp. 18, 19; আরও দ্রষ্টব্য, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, 'রামমোহন ও ইঙ্গ-ভারতীয় আইন' *The Students Rammohun Centenary Commemoration Volume* (M. C. Sarkar & Sons, Calcutta 1933 ?): বাঙলা অংশ (রামমোহন-প্রতিভা), পৃ: ২-১২ পুনর্মুদ্রিত, তত্ত্বকৌমুদী, মাঘোৎসব সংখ্যা, ১৩৭৩, পৃ: ৯-১৮

৪১. John Plamenatz *The English Utilitarians* (Oxford 1958) p. 68

৪২. অতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত ; দ্রষ্টব্য, তাঁর প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, *The Students Rammohun Cenenary Volume*, বাঙলা অংশ, পৃ: ১০-১১ তত্ত্বকৌমুদী, মাঘোৎসব সংখ্যা, ১৩৭৩, পৃ: ১৬-১৭

৪৩. শ্রীরামচন্দ্র মৌলিকের নিজের মুখে এই কথা শোনেন স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী কাশীতে তাঁর তরুণ বয়সে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। রামচন্দ্র তখন স্থবির। ক্ষিতিমোহন এই কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন, 'যুগগুরু রামমোহন' প্রবন্ধে ; দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১০ম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮) পৃ: ১৯-৩৬, পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা ১৯৫২, পৃ: ১৬

৪৪. 'ব্রাহ্মণ সেবধি'-প্রথম সংখ্যা ; গ্রন্থাবলী-৫, পৃ: ৩ ; 'The Brahmunical Magazine: 'Preface to the First Edition' *English Works* Pt. II p. 131; কোনও বন্ধুকে লিখিত পত্র (ইংরেজি). *Ibid* Pt. IV p. 95; Collet p. 213

৪৫. Collet pp. 257-58

৪৬. দ্রষ্টব্য এম. ভি. কামাথের সচিত্র প্রবন্ধ 'Sati-the Shame of a Nation' *Illustrated Weekly of India* April 13-19, 1980.

৪৭. Collet p. 89; নগেন্দ্রনাথ পৃ: ৩৫৮; সতীদাহের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন করবার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, রামমোহন-প্রণোদিত এবং হরচন্দ্র রায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য পরিচালিত 'বঙ্গাল গেজেটি' সাপ্তাহিক পত্রে (১৮১৮) রামমোহনের 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ' শীর্ষক পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ, Collet p. 205), এবং রামমোহন পরিচালিত 'সংবাদ-কৌমুদী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধ সমালোচনা (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক-পত্র, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ) পৃ: ১৮-১৯

৪৮. *English Works* Pt. II pp. 100, 113

৪৯. ২৮ নভেম্বর ১৮২৯ সংখ্যা *Bengal Hurkaru* প্রকাশিত ২৬ নভেম্বর ১৮২৯ তারিখের এক পত্রে শ্রীমতী ফ্রান্সেস কীথ মার্টিন জানিয়েছিলেন, রামমোহন দীর্ঘ আঠার বছর ধরে

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন (*Progressive Movements* No. 80, pp. 150-51)। সুতরাং এর আরম্ভ ১৮১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে পড়ছে। সতীদাহ-উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার পর এই পত্র লেখা হয়েছিল। 'বেঙ্গল হরকরা' এই আইন-প্রণয়ন উপলক্ষে সতীদাহ উচ্ছেদের জন্য বেণ্টিংকের উপর অত্যধিক কৃতিত্ব আরোপ করায় শ্রীমতী মার্টিন উক্ত পত্রে তার প্রতিবাদ করেন। তিনি অভিযোগ করেন 'হরকরা' এই ব্যাপারে পরোক্ষে রামমোহনের কৃতিত্বের লাঘব করেছেন এবং এই সূত্রে বলেন, "বেণ্টিংকের সতীদাহ উচ্ছেদ আইন"... would not now, in the utmost probability, have been brought into effect... but for the powerful though unackowledged aid of the great Hindoo Philosopher, Rammohun Roy ......at least to those prodigies of fortitude, the Indian widows may the present era prove a Jubilee which enfranchises them for ever,—and in commemorating the amiable and highly politic administration of Lord Bentinck, may they never cease to remember the growing sympathy, intelligence and fearless energy displayed through a course of *eighteen years* by their great and at length successful advocate Ram Mohun Roy. |" উল্লেখ্য যে, লেখিকার পত্রখানি প্রকাশ করে ২৮ নভেম্বর ১৮২৯ তারিখের 'হরকরা' তাঁর বক্তব্য স্বীকার করে নেন এবং মন্তব্য করেন: "Let us not therefore offer our exclusive praise and gratitude either to Ram Mohun Roy or to Lord William Bentinck. The former would never have succeeded in his patriotic and enlightened labours without the co-operation of the latter, nor would Lord Bentinck have ventured on so desirable a measure if the minds of the natives had not been prepared to abandon the worst of superstitions, by the unwearied labours of their distinguished countryman." (*Progressive Movements*, No. 81, p. 152)।

৫০. *Progressive Movements* No. 59 pp. 115-17; আবেদনপত্রখানি যে রামমোহন রচিত, অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে তা বোঝা যায়। এই মর্মে উল্লেখ্য, সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী স্বাক্ষরিত একখানি ইংরেজি পত্র ২৭ মার্চ ১৮১৮ সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ প্রকাশিত হয় (*Progressive Movements* No. 56, pp. 113-14)। হরিহরানন্দ ইংরেজি জানতেন না, সুতরাং এ-পত্রখানিও রামমোহন রচনা করেছিলেন, এমন অনুমান যুক্তিসঙ্গত।

৫১. Reginald Heber *Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India from Calcutta to Bombay 1824-25* (Fourth Ed. in Three Volumes, London 1829) Vol. I p 73

৫২. *Progressive Movements* No. 77, p. 142

৫৩. ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ঘটনাটি যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তার মধ্যে

বিৰজ্জনোচিত সততার পরিচয় পাওয়া যায় না: "He [Pentinck] consulted several persons one of whom was naturally Ram mohun Roy who was known to be a great fighter against the evil. But to Bentinck's utter surprise Rammohun opposed the proposal to stop the evil by legislation" (*On Rammohan Roy* Calcutta, 1972. p. 43)। রামমোহন বেণ্টিংককে এই প্রসঙ্গে কোন যুক্তিতে কি বলেছিলেন রমেশচন্দ্র কিন্তু তা উদ্ধৃত করেন নি। বরঞ্চ এ বিষয়ে খানিকটা অনীহা প্রদর্শন করে একটু পরে বলছেন, "Now, it is not necessary in the present context to discuss the wisdom or reasonableness of Rammohun's position." (*Ibid* p. 43)। কেন? সেটুকু না করলে রামমোহনের 'position'কে বিচার করা যাবে কি উপায়ে? নিজের পক্ষে অস্বস্তিকর এইসব প্রশ্ন উত্থাপন না করে ডঃ মজুমদার এমন অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে রামমোহন কর্তৃক বেণ্টিংকের প্রস্তাবের "বিরোধিতা" প্রসঙ্গটিকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন যার থেকে স্বভাবত মনে হতে পারে সম্ভবত সতীদাহ-উচ্ছেদ রামমোহনের কাম্য ছিল না। সততার অভাব শুধু এখানে নয়। "But to Bentinck's utter surprise" অংশটিও রমেশচন্দ্রের মনগড়া কল্পিত যোজনা। 'সতী-সংক্রান্ত' বেণ্টিংকের 'মিনিট'টি আদ্যোপান্ত পাঠ করেও রামমোহনের মতামত প্রসঙ্গে কোথাও বেণ্টিংকের বিস্ময়ের প্রকাশ দেখা যাবে না। রামমোহনের পরামর্শ তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাসহকারে শুনেছিলেন, তাঁর সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট গুরুত্বও দিয়েছিলেন, যদিও গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট উক্তি 'মিনিট'-এ বর্তমান: 'Admitting, as I am always disposed to do, that much truth is contained in these remarks, but not at all assenting to the conclusions..." (*Progressive Movements* p. 142)।

৫৪. C. H. Philips সম্প্রতি *The Correspondence of Lord William Cavendish Bentinck* শীর্ষক বেণ্টিংকের চিঠিপত্রের দুটি খণ্ডে যে সংকলন প্রকাশ করেছেন (Oxford University Press, 1977) তাতে উক্ত পত্র দুখানি স্থান পায় নি। পত্র দুখানির উল্লেখ করেছেন ও আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন ডঃ সালাহউদ্দীন আহ্‌মদ (*Social Ideal and Social Change in Bengal 1818-1835*, Leiden 1965, p. 124)। নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে বর্তমান লেখক যে দুখানির পূর্ণ জেরক্স-প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

৫৫. *Progressive Movements* No. 98, pp. 173-74.

৫৬. *John Bull* February 27, 1830 quoted by the *Asiatic Journal* Vol. II New Series (May to August 1830): 'Asiatic Intelligence', p. 202

৫৭. *India Gazette* quoted by *Calcutta Monthly Journal* November 1830, *Progressive Movements* No. 101, pp. 178-79

৫৮. *Asiatic Journal*, Vol. V, New Series (August 1831), 'Asiatic Intelligence', pp. 20-21

৫৯. *The English Works of Raja Rammohun Roy* (Social and Educational) Centenary Edition (Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta 1934) pp. 67-80, পুনর্মুদ্রিত *Progressive Movements* No. 12, pp. 186-92 ; রামমোহন রায় যে 'Counter-Petition' সঙ্গে করে ইংলণ্ডে নিয়ে যান তাঁর ইংরেজি গ্রন্থাবলীর এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্করণে সেটি মুদ্রিত হয়েছে (pp. 92-94) ; এটি সঙ্গত কারণেই রামমোহনের রচনা বলে অনুমিত। রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণগুলিতে (যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বা পাণিনি অফিস বা নাগ-বর্মন্ প্রকাশিত) সতীদাহ বিষয়ক তাঁর উল্লিখিত শেষ গ্রন্থখানি নেই। তাই রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্ভবত এটির অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাঁর *On Rammohun Roy* গ্রন্থে কোথাও এ গ্রন্থের উল্লেখ নেই।

৬০. *Progressive Movements* No. 116, pp. 194 96 ; ৯ জুলাই, ১৮৩২ তারিখে লণ্ডন থেকে বেণ্টিংককে লিখিত এক ব্যক্তিগত পত্রে জে. জি. র‍্যাভেন্‌শ জানাচ্ছেন ; "After 3 days argument before the privy council, the petition against you for putting down suttee was dismissed yesterday to the no small gratification...of Rammohan Roy who was present all the time. (C. H. philips ed. *The Correspondence of Lord William Bentinck* vol II, No, 464, p. 851) ; এই পত্রের তারিখটি একটু গোলমেলে। সতীদাহ-নিবারক আইন বিরোধী রক্ষণশীল-পক্ষীয় আবেদনটি নাকচ করে চূড়ান্ত রায় দেওয়া হয় ১১ জুলাই ১৮৩২ (*Asiatic Journal* Vol VIII, New Series, August 1832 : 'Home Intelligence', pp. 223-24)। হয়তো কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হবার আগেই জানা গিয়েছিল, কিংবা র‍্যাভেনশ অনবধানতাবশত চিঠিতে তারিখ ভুল লিখেছিলেন।

৬১. রামমোহনের এই পত্রখানি সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন শ্রীবিনয় ঘোষ— 'তত্ত্বকৌমুদী', মাঘোৎসব সংখ্যা, ১৩৭৩, 'রামমোহন ও সতীদাহ', পৃঃ ৬৮ ; পুনর্মুদ্রিত, বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : ১৮০০—১৯০০ (সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র-পঞ্চম খণ্ড), কলিকাতা ১৯৬৮, পৃঃ ২৪৬

৬২. যুক্তিমার্গের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে 'কেনোপনিষদ'-এর ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহনের স্পষ্ট ও সুচিন্তিত উক্তি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, পূর্ববর্তী দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৭৩ ; তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১০৬-৭ ; এই প্রসঙ্গে তুলনীয় অন্যত্র তাঁর উক্তি : "... the reasoning faculty, which leads men to certainty in things within its reach produces no effect on questions beyond its comprehension." 'Translation of an abridgement of the Vendant,' *English Works* Pt. II. p. 60.

৬৩. চন্দ্রশেখর দেব, 'Reminiscences of Rammohun Roy', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃঃ ১৪০

৬৪. ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্মেঽস্তি ন ধর্মাৎ প্রতিষেধনম্। —মনুসংহিতা, ১০.১২৬

৬৫. *The History of Bengal* Vol. I (Hindu Period) ed. R. C. Majumdar (Published by the University of Dacca, First Ed. 1943) Vol. I pp. 575-76.

৬৬. "A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas." *English Works* Pt. II. p. 100

৬৭. Mathew xxii. 37, 38, 39 ; এর মধ্যে রামমোহনের মত বেদান্তবিদ্ অবশ্যই পেয়েছিলেন উপনিষদ আত্মবাদের প্রতিধ্বনি :

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥

ঈশোপনিষৎ ৬

'যিনি আত্মাতে সর্বভূতকে দেখেন এবং সর্বভূতে আত্মাকে দেখেন তিনি সেই কারণে কাউকে ঘৃণা করেন না।' এই জন্যই রামমোহনের চোখে বৈদিক নীতিবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টোপদেশের সাদৃশ্য ধরা পড়েছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিতে উপনিষদের এই উদার আদর্শ বজায় থাকে নি। শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সমকালীন হিন্দু সমাজের সর্বতোমুখী অধঃপতিত অবস্থা পর্যবেক্ষণ, এ বিষয়ে রামমোহনকে স্থিরনিশ্চয় করেছিল। সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার পক্ষে খ্রীষ্টের মানবমুখী নীতি-উপদেশকে তাই তিনি অধিকতর উপযোগী মনে করেছিলেন।

৬৮. St. Mathew vii. 12 ; St. Luke vi. 31

৬৯. *English Works* Pt. V p. 3

৭০. 'ব্রহ্মোপাসনা' : গ্রন্থাবলী, ৪, পৃঃ ৫১

৭১, দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১৩৫-৩৬

৭২. দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১৫-১৬ ; বেকন, লক নিউটন, হিউম, গিবন, ভোলতেয়ার-এর উল্লেখ রামমোহনের রচনাতেই পাওয়া যায়, *English Works* Pt. IV. p. 106 : (বেকন) ; দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৭৬-৮০ এবং তত্রস্থ প্রমাণপঞ্জী, উল্লেখ '৮৪', '৪৫', '৫৩ক' (লক ও নিউটন) ; রবার্ট্ ডেল ওয়েনকে লিখিত পত্র, (লক ও নিউটন)-Collet, p. 494 এবং সপ্তম পরিশিষ্ট ; *English Works* IV pp. 69, 72 (হিউম, ভোলতেয়ার ও গিবন) ; বেন্থামের সঙ্গে পত্র-বিনিময়. *Works of Jeremy Bentham* ed. J. Bowring (Edinburgh, 1838-43) Vol X pp. 589-92 ; Collet, pp. 488-93 ; অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে লিখিত পত্র, এলফিনস্টোন-সংগ্রহ, ইণ্ডিয়া অফিস, লণ্ডন (জেমস্ মিল), তৃতীয় পরিশিষ্ট ; রবার্ট্ ওয়েন ও তাঁর পুত্র রবার্ট্ ডেল ওয়েনকে লিখিত পত্র, Collet p. 494 ও সপ্তম পরিশিষ্ট ; Carpenter *Last Days* p. 130 ; Collet, pp 329, 494-95 ; রামমোহনের সঙ্গে পরিচয় ও আলাপের পর ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে লেঃ কর্নেল ফিজক্লারেন্স্ (লর্ড মুনস্টার) লেখেন, রামমোহন, "...quotes Locke and Bacon on all occasions." *Journal of a Route Across India through Egypt in the Latter End of the year 1817 and the Beginning of 1818* London, 1819, p. 106

১৩. Bertrand Russell *A History of Western Philosophy* London 1946, p. 633

১৪. John Stuart Mill, *Utilitarianism, Liberty & Representative Government* (Everyman's Library Ed. 1925) p. 6

১৫. ওয়েন-মতবাদের একজন সাম্প্রতিক ব্যাখ্যাতার ভাষায় "Owen's key concepts were common places of later eighteenth century liberal thought.........The Owenite search for a science of society is thus to be seen as part of the emergence of modern social sciences from the matrix of eighteenth century social thinking." J. F. C. Harrison *Robert Owen and the Owenites in Britain and America* London 1969, p. 83

১৬. দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃ: ১৬-১৭

১৭. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ: ৬২-৬৩; রামমোহন ও বেন্থাম পরস্পর পরিচিত ও পরস্পরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। এই সূত্রে রামমোহন সম্পর্কে বেন্থাম একসময় বলেছিলেন, "Rammohun Roy has cast off thirty-five million of gods and has learnt from us to embrace reason in the all important field of religion." (*The Works of Jeremy Bentham* ed J. Bowring, Vol X p. 571)। উক্তিটিতে অনেকখানি সত্য থাকলেও সম্ভবত খানিকটা অনভিপ্রেত অতিরঞ্জনও আছে। প্রথমত রামমোহন মূলত একেশ্বরবাদ ও যুক্তিবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন ইসলাম শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে; ইউরোপীয় জ্ঞানরাজ্যে তাঁর প্রবেশ জীবনের পরবর্তী পর্বে। এক্ষেত্রে 'us' শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা বেন্থাম যদি সাধারণভাবে সপ্তদশ-উনবিংশ শতকীয় পাশ্চাত্য চিন্তানায়কগণকে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে রামমোহন-মানসে ইসলামীয় প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়। আর যদি 'us' শব্দদ্বারা তিনি স্বসম্প্রদায়ের অর্থাৎ উপযোগবাদী (Utilitarian) দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকেন তাহলেও বলতে হবে তিনি রামমোহনের উপর জ্ঞানবিভাসিত যুগের চিন্তাবিদ্‌গণের বা ওয়েন প্রভৃতি তৎকালীন সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রভাবকে হিসেবের মধ্যে ধরেননি। বেন্থাম নিজের মতবাদ সম্পর্কে এতই উৎসাহী ও নিজ আদর্শে এতই সমর্পিতপ্রাণ ছিলেন যে, কোনও আদর্শবাদী বুদ্ধিজীবী সংস্কারক বা কর্মবীরের সঙ্গে কোনও সূত্রে তাঁর যোগাযোগ হলেই তিনি তাঁকে স্বমতে দীক্ষিত করবার জন্য ব্যস্ত হতেন। ভারতবর্ষেও তিনি তাঁর একান্ত অনুরাগী শিষ্য জেমস্ ইয়ং-এর মাধ্যমে তদানীন্তন বড়লাট বেন্টিক ও রামমোহনকে প্রভাবিত করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন—Eric Stokes *The English Utilitarians and India* pp. 51-52; রামমোহন বেন্থামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলেও, আমরা দেখব, তথাখ্যাত উপযোগবাদী (Utilitarian) দর্শনের সবটুকু গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৮. ইংলণ্ডে এক মহিলা রামমোহনকে কোনও এক উপলক্ষে প্রশ্ন করেন, তিনি খ্রীষ্টধর্মের আদিপাপতত্ত্বে (Doctrine of Original Sin) বিশ্বাস করেন কি না। রামমোহন যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, "I believe, it is a doctrine, which in

many well-regulated minds has tended to promote humility, the first of Christian virtues; for my own part I have never been able to see the evidence for it". Carpenter-*Last Days* p. 131; আরও দ্রষ্টব্য-ষষ্ঠ পরিশিষ্ট।

৭৯. 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ': গ্রন্থাবলী ৩, পৃঃ ৩৯

৮০. তদেব, পৃঃ ৪১

৮১. দ্রষ্টব্য, উল্লেখ '১১'

৮২. ইন্দ্র মিত্র—করুণাসাগর বিদ্যাসাগর প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬৯, পৃঃ ৬৩৪; বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্পর্কে অনেকে কৌতূহলী। তাঁর জীবনীকারগণ এ সম্পার্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। রামমোহনের মত আধ্যাত্মিক প্রবণতা বিদ্যাসাগরের ছিল না নিশ্চয়, কিন্তু তাঁকে নাস্তিক বললে বেশী বলা হয়। আলোচ্য উক্তি ইঙ্গিত করছে কেবলমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বে যে তাঁর বিশ্বাস ছিল তাই নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়েও নিশ্চিত ধারণা ছিল এবং জীবনের কর্তব্যসাধনকে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তিনি ঈশ্বরের নিকট আবশ্যিক দায়িত্বপালন বলেই মনে করতেন।

৮৩. রামমোহন বেন্থামের গুণগ্রাহী হয়েও বেন্থামনীতির এই অংশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আর এক মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র বেন্থামের এই সুখপরিমাণবাদ প্রায় সর্বাংশেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে শিষ্যের প্রশ্ন "সর্বভূতে যদি সমান তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের হিতসাধন ধর্ম এবং একজনের অল্প হিতের অপেক্ষায় একজনের বেশী হিতসাধন ধর্ম, কিন্তু যেখানে একজনের বেশী হিত একদিকে আর দশজনের অল্পহিত (তুল্য হিত নহে) আর এক দিকে সেখানে ধর্ম কি?" উপলক্ষে গুরুর উত্তর, "সেখানে অঙ্ক কষিবে।...মনে কর একদিকে একজনের যে পরিমাণ হিত সাধিত হইতে পারে, অন্য দিকে শতজনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে পারে। এস্থলে একজনের হিতের অঙ্ক $\frac{১০০}{৪}$=২৫। এখানে একজনের বেশী হিত পরিত্যাগ করিয়া শতজনের অল্প হিত সাধন করাই ধর্ম।" 'ধর্মতত্ত্ব', দ্বাবিংশতম অধ্যায়, "আত্মপ্রীতি"। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম অবশ্য বলেছেন, "ইহা (হিতবাদ) ধর্মতত্ত্বের সামান্য অংশ মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্বের কোণের কোণ মাত্র।... ...ক্ষুদ্রতম হউক ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম, অধর্ম নহে"।

৮৪. L. T. Hobhouse *The Elements of Social Justice* London 1949, p. 18; বেন্থাম ব্যাখ্যাত নীতিতত্ত্বের দুর্বলতা ও অগভীরতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে জনৈক আধুনিক লেখক বলেন, 'The desire for plesure, prudence and egoism, even if sympathy is added to them, are not the stuff of which to make a plausible theory of morals. Whatever men may be doing when they are acting morally, they are not seeking pleasure, nor are they being selfish, prudent and

sympathetic. Morality curbs egoism, is often indifferent to pleasure and usually overrides prudence. These are the undeniable facts vouched for by our daily experience. That society could not hold together without morality is also a fact, but it does not follow that morality is a kind of social insurance, in which each individual finds his account. ...They [the Utilitarians] did not analyse the moral behaviour of men in the attempt to discover what it is they are doing when they behave morally." J. Plamenatz *The English Utilitarians* Oxford 1958, pp. 148-49

৮৫. Collet. p. 494 ; আরও দ্রষ্টব্য, সপ্তম পরিশিষ্ট।

৮৬. *Works of Jeremy Bentham* ed. J. Bowring. Vol. I. Introduction by J. Hill Burton, p. 31

৮৭. *English Works* I p. 31

৮৮. *Ibid* pp. 31-32 ; রামমোহনের কাছে এই রকম পাল্টা মার মাঝে মাঝে খেতেন বলেই শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের একাংশ তাঁর উপর জাতক্রোধ ছিলেন।

৮৯. T. E. Holland *The Elements of Jurisprudence* (Tenth Edition, London 1906) pp. 27-40

৯০. W. L Davidson *Political Thought in England : The Utilitarians from Bentham to Mill* (1944) pp. 94-98 ; প্রচলিত বিচারব্যবস্থার অধীনে নিযুক্ত বিচারকের প্রতি বেন্থামের তীব্র ঘৃণা ছিল, বিদ্রূপ করে অনেক সময় তিনি তাঁদের 'Judge and Co.' বলে উল্লেখ করতেন।

৯১. *English Works* Part III pp. 11-13, 14, 32-33, 35

৯২. *Ibid*. pp. 12-13

৯৩. *Ibid*. p. 35

৯৪. অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, রামমোহন ভারতীয় ব্যবহারবিধির সংহিতা প্রণয়নের উপযোগিতা সংক্রান্ত তাঁর ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে বেন্থামের চিন্তা থেকেই লাভ করেছিলেন (*History of Indian Social and Political Ideas from Rammohun to Dayananda* Calcutta 1967, p. 27)। বিপুল হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র ও মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় ও সেই সূত্রে লব্ধ প্রেরণাকে তিনি এই প্রসঙ্গে কতকটা উপেক্ষা করেছেন মনে হয়।

৯৫. *English Works* III pp. 32-33

৯৬. *English Works* (G) Vol I p. 558 ; নাগ-বর্মণের সংস্করণে এই অংশ মুদ্রাকর প্রমাদে দূষিত।

৯৭. 'রামমোহন রায় ও ইঙ্গ-ভারতীয় আইন' *The Students' Rammohun Centenary Volume* ; বাংলা অংশ (রামমোহন-প্রতিভা) পৃঃ ১০-১১ ; পুনর্মুদ্রিত, কৌমুদী, মাঘোৎসব সংখ্যা ১৩৭৩, পৃঃ ১১-১২

২৬(ক)

৯৮. *English Works* III p. 69

৯৯. *Ibid.* pp. 11-14, 17-20, 24-29, etc.

১০০. *Progressive Movements* pp. 360-70

১০১. *English Works* III pp. 21-22

১০২. W. Adam *A Lecture on the Life and Labours of Rammohun Roy* 2nd ed. Calcutta 1977, pp. 16,17

১০৩. ব্যক্তিগত আচরণে রামমোহনের স্বাধীনচিত্ততা ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধের বহু নিদর্শন তাঁর জীবনে দেখা যায়। ভাগলপুরের ইংরেজ কলেক্টর সার ফ্রেডেরিক হ্যামিল্টনের উদ্ধত, অভদ্র আচরণের প্রতিবাদ (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ২৫-২৯) ; কোনও উদ্ধত শেতাঙ্গ রাজকর্মচারীকে বাইরে ডেকে এনে তাকে অভদ্রতার জন্য ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা (বেন্টিংক্‌কে লিখিত কর্ণেল জেম্‌স ইয়ং-এর পত্র, ২০ এপ্রিল ১৮৩৪-C. H. Phillips ed. *The Correspondence of Lord William Bentink Vol* II p, 1246) ; কলিকাতার বিশপ ডঃ মিড্‌লটন প্রদত্ত খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ করবার অমর্যাদাকর প্রস্তাবের উত্তরে তাঁর ঘৃণাপূর্ণ উক্তি—"My Lord, you are under a mistake. I have not laid down one superstition to take up another (*India Gezette* October 8, 1829) ; দিল্লীর বাদ্‌শাহের দৌত্যসংক্রান্ত পত্রালাপ উপলক্ষে বাদ্‌শাহ্‌ কৃত রামমোহনের আত্মমর্যাদাহানিকর এক উক্তির দর্পিত প্রতিবাদ (J. K. Majumdar ed. *Raja Rammohun Roy and the Last Moghuls* Calcutta 1939. pp. 213-14) ; ইত্যাদি ঘটনাগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ অনুরাগী বন্ধু জেম্‌স সাদার্ল্যাণ্ড এমন এক কিংবদন্তীরও উল্লেখ করেছেন (Sutherland's Remiscences of Rammohun Roy *Calcutta Review* October 1935, p. 59) যে রামমোহন একবার আত্মমর্যাদারক্ষার্থ কোনও এক শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে (duel) অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবশ্য এ ঘটনা সত্য কি না জানা যায় না। তবে ভারতীয়দের কাছ থেকে চাটুকারিতা প্রত্যাশী শ্বেতাঙ্গসমাজে, বিশেষত শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষগণের একাংশ যে এই স্বাধীনচিত্ততার জন্য রামমোহনকে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন তাতে সন্দেহ নেই।

১০৪. Collet, pp. 130-31, 161-63, 172-73 ; ১৮৮২ সালের নভেম্বর মাসে 'মিরাৎ-উল্‌ আখবর্‌'-এ অবশ্য তুর্কীশাসনের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল (Collet, p. 174) ; সম্ভবত তখন পর্যন্ত রামমোহন সমকালীন গ্রীক স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। পরে এ সম্পর্কে তাঁর মত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তিনি গ্রীক স্বাধীনতাযুদ্ধের সমর্থক হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে উইলিয়ম এ্যাডাম লিখেছেন, "Within the period of my own acquaintance with him, I well recollect the enthusiasm with which he heard of the···establishment of constitutional government in Portugal, and the fervent good wishes with which he watched the struggle of Greece against Tarkish power

(*A Lecture on the Life and Labours of Rammohun Roy* 2nd ed, Calcutta, 1977, pp. 13-14)

১০৫. দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ২৩-২৬, এবং ষষ্ঠ পরিশিষ্ট।

১০৬. Bentham *Works* (ed. J. Bowring) Vol IV pp. 408, 418

১০৭. *Ibid.* Vol. II pp. 277-97

১০৮. বিপ্লবাদর্শের প্রতি রামমোহনের সহানুভূতি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Collet pp. 161-63; ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বসিত অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন ইংলণ্ড গমনে তাঁর সহযাত্রী জেম্‌স্‌ সাদার্ল্যাণ্ড, দ্রষ্টব্য 'Sutherland's Reminscences of Rammohun Roy' *Calcutta Review* October 1935 p. 62; আমেরিকা সম্পর্কে রামমোহনের মনোভাব বিশ্লেষণ করে সাদার্ল্যাণ্ড উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন—'He admired republicanism in the abstract and thought that in America it worked well. He had a great partiality for that country where he had many friends and which he certainly intended to visit; and I have been informed, that it was resolved to receive him throughout the Union as a national visitor." (p. 69); ১৮২৪ সালে আমেরিকা পরিদর্শন করবেন, রামমোহনের এমন ইচ্ছা ছিল (১৭ অক্টোবর ১৮২২ রেভা: জ্যারেড স্পার্ক্‌সকে লিখিত পত্র *Bengal Past and Present* January-June 1975, p. 28)। দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ পরিশিষ্ট।

১০৯. অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকীয় ইংলণ্ডীয় প্রজাতন্ত্রী ধ্যানধারণার উপযুক্ত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য: H. A. L. Fisher *The Republican Tradition in Europe* London 1918, pp. 139-49, 160-63; ইংরেজ জাতি রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী হলেও প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের মজ্জাগত। সুতরাং বুদ্ধিজীবীদের একাংশের প্রজাতান্ত্রিক ভাবনা সেখানকার বৃহত্তর জনসাধারণকে স্পর্শ করেনি। তা ছাড়া কোলরিজ, ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসে অনেকখানি রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ছিল এবং এঁদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তাঁদের প্রজাতান্ত্রিক মতবাদ প্রত্যাহার করেছিলেন।

১১০. Bentham, 'The Constitutional Code' Book I. Chapter VIII, Section I (Supreme Operative)-*Works* (ed. Bowring) Vol. II pp. 127-29; রাজতান্ত্রিক ও অভিজাততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিষয়ে বেন্থামের বিরূপ সমালোচনা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য *Ibid.* pp. 128-44; বেন্থাম কর্তৃক প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এই দৃঢ় সমর্থন বিশ্বের সর্বত্র প্রজাতন্ত্রের সমর্থকগণকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। গুয়াতেমালা প্রজাতন্ত্রের তৎকালীন সভাপতি জোসে দেল ভাল বেন্থামকে গুরুর ন্যায় মান্য করতেন; ৩ আগস্ট, ১৮৩১ তারিখে বেন্থামকে পিতৃ-সম্বোধনে লিখিত এক পত্রে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বেন্থামের Constitutional Code তিনি গুয়াতেমালায় চালু করবেন (Bentham *Works* Vol. XI p. 71); এখানে উল্লেখযোগ্য, রামমোহনকে লিখিত পত্রে বেন্থাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই জোসে দেল

তাদের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় করিয়ে দেবেন (Fentham Works Vol. X pp. 589-92)।

১১১. *Tuhfatul Muwahhidin*—Eng. Trans. pp. 23-24

১১২. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ: ১৩২-৩৫

১১২ক. Monier-Wlliams *Religious Life and Thought in India* Pt. I Vedism, Brahmanism and Hindunism, London 1883 p. 484

১১৩. ব্রহ্মোপাসনা : গ্রন্থাবলী ৪, পৃ: ৫১

১১৪. 'বেদান্তগ্রন্থ' : গ্রন্থাবলী ১, পৃ: ৪

১১৫. তদেব, পৃ: ৮৮ ; তৃতীয় অধ্যায়, পৃ: ১৩৫-৩৬

১১৬. 'কবিতাকারের সহিত বিচার' : গ্রন্থাবলী ২, পৃ: ৮৯

১১৭. Carpenter *Last Days* p. 150

১১৮. 'প্রার্থনাপত্র, গ্রন্থাবলী ৪, পৃ: ২৭-২৮ ; *English Works* II pp. 200-01

১১৯. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ: ১২৯-৩৫

১২০. দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃ: ৩৩-৩৪

১২১. সৌভাগ্যক্রমে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকাল (৬ ভাদ্র ১৭২৫ বঙ্গাব্দ) থেকে সমাজের আচার্যরূপে প্রদত্ত সতেরটি 'ব্যাখ্যান' ঈশানচন্দ্র বসু কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে "ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত" শিরোনামে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শ্রীগৌতম নিয়োগী লিখিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবনী সংবলিত এই গ্রন্থের এক নূতন সংস্করণ 'ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান' শিরোনামে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে সংগৃহীত সতেরটি ব্যাখ্যানে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নিম্নলিখিত শ্রুতি (উপনিষদ্) বাক্যগুলি উদ্ধৃত করে সর্ববর্ণভুক্ত শ্রোতৃবর্গের কাছে সেগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলেন : 'যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ' (মুণ্ডক ২।২।২) ; ''তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি' (কঠ ১।২।১৫), 'আত্মানমেবোপাসীত' (দুইবার) (বৃহদারণ্যক ১।৪।৭, ৮, ১৫) ; 'যতো বা ইমানি ভূতানি' (তৈত্তিরীয় ৩।১) ; 'যতো বাচো নিবর্তন্তে' (তৈত্তিরীয় ২।৪।৯) 'প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়' (তিন বার) (মুণ্ডক ১।২।১৩) ; 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি…যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে' (কঠ ১।৩।৩-৮) ; 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ' (কঠ ২।৩।৩) ; 'প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ' (মুণ্ডক ২।১।৭) ; 'ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ (কঠ ১।১।২১)' ; 'আচার্যকুলাদ্বেদমধীত্য…ন স পুনরাবর্ততে' (ছান্দোগ্য ৮।১৫।১) ; 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত' (কঠ ১।৩।১৪) ; 'আত্মা বা অরে…নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫ ; ৪।৫।৬) ; 'তত্তে পদং সংগ্রহণে ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ' (কঠ ১।২।১৫) ; 'প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা…তন্ময়ো ভবেৎ' (মুণ্ডক ২।২।৪) ; 'ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং (মুণ্ডক ২।২।৬) ; 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্' (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮) ; 'অশব্দমস্পর্শমব্যয়ং… মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে (কঠ ১।৩।১৫) ; 'স যোহন্যমাত্মনঃ…রোৎস্যতীতি' (বৃহদারণ্যক ১।৪।৮) ; 'অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্যে…ইদং সর্বং বিদিতম্' (বৃহদারণ্যক ৪।৫।১-৬) ; 'সত্যমায়তনম্'

(কেন ৪।৮) ; 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তিরীয় ২।১) 'অন্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে' (চার বার) (কঠ ১।১।২০) ; 'পরীক্ষ্য লোকান্‌...নাস্ত্যকৃতঃকৃতেন' (মুণ্ডক ১।২।১২) ; 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্‌' (তৈত্তিরীয় ২।১) ; 'ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং' (কঠ ১।২।৬) 'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ' (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৩) ; 'পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ...নান্তরাত্মন্‌' (কঠ ২।১।১) ; (দ্রষ্টব্য, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, 'ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান' দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৮৪, পৃঃ ৩, ৫, ৭, ৯, ১২-১৩, ১৫, ১৭, ২০-২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৯, ৩২, ৩৩-৩৯, ৪১, ৪৫, ৪৭, ৫৩, ৫৯, ৬৪, ৭০, ৭৭, ৮২, ৯০, ১০৬, ১১৪, ১২৩) ।

১২২. রামমোহনের কালে কলিকাতার দক্ষিণী তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সম্মুখে বেদমন্ত্র আবৃত্তিতে যে আপত্তি ছিল, ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে পরবর্তী বার-তের বছরের মধ্যেই তা দূর হয়ে যায়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সাংবৎসরিক অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় কুড়িজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেণীর শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে প্রকাশ্যে বেদপাঠ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৯) ।

১২৩. গ্রন্থাবলী-৪, পৃঃ ২৭-২৮

১২৪. প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়, পৃঃ ১৭৪-৭৬ ; গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংকীর্তনের প্রতি রামমোহনের অনীহার আরও একটি কারণ হতে পারে তাঁর ব্যক্তিগত সাংগীতিক রুচি। তিনি মার্গসঙ্গীতের ভক্ত এবং এই সঙ্গীতে শিক্ষিত ছিলেন। কীর্তনের উদ্দাম সুরোচ্ছ্বাসের প্রতি এজন্য তাঁর মনে বিরাগ থাকা সম্ভব। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'এ প্রসঙ্গত তিনি বাঙলার সঙ্গীত সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলেছেন, "গৌড় দেশে, না গীতের শৃঙ্খলা আছে, না গৌড়দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য আছে..." ('গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থাবলী-৭ পৃঃ ৬৬) । সঙ্গীত বিষয়ক উক্তিতে এখানে কীর্তনের প্রতি ইঙ্গিত থাকা অসম্ভব নয়।

১২৫. দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৩৩-৩৬

১২৬. *Tuhfat* Eng. Trans. pp. 18-19 ; 'Second Appeal' *English Works* Pt. VI p. 13

১২৭. 'An Appeal to the Christian Public' *English Works* Pt. V p. 65 ; 'Second Appeal' *English Works* Pt. VI pp. 39-41

১২৮. The Brahmunical Magazine. (No. 1) ' ; Preface to the second edition : *English Works* Pt. II. p. 140

১২৮ ক. Chandrasekhhar Dev 'Reminiscences of Rammohun Roy'— তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃঃ ১৪০

১২৯. দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ; ৭০, ৭৭-৭৮

১৩০. J. Estlin Carpenter *Comparative Religion* pp. 24-25

১৩১. E. M. Wilbur *Our Unitarian Heritage ; An Introduction to the History of the Unitarian Movement* Boston 1925, p. 368

১৩২, *Majma-'Ul-Bahrain or the Mingling of the Two Oceans* edited with English Translation, by M. Mahfuz-ul-Haq (Bibliotheca Indica) Calcutta 1929, Introduction, pp. 12-14, 26-28; দুঃখের বিষয় জোহন ভান মানেন নামক এক অনধিকারীর রচিত একটি অনুপযুক্ত মুখবন্ধ এই অতি উৎকৃষ্ট সংস্করণ ও অনুবাদের কিছুটা উৎকর্ষহানি ঘটিয়েছে।

১৩৩. *Ibid*. pp. 28-29

১৩৪. রামমোহনের ধর্মবিষয়ক রচনা, বিশেষত 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওহাহিদিন্‌'-এর উপর 'দবিস্তান-ই-মজহব্‌'-এর সম্ভাব্য প্রভাবের বিষয়টি বর্তমানকালে প্রথম আলোচনা করেছেন শ্রীঅজিতকুমার রায় ক্যানবেরাতে ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনের ২৭তম অধিবেশনে পঠিত তাঁর 'Rammohun Roy's Tuhfat-ul-Muwahhidin and the 17th Century Persian Tract Dabistan-i-Mazhib' নামক প্রবন্ধে। লেখক অশেষ সৌজন্য সহকারে তাঁর প্রবন্ধের একখানি প্রতিলিপি আমাকে প্রেরণ করেছেন।

১৩৫. *The Dabisian or School of Manners* Translated from the original Persian by David Shea and Anthony Troyer, Vol II, Paris 1843, pp. 186-91, 238, 241, 246-88, etc.

১৩৬. অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের সন্তকবি, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৪-৩৫

১৩৭. ক্ষিতিমোহন সেন 'যোগক্ষেত্র ভারতের পূর্ণ সাধক রামমোহন' *The Father of Modern India: Commemoration Volume of the Rammohun Roy Centenary Celebrations 1933* Pt. II pp. 403-16, 'রামমোহন ও তাঁহার সমসাময়িক ভারতীয় সাধক' *Students' Rammohun Centenary Volume* (Bengali Section) পৃঃ ২৬-৩৯ ; 'যুগগুরু রামমোহন' বিশ্বভারতী পত্রিকা, দশম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৮ পৃঃ ১৯-৩৬

১৩৮. "ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনধারা বর্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দুমুসলমান খ্রীষ্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি।···আজকের দিনেও যে রামমোহন রায় আমাদের দেশে জন্মেছেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবীর, নানক, দাদূ ভারতের যে সত্যসাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেনি।"—রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা: ক্ষিতিমোহন সেন, দাদূ বিশ্বভারতী ১৩৪২ পৃঃ ৯, আরও দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ, ভারতপথিক রামমোহন রায় (রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংস্করণ ১৩৬৬), পৃঃ ১৭-১৮; 'ব্রহ্মসভা' বা 'ব্রাহ্মসমাজ' অভিধার সঙ্গে দাদূ প্রবর্তিত 'ব্রহ্মসম্প্রদায়'-এর নামসাদৃশ্যের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায় পৃঃ ১৮৮-৮৯)।

১৩৯. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৪৯-৫০ ; তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৩৫-৩৬

১৪০, *Progressive Movements*, No. 11 p. 18: এখানে ৯ মে ১৮১৯ অনুষ্ঠিত 'আত্মীয়সভা'র এক অধিবেশনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; তাতে দেখা যায় সভ্যগণ উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ, নিরর্থক খাদ্যাখাদ্যবিচার, বালবিধবার বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্যপালন,

বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি সর্ববিধ সামাজিক কুপ্রথার তীব্র নিন্দা করেছেন। কর্মজীবনে রামমোহন এর সবগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অবকাশ পাননি।

১৪১. H.J. Laski *The Rise of European Liberalism : An Essay in Interpretation* London 1947, pp. 18-19

১৪২. *Ibid.* p. 196

১৪৩. G. M. Trevelyan *English Social History* London 1962, pp, 363-64

১৪৪. এ-সম্পর্কে পঠিতব্য H J. Laski-র পুস্তিকা *The Socialist Tradition in the French Revolution* (Fabian Society Pamphlet Series) London 1930 ; অবশ্য উত্তরকালীন গবেষণার আলোকে লেখকের কোনও কোনও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনাসাপেক্ষ।

১৪৫. *Last Days* p. 130

১৪৬. ৩১ জুলাই, ১৮৩২ তারিখে উইলিয়ম র‍্যাথবোনকে লিখিত পত্র *English Works* Pt. IV p. 91

১৪৭, *Ibid.* p. 93

১৪৮. *Asiatic Journal* New Series Vol XII, September to December 1833, p. 212

১৪৯. G, D. H. Cole *The Life of Robert Owen* London 1930, pp. 266-92

১৫০. Bentham *Collected Works* (ed. J. Bowring) Vol. X pp. 570-71

১৫১. Alexander Bain *James Mill ; A Biography* London 1882, pp 363-64

১৫২. J. F. C. Harrison *Robert Owen and Owenites in Britain and America* London 1969, pp 32-36, 122-26

১৫৩. *Ibid.* p 208

১৫৪. L. T. Hobhouse *Liberalism* (Second Impression, London 1919) pp. 172-73

সপ্তম অধ্যায়

রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার চিন্তায় যে সর্বতোমুখী নবসৃষ্টির প্রেরণা দেখা দিয়েছিল তার প্রভাব, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি জাতীয় সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের বীজ বপন করেছে। রামমোহন কলিকাতায় স্থায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে (১৮১৪ কি ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে) তাঁকে কেন্দ্র করে একটি জিজ্ঞাসু মণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। এই গোষ্ঠীর মিলনকেন্দ্র ছিল রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'। কালক্রমে রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিশিষ্ট মতামত যখন পারস্পরিক আলোচনা ও গ্রন্থপ্রকাশের মাধ্যমে সুপরিচিত হয়ে উঠল তখন এঁদের কেউ কেউ শংকিত বা বিরক্ত হয়ে যেমন রামমোহনকে ত্যাগ করে গেলেন, তেমনি আরও অনেক অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক অনুসন্ধিৎসু শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগও দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে রামমোহন ও তাঁর অন্তরঙ্গগণ সমাজে যে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন ও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ভয়ের কারণ ও ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এতে সন্দেহ নেই। সমসাময়িক সাহিত্যে ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় রক্ষণশীল গোষ্ঠীর এই মনোভাবের প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। নবযুগের ভাববিপ্লবের বুনিয়াদ এইভাবে প্রতিষ্ঠা করেন রামমোহন। নবযুগের এই নূতন চিন্তায় একটি অতিরিক্ত ধারা সংযুক্ত হয় মোটামুটি বিগত শতাব্দীর কুড়ির দশক থেকে। উক্ত নবপর্বের পশ্চাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা কার্যকরী হয়েছিল তা হল মুখ্যত ২০ জানুয়ারী ১৮১৭ কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা এবং গৌণত, ঐ বৎসর ৪ জুলাই 'স্কুল বুক সোসাইটির ও পর বৎসর ১ সেপ্‌টেম্বর 'স্কুল সোসাইটির' আবির্ভাব। হিন্দু কলেজের শিক্ষা তরুণগোষ্ঠীর মনের মুক্তি তরান্বিত করে অতি অল্পকালের মধ্যে বঙ্গীয় ভাবরাজ্যে এক নব অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। 'স্কুল বুক সোসাইটি' ও 'স্কুল সোসাইটি' পরস্পরের পরিপূরক রূপে বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, পাঠশালাসমূহের উন্নতিসাধন, নূতন বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতির দ্বারা সাধারণের উপযোগী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে উচ্চতর জ্ঞানচর্চার যে উপযুক্ত

পশ্চাদ্ভূমি রচনার সহায়ক হয়েছিল তার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। জন্মের পর হিন্দু কলেজ বেশ কিছুকাল অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যাপন করেছিল। উত্তরকালে এর শিক্ষা ক্রমশ ছাত্রগণকে নবযুগের ভাবধারায় উদ্দীপ্ত করে তরুণ সমাজে এক মানসবিপ্লবের সৃষ্টি করে। এই পরিবর্তনের মূলে ছিলেন এখানকার প্রতিভাশালী তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। এঁর আয়ুষ্কাল স্বল্প, মাত্র তেইশ বৎসর (১৮০৯-১৮৩১)[১] ; হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার কালও সংক্ষিপ্ত—মাত্র পাঁচ বৎসর (১৮২৬—১৮৩১)। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁর উদ্দীপনাময় শিক্ষা যুবমানসে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা সত্যই বিস্ময়কর। এঁর সাক্ষাৎ ছাত্র ও প্রভাব-পরিমণ্ডলভুক্ত তরুণগোষ্ঠীই 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'নব্য বঙ্গ' নামে ইতিহাসে সুপরিচিত। অবশ্য 'ইয়ং বেঙ্গল' নামটি অনেক সময় সম্প্রসারিত অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেউ কেউ কলেজের উত্তর-ডিরোজিও পর্বের কিছু প্রতিভাশালী ছাত্রের প্রতিও এই অভিধা প্রয়োগ করেছেন। এই নামের প্রচলন ঠিক কবে থেকে হয়েছে জানা যায় না। ১২ এপ্রিল ১৮৪৮ তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই অভিধা শিরোনামরূপে ব্যবহার করেছিলেন।[২] যোগেশচন্দ্র বাগল এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'ক্যালকাটা রিভ্যু' পত্রিকার ষোড়শ খণ্ডে (১৮৫১) প্রকাশিত এক রচনায় 'ইয়ং বেঙ্গল' নামের প্রয়োগ দেখা যায় এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ডেভিড হেয়ার-স্মৃতিসভা'র এক অধিবেশনে কৃষ্ণদাস পাল 'Young Bengal Vindicated' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৩] তা ছাড়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন তরুণ নায়ক কেশবচন্দ্র সেন তাঁর রচিত এক পুস্তিকার নাম রেখেছিলেন 'Young Bengal-This is for you'।[৪] উল্লেখ্য যে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র স্বয়ং এই মণ্ডলী সম্পর্কে Young Calcutta অভিধা ব্যবহার করেছেন।[৫] এক অর্থে এ নামকরণ সার্থক, কেননা ডিরোজিওর প্রভাব প্রধানত তাঁর কলিকাতাস্থ ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুকলেজের যে ছাত্রবৃন্দ ডিরোজিওর শিক্ষায় বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-৫৭), চন্দ্রশেখর দেব (১৮১০-১৮৭০ ?), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৯৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), দক্ষিণারঞ্জন

মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৮৭), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৭-১৮৬৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১০-১৮৭০), মাধবচন্দ্র মল্লিক, দিগম্বর মিত্র (১৮১৭-১৮৭৯) প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ডিরোজিওর সাক্ষাৎ শ্রেণীভুক্ত ছাত্র ছিলেন ; কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী (ডিরোজিও অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ) তাঁর শ্রেণীভুক্ত না হলেও তাঁর ক্লাসে যেতেন, বক্তৃতা শুনতেন ও ক্লাসের বাইরে তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনায় সর্বদা যোগ দিতেন। এরা ছাড়া হিন্দু কলেজের পরবর্তী ছাত্রদলের মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতিকে ডিরোজিও সৃষ্ট ভাবপরি-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে সম্প্রসারিত অর্থে আমরা তাঁদের 'ইয়ং বেঙ্গল' আখ্যা দিতে পারি।

ডিরোজিওর ব্যক্তিত্ব ও তদানীন্তন ইংরেজি শিক্ষিত তরুণগোষ্ঠীর উপর তাঁর অসীম প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে প্রথমে মনস্বী অধ্যাপক-রূপে তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু আলোচনা আবশ্যক। ডেভিড ড্রামণ্ড প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মতলা একাডেমী'র মেধাবী ছাত্র হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হবার পূর্বেই সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন ; তাঁর রচিত ইংরেজি কবিতা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাণ্ডিত্য, স্বভাবমাধুর্য, শিক্ষাদানপ্রণালীর স্বকীয়তা, ছাত্রবাৎসল্য, বিশুদ্ধ চরিত্র, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলী অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে ছাত্রসমাজের গুরু, বন্ধু ও সর্ববিধ জ্ঞানচর্চায় প্রেরণার উৎস করে তুলেছিল। তার অন্যতম চরিতকার টমাস এড্‌ওয়ার্ড্‌সের ভাষায় : "The teaching of Derozio, the force of his individuality, his winning manner. his wide knowledge of books, his own youth, placed him in sympathy with pupils, his open, generous chivalrous nature, his humour and playfulness,

his fearless love of truth, his hatred of all that was unmanly and mean, his ardent love of India···his social intercourse with his pupils, his unrestricted efforts for their growth in virtue, knowledge and manliness producced an intellectual and moral revolution in Hindu society since unparalleled." ।[৬]

ডিরোজিওর শিক্ষাদানপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে—তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তিনি তাঁর ছাত্রগণকে সর্বদা সর্ববিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার জন্য উৎসাহ এবং কোনও প্রচলিত সংস্কারকেই বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে গ্রহণ না করবার পরামর্শ দিতেন। একদিকে যেমন মননের ক্ষেত্রে সর্বত্র যুক্তিমূলক জিজ্ঞাসা ও বিচারের প্রাধান্য স্থাপন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—অপর দিকে তেমনি সর্বপ্রকার শঠতা, ভণ্ডামী, মিথ্যাচরণ ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছাত্ররা যাতে বিশুদ্ধ ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হতে পারে সেদিকেও তিনি লক্ষ্য রাখতেন। তাঁর অন্যতম কৃতী ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র সাক্ষ্য দিয়েছেন : "Derozio appears to have made strong impression on his pupils as they regularly visited him at his house and spent hours in conversation with him. He continued to teach at home what he had taught at school. He used to impress upon his pupils the sacred duty of thinking for themselves—to be in no way influenced by any of the idols mentioned by Bacon, to live and die for truth—to cultivate and practise all the virtues, shunning vice in every shape. He often read examples from ancient history of the love of justice, patriotism, philanthropy and self-abnegation, and the way in which he set forth the points, stirred up the minds of his pupils. Some were impressed with excellence of justice, some with the paramount importance of truth, some with patriotism and some with philanthrophy. ।"[৭]

ডিরোজিওর ছাত্রগণ কেবল কলেজে নয়, ডিরোজিওর গৃহেও সমবেত হয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন এবং পাঠ্য বিষয় অনুশীলন বা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ছাড়াও ব্যক্তিগত নানা ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নিতেন। গুরু ও শিষ্যমণ্ডলীর উদ্যোগে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন ভাবে জ্ঞানচর্চার জন্য 'এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভার অধিবেশনগুলিতে দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনুশীলন হত, প্রতিমাপূজা জাতিভেদ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম, ইত্যাদি কোনও প্রসঙ্গই বাদ যেত না। এরই আদর্শে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আরও সাতটি বিতর্কসভা স্থাপিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে ডিরোজিও যুক্ত হয়ে পড়েন। ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গা স্কুলেও ডিরোজিওর ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ছাত্রসমাজ এখানেও তাঁর বক্তৃতা শুনবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই ভাবে ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় তাঁর তরুণ ছাত্রদল সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন বিচাবুদ্ধির উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত হন ও সর্ববিধ ধর্মান্ধতা ও যুক্তিহীন আচারপরায়ণতার উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। ক্রমশ তরুণ বয়সের ধর্ম অনুসারে এই প্রখর যুক্তিশীলতা তাঁদের বাক্যে ও আচরণে উগ্র নস্যাৎপ্রবণতারূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। হিন্দু সমাজের সমস্ত প্রচলিত সংস্কার ও বিধিনিষেধকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করে তাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ, সুরাপান, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রূপ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অমর্যাদা প্রভৃতি এঁদের আচরণ রক্ষণশীল সমাজের আশংকা ও ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু কলেজ-কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে যাঁরা সনাতনপন্থী তাঁরা আতংকিত হয়ে নানা ভাবে এই স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ রোধ করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এঁদের চাপে ছাত্রগণের 'পার্থেনন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয় ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণের পক্ষে ধর্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনা-মূলক সভা-সমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু দমননীতি ছাত্রগণের ডিরোজিও-সংসর্গ বন্ধ করতে পারেনি বা তাদের প্রগতিশীল মতামতের উগ্রতা বা সাময়িক উন্মার্গগামী মনোভাবও কিছুমাত্র প্রশমিত করতে পারেনি। রক্ষণশীল সমাজ ও এর পত্র-পত্রিকাগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে ডিরোজিত ও তাঁর শিষ্যবর্গ সম্পর্কে অর্ধসত্য ও মিথ্যায় মেশানো নানা নিন্দা-কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হলেন। অভিভাবকগণের মধ্যে অনেকে শংকিত হয়ে নিজ নিজ পরিবারভুক্ত ছাত্রগণকে

কলেজ থেকে সরিয়ে নিতে আরম্ভ করলেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে এই সংকটের কারণ গণ্য করে অধ্যক্ষসভার ২৩ এপ্রিল, ১৮৩১ তারিখের এক বিশেষ অধিবেশনে আত্মপক্ষসমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়েই কলেজের অধ্যাপক পদ থেকে তাঁকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর পদত্যাগ ভিন্ন ডিরোজিওর গত্যন্তর রইল না (২৫ এপ্রিল, ১৮৩১)। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কয়েক মাস তিনি সম্পূর্ণভাবে সংবাদপত্র ও সাহিত্যের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। পূর্ব হতেই তিনি 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন ; পদত্যাগের পর প্রথম অল্পদিন 'হেস্পেরাস' নামক একখানি পত্রিকা সম্পাদন করে, অতঃপর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'দি ইস্ট্ ইণ্ডিয়ান' নামক দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপক জীবনেই তিনি কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন ও তাঁর দুখানি কাব্যগ্রন্থ ('পোয়েম্স' ১৮২৭, 'দ্য ফকীর অব জাংগিরা' ১৮২৮) প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর মৃত্যু হয়। কলেজ ত্যাগের পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রিয় ছাত্রগণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগে ছেদ পড়ে নি।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ছাত্রগণের মনে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উন্মেষ-সাধনই শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিওর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি স্বয়ং বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা সর্ববিধ সমস্যার সমাধানে উপনীত হবার পক্ষপাতী ছিলেন। আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব যুক্তি উত্থাপিত করা যেতে পারে আনুপূর্বিক ভাবে সেগুলি বিদ্যার্থীদের সম্মুখে উপস্থিত করে তিনি বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার ও নিজস্ব বিচার-ভিত্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রেরণা তাদের মনে সঞ্চার করতেন। অধিকন্তু ডিরোজিওর আদর্শ ছিল নৈতিক সততা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা। যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তসমূহ আচরণের মাধ্যমে জীবনে রূপায়িত না হলে জীবনচর্যা সম্পূর্ণ হল না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এই ধারণা তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকেও প্রভাবিত করেছিল। সম্ভবত তাঁর ছাত্রগণ সকলেই হিন্দুসমাজভুক্ত হওয়ার কারণে (হিন্দু কলেজে তখন হিন্দু ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিলনা) ডিরোজিও-অনুপ্রাণিত তাঁদের যুক্তিবাদী সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার সমূহ। এ-সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এঁরা তিলমাত্র বিলম্ব করলেন না। হিন্দুধর্ম

যে এঁদের আক্রমণের প্রধান বিষয় ছিল সমসাময়িক সূত্রে তার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন: "The convulsion caused by Derozio was great. It pervaded almost the house of every advanced student. Down with Hinduism! Down with orthodoxy! was the cry everywhere...The junior students caught from the senior students the infection of ridiculing the Hindu religion and where they were required to utter mantras or prayers they repeated lines from the Iliad. There were some who flung the Brahmanical thread instead of putting it on. The horror of orthodox families was intensified—withdrawals of pupils took place.।"[৮] তিনি ডিরোজিওর শিষ্যমণ্ডলী সম্পর্কে আরও বলেছেন: "The uppermost thought was to expose Hinduism, and to renounce it.।"[৯] এ ছাড়াও ছাত্রদের আরও বহুপ্রকার উগ্র অসংযত আচরণের তালিকা দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী সমকালীন ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সংগ্রহ করে: "অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমাতে যাইত। তাহারা রাজপথে যাইবার সময় মুণ্ডিতমস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য "আমরা গরু খাই গো, আমরা গরু খাই গো" বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় ভবনের ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, 'এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি'—এই বলিয়া পিতা-পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।"[১০] এই হিন্দুধর্মবিরোধী মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে ৩ অকটোবর ১৮৩১ তারিখে 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত ডিরোজিও-শিষ্য মাধবচন্দ্র মল্লিকের এবংবিধ উক্তিতে: "If there be anything under Heaven that I and my friends look upon with most abhorrence, it is Hinduism.।"[১০] মাধবচন্দ্র এই মর্মে একখানি বাঙলা পত্রও ২৩ আশ্বিন ১২৩৮ (৮ অকটোবর ১৮৩১) তারিখের 'সমাচার-দর্পণ'-এ প্রকাশ করেন যাতে তিনি একই উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন: "...পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যদ্রূপ হিন্দুধর্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমাদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই। হিন্দুধর্ম কুকর্মের যদ্রূপ

কারণ তদ্রূপ অপর কুকর্মের কারণ জ্ঞান করিনা হিন্দুধর্মের দ্বারা যদ্রূপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করিনা এবং সর্বসাধারণ লোকের শান্তি ও কুশল ও সুখের হিন্দুধর্মে যেরূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রূপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝিনা। এবং অযুক্ত ধর্ম বিনাশার্থ আমাদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি, কি তোষামোদ কি ভয় কি তাড়না কোনও প্রকারেই আমরা ত্যাগ করিবনা।"[১১]

কেউ কেউ বলেছেন, ডিরোজিও প্রভাবিত হিন্দু কলেজের তৎকালীন আবহাওয়া কেবল হিন্দুধর্মের নয়, কোনও আনুষ্ঠানিক ধর্মেরই অনুকূল ছিল না—এমন কি খ্রীষ্টধর্মেরও নয়। এই উক্তি কিছুদূর সত্য। ডিরোজিও ছাত্রগণের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি উদ্রেক করতে চেষ্টিত ছিলেন, সুতরাং তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত তরুণগোষ্ঠী সকল ধর্মকেই যুক্তিবাদের নিকষে পরীক্ষা করবার পক্ষপাতী হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যত এঁদের হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণ যেমন হিংস্র ছিল তার তুলনায় খ্রীষ্টধর্মসমালোচনা তেমন কিছুই ছিলনা। এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি। তিনি বলেছেন, (ছাত্রাবস্থায়) তিনি ও তাঁর বন্ধুরা কলিকাতার পথে পথে যীশুর বাণী প্রচারের ভাণ করে মিশনারীদের বিকৃত বাঙ্‌লা ভাষা ও ভুল উচ্চারণ নকল করে তাঁদের প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করতেন।[১২] ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, এই বিদ্রূপ ও অশ্রদ্ধার লক্ষ্য খ্রীষ্ট বা খ্রীষ্টধর্ম ততটা নয়, যতটা অযোগ্য খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকের দল। বস্তুত ডিরোজিও-শিষ্যগণের বিরুদ্ধাচরণের ফলে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ যে পরিমাণ আহত ও বিপর্যস্ত হয়েছিল, খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সমাজ তা হয়নি। ডিরোজিও ধর্মবিষয়ে স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু সেজন্য তিনি খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করেছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। বরং সমসাময়িক সূত্রে এর বিরুদ্ধ সাক্ষ্যই পাওয়া যায়। ডিরোজিওর মৃত্যুপ্রসঙ্গে ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩২ সংখ্যা 'ক্যালকাটা গেজেট' সমসাময়িক Indian Register থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে, "His sentiments on religion he was not fond of obtruding on others, nor did he ever speak on that subject in that irreverent manner in which some foolishly indulge; on the contrary he had great respects for Christianity. and admired

the moral lessons which it inculcated. The Christian will not, therefore, be greatly surprised to learn, that when on his death bed, and probably aware of his situation, he desired the presence of a minister to pray with him and expressed his belief in the Redeemr's name.।"[১২ক] তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন শুভানুধ্যায়িগণের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক রেভাঃ জেম্‌স হিল ও ডঃ জন গ্র্যাণ্ট্‌। ডিরোজিওর প্রয়াণের অনতিপরে শেষোক্ত জন Calcutta Literary Gazette পত্রিকায় (১০ নভেম্বর ১৮৩৩ সংখ্যা) তাঁর সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সেখানে বলেছেন, "It was a source of great consolation to his friends that shortly before he expired his last words were an appeal to the great Fountain of all Mercy, and such as became a dying Christian····।"[১১] এর দশ বছর পরে The Oriental Magazine পত্রিকায় (প্রথম খণ্ড, দশম সংখ্যা অক্টোবর ১৮৪৩) ডিরোজিও সম্পর্কে একটি স্বাক্ষরহীন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; এটি সি, জে, মণ্টাগুর রচনা বলে অনুমিত।[৪] এখানে পূর্বোক্ত ঘটনার কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়: "On the Sunday preceding his death, the late Mr. J. W. Ricketts, the distinguished East Indian, came to see him. To him Derozio expressed a wish to see the Rev. James Hill, whose eloquence had before touched his heart. The Reverend gentleman came and it is consolatory to remark, that, in his last moments. Derozio confessed he was a Christian, and he died a believer in the saving faith of Jesus Christ.।"[১৫] দুটি বিবৃতির মধ্যে মিল লক্ষণীয়। উত্তরকালে Bengal Obituaryতে প্রকাশিত ডিরোজিওর সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনীতে Oriental Magazine এই অংশটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।[১৬] ডিরোজিওর অন্যতম জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ড্‌স (যাঁর গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) অবশ্য এই সমসাময়িক বিবরণগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি। তাঁর মতে ডিরোজিও মৃত্যুশয্যায় নিজেকে খ্রীষ্টের অনুগামী ও

খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী বলে স্বীকারোক্তি করেছিলেন এ কথা মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে এ সিদ্ধান্তও অনিবার্যভাবেই করতে হয় যে সারা জীবন তাঁর উক্ত ধর্মে বিশ্বাস ছিলনা; কিন্তু এমন অনুমান করার কোনও কারণ নেই: "That Mr. Hill, the congregational Minister, visited Derozio the Sunday before his death, that is, on the second day of his illness, and that he, as well as as J. W. Ricketts and others, spoke earnestly to the dying lad regarding the unseen realities that lie beyond the grave, was only natural and Christian like ; but that Derozio died in any other faith than that in which he lived, that is, a child-like confidence in the great loving spirit that formed his spirit, "and confessed that he was a Christain and he died a believer in the faith of Christ," is a statement that takes for granted that he lived and thought during his short life in antagonism to the teachings of Christ as he undertood these. This conclusion we venture to think cannot be accepted notwithstanding the statements that have been made regarding what passed between both Hill, J. W. Ricketts and Derozio।[১৭] এড্‌ওয়ার্ড্‌স এ-কথাও বলেছেন, ডিরোজিওর মৃত্যুর পর প্রচারিত হয়েছিল যে তিনি মৃত্যুশয্যায় কেবল মৌখিকভাবে নয় লিখিত স্বীকারোক্তির মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মে তাঁর বিশ্বাস জ্ঞাপন করে গিয়েছিলেন, কিন্তু ডিরোজিওর অন্তরঙ্গ বন্ধুমণ্ডলী বা শিষ্যগণের মধ্যে এই মর্মে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত স্বীকারোক্তি (confession) কেউই দেখেন নি ; এমনকি ডিরোজিওর প্রিয় শিষ্য মহেশচন্দ্র ঘোষ যিনি তাঁর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন এবং উত্তরজীবনে স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনিও এমন কোনও মৌখিক বা লিখিত স্বীকারোক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।[১৮] এড্‌ওয়ার্ড্‌সের মতে ডিরোজিওর আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসী কোনও কোনও অত্যুৎসাহী বন্ধুর প্রথাসম্মত আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্মমতে তাঁর বিশ্বাস প্রতিপন্ন করবার আগ্রহ থেকেই এ-সব কাহিনী উৎপন্ন হয়েছিল (The whole story seems to have arisen from the

laudable anxiety of some of his friends, to get from him some more definite avowal of religious convictions than he ever could see his way to formulate during his life, and in the course of conversation no doubt Derozio expressed himself, as in his calmer and more serious moments he would have done, in such a way as seemed to those anxious for his 'soul's welfare' to warrant them in declaring that Derozio died in the faith of Christ)।[১৯] এক্ষেত্রে এড্ওয়ার্ড্সের নিজের সিদ্ধান্ত ডিরোজিও খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, তবে তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও সত্যানুসন্ধিৎসা তাঁকে খ্রীষ্টীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রেখেছিল ; তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি আজীবন খ্রীষ্টের শিক্ষাকে শ্রদ্ধা করেছেন (Derozio lived in the faith and spirit of Christ as he undetstood that faith and life ; and in no other faith could he live of die···he read the life and teaching of Christ differently from others ;···)।"[২০] সুতরাং লেখকের মতে মৃত্যুকালে তাঁর পক্ষে নূতন করে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসজ্ঞাপন করার প্রশ্নই ওঠে না। ডিরোজিওর অপর জীবনীকার ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ্ ডিরোজিওর মৃত্যুকালীন খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসজ্ঞাপক জবানবন্দীগুলিব উল্লেখ করলেও তা নিয়ে কোনও তর্ক তোলেননি, প্রকারান্তরে সেগুলির সাক্ষ্য স্বীকার করেই নিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে উক্ত তথাকথিত স্বীকারোক্তিগুলির সাক্ষ্য হিসাবে মূল্য যাই হোক, ডিরোজিওর যে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি মূলত কোনও অনাস্থা বা বিরূপতা ছিল না এ বিষয়ে সমসাময়িক বিবরণকারগণ এবং পরবর্তী দুই জীবনীকারই একমত। তার সময়ে ডিরোজিও যে খ্রীষ্টীয় মহলে বিধর্মী বা নাস্তিক রূপে চিহ্নিত ছিলেন না এর একটি পরোক্ষ প্রমাণ, মৃত্যুর পর তাঁর দেহ খ্রীষ্টীয় পদ্ধতি অনুসারে খ্রীষ্টীয় সমাধিস্থানেই সমাহিত হয়—নাস্তিক বা খ্রীষ্টধর্মে অবিশ্বাসীরূপে গণ্য ডেভিড হেয়ারের ক্ষেত্রে মিশনারী সমাজের কাছ থেকে যার অনুমতি পাওয়া যায়নি।

ডিরোজিওর খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা না থাকলেও তিনি কখনও তাঁর ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা বা ধর্মবিষয়ক উপদেশ দেন নি এ-কথা সত্য। অবশ্য ধর্ম তাঁদের আলোচ্য বিষয়গুলির অন্যতম ছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের

মতই ধর্মীয় সিদ্ধান্তগুলিকে বিচারবুদ্ধির নিকষে পরীক্ষা করে নেবার জন্যই তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁর চূড়ান্ত ঝোঁকটি যেন ছিল নাস্তিকতার উপর নয়, আস্তিকতারই উপর। ২৬ এপ্রিল ১৮৩১ তারিখে উইলসনকে লিখিত তাঁর বিখ্যাত পত্রে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়: "I have never denied the existence of a God in the hearing of any human being····I am neither afraid, nor ashamed to confess having stated the doubts of philosophers upon this head, because I have also stated the solution of these doubts.··· And··· I can vindicate my procedure by quoting no less orthodox authority than Lord Bacon : 'If a man····will begin in certainties he shall end in doubt.' This I need scarcely observe, is always the case with contented ignorance when it is roused too late to thought. One doubt suggests another, and universal scepticism is the consequence. I therefore thought it my duty to acquaint several of the College students with the substance of Hume's celebrated dialogue between Cleanthes & Philo in which the most subtle and refined arguments against Theism are adduced. But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's *more acute replies to Hume-replies which to this day continue unrefuted.*" (Italics বর্তমান লেখকের)।[২১] এখানে ডিরোজিও স্পষ্টই বলছেন, ঈশ্বরে অস্তিত্ব তিনি কদাপি অস্বীকার করেন নি; এ বিষয়ে কিছু কিছু দার্শনিকের যে সন্দেহ আছে তার উল্লেখ করেছেন; সেই সন্দেহের নিরসন কি ভাবে হতে পারে তাও বলেছেন; বেকনের মতে সায় দিয়ে তিনি বলেন, প্রথমেই কোনও গোঁড়া বিশ্বাসের ভূমি থেকে যাত্রা সুরু করলে শেষ পর্যন্ত সন্দেহবাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। তিনি তাই প্রথমে তাঁর ছাত্রগণকে নাস্তিকতার স্বপক্ষে হিউমের অতি মার্জিত ও সূক্ষ্ম যুক্তিগুলির সঙ্গে পরিচিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে রীড্, ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ হিউমের মতের

বিরুদ্ধে যে গভীরতর ও সূক্ষ্মতর আপত্তিগুলি উত্থাপন করেছেন, তাও শিখিয়েছেন। শেষোক্তদের প্রতিযুক্তিগুলি তাঁর মতে আজ পর্যন্ত কেউ খণ্ডন করতে পারেন নি। দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত সমস্যাটি যাতে তাঁর ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে যুক্তি দ্বারা বিচার করে দেখেন সেই বিষয়েই ডিরোজিও সচেষ্ট ছিলেন; এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ঈশ্বরবিশ্বাসের স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি আছে সেগুলি উত্তমরূপে আয়ত্ত করে ছাত্ররা যেন নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদের ভূমি অতিক্রম করতে পারেন। উল্লেখ্য, যে নাস্তিকতার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে তদানীন্তন পাশ্চাত্য দার্শনিক জগতে প্রচলিত যুক্তিসমূহের মধ্যে তিনি বিপক্ষের যুক্তিগুলিকেই দৃঢ়তর মনে করেছেন। সুতরাং ডিরোজিওকে নাস্তিক বা তাঁর শিক্ষাকে নাস্তিকতার পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক বলে ধরে নেবার কোনও কারণ আছে বলে মনে হয় না। এই মনোভাবের সঙ্গে মিশেছিল খানিকটা জন্ম ও পরিবেশগত সূত্রে এবং অনেকখানি অধ্যয়ন ও বিচারের মাধ্যমে আহরিত খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা। ফলে পূর্ণ চিত্রটি পেতে অসুবিধা হয় না। ডিরোজিওকে প্রচলিত অর্থে 'ধার্মিক' কিছুতেই বলা যাবে না। তাঁর যদি ধর্মের, তথা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি কোনও আস্থা থেকে থাকে তা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত ও মুখ্যত বিচারবুদ্ধি নির্ভর এবং সর্ববিধ সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত অর্থহীন আচার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রতি তাঁর মত যুক্তিবাদী যে খড়্গহস্ত হবেন তা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁর জন্ম, পরিবেশ, মানসিক গঠন ও মতামতের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন তাঁর ও পরোক্ষত প্রথমাবস্থায় তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর প্রখর ও হিংস্র হিন্দুধর্ম সমালোচনার তুলনায় তাঁদের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আক্রমণ উল্লেখযোগ্য ছিল না।

বরঞ্চ দেখা যায় ডিরোজিও-শিষ্যমণ্ডলী কৃত হিন্দুধর্মের এই নিগ্রহে তৎকালীন কলিকাতার খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ উৎসাহিতই বোধ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কলিকাতায় নবাগত রেভাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ। এঁরা হিন্দুধর্ম ও সমাজকে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মের সবচেয়ে প্রবল বিরুদ্ধশক্তি মনে করতেন এবং হিন্দুধর্মকে উচ্ছেদ করে সমগ্র হিন্দুসমাজকে খ্রীষ্টধর্মান্তরিত করাই ছিল এঁদের প্রধান লক্ষ্য।[২২] এই ব্যাপারে মিশনারীপক্ষের হিসাব ছিল খুবই সোজা। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন ডিরোজিওর যুক্তিবাদী শিক্ষার ফলে তরুণ

হিন্দু ছাত্রদের মন থেকে তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধ বিদূরিত হয়ে যাবার ফলে তাঁদের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। আলেকজাণ্ডার ডাফ খ্রীষ্টীয় যাজক সম্প্রদায়ের তৎকালীন এই মনোভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন : "···we rejoiced in June 1830 when, in the metropolis of British India, we fairly came in contact with a rising body of natives who had learned to think and discuss all subjects with unshackled freedom—though that freedom was ever apt to degenerate into license in attempting to demolish the claims and pretensions of the Christian as well as every other *professedly revealed* faith. We hailed the circumstance, as indicating the approach of a period for which we had waited and longed and prayed. We hailed it as heralding the dawn of an auspicious era— an era that introduced something new into the hitherto undisturbed reign of a hoary and tyrannous antiquity····Enough that the enemy has at length been shaken out of his impregnable security—that he is urged to sound the trumpet of alarm—that he is compelled to rally his scattered and long slumbering forces and that he finds himself necessitated to prepare for the toil and the fierceness of a mighty conflict।" এই অবস্থায় কলিকাতার তদানীন্তন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়গুলি তাঁদের নিজস্ব গৃহ-বিবাদ ভুলে শিক্ষিত তরুণ হিন্দুসমাজের ধর্মবোধহীন চিত্তকে খ্রীষ্টধর্মের আওতায় আনবার জন্য ইংরেজিতে খ্রীষ্টধর্মের অনুকূলে বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন (Hence *first* originated the idea of instituting a systematic course of theological Lectures in the English language designed expressly for Educated Natives. The subject to be embraced were :—1st, The External and Internal Evidences of Natural and Revealed Religion, 2d, The proofs derived from

profane history, of the fulfilment of Scripture prophecy, as a source of evidence, which. it was supposed, the attainments and previous studies of the young men would prepare them to appreciate, 3d, The facts recorded in the four Gospels. as exhibiting the moral character of the Founder of Christianity, and the genius and temper of His religion; and 4thly, The doctrines of Revelaton."। ডাফের রচনা থেকে আরও জানা যায় তাঁর বাসগৃহ হিন্দুকলেজের সন্নিকটবর্তী হওয়ায় সেখানেই এই জনসভাগুলি অনুষ্ঠিত হয় (My home being conveniently situated, in the square of the Hindu College, it was agreed that there our public meetings should be held)।[২৩] ডিরোজিও-শিষ্যগণের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও সমগ্রভাবে মিশনারী সমাজের এই উদ্যম মোটেই তাঁদের আশানুরূপ ফল প্রসব করেনি। যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কেও এ কথা অবশ্যই বলা যায় ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে তাঁদের মন কুসংস্কার-মুক্ত ও যুক্তিবাদে অনুপ্রাণিত হওয়ায় এবং নৈতিক পুরুষার্থে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানোর ফলে, খ্রীষ্টধর্মে প্রবেশ তাঁদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। কৃষ্ণমোহন তৎসম্পাদিত Enquirer পত্রিকায় তাঁর মানসবিবর্তন প্রসঙ্গে লিখেছেন, হিন্দু কলেজের শিক্ষার প্রভাবে প্রথম তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও নাস্তিক হয়েছিলেন; এই অবস্থায় ডিরোজিও তাঁদের মধ্যে একটি মৌলিক শ্রেয়োবোধ ও উচ্চ নৈতিক আদর্শ সঞ্চারিত করেন; ফলে তাঁরা তাঁদের নাস্তিকতাসত্ত্বেও নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাস ফিরে পেলেন। এই রকম মনের অবস্থায় খ্রীষ্টধর্ম তাঁদের আশ্রয় দিল এবং তাঁরা ধন্য হলেন।[২৪] সুতরাং এই ধর্মান্তর গ্রহণের পশ্চাতে ডাফপ্রমুখ মিশনারীদের প্রচার অপেক্ষা ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাব কিছুমাত্র কম নয়। এড্ওয়ার্ডস্‌ও ও ম্যাজ্‌-ডিরোজিওর এই দুই জীবনীকারই সে কথা স্বীকার করেছেন।[২৫]

নিজ শিষ্যমণ্ডলীর আচরণের আতিশয্য সর্বাংশে ডিরোজিওর মনঃপূত ছিল কিনা সন্দেহ। হিন্দু কলেজ-কর্তৃপক্ষের অভিযোগের উত্তরে তিনি উইলসনকে পূর্বোল্লিখিত যে পত্র লেখেন তাতে তাঁর স্বাধীন চিন্তার জয়গানের সঙ্গে যথেষ্ট

সামঞ্জস্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর মনে যাই থাক তাঁর শিক্ষার সাময়িক প্রতিক্রিয়াই যে তৎকালীন 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর এই ব্যাপক নস্যাৎ-প্রবণতার জনক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এই সঙ্গে তাঁর শিক্ষার স্থায়ী ও সৃষ্টিশীল দিকটিকে বিস্মৃত হলে চলবে না। সর্বসংস্কারমুক্ত স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, অন্যায় অবিচার ও পাপের প্রতি ঘৃণা, বিশুদ্ধ নৈতিক মূল্যবোধ, উদার মানবপ্রীতি ও দেশপ্রেম ছাত্রগণের মনে তিনি সঞ্চার করেছিলেন। ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া গেজেট-এ প্রকাশিত এঁদের মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ক এক সমসাময়িক বিবরণের ভিত্তিতে জনৈক সাম্প্রতিক গবেষক লিখেছেন, "The radicals··· advocated social reforms and education, including female education and demanded freedom of thought and expression. Their views were influenced by the writings of Adam Smith. They demanded the abolition of monopoly, advocated freedom of trade and also supported the colonization of India by intelligent Europeans which they believed would contribute to the welfare of the country।"[২৬] ইণ্ডিয়া গেজেট-এর এই বিবরণটি "ইয়ং বেঙ্গল' দলের মুখপত্র Parthenon-এর ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা থেকে গৃহীত। এই ভাবে ডিরোজিওর শিক্ষার যুক্তিবাদী আবহাওয়ায় যে তরুণগোষ্ঠী গড়ে উঠলেন উত্তর কালে তাঁদের অনেকেই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে সমর্থ হয়েছিলেন।

উনবিংশ শতকীয় বঙ্গসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে কোনও কোনও মহলে এমন একটি ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠেছে যে, রামমোহন-সৃষ্ট প্রগতিশীল ভাবধারা এবং ডিরোজিও ও তৎপ্রভাবিত 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রবর্তিত যুক্তিবাদী মানসিকতা চিন্তারাজ্যের দুই সমান্তরাল প্রবাহ, এরা কোথাও পরস্পরকে স্পর্শ বা প্রভাবিত করেনি। কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে বলেছেন রামমোহন যে নব চিন্তার প্রবর্তক তাকে বলা যেতে পারে 'রিফর্মেশন' বা ধর্মসংস্কার, অন্য পক্ষে 'ইয়ং বেঙ্গল' সৃষ্ট ভাববিপ্লব হল 'রেনেশাঁস' বা নবজাগরণ। এই প্রসঙ্গে প্রযুক্ত বিদেশী শব্দ দুটি অবশ্যই ইউরোপের ইতিহাস থেকে ধার করা এবং সমগ্রভাবে বিচার করলে বোঝা যায় এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে দুটি ধারণা

নিহিত: (১) আধুনিক কালের ইউরোপীয় 'রেনেশাঁস' ও 'রিফর্মেশন' দুটি স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন ধারা; (২) রামমোহনের চিন্তার সঙ্গে মুখ্যত পাশ্চাত্য ধর্মীয় সংস্কার সংক্রান্ত চিন্তার যতখানি সাদৃশ্য, 'রেনেশাঁস' প্রসূত ভাবধারার তেমন নয়। জনৈক প্রবীণ ঐতিহাসিক এমন কথাও বলেছেন যে ডিরোজিওশিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত তরুণগণের রামমোহন কর্তৃক প্রভাবিত হবার কোনও সম্ভাবনাই ছিলনা, কেননা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন যখন ইংলণ্ড রওনা হন এঁরা সকলেই তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং এর একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী।[২৭] আরও বলা হয়ে থাকে, 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত যুবকদল সকলেই এসেছিলেন সমাজের মধ্যবিত্ত স্তর থেকে, কিন্তু রামমোহনের সমকালীন অনুবর্তিগণ প্রায়শ ছিলেন উচ্চবিত্ত ভূস্বামী; এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর ভাবধারা প্রসূত আলোড়ন যেহেতু মধ্যবিত্ত শ্রেণীজাত তাই তা সমাজকে স্বভাবত অধিক মাত্রায় প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তী ইতিহাসের সাক্ষ্যের সঙ্গে এইসব ব্যাখ্যার অধিকাংশের এতই গরমিল যে সমস্ত প্রশ্নটি একবার আদ্যোপান্ত যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

স্বভাবত আমাদের জানতে ইচ্ছা হয় রামমোহন ও ডিরোজিও পরস্পরের পরিচিত ছিলেন কি না। রামমোহন ডিরোজিত অপেক্ষা প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ। অবশ্য বয়সের এই ব্যবধান তাঁদের পরিচয়ের পথে অন্তরায় নয়। রামমোহনের অনেক অন্তরঙ্গ শিষ্যের সঙ্গেও তাঁর প্রায় ৩০/৩২ বৎসর বয়সের ব্যবধান ছিল।[২৮] বালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩ বৎসর বয়সেই রামমোহনের এত অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে করমর্দন না করে রামমোহন বিলাতযাত্রা করতে প্রস্তুত ছিলেন না।[২৯] ডিরোজিওর অন্যতম চরিতাখ্যায়ক ম্যাজ্ বলেছেন রামমোহন ও ডিরোজিও পরস্পর বন্ধু ছিলেন,[৩০] কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে কোন্ সূত্র থেকে তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা জানান নি; অপর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ড্স এ প্রসঙ্গে নীরব। সুতরাং এ বিষয়ে একটি জিজ্ঞাসাচিহ্ন থেকেই যায়।

সে যাই হোক রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিওর দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু মৌলিক পার্থক্য যে ছিল এতে কোনও সন্দেহ নেই। বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকে ডিরোজিও এবং তাঁর অনুবর্তিগণ রামমোহন ও তদীয় মণ্ডলী সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন তদনুযায়ী রামমোহন-গোষ্ঠী হলেন half-liberal বা

আংশিক ভাবে প্রগতিশীল। ডিরোজিও স্বয়ং এঁদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন ৫ আক্টাবর, ১৮৩১ সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া গেজেট' তার খানিকটা উদ্ধৃত করেছেন। ডিরোজিওর মন্তব্য এই রকম: "What his [Rammohun Roy's] opinions are neither his friends nor foes can determine. It is easier to say what they are not than what they are···· Rammohan, it is well known, appeals to the Vedas, the Koran and the Bible holding them in equal estimation extracting the good from each and rejecting from all whatever he considers apocryphal····He has always lived like a Hindoo···His followers, at least some of them, are not very consistent. Sheltering themselves under the shadow of his name they indulge in licentiousness in everything forbidden in the Shastras, as meat and drink, while at the same time they fee the Brahmins, profess to disbelieve Hindooism and never neglect to have Poojahs at home।[৩১] এই প্রসঙ্গে ডিরোজিও বিশেষভাবে প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে আক্রমণ করেন এই কারণে যে মুখে তিনি নিজেকে রামমোহন ব্যাখ্যাত ব্রহ্মবাদের অনুবর্তী স্বীকার করলেও স্বগৃহে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই নিয়ে সেকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কিছু বাদানুবাদ হয় ও ১৯ অক্টোবর ১৮৩১ সংখ্যা "ইণ্ডিয়া গেজেট"-এ প্রসন্নকুমারের পক্ষে বলা হয় যে তাঁর গৃহে দুর্গাপূজানুষ্ঠানের হেতু এ নয় যে তিনি প্রতিমাপূজায় বিশ্বাস করেন; তাঁকে অনিচ্ছা ও অবিশ্বাস সত্ত্বেও এ অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, কেন না প্রতি বৎসর পূজানুষ্ঠান করতে হবে এই সুস্পষ্ট সর্তে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বয়ং রামমোহনের বিরুদ্ধে ডিরোজিওর অভিযোগ বিশেষ গুরুতর নয়। তিনি কেবল বলতে চেয়েছেন, ধর্মবিষয়ে রামমোহনের মতামত স্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট নয়, তিনি সর্বশাস্ত্রের সারভাগকে সমান শ্রদ্ধা করেন ও অর্বাচীন অংশকে বর্জন করেন। আর একটি অভিযোগ যা কিছু অদ্ভুত শোনায়, তা হল এই, রামমোহনের জীবনযাত্রা হিন্দুর মত। রামমোহনগোষ্ঠীর অনেকের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, এঁদের মতে ও আচরণে মিল নেই; রামমোহনের ব্যক্তিত্ব

ও খ্যাতির অন্তরালে আশ্রয় নিয়ে এঁরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ সর্ববিধ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেন ও প্রকাশ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্মে অবিশ্বাস জ্ঞাপন করেন, অথচ নিজ নিজ গৃহ পরিবারে পুরোহিতগণকে দক্ষিণা দিয়ে প্রতিমাপূজার অনুষ্ঠান করতে দ্বিধা করেন না। রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তিগণের মধ্যে এখানে স্পষ্টত পার্থক্য করা হয়েছে। একথা সুবিদিত রামমোহন স্বয়ং প্রতিমাপূজা ও তৎসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন এবং সামাজিক ভাবেও এ-সকলে যোগ দিতেন না। অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারে অনুষ্ঠিত দুর্গা-পূজার নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখ্যানের নিদর্শনটিতো এ-সম্পর্কে বিখ্যাত হয়ে আছে।[৩২] অথচ বেদ-উপনিষদ্ প্রোক্ত ব্রহ্মবাদ ও একেশ্বরবাদের ভাবধারায় নিষিক্ত হয়ে তিনি নিজেকে হিন্দু বলতে দ্বিধা করেন নি—এই উদার ব্রহ্মবাদই ছিল তাঁর নিকট হিন্দুধর্মের সারবস্তু। উল্লেখ্য যে, রামমোহন ও তাঁর অন্তরঙ্গগোষ্ঠীভুক্ত অনেকের আচরণগত এই পার্থক্য তাঁদের রক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ৭ কার্তিক ১২৩৮ বঙ্গাব্দ (২২ অক্টোবর ১৮৩১) সংখ্যা 'সমাচার-দর্পণ', 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রিকা থেকে এই মর্মে যা উদ্ধার করেছন তা আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 'ইংরেজী ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম, পিতৃকর্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্রীরামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাঁহারা তদুপদেশে উক্ত কর্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত কালীনাথ মুনসী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইঁহার সর্বদা গমনাগমন আছে তথায় যে জ্ঞানো-পদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে বিলক্ষণ •মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটিতে শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ-দিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম বা কাম্যকর্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না ঐ বাবুর বাড়ীতে ৺দুর্গোৎসব ও ৺শ্যামাপূজা ও ৺জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে।"[৩৩] দুই দলই লক্ষ্য করেছেন রামমোহন ও তাঁর অধিকাংশ অনুবর্তীর মধ্যে জীবনচর্যার প্রভেদ। অবশ্য এর থেকে তাঁদের সমালোচনা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে।

ডিরোজিও-গোষ্ঠী সম্পর্কে রামমোহনের মতামত স্পষ্টভাবে জানবার সুযোগ আমাদের নেই। এঁদের চিন্তা ও কার্যক্রম দীর্ঘকাল অনুশীলন করবার সুযোগ তিনি পান নি, কেন না ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষকরূপে ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে যোগদান ও ১৮৩০-এ রামমোহনের ইংলণ্ড-যাত্রা। তবে ঈশ্বরবিশ্বাস রামমোহনের জীবনে মূলমন্ত্রস্বরূপ ছিল; তাই তাঁর নিকট সন্দেহবাদ বা নাস্তিকতার তুল্য মহা অনর্থ আর কিছু ছিল না। যে প্রতিমাপূজাকে তিনি কোনও ক্রমেই সহ্য করতে পারতেন না, তাকেও তিনি অন্ততপক্ষে নাস্তিকতা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব ছিল প্রায় মনীষী ফ্রান্সিস্ বেকনের মতই, যিনি বলেছিলেন, "I had rather believe all the fables in the Legend and the Talmud and the Alcoran than that this univesal frame is without a Mind···· It is true, that a little philosophy inclineth man's mind to Atheism, but depth in philosophy bringeth men's minds about to religion···"।[৩৪] সেই কারণে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত অনেক তরুণের প্রতিভা তিনি স্বীকার করে নিলেও, তাদের কারও কারও প্রথম পর্বের ধর্মবিশ্বাসহীনতা বা সর্বনস্যাৎপ্রবণতা যে তাঁর চিত্তকে ব্যথিত করবে তা স্বাভাবিক। তবে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে কোনও কোনও ক্ষেত্রে রামমোহনের মতপার্থক্য থাকলেও তাঁর প্রতি এঁদের যে সহানুভূতির সম্পূর্ণ অভাব ছিল না তার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ আছে। যথাস্থানে তা বিবেচ্য।

রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তিগণ সংক্রান্ত ডিরোজিওর বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর কিছুটা সত্য ও কিছুটা রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝবার স্বাভাবিক অক্ষমতা প্রসূত। রামমোহনের শিষ্যমণ্ডলীর বিশেষত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের-বিঘোষিত আদর্শে ও আচরণে মিল নেই-এই অভিযোগের বিচারপ্রসঙ্গে অবশ্য একটু সতর্কতা আবশ্যক। তখনকার হিন্দু যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থায় গৃহের পূজাপার্বণসমূহ পরিবারভুক্ত কোনও বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে ইচ্ছানুসারে বন্ধ করে দেওয়া সর্বদা সহজ ছিল না। এতে অনেক সময় আইনগত বাধাও থাকত। ডিরোজিওশিষ্য রামগোপাল ঘোষের গ্রামের বাড়ীতে দুর্গোৎসবানুষ্ঠানে রামগোপাল রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ বন্ধুবর্গকে নিয়ে যান। রাজনারায়ণের সাক্ষ্য অনুসারে রামগোপাল স্বয়ং বাড়ীর পূজানুষ্ঠানে

যোগ দেন নি, কেবলমাত্র পূজাশেষে শান্তিজল গ্রহণ করেছিলেন: কিন্তু তাঁর পরিবারে পূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিনি তাতে বাধাও দেন নি।[৩৫] সুতরাং বিশ্বাস ও আদর্শের সঙ্গে সামাজিক আচরণের গরমিলের জন্য যে সর্বদা রামমোহনশিষ্যরাই অপরাধী হতেন এমন কথা সম্ভবত সত্য নয়। তবে এটুকু স্বীকার করে নিয়েও অবশ্যই বলা চলে, রামমোহনের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে যাঁরা তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিলেন, মনীষা, আদর্শনিষ্ঠা, চরিত্রবল, ত্যাগ, তিতিক্ষায় তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক মানুষ রামমোহন অপেক্ষা অনেক নিম্নভূমিতে বিচরণ করতেন। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি তাঁদের যে আকর্ষণ ছিল না তা নয়—কিন্তু পরিপূর্ণভাবে তা অনুসরণ করতে হলে যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন তা তাঁদের চরিত্রে ছিল না। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বিত্তোপার্জন, পার্থিব সুখভোগ, বিষয়সম্পত্তি, সব কিছু বজায় রেখে যে শক্তি ও সময় উদ্‌বৃত্ত থাকত, সেটুকুই মাত্র তাঁরা দেশের ও সমাজের কল্যাণে ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে রামমোহনের অসাধারণ মনীষার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নানা বৈষয়িক ও সাংসারিক ব্যাপারে পরামর্শের জন্যও তাঁর শরণাপন্ন হতেন। রামমোহনের মণ্ডলীভুক্ত সকলের আন্তরিকতা যে গভীর ছিল না তার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রমাণ—রামমোহনের ইংলণ্ডগমনের পর এঁদের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করেন। মাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিয়মিত অর্থসাহায্য ও দরিদ্র পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিষ্ঠা পরবর্তী দশ বৎসর (১৮৩০-১৮৪০) ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোনও রকমে বাঁচিয়ে রেখেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এর ভার গ্রহণ করবার পর উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে এই সংঘে নবজীবন সঞ্চার হয়। এমন কি, রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তাঁর সর্ববিধ কল্যাণকর্মের সহায়ক দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত পুত্র দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যাচর্চা ও ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করেননি। রামমোহন স্বয়ং তাঁর আদর্শের জন্য যথেষ্ট দুঃখ ও নির্যাতন বরণ করেছিলেন, আততায়ীর ভয়ে তাঁকে সন্ত্রস্ত থাকতে হত, ও শেষ জীবনে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও নিঃস্ব অবস্থায় তাঁকে বিদেশে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাঁর বন্ধুরা অনেকেই দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতেন এবং বেগতিক দেখলেই বিপজ্জনক নৌকাটি পরিত্যাগ করে যেতেন। এঁদের সম্পর্কে ডিরোজিওর বিদ্রূপ সমালোচনা যে অনেক পরিমাণে যথার্থ সে-বিষয়ে সন্দেহ

নেই। ডিরোজিও স্বয়ং ছিলেন এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর আদর্শবাদে কোনও ছিদ্র ছিল না। আদর্শের জন্য ত্যাগস্বীকারে ও সামাজিক লাঞ্ছনাভোগে এরা কখনও পশ্চাৎপদ হননি, (যদিও এঁদের উপর সামাজিক উৎপীড়ন সাময়িক ছিল এবং উত্তরজীবনে এঁদের প্রায় সকলেই যথেষ্ট খ্যাতি, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন)। কিন্তু ডিরোজিও যেখানে half-liberal বলে রামমোহনের সমালোচনা করেছেন সেখানে তিনি রামমোহনের প্রতি সুবিচার করেন নি বা করতে পারেন নি। এর কারণ দুই মনীষীর নিজ নিজ অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত। ডিরোজিওর মানস মুখ্যত বায়রণীয় রোমান্টিকতার প্রভাবে গঠিত—তাঁর দার্শনিক যুক্তিবাদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে তাঁর রোমান্টিক মনোভাব প্রতিফলিত। তিনি যে তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে রামমোহনের মত নানা ভাষায় বিভিন্ন ধর্মমতের মূলানুসন্ধান ও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুশীলন করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তিনি যে দর্শনচর্চা করতেন, তা সমসাময়িক ইউরোপীয় দর্শনের এক বিশেষ ধারা-বেকন, হিউম, কাণ্ট ও সহজ জ্ঞানবাদী রীড্, ডুগাল্ড্ স্টুয়ার্ট্ ও ব্রাউনের রচনায় যা প্রকাশিত। অপর পক্ষে রামমোহন যেমন একদিকে বেকন, লক্ নিউটন. ভোলতেয়ার, হিউম, বেন্থাম মিল প্রভৃতির দার্শনিক রচনায় কৃতবিদ্য ছিলেন, তেমনি তাঁর ভারতীয় দর্শন (উপনিষদ-বেদান্ত-ন্যায়-মীমাংসা-তন্ত্র প্রভৃতি) ও ইসলামীয় যুক্তিবাদী দর্শনে ছিল গভীর প্রবেশ। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে ডিরোজিও ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইহুদী, খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান শাস্ত্রেও তাঁর যে বিশেষ অধিকার ছিল এমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়না। স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী হলেও এবং স্বল্পপরিসর জীবনে ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামালেও জন্মসূত্রে পাওয়া খ্রীষ্টধর্ম যে তিনি ত্যাগ করেননি তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। আমাদের স্বাদেশিকতার প্রথম কবিরূপে তিনি নমস্য। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ জ্ঞান করে স্বীয় কাব্যে গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছের। কিন্তু একথা বললে তাঁকে অসম্মান করা হয় না বা ইতিহাসকে লংঘন করা হয় না, যে তাঁর দেশভক্তিও অনেক পরিমাণে বায়রণীয় রোমান্টিক মনোবৃত্তি প্রসূত। ভারতবর্ষীয় জীবনচর্যার অন্তর্নিহিত চিরন্তন মূল্যবোধগুলির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবশত রামমোহন যে স্বাজাত্যবোধের অধিকারী হয়েছিলেন ডিরোজিও দেশভক্তি আন্তরিক হলেও তার মূল জাতীয়

সংস্কৃতির সেই গভীরে প্রবেশ করেনি, তার মধ্যে উচ্ছ্বাসের ভাগ ছিল বেশী। তাঁর ও তাঁর শিষ্যগণের শাণিত যুক্তিবাদের আক্রমণের প্রায় একমাত্র লক্ষ্যস্থল ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ। রামমোহন তাঁর পাণ্ডিত্য, দেশপরিচয় ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দ্বারা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সারভাগকে গ্রহণ করে অর্বাচীন অংশকে বর্জন করেছিলেন; কদাপি একথা গোপন করেন নি যে হিন্দুধর্মের যা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তারই উপর তিনিই স্বীয় জীবনচর্যাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বহু যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তিনি দেখাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন যে ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া বিশ্বজনীন, প্রত্যেক সভ্যতার ইতিহাসে তা প্রতিফলিত। এই পর্যায়ের বিচারবুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ডিরোজিও ও প্রথম পর্বে তাঁর শিষ্যগণ দিতে পারেন নি। হিন্দুধর্মের বর্তমান অধঃপতিত রূপটিই তাঁদের নিকট ছিল এর সমগ্র রূপ; বর্তমানে প্রচলিত নানা বিকৃত আচার ও কুসংস্কারের বাইরে হিন্দুসভ্যতায় যে মহৎ ও গ্রহণযোগ্য কিছু থাকতে পারে এমন ধারণা তাঁদের ছিল না। হিন্দুধর্মসংক্রান্ত সব কিছুই এই দৃষ্টিতে ছিল অশ্রদ্ধেয় ও বর্জনীয়,—দেশের ও সমাজের অধঃপতনের কারণ। এই কারণেই ডিরোজিওর লেখনী থেকে এমন অদ্ভুত অভিযোগ নির্গত হয়েছিল যে রামমোহন যথেষ্ট প্রগতিশীল (liberal) হতে পারেন না, কেননা তাঁর তাঁর জীবনযাত্রা হিন্দুর মত! রামমোহনের পক্ষে এমন মত পোষণ করা কখনও সম্ভব ছিল না। তিনি সমাজের আমূল সংস্কার চেয়েছেন, কিন্তু গভীর অনুশীলন ও প্রত্যক্ষ দেশপরিচয় হেতু নিজ সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি এমন একটি মমত্ববোধের অধিকারী হয়েছিলেন যে ডিরোজিওগোষ্ঠীর সর্বনস্যাৎকারী মনোভাব তাঁকে কোথাও স্পর্শ করেনি আমরা দেখেছি, তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজের অন্তঃস্থল থেকে সংস্কারের প্রেরণা জন্ম নিলে তবেই সেই প্রেরণা প্রসূত পরিবর্তন স্থায়ী হয়,—সব প্রচলিত ব্যবস্থা এক মুহূর্তে চূর্ণ বা নস্যাৎ করলে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয় মাত্র। অতীতের সঙ্গে আকস্মিক ছেদের প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের মত পরম্পরাগত ঐতিহ্য লালিত দেশে জনমানসে শেষ পর্যন্ত শুভকর হয় না—এই ছিল এদেশের সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মর্ম। বহু বৎসর পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী ভূমিকাস্বরূপ রামমোহন সম্পর্কে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্য করেছিলেন আজকের বিচারেও তার যাথার্থ্য অস্বীকার

করবার উপায় নেই : "রামমোহন রায় এমন অসাম্প্রদায়িক ও সার্বভৌমিক হইয়াও জাতীয় ভাব ত্যাগ করেন নাই।...তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে 'স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়' এবং আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।' এ জায়গায়ও আবার 'তিনি যদি কেবলমাত্র সার্বভৌমিক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন, তাহার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের যোগ কোথায় তাহা তলাইয়া না দেখিতেন, তবে তিনি জাতীয়ভাবে সার্বভৌমিক হইতে পারিতেন না। এবং এখানেই আবার ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্ট্‌দের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য কারণ তাঁহাদের সার্বভৌমিকতা জাতীয় ইতিহাসের পথে ফোটে নাই। তাঁহারা সমাজ ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে ব্যক্তিতন্ত্রতাকে (Individualism) অধিনায়ক করিয়াছিলেন। রামমোহন সেই ব্যক্তিতন্ত্রতার কর্তৃত্বের জন্য জাতীয় শাস্ত্রের একটা শাসনের প্রয়োজন অনুভব করিতেন। কিন্তু শাস্ত্রকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষিয়া তবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।......দেশকালের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন সার্বজনীন ধর্ম বা সমাজ আকাশকুসুম মাত্র; আবার যে ধর্মে বা সমাজে সার্বজনীনতার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহাও সংকীর্ণ বা প্রাণহীন।"[৩৬] জাতীয় শাস্ত্রের সারভাগ বিশ্বের অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত করে সবটুকুকে যুক্তিবিচারের দ্বারা পরিমার্জিত করে গ্রহণ করবার মনোভাব বুঝবার মত অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি ডিরোজিওর ছিল না। তাই তাঁর দৃষ্টিতে রামমোহন 'হাফ লিবারাল'। স্বীয় মনীষার প্রাখর্য সত্ত্বেও ডিরোজিও রামমোহনের প্রজ্ঞার গভীরতা বা দূরদৃষ্টির অধিকারী হননি।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যের প্রশ্ন বাদ দিলে কিন্তু সমস্ত রকম প্রগতিশীল প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যবর্গের সাধারণভাবে মতৈক্য ছিল। ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী পোষিত যে সব মতবাদের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়—(১) প্রগতিশীল সমাজসংস্কার (social reform) (২) শিক্ষাবিস্তার (education), বিশেষত নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার (female education); (৩) চিন্তার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা (freedm of thought and expression); (৪) অ্যাডাম

স্মিথ ব্যাখ্যাত অর্থনীতি সম্মত ব্যবসাক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার (monoply) বর্জন ও অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন (freedom of trade), (৫) ভারতে উঁচুদরের ইউরোপীয়গণ কর্তৃক উপনিবেশস্থাপন (colonization of India by intelligent Europeans which they believed would lead to the welfare of the country)। এই আদর্শসমূহের সব কয়টিই রামমোহনের চিন্তায় ইতিপূর্বেই রূপ গ্রহণ করেছে। প্রগতিশীল সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা এবং নারীর সম্পত্তিতে অধিকার স্থাপন প্রভৃতি কাজে রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অর্থনীতিবিদ্ ভবতোষ দত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্ভবত প্রভাবিত হয়েছিল সমকালীন তিনজন মনীষীর দ্বারা, এ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো ও মলথস।[৩৭] অবাধ বাণিজ্যনীতির একজন প্রকাশ্য ও উৎসাহী সমর্থক ছিলেন রামমোহন; আর ভারতে উন্নতচরিত্র বিশিষ্ট ও ধনবান ইউরোপীয়দের (Europeans of character and capital) উপনিবেশ স্থাপনের স্বপক্ষে প্রদত্ত তাঁর অভিমত তো সুবিদিত। তাই রামমোহনের চিন্তায় নিজেদের প্রগতিশীল আদর্শকে প্রতিফলিত দেখে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী রামমোহনের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান হবেন এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য এঁদের মধ্যে কেউ ব্যক্তিগত ভাবে কোনও কোনও প্রশ্নে রামমোহনের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। যেমন ১২ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ প্রকাশিত 'On the Colonization of India' শীর্ষক এক নিবন্ধ এঁদের দলভুক্ত এক তরুণ ভারতে ইউরোপীয় উপনিবেশ বিস্তারের শোষণমূলক দিকটি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছিলেন।[৩৮] রামমোহন 'সৎ' ও বিত্তশালী ইউরোপীয়গণের উপনিবেশ স্থাপন প্রস্তাবের গঠনমূলক দিকটির উপর এত বেশী জোর দিয়েছেন যে এর উল্লিখিত অমঙ্গলের সম্ভাবনাপূর্ণ দিকটি তাঁর দৃষ্টি তেমন ভাবে আকর্ষণ করে নি। কিন্তু এই মনোভাবকে ব্যতিক্রম বলা যায়। 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর নিজস্ব মুখপত্র Parthenon-এর ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যার উক্তি অনুসারে (যা ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া গেজেট উদ্ধৃত করেছেন ও বর্তমান প্রবন্ধে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) সাধারণভাবে উন্নত স্তরের ইউরোপীয়গণের ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন এঁদের অভিপ্রেত ছিল। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে

এঁদের কারও কারও সঙ্গে এই প্রশ্নে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকলেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে এই তরুণদলের আটকায়নি। এই প্রসঙ্গে ডিরোজিও-শিষ্য রামতনু লাহিড়ীর নিকট সংগৃহীত একটি মনোরম কাহিনী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রামমোহন জীবনীতে প্রকাশ করেছেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহবিরোধী আইন পাশ হলে যখন রামমোহন ও তাঁর সহযোগিবৃন্দ বেণ্টিংক্‌কে প্রকাশ্যে অভিনন্দিত করেন সেই সময় একদিন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ কলেজভবনে বসে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন—বেণ্টিংক্‌কে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের ইংরেজি রচনা রামমোহন রায়ের কি অ্যাডাম সাহেবের।[৩৯] এই সময় তাঁদের শিক্ষক ডিরোজিও উপস্থিত হলেন ও সব কথা শুনে কৌতুকমিশ্রিত তিরস্কারের ভাষায় তাঁদের বললেন "তোমরা কি মানুষ না এই দেয়াল? নারীহত্যারূপ এই ভীষণ প্রথা দেশ থেকে উঠে গেল কোথায় তোমরা আনন্দ করবে না অভিনন্দনপত্রের ইংরেজি কার লেখনীপ্রসূত সেই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত: রামমোহন ইংরেজিতে কিরূপ সুপণ্ডিত তা জানলে তোমরা ঐ রচনা এ্যাডাম সাহেবের বলে কিছুতেই মনে করতেনা।[৪০] কাহিনীর উৎস উক্ত ছাত্রগণের সতীর্থ স্বয়ং ডিরোজিও-শিষ্য পূতচরিত্র রামতনু লাহিড়ী, সুতরাং এর সত্যতা সন্দেহাতীত। এর মধ্যে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদলের রামমোহনের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে।

'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর যাঁরা প্রতিনিধিস্থানীয় তাঁদের কয়েকজনের বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে রামমোহনের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম অনুরাগের অপেক্ষাকৃত গভীর ও বিস্তারিত পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ, স্থিতধী ও ও যুক্তিনিষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন রামমোহনের একান্ত অনুরাগী যদিও রামমোহনের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। রামমোহনের মৃত্যুর পর ৫ এপ্রিল ১৮৩৪ কলিকাতা টাউন হলে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তিনি ছিলেন একমাত্র ভারতীয় বক্তা। রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই উপলক্ষে তিনি বলেন:
His like we will not see again. He arose amidst all horrors of superstition to proclaim that India was capable of much

better things than his countrymen themselves at that time imagined···The perusal of the Vedas opened his mind and induced him to reject superstition and to think of the future regeneration and improvement of his country. Along this line he proceeded further and further, till he accomplished many of those things which has made his name so famous. No doubt most of my countrymen still object to Rammohun Ray on account of the pre-eminent part he took in the abolition of Suttee. He was almost alone in the cause of humanity"। এরপর রসিককৃষ্ণ অগ্রসর হয়েছেন শিক্ষাবিদ্‌রূপে রামমোহনের মূল্যায়নে : "A point which Rammohun Ray had particularly at heart,was the education of his countrymen. In this matter his opinions were very correct and forcible. He maintained at his own expense a school at which Hindoo Boys were taught."। অতঃপর রসিককৃষ্ণ এই দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে এমন একজন মনস্বী শিক্ষাবিদ্‌কে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের চক্রান্ত হিন্দু কলেজের সংশ্রবে থাকতে দেয়নি—তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হতে পারত : "Not being held in that respect in which he should have been held by his bigoted countrymen he was prevented from doing all the good which he could otherwise have done. I allude to his not being allowed to join an institution in which he might have been of the greatest service to his country. If he had been permitted, his benevolent mind might have suggested many measures which might have done still greater benifit to his country."। হিন্দু কলেজ-পরিচালক সমিতিতে রামমোহনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করবার এক সুপরিকল্পিত রক্ষণশীল চক্রান্ত যে ক্রিয়াশীল ছিল তার সমসাময়িক প্রমাণ হিসাবে এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। লক্ষণীয় যে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভায় রামমোহনের অনুপস্থিতি এই

প্রতিভাশালী ডিরোজিওশিষ্যের নিকট নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়েছে। সর্বশেষে রসিককৃষ্ণ বলছেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনদ যদিও অনেক দিক দিয়েই জঘন্য,—ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক যা কিছু উৎকৃষ্ট শর্ত এতে সংযোজিত হয়েছে তা রামমোহনের একক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল (He went to England and to his going there we are in a great measure indebted for the best clauses in the new charter bad and wretched as the charter is...the few provisions that it contains for the good of our counrrymen we owe to Rammohun Roy)।[৪১] রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই সভা যে সমিতি গঠন করেন তার তিন জন ভারতীয় সদস্যের অন্যতম ছিলেন রসিককৃষ্ণ ও অপর দু'জন রুস্তমজি কাওয়াসজি ও বিশ্বনাথ মতিলাল। কিন্তু কেবল বাক্যে নয়, আচরণে ও চিন্তাতেও যে রসিককৃষ্ণ রামমোহনকে অনুসরণ করতেন তারও স্পষ্ট নিদর্শন আছে। রসিককৃষ্ণ কর্মজীবনে যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন যখন তিনি আদালতে জুরীর কর্তব্যপালনকালে প্রকাশ্যে গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই উপলক্ষে তিনি আদালতে ঘোষণা করেন, "I do not believe in the sacredness of the Ganges"। এটি সম্ভবত ১৮৩৪ সালের ঘটনা। এর ১৪।১৫ বৎসর পূর্বে রামমোহন রায়ের জনৈক অনুবর্তী আদালতে সাক্ষ্যদানকালে অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। জুলাই ১৮২০ সংখ্যা 'এসিয়াটিক জার্নাল' এই ঘটনার বর্ণনায় লিখেছেন: 'During the present sitting of the Supreme Court, a native in giving evidence on a case there-in pending, refused to take the oath in the usual manner, viz on the water of the Gunga. He declared himself to be one of the followers of Rammohun Roy, and in consequence not a believer in the imagined sanctity of the river ...We understand his simple affirmation was taken, as practised in England by the Society of Quakers"।[৪২] রসিককৃষ্ণও আদালতে এই simple affirmationই দিয়েছিলেন। সাময়িক কালের আলোড়নসৃষ্টিকারী এই পূর্বদৃষ্টান্ত যে তাঁর সংস্কারমুক্ত মনকে প্রভাবিত করেছিল

উভয় ঘটনার পারম্পর্য ও সাদৃশ্য বিচার করলে সে বিষয়ে বড় সন্দেহ থাকে না। রসিককৃষ্ণের চিত্তে রামমোহনের আদর্শ স্পষ্টতর রূপে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ধর্মমতে। আদালতে প্রচলিত প্রথায় শপথ গ্রহণে তিনি অস্বীকৃত হলে ২০ ডিসেম্বর ১৮৩৪ সংখ্যা 'ক্যালকাটা ক্যুরিয়র'-এ মন্তব্য করা হয়, প্রচলিত শপথ গ্রহণে তাঁর আপত্তির কারণ কোনও ধর্মেই তাঁর আস্থা নেই। এর উত্তরে রসিককৃষ্ণ বিবৃতি দেন, এক ঈশ্বরে তিনি গভীর বিশ্বাসী ও ঈশ্বরের নিকট তাঁর পবিত্র দায়িত্ব আছে এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। নিজ ধর্মমত কিছু বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি একটি খসড়া রচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার তিন সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়।[৪৩] এই নিবন্ধ প্রসঙ্গে উক্ত প্রতি সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য মুদ্রিত হয়েছে তা এই: "The following rough notes on religion left by the late Baboo Russik Krishna Mullick are the results of his enquiries and reflections for many years. These rough notes which he had no intention of publishing at least in the form in which they are presented, were written we believe in 1854 and 1855 at Burdwan without the aid of any works. In fact, he was totally ignorant of the publications by Chapman or of the works of Theodore Parker when he wrote the the notes and the sentiments expressed are entirely his own"। ধারাবাহিক এই রচনাটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় রসিককৃষ্ণ তাঁর ধর্মানুশীলনে ও ধর্মবিশ্বাসে রামমোহনের দ্বারা বিশেষত রামমোহন রচিত 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্'-এর বক্তব্যের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেখা যায় তিনি রামমোহনের মতই উদার সার্বভৌম একেশ্বরবাদে গভীর বিশ্বাসী। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি এইরূপ: (১) এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস মানুষের ধর্মজীবনের ভিত্তি; মানুষের এই বিশ্বাস জন্মগত ও স্বাভাবিক এবং এই বিশ্বাসের ভূমিতে সব মানুষই সমান; (২) বিভিন্ন দেশে ও কালে বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশধারা সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। পারিপার্শ্বিকের

প্রভাবহেতু কালক্রমে সকল ধর্মেই বিশ্বজীনন আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে প্রচুর কুসংস্কার ও হাস্যকর অন্ধবিশ্বাসের খাদ মিশেছে। ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল সত্যই গ্রহণীয়,—আবর্জনার সামিল অন্ধ বিশ্বাস ও যুক্তিহীন আচার সর্বথা বর্জনীয়; (৩) ধর্মকে বিশুদ্ধ ও কুসংস্কারমুক্ত করে অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা একমাত্র ব্যাপক লোকশিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। ধর্মসংস্কার বা reformation-এর এইটি একমাত্র পথ। যুগে যুগে বরণীয় লোকশিক্ষক ও ধর্মগুরুরা ধর্মের এই বিশুদ্ধীকরণ বা সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন; মানবজাতির এঁরাই শ্রেষ্ঠ হিতকারী ও পথপ্রদর্শক। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত মহামানবগণের মধ্যে আছেন, সোক্রাতেস, জরথুষ্ট্র, কনফ্যুসিয়াস, বুদ্ধ, ব্যাস, জনক, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য ও রামমোহন রায়। রামমোহন সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে রসিককৃষ্ণের উক্তি: "In our own day, too, with what persevering energy—what persecution did a Rammohun Roy labour to point out what he deemed the true sense of the Hindu Scriptures and hereby to extricate them from the gross puerilities with which a selfaggrandizing priesthood had encumbered it."। এই নিবন্ধ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, লেখকের দৃষ্টিতে রামমোহন সোক্রাতেস-বুদ্ধ-যীশুখ্রীষ্ট জরথুষ্ট্র-মহম্মদ পর্যায়েরই একজন লোকহিতৈষী ধর্মগুরু, অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম আধ্যাত্মিতকতার প্রবক্তা ও অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। রসিককৃষ্ণের অধ্যাত্মদর্শনে রামমোহনের প্রেরণা যে ক্রিয়াশীল 'হিন্দু পেট্রিয়ট্'-এ প্রকাশিত তাঁর এই সুদীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করলে সে বিষয়ে সংশয় থাকে না।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব সম্পর্কে বাগ্‌বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। এঁরা হিন্দুকলেজের ছাত্র, 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত, ডিরোজিও কর্তৃক অনুপ্রাণিত ও তাঁর অন্তরঙ্গমণ্ডলীর অন্তর্গত। তারাচাঁদ ছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের নেতৃস্থানীয়। তাঁর নাম যুক্ত করে 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' ঈষৎ বিদ্রূপভরে এই নব্য গোষ্ঠীর নাম দিয়েছিলেন 'চক্রবর্তী ফ্যাক্‌শন'। তারাচাঁদের কর্মকাণ্ড বিবিধ ও বিচিত্র। তিনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র (Society for the Acquisition of General Knowledge) স্থায়ী সভাপতি, 'মেকানিক্‌স ইন্‌ষ্টিট্যুট'-এর কার্যকরী সমিতির বিশিষ্ট সদস্য,

'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র অন্যতম সংগঠক, নব্যবঙ্গের মুখপত্র Bengal Spectator-এর প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতম পরিচালক-'Quill' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, বাংলা সংস্কৃত, ইংরেজি, হিন্দুস্থানী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত, মনুসংহিতা'র সম্পাদক এবং এদেশে প্রগতিশীল রাজনীতিচর্চার অন্যতম পথপ্রদর্শক। অপরদিকে তারাচাঁদ ছিলেন রামমোহনের পরমস্নেহভাজন শিষ্য। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে ইনি ও চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের দুই হস্তস্বরূপ গণ্য হতে পারেন। এঁদেরই পরামর্শক্রমে অ্যাডামের ইউনিটারিয়ান উপাসনাগৃহে নিয়মিত যাওয়ার পরিবর্তে রামমোহন সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনার নির্বাহহেতু এক নিজস্ব গৃহের ব্যবস্থা করেন ও ব্রাহ্মসমাজ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের রূপ পায়।[৪৩] রামমোহন কর্তৃক ১২৩৫ বঙ্গাব্দে (১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ৬ ভাদ্র ১২৩৫ বঙ্গাব্দে (২৩ আগষ্ট ১৮২৮) অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অধিবেশনে আচার্যরূপে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তারাচাঁদই তা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ মুদ্রিত করে রামমোহন ইউরোপীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।[৪৫] এই সকল ঘটনা রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তারাচাঁদের গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা সূচিত করে। চন্দ্রশেখর দেবের সঙ্গেও রামমোহনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনিও প্রথম যুগে ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত কিছু উপদেশাদির ইংরেজি অনুবাদ করেন। শেষ জীবনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'Reminisecences of Rammohun Roy' শীর্ষক ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি তাঁর গুরু রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।[৪৬]

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। সম্ভবত সেই কারণে রামমোহনের প্রতি তাঁর মনোভাব আলাদা করে বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন কোনও আধুনিক গবেষক অনুভব করেন নি। এটা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক যে নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানের পক্ষে রামমোহনের মত প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম-সমালোচকের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি পোষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আদ্যোপান্ত আলোচনা করলে যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় তা এই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হিসাবে রামমোহনের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের স্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল। তা কোথাও তিনি গোপন করেন নি। রামমোহন

যে তাঁর পাণ্ডিত্য, মনীষা ও দূরদৃষ্টি সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন নি, হিন্দুধর্মকে সংস্কারযোগ্য মনে করেছেন, বেদান্তকে জীবনদর্শনরূপে গ্রহণ করেছেন ও প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের কার্যাবলীর সমালোচনা করেছেন—তা কৃষ্ণমোহনকে পীড়া দিত। স্বসম্পাদিত Enquirer পত্রিকায় এ জন্য তিনি রামমোহনকে সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। তাঁর মতে হিন্দুধর্ম এতই জঘন্য যে রামমোহনের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেও একে যুক্তিসঙ্গত প্রতিপন্ন করা অসম্ভব (for really such is the visage of Hinduism that it was impossible even for so talented an individual in spite of all his efforts, to cast a veil of rationality on it); হিন্দুধর্মের কোনও সংস্কার সম্ভব নয়, দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য চাই হিন্দুধর্মরূপ বৃক্ষটির সমূল উৎপাটন (Braminism···may therefore be called a corrupt tree planted in the midst of the country··· If a person wishes to benefit the poor Hindus he must lay the axe at the root of this tree. While it exists good fruits cannot be expected)। [৪৭] রামমোহন এবং তাঁর অনুবর্তিদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন নিজগুরু ডিরোজিওর মতই তফাৎ করেছেন এবং শেষোক্তদের তাঁদের স্ববিরোধী আচরণের জন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনাও করেছেন। বাইবেলের শিক্ষা ও হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশকে একই ভূমিতে স্থাপন করবার জন্য তিনি রামমোহনকে ক্ষমা করেন নি।[৪৮] কিন্তু এ-সব কিছু আশ্চর্য নয়, একজন স্বধর্মনিষ্ঠ খ্রীষ্টানের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এরই পাশাপাশি লক্ষ্য করতে হবে, প্রথম থেকেই তিনি স্বয়ং দৃঢ় ও দ্বিধাহীন ভাবে রামমোহনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করে গিয়েছেন। প্রিভি কাউনসিল রক্ষণশীল হিন্দু নেতৃবৃন্দের সতীদাহ-উচ্ছেদ-আইন বিরোধী আবেদন অগ্রাহ্য করলে এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে ১০ নভেম্বর ১৮৩২ কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থ ব্রাহ্মসমাজভবনে ভারতীয় ও ইউরোপীয় নাগরিকবৃন্দের এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সতীদাহ-বিরোধী সংগ্রামের সেনাপতি রামমোহনকে সতীদাহ-উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে কৃত তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাব উত্থাপন করেন চন্দ্রশেখর দেব ও এর সমর্থনে দীর্ঘ ভাষণ দেন শ্যামলাল ঠাকুর ও কৃষ্ণমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সংবাদ-কৌমুদী'তে প্রকাশিত এই সভার যে বিবরণ ২৪ নভেম্বর ১৮৩২ সংখ্যা ইংরেজি-সংস্করণ 'সমাচার-দর্পণ'-এ উদ্ধৃত হয়েছে তাতে প্রকাশ: "Baboo Chandra Sekhar Deb then moved that as the Raja had devoted much labour to this matter thanks were likewise due to him. The motion was seconded by Baboo Shyamlal Thakoor and agreed to by all with great satisfaction. Sreejut Krishna Mohan Banerjee spoke at great length on this topic, and greatly enlarged on the zealous endeavours of the Raja for the abolition of the evil practices and customs of the country."।[৪১] দেখা যাচ্ছে রামমোহনের জীবদ্দশাতেই তিনি তাঁর সতীদাহবিরোধী সংগ্রামের জন্য কলিকাতায় প্রকাশ্য জনসভায় অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং এই অভিনন্দন প্রদানের ব্যাপারে অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম দুই ডিরোজিওশিষ্য চন্দ্রশেখর দেব ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শ্রদ্ধা কৃষ্ণমোহন আজীবন পোষণ করে গিয়েছেন। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে (১৮৪৫) কৃষ্ণমোহন 'The Transition States of the Hindu Mind' শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই রচনার অন্তর্ভুক্ত তাঁর রামমোহনের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের দৃষ্টি যথেষ্ট পরিমাণ আকর্ষণ করে নি। কৃষ্ণমোহন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক, ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল না, সুস্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি বিশেষ ব্যঞ্জনাপূর্ণ: 'The name of Rajah Rammohun Roy cannot be unknown to any in Europe or Asia. Endowed with a vigour of mind and acuteness of intellect far above his age, this extraordinary personage sought to reform the faith and the worship of his countrymen by the introduction of European ideas and customs and the translation and composition of religious tracts, not only in the vulgar dialect of Bengal, but also in foreign or what his predecessors would have

designated the Mletcha vocables of English. This gave rise to a new era in native opinions. The Brahmo Samaj which he established on the Chitpore road, tore up for the first time in India the sacred veil that had enveloped the Vedas. That which the primitive Brahmins had accounted as too holy to be publicly exposed-into which the Sudra and the woman and even the unconsecrated or degraded Brahmin were forbidden to pry, was now read and translated to crowds of wondering hearers in the Vedantic chapel. Exposition of the ancient scripture which would have filled Manu and Vyasa with horror, were now boldly put forth as their true interpretation. A new picture of Hinduism was presented totally distinct from the old...Rammohun Roy's memory we cannot but venerate. A patriot and a philosopher and that in the true sense of the words he certainly was...Possessed as he was of a moderate fortune the liberality with which he spent it in the service of his countrymen, was a noble evidence of his regard for their improvement. His pecuniary sacrifices were only equalled by his sacrifice of his personal exertions. Never did a man labour more indefatigably as an amateur reformer. Never did we see a voluntary instructor of his species more untiring in his efforts to do good Nor have we ever heard of an individual who could embody like Rajah Rammohun Roy the thoughtful patience of a philosopher, the disinterested energy of a patriot and the courtesy and amiability of the gentleman. It is impossible for us not to honour the memory of such a character. But it is equally impossible for us not to regret that he so hastily considered

the rejection of Hinduism to be incompatible with his patriotism ; that from the beginning of his career he contracted a strange jealousy against Christian missionaries⋯ He has conferred benefits which India can never forget. He has imparted an impetus to free enquiry which must sooner or later lead to the knowledge of truth. He has inflicted a blow upon the corrupt and superstitious fabric idolized by his countrymen which must eventually cause its destruction।"[৫০] সুস্পষ্ট ধর্মীয় মতপার্থক্য সত্ত্বেও রামমোহন তরুণ কৃষ্ণমোহনের চিত্তকে কি পরিমাণ আলোড়িত করেছিলেন—এই বিবৃতিতে তা প্রকাশিত। সম্ভবত রামমোহনের মণ্ডলীভুক্ত সমসাময়িকগণের মধ্যেও বেশী লোক তাঁর সম্পর্কে এমন অকুণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেন নি।

মৃদুস্বভাব, বিনয়ী, মিষ্টপ্রকৃতি অথচ দৃঢ়চরিত্র শিবচন্দ্র দেব ডিরোজিওর অতি প্রিয় এবং সম্ভবত সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্র ছিলেন, এবং 'নীতির উৎপত্তি' শীর্ষক তাঁর রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের জন্য ডিরোজিও তাঁকে স্বয়ং বিশেষ পুরস্কার দিয়েছিলেন (১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮২৯)।[৫১] ছাত্রাবস্থা থেকেই রামমোহনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। তাঁর সংক্ষিপ্ত ইংরেজি আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, "When I was studying in the 4th class of the late Hindu College under the tution of Mr. D'Rozio, religious discussions were carried on under his guidance both in and out of the College, the result of which was that my faith in the Hindu Religion was gone and I became a believer in one God, or in other words a Deist"।[৫২] মনের এই অবস্থায় ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি কলিকাতায় রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন, এবং উত্তরকালে (১৮৫০) বিধিপূর্বক ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সবকটি পর্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিয়ন্ত্রিত আদি ব্রাহ্মসমাজের তিনি সভ্য ছিলেন; পরে যখন কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয়

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, (১৮৬৬) শিবচন্দ্র বিবেকের অনুপ্রেরণায় কেশবের অনুগামী হন; শেষপর্যন্ত তাঁকে দেখা যায় কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে তরুণ প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণের বিদ্রোহের নায়করূপে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের (প্রতিষ্ঠিত ১৮৭৮) তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা, প্রথম সম্পাদক ও উত্তরকালীন সভাপতি। রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা স্মরণে রেখেই শ্রীমতী সোফিয়া ডবসন কলেট তাঁর ইংরেজি রামমোহন-জীবনী প্রণয়নকালে এই আদি-পর্বের তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য তাঁর সঙ্গে পত্রবিনিময় করেছিলেন। এ বিষয়ে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারী ও ১০ এপ্রিল শ্রীমতী কলেটকে লিখিত দু'খানি পত্রে তিনি রামমোহনকালীন ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন।[৫০] কর্মস্থল মেদিনীপুর ও জন্মস্থান কোন্নগরেও তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ডিরোজিওর শিক্ষা তাঁর চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, দেখা যায় উত্তরকালে রামমোহনের জীবনদর্শনে সেই মুক্ত চিত্ত আশ্রয় পেয়েছে।

ডিরেজিও-মণ্ডলীর অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক প্যারীচাঁদ মিত্র (বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে টেকচাঁদ ঠাকুররূপে পরিচিত) গুরুর শিক্ষায় ও সাহচর্যে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও কখনও ধর্মবিশ্বাস হারান নি। তবে গুরু-প্রসাদে সর্বদা স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল হবার যে শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন—তার ফলে উত্তরকালে তাঁর জীবনদর্শনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জীবনে প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজা ও লৌকিক আচারে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু কালক্রমে তিনি প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। এ বিষয়ে স্বরচিত On the soul : Its Nature and Develpmont (১৮৮১) গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর নিজসাক্ষ্য এই: "I was born in 1814 and was brought up as an idolator. I received my education at the Hindu College. I came in contact with a number of congenial friends with whom I had periodical discussions on metaphysics, theology, politics and other subjects. My desire to understand God and his Providence was earnest from my reading of standard works on those subjects and theistic and Christian authors,

as well as Arya works in Sanskrit and Bengali, produced a living conviction that there is but one God of infinite perfection. I became a theist or a Brahma"।[৫৪] তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেবের মত ছাত্রাবস্থায় রামমোহনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল কি না তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু উক্ত ভূমিকায় যে Arya works in Sanskrit and Bengali-র প্রসঙ্গ আছে তার এক উল্লেখযোগ্য অংশ যে রামমোহন রায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সম্পাদিত ও অনূদিত শাস্ত্রগ্রন্থ ও ব্যাখ্যানাদি এর পরোক্ষ প্রমাণ প্যারীচাঁদের 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) প্রভৃতি গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। 'যৎকিঞ্চিৎ'-এর প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে রামমোহন রচিত সুপরিচিত ব্রহ্মসংগীতের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে:

'ভাব সেই একে
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।'[৫৫]

উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোভাগে স্থান পেয়েছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সংস্কৃত ব্রহ্মসংগীতের প্রথম পঙ্‌ক্তি 'পরিপূর্ণমানন্দম্'।[৫৬] ষষ্ঠ অধ্যায়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি বচন ৪. ৩. ৩২) উদ্ধার করে তার যে বঙ্গানুবাদ যোজন করা হয়েছে তা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থ থেকে নেওয়া;[৫৭] এবং তার কিছু পরে উদ্ধৃত কেনোপনিষদের (১, ৪) বচনটির ক্ষেত্রেও তাই।[৫৮] 'যৎকিঞ্চিৎ' গ্রন্থের উপসংহারে প্যারীচাঁদ ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন: "এই ধর্ম বিশ্বব্যাপক—স্বাভাবিক,—শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে না। যদি কোন কারণবশাৎ ইহা শ্রেণীবদ্ধ হয় তবে পরে স্বীয় স্বভাবজন্য ঐশ্বরিক ভাব ধারণাপূর্বক শ্রেণীনাশক ও সর্বব্যাপক অবশ্যই হইবে। দিবাকর পর্বতের পার্শ্বে উদিত হইলে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু পরে কে না দেখিতে পায়? আত্মার প্রকৃত ভাবেতেই এই ধর্মের প্রকাশ—ইহার গতি অদ্রুত অথচ নিশ্চয়। প্রস্তরভেদী বারির ন্যায় ইহার কার্য—আপনার আনুকূল্য আপনিই করে ও যে ধর্ম যিনিই অবলম্বন করুন তাহা শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, ইহকালে বা পরকালে হউক ইহার সোপান অবশ্যই হইবে। এ ধর্ম সমুদ্রস্বরূপ—অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নদনদী স্বরূপ যত ধর্ম আছে তাহা কালেতে এই ধর্মেতে বিলীন হইবে। এই ধর্মই নিত্যধর্ম—এইই সত্যধর্ম—এইই

ব্রাহ্মধর্ম।[৫৯] এই প্রসঙ্গে প্যারীচাঁদের 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১) শীর্ষক ব্রহ্মসংগীত পুস্তকখানিও বিবেচ্য। এটি প্রতিপদে রামমোহনের 'ব্রহ্ম সংগীত' (১৮২৮)-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মবিশ্বাসে ব্রাহ্ম হলেও ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ মতসংঘর্ষে প্যারীচাঁদ কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। তাঁর রচনাবলী স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়—আত্মাতে পরমাত্মার পূর্ণ উপলব্ধিকেই তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোৎকর্ষ জ্ঞান করেছেন। পরিণত বয়সে পরলোকচর্চা, থিয়সফি, যোগসাধন প্রভৃতি রহস্যময় আধ্যাত্মিক মার্গের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখা গেলেও তিনি কখনও একেশ্বরবাদ ও ব্রহ্মবাদে বিশ্বাস হারান নি—যেমন পরিণত বয়সে যথেষ্ট পরলোকচর্চা করেও শিশিরকুমার ঘোষ বৈষ্ণবধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা অটুট রেখেছিলেন। বস্তুত ডিরোজিওর অনুপ্রেরণার পরিপূরকরূপে রামমোহনের ভাবধারায় উত্তরণের আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্যারীচাঁদ মিত্র।

শান্ত, সাত্ত্বিকতার প্রতিমূর্তি রামতনু লাহিড়ী সম্পর্কে অধিক কিছু বলা বাহুল্য। ইনি মনীষায় তাঁর সমকালীন সুহৃদ্‌বর্গ ডিরোজিওর অন্যান্য নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের সমকক্ষ না হলেও চরিত্রবলে, সত্যনিষ্ঠায় ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অর্থহীন আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে, স্বভাবের মৃদুতা সত্ত্বেও ইনি অগ্রণী। ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও ইনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মদের মধ্যে সর্বপ্রথম (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে) উপবীত ত্যাগ করেছিলেন।[৬০] তাঁর সমকালীন ব্রাহ্মসমাজে তখনও উপবীত বর্জনের পক্ষে ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন আরম্ভ হয় নি। রামতনু এবিষয়ে পথপ্রদর্শন করবার পরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে গোরিটি(পলতা)র উদ্যানে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সম্মিলনে ব্রাহ্মগণের উপবীত ত্যাগের প্রস্তাব আলোচিত ও সমর্থিত হয় এবং তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের অত্যগ্রসরদলভুক্ত রাখালদাস হালদার উপবীত ত্যাগ করেও পিতার তৃপ্তির জন্য তা পুনরায় গ্রহণ করেন।[৬১] উপবীত বর্জনের আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজে প্রবল হয়ে ওঠে উনবিংশ শতকের ষাঠের দশক থেকে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এ-ব্যাপারে রামতনু লাহিড়ীই পথপ্রদর্শক। যতদূর জানা যায় ব্রাহ্মসমাজে প্রথম যুগে প্রচলিত আপ্তশাস্ত্রে বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও প্রথম প্রতিবাদ করেন রামতনু। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচ্য। ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করলেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ কলহ-

বিবাদ থেকে সর্বদা দূরে থেকেছেন। ডিরোজিও ও রামমোহনের মধ্যে এই অতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বটি সুনিশ্চিত রূপেই আর এক যোগসূত্র।

দক্ষিণারঞ্জন (বা দক্ষিণানন্দ) মুখোপাধ্যায় ছিলেন ডিরোজিও-শিষ্যগণের মধ্যে সম্ভবত সর্বাধিক দুঃসাহসী ও রোম্যান্টিক প্রকৃতির মানুষ। ডিরোজিওর প্রিয় শিষ্য ও পারিবারিক মিত্র এবং ডেভিড হেয়ারের প্রীতি ও আস্থাভাজন এই যুবক তরুণ বয়সে কেবলমাত্র সমাজব্যবস্থায় বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি; বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর সঙ্গে তাঁর রোমান্স্-এর পরিণতিস্বরূপ উভয়ের সিভিল বিবাহ সে-যুগের সুপ্রসিদ্ধ জন-চিত্ত-আলোড়নকারী ঘটনা। এই বিবাহ একাধারে বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ। তরুণ বয়স থেকেই তিনি রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে যে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় সে-সংক্রান্ত সমসাময়িক বিবরণে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণারঞ্জন পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়েছেন।[৬১ক] উত্তর জীবনে দক্ষিণারঞ্জন লক্ষ্ণৌপ্রবাসী হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের এক বিবরণ রেখে গিয়েছেন তাঁর সুহৃদ রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিত'-এ। রাজনারায়ণের সাক্ষ্য এই: "দক্ষিণাবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ্ পাঠ ও সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্তব্য মনে করিতেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে অহিন্দু জ্ঞান করিতেন··দক্ষিণারঞ্জন উপনিষদ্‌কে এত মান্য করিতেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন না।···কিন্তু উপনিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া উচিত এমন মনে করিতেন। তাঁহাকে ঔপনিষদিক ব্রাহ্ম বলিলে হয়। প্রণবের প্রতি আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা দক্ষিণাবাবুর সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতেন, তখন তাঁহার চাপরাসীদিগকে 'ওঁ' অংকিত তকমা পরাইতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্যের ভার···নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন সেই উপলক্ষে এক ঘোষণাপত্র বাহির করেন। যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর ও উপনগরে ঐ ঘোষণাপত্র উদ্‌ঘোষিত হয়, সেইদিন মহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের দিনে দক্ষিণারঞ্জনবাবু ব্রাহ্মসমাজ করিয়া মহারাণীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা

করেন। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্যবৃত্তান্ত ও উপাসনা যে পুস্তকে ছাপা হইয়াছিল, সেই পুস্তকের একখণ্ড লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিতিকালে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন।"[৬২] শেষোক্ত সংবাদটিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেন না সিপাহীবিদ্রোহের প্রতি ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের মনোভাব অনুকূল ছিল না এবং ইংরেজশাসনকে এঁরা দেশের পক্ষে হিতকারী মনে করতেন। দক্ষিণারঞ্জন এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম নন। কিন্তু রামমোহনের ভাবধারা তাঁর চিত্তকে কি পরিমাণ অধিকার করেছিল, রাজনারায়ণের সাক্ষ্য সে-সম্পর্কে এক মূল্যবান দলিল। এর থেকে সম্ভবত এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ১৮২৮-৩০ এর মধ্যে ছাত্রাবস্থায় রামমোহন স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল।

তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ডিরোজিওশিষ্য রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ সংস্রব ছিল কি না জানা যায় না, তবে একথা উল্লেখ্য, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামমোহন-স্মৃতিরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে যে চাঁদা সংগৃহীত হয়েছিল তার দাতৃগণের তালিকায় রামগোপালের নাম আছে, চাঁদার পরিমাণ ষোল টাকা।[৬৩] তরুণ বয়স থেকে তিনি যে রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এর দ্বারা তা সূচিত হচ্ছে। উত্তরকালে দেখতে পাওয়া যায় রামমোহনের স্মৃতি যাতে উপযুক্ত ভাবে রক্ষিত হয় তার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেছে রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্র Bengal Spectator।[৬৪] এই পত্রিকার ১৬ জুলাই ১৮৪৩ সংখ্যায় প্রসঙ্গত রামমোহন সম্পর্কে যে প্রশস্তিবাক্য উচ্চারিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সম্পাদক রামগোপালের মতামত অবশ্যই প্রতিফলিত: The more we reflect on his [Rammohun's] intellectual labours, his generous exertions for the enlightenment of the native mind and for the political amelioration of his country, the more we think it incumbent on his countrymen to adopt such means as will hand down his name to posterity. Though his liberal views and the greatness of his mind were not appreciated here by the people at large, owing no doubt, to the ignorance of the age in which he flourished,

he was looked upon with admiring respect and veneration in England, and is still remembered as the reformer of this land.····the most valuable testimony to his great worth was from Jeremy Bentham··· ।"[৬৫] রামমোহন সম্পর্কে এই আগ্রহ ও শ্রদ্ধা রামগোপাল আজীবন পোষণ করেছিলেন। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রেভাঃ উইলিয়ম এ্যাডামের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে রামমোহন সম্পর্কে আলোচনা হত। তাঁর বন্ধু চট্টগ্রামের ডেপুটি কালেক্টর গোবিন্দচন্দ্র বসাককে ২৪ নভেম্বর ১৮৩৯ তারিখে এক পত্রে রামগোপাল লিখছেন: "I have lately received a kind letter from W. Adam who is now living at Boston with his family. He sent me a United States Periodical containing a characteristic article from his pen defending the character and labours of Rammohun Roy from the attacks of a missionary traveller Mr, Malcolm" ।[৬৬] এ ব্যাপারে রামগোপাল সমমর্মী না হলে এ্যাডাম তাঁকে উক্ত বিবরণ পাঠাতেন না। রামমোহনের জীবনদর্শন যে রামগোপালের চিত্তকে কতদূর অনুপ্রাণিত করেছিল তার কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্য আছে রাজনারায়ণ বসুর রচনায়। রামগোপালের অন্যতম চরিত্রবৈশিষ্ট্য অকুতোভয়তা ও সর্ববিধ প্রচলিত-সংস্কারবিমুখতা। রাজনারায়ণ একবার দুর্গাপূজার সময় রামগোপালের স্বগ্রাম বাঘাটিতে তাঁর অতিথি হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন বাড়ীর পূজার কোনও অনুষ্ঠানে রামগোপাল যোগ দিলেন না একমাত্র সর্বশেষে শান্তিজল গ্রহণ করা ছাড়া। তার পরই তাঁরা রামগোপালের নিজস্ব ষ্টীমার 'লোটাস'-এ আরোহণ করে জলপথে বঙ্গভ্রমণে বহির্গত হন। মহানন্দা নদীতে একস্থানে তাঁরা অত্যন্ত খরস্রোতের মধ্যে পড়েন যা ঠেলে ষ্টীমারের অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব হল। সবাই রামগোপালকে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলেন। উত্তরে রামগোপাল বলেন: 'ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখেনা, ষ্টীমারের কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে বইল (boiler) ফাটিয়া আমরা যদি আকাশে উড়িয়া যাই তাহাতে ক্ষতি কি'? অতঃপর রাজনারায়ণের ভাষায়, "···ষ্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া···ঈশ্বরেচ্ছায় কোন প্রকারে পার হইল।···যেমন পার হইল অমনি রামগোপাল বাবু রামমোহন রায়ের

গান ধরিলেন 'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়,' কেবল 'অন্যের' শব্দ পরিবর্তন করিয়া গান গাইতে লাগিলেন 'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে জলের ভয়'।"[৬৭] দেখা যাচ্ছে পরম সংকটমুহূর্তে রামগোপালের চিত্তের ভয়শূন্যতার প্রেরণা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসংগীত।

ডিরোজিওর শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়েও বা তাঁর সংস্পর্শে না এলেও সম্প্রসারিত অর্থে হিন্দু কলেজের পরবর্তী ছাত্রদের মধ্যে যাঁদের 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত বলে গণ্য করা চলে সেই দলভুক্ত কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সম্পর্কে বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নেই। রামমোহনের অকৃত্রিম অনুরাগী ও তাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত কিশোরীচাঁদ, ব্রাহ্ম-আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ও স্বদেশী ভাবধারার অন্যতম জনক রাজনারায়ণ প্রমুখের কীর্তি সুপরিচিত। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে (১৮৪৫) কিশোরীচাঁদ রামমোহন সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছিলেন তার জীবনী অংশ ত্রুটিহীন না হলেও মূল্যায়নভাগটি লেখকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রণিধানযোগ্য। এই অংশ থেকে কিছু উদ্ধার করে বর্তমান প্রসঙ্গে ছেদ টানা যেতে পারে: "He was a man whose genius and energy under happier circumstances, might have achieved a complete moral revolution among his countrymen He was by nature not one of those who follow-one of those who are behind their age...The life of Rammohun Roy was commensurate with one of the most important and stirring periods, in the annals of this country. It embraces the commencements of that great social and moral revolution through which she is now silently but surely passing···He helped to break the crust of that rigid and unbroken superstition which had braved the formidable attacks of the Buddhist and the fierce persecution of the Mohammedan. No native had before been enlightened and bold enough to do anything of the kind. He was the first who opened the eyes of his countrymen to the monstrous absurdities of their national

creed ··· The time is coming ···· when the millions of Hindustan who now exhibit a heart-rending spectacle of the prostitution of all that is sublime in religion and divine in worship, shall be liberated from the thraldom of ignorace and bigotry and superstition-learn to love and obey and adore the one true and living God" ।[৬৮] এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে কিশোরীচাঁদের বক্তব্য,—রামমোহনের ধর্মমত সর্ববিধ শাস্ত্রীয় ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত এবং মানবকল্যাণসাধন ও বিশ্বজনীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এর সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন Theophilanthrophy অথবা ঈশ্বরবিশ্বাস ও লোকশ্রেয়সের সমন্বয়। অভিধাটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ স্বয়ং অগ্রণী হয়ে স্থাপন করেছিলেন Hindu Theophilanthropic Society নামক সংস্থা। সে-প্রসঙ্গ যথাস্থানে।

কোনও কোনও বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সত্ত্বেও ডিরোজিওর প্রধান শিষ্যমণ্ডলী ও সাধারণভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত তরুণগণ যে রামমোহন সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে রামমোহনের ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, ঐতিহাসিক তথ্যের আনুপূর্বিক আলোচনায় তার কিছু আভাস পাওয়া গেল। দেখা যাচ্ছে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর প্রথম যুগে রামমোহনের প্রতি উচ্চারিত 'হাফ-লিবারাল' আখ্যা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাদকতাপ্রসূত সাময়িক উচ্ছ্বাসের বেশী আর কিছু নয়। এ বিষয়ে ১২৯১ বঙ্গাব্দের 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় ডিরোজিওর অন্যতম প্রধান শিষ্য মনস্বী রাধানাথ শিকদারের জীবন আলোচনাপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা যথার্থ: "ইংরাজি শিক্ষাপ্রভাবে হঠাৎ যুবকদলের চক্ষু ফুটিয়াছিল সুতরাং তাঁহারা কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই ইহা ভিন্ন এত বাড়াবাড়ির প্রকৃত কারণ আর কিছুই নহে" ।[৬৯] একথাও মনে রাখতে হবে, হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে এই গোষ্ঠীভুক্ত অনেকেই ছিলেন অপরিণতবয়স্ক, কেউ কেউ তো বালকমাত্র। তাঁদের গুরু ডিরোজিও স্বয়ং পূর্ণ যৌবনে উপনীত হবার পূর্বেই কালগত হন। তর্কাতীত মনস্বিতা, সহৃদয়তা ও স্বাভাবিক শিক্ষাদাননৈপুণ্যের পাশাপাশি তাঁর মধ্যে যে খানিকটা বিদ্যার দম্ভ ছিল সে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন তাঁর প্রিয় শিষ্য ও তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান রাধানাথ

শিকদার স্বরচিত সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীমূলক এক বিবরণে : "Mr. Derozio was a very kind and indulgent teacher ; and though often vain of his attainments, was neverthless a learned man."।[৭০] এই আত্মসচেতন, তরুণ, বিদ্যাগর্বী শিক্ষকের মুখনিঃসৃত পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব থেকে আহরিত যুক্তিবাদ ও সংস্কারমুক্তির বার্তা যে তাঁর তরুণ মেধাবী ছাত্রগণের মনকে সর্বতোভাবে অর্গলমুক্ত করবার সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক ভাবে ভারসাম্যচ্যুত করবে তা স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল অন্ধকারে বাস করবার পর হঠাৎ আলোর ঝলকানি চোখে প্রথমে ধাঁধা লাগায়। কিন্তু এই নিতান্ত সাময়িক অব্যবস্থচিত্ততার পর্বে এঁদের কেউ কেউ যদি রামমোহন সম্পর্কে কিছু বিরূপ মনোভাব পোষণ করেও থাকেন, সেই মানদণ্ডে এঁদের জীবনদর্শনের সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গেলে ভুল হবে। এই বিরূপতা তাঁদের জীবনে স্থায়ী হয়নি। আমরা দেখেছি এই তরুণগোষ্ঠীর মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি রামমোহনের জীদ্দশাতেই তাঁর সঙ্গে যুক্ত ; অন্য প্রধানদের মধ্যে প্রায় সকলেই উনবিংশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও তাঁর জীবনদর্শনে অনুরক্ত। ভারসাম্যচ্যুতির আদিপর্ব কাটিয়ে এঁরা যখনই আত্মস্থ হতে চলেছেন তখন থেকেই প্রথম যুগের সম্ভাব্য বিরূপতা ক্রমশ অপসারিত হয়েছে ও উত্তরোত্তর তার স্থান নিয়েছে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা।

এই প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত একটি প্রচলিত মতের কিছু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রামমোহন যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন এই ছাত্রগোষ্ঠী ছিলেন নিতান্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তখন পর্যন্ত ডিরোজিওরই ছাত্র। সেই কারণে এঁদের উপর ডিরোজিওর প্রভাবের অতিরিক্ত রামমোহনের প্রভাব পড়বার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, এ কথা ইদানীং কালে খুব জোর দিয়েই বলেছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।[৭১] তিনি তাঁর যুক্তির সমর্থনে আরও বলেছেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছাড়া এই গোষ্ঠীর আর কারও সঙ্গে রামমোহনের যে পরিচয় বা যোগাযোগ ছিল এমন প্রমাণও নেই। এর উত্তরে যা বলা যেতে পারে সংক্ষেপে তা এই : তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছাড়া ডিরোজিও শিষ্যমণ্ডলীর আর কারও সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ ছিল না ডঃ মজুমদারের এই অনুমান তথ্যের দিক থেকে ঠিক নয় তা আমরা দেখেছি।

চন্দ্রশেখর দেব তারাচাঁদের মতই রামমোহনের পরিচিত এবং ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে তাঁর সহযোগী ছিলেন ; শিবচন্দ্র দেব ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে ১৮২৮-৩০এর মধ্যে রামমোহনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। অন্যদের সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোনও সমকালীন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তার সম্ভাবনার কথা একেবারে বাদ দেওয়াও চলেনা, কেন না দেখা যায় রামমোহনের জীবদ্দশাতেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কেউ কেউ তাঁক প্রকাশ্য সভাতে সতীদাহ নিবারণের জন্য অভিনন্দন জানাতে অগ্রসর হয়েছেন। এ কথাও মনে রাখা উচিত এই তথাকথিত 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' তরুণগণ ডিরোজিওর নিকট পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস প্রভৃতির পাঠ সার্থকভাবেই নিতে পেরেছিলেন ১৮২৬-৩১-এর মধ্যে ডঃ মজুমদার উল্লিখিত ঐ একই বয়সে। গ্রহণ করবার ক্ষমতার কোনও অভাবই সেক্ষেত্রে দেখা যায় না। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত রামমোহনের বাঙলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলি একের পর এক প্রকাশিত হয়ে কায়েমী স্বার্থ ও প্রচলিত সংস্কারের জগৎকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' উদ্ধৃত পার্থেনন-এর উক্তি অনুসারে ডিরোজিও অনুপ্রাণিত 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর চিন্তায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট, আমরা দেখেছি রামমোহনের চিন্তা পূর্ব হতেই সেই সব লক্ষণমণ্ডিত। এই পরিস্থিতিতে এই মেধাবী সংস্কারমুক্ত তরুণগোষ্ঠী যদি ক্রমশ রামমোহনের মনীষা, ও কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট না হতেন তাহলে সেটাই আশ্চর্যের বিষয় হত। সমকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে সাময়িক বিরূপতার উচ্ছ্বাস কাটিয়ে রামমোহনের জীবদ্দশাতেই 'ইয়ংবেঙ্গল'-প্রধানদের অনেকে (যেমন, তারাচাঁদ, চন্দ্রশেখর, শিবচন্দ্র, কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ প্রভৃতি) রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েছেন এবং এই শ্রদ্ধা উত্তরকালে আরও গভীর হয়েছে। ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবেই এঁদের চিত্ত সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ হয়েছিল একথা অবশ্য স্বীকার্য ; কিন্তু প্রায় একই সময়ে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তাও যে সেই সব প্রস্ফুটিত মানসকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করেছিল সমকালীন সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করলে এতে কোনও সন্দেহ থাকে না। দুঃখের বিষয় ডঃ মজুমদার উক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণগুলিকে বিনা আলোচনায় এড়িয়ে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক বিবেচনা করেন নি। বয়সের বা সময়ের ব্যবধান ভাবশিষ্য হবার পথে কোনও বাধা নয় ;

এর জন্য সর্বদা গুরুশিষ্যের ব্যক্তিগত সাহচর্য, এমন কি সমকালীনতা না থাকলেও কিছু এসে যায় না। রামমোহন উপনিষদ্-বেদান্তের শিক্ষা বা খ্রীষ্টের নীতি-উপদেশ মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এমন সিদ্ধান্তের তাৎপর্য নিশ্চয় এই নয় যে তিনি উপনিষদের ঋষিবৃন্দ, খ্রীষ্ট বা শংকর-রামানুজের সমবয়স্ক বা সমকালীন ছিলেন। সাম্প্রতিক কালে যদি কেউ নিজেকে প্লেটো, শংকর বা মার্ক্সের ভাবশিষ্য বলে চিহ্নিত করেন। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই) তাহলে নিশ্চয় বোঝাবে না যে তিনি উক্ত মনীষীদের সমকালীন বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অন্তরঙ্গ ! ডিরোজিও-শিষ্যগণের কেউ বা রামমোহনের সংস্পর্শে এসেছিলেন ও তাঁর চিন্তা ও কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য ও প্রগতিশীলতা উপলব্ধি করবার উপযুক্ত মানসিক পরিণতি অল্পবয়সেই অর্জন করেছিলেন ; আবার কারও কারও বা তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ঘটেনি—কিন্তু তাঁর ভাবধারা তাঁদের চিত্তকে কালক্রমে অধিকার করেছ ও জীবনকে অনেকাংশে তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করেছে। বস্তুত ইতিহাসের নির্ভুল সাক্ষ্য এই, যে এঁদের জগৎ ও রামমোহনের জগৎ পৃথক ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন দুই স্বতন্ত্র পৃথিবী নয় ; প্রগতির দুই ধারা এখানে পরস্পরের পরিপূরকরূপে সম্পূর্ণ মিলেমিশে গিয়েছে।

উক্ত দুই ধারার একটিকে 'রিফর্মেশন' বা সংস্কার এবং অপরটিকে 'রেনেশাঁস' বা চিত্তের নবজাগৃতি আখ্যা দিয়ে এগুলিকে পৃথক কল্পনা করলেও ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে রামমোহনের চিন্তাবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি তাঁর মনন ইউরোপীয় ইতিহাসের আধুনিক পর্বভুক্ত 'রেনেশাঁস' ও 'রিফর্মেশন' প্রসূত চিন্তার উভয় ধারাতেই নিষ্ণাত। কিন্তু দুটি স্রোত পরস্পরবিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়। রেনেশাঁসের মধ্য দিয়ে মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধির জয় ঘোষিত হল, ক্রমশ জীবনের সর্বস্তরের সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যাকে ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে সত্যাসত্য নির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষা জন্মাল। এই সর্বাত্মক ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব মানুষের ব্যক্তিজীবন ছাড়াও, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম সর্বক্ষেত্রে তার সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ধর্মজগতে এরই ফলশ্রুতি 'রিফর্মেশন' বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন যা ইউরোপের ইতিহাসে শুধু ধর্মে নয়, রাষ্ট্রে, সমাজে ও অর্থনীতিতে পর্যন্ত যুগান্তর এনেছে। উদ্বুদ্ধ চিত্তই প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার ও কায়েমী স্বার্থের অবসান কামনা করে। সুতরাং 'রেনেশাঁস' ও 'রিফর্মেশন' পরস্পর অতি গূঢ়সম্বন্ধ—একটিকে বাদ দিয়ে

অপরটিকে কল্পনা করা যায় না। 'রেনেশাঁস' প্রসূত যুগোপযোগী নূতন চিন্তা রামমোহন-মানসকে উদ্বুদ্ধ না করলে ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সর্বাত্মক সংস্কারপরিকল্পনা পোষণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। 'রেনেশাঁস' ও 'রিফর্মেশন' উভয়ের দ্বারাই তিনি প্রভাবিত। আর ডিরোজিও? স্বল্পায়ু এই মনীষীর জীবনে কি আমরা শুধু 'রেনেশাঁস'-চিন্তার একটি বিদ্যুৎঝলকই নিরীক্ষণ করব? তাঁর প্রিয় ছাত্র রাধানাথ শিকদার কিন্তু স্বরচিত সংক্ষিপ্ত ইংরেজি আত্মজীবনীতে অন্য কথা বলছেন: "Cut off in the prime of life, amidst innumerable projects for the reformation of India, his untimely death must ever be a matter of regret.।"[১২] দেখা যাচ্ছে ডিরোজিওর মনেও ব্যাপক সংস্কার-পরিকল্পনা ছিল; অকালে মৃত্যু না ঘটলে হয়তো তা রূপায়িত করবার জন্য তিনি তৎপর হতেন। এক্ষেত্রেও উদ্বোধিত চিত্ত (রেনেশাঁস) ও সংস্কার-পরিকল্পনা (রিফর্মেশন) যুগনদ্ধ। সুতরাং রামমোহন ও ডিরোজিও প্রবর্তিত নূতন চিন্তার দুটি ধারার একটিকে 'রিফর্মেশন' ও অন্যটিকে 'রেনেশাঁস' ছাপ দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কল্পনা করবার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই।

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ছাড়াও, এক ঋণাত্মক ভূমিতে আলোচ্য দুই গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা সমপর্যায়ের ছিল। সেটি হল রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক নিন্দা ও নির্যাতন। অবশ্য এখানে 'গোষ্ঠী' শব্দটির প্রয়োগ সম্পর্কে একটু সতর্কতার প্রয়োজন আছে। রামমোহন প্রায় আজীবন নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন কিন্তু কলিকাতায় যে মণ্ডলী তাঁর চারদিকে গড়ে উঠেছিল—তার অন্তর্ভুক্ত রামমোহনের বন্ধু বা পরিচিতবর্গকে (দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) সামাজিক বা অন্যবিধ নির্যাতন প্রায় স্পর্শ করেনি বলা চলে। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী বা অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমসাময়িক হিন্দুসমাজে তাঁদের মর্যাদা হারান নি। তাঁরা অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তি যাতে বজায় থাকে, সেজন্য স্বগৃহে পূজাপার্বণের অনুষ্ঠানাদি বজায় রেখেছিলেন। এই জন্যই রক্ষণশীল পত্রিকা 'সমাচার-চন্দ্রিকা' রামমোহনের তুলনায় তাঁদের প্রতি অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দেন। অপর পক্ষে রামমোহন বাল্যে গৃহ হতে বিতাড়িত, উত্তরকালে জননী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত ও সর্বধর্মের রক্ষণশীল

প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক নিন্দিত ও নিপীড়িত। গোঁড়া মুসলমান সমাজ তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন, খ্রীষ্টীয় বিরুদ্ধপক্ষ তাঁদের মুদ্রাযন্ত্রে তাঁর গ্রন্থাদি মুদ্রণ নিষিদ্ধ করেন, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁর নিন্দাকুৎসায় পঞ্চমুখ হন, আদালতে তাঁর ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের নামে মামলা উপস্থিত করে বহুবার তাঁকে বিপদগ্রস্ত করবার চেষ্টা করেন ও সতীদাহ-উচ্ছেদ আইন পাশ হবার পর তাঁর প্রাণনাশের সুপরিকল্পিত প্রয়াস করেন। মামলাগুলি সবই ব্যর্থ হয়, কিন্তু রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে আনীত তহ্‌বিল তছ্‌রুপের অভিযোগটি রামমোহনকে এতই মর্মাহত করেছিল যে তাঁর গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। একই কারণে দুশ্চিন্তায় ও মনোবেদনায় রামমোহনের পত্নী রাধাপ্রসাদের জননীর মৃত্যু ঘটে। আদালতের নথিপত্রে এ-সবের সাক্ষ্য আছে।[৭৩] গুপ্ত আততায়ীর ভয়ে তাঁকে কতখানি সন্ত্রস্ত হয়ে বাস করতে হত তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা 'জন বুল' পত্রিকা।[৭৪] লক্ষ্য করবার বিষয় রামমোহনকে এই শত্রুতা মাত্র যে তাঁর দেশীয় বা ধর্মীয় বিরোধী পক্ষ থেকে সহ্য করতে হয়েছিল তা নয়, ইংরেজ রাজপুরুষগণের মধ্যে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠীও এই বিরুদ্ধ মনোভাবের ও চক্রান্তের অংশীদার ছিলেন; বর্ধমানরাজের সঙ্গে রাধাপ্রসাদ রায়ের মামলা প্রসঙ্গে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষগণের একাংশের এই মনোভাব অতি স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত।[৭৫] ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছিল যে জেম্‌স ইয়ং জেরেমি বেন্থামকে লিখিত তাঁর ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮২৮ তারিখের পত্রে এ বিষয়ে তীব্র মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর ২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ তারিখে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক্‌কে লিখিত এক পত্রে তিনি উক্ত মন্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।[৭৬] ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের একাংশের এই রামমোহন-বিরোধী মনোভাবের উৎপত্তি অবশ্যই ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরের কলেক্টর সার ফ্রেডেরিক হ্যামিলটনের সঙ্গে রামমোহনের সংঘর্ষের ঘটনা থেকে।[৭৭] ইংরেজ রাজপুরুষের সম্মুখে দুর্বিনীত 'নেটিভ' কর্তৃক প্রদর্শিত অপরিসীম ঔদ্ধত্য এঁরা ক্ষমা করেন নি।

রামমোহন-দ্বেষী রক্ষণশীল হিন্দু মনোভাবের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে 'অধ্যক্ষ সভা' বা Board of Directors থেকে হিন্দু প্রধানগণের আপত্তিহেতু রামমোহনকে বর্জনের ঘটনায়। সুবিখ্যাত হাইড ইস্ট্-পত্রাবলীতে এই বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত। এর তীব্র

সমালোচনা করেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩৪-এ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রামমোহনের প্রথম স্মৃতিসভায় ভাষণদানপ্রসঙ্গে, তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। ১৫ অক্টোবর ১৮৩১ (৩০ আশ্বিন ১২৩৮ বঙ্গাব্দ) সংখ্যা সমাচার-দর্পণ-এ রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন জনৈক হিন্দু এ বিষয়ে উল্লাস প্রকাশ করে এবংবিধ পত্র লিখেছেন: "তাঁহার [রামমোহন রায়ের] আচার ব্যবহার হিন্দু ধারামত নহে ইহাও ব্যক্ত হইল। তৎকালাবধি রামমোহন রায় হিন্দুদের ত্যজ্য হইলেন ইহারো এক প্রমাণ লিখি। অনেকের স্মরণ থাকিবে যে পূর্বের চিফ জুষ্টিস সর এড্বার্ড্ হাইড-ইস্ট্ সাহেব যখন হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগব্যন্ত লোক উক্ত সাহেবের অনুরোধে এবং দেশের মঙ্গল বোধে অনেক অনেক টাকা চান্দা দিলেন ইহাতে হাইড্ ইস্ট্ সাহেব তুষ্ট হইয়া কলেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়দেব মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ পাঠশালার কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধ্যে রামমোহন রায় গ্রাহ্য হইলে না যেহেতু তাবৎ হিন্দুর মত নহে; দ্বিতীয় প্রমাণ রামমোহন রায় হিন্দুদের সমাজে গ্রাহ্য হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার সহিত সহবাস ছিল এই অপরাধে একজন অতিমান্য লোকের সন্তান বিদ্বান এবং অনেক ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না—তাঁহাকে তদপদাভিষিক্ত করণাশয়ে সদর দেওয়ানী জজ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা হইল না।"[৭৮] এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এদেশ থেকে ইলণ্ডে পালিয়েও রামমোহনের নিষ্কৃতি ছিল না। ৩ নভেম্বর ১৮৩২ সংখ্যা 'সমাচার-দর্পণ'-সংবাদ দিচ্ছেন, গুজব রটেছে, রামমোহন ইংলণ্ডে কোনও ইংরেজ রমণীকে বিবাহ করবার উদ্যোগ করেছেন।[৭৯] অতি সাধু উদ্দেশ্যেই এই গুজব ছড়ান হয়েছিল সন্দেহ নেই। ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৩১ সংখ্যা 'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট' অনুসারে রক্ষণশীল পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা'র এক লেখক ইংলণ্ড-প্রবাসে রামমোহনের সহচর ভৃত্যগণের নামগোত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন।[৮০] এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ছিল খুবই মহৎ-রামমোহনকে কোনও ভাবে জাতিভ্রষ্ট প্রমাণ করা। বস্তুত দেশ ও সমাজ সেবার মূল্যস্বরূপ রামমোহনকে আমৃত্যু এঁদের আক্রমণ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। শুধু তিনি নন, তাঁর দু একজন বন্ধু এবং শুভার্থীর ভাগ্যেও এই নির্যাতন জুটেছিল। 'সমাচার-দর্পণ'-এর পূর্বোদ্ধৃত পত্রাংশটিতে দেখা যায় রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে

তাঁর এক অন্তরঙ্গ সুহৃদেরও হিন্দু কলেজের অধ্যাপকসভায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। পরে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন-বন্ধু উইলিয়ম এ্যাডামকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করবার প্রস্তাব উঠলে রক্ষণশীল দলের নেতা রাধাকান্ত দেব প্রবল আপত্তি জানিয়ে হোরেস হেম্যান উইলসনকে লেখেন (১৯ জানুয়ারী, ১৮৩২): "For my part, I cannot entrust the morals and education of those I regard to such an one that was once a Missionary, then a Vaidantic or disciple of Rammohun Roy and lastly an Unitarian"।[৮১] এ্যাডামের সর্ববিধ যোগ্যতাসত্ত্বেও এই আপত্তির ফলে হিন্দু কলেজে তাঁর চাকরি হয়নি। পঞ্চম অধ্যায়ে প্রমাণ সহ উল্লেখ করা হয়েছে কি ভাবে রামকমল সেন চাপ সৃষ্টি করে রামমোহনের অনুগামী পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে সতীদাহ সংরক্ষণের পক্ষে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিলেন। পরে বিদ্যাবাগীশ নিজের সাময়িক দুর্বলতা কাটিয়ে আবার রামমোহনের সঙ্গে মিলিত হন। এই 'অপরাধে' উত্তরকালে রামকমল সেনেরই প্রভাবে সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি কর্মচ্যুত হয়েছিলেন। প্রবল সংগ্রামের দ্বারা নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে তিনি পুনরায় কর্মে প্রতিষ্ঠিত হন।[৮২]

সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ডিরোজিও এবং স্থলবিশেষে তৎপ্রভাবিত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একই রক্ষণশীল চক্র সমানভাবেই সক্রিয়। এঁদেরই চেষ্টায় ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়, নতুবা তাকে বরখাস্ত হবার অপমান সহ্য করতে হত। ২৩ এপ্রিল ১৮৩১ তারিখে অনুষ্ঠিত হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষসমিতির এক অধিবেশনে ডিরোজিওকে বিতাডনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার হিন্দু কলেজের পুরাতন কার্যবিবরণীর পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করে এই কলঙ্কময় দিবসে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ 'প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকা'র ৪১তম খণ্ডে প্রকাশ করেছেন।[৮৩] সেখানে দেখা যায়, সেদিনকার অধিবেশনে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে বিতাড়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন রক্ষণশীল গোষ্ঠীর তিন নায়ক, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা একবাক্যে মত-প্রকাশ করেন যে, তরুণ ছাত্রগণের শিক্ষক হবার পক্ষে ডিরোজিও অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তি (a very improper person to be entrusted with

the education of youth); এবং হিন্দুকলেজের শিক্ষকপদ থেকে তাঁর অপসারণ একান্ত আবশ্যক। অধিকন্তু এঁরা এক স্মারকলিপি দাখিল করেন যার মধ্যে প্রয়োজন হলে ডিরোজিও প্রভাবিত মেধাবী ছাত্রগণকে কলেজ থেকে বিতাড়ন ও সভাসমিতিতে তাঁদের যোগদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তাবও ছিল। তবে সম্ভবত ডিরোজিও-বিতাড়ন-ব্যাপারে সাফল্যলাভ করায় তাঁরা এই নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করেন নি। স্মারকলিপির অন্তর্ভুক্ত আর দু'একটি তথ্যের প্রতিও অধ্যাপক সরকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এতে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে, কলেজের পাঠক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষার কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে (নিয়মাবলী ১৩, ১৪, ১৬) : ডেভিড হেয়ারের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন আক্রোশের আভাসও এতে পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের প্ররোচনায় ডিরোজিওকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতেও সভা স্বীকৃত হয়নি। হেয়ার এবং উইলসন ডিরোজিওর গুণমুগ্ধ হলেও নিরপেক্ষ থাকেন। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সেদিনের অধিবেশনে একমাত্র সভ্য যিনি সাহস ও সততার সঙ্গে প্রথম থেকে ডিরোজিওকে সমর্থন করেছিলেন ও নির্ভীকভাবে তাঁর অপসারণের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন, তিনি রামমোহন-সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ডিরোজিওকে নির্দোষ ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর অপসারণ আবশ্যক (necessary) মনে করেন নি, কিন্তু কলেজ-পরিচালনের সুবিধার জন্য তিনি সরে গেলে ভাল হয় (expedient) এই মর্মে মধ্যপন্থী মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর উদারতার সঙ্গে সতর্কতার এই সংমিশ্রণটুকু নিঃসন্দেহে আমাদের মনকে কিঞ্চিৎ পীড়িত করে; তবু রক্ষণশীল ধর্মসভাপন্থীদের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়। উত্তর কালে ডিরোজিওর প্রধান শিষ্যদের মধ্যেও কেউ কেউ অনুরূপভাবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিগণের আক্রোশের শিকার হন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ ত্যাগের পর ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর এই দুই শিষ্যের মনীষা ও যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও বিতর্ক ছিল না। কিন্তু এঁরা সনাতনপন্থী নন ও আচারনিষ্ঠ নন, এই দাঁড়াল এঁদের অপরাধ। সুতরাং রাধাকান্ত দেব ২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১-এ হুমকি দিয়ে ডেভিড হেয়ারকে পত্র লিখলেন: "I think you might have heard the particulars of the dinner of the two teachers of the

Putuldanga School and consequently wish to know whether you are determined upon removing the outcasts from the School or retaining them to corrupt the Hindu pupils."।[৮৪] অসহায় হেয়ার এঁদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও এঁদের রক্ষা করতে পারলেন না। রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহনের চাকরী গেল।

কর্মজীবনে এই রকম নির্যাতন ভোগ করা ছাড়াও 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত তরুণগণকে আত্মীয়স্বজন ও সমাজের বিরূপতা সহ্য করতে হয়েছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় চিরতরে ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সাময়িকভাবে গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন; রসিককৃষ্ণ মল্লিককে আত্মীয়স্বজনের হাতে যথেষ্ট নিগ্রহ সহ্য করতে হয়; রামগোপাল ঘোষ এক সময় সামাজিকভাবে স্বগ্রামবাসীদের দ্বারা বর্জিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া রক্ষণশীল সাময়িক পত্রগুলির বিরূপ ও অশালীন আক্রমণ তো ছিলই।

এই তথ্যগুলি মনে রাখলে রামমোহন, ডিরোজিও ও ডিরোজিও প্রভাবিত তরুণগোষ্ঠীর মধ্যে অভিজ্ঞতার রাজ্যে একটি সমভূমি সহজেই আবিষ্কার করা যাবে। একই শত্রুর আক্রমণে যাঁরা নিপীড়িত, পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পার্থক্যসত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে একটি আত্মীয়তার সূত্র খুঁজে পেতে তাঁদের অসুবিধা বা বিলম্ব হয় না। রামমোহন সম্পর্কে রসিককৃষ্ণ বা কৃষ্ণমোহনের যে প্রশস্তি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে এই আত্মীয়তার সুর শোনা যায়। অবশ্য এইটুকু মনে রাখা প্রয়োজন ব্যক্তিগত ভাবে এই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর রামমোহন-নির্যাতন যত হিংস্র ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল, ডিরোজিও বা নব্যবঙ্গগণের ক্ষেত্রে তা হবার উপায় ছিল না; কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হেতু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিকতায় অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকেই 'ইয়ং বেঙ্গল' দলভুক্ত প্রতিভাশালী যুবকগণ জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে স্বমহিমায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ও তাঁদের চরিত্র, কর্মদক্ষতা ও মনীষা সাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছিল। রক্ষণশীল সমাজের নিন্দা কুৎসা এক্ষেত্রে ক্রমশ নিস্তেজ ও নিষ্ফল হয়ে যায়।

রামমোহন, ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজপতিগণের

যে নীতি আগাগোড়া এমন তীব্রভাবে সক্রিয় ছিল তার সমর্থনে দু'একটি কণ্ঠস্বর সাম্প্রতিক গবেষণাক্ষেত্রে শোনা গেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা পরলোকগত ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগলের রচনায়। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর অপসারণ সংক্রান্ত ঘটনাবলীতে রাধাকান্ত দেবের ভূমিকাপ্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: "রাধাকান্ত প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণের মুখপাত্র হইয়া কলেজরক্ষায় অগ্রসর হইলেন। এই ব্যাপারে শিক্ষক ডিরোজিওকে আহুতি দেওয়া হইল।...রাধাকান্ত প্রতিষ্ঠানটিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং দেখিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দু কলেজ আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।"[৮৫] রামমোহন-বন্ধু এ্যাডামকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করবার প্রশ্নে রাধাকান্তর আপত্তি সম্পর্কেও যোগেশচন্দ্রের একই সিদ্ধান্ত: "কোন পাদ্রি বা অজ্ঞাতকুলশীল ইংরেজ যাহাতে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত না হয় সেদিকে রাধাকান্ত দেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।"[৮৬] রাধাকান্ত কর্তৃক রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে outcasts অভিযোগে চাকরী থেকে উচ্ছেদ করবার ব্যাপারে সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেও তিনি বিশেষ কোনও মন্তব্য করেন নি সম্ভবত অপর দুটি সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করবার পর তা বাহুল্য মনে করেই। রাধাকান্ত দেব যে প্রাচীনপন্থী ছিলেন এ কথাও তিনি সরাসরি অস্বীকার করেছেন এবং নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থনে রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিসভায় প্রদত্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন।[৮৭] ইদানীং উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির ইতিহাসে রাধাকান্তর ভূমিকাকে যাঁরা পুনর্মূল্যায়ন করতে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ ডেভিড্ কফ্[৮৮] ও অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের[৮৯] সিদ্ধান্ত অনেকটা অনুরূপ। ডঃ কফের যুক্তিগুলির বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কেননা সেগুলি যোগেশচন্দ্রের আলোচনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। তথ্যের ক্ষেত্রেও তিনি কোনও নূতন কথা বলেন নি। ভবতোষ দত্ত তথ্যনিষ্ঠ; তিনি রাধাকান্তের জনহিতকর কার্যসমূহের সযত্ন ও নিপুণ আলোচনা করেছেন। কিন্তু হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও বিতাড়নের ব্যাপারে রাধাকান্তের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁকে যোগেশচন্দ্রের প্রতিধ্বনি করতেই শুনি: 'এ ক্ষেত্রেও রাধাকান্তকে দেখি সমাজনেতারূপে। সমাজে যে-ভাবে তিনি প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন তাতে বাধা ঘটে সবটাই চোরাবালিতে হারিয়ে যেত। ডিরোজিওকে না সরিয়ে উপায় ছিলনা।" এই যুক্তির সম্পূর্ণ তাৎপর্য সম্ভবত গ্রন্থের নিবন্ধকার

অনুধাবন করেন নি। এ প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই ওঠে, যে সমাজব্যবস্থা রক্ষার জন্য ডিরোজিওর মত প্রতিভাশালী শিক্ষক ও মনীষীকে বিসর্জন দিতে হয়, তা কি আদৌ সংরক্ষণের যোগ্য? যুক্তিটিকে শেষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করলে বলতে হয় রক্ষণশীল চক্র যতগুলি অনুচিত কাজ করেছিলেন—যেমন, হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষসভায় রামমোহনের প্রবেশে বাধাদান, রামমোহনের নামে নিন্দা কুৎসা রটানো, এমন কি তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা, ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রগণ সম্পর্কে নানাবিধ অসত্য ও অর্ধসত্য প্রচার, এ্যাডামের মত মনস্বী শিক্ষাবিদের হিন্দু কলেজের অধ্যাপকপদে যোগদানে আপত্তি, রসিকক্বষ্ণ-কৃষ্ণমোহনকে শিক্ষকপদ থেকে অপসারণ, এর সবকটিই দেশের ও সমাজের স্থিতাবস্থা রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন ছিল, তা না হলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সবটাই 'চোরাবালিতে হারিয়ে যেত'। স্বাধীন মত ও বিশ্বাস পোষণের মূল্যস্বরূপ মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে ও কালে বহু আদর্শনিষ্ঠ মনীষী কঠোর নির্যাতন বরণ করেছেন, প্রাণপর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। এঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়েই নিঃসন্দেহে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। উপরের যুক্তি অনুসরণ করে এঁদের নির্যাতনকারীরাও বলতে পারতেন এবং বলেও এসেছেন যে রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলের জন্যই এঁদের পীড়ন বা হত্যা করা হয়েছে, তা না হলে স্থিতাবস্থায় বিপর্যয় ঘটে সমাজ "চোরাবালিতে হারিয়ে যেত।" এ ক্ষেত্রে আদি প্রশ্নটি মূল্যবোধঘটিত। প্রাচীনপন্থিদল সমাজের যে সব আচার ও সংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন—যুগপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা যে বহুকাল নিঃশেষিত, নীতিগতভাবে তার অনেকগুলি যে সমর্থনের অযোগ্য, এ সত্যটি তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। রামমোহন-ডিরোজিও-নব্যবঙ্গের বিরোধিতা করা যে ইতিহাসের গতিরোধ-প্রয়াসেরই নামান্তর এই ধারণা রাধাকান্ত ও তাঁর সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ছিল না। রাধাকান্ত অনেক জনকল্যাণমূলক কর্মে, বিশেষত জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তারে অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা অস্বীকার করলে ঐতিহাসিককে অবশ্য প্রত্যবায়গ্রস্ত হতে হবে।[৯০] কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ডের আনুপূর্বিক আলোচনা করলে সমগ্র অর্থে তদানীন্তন সমাজোন্নয়নপর্বে এই ভূমিকাকে প্রগতিশীল আখ্যা দেবার উপায় নেই। যুগপরিবর্তনের সর্বাত্মক স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর যে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল এমন প্রমাণ দেখি না।

ভবতোষ দত্ত বলতে চেয়েছেন, রাধাকান্ত হিন্দু সমাজকে ভিতর থেকে ধীরে ধীরে সংস্কার করে সামাজিক পরিবর্তন ঘটাবার পক্ষপাতী ছিলেন; আইনের সাহায্যে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপের দ্বারা হিন্দুসমাজের পরিবর্তন হোক এ তিনি কামনা করেন নি। তাঁর ভাষায় "হিন্দু সমাজেও সংস্কার হয়েছে। রঘুনন্দনের কথা আমরা জানি। তিনি সমাজে থেকেই এ কাজ করেছিলেন। বস্তুত রাধাকান্ত সহমরণপ্রথাকে উৎকৃষ্ট সামাজিক আচার মনে করতেন কিনা বলা শক্ত কারণ তাঁর পরিবারে সহমরণ কখনো হয়নি;...তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস যাই থাক, রামমোহনের বাদবিতর্কের তিনি কোনো প্রতিবাদ করেছিলেন বলে জানি না। তাঁর প্রতিবাদ তখনই উচ্চারিত হল যখন ইংরেজশাসক এ বিষয়ে আইনপ্রণয়ন করতে এগিয়ে এল। কেন না তাঁর মনে হল সমাজের অধিকারকে শাসক হরণ করে নিচ্ছে।" এই কয়েকটি বাক্যের মধ্যে লেখকের একাধিক প্রমাণহীন অনুমানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথমত হিন্দুসমাজের অভিব্যক্তির ইতিহাসে সমাজের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি বার বার নূতন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজদেহে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটিয়েছে এ কথা সাধারণ ভাবে সত্য হলেও রঘুনন্দন এই প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্তস্থল নন। তাঁর চেষ্টা মুখ্যত ছিল কি ভাবে পুরাতন আচারের নিগড়ে ভগ্ন সমাজব্যবস্থার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলিকে একত্র জোড়া দেওয়া যায়। বস্তুত হিন্দুসমাজকে তিনি এক অনড় অচলায়তন রূপে কল্পনা করেছিলেন। রামমোহনের কালপর্যন্ত বঙ্গীয় রক্ষণশীল স্মার্ত পণ্ডিতগণের সতীদাহ সমর্থনের মূল উৎস যে প্রকারান্তরে ছিল রঘুনন্দনেরই 'শুদ্ধিতত্ত্ব' তা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিয়েছি।[৯১] দ্বিতীয়ত রাধাকান্ত সহমরণ প্রথাকে উৎকৃষ্ট সামাজিক আচার মনে করতেন কিনা বলা শক্ত নয়। সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ হবার অনেক পরে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রের ষোড়শ খণ্ডে (১৮৫৬) অধ্যাপক উইলসন বিচার করে দেখান, 'ইমা নারীরবিধবা...' ইত্যাদি যে মন্ত্রটিকে এতাবৎকাল সতীদাহবাচক গণ্য করা হয়ে আসছিল তা প্রকৃতপক্ষে সতীদাহ-বিধায়ক নয়।[৯২] রামমোহন পূর্বেই এ কথা বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন রাধাকান্ত দেব উইলসনকে লিখিত এক পত্রে যেটি উইলসনের প্রত্যুত্তর সহ উক্ত পত্রিকার পরবর্তী খণ্ডে (১৮৬০) প্রকাশিত হয়।[৯৩] এই দীর্ঘ পত্রে রাধাকান্ত তাঁর পণ্ডিতদের জবানীতে খণ্ডিত ও বর্জিত পুরাতন যুক্তিসমূহ পুনরুপস্থাপিত করে

প্রমাণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, সতীদাহপ্রথা শাস্ত্রসমর্থিত, এমন কি বেদসমর্থিত। ইংরেজি অনুবাদে প্রাচীন রোমান কবি প্রপের্তিয়ুস রচিত সতীদাহের সপ্রশংস, উচ্ছ্বাসপূর্ণ, রোম্যান্টিক বর্ণনা সংবলিত এক কবিতাংশ উদ্ধৃত করে রাধাকান্ত পত্র শেষ করেছেন। এই দীর্ঘ পত্রের অন্তর্নিহিত সুরটি একাধারে গর্বের ও বিষাদের। হিন্দু হিসাবে এই প্রথার জন্য লেখক গর্ব অনুভব করেছেন এবং এর অবলুপ্তির জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন। সুতরাং সতীদাহপ্রথা মনে মনে অপছন্দ করেও করেও মাত্র "সমাজরক্ষা"র জন্য রাধাকান্ত এর উচ্ছেদবিরোধী ছিলেন—এ যুক্তি টিকছে না। তাঁর নিজপরিবারে সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না-এ তথ্যও রাধাকান্তর সতীদাহবিরোধী মনোভাব প্রমাণ করে না। তখনকার দিনে এমন অনেকেই সতীদাহ উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন যাঁদের পরিবারে সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। সতীদাহবিরোধী আইন-প্রণয়নের পূর্বে রাধাকান্ত রামমোহনের বাদবিতর্কের কোনও প্রতিবাদ করেন নি এমন উক্তি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর। রামমোহন কলিকাতায় ১৮১৪ বা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ী হয়ে 'আত্মীয়সভা'র মাধ্যমে তাঁর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের কর্মসূচীর প্রকাশ্য ব্যাখ্যা করবার সময় থেকেই রাধাকান্ত-গোষ্ঠী রামমোহনের বিরুদ্ধতা করে এসেছেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হওয়ার কালে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসভা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়ার চক্রান্তের মধ্যে এই মনোভাবের প্রকাশ। তা ছাড়া ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত এই সব প্রকাশ্য বিতর্কে রাধাকান্ত সচরাচর স্বয়ং লিখিতভাবে যোগ দিতেন না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত উইলসনকে লিখিত তাঁর পত্র। তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত ও পোষিত রক্ষণশীল পণ্ডিতগণকে দিয়েই তাঁরা সাধারণত প্রতিবাদ লেখাতেন। 'সতীদাহ-উচ্ছেদ' ও পরবর্তী কালের 'বিধবাবিবাহ-প্রচলন'—দুটি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই তা দেখা গেছে। 'সতীদাহ-উচ্ছেদ' আইন পাশ হবার (১৮২৯) বহু পূর্ব হতেই এই বিষয়ে রামমোহনের মতকে আক্রমণ করে রক্ষণশীলপক্ষীয় একাধিক পণ্ডিত রচিত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। উইলসনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি স্বয়ং লেখনীধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সম্ভবত এই কারণে যে বিলাতে প্রকাশিত ইংরেজি নিবন্ধের উত্তর দেবার সাধ্য ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ তাঁর পণ্ডিতগণের

ছিল না। বিধবাবিবাহপ্রবর্তন-সংগ্রামেও বিদ্যাসাগরের প্রবলতম রক্ষণশীল প্রতিপক্ষ ছিলেন রাধাকান্ত দেব এবং তাঁর আশ্রিত পণ্ডিত সমাজ।

প্রকৃতপক্ষে রাধাকান্ত দেব বা রামকমল সেন সর্বাংশে নবযুগোপযোগী চরিত্র নন। ব্যক্তিগত ভাবে উচ্চ শিক্ষা, স্বধর্মনিষ্ঠা, মার্জিত রুচি ও নানা বিষয়ে যোগ্যতা এঁদের ছিল। জনকল্যাণমূলক নানা কাজে, বিশেষত শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এঁরা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে এঁরা যে কোনও গভীর চিন্তা করেছিলেন তার কোনও নিদর্শন কোথাও নেই। এঁদের সমপর্যায়ের গোষ্ঠী-পতি ভারতবর্ষে প্রাচীন বা মধ্যযুগেও বিরল ছিলেন না - যাঁরা দানপুণ্য করতেন, টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষণে অগ্রণী হতেন, জ্ঞানীগুণীকে বৃত্তি দিতেন, দীঘি কাটাতেন, ধর্মশালা ও এতিমখানা নির্মাণ করতেন, নিজেরা সাধ্যমত বিদ্যাচর্চা করতেন, পণ্ডিতদের গ্রন্থাদিরচনায় উৎসাহ দিতেন ও তাঁদের সাহায্যে স্বনামেও গ্রন্থ প্রকাশ করতেন; [১৪]—আবার প্রচলিত বর্ণভেদ ও জাতিবিভাগকে সযত্নে রক্ষা করতেন, সর্ববিধ যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কারকে নির্বিচারে সমর্থন করতেন স্বাধীন সংস্কারমুক্ত চিন্তার মূলোচ্ছেদ করতেন ও বিরোধীপক্ষের ধোপা নাপিত বন্ধ করতেন। ব্যক্তিগত নানা সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও এঁরা গতানুগতিক মনোভাবের প্রতীক, যুগপরিবর্তনের অনুকূল মানসিকতাকে বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম। একযোগে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থন ও সম্প্রসারণের ও সামাজিক এবং ধর্মীয় অচলায়তনের সংরক্ষণের চেষ্টা করে চললে যে স্পষ্ট স্ববিরোধের সৃষ্টি হয় তা তলিয়ে দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি এঁদের ছিল না। নানাবিধ সৎকাজে অগ্রণী হওয়া সত্ত্বেও নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাই এঁরা 'এ্যানাক্রনিজ্‌ম' হয়ে রইলেন। নব্যবঙ্গগোষ্ঠীর দুই প্রতিনিধি রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা রামমোহন-ডিরোজিও সংক্রান্ত রাধাকান্তর মনোভাবের উচিত মূল্যায়ন বলেই গণ্য হবে। প্রথম জন ডিরোজিও-শিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি রাধাকান্তর আচরণ সর্বদা প্রশংসাযোগ্য হয়নি। পটলডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষকপদ থেকে তরুণ কৃষ্ণমোহনের অপসারণের জন্য রাধাকান্তর সংকীর্ণ মনোভাব ও অন্যায় জেদই সম্পূর্ণ দায়ী। তা সত্ত্বেও ১৪ মে ১৮৬৭ তারিখে অনুষ্ঠিত রাধাকান্তর স্মৃতিসভায় কৃষ্ণমোহন শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টার প্রশংসা করে ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে

নবযুগের পটভূমিতে রাধাকান্তর প্রগতিবিরোধী ভূমিকাটির প্রতিও অতি ভদ্র ও মার্জিত ভাবেই ইঙ্গিত করতে পশ্চাৎপদ হননি : "To the remarks made on the Rajah's retrograde movements and his obstructions to progress I can only say that it is unfair to compare him with persons who were his junior by more than half a century…& man in this respect can only be compared with his contemporaries. Judged by such a standard the Rajah would certainly appear not behind but in advance of his age" [২৫] অর্থাৎ সমকালীন নবযুগীয় প্রেক্ষাপটে রাধাকান্ত উপযুক্ত প্রগতিশীল চরিত্র নন—আরও অন্তত পঞ্চাশ বৎসর বা তার পূর্বে এই জাতীয় চরিত্রকে কালোপযোগী বিবেচনা করা যেতে পারত। কিশোরীচাঁদ মিত্র ডিরোজিও-শিষ্য না হলেও সম্প্রসারিত অর্থে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামধেয়। রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে তাঁর উক্তিতে রাধাকান্তর ব্যক্তিগত সদ্‌গুণাবলীর প্রশংসা করলেও তিনি এতটা সংযমের পরিচয় দেননি : "The superstitious element which had been mild in his father Gopeemohun and torpid in his uncle Raja Rajkissen, assumed in him an agressive development. It is therefore not to be wondered at, that his attachment to the antiquated customs and usages of his country, was as devoted as his advocacy of educational measures was zealous. In him the argument had a strong hold that what had lasted a long time must be right and was intended to last. The reverence for existing usages which is strong in human nature was stronger in Radha Kanta Deb. His belief in the wisdom of his ancestors was unlimited. Thus impressed he proved during his the latter end of his life an anachronism…He also lacked that bold spirit and penetrating genius which inspired a Ramanund and Rammohun Roy, and which lifted them out of the mass of men whose belief is regulated by the geography of their

country and the prejudices of their nursery···we have seen how the views and dogmas of Radhakanta Deb marred his usefulness and interfered with the formation of a healthy public opinion।"[২৬] কৃষ্ণমোহনের পূর্বোদ্ধৃত রামমোহন প্রশস্তি পাঠ করলে জানা যায় শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্রকে মন খুলে প্রশংসা করবার অভ্যাস তাঁর ছিল। সে তুলনায় রাধাকান্ত সম্পর্কে তিনি অনেক সংযতবাক্ ও ইঙ্গিতপরায়ণ। রামমোহন সম্পর্কে কিশোরীচাঁদের গভীর শ্রদ্ধা তাঁর পূর্বোদ্ধৃত রামমোহন সংক্রান্ত ইংরেজি নিবন্ধে সবিশেষ প্রতিফলিত; এবং রাধাকান্ত বিষয়ক মন্তব্যেও তিনি তুলনামূলক বিচারে রামানন্দ ও রামমোহনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রামমোহনের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন রাধাকান্ত-রামকমল-ভবানীচরণ প্রমুখ পরিচালিত ধর্মসভাগোষ্ঠী। রামমোহন ও রাধাকান্ত সম্পর্কিত কৃষ্ণমোহন ও কিশোরীচাঁদের উক্তিতে এই দুই পক্ষের প্রতি নব্যবঙ্গগোষ্ঠীর মনোভাবের পরিপূর্ণ বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ডিরোজিওশিষ্যগণ গুরুর নিকট যে সম্পদ লাভ করেছিলেন তার একটি হল স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, অপরটি নৈতিক সততা। ডিরোজিও আর কিছুকাল জীবিত থাকলে কোন গঠনমূলক পন্থায় তাঁদের এই আদর্শগুলি রূপায়িত করবার অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা দিতেন তা জানবার উপায় নেই। সাধারণ ভাবে দেখা যায় নব্যবঙ্গগোষ্ঠী ছাত্রাবস্থা থেকেই নানা সভাসমিতি সংগঠন করে সেগুলিকে বিভিন্ন তত্ত্ব ও সমস্যার আলোচনা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত করেছিলেন। 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' (১৮২৮) ও তার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত অপর সাতটি সভা, শিবনাথ শাস্ত্রী কথিত 'এপিস্টোলারি এসোসিয়েশন' বা 'পত্রালাপ-সমিতি', 'সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অব্ জেনারেল নলেজ' বা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮), বিগত শতাব্দীর কুড়ির ও তিরিশের দশকে এই ভাবাদর্শের প্রতিনিধিস্থানীয়, কয়েকটি সংস্থা। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র কর্ণধারগণ যথা—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং এর পরিদর্শক ডেভিড্ হেয়ার—সকলেই ডিরোজিও ও রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং রক্ষণশীল ধর্মসভাপন্থিগণের বিরুদ্ধ সমালোচক। কিন্তু বিশুদ্ধ-জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপেই বর্ণিত সংগঠনগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ; এগুলির উপযুক্ত-

সাধারণ সংজ্ঞা হল 'আলোচনাচক্র' বা study circle। স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহকে জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কি ভাবে প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা এই সভাগুলি দিতে পারেনি—দেওয়ার সুযোগ বা সাংগঠনিক যোগ্যতাও এগুলির ছিল কিনা সন্দেহ। একটি সক্রিয় ভাবাত্মক প্রতিষ্ঠাভূমি ও উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র উদ্বুদ্ধ তরুণ মানস ক্রমশ আবিষ্কার করেছিল রামমোহন ও তদীয় মণ্ডলীর আদর্শ ও পরবর্তী কর্মধারার মধ্যে এমন মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমপর্ব থেকেই ডিরেজিও ও 'ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী কিছু কিছু মতপার্থক্য সত্ত্বেও রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যদিও রামমোহনের অনুবর্তিগণের প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল অপেক্ষাকৃত কঠোর। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তিরিশের দশক থেকে লক্ষ্য করা যায় রামমোহন সম্পর্কে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর শ্রদ্ধা ক্রমবর্ধমান এবং কর্মক্ষেত্রে রামমোহন-শিষ্যদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান উত্তরোত্তর বিলীয়মান। ডিরোজিওর কয়েকজন প্রধান শিষ্যের (রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি) উদ্যোগে স্থাপিত 'হিন্দু ফ্রি স্কুল' নামক বিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যকারী পৃষ্টপোষক-গণের মধ্যে 'সংবাদকৌমুদী' থেকে ১১ ফাল্গুন ১২৩৮ (ইং ২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৩২) সংখ্যা 'সমাচারদর্পণ' উদ্ধৃত করেছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় হরচন্দ্র লাহিড়ী ও রেভাঃ এ্যাডামের নাম।[২৭] প্রসন্নকুমার প্রভৃতি রামমোহনমণ্ডলীভুক্তগণের প্রতি প্রগতিশীল তরুণ সমাজের বিরূপতা এই সহযোগিতার অন্তরায় হয়নি। প্রসন্নকুমারের মত দ্বারকানাথ ঠাকুরও এক সময়ে ছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর প্রখর সমালোচনার পাত্র এবং এঁদের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' তাঁর প্রতি অতি কটু তিরস্কার বর্ষণ করেছিল।[২৮] কিন্তু ক্রমশ এই দ্বারকানাথই হয়ে উঠলেন সব দিক দিয়ে তরুণ সমাজের 'হিরো।' এর প্রধান হেতু হল বাঙালীদের মধ্যে দ্বারকানাথই সর্বপ্রথম ইংরেজ ব্যবসায়ীদের স্বাধীন অংশীদাররূপে স্বোপার্জিত অর্থের সাহায্যে প্রচুর মূলধন লগ্নী করে যুগোপযুক্ত আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যবসায় সংগঠন করেছিলেন। বিদেশী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে অভ্যস্ত মুৎসুদ্দিগিরি করবার পরিবর্তে তিনি স্বয়ংনির্ভর বাণিজ্যপতিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত কার ঠাকুর কোম্পানী স্থাপিত হয়। এর মধ্যে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলভুক্ত প্রগতিশীল তরুণরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন--ভারতের ভবিষ্যৎ ধনসমৃদ্ধির পূর্বাভাষ। তাঁদের

মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' এ-সম্পর্কে লেখেন: "আমরা আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি এতদ্দেশীয় কতক মর্যাদাবন্ত মহাশয়েরা এই প্রশংসিত অভিপ্রায় করিয়াছেন যে তাঁহারা এক বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন করিয়া ঠাকুরান কোম্পানি [Tagore and Company] নামে ঐ কুঠীর কার্য চালাইবেন (।) ইহাতে বোধ হয় এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি লোকেরা সাধারণের উপকারজনক এই অত্যাশ্চর্য সাহসিক উদ্যোগের অসংখ্য প্রশংসা করিবেন (।) এবং আমরা অনুমান করি এই দৃষ্টান্ত দর্শনে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মন এইরূপ উত্তম কর্মে প্রবর্ত্ত হইয়া বাণিজ্যকার্য করত পুনশ্চ হিন্দুস্থানকে অতিসমৃদ্ধ ও মর্যাদাশালী করিবে (।)···বোধ হয় এদেশের দুরবস্থা পরিবর্তনের কাল উপস্থিত হইল এবং পৃথিবীর বাণিজ্যকারি দেশের সহিত হিন্দুস্থানেরো নাম লিখিত হইবে (।) অতএব আমরা প্রার্থনা করি এইক্ষণে ঠাকুরেরা যে পথ দেখাইবেন এই দৃষ্টান্তে আমাদের দেশীয় লোকেরাও উপকারজনক প্রশংসিত সাহসিক ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হন এবং হিন্দু নামেতে যে এই কলংক ছিল তাঁহারা নির্বোধ ও নিষ্কর্মা তাহা দূর করেন···"?[৯৯] এই স্বাধীন বাণিজ্যিক উদ্যমের সঙ্গে দ্বারকানাথের মধ্যে তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, প্রগতিশীল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, সর্ববিধ কল্যাণকর্মের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি ও বিরাট দানশীলতা। সেই কারণে যে 'জ্ঞানান্বেষণ' একদা তাঁকে কঠোর সমালোচনা করেছিল, সেই পত্রিকাতেই কয়েক বৎসর পরে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়, "এইক্ষণে হিন্দুগণের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠ ও পরহিতৈষী মনুষ্য তদ্ভিন্ন আর দৃষ্ট হয় নাই।"[১০০]

সমাজ ও রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে কি ভাবে নিয়মতান্ত্রিক প্রণালীতে পরিচালিত আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের আদর্শ রূপায়িত ও দাবী আদায় করা যায় এ বিষয়ে আধুনিক কালে এদেশে পথপ্রদর্শক রামমোহন রায়। তাঁর অনুবর্তিরূপে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এ দেশীয় ভূস্বামীদের নানা সমস্যার সমাধানকল্পে ও সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দাবীদাওয়াগুলি জোরালোভাবে উপস্থিত করবার উদ্দেশ্যে একটি সংঘস্থাপনের প্রস্তাব প্রথম করেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর তৎসম্পাদিত 'রিফর্মার' পত্রে ১৮৩৩ সালে।[১০১] ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় এবং 'ল্যাণ্ড হোলডার্স সোসাইটি' নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০২] এই সংগঠনে অবশ্য দলমতনির্বিশেষে

তৎকালীন জমিদারবর্গ সকলেই যোগ দিয়েছিলেন, তবে এর মূল প্রেরণা এসেছিল প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথ প্রমুখ রামমোহনমণ্ডলীভুক্ত জ্যোতিষ্কদের কাছ থেকেই। যদিও এই সংস্থার প্রধান আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণ এবং সেক্ষেত্রেও এর কীর্তি সামান্যই তবু সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এটি পরোক্ষভাবে তদানীন্তন প্রগতিশীল তরুণ সমাজকে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে উদ্বোধিত করেছিল সন্দেহ নেই। দ্বারকানাথের জনৈক চরিতকার যথার্থ বলেছেন, "The Landholders' Society···as the first notable attempt at organizing a political association on western lines in India, which became in some respects an exemplar for the future,···deserves prominent mention in the history of the country" ।[১০৩] ১৮৪২ সালে প্রথমবার ইলণ্ড ভ্রমণকালে এই 'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটির' মুখপাত্র রূপে দ্বারকানাথ রামমোহন বন্ধু উইলিয়ম এ্যাডাম কর্তৃক ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত তত্রস্থ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক দাসমুক্তি আন্দোলনের এবং মানবাধিকার (human rights) প্রতিষ্ঠা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক, প্রগতিশীল (radical) রাজনীতির পরিপোষক, বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টম্প্‌সনকে ফিরবার সময় ভারতে নিয়ে আসেন। টম্প্‌সনের কাছে ডিরোজিও অনুপ্রাণিত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী সাক্ষাৎ ভাবে তদানীন্তন প্রগতিশীল রাজনীতিতে দীক্ষা লাভ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুপ্রেরণার ফলে কলিকাতায় জন্মলাভ করে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামক প্রগতিশীল রাজনৈতিক সভা। কেবল জমিদারগোষ্ঠীর নয় সর্বশ্রেণীর ভারতীয়গণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ ও বৈধ পদ্ধতিতে আন্দোলন করাই ছিল ছিল সভার নীতি। এর প্রতিষ্ঠা ও কর্মধারার মধ্যে রামমোহন শিষ্য এবং ডিরোজিও-ছাত্রগণের সম্পূর্ণ একাত্মতা ও সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডিরোজিও-শিষ্যগণ তাঁদের সযত্ন অনুশীলিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সংগঠিত কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য পরোক্ষ ভাবে ঋণী ছিলেন কিছু কিছু উদ্যোগী রামমোহন-শিষ্যের—বিশেষত দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছেই। বিনা কারণে তাঁরা দ্বারকানাথকে নিজেদের 'হিরো' গণ্য করেন নি। ১৮৫১ সালে রাজনৈতিক সংস্থা গড়বার এই প্রবণতা পরিণত-

তর রূপে পেল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ; প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ-পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনৈতিক ভূমিতে রামমোহনপন্থী ও ডিরোজিওপন্থীগণের সম্মিলিত কর্মোদ্যমের আর এক দৃষ্টান্ত এই সংস্থা ; সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর জন্য রাজনৈতিক অধিকার অর্জনই ছিল এর লক্ষ্য।

রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন দ্বারকানাথের সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' এবং উত্তকালে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' রামমোহন-ডিরোজিওর ভাবধারার সম্মিলন ঘটিয়েছিল, তেমনি প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যমের ক্ষেত্রে ডিরোজিও উদ্বুদ্ধ তরুণ মানস সর্বপ্রথম এক ভাবাত্মক প্রতিষ্ঠাভূমি ও সংগঠিত কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেল যখন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের ভাবশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করলেন। প্রতিষ্ঠাতার আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষের সঙ্গে এই সভার জন্মকাহিনী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। প্রথম বয়েসে স্বীয় ধর্মজিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ যখন তীব্র মানসিক অশান্তি ভোগ করছিলেন সেই মুহূর্তে (সম্ভবত ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের কোনও সময়ে) তিনি রামমোহন সম্পাদিত 'ঈশোপনিষদ'-এর একখানি ছিন্নপত্র কুড়িয়ে পান ও তার প্রথম শ্লোকটির ('ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'—ইত্যাদি) মর্মার্থ অবগত হয়ে ঈপ্সিত শান্তি লাভ করেন। এর পরেই তাঁর উপনিষদ অধ্যয়ন, প্রচলিত হিন্দুধর্মে অনাস্থা সঞ্চার ও রামমোহন প্রচারিত ব্রহ্মবাদ অনুশীলন—ফলে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সৃষ্টি। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সংগঠনকে দৃঢ় করা। সভার ১৭৬৮ শকের (১৮৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের) 'সাংবৎরিক আয়-ব্যয়-নিরূপণপুস্তক'-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে : "কিয়ৎকাল হইতে এদেশে যথার্থ পরমেশ্বরের উপাসনা লুপ্ত হওয়াতে লোক সকল অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ হইয়া নানা প্রকার কাল্পনিক ধর্মের অনুষ্ঠানে অনর্থক কাল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবিধ প্রকার প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাহার উপাসনাকেই পরম ধর্ম জ্ঞান করিতে লাগিলেন।…তদুপলক্ষে উপাসক-ভেদে পরস্পর দ্বেষ-ঈর্ষার বাহুল্য হইয়া উঠিল। ধর্মের বন্ধন শিথিল হওয়াতে পরস্পর ঐক্যতারও শিথিল হইল।…এতদ্রূপ দুরবস্থা সময়ে সৌভাগ্যের চিহ্ন স্বরূপ হইয়া মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইলেন।

ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি নানাবিধ শাস্ত্রের বিধিদর্শী হইয়া তদ্বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হইলেন।...তিনি বেদপ্রণীত একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিবার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে তজ্জন্য তাঁহার আত্মীয় কি অপর অনেকেই তাঁহার বিপক্ষতা করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ম্লান না হইয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করিতে একদিনের নিমিত্তেও অনুৎসাহী হয়েন নাই।...কলিকাতা নগরে জোড়াসাঁকো পল্লীতে এক ব্রাহ্মসমাজ তিনি স্থাপন করিলেন, তাহার তাৎপর্য এই যে ঐ সমাজ উপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যান ও পরমার্থ ঘটিত সংগীতাদি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা বিশিষ্ট রূপে হইতে পারে।.... তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার কতিপয় বন্ধুর আয়াসে কিয়ৎ দিবস ঐ সমাজের কর্ম এক প্রকার নির্বাহ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু কালক্রম ঐ ব্রাহ্মসমাজের এ প্রকার অবসন্নতা হইল যে পাচ ছয় উর্ধ্ব সংখ্যা আর সমাজে দৃষ্ট হইত না এবং ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ের আলোচনা বা আন্দোলন লুপ্ত প্রায় হইল।...মহাত্মা রাজার সমকালবর্তী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপদিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি ১৭৬১ শকে ব্রাহ্মধর্ম প্রদীপ্ত করিবার মানসে তত্ত্ববোধিনী নাম্নী এই সভা স্থাপন করিলেন। এদেশের কাল্পনিক ধর্ম নিরাকরণ পূর্বক বিস্তাররূপে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করাই এ সভার সংকল্প, এ নিমিত্তে ইহার প্রথম নিয়ম এই ধার্য আছে যে 'বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবেন।"[১০৪] সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১ ভাদ্র ১৭৬৬ শক (১৮৪৩-৪৪ খ্রী:) সংখ্যায় ইংরেজিতে এই বিবরণের সারমর্ম দিয়েছেন: "The members are fully aware of the extent to which the cause of religion was carried during the time of the celebrated Rammohun Roy. But it is no less a fact that, in his lamentable demise, it received a shock from which it was feared it could hardly have recovered. The exertions of the Tuttuvodhini Society however have imparted renewed energies to the cause."[১০৫] সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, প্রথম থেকেই স্থির হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনাদির কাজ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানের কাজ সভা করবে।[১০৬] উভয় সংস্থার এই ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৭৮১ শকাব্দে

(১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) তত্ত্ববোধিনী সভা তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিশে যায়। এর জীবৎকালে অর্থাৎ ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত কুড়ি বৎসরে—এই সভা ছিল সমসাময়িক বিভিন্ন প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সর্বাধিক শক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন্ন মিলনভূমি ও কর্মকেন্দ্র।[১৭] মাত্র দশজন সভ্য নিয়ে সভার কাজ স্বরু হয়েছিল; কিন্তু এই প্রগতিশীল সংস্থাটির আকর্ষণ এত দ্রুত বেড়ে যায় যে কিছুকালের মধ্যেই এর সভ্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল আট শতেরও অধিক—সে যুগের পক্ষে যা সত্যই বিস্ময়কর।[১৮] ব্রাহ্মসমাজের সংগঠন, হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতের পুরাতত্ত্ব চর্চা, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন, শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর খ্রীষ্টীয় ধর্ম যাজকগণের আক্রমণের প্রতিবাদ, খ্রীষ্টধর্মের প্রসার রোধ, জমিদার ও নীলকরগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাপক্ষ সমর্থন, পরোক্ষ রাজনীতি চর্চা, বাঙ্‌লা সাহিত্যের চর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর জীবৎকালে সভা সর্বদা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে দেশে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার 'বার্ষিক আয়-ব্যয়-স্থিতির নিরূপণ পুস্তক' গুলিতে ও সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিক'ার ফাইলে নিয়মিত ভাবে মুদ্রিত এর সুবিস্তীর্ণ সভ্যতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে সে-যুগের তিনটি স্বতন্ত্র প্রগতিশীল চিন্তাধারা একত্র মিলিত হয়েছিল। রামমোহন প্রচারিত ব্রহ্মবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাঁর মুক্তি-আন্দোলনের অনুরাগী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রসন্নকুমার ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রমাপ্রসাদ রায়, লালা হাজারীলাল, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রমানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি ছিলেন এক ধারার প্রতীক। এঁদের মধ্যে সকলে না হলেও অধিকাংশ নব প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। সভাগঠনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। কালক্রমে এই মণ্ডলীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ধ্যানপরায়ণ ঈশ্বরজিজ্ঞাসু এবং অক্ষয়কুমার দত্ত রাখালদাস হালদার অনঙ্গমোহন মিত্র প্রমুখ বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী দুই পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। অপর এক দলভুক্ত ছিলেন তেজস্বী সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জ্ঞানতপস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি। ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা কেউ দীক্ষিত বা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন না; 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মধ্যে সমাজসংস্কার, সাহিত্য সেবা, পুরাবৃত্ত-

চর্চা ইত্যাদির অনুশীলনের একটি অনুকূল পরিবেশ লক্ষ্য করেই এই মনীষীরা সভার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই ধারাভুক্ত সভ্যসংখ্যা ছিল প্রচুর এবং এঁদের মানসিকতার বৈচিত্র্যের কথা স্মরণে রাখলে একে মিশ্র ধারা বলা সঙ্গত। তৃতীয় ধারার অন্তর্গত হলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, ব্রজনাথ ধর, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, শ্যামাচরণ সেন প্রমুখ যাঁদের অধিকাংশই হয় ডিরোজিওশিষ্য অথবা ডিরোজিও সৃষ্ট ভাবপরিমণ্ডলভুক্ত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয়। আপন সংগঠন-নৈপুণ্যের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যে সমসাময়িক প্রগতিশীল চিন্তার এই ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়েছিলেন। আমরা দেখেছি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পরম অনুরাগী হয়েও রামমোহন ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও দেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃতির মর্মজ্ঞ ছিলেন এবং এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়ের মাধ্যমে নূতন জীবনদর্শন গঠনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'তত্ত্ব-বোধিনী সভা' জাতীয় জীবনে এই আদর্শকেই রূপদান করবার ব্রত গ্রহণ করেন। এই সভার অনুসৃত মার্গেই স্বাধীনচেতা সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী ডিরোজিও-শিষ্যগণ উপযুক্ত গঠন-মূলক কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ছাত্র-জীবনে তাঁদের মনে যে মাদকতার সঞ্চার হয়েছিল তার ফলে সাময়িক ভাবে এঁদের কেউ কেউ হয়তো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, কেননা উচ্ছ্বাস বা আতিশয্যই তারুণ্যের ধর্ম। তত্ত্ববোধিনী সভার যুগে দেখা যাচ্ছে তাঁদের জীবনের প্রথম পর্বের সেই বিচ্যুতি অপসারিত, তাঁরা সম্পূর্ণ আত্মস্থ। জীবনের এই প্রকৃত সৃষ্টিশীল পর্বে রামমোহনের সমন্বয়াদর্শের প্রতি আর তাঁদের বিরূপতা নেই; এই আদর্শের রূপায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যে তাই তাঁরা উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন।

এই সূত্রে উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে স্থাপিত 'Hindu Theo-philanthropic Society' ও পঞ্চাশের দশকে প্রতিষ্ঠিত 'সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদ্-সমিতি' নামক সংস্থাদ্বয়ের আদর্শ ও কর্মপন্থাও পর্যালোচনার যোগ্য। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মে প্রথমোক্ত সভাটি নব্য বঙ্গগোষ্ঠীর অন্যতম মুখপাত্র রামমোহনের অনুরাগী ও উত্তর জীবনে রামপুর,

বোয়ালিয়া (রাজসাহী) ব্রাহ্মসমাজের সংগঠক কিশোরীচাঁদ মিত্র কলিকাতায় স্বগৃহে স্থাপন করেন। ১৮৪৬ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি জীবিত ছিল।[১০৯] এর মাসিক অধিবেশনসমূহে পঠিত এক গুচ্ছ ইংরেজি-বাঙলা প্রবন্ধ Discourses read at the meetings of the Hindu Theophilanthropic Society Vol. I নামে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত প্রথম প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ লিখেছেন: "The object of the 'Hindu Theophilanthropic Society' is the cultivation of moral and religious feeling. It is, as the very name implies, to promote love to God and love to man. The Society aims at the extermination of Hindu idolatry and the dissemination of sound and elevated views of God, Futurity, Truth and Happiness. Though it is established for the purpose of promoting moral and religious culture irrespective of any revealed form and only by the study of duties and destinies of man as revealed by his constitution and the power, wisdom and goodness of God as manifested in nature, still its basis is broad and unexceptionable enough to admit the cordial co-operation of every good man, no matter to what creed he may belong"।[১১০] প্রতীকোপাসনাবর্জিত বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অনুশীলন, মানবপ্রেম ও অসাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি আদর্শগুলির একত্র সমাবেশ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই সভা স্থাপনের মূলে রামমোহনের আদর্শ ক্রিয়াশীল। বস্তুত এক বৎসর পরে Calcutta Review পত্রে প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত 'রামমোহন রায়' শীর্ষক তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ স্পষ্টই বলেছেন, ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রেমের সুষ্ঠু সমন্বয়ের আদর্শ পূর্ণ বিকশিত হয়েছে রামমোহনের মধ্যে—তাঁর জীবনদর্শনের যদি কোনও সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয় তাহলে তাঁকে আখ্যা দিতে হয় Theophilanthrophist; 'হিন্দু থিওফিলানথ্রোপিক সোসাইটি' সেই আদর্শই অনুসরণ করে চলেছে।[১১০ক] সভার অধিবেশনগুলিতে যাঁরা নিয়মিত উপস্থিত থেকে প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন বা আলোচনায় যোগ দিতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (কবি ও সাংবাদিক), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্-সমিতি' ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; যুগ্ম সম্পাদক: কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত; কার্যনির্বাহক সমিতিতে ও সাধারণ সদস্য-তালিকায় নব্যবঙ্গগোষ্ঠীর অনেকেই উপস্থিত—যথা প্যারীচাঁদ মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব, দিগম্বর মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, গৌরদাস বসাক, প্রভৃতি। বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহনিবারণ, জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের স্বার্থসংরক্ষণ, হিন্দুসমাজে প্রচলিত উৎসবানুষ্ঠানগুলি থেকে নিষ্ঠুর অশালীন আচরণসমূহের অপসারণ প্রভৃতি কাজে এই সভার প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।[১১] 'হিন্দু থিওফিলানথ্রোপিক সোসাইটি' এবং 'সুহৃদ্-সমিতি'-দু'টি সংস্থার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, রামমোহন ও ডিরোজিওর ভাবধারা একই স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়ে একই খাতে একই লক্ষ্য অভিমুখে প্রবাহিত। কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য প্রতিষ্ঠান দু'টির জন্ম একথা বিস্মৃত হলে চলবে না। এ যুগের প্রগতিশীল মনন ও কর্মজগতের প্রেরণার প্রধান উৎস 'তত্ত্ববোধিনী সভা'—তার প্রতিষ্ঠার মূলে যে আদর্শ কার্যকরী—উক্ত সংস্থাদ্বয়ের পশ্চাতেও তাই। এমন কি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' যাঁদের উদ্যোগে ও যাঁদের সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—তাঁদেরই দেখা যাচ্ছে 'হিন্দু থিওফিলানথ্রোপিক সোসাইটি' ও 'সুহৃদ্-সমিতি'র কর্মকর্তা ও সভ্যরূপে। এ যোগাযোগ আকস্মিক নয়। রামমোহন যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে নব্যবঙ্গগণ অনেকেই সেই জীবনচর্যা গ্রহণ করেছিলেন আলোচনাপ্রসঙ্গে পূর্বে তা দেখা গেছে। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে ডিরোজিও-প্রভাবিত তরুণগোষ্ঠী সচেতন ও সুপরিকল্পিত ভাবে সাংগঠনিক ভিত্তিতে সেই আদর্শকে জাতীয় জীবনে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তত্ত্ববোধিনী যুগে দুই ভাবধারার সমন্বিত আদর্শই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

উপসংহারে মাত্র একটি ক্ষুদ্র বক্তব্য থাকে। ঐতিহাসিক তথ্যবিচারের দ্বারা দেখা গেল রামমোহন ও ডিরোজিও যে দুই প্রগতিশীল ঐতিহ্যধারা সৃষ্টি করেন সেগুলি সর্বদা পারস্পরিক পার্থক্য বজায় রেখে সমান্তরাল প্রবাহরূপে চলে নি;

কালক্রমে একত্র মিলিত হয়ে একটি অগ্রগামী সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই সমন্বিত পর্বে ডিরোজিও প্রভাবিত তরুণগোষ্ঠী রামমোহনের ভাবধারাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু নিজেদের বৈশিষ্ট্য তাঁরা হারিয়ে ফেলেন নি। গুরুর নিকট হতে তাঁরা যে যুক্তিবাদ ও স্বাধীনচিত্ততার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন নবযুগের চিন্তাকে তা উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি রামমোহন প্রথমজীবনে শাস্ত্রপ্রমাণকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে স্বীয় ধর্মচিন্তাকে বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত বর্জন না করলেও খানিকটা সংশোধন করেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তায় এবং অধ্যাত্মজীবনগঠনের প্রয়াসে শাস্ত্রেরও যে একটি উল্লেখযোগ্য ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান আছে তা স্বীকার করেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে ভোলেন নি যে শাস্ত্রপ্রমাণ (scripture) যুক্তি (reason) ও সহজজ্ঞানের (common sense)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তবেই তা গ্রহণযোগ্য হবে।[১১২] রামমোহনের পর ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মসভার নেতৃত্ব ও উপাসনা পরিচালনের ভার সাময়িক ভাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি যে সকল পণ্ডিতের হাতে এসেছিল উদারতা এবং সৎসাহস সত্ত্বেও রামমোহনে ন্যায় প্রখর মনীষা ও সার্বভৌম দৃষ্টি তাঁদের ছিল না—তাঁরা সরাসরি অভ্রান্তরীতিতে শ্রুতিপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহদীক্ষিতগণ যখন ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করেন তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে নি; ব্রাহ্মসমাজ বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী বলেই মনে করতেন এবং স্বীয় ধর্মকে 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' বলে ঘোষণা করতেন। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন ধর্মবিশ্বাস রামমোহনযুগের বিশ্বজনীন চরিত্র হারিয়ে ফেলে। এই সময় খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজের যে বাদ-প্রতিবাদ সুরু হয় তার ফলে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ পোষিত বেদের অভ্রান্ততার প্রশ্নটি আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণ এই নিয়ে ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ তো করেনই—ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যেও এই অভ্রান্তশাস্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে প্রধান আপত্তিকারী ছিলেন যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক একেশ্বরবাদরূপে

পরিকল্পনা করে অভ্রান্তশাস্ত্রপ্রামাণ্য খণ্ডন করতে অগ্রসর হলেন। অপর পক্ষে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপাসক সত্যানুরাগী ডিরোজিওশিষ্যদল যাঁরা প্রায় সকলেই তত্ত্ববোধিনী সভায় সমবেত হয়েছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অযৌক্তিক ও অসত্যের সঙ্গে অযথা আপসপরায়ণতা বলে নিন্দা করলেন। ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীবর্গের কঠোর সমালোচনাও এঁরা মোটেই পছন্দ করেননি। রামতনু লাহিড়ী ১৮৪৬ সালের ২৪ জুলাই এই বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রে তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে এই দুটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, ও এই কারণে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' গ্রহণ করতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন।[১১৩] দেখা যায় প্রতিবাদের দুটি ধারা দুই স্বতন্ত্র উৎসমুখ থেকে নির্গত। অক্ষয়কুমার অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন প্রধানত রামমোহনের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা—অভ্রান্তশাস্ত্রবাদখণ্ডনে তাঁর প্রধান অবলম্বন রামমোহন রচিত 'তুহফাৎ-উল্ মুওহাহিদিন'।[১১৪] অন্য দিকে ডিরোজিও-শিষ্যগণের প্রতিবাদ উৎসারিত হয়েছিল—ডিরোজিও উপদিষ্ট যুক্তিবাদ ও নৈতিক সততার প্রত্যয় থেকে—যা কথা এবং কাজের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্য দাবী করে এবং মুখে কোনও আদর্শ বা বিশ্বাস জ্ঞাপন করে জীবনে তা রূপায়িত না করা যে দৃষ্টিতে নৈতিক অপরাধ। প্রতিবাদের ভূমিতেও রামমোহন-ডিরোজিও পাশাপাশি আছেন। এই যুগ্ম প্রতিবাদের ফলেই ব্রাহ্মসমাজের ধর্মবিশ্বাসে বিপ্লবী রূপান্তর ঘটে গেল। দেবেন্দ্রনাথ প্রবৃত্ত হলেন সমগ্র বেদ উপনিষদের পুনরধ্যয়নে ও পুনর্মূল্যায়নে। তিনি উপলব্ধি করলেন যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শাস্ত্রকে সমগ্রভাবে রক্ষা করা যায় না এবং শেষ পর্যন্ত ঘোষিত হল ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি কোনও অভ্রান্ত শাস্ত্র নয়—তা হল উপাসকের 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'।[১১৫] এই আত্মপ্রত্যয়ের সমর্থন শাস্ত্রের যে অংশে পাওয়া যায় শাস্ত্রের সেই অংশই শ্রদ্ধেয়। দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পরিবর্তন মাত্র ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজেরই রূপান্তর ঘটায়নি, আধুনিক ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও যুগান্তর এনেছে। রামমোহনের ভাবশিষ্য অক্ষয়কুমার দত্তর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপাসক ডিরোজিওশিষ্যগণের নিকটও আধুনিক যুগ এ বিষয়ে ঋণী। তত্ত্ববোধিনীপর্বের এই সমন্বিত ভাবধারাই ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে কেশবচন্দ্র-শিবনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কীর্তিমণ্ডিত যুগের উপযুক্ত ভূমিকা রচনা করেছে।

প্রমাণপঞ্জী

১. ডিরোজিওর জন্মের সন-তারিখ নিয়ে সম্প্রতি কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। টমাস এড্‌ওয়ার্ড্‌সের মতে ডিরোজিও জন্মেছিলেন ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল (*Henry Derozio: The Eurasian Poet, Teacher and Journalist* Calcutta 1980, p. 2)। ডিরোজিওর অপর জীবনীকার ইলিয়ট ওয়াল্টার ম্যাজ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের *Bengal Directory*-র সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উক্ত মত সংশোধন করে সিদ্ধান্তে আসেন, তাঁর জন্মের সন তারিখ ১৮ এপ্রিল, ১৮০৯ (*Henry Derozio: The Eurasian Poet and Reformer*, New Ed, Calcutta 1967, ed. Subir Ray Choudhuri, Introduction, p. ii)। বর্তমানে এই মতটিই সর্বাধিক প্রচলিত। সম্প্রতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১ তারিখের *Calcutta Gazette*-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন ডিরোজিওর জন্মতারিখ ১৮ এপ্রিল হলেও জন্মবৎসর হবে ১৮০৮ (*Renascent India* Calcutta 1976, p. 252)। এই মতের সমালোচনা করেন ডঃ যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮৩তম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৬৮-৬৯); তিনি ম্যাজ প্রদত্ত ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দকেই ডিরোজিওর সঠিক জন্মসাল মনে করেছেন। সমালোচনার কিছুটা অসহিষ্ণু উত্তর দেন ডঃ মজুমদার (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮৩তম বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ ৪২-৪৩)। প্রত্যুত্তরস্বরূপ ডিরোজিওর জীবদ্দশায় কৃত তাঁর নিজের উক্তির ভিত্তিতেই ডঃ মজুমদারের মত পুনর্খণ্ডন করেছেন ডঃ চৌধুরী (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৮৭তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৩১-৩২)। শেষোক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর ডঃ মজুমদারের মত আর নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া চলে না।

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব', ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৬৮—সম্পাদক যোজিত আনুষঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১১১, পাদটীকা ৮১

৩. ভারতকোষ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) প্রথম খণ্ড 'ইংরেজকুল, নব্যবঙ্গ', পৃঃ ৫১৭

৪. Prem Sunder Basu *Life and Works of Brahmananda Keshav* Calcutta 1940 pp. 6-8

৫. Peary Chand Mitra *A Biographical Sketch of David Hare* (Reprint. Calcutta 1949) p. 32

৬. T. Edwards. *Henry Derozio; The Eurasian Poet, Teacher and Journalist* (New Edition. Calcutta 1980) p. 65

৭. P. C. Mitra *Op. Cit.* p. 31

৮. *Ibid.* pp. 17-18

৯. *Ibid.* p. 32

১০. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯০৯) পৃঃ ১০৮

১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ) পৃ: ৫২; শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, মাধবচন্দ্রের এই মর্মে কৃত ইংরেজি উক্তিটি সর্বপ্রথম ডিরোজিওর ছাত্রমণ্ডলী পরিচালিত *Athenaeum* (*Parthenon* ?) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ: ৯১)।

১২. *India Review*, October 1942 সংখ্যায় প্রকাশিত কৃষ্ণমোহনের আত্মজীবনীমূলক বিবৃতিতে কথিত উক্ত কাহিনীটি উদ্ধার করেছেন শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, 'রামকমল সেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়' (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা), পৃ: ৩৭

১২ ক. *The Days of John Company: Selections from Calcutta Gazette 1824-1832* Compiled and Edited by A. C. Dasgupta. Calcutta 1959, p. 725.

১৩. E. W. Madge কর্তৃক উদ্ধৃত; দ্রষ্টব্য তাঁর *Henry Derozio : The Eurasian Poet and Reformer* (New Edition, Calcutta 1967) p. 16n.

১৪. *The Oriental Magazine* Vol. I No. 10 (October, 1843) 'Henry Louis Vivian Derozio', reprinted in Madge, *Op. Cit*, pp. 35-59

১৫. *Ibid.* p. 49

১৬. *The Bengal Obituary or a record to perpetuate the memory of Departed Worth being a compilation of Tablets and Monumental Inscriptions from various parts of Bengal and Agra Presidencies* by Holmes & Co. (W. Thacker & Co., London and St. Andrews Library, Calcutta 1851). p. 106

১৭. T. Edwards, *Derozio* pp. 169-70

১৮. *Ibid.* pp. 125-26, 170

১৯. *Ibid.* pp. 170-71

২০. *Ibid.* p. 171

২১. হিন্দু কলেজের রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওর ছাত্রমণ্ডলীর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁকে দায়ী করে শিক্ষকপদ থেকে তাঁর অপসারণ দাবী করলে ডিরোজিও ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠান। ঐ তারিখে ডিরোজিওকে লিখিত এক ব্যক্তিগত পত্রে উইলসন জানতে চান ডিরোজিওর বিরুদ্ধে নাস্তিকতার বা হিন্দুসমাজে প্রচলিত সামাজিক বিধিলংঘনে ছাত্রগণকে উৎসাহদানের অভিযোগ সত্য কিনা। তদুত্তরে ডিরোজিও উইলসনকে ২৬ এপ্রিল, ১৮৩১ তারিখে তাঁর উল্লিখিত পত্রখানি লেখেন। পত্রখানির জন্য দ্রষ্টব্য Peary Chand Mitra *A Biographical Sketch of David Hare* (Calcutta 1949) pp. 24-31; T. Edwards *Derozio* pp. 82-89; উদ্ধৃত অংশের জন্য দ্রষ্টব্য Mitra *Op. Cit.* pp. 25-26; Edwards. *Op. Cit.* pp. 82-84.

২২. এটা লক্ষ্য করবার বিষয়, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রমুখ ভারতবর্ষের ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষভাবে হিন্দুসমাজকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার জন্য এযাবৎ খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের উদ্যম ব্যয়িত হয়েছে সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলিকে

ধর্মান্তরিত করবার চেষ্টা তাঁরা অবশ্যই করেছেন—কিন্তু হিন্দুগণকে "উদ্ধার" করবার জন্য অবলম্বিত তাঁদের প্রয়াসের তুলনায় সে-সব এমন কিছু নয়। প্রধানত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক উন্নাসিক সমালোচনা এদেশে খ্রীষ্টীয় প্রচারের অঙ্গবিশেষ।

২৩. Alexander Duff *India and India Missions including the sketches of Hinduism both in Theory and Practice* Second Ed. Edinburgh, 1840, Appendix: 'Brief sketch of the circumstances which led to the delivery of the *first* series of Lectures on the Evidence and Doctrines of Revealed Religion ever addressed to an audience of Educated Hindus in Eastern India-with notice of some of the results, as more especially manifested in the ultimate conversion of a few to the faith of Jesus,' pp. 630-33

২৪. *The Enquirer* February 1835, pp. 39-40; আমার ছাত্র শ্রীমতী অনীতা কুমার ও ছাত্র শ্রীমৃণালকান্তি চন্দের সৌজন্যে আমি এই দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার ফাইলগুলি দেখবার সুযোগ পেয়েছি।

২৫. এড্‌ওয়ার্ড্‌স স্পষ্টই বলেছেন, "That Krishna Mohun Banerjee, Mohesh Chunder Ghosh, and others of Derozio's pupils went over to Christianity was only what was to be expected, was only the logical consequence of the teaching of their friend and master···," (*Henry Derozio* p. 95); ম্যাজ্‌ সাধারণভাবে এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন, "···it will be seen that the 'moral lessons taught by Derozio' made the work of Christian missionaries more easy of accomplishment." (*Henry Derozio, the Eurasian Poet and Reformer* p. 10)।

২৬. A. F. Salahuddin Ahmed *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835* Leiden 1965 pp. 42-43

২৭. R. C. Majumdar *Renascent India (Nineteenth Century)* Calcutta, 1976, pp. 259-60

২৮. রামমোহনের জন্মসাল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ ধরলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামমোহনের বয়সের ব্যবধান দাঁড়ায় ২২: রমানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ২৮; প্রসন্নকুমারের সঙ্গে ২৯, নন্দকিশোর বসুর সঙ্গে ৩০; তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে ৩২; কালীনাথ মুন্‌শীর সঙ্গে ২৯; বৈকুণ্ঠনাথ মুন্‌শীর সঙ্গে ৩৪। এ হিসাব আরও বাড়ানো চলে।

২৯. নগেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৩৭

৩০. Madge *Derozio* p. 12

৩১. Quoted by A. F. Salahuddin Ahmed in his *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835* p. 48

৩২. নগেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৩২

৩৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, (কলিকাতা ১৩৮৫) পৃঃ ৪৮২-৮৩

৩৪. Francis Bacon *Essays* (Collins Ed.) XVI "Of Atheism" p. 148

৩৫. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩১৯) পৃঃ ৩২

৩৬. অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (এলাহাবাদ, ১৯১৩) : 'জীবন চিত্রের খসড়া' পৃঃ গ-ঘ

৩৭. ভবতোষ দত্ত 'রামমোহন রায় ও ভারতীয় অর্থনীতি' বিশ্বভারতী পত্রিকা ২৮ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ ১৩৭৯) পৃঃ ১১৭

৩৮. India Gazette February 12, 1830 quoted in Bemanbehari Majumdar *History of Indian Social and Political Ideas* Calcutta 1967, pp. 54-55 ; ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই ব্যাপারটি এমন ভাবে উল্লেখ করেছেন যার থেকে মনে হতে পারে এটি বোধ হয় তদানীন্তন 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর ভারতে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সামান্যলক্ষণ : "...we know that at least some leading students of the Hindu College very strongly attacked a pet political programme of Rammohun Roy namely the establishment in India of a permanent colony of cultured Englishmen (sic). In a paper read by a student before the Hindu Literary Society and published in the India Gazette of 12 February 1830, the whole history of European colonization was reviwed and its evil effects were condemned in strong language," (*Renascent India* p. 260)। ডঃ মজুমদার মূল India Gazette পড়েন নি, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু যে পঙ্‌ক্তিটিকে তিনি তাঁর উক্তির আকররূপে ব্যবহার করেছেন ঠিক তার পূর্বের পঙ্‌ক্তিতেই যে বিমানবিহারী 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্র Parthenon ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যার উক্তি থেকে India Gazette (১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০)-এর উদ্ধৃতির ভিত্তিতে বলেছেন "Some students of the Hindu College supported Rammohun Roy's scheme of colonization of India by cultured European settlers" (B. B. Majumdar *Op. Cit.* p. 54), সে কথা তিনি বাদ দিলেন কেন ?

৩৯. রামমোহন ও তাঁর বন্ধুবর্গ কর্তৃক বাঙলা ও ইংরেজি ভাষায় বেণ্টিংক্‌কে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র *Government Gazette* Vol. *XVI* No. 858 (January 18, 1830) (First Supplement pp. 3-4)-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

৪০. নগেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৬৮, পাদটীকা ; উল্লেখ্য যে, রামমোহন-জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক সময় ডিরোজিওর একখানি চরিত প্রণয়নের সংকল্প করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ডিরোজিও-শিষ্য রামতনু লাহিড়ী ও অন্যান্য সমসাময়িক ব্যক্তিদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। দ্রষ্টব্য রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত তাঁর পত্র—তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ বৈশাখ ১৩৫৭ (২৯ এপ্রিল ১৯৫০), পৃঃ ১২

৪১. *Calcutta Monthly Journal* Vol. V, New Series (May to August 1834) 'First Memorial Meeting of Raja Rammohun Roy' pp. 258-66 ; রসিককৃষ্ণ ও অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতাগুলি ঐখানে সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছে।

৪২. *Asiatic Journal* July 1820, p. 92

৪৩. *Hindu Patriot* Vol IX, No. 39 (September 29, 1862) p, 311 ; No. 40 (October 6, 1862) pp. 317-19 ; No. 41 (October 13 1862) pp. 326-28

৪৪. Collet p. 220

৪৫. *Ibid.* p. 225

৪৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২৫১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৭৯৪ শক, পৃঃ ১৩৯-৪০

৪৭. *Enquirer* January 1835, 'Thoughts on Indian Reformers', pp. 1-8 ; অন্যত্রও বেদ-উপনিষদের মত অধন্য (কৃষ্ণমোহনের মতে) শাস্ত্রের প্রতি রামমোহনের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষপাতিত্বে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে what is astonishing, such a mighty mind as that of Rammohun Roy was not ashamed to submit or at least to profess submission to it— *Enquirer* December 1834. p. 19) ।

৪৮. *Enquirer* February 1835, pp. 34-35

৪৯. Majumdar *Prgressive Movements* No. 117, p. 204

৫০. *Calcutta Review* Vol. III (January-June 1845) pp. 132-33

৫১. অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, 'নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎ সহধর্মিণীর জীবনালেখ্য', কলিকাতা ১৩১৮, পৃঃ ৩৫

৫২. তদেব, পৃঃ ২৪৩ ; শিবচন্দ্র তাঁর পুত্রের জন্য পাণ্ডুলিপি আকারে এই অতি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী রচনা করেন। তাঁর বাঙলা জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এটি তাঁর উল্লিখিত বাঙলা জীবনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন (পৃঃ ২৩২-৪৬)।

৫৩. তদেব, পৃঃ ১৭৭-৭৮-তে উদ্ধৃত।

৫৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত,—প্যারীচাঁদ মিত্র, (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৯) দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৫০, পৃঃ ১৮

৫৫. 'লুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী' (কলিকাতা ১৮৯২)-র অন্তর্ভুক্ত 'যৎকিঞ্চিৎ' দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১২৯৯, পৃঃ ১ ; রামমোহন রচিত সংগীতটির পূর্ণ বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য, 'ব্রহ্মসঙ্গীত', গ্রন্থাবলী ৪, পৃঃ ৬২

৫৬. 'যৎকিঞ্চিৎ' (লুপ্তরত্নোদ্ধার), পৃঃ ৬

৫৭. তদেব, পৃঃ ৫১ ; 'ব্রাহ্মধর্মঃ', নবম সংস্করণ, কলিকাতা ১২৯৭, পৃঃ ২৫-২৬

৫৮. তদেব, পৃঃ ৫২-৫৩ : 'ব্রাহ্মধর্মঃ', পৃঃ ৪৭

৫৯. তদেব, পৃঃ ৮৬

৬০. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ১১৪

৬১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী' (চতুর্থ সংস্করণ), পৃঃ ৪০৬-০৯

৬১ ক. ১৯ বৈশাখ, ১২৪১ (৩০ এপ্রিল ১৮৩৪) তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত চাঁদা-দাতৃগণের নামতালিকা দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ৪৯৩ ; নামটি এখানে 'দক্ষিণানন্দ' ছাপা হয়েছে ; তাঁর নামটি এই আকারেও প্রচলিত ছিল, এবং তার অনেক উল্লেখ আছে।

৬২. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত (দ্বিতীয় সংস্করণ). পৃঃ ১১৭-১৯ ; মন্মথনাথ ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা, ১৩২৪), পৃঃ ১২২-২৩

৬৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ৪৯৩

৬৪. *Bengal Spectator* Vol. I No. 5 (July 1842) pp. 49-50 ; **Vol. II, No. 23 (July 16, 1843) pp. 205-06 ; Vol. II No. 25 (August. 24, 1843) p. 249**

৬৫, *Ibid*, Vol II, No. 23 (July 16, 1843) pp. 205-06

৬৬. **Ramgopal Sanyal** *A General Biography of Bengai Celebrities* **Vol. I, Calcutta 1889. p. 180**

৬৭. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩১৮) পৃঃ ৩৬

৬৮. *Calcutta* **Review** Vol IV (July-December 1845) pp. 392, 393

৬৯. আর্যদর্শন, কার্তিক ১২৯১, 'রাধানাথ শিকদার : দ্বিতীয় প্রস্তাব', পৃঃ ২২৭

৭০. তদেব, পৃঃ ২২৩ ; রাধানাথের এই আত্মজীবনীটি 'আর্যদর্শন' কার্তিক ১২৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত বাঙলা প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত।

৭১. R. C. Majumdar *Renascent India* p. 259 ; এখানে বিনীত বক্তব্য, ডঃ মজুমদার এই সিদ্ধান্তস্থাপনকালে বিচারের যে যে মানদণ্ড নির্ণয় করেছেন, রামমোহন-প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি স্বয়ং তা মেনে চলেন নি। রামমোহনের জন্ম সাল ১৭৭২ অথবা ১৭৭৪ এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে ১৭৭৪-এর পক্ষে তিনি লিখতে দ্বিধা করেন নি, **"Kishorichand Mitra, who knew the Raja very well, wrote in the** *Calcutta Review* **in 1845 that the Raja was born in 1774"** (*On Rammohan Roy* Calcutta 1972, p. 5) ; এবং এ বিষয়ে কিশোরীচাঁদের উক্তিকে রেভাঃ ডল উদ্ধৃত রমাপ্রসাদ রায়ের বিপরীত মতের (১৭৭২) বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন (*Ibid*. pp. 14-15)। কিশোরীচাঁদের জন্ম ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে এবং রামমোহনের বিলাতযাত্রাকালে (১৮৩০) তিনি আট বছরের বালকমাত্র। সুতরাং প্রবীণ ঐতিহাসিকের পরোক্ষ যুক্তি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াচ্ছে, এই বালক রামমোহনকে এতই ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন (তিনি যে রামমোহনকে আদৌ জানতেন এ তথ্য ডঃ মজুমদার কোথায় পেলেন জানি না) যে সেই বাল্য বয়সেই তাঁর প্রকৃত জন্মসালটি পর্যন্ত জেনে নিয়ে মনে করে রেখেছিলেন, এবং পনর বছর পরে তাঁর প্রবন্ধে সেটি সঠিক ভাবে ব্যবহার করেছিলেন। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত যেখানে নিজের অভিপ্রেত সেখানে আট বছরের বালকের সাক্ষ্যও প্রমাণ হিসাবে অবশ্য গ্রাহ্য ! তাহলে ডঃ মজুমদারের হিসাব মত রামমোহনের বিদেশযাত্রাকালে

"ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত যাঁদের বয়স ১৫ থেকে ২০র মধ্যে—তাঁদেরই বা রামমোহনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে বা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হতে বয়সের দিক থেকে বাধা কোথায়? ডঃ মজুমদার একথা খুব জোর দিয়েই বলেছেন, এক তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছাড়া 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর আর কেউই যে রামমোহনের সংস্পর্শে এসেছেন তার কোনও প্রমাণই নেই (*Renascent India* p, 259)। এই উক্তি তথ্যগত ভাবে ঠিক নয় তা আমরা দেখেছি (দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৪০৯-৬০)। কিন্তু মুহূর্তকালের জন্য যদি তথ্যগত অসঙ্গতির প্রশ্ন না তুলে আমরা এই উক্তিকে তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিই, তাহলেও ডঃ মজুমদারকে বোধ করি প্রতিপ্রশ্ন করা চলে, কিশোরীচাঁদ যে আট বছর বয়সের মধ্যেই রামমোহনের অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন তার প্রমাণ কোথায়? কিন্তু সঙ্গতি-অসঙ্গতি বিচারের প্রয়োজনই অনাবশ্যক হয়ে পড়ে যখন লক্ষ্য করা যায়, ডঃ মজুমদারের যে *On Rammohan Roy* গ্রন্থে কিশোরীচাঁদের আট বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার এবং সেই হেতু রামমোহনের জন্মসাল সম্পর্কে তাঁর সাক্ষ্যের মূল্যবত্তার উল্লেখ আছে, সেই একই গ্রন্থে হিন্দু কলেজ পরিকল্পনার উৎপত্তি সম্পর্কে ডিরোজিওর মতামত নাকচ করে গ্রন্থকার বলেছেন: "Derozio was a lad of nine years when the Hindoo College was founded and could not have any personal knowledge" (*On Rammohan Roy* p. 31)। অর্থাৎ রামমোহনের জন্মসালপক্ষে আট বছরের বালক কিশোরীচাঁদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য কেন না তা ডঃ মজুমদারের অভিপ্রেত সিদ্ধান্তের পক্ষে; কিন্তু হিন্দু কলেজ স্থাপন কালে ডিরোজিওর বয়স যেহেতু মাত্র নয় বৎসর ছিল, সে হেতু হিন্দুকলেজের সঙ্গে উত্তরজীবনে ঘনিষ্টভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও হিন্দু কলেজ-পরিকল্পনার উৎপত্তি সম্পর্কে ডেভিড হেয়ার-রামমোহন এই পরিকল্পনার জনক এই মর্মে তাঁর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য, কেন না তা ডঃ মজুমদারের অভিপ্রেত সিদ্ধান্তের বিরোধী। একই গ্রন্থে কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে যাঁর যুক্তিতে এত স্ববিরোধ, গ্রন্থান্তরে তিনি যে তাঁর পূর্বনির্ণীত মানদণ্ড বিস্মৃত হবেন তা বিচিত্র কি?

৭২. আর্যদর্শন, কার্তিক ১২৯১ 'রাধানাথ শিকদার: দ্বিতীয় প্রস্তাব', পৃঃ ২২৩

৭৩. ২৩ জুলাই ১৮২৮ রাধাপ্রসাদ রায় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংকের নিকট যে আবেদন পাঠান তাতে তিনি তাঁর পিতার গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা ও জননীর মৃত্যুপ্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এই বিষয়ে ইউরোপীয় চিকিৎসক ডঃ এলেক্জাণ্ডার হ্যালিডের একখানি সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন (*Letters and Documents* No. 249, p. 519); কর্নেল জেমস ইয়ং ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮২৮ তারিখে বেন্থামকে লিখিত এক পত্রে নির্যাতন ও দুশ্চিন্তার দরুণ রামমোহনের স্বাস্থ্যহানির উল্লেখ করে বলছেন, "Rammohun Roy, after an arduous and prolonged battle through gradations of tribunals, has at length by dint of talent, perseverance, right, got the better in the last resort; but the strife and magnititude of the stake and long despairs of justice have shattered his nerves and impaired his digestion and bodily health and his energies of mind". (*Collected Works of Jeremy Bentham* ed. J. Bowring, Vol. XI p. 7)।

৭৪. Quoted by the *Asiatic Journal* Vol. II, New Series (May to August 1830) : 'Asiatic Intelligence' p. 202

৭৫. *Letters and Documents* pp. lxxv—lxxxiii, 519

৭৬. *Works of Jeremy Bentham* ed. J. Bowring Vol. XI pp. 7-9 ; *Correspondence of Lord William Bentinck 1828-35* ed. C H. Phillips, Vol- II pp. 1245-46

৭৭, ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, পঞ্চম সংস্করণ). পৃঃ ২৪-২৯

৭৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ৪৮১ ; এ সম্পর্কে সমাচার-দর্পণ ২৩ আশ্বিন ১২৩৮ (৮ অক্টোবর ১৮৩১) সংখ্যায় প্রকাশিত মন্তব্যটিও তাৎপর্যপূর্ণ—তদেব, পৃঃ ৪৯ ; রসিককৃষ্ণ মল্লিকের ১৮৩৪ সালের কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত রামমোহন-স্মৃতিসভায় কৃত উক্তির এবং ১৮৩১ সালে রামমোহনের জীবদ্দশায় সমাচার-দর্পণের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই রক্ষণশীল রামমোহন-প্রতিপক্ষের পত্রের সমকালীন সাক্ষ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : "...Rammohan Roy's name was not associated with the foundation of the Hindoo College before 1862...." (*On Rammohan Roy* p, 37) । রামমোহন যদি হিন্দু কলেজ-পরিকল্পনার সঙ্গে আদৌ জড়িত না ছিলেন তাহলে তাঁকে অধ্যক্ষসভার সদস্য করবার প্রশ্ন তাঁর সমকালে উঠল কেন সেটুকু ডঃ মজুমদার ভেবে দেখেন নি। যদি কেবলমাত্র রক্ষণশীল হিন্দু মহল থেকেই এই পরিকল্পনার উদ্ভব হত তাহলে রামমোহনকে এর সঙ্গে জড়িত করবার প্রশ্নই উঠতো না।

৭৯. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ৪৮৫-৮৬

৮০. *The Days of John Company: Selections from Calcutta Gazette 1824-1832* Compiled and Edited by A. C. Das Gupta, Calcutta 1959, p. 627 ; এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য, সমাচার-দর্পণ, ২ ফাল্গুন ১২৩৭ (ইং ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৭৬-৭৭

৮১. উদ্ধৃত, যোগেশচন্দ্র বাগল, 'রাধাকান্ত দেব' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৭০, দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ১৪

৮২. দ্রষ্টব্য, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৫৭-৫৮ ; এবং তত্রস্থ প্রমাণপঞ্জী, উল্লেখ ১১২ পৃঃ ৩০৩-৩০৪

৮৩. Sushobhan Chandra Sarkar, "Extracts from the Proceedings of the Hindu College Committee relating to the dismissal of Henry Louis Vivian Derozio", *Presidency College Magazine* Vol. 41 (April 1959) English Section, pp. 1-8

৮৪. উদ্ধৃত, যোগেশচন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬৩) 'রসিককৃষ্ণ মল্লিক', পৃঃ ১৭৮-৭৯

৮৫. ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (প্রথম সংস্করণ, ১৯৪১) পৃঃ ৪৬; রাধাকান্ত দেব (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা) পৃঃ ১৩; 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'র দ্বিতীয় সংস্করণে 'রাধাকান্ত দেব' অধ্যায়টি বর্জিত হয়েছে। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন যে হেতু সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় 'রাধাকান্ত দেব' শীর্ষক তাঁর স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—তাই তিনি এই সংস্করণে সে-সম্পর্কিত অধ্যায়টি রাখা প্রয়োজন মনে করেন নি।

৮৬. 'রাধাকান্ত দেব' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা), পৃঃ ১৪; এ্যাডাম প্রচলিত অর্থে পাদ্রি ছিলেন না, রামমোহনের প্রভাবে তিনি একেশ্বরবাদ অবলম্বন করেন।

৮৭, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ৮৫-৮৬; 'রাধাকান্ত দেব', পৃঃ ৮১

৮৮. David Kopf *British Orientalism and the Bengal Renaissance* pp. 193-96

৮৯. ভবতোষ দত্ত, 'রাজা রাধাকান্ত দেব'—ইতিহাস, সপ্তম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৯), পৃঃ ১৫৭-৭৫; রচনাটি পরে লেখকের 'কীর্তিস্তম্ভ' (কলিকাতা, ১৩৮৬) শীর্ষক প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (পৃঃ ১-১৯)।

৯০. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রদর্শিত ডিরোজিওর জীবনসংক্রান্ত এক চলচ্চিত্রে রাধাকান্ত দেবকে যে ভাবে খলনায়করূপে চিত্রিত করা হয়েছে তা ইতিহাসের অমার্জনীয় বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়।

৯১. দ্রষ্টব্য, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৬১-৬২

৯২. *Journal of the Royal Asiatic Society* Vol. XVI (1856) pp. 201-14; দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায় পৃঃ ২৬২

৯৩. *Journal of the Royal Asiatic Socicety* Vol. XVII (1860) pp. 209-20

৯৪. রাধাকান্ত দেবের স্মৃতির প্রতি এতটুকু অমর্যাদা প্রকাশ না করে বলা যায় 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধানের পরিকল্পনা ও প্রকাশ সংক্রান্ত সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনা রাধাকান্তর হলেও, প্রকৃত সংকলয়িতা ছিলেন তাঁর পোষিত পণ্ডিতমণ্ডলী। দুর্ভাগ্যবশত এর সবটুকু কৃতিত্বই উত্তরকাল রাধাকান্তকেই অর্পণ করেছে; সংকলক পণ্ডিতবর্গ আজ বিস্মৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের নামে প্রচলিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ এখন কালীপ্রসন্নর নামেই চলে, কালীপ্রসন্ন নিযুক্ত প্রকৃত অনুবাদক পণ্ডিতমণ্ডলীর নামও কেউ করেন না। সেকালে হিন্দুসমাজভুক্ত বিদ্যোৎসাহী বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের অনেকে সংস্কৃতচর্চায় উৎসাহী ছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে পণ্ডিতগণের সাহায্যে সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও শাস্ত্রানুবাদ প্রকাশ পুণ্যকর্ম বিবেচনা করতেন। বর্ধমান রাজসভা-প্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদসমূহ এই মনোভাবের অপর এক নিদর্শন। এই সব প্রকাশনের মূলে যে পণ্ডিতমণ্ডলীর উদ্যম থাকত তাঁদের যথোপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে তুষ্ট করা হত—সংকলয়িতা বা অনুবাদকরূপে তাঁদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ প্রয়োজন মনে করা হত না।

৯৫. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'রাধাকান্ত দেব' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা) পৃঃ ৫১-তে উদ্ধৃত।

৯৬. *Calcutta Review* Vol. XLV (1867) Article III 'Radhakant Deb' pp. 323, 325

৯৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ: ৫০-৫১

৯৮. Kissory Chand Mitra *Memoir of Dwarkanath Tagore* Calcutta 1870 p. 41

৯৯. ২৬ শ্রাবণ. ১২৪১ (৯ আগস্ট, ১৮৩৪) সংখ্যা 'সমাচার-দর্পণ'-এ উদ্ধৃত,—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দ্বিতীয় খণ্ড (৪র্থ সংস্করণ) পৃ: ৩৩৯-৪০

১০০. ৭ ফাল্গুন, ১২৪৪ (১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮) সংখ্যা 'সমাচার-দর্পণ'-এ উদ্ধৃত—তদেব, পৃ: ৪৪৮-৪৯

১০১. তদেব, পৃ: ৫৫৭

১০২. তদেব, পৃ: ৪০৫-০৮

১০৩. Krishna Kripalani *Dwarkanath Tagore* p. 194

১০৪. 'তত্ত্বোধিনী সভার ১৭৬৮ শকের আয়-ব্যয়-স্থিতির নিরূপণ পুস্তক', ভূমিকা: পৃ: ১-৩

১০৫. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ ভাদ্র ১৭৬৬ শক, পৃ: ১০৪

১০৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১৩৬০) পৃ: ১৯-২০ ; আত্মজীবনী (চতুর্থ সং) পৃ: ৩২

১০৭. তত্ত্ববোধিনী সভা ও আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে তার ভূমিকা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, যোগানন্দ দাস, '১৯৩৯ : তত্ত্ববোধিনী সভার শতাব্দ বৎসর' প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৫, পৃ: ৮৩০-৪০ ; দিলীপকুমার বিশ্বাস, 'তত্ত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'—ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (ভাদ্র-কার্তিক ১৩৬১) পৃ: ৩১-৪৯ , তৃতীয় সংখ্যা (ফাল্গুন-বৈশাখ ১৩৬১-৬২), পৃ: ১৬৪-৭৯ ; চতুর্থ সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৬২), পৃ: ২৪২-৬১ , ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (ভাদ্র-কার্তিক ১৩৬২) পৃ: ৩৩-৪৬ ; দ্বিতীয় সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৬২) পৃ: ৯২-১০২ ; 'Maharshi Debendranath Tagore and the Tattvabodhni Sabha' in *Studies in Bengal Renaissance* (In commemoration of the birth centenary of Bepin Chandra Pal) ed. Atulchandra Gupta ; Calcutta 1958, pp. 33-46

১০৮, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ (১৩১০ বঙ্গাব্দ) পৃ: ৩৯

১০৯. মন্মথনাথ ঘোষ, কর্মবীর কিশোরীচাদ মিত্র, কলিকাতা ১৩৩৩, পৃ: ৪৮-৬১

১১০. *Discourses read at the Meetings of the Hindu Theo-Philanthropic Society* Vol. I Printed by P. S. D' Rozario & Co , No. 8 Tank Square ; 'Discourse read at the Inaugural Meeting' pp. 1-20

১১০ ক. *Calcutta Review* Vol. IV (1845) p. 391

১১১. মন্মথনাথ ঘোষ, কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, পৃ: ৯৯-১১১

১১২. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৭৪-৭৫, ৮১-৮৩ ; এবং তত্রস্থ প্রমাণপঞ্জী উল্লেখ '৫৫' (পৃঃ ৮৭)

১১৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (দ্বিতীয় সং) পৃঃ ১৮১–৮২-তে পত্রখানি আংশিক উদ্ধৃত।

১১৪. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৮২

১১৫. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ১২৪

পরিশিষ্ট

১

রামমোহন রায় ও ফরাসী বিদ্বন্মণ্ডলী

রামমোহন রায়ের জীবন নিয়ে যাঁরা অনুশীলন করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন ইউরোপ-প্রবাসকালে পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তিনি ফ্রান্সে প্রভূত শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। রাম-মোহনের ইংরেজি জীবনচরিতগুলির মধ্যে বিশেষ করে শ্রীমতী কলেট রচিত The Life and Letters of Raja Rammohun Roy এবং মেরী কার্পেণ্টারের Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy গ্রন্থ দু'খানিতে প্রসঙ্গত উক্ত লেখিকাদ্বয় রামমোহন কর্তৃক ফ্রান্স-পরিদর্শনের উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁরা সে-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেননি; সম্ভবত তাঁদের তা জানাও ছিল না।[১] ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত রামমোহন-মৃত্যুশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাদাম্ মোর‍্যাঁ নাম্নী জনৈকা ফরাসী বিদুষী ফ্রান্সের সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ সংক্রান্ত দুটি নিবন্ধ রচনা করে এ বিষয়ে নূতন আলোকপাত করেন।[২] সেই সময় শোনা গিয়েছিল উক্ত মহিলা ফরাসী ভাষায় রামমোহনের একটি জীবনচরিত প্রণয়নের জন্য উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। (বর্তমান লেখক যতদূর জানেন পরিকল্পিত এই জীবনীগ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নি।) তাঁর প্রবন্ধে মাদাম মোর‍্যাঁ উল্লেখ করেছিলেন যে রামমোহন ফ্রান্সে গমন করবার বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই ভারতীয় দর্শনে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ রূপে তাঁর সুনাম সে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুলাই ফ্রান্সের 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্ (প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরূপ সারস্বতসভা) নামক প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত বিদেশী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেরী কার্পেণ্টারের পূর্বোক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত একখানি পত্রেও আমরা এই তথ্য জানতে পারি যদিও উল্লিখিত ঘটনার সন-তারিখ সেখানে দেওয়া নেই।[৩] বর্তমান আলোচনায় মাদাম মোর‍্যাঁ

পরিবেশিত এই কৌতূহলোদ্দীপক প্রসঙ্গটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত অনুসন্ধান ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগের যথাসম্ভব পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করা যাচ্ছে।

বিপ্লবের জন্মভূমি রূপে ফ্রান্সের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করলেও ভারতে অবস্থানকালে ফরাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ রামমোহন সম্ভবত পাননি। কিন্তু তিনি 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর সদস্য মনোনীত হবার পূর্বেই—এমন কি তাঁর ইউরোপগমনেরও পূর্বে, বেদান্তদর্শনের সুপণ্ডিত ব্যাখ্যাতা ও সমাজসংস্কারক রূপে তাঁর পরিচয় ক্রমশ ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সেও ছড়িয়ে পড়তে সুরু করেছিল। সম্ভবত ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে কলিকাতার তদানীন্তন The Times পত্রিকার সম্পাদক ম. দা'কোস্তা স্বরচিত রামমোহনের এক জীবনকাহিনী ও তৎসহ রামমোহনের কয়েকখানি গ্রন্থ ব্লোয়া (Blois)-র বিশপ আবে গ্রেগোয়ারকে পাঠিয়ে দেন। এই তথ্যাদি ও গ্রন্থাবলীর ভিত্তিতে উক্ত ধর্মযাজক রামমোহনের জীবন ও কীর্তি সংক্রান্ত এক পুস্তিকা ফরাসী ভাষায় সংকলন করে প্রচার করেন। এই পুস্তিকাটি ১৮১৯-এ তৎকালীন ফরাসী সাময়িকপত্র 'লা ক্রোণিক্ রেলিজিউজ্' (La Chronique Religieuse)-এ মুদ্রিত হয়েছিল[৪]; এবং এর একটি ইংরেজি সারানুবাদ ইংলণ্ডের 'দ্য মান্থ্লি রিপোজিটরী অব্ থিয়লজি এ্যাণ্ড্ জেনারাল লিটারেচার' (The Monthly Repository of Theology and General Literature) পত্রিকায় পর বৎসর (১৮২০) প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদের কয়েকটি অনুচ্ছেদ মেরী কার্পেণ্টার তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।[৫] যতদূর জানা যায় গ্রেগোয়ারের রচনাটি ফরাসী দেশে রামমোহনকে পরিচিত করবার প্রথম প্রচেষ্টা। এ পর্যন্ত রামমোহন সংক্রান্ত আলোচনায় 'মান্থ্লি রিপোজিটরী'তে মুদ্রিত সারানুবাদের মেরী কার্পেণ্টার উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ ক'টির উল্লেখ অনেকে করেছেন। দীর্ঘ মূল রচনাটি আধুনিককালে কেউ অনুসন্ধান ও ব্যবহার করেছেন বলে বর্তমান লেখকের জানা নেই। সম্প্রতি লেখকের অনুরোধে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব্ ওরিয়েণ্টাল এ্যাণ্ড্ আফ্রিকান স্টাডিজ্'-বিভাগের বাঙ্লা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় অনুগ্রহপূর্বক ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম গ্রন্থাগার থেকে 'ক্রোণিক্ রেলিজিউজ'-এ প্রকাশিত গ্রেগোয়ারের মূল প্রবন্ধটির আলোকচিত্র লেখককে পাঠিয়েছেন। এই

সৌজন্যের ফলে বর্তমান লেখক সমগ্র মূল রচনাটির এক টীকা-টিপ্পনী-যুক্ত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।[৮]

আলোচ্য প্রবন্ধটির পাঠকমাত্রই জানতে কৌতূহলী হবেন ম. দা'কোস্তা রামমোহনকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন কিনা এবং রামমোহনের জীবনসংক্রান্ত তথ্যসমূহ তিনি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে সংগ্রহ করেছিলেন কি না। রচনার কোথাও এ সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নেই। এমন অনুমান করবার ভিত্তি আছে ১৮১৬-১৮-এর মধ্যে লেখক রামমোহন সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁর জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করেন। ১৮১৬ থেকে রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থগুলির প্রকাশ শুরু হয় এবং এই সময় থেকে উক্ত সূত্রে দেশবিদেশের ইউরোপীয় মহল ক্রমশ তাঁর সম্পর্কে আগ্রহী হতে আরম্ভ করেন। এই সময় কলিকাতার এক ইংরেজি সংবাদপত্রের ইউরোপীয় (ফরাসী) সম্পাদক ম. দা'কোস্তার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নয়; বিশেষত যেখানে 'ক্রোণিক রেলিজিউজ'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের ভূমিকায় বলা হচ্ছে দ'কোস্তা ছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শী (trés versé dans les langues, l'histoire, les antiquités de l'Inde), তবে এই সম্ভাব্য পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তাঁর কিছু কিছু উক্তি অসতর্ক, ভাসা-ভাসা অথবা ভ্রান্ত। রামমোহনের সঙ্গে পরিচয় থেকে থাকলেও তিনি সব তথ্য যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেননি, প্রচলিত ধারণা বা কিংবদন্তীর উপর একাধিক স্থলে নির্ভর করেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এটুকুও বিচার্য, কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সাহায্যে তাঁর নাড়ীনক্ষত্রের খবর জেনে নিয়ে প্রকাশ করবার বর্তমানে প্রচলিত সাংবাদিক রীতি সেকালে চালু হয়নি।

লেখকের ভ্রান্তির নিদর্শনস্বরূপ বলা যেতে পারে, তিনি রামমোহনের জন্মসাল উল্লেখ করেছেন ১৭৮০; তাঁর পিতা রামকান্ত রায়ের (নামটি অশুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত—Ram-Hant-Roe) মৃত্যু-বৎসর সম্পর্কেও তিনি সুনিশ্চিত নন। তাঁর মতে রামকান্তর মৃত্যু হয় ১৮০৪ কিংবা ১৮০৫ সালে। সম্ভবত এই সূত্র থেকেই কোনও কোনও সমকালীন পাশ্চাত্য লেখকের ধারণা জন্মেছিল, রামমোহনের জন্ম ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এই তারিখ বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা রামমোহনের জীবনের পরবর্তী যে সব ঘটনার তারিখ আমরা

নিশ্চিত জানি সেগুলির সঙ্গে এর সামঞ্জস্য করা যায় না। রামমোহনের জন্মসাল হিশাবে ১৭৭২ বা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হবে। রামকান্ত রায়ের মৃত্যু যে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল, তা নিশ্চিত জানা গেছে। রামমোহনের আরবী-ফার্সীতে লিখিত পুস্তিকা 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওহাহিদিন'-এর শিরোনামের অনুবাদ লেখক করেছেন 'সর্বধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে' (Contre l'Idolaitre de toutes les Religions) ; প্রকৃতপক্ষে তা হবে 'একেশ্বরবাদীগণের প্রতি উপহার'। এই জাতীয় বেশ কিছু ত্রুটি থাকলেও প্রবন্ধটির মধ্যে একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সমকালীন ব্যক্তির দৃষ্টিতে সমগ্র ভাবে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও কীর্তির যে ছবি ফুটেছে তার মূল্য কম নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, নিম্নলিখিত উল্লেখগুলি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে :

(১) সমসাময়িক অন্য কোনও আকরেই রামমোহনের কৌলিক উপাধি 'বাঁড়ুয্যা' (বা 'বন্দ্যোপাধ্যায়') উল্লিখিত হয়নি। রামমোহনের বংশ সাধারণ্যে 'রায় বংশ' বলেই পরিচিত। 'রায়' (বা 'রায় রায়ান') খেতাব এই পরিবারে এসেছিল মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে চাকরীর সূত্রে। গ্রেগোয়ারের প্রবন্ধে আরম্ভেই দেখা যায় রামমোহন উল্লিখিত হয়েছেন 'Rammohon-Roe Banoudjia' অর্থাৎ 'রামমোহন রায় বাঁড়ুয্যা' বলে। মূলের 'বান্নুজিয়া' (Banoudjia) যে 'বাঁড়ুয্যা'রই যৎসামান্য উচ্চারণ-বিকৃতি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(২) রামমোহনের শিক্ষা সম্পর্কে প্রবন্ধে বলা হয়েছে, তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় পিতার তত্ত্বাবধানে নিজ গ্রামে। এই সময় তিনি ফার্সী ভাষাও শিক্ষা করেন। এর পর তাঁকে বিশেষ করে আরবী শিক্ষার জন্য পাটনায় পাঠানো হয় (Il y recut les premiérs élémens de l'éducation auprés de son pere, et y apprit aussi le persan ; puis fut envoyé a Patna, pour y apprendre l arabe)। পাটনাতে আরবী ভাষায় মূল ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্র ছাড়া আরবী অনুবাদে আরিস্টট্‌লের দর্শন ও ইউক্লিডের জ্যামিতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় (Ses maitres de Patna lui firent etudier quelques-uns des ecrits d' Aristote et

d' Euclide traduits en arabe)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, আরবী শিক্ষার জন্য রামমোহনের পাটনা গমনের কাহিনী উত্তরকালের কিংবদন্তী মাত্র, এর কোনও সমসাময়িক প্রমাণ নেই। দেখা যাচ্ছে সমকালীন বিবরণে আরবী শিক্ষার জন্য পাটনাপ্রবাসের কাহিনী সমর্থিত হচ্ছে। পাটনার পর্ব শেষ করে অবশেষে কলিকাতায় এসে রামমোহন সংস্কৃত শেখেন (···enfin a Calcutta pour y apprendre la langue sanscrite)। এ বর্ণনা যথাযথ হলে বলতে হবে রামমোহনের সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল কলিকাতায় এবং উত্তর জীবনে এর ভিত্তি পাকা হয় কাশীতে, বিশেষ করে উপনিষদ্-বেদান্ত অনুশীলনের ক্ষেত্রে।

(৩) কলিকাতায় স্থায়ী হবার আগে রামমোহন নিজের চেষ্টায় খানিকটা ইংরেজি শিখেছিলেন ; লেখকের মতে ১৮১৪ থেকে কলিকাতা বাস আরম্ভ করবার পর তিনি অধ্যয়ন, কথোপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর ইংরেজিজ্ঞান পাকা করে নেন (A Calcutta Ram mohun Roe se mit a perfectionner ses conaissances dans la langue anglaise, par la lecture et la conversation)।

(৪) লেখক আরও জানাচ্ছেন, এই সময় তিনি প্রিচার্ড (Pritchard) নামক এক ইংরেজ স্কুল-শিক্ষকের কাছে কিছু লাটিন ও ম্যাকে (Makay) নামক জনৈক দার্শনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন জার্মানের নিকট গণিত বিদ্যা শিক্ষা করেন (Il apprit quelque peu de latin d'un maitre d'e´cole anglais, nomme´ Pritchard ; et un Allemand, nomme´ Makay, home d' un tour d' espirit tre´s-philosophique, lui enseigna les mathe´-matiques)। দুটি তথ্যই অজ্ঞাতপূর্ব। রামমোহন যে ইউরোপীয় উচ্চ গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এমন পরোক্ষ ইঙ্গিত সমসাময়িক সূত্রে পাওয়া যায়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট্ মিশনের কার্য-বিবরণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে, "····he also writes English with correctness and reads

with ease English mathematical and metaphysical works." ।[৭] এ বিষয়ে রামমোহনের কিছু খ্যাতিও ছিল, কেন না স্কুল বুক সোসাইটি ফাগু'সন রচিত Introduction to Astronomy-র যে বাঙলা অনুবাদ প্রস্তুত করেন সেখানি পরিমার্জনের ভার তাঁরা রামমোহন ও মিঃ গর্ডনের উপর দিয়েছিলেন।[৮] তা ছাড়া রামমোহন আইজাক নিউটনের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং এই মহামনীষীকে one of the greatest mathematicians ....that ever existed বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] আলোচ্য নিবন্ধে তাঁর গণিতশিক্ষা সংক্রান্ত একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য সর্বপ্রথম পাওয়া গেল। ১৮১৯ সালে সংকলিত এ নিবন্ধে রামমোহনের গ্রীক ও হিব্রু শিক্ষার স্বভাবত উল্লেখ নেই, কেন না এ দুটি ভাষা তিনি অনুশীলন করেন ১৮২০-র পর খ্রীষ্টীয় বিতর্কে জড়িয়ে পড়বার সময়।

(৫) নিবন্ধে বলা হয়েছে, তরুণ বয়সই ভাল বা মন্দ যে কোনও নূতন ভাবধারা গ্রহণ করবার পক্ষে উপযুক্ত সময় একথা বিবেচনা করে রামমোহন নিজ ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন যেখানে পঞ্চাশটি ছেলেকে সংস্কৃত, ইংরেজি ও ভূগোল শেখানো হয় (Rammohon-Roe, pensant que les jeunesse est l'age le plus favorable aux nouveautés bonnes ou mauvaises, a fondé a ses propres frais une école ou l'on enseigne le sanscrite, l' anglais et la géographie, à une cinquantaine d'enfans)। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে রামমোহন নিজ ব্যয়ে শুঁড়া পল্লীতে ইংরেজি শিক্ষার জন্ম এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। ১৮২২ সালে তিনি এটিকেই এ্যাংলো হিন্দু স্কুলে রূপান্তরিত করেছিলেন। এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্থাপিত নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর পূর্বেতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১০] এখানে ১৮২২-এর বহু পূর্বে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত উক্ত বিদ্যালয়ের একটি অজ্ঞাতপূর্ব নির্ভরযোগ্য সমসাময়িক উল্লেখ পাওয়া গেল।

দা কোস্তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রেগ্রোয়ার কর্তৃক রচিত সমগ্র প্রবন্ধটির

যে বঙ্গানুবাদ আমি অন্যত্র প্রকাশ করেছি এখানে তার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। কিছু কিছু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য পরিবেশন করা ছাড়া এ প্রবন্ধের অতিরিক্ত মূল্য এখানেই যে, রামমোহন সম্পর্কে এটি সর্বপ্রথম ফ্রান্সের ভারত-জিজ্ঞাসু পণ্ডিতমণ্ডলীর কৌতূহল উদ্রিক্ত করতে সমর্থ হয়। এর পর থেকে রামমোহনের সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কিত সংস্কারপ্রচেষ্টা ও গ্রন্থাবলী তাঁদের অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়াল। দা কোস্তা ১৮১৯ সালের একেবারে প্রথম দিকে রামমোহন সংক্রান্ত তাঁর প্রতিবেদনের সঙ্গে রামমোহনের কিছু গ্রন্থও গ্রেগোয়ারকে পাঠিয়েছিলেন। গ্রেগোয়ারের প্রবন্ধটি অনুবাদকালে সেটি বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বর্তমান লেখক দেখিয়েছেন এই প্রেরিত গ্রন্থগুলি সুনিশ্চিতভাবে ছিল: (১) Translation of an Abridgement of the Vedant (১৮১৬); (২) Translation of the Ishopanishad (১৮১৬); (৩) A Defence of Hindoo Theism (১৮১৭) (৪) A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas (১৮১৭); এবং (৫) Translation of a Conference between an advocate for and an opponent of the Practice of Burning Widows Alive (১৮১৮)। 'কেনোপনিষদ'-এর ইংরেজি অনুবাদখানি ১৮১৬-তে প্রকাশিত হলেও সেটির কোনও উল্লেখ গ্রেগোয়ারের প্রবন্ধে নেই। এই কারণে প্রেরিত গ্রন্থগুলির মধ্যে এটি ছিল না বলেই অনুমান করতে হয়।[১১] ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহফাৎ উল্-মুওহাহিদিন্'-এর উল্লেখ গ্রেগোয়ার যে ভাবে করেছেন ও তার শিরোনামের যে ভুল অনুবাদ প্রবন্ধে দিয়েছেন তাতে মনে হয় এ গ্রন্থখানিরও তিনি নাম শুনেছিলেন মাত্র, এটি চোখে দেখেন নি। মনে রাখতে হবে 'তুহ্ফাৎ'-এর ইংরেজি অনুবাদ তখনও প্রকাশিত হয় নি। যাই হোক গ্রেগোয়ার কর্তৃক তাঁর প্রবন্ধে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনার পর থেকে রামমোহনের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে বিদগ্ধ ফরাসী পাঠকের আগ্রহ জন্মায় এবং তা সেদেশে আমদানী হতে শুরু হয়।

মাদাম্ মোরঁ্যার পরে যত্নপূর্বক এই বিষয়ে কিছু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন আমেরিকান গবেষিকা শ্রীমতী আড্রিয়েন মূর। তাঁর বহু পরিশ্রমের ফলে রচিত Rammohun Roy and America (১৯৪২) নামক গ্রন্থে

তিনি রামমোহন সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত রচনাবলীর যে তালিকা সংকলন করেছেন তার থেকে জানা যায়, ফ্রান্সে উনবিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশকের আরম্ভেই রামমোহনের রচনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান ও আলোচনা কিছু কিছু আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত সর্বপ্রথম 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্' (Revue Encyclopédique) পত্রিকায় রামমোহন রায়ের আটখানি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।[১২] শ্রীমতী মূর এই বিশেষ সংখ্যাটির সন-তারিখ উল্লেখ করেন নি। কিন্তু 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক'-এর মুখপত্র 'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্' আগস্ট্ ১৮২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত রামমোহনের অপর এক গ্রন্থতালিকায় প্রসঙ্গতঃ 'রেভ্যু আঁসিক্লো-পেদিক্'-এর ঐ সংখ্যাটির খণ্ড ও প্রকাশকালের উল্লেখ আছে; তা হল সপ্তম খণ্ড, ১৮ ০ খ্রীষ্টাব্দ।[১৩] 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্'-এ প্রকাশিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির নাম ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হলেও শ্রীমতী মূর অনুমান করেছেন, এগুলি রামমোহনের গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ নয়, ইংরেজি নামগুলিরই (সম্ভবত ফরাসী পাঠকগণের বুঝবার সুবিধার জন্য) ফরাসী অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অনুমান যে যথার্থ তার অন্য প্রমাণ আছে, সে আলোচনা যথাস্থানে করব। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি এই (বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি নামগুলিও দেওয়া হল):

(১) Traduction du Kena Oupanishada un des chapitres du Sama Veda, suivant la glose du célèbre Chankara-Tcharya constantant l'unité et la tout-puissance de l'etre supreme seul object digne d'adoration per le brahmen Rammohen Rai, Calcutta, Philip Pereira, Hindoostanee Press, 1816 (Translation of the Cena Upanishad one of the the chapters of the Same Veda according to the gloss of the celebrated Shancaracharya: Establishing the unity and the Sole Omnipotence of the Supreme Being and He Alone is the object of worship, Calcutta, 1816).

(২) Traduction d'un abrégé du Vedanta ou solution de tous les Vedas...Calcutta, 1817, 17 pp. (Translation of

an abridgement of the Vedanta or thė Resolution of all the Vedas, Calcutta, 1816).[১৪]

(৩) Traduction de l'Ichopanishada un des chapitres de l'Yadjoua Veda...Calcutta, Philip Pereira, Hindoostanee Press, 1816. (Translation of the Ishopanishad one of the chapters of the Yajur Veda Calcutta 1816).

(৪) Defense du theisme hindoue en reponse a l'attaque d'un defenseur [de] l'idolatrie hindoue a Madras, Calcutta, 1817, 52 pp. (A Defence of Hindu Theism in reply to the attack of an advocate for idolatry at Madras, Calcutta, 1817).

(৫) Seconde defense du systeme monotheiste des Vedas en reponse a une apologie de l'etat present de culte hindoue ...Calcutta, 1817, 58 pp. (A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas in reply to an apology for the present state of Hindoo Worship, Calcutta, 1817).

(৬) Traduction d'un abrégé de Vedanta ou solution du tous les Vedas avec un traduction du Kena Oupanichada un des chapitres du Sama Veda, Londres, T. et J. Hooitt, 1817. (Abridgement of the Vedant and the English translation of the Cena Upanishad reprinted with a preface by John Digby containing a letter addressed by Rammohun Roy, T. and J. Hooitt, London. 1817).

(৭) Traduction du Moundek-Oupanichada de L'Atharva-Veda...Calcutta, D. Lankheet, Times Press, 1819 25 pp. (Translation of the Moonduk Opunishud of the Uthurvu-Ved according to the gloss of the celebrated Shunkura-charyu. Calcutta, 1819).

(৮) Traduction du Keth-Oupanichada de L' Yadjour

Veda,⋯ Calcutta, 1819, 40 pp. (Translation of the Kuth-Opunishud of the Ujoor-Ved according to the gloss of the celebrated Sunkuracharyu, Calcutta. 1819).

১৮২০-তে 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্'-এ প্রকাশিত এই গ্রন্থপঞ্জী ভিন্ন রামমোহনের কতকগুলি গ্রন্থের অপর একটি তালিকা যে 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর মুখপত্র 'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্' আগস্ট, ১৮২৩, সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমতী মূর তাঁর সংগৃহীত রচনাপঞ্জীতে 'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্'-এর অক্টোবর, ১৮২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ম ল্যাঁজুয়্যাঁনে লিখিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীর সমালোচনামূলক এক প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন।[১৫] দুই কারণে বর্তমান লেখকের মনে হয়েছে প্রবন্ধটির নাম ও প্রকাশের স্থানকাল তিনি জানতে পারলেও সেটি নিজে পড়বার সুযোগ তাঁর হয়নি। কেননা অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত ল্যাঁজুয়্যাঁনের প্রবন্ধে স্পষ্ট আগস্ট সংখ্যায় মুদ্রিত রামমোহনের গ্রন্থতালিকার উল্লেখ আছে। শ্রীমতী মূরের এই তালিকার কথা জানা নেই। দ্বিতীয়ত উক্ত গ্রন্থতালিকা এবং ল্যাঁজুয়্যাঁনের প্রবন্ধ পড়ে দেখলে তিনি সুনিশ্চিতরূপে বুঝতে পারতেন যে ফরাসীদেশে রামমোহনের পুস্তকাদির ইংরেজি অনুবাদই প্রচলিত ছিল, ফরাসী ভাষায় রামমোহন-গ্রন্থাবলী সম্ভবত অনূদিত হয়নি। 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্'-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে তিনি যে অনুমান করেছিলেন তার সমর্থক প্রমাণ 'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্'-এ প্রদত্ত গ্রন্থতালিকা ও ল্যাঁজুয়্যাঁনের প্রবন্ধের মধ্যেই আছে। তা ছাড়া এই গ্রন্থতালিকার মধ্যে শ্রীমতী মূর কথিত 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্'-এর বিশেষ সংখ্যাটির প্রকাশকাল যে দেওয়া আছে সে তথ্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমতী মূরের পরিশ্রমের মূল্য বা গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। বিশেষতঃ ল্যাঁজুয়্যাঁনের রচনাটির উল্লেখ করে তিনি রামমোহন-গবেষকগণকে এক নূতন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত নিবন্ধের উল্লেখ মাদাম্ মোর‍্যাঁও করেন নি।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 'জুর্নাল আসিয়াতিক্'-এ উপরি-উক্ত গ্রন্থতালিকা বা ম. ল্যাঁজুয়্যাঁনে লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্' রামমোহনকে সম্মানিত সদস্য মনোনীত করবার পূর্বে। মাদাম্ মোর‍্যাঁর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে উক্ত বৎসরের ৭ জুন তারিখের

অধিবেশনে ঐ প্রতিষ্ঠান রামমোহনের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা আছে কি না সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য এক বিচারক-সমিতি নিযুক্ত করেন। ম. ল্যাজুয়াঁনে, ম. বুর্নুফ এবং ম. ক্লাপরোট, এই তিনজন সদস্যকে নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয়। এর পূর্বে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ম. ল্যাজুয়াঁনে রামমোহন-গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে, বিচারক-সমিতির সদস্যরূপে নয়; বিচারক-সমিতি তখন পর্যন্ত গঠিতই হয় নি। কথাটি উল্লেখযোগ্য, কেননা কারও কারও এই রকম ধারণা হয়তো আছে যে ল্যাজুয়াঁনের ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রবন্ধ অনুসন্ধান-সমিতির সদস্য হিসাবে তাঁর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত।[১৬] বরং বলা যেতে পারে ফ্রান্সে রামমোহনের গ্রন্থাদির ক্রমপ্রচার ও ল্যাজুয়াঁনের প্রবন্ধে প্রদত্ত সশ্রদ্ধ রামমোহন-পরিচিতি 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর সঙ্গে যুক্ত প্রাচ্যতত্ত্বজিজ্ঞাসু ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলীকে রামমোহন সম্পর্কে ক্রমশ শ্রদ্ধাবান ও অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছিল এবং সেই জন্যই তাঁরা রামমোহনকে বৈদেশিক সদস্য মনোনীত করতে ইচ্ছুক হয়ে উল্লিখিত কমিশন বা বিচারক-মণ্ডলী নিযুক্ত করেন। রামমোহনের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে তাঁর মতামতের সঙ্গে পূর্ব হতে পরিচিত ছিলেন বলেই ম. ল্যাজুয়াঁনে অনুসন্ধান-সমিতির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। 'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্'-এর পুরাতন ফাইলে বর্তমান লেখক শ্রীমতী মূর নির্দিষ্ট ম. ল্যাজুয়াঁনের প্রবন্ধটি খুঁজে পেয়েছেন; সেই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থতালিকাটিও তাঁর দেখাবার সৌভাগ্য হয়েছে। নানা দিক থেকে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং রামমোহন-প্রসঙ্গে এসবের কোনও আলোচনাই আজ পর্যন্ত হয়নি। সুতরাং এ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ ও প্রয়োজন আছে।

'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্'-এর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যায় মুদ্রিত সংবাদে দেখা যায় ম. দুবোয়া দ্য ব্যোসেন্ 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর ৭ জুলাই, ১৮২৩, তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কয়েকখানি গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন।[১৭] তার মধ্যে ফার্সী ভাষায় দুখানি হস্তলিখিত পুঁথি এবং ভারতবর্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজি, ওলন্দাজ ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা কয়েকখানি পুস্তক ছিল। রামমোহন-রচিত আটখানি পুস্তকও যে এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এই তথ্য জানতে পারা যায় পরবর্তী আগস্ট সংখ্যার পত্রিকায়

প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত রামমোহনের গ্রন্থতালিকা থেকে। সেখানে ৭ জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত সভা ও ম দুবোয়া কর্তৃক পুস্তক উপহারের উল্লেখ আছে (Parmi les ouvrages offerts a la Socie'te' Asiatique dans les Seance du 7 juillet 1823 par M. Dubois de Beauchene on remarque huit brochures in-8° contenant huit ouvrages publie's a Calcutta de 1816 a` 1821 et tous par le feu brahmane nomme' en Sanscrit Ramayana Radja et en bengali Rammohun Roy)। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, এই গ্রন্থতালিকা প্রকাশকালে রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ফরাসী পণ্ডিত মহলের ধারণা অতিশয় অস্পষ্ট ছিল। কেননা এই প্রসঙ্গে তাঁকে le feu brahmane বা 'পরলোকগত ব্রাহ্মণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খানিক পরে এই মর্মে এমন স্পষ্ট উক্তিও দেখা যায় যে ১৮২১ বা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দেই রামমোহনের মৃত্যু হয়েছে (Le me'me brahmane qui est mort en 1821 ou 1822···)। তাঁদের এমন বিশ্বাসও ছিল রামমোহনের সংস্কৃত নাম 'রামায়ন-রাজা' ! দেখা যাচ্ছে ম. দা'কোস্তা প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে ইতিপূর্বে রচিত রামমোহন সম্পর্কে আবে গ্রেগোয়ারের ফরাসী পুস্তিকা রামমোহনের মনীষা সম্পর্কে ফরাসী বিদ্বৎ-সমাজের কৌতূহল উদ্রিক্ত করলেও তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অন্তত ১৮২২-২৩ পর্যন্ত ফ্রান্সে বিশেষ কোনও অনুসন্ধান হয়নি। ম. দুবোয়া উপহৃত গ্রন্থগুলির মাধ্যমে রামমোহন সম্পর্কে ফরাসী সুধীসমাজে ধীরে ধীরে যে সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয় তার ফলেই পরে এই সব ভ্রান্ত কাল্পনিক ধারণার নিরসন হয়েছিল একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

উক্ত গ্রন্থতালিকার প্রথমে দুবোয়া-প্রদত্ত রামমোহনের আটখানি পুস্তকের নাম দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম চারখানি যথাক্রমে কেন (কলিকাতা, ১৮১৬), ঈশ (কলিকাতা, ১৮১৬), মুণ্ডক (কলিকাতা, ১৮১৯) ও কঠ (কলিকাতা, ১৮০৯) উপনিষদগুলির ইংরেজি অনুবাদ। লক্ষ্য করবার বিষয় নাম কটি ইংরেজিতেই দেওয়া হয়েছে, ফরাসীতে নয়। তালিকার পরবর্তী চারখানি গ্রন্থ যথাক্রমে : (৫) An Apology for the Pursuit of Final Beatitude Independently of Brahmanical Observances (Calcutta, 1820) ; (৬) The Precepts of Jesus (Calcutta 1820) ;

(9) An Appeal to the Christian Public (Calcutta, 1820); (৮) Second Appeal to the Christian Public (Calcutta, 1821)। দুবোয়ার নিকট হতে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কয়েকখানি পুস্তকের নাম এই তালিকাভুক্ত হয়েছে দেখা যায়, যথা: (৯) Un petit Traité contre l''idolatrie des Indoues en langue arabe le meme ouvrage en langue persane (হিন্দুগণের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আরবী ভাষায় রচিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং ফার্সী ভাষায় ঐ একই গ্রন্থ); (গ্রন্থ প্রকাশের স্থান কাল দেওয়া নেই); আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বইখানি রামমোহন রচিত সুপরিচিত আরবী ভূমিকাযুক্ত ফার্সী পুস্তিকা 'তুহ্ফাৎ-উল মুওহাহিদিন' (প্রকাশকাল আনুমানিক ১৮০৩-০৪)। কিন্তু গ্রন্থের নাম যে ভাবে উল্লিখিত হয়েছে তা 'তুহ্ফাৎ' এর বিষয়বস্তুর যথার্থ পরিচায়ক নয়। 'তুহ্ফাৎ'-এ সাধারণ ভাবে সকল প্রচলিত ধর্মের ত্রুটি প্রদর্শন করা হয়েছে, বিশেষ করে হিন্দু প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয় নি। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, গ্রেগোয়ারও তাঁর পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে 'তুহ্ফাৎ' এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে একই ভুল করেছিলেন। রামমোহনের An Appeal to the Christian Public-এর ভূমিকায় উল্লিখিত আছে, তিনি অতি অল্প বয়সে প্রচলিত হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আরবী ও ফার্সী ভাষায় একখানি পুস্তিকা রচনা করেন (···who although he was born a Brahmun, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against the system)।[১৮] গ্রন্থপঞ্জীতে আরবী-ফার্সীতে রচিত পুস্তকখানির প্রকাশের স্থান ও কালের উল্লেখ না থাকাতে মনে হয় সংকলক এ গ্রন্থ নিজে দেখেন নি: সম্ভবত An Appeal to the Christian Public এর ভূমিকা থেকে এর বর্ণনাটি সংগ্রহ করেছেন। এক্ষেত্রে নামটি ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হবার কারণ বোধ হয় এই যে মূল গ্রন্থ ইংরেজিতে রচিত নয়; (১০) A Defence of of Hindu Theism (Calcutta, 1817); (১১) A Second Defence of the Monotheistic System of the Vedas (Calcutta, 1817); (১২) Un Oupanishada du Sáma Veda en sanscrit et en bengali et un Oupanishada de l' Yadjour-Veda aussi dans

ces deux langues (Calcutta, 1818) (সংস্কৃত ও বাঙলা-ভাষায় একখানি সামবেদীয় উপনিষদ্ ও ঐ দুই ভাষায় একখানি যজুর্বেদীয় উপনিষদ)[১৯] ; (১৩) Translation of the Abridgement of the Vedant (Calcutta, 1818)[২০] ; (১৪) Translation of a conference between an advocate and an opponent of the practice of burning widows alive from the original bungla (bengali) (Calcutta, 1818)।

দুবোয়া যে পুস্তকগুলি 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্' নামক প্রতিষ্ঠানকে উপহার দেন তার সব কটি যে ইংরেজি, ওলন্দাজ ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্'-এর ১৮২৩ সালের জুলাই সংখ্যায় তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রামমোহন-রচিত পুস্তকগুলি সেই গ্রন্থরাজিরই অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আগস্ট সংখ্যায় মুদ্রিত গ্রন্থতালিকাতেও দেখা যায় দুবোয়া-উপহৃত গ্রন্থগুলির পরিচয় ইংরেজি নামেই দেওয়া হয়েছে এবং অতিরিক্ত বইগুলির ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষে প্রকাশিত ইংরেজি, বাঙ্লা, সংস্কৃত ও আরবী-ফার্সী সংস্করণসমূহেরই উল্লেখ করা হয়েছে। কেবলমাত্র আরবী-ফার্সী পুস্তিকা এবং সংস্কৃত-বাঙ্লায় মুদ্রিত উপনিষদ দুইখানির ক্ষেত্রে পুস্তকের নাম ইংরেজির পরিবর্তে ফরাসীতে লেখবার কারণ এই যে উক্ত রচনাগুলির ভাষা ইংরেজ নয়। রামমোহনের কোনও গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। তৎকালীন ফরাসী বিদ্বৎ-সমাজ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই তাঁর গ্রন্থাদি অনুশীলন করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্'-এ প্রকাশিত রামমোহনের গ্রন্থতালিকা সম্পর্কে শ্রীমতী আড্রিয়েন মূর যে অনুমান করেছিলেন তা যথার্থ,—অর্থাৎ ফরাসীতে মুদ্রিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের ইংরেজি পুস্তকেরই তালিকা। 'জুর্নাল আসিয়াতিক্'-এ প্রকাশিত রামমোহনের গ্রন্থপঞ্জীটির সঙ্গেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল যে পত্রিকার পরবর্তী কোনও সংখ্যায় ম. ল্যাঁজুয়াঁনে রামমোহন-গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করবেন (On trouvera dans un prochain Numéro des observations de M. Lanjuinais sur les ouvrages de Rammohun Roy)।

'জুর্নাল্ আসিয়াতিক'-এর অক্টোবর, ১৮২৩ সংখ্যায় ম. ল্যাঁজুয়াঁনে লিখিত

রামমোহন-গ্রন্থাবলীর আলোচনা প্রকাশিত হয়। নানা দিক দিয়ে প্রবন্ধটি মূল্যবান। যে সময়ে এটি রচিত হয় তখন পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ সবে মাত্র ভারতীয় দর্শন, বিশেষত বেদ-বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত বেদ, উপনিষদ্ বা ব্রহ্মসূত্রের কোনও প্রামাণিক সংস্করণ বা অনুবাদ পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হয়নি। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শুকোহ্ কিছু হিন্দু সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতের সাহায্যে 'সির্‌র-ই আকবর্' বা 'সির্‌র-উল্-অস্রার্' নামে বাহান্নখানি উপনিষদের একটি ফার্সী গদ্যানুবাদ সংকলন করেন।[২১] ফরাসী পণ্ডিত ও সাধক আঁক্যতিল্ দ্যু পেরোঁ (১৭৩১-১৮০৫) এই ফার্সী সংস্করণের 'উপ্‌নেক্‌হৎ' (Oupnek'hat) শীর্ষক এক লাটিন অনুবাদ করেছিলেন। ১৮০১-০২ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদের এক প্রামাণিক সংস্করণ পারি থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[২১ক] দারা শুকোহ্ সংকলিত ফার্সী অনুবাদে অনেক ত্রুটি ছিল। দ্যু পেরোঁ নিজে সংস্কৃত ভাল না জানায় এই ফার্সী অনুবাদটিকে অবলম্বন করেন। অনুবাদের অনুবাদ হওয়াতে তাঁর লাটিন সংস্করণটির 'সাত নকলে আসল খাস্তা'র অবস্থা হয়েছিল। রামমোহন রায় কর্তৃক উপনিষদের সংস্করণ ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এই লাটিন সংস্করণটিই ভারত-জিজ্ঞাসু ফরাসী সুধীসমাজের প্রায় একমাত্র অবলম্বন ছিল। 'প্রায়' বলা হয়েছে এই জন্য যে ইংরেজি ভাষায় উইলিয়ম জোন্স, কেরী, কোলব্রুক ও জার্মানে অথ্‌মার ফ্রাঙ্কের উপনিষদের অনুবাদ-প্রচেষ্টাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়; যদিও এ-সব অনুবাদ তখন পর্যন্ত ইউরোপখণ্ডে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেনি, এবং ফ্রাঙ্কের অনুবাদপ্রচেষ্টা রামমোহনের পরবর্তী। রামমোহনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উপনিষদ ও বেদান্ত আলোচনা ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের যথার্থ পরিচয় পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সমকালীন ইউরোপীয় সারস্বত সমাজের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করবার সহায়ক হয়েছিল। জার্মান্ পণ্ডিত ভিন্‌তারনিৎস্ যদিও ফ্রান্স বা ইউরোপখণ্ডের অন্যত্র রামমোহনের গ্রন্থাবলী কতদূর প্রচারিত হয়েছিল তার সম্পূর্ণ সংবাদ জানতেন না, তথাপি তিনি নির্ভুল অনুমানের সাহায্যে তাঁর সুবিখ্যাত 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডে রামমোহনের এই কীর্তির ঐতিহাসিক মূল্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন।[২২] ম. ল্যাঁজুয়ানের প্রবন্ধটি পাঠ করলে দেখা যায় প্রধানত

উপনিষদ ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যাতা রূপে রামমোহন তদানীন্তন ফরাসী পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ; সংস্কারক বা খ্রীষ্টীয় নীতিমার্গের অনুরাগীরূপে তাঁর পরিচয় এক্ষেত্রে উপেক্ষিত না হলেও তখন পর্যন্ত গৌণ। আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ম. ল্যাঁজুয়ানের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তৎকালীন ফরাসী পণ্ডিতমহলের প্রাথমিক ধারণার মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় শাস্ত্রচর্চা সম্ভবত বহুলাংশে এর জন্য দায়ী। রামমোহন-কর্তৃক শাস্ত্রের প্রামাণিক ব্যাখ্যা এই সকল ভ্রান্তি অপনোদনে নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছিল। প্রবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনা করে মূল থেকে তার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এখানে দেওয়া গেল। স্থানে স্থানে লেখকের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করবার জন্য যে দু'একটি অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার প্রয়োজন হয়েছে সেগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে রেখেছি। মূল প্রবন্ধের অনুচ্ছেদগুলিকে পরিবর্তন করা হয় নি। মূলের অর্থবিস্তারের জন্য অনুবাদক প্রদত্ত আবশ্যকীয় টীকাগুলি সংখ্যানুসারে প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে পাওয়া যাবে। 'ক্রোণিক্ রেলিজিউজ্'-এর অন্তর্ভুক্ত আবে গ্রেগোয়ারের রামমোহন সংক্রান্ত পুস্তিকাখানি থেকে ল্যাঁজুয়ানে তাঁর প্রবন্ধের জন্য প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন ; প্রবন্ধের আরম্ভেই তার উল্লেখ রয়েছে।

॥ রামমোহন রায়ের কতিপয় গ্রন্থসম্পর্কে মন্তব্য ॥

'লা ক্রোণিক্ রেলিজিউজ্' (পৃঃ ৩৮৮-৪০৩)-এ রামমোহন রায়ের ব্যক্তিগত পরিচয়, মতামত, জীবন এবং প্রধান গ্রন্থগুলি সম্পর্কে যে বিবরণ আছে তার উপর নির্ভর করা চলে।

'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্'-এর তৃতীয় খণ্ডে ১১৭-১৯ পৃষ্ঠায় উক্ত ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রকাশিত রচনাবলীর একটি সাধারণ তালিকা দেওয়া হয়েছে। তিনি স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করতেন ও প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

এখানে তাঁর প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা যাচ্ছে। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাঁর চারখানি উপনিষদের অনুবাদ এবং 'বেদান্তসার' [ইংরেজি অনুবাদ] দিয়ে আরম্ভ করছি।

উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে 'ঈশ'-এর স্থান পঞ্চম। পারসীক সংস্করণে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'Eischa Vasieh' [ঈশাবাস্য]; সংস্কৃত ভাষায় কথাটি হল 'Irza' অথবা 'Iza' [ঈশ] কিংবা Ischavasyam [ঈশাবাস্যম্]; ফরাসী ভাষায় এর অর্থ হবে 'প্রভু' 'পরমেশ্বর' 'অদ্বিতীয়' 'প্রচ্ছন্ন' 'আচ্ছাদিত' বা 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত সত্তা', সৃষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির গোচর হন; তিনি ভিন্ন সৃষ্টির কোনও নিজস্ব সত্তা নেই।[২৩] 'উপনেক্‌হৎ'গুলি[২৪] বিশ্লেষণ করে আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, এই হল উক্ত উপনিষদখানির মর্মকথা।

রামমোহন রায়ের পক্ষে এই গ্রন্থখানি ইংরেজিতে অনুবাদ না করলেও চলত, কেননা উইলিয়ম জোন্সের গ্রন্থাবলীতে (ষষ্ঠ খণ্ড পৃ: ৪৩৩) এর একটি ইংরেজি অনুবাদ বর্তমান আছে।[২৩ক] উইলিয়ম জোন্স ও রামমোহন রায়ের উক্ত দুইখানি ইংরেজি সংস্করণের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে যদিও শেষোক্ত গ্রন্থখানি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।[২৫] যদি আঁক্যতিল্ দ্যু পেরোঁর লাটিন অনুবাদের মাধ্যমে এই গ্রন্থগুলিকে [দারা শুকোহ্ প্রকাশিত] পারসীক অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে পারসীক অনুবাদের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ করার আছে: প্রথমত বিষয়বস্তুর অনাবশ্যক ও দীর্ঘ অর্থব্যাখ্যা; দ্বিতীয়ত [গ্রন্থমধ্যে] 'তন্‌জি' বা 'তহ্‌বি'র ন্যায় মুসলমানী শব্দ ও তত্ত্বের সমাবেশ।[২৬] আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করে বলবার প্রয়োজন নেই যে এই সকল শব্দ ও সেগুলির অর্থ বৈদিক সাহিত্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অবশ্য ঐ কারণেই হয়তো পারসীক সংস্করণের মুসলমান গ্রন্থকারগণ যে সব অমার্জনীয় সংযোজন করেছেন, সেগুলি আশংকানুরূপ বিপজ্জনক হয়নি।[২৭]

এবারে রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮১৯ সালের কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত 'কঠোপনিষদ'-এর প্রসঙ্গে আসছি। গ্রন্থে প্রকাশের স্থানকালের যথাযথ উল্লেখ নেই।[২৮] সহজেই বোঝা যায় আঁক্যতিল্ দ্যু পেরোঁ প্রকাশিত 'উপনেক্'হৎ', দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৯-৩২৭ পৃষ্ঠার 'কিউনি উপনেক্'হৎ' (Oupnek'hat Kiouni)[২৯] শীর্ষক সপ্তত্রিংশত্তম গ্রন্থ এবং 'কঠোপনিষদ' অভিন্ন। কিন্তু 'কঠ' বা 'কিউনি' শব্দদ্বয়ের কোনও অর্থ আমি খুঁজে পাই না।[৩০] রায় বলেন এই উপনিষদ খানি যজুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত। পারসীক ভাষার অনুবাদকগণ এবং তাঁদের মতে সায় দিয়ে আঁক্যতিল্

দ্যু পেরোঁ বলেছেন এটি অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত। বলতে পারি না কার মত যুক্তিযুক্ত।[৩১] তত্ত্ব ও বর্ণনা উভয় দিক থেকেই লাটিন ও ইংরেজি সংস্করণের তাৎপর্য এক। কিন্তু [তুলনামূলক আলোচনার পর] আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে, পারসীক সংস্করণটি মূলগ্রন্থের এক সুদীর্ঘ অর্থবিবৃতিমাত্র। একথাও মনে হয় ব্রাহ্মণ রায়ের [রামমোহন রায়ের] সংস্করণে গ্রন্থটিকে কিছু সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।[৩২] 'কেনোপনিষদ', সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আঁক্যতিল্ দ্যু পেরোঁর ষষ্ঠত্রিংশত্তম 'উপনেক্'হৎ' 'কিন'-এর সঙ্গে আমি এটিকে অভিন্ন বলে বুঝতে পেরেছি। পারসীক্ ও লাটিন সংস্করণ অনুসারে 'কেন' অথবা 'কিন' (অর্থাৎ 'ভাস্বর' বা 'প্রকাশমান' সত্তা)[৩৩] 'অথর্ববেদ'-এর এক অংশ— [সংস্কৃত ভাষায়] 'শাখা' অথবা 'কাণ্ড'। অপর পক্ষে রামমোহন রায়ের মতানুসারে এটি 'সামবেদ'-এর শাখা।[৩৪] [গ্রন্থকারগণের] উক্তিসমূহের মধ্যে গরমিলের এই হল দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভারতবর্ষে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় গ্রন্থাদির নামের ক্ষেত্রেও কতখানি শৈথিল্য বর্তমান।

কিন্তু চতুর্থ বা 'মুণ্ডক' উপনিষদখানি বেদের কোন গ্রন্থ থেকে নির্গত সে সম্পর্কে সব কটি সংস্করণই এক মত। পারসীক ও লাটিন সংস্করণ অনুসারে নামটি 'মুণ্ডেক' (Mundek); রামমোহন রায় প্রদত্ত বাঙলা উচ্চারণ অনুযায়ী 'মুণ্ডাক' (Moonduck)।[৩৫] সংস্কৃতে নামটি 'মুণ্ডক' অর্থাৎ যা বেদের সার-স্বরূপ বা অলংকার-স্বরূপ।[৩৬] এই অংশটি 'অথর্ববেদ'-এর অন্তর্ভুক্ত।

রামমোহন রায়ের উক্ত চারখানি উপনিষদ-এর সারানুবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করা ও বেদবিহিত হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা[৩৭]; ঐ বেদেরই সাহায্যে একথা প্রমাণ করা যে ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্যানুভূতির মাধ্যমে যে মুক্তির আস্বাদ লাভ করা যায় সে মুক্তি পৌত্তলিকতা মানুষকে কখনও দিতে পারে না; [এই ঐক্যবোধের প্রত্যয়ের মধ্যে] সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা, সর্বাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়ানুভূতির অবদমন, নিরাসক্তি, নৈষ্কর্ম্য এবং সর্বশেষে [ব্রহ্মোপলব্ধি-জনিত] জ্যোতিরুল্লাস প্রভৃতি, 'উপনেক্'হত'-এর বিশ্লেষণে আমরা যা যা ব্যাখ্যা করেছি, সব কিছু মিশে রয়েছে। তিনি এর দুর্বল দিকগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরেন নি।

এই সর্বাত্মবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এই পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে, ১১৮-১৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত গ্রন্থসকল প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে সর্বাধিক

উল্লেখযোগ্য বেদান্তের একটি অতি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বেদান্ত শব্দের অর্থ হল বেদের শেষ ভাগ বা সারবস্তু। ভারতের সনাতন আস্তিক ছয়টি দর্শনের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম। 'দর্শন' বলতে বোঝায় যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বচিন্তার একটি 'প্রতিচ্ছবি' বা 'দর্পণ'।[৩৮]

উক্ত প্রস্থানগুলি সংখ্যায় মূলত তিনটি। এর প্রত্যেকটি দুটি তত্ত্বের বা দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের সমষ্টি। এই তিনটি মূল প্রস্থান সাংখ্য, ন্যায় ও মীমাংসা নামে পরিচিত।[৩৯] বেদান্তদর্শন মীমাংসার অন্তর্ভুক্ত। আক্ষরিক অর্থে বিবেচনা করলে মীমাংসার অর্থ দাঁড়ায় [প্রামাণিক বিজ্ঞানের] গবেষণা।[৪০] ঐ নামের প্রাচীনতম গ্রন্থ তার প্রাচীনত্বের জন্য পূর্বমীমাংসা নামে অভিহিত। অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রাচীন গ্রন্থখানির নাম উত্তর মীমাংসা বা শ্রেষ্ঠ গবেষণা।[৪১] শেষোক্ত গ্রন্থে ব্রহ্মের সহিত [জীবাত্মার] মিলনের পন্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থ পতঞ্জলি-মুনি কৃত।[৪২] ব্যাস কৃত পূর্বমীমাংসাতে ঔপনিষদ মতানুযায়ী সেই ব্রহ্মসংযোগের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় এবং বেদান্ত, এই সহজ নামেই তা সমধিক পরিচিত।[৪৩]

কয়েক বৎসর হল কলিকাতায় উক্ত গ্রন্থের বাংলা অক্ষরে এক সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই।[৪৪] রামমোহন রায় তাঁর [আলোচ্য] ছাব্বিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী রচনায় বেদান্তদর্শনের কতগুলি অতি সরল অংশ মাত্র বিবৃত করতে পেরেছেন।

বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, আগম, আখ্যায়িকা, ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সকল অঙ্গেরই প্রতিপাদ্য, কেবলমাত্র জ্ঞানী, লয়বাদী, পবিত্রাত্মা এবং যোগিগণই মুক্তিলাভের যোগ্য। কিন্তু মূর্তিপূজক সম্প্রদায়গুলির জন্য উক্ত শাস্ত্রের বিধান (দেহান্তে) ঊর্ধ্বাকাশে চন্দ্রলোক, তারকালোক প্রভৃতিতে অবস্থিত আজগুবি, অশ্লীল ও নৈতিক আদর্শবিহীন নানা প্রকার স্বর্গে লক্ষ লক্ষ বৎসর বাস এবং পরিণামে এই পৃথিবীতে নবজন্ম ও একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি; আর সর্বশেষে [প্রলয়কালে] যখন ব্রহ্ম সমগ্র সৃষ্টিকে নিজমধ্যে সংহরণ করবেন তখন তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া। সুতরাং বুঝতে পারা যায় রামমোহন রায়ের রচনাবলী কখনোই কাউকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয় নি।[৪৫]

একেশ্বরবাদের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক রচনা প্রকাশ

এবং প্রচারকার্যেও তিনি যথেষ্ট আনন্দবোধ করেছেন; অধিকন্তু ধর্মীয় উপাখ্যান, ভবিষ্যদ্বাণী, অলৌকিক কাহিনী, রহস্যবাদ প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী সমূহের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অসার প্রতিপন্ন করবার কাজেও তাঁর উৎসাহ দেখা গিয়েছে। এই প্রচেষ্টাই তিনি করেছেন তাঁর সুপরিচিত 'খ্রীষ্টের উপদেশাবলী' ও 'খ্রীষ্টীয় জনসাধারণের প্রতি' প্রথম ও দ্বিতীয় 'আবেদন' শীর্ষক গ্রন্থগুলিতে। ইউরোপের সুপরিচিত এবং বহুল আলোচিত বিতর্কের বিষয়গুলির উপর তা মোটেই আলোকপাত করে না।[৪৬]

হিন্দু বিধবাগণকে তাদের স্বামীর চিতানলে দাহ করবার প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত তাঁর 'কথোপকথন'[৪৭] সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলবার কিছু নেই। প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রাদি যথেষ্ট সূক্ষ্মতার সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সেক্ষেত্রে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে উক্ত নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, পরন্তু ঐ বিষয়ে যে শাস্ত্রোক্তি সংগৃহীত হয়েছে তার দ্বারা বিপরীত মতই প্রমাণিত হয়।

কোলব্রুকের একটি আলোচনায় বলা হয়েছে (চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৪, ২১৫)[৪৮] যে শাস্ত্রে [হিন্দু] বিধবাগণকে চিতানলে প্রাণ বিসর্জন দেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের সে কাজে বাধ্য করাবার কথা বলা হয় নি। আমাদের গ্রন্থকার [রামমোহন রায়] বাঙ্‌লাদেশের ব্রাহ্মণদের যষ্টীর সাহায্যে বিধবাগণকে চিতায় নিক্ষেপ করবার এবং সেখানে স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে তাদের বেঁধে রাখবার জন্য তিরস্কার করেছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্বরোচিত আজগুবী শাস্ত্রীয় প্ররোচনার সহিত যুক্ত এই বলপ্রয়োগ অমার্জনীয়; এর ফল বার বার বহু ভারতবাসীকে ভোগ করতে হয়েছে।

যদি সিসিলিবাসী দিওদোরস বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থে উল্লিখিত এবং পরে কালগর্ভে লুপ্ত এই প্রথার উৎপত্তি ও প্রাচীনত্বের কথা জানতেন, তিনি যদি খবর রাখতেন যে তাঁর রচনাকালের দুহাজার বৎসর পূর্বে বৈদিক সাহিত্যে বিবাহের যে বিধিসকল সুনির্দিষ্ট হয়েছিল, সেগুলির সম্ভবত কোনও পরিবর্তন হয়নি, এবং সকল শাস্ত্রই হিন্দু বিধবাকে স্বামীর মৃত্যুর পর নির্জনে কৃচ্ছ্রসাধনপূর্বক জীবনধারণ করবার অনুমতি দিয়েছে, তাহলে তাঁর ইতিহাসে (৫০, ১৯, ৩৩) নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসের সহিত তিনি যে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন, তা নিশ্চয় বর্জন করতেন। উক্ত কাহিনী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

ব্যাভিচার নিরাকরণার্থে [ভারতবর্ষে] একটি আইন প্রণীত হয়েছিল। এই আইনে বিধবাগণকে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে বাধ্য করা হত। *

হিন্দুসমাজে কখনও নূতন আইন প্রণয়ন করা হয় নি ; সুপ্রাচীন তথাকথিত আপ্তবিধান এবং লোকাচারের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা হয়েছে। কথিত আছে প্রাচীনরা ঐ গুলি সংগ্রহ করেছিলেন। উত্তরকালে টীকা-টিপ্পনীর দ্বারা সেগুলির অর্থ ক্ষেত্রবিশেষে স্পষ্ট ও ক্ষেত্রান্তরে অস্পষ্ট হয়েছে ; কেননা উক্ত টীকাসমূহ সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে মেলে না।

'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্-এর মুখপত্রে প্রকাশিত রামমোহন ও তাঁর গ্রন্থাবলী ও আদর্শ সম্পর্কে এই বিস্তারিত আলোচনা 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর সঙ্গে যুক্ত ফরাসী পণ্ডিত-সমাজকে রামমোহন সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছিল। অনুমান করা যেতে পারে তাঁর সম্পর্কে এইবার ফরাসী সুধী-মণ্ডলী রীতিমত অনুসন্ধান আরম্ভ করেন এবং তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা (যথা, রামমোহন জীবিত নেই) তার ফলে ক্রমশ দূর হয়। 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর ৭ জুন, ১৮২৪ তারিখের অধিবেশনে রামমোহনকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক সদস্য (Associé Correspondant) মনোনীত করবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ব্যারন দ্য সাসি ও ল্য কোঁৎ দওত্যরিভ্ এই প্রস্তাব আনয়ন করেন। ঐ সভাতেই ল্যাজুয়ানে, বুর্ন্ফ্ ও ক্লাপরোট্ কর্তৃক গঠিত এক বিচারক-মণ্ডলীকে রামমোহনের সদস্যপদলাভের যোগ্যতা বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী ৫ জুলাই তারিখের অধিবেশনে এই বিচারক-সমিতির পক্ষ থেকে ক্লাপরোট্ তাঁর অনুকূল অভিমত প্রকাশ করেন। 'জুর্নাল আসিয়াতিক্'-এর জুলাই, ১৮২৪ সংখ্যায় সে বিষয়ে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল : 'বৈদেশিক সদস্যপদের জন্য প্রস্তাবিত পণ্ডিত রামমোহন রায়ের বিদ্যাবত্তাবিষয়ক যোগ্যতা সম্পর্কে ম. ক্লাপরোট্ বিচারক-মণ্ডলীর পক্ষ হতে এক বিবরণ পেশ করেন। ঐ বিবরণীতে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল সেগুলি কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত করা হয় এবং রামমোহন রায়কে বৈদেশিক সদস্য উপাধিতে ভূষিত করা হয়' (M. Klaproth au nom d' une commission, fait un rapport sur les titres litteraires du Pandit Rammohan Roy, presenté pour être

associé correspondant. Les conclusions de ce rapport sont soumises à la délibération du conseil, et le titre d' associe correspondant est decerné à Rammohan Roy)[৫০]। ইংরেজ সামরিক বাহিনীর জনৈক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী কর্নেল লাচ্‌লানের উপর 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্' রামমোহনের নিকট তাঁর সদস্যপদভুক্তিপত্রখানি পৌঁছে দেবার ভার দিয়েছিলেন। এই সংবাদ উক্ত কর্মচারীর এক চিঠি থেকে জানতে পারা যায়।[৫১] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ্ ঝাঁ্য সার্ল্ লেওনার্ দ্য সিস্‌মোঁদি (১৭৭৩-১৮৪২) 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্' পত্রিকার নভেম্বর, ১৮২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর Recherches sur le systeme colonial pour le gouvernment de l' Inde প্রবন্ধে প্রসঙ্গত ধর্মনেতা ও সমাজ-সংস্কারকরূপে রামমোহনের অতি উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন।[৫২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৮১৮ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত ফ্রান্সে রামমোহন ও তাঁর কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল এবং এরই পরোক্ষ ফলস্বরূপ রামমোহন স্বয়ং ফ্রান্সে যাবার কয়েক বৎসর পূর্বেই 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্' কর্তৃক সম্মানিত বৈদেশিক সদস্য মনোনীত হয়ে ফরাসী সারস্বত সমাজে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ফ্রান্সে অল্পকাল অবস্থানের মধ্যেই যে তিনি ফরাসী-রাজকর্তৃক সমাদৃত হয়েছিলেন উপরিউক্ত পরিপ্রেক্ষিতে সেটির খুব স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ঘটনা। ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপ ছিলেন 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষক (protecteur)।[৫৩] সুতরাং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত বৈদেশিক সদস্য রামমোহনের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিষয় পূর্ব হতেই নিশ্চয় তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল।

রামমোহনের মনীষা, কীর্তি ও রচনাবলী সম্পর্কে ফরাসী বুধমণ্ডলীর যে শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর সম্মানিত বিদেশী সদস্যরূপে তাঁর নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত তার আর একটি বিস্তারিত সমকালীন পরিচয় পাওয়া যায় তদানীন্তন ফরাসী সাময়িক পত্র 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্'-এর পৃষ্ঠায়। এর ডিসেম্বর ১৮৫২ সংখ্যায় ম. পথিয়ে নামক এক সমালোচক রামমোহনের Translation of Several Principal

Books, Passages and Texts of the Veds, and of some controversial works on Brahmanical Theology গ্রন্থখানির এক সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন[৫৪]। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে আলোচ্য পুস্তকটি পারবারী অ্যালেন কোম্পানী কর্তৃক লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি রামমোহনের পূর্বপ্রকাশিত তেরখানি গ্রন্থের একটি সংগ্রহ। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি এই সংগ্রহভুক্ত: (১) Translation of an Abridgment of the Vedant; (২) Translation of the Moonduck Opunishud; (৩) Translation of the Cena Upanishad; (৪) Translation of the Kuth-Opunishud; (৫) Translation of the Ishopunishud; (৬) A Translation into English of a Sunskrit Tract inculcating the Divine Worship etc.; (৭) A Defence of Hindoo Theism; (৮) Second Defence of the Monotheistical System of the Veds, etc.; (৯) An Apology for the Pursuit of Final Beatitude independently of Brahmunical Observances; (১০) Translation of a Conference between an Advocate for, and an Opponent of, the practice of Burning Widows alive; (১১) A Second Conference between an Advocate for, and an Opponent of burning Widows alive; (১২) Abstract of Arguments regarding the Burning of Widows considered as a Religious Rite; (১৩) Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance।[৫৫] বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই ফরাসী সুধীমণ্ডলীর পূর্বপরিচিত। তথাপি গ্রন্থাবলীর আকারে এই নূতন সংস্করণ লণ্ডনে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক ফরাসী পত্রিকায় তার সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ থেকেই বোঝা যায় রামমোহনের মনীষা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে ফরাসী বিদ্বৎসমাজের আগ্রহ কত গভীর ছিল। ম. পথিয়ে স্বয়ং প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন করতেন; সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি রামমোহন-গ্রন্থাবলীর আলোচনা করেছেন। আলোচনায় তাঁর যে মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে

তা একযোগে সশ্রদ্ধ ও বিচারশীল। এই আলোচনা যখন প্রকাশিত হয় তার অল্পদিন পূর্বে রামমোহন ফ্রান্স পরিদর্শন করে ইংলণ্ডে ফিরে গেছেন ও পুনরাগমনের সংকল্প ঘোষণা করে গেছেন। পথিয়ে উপসংহারে এ-কথার উল্লেখ করেছেন। পারি-নিবাসী বন্ধু অধ্যাপক ডঃ কমলেশ্বর ভট্টাচার্যের সৌজন্যে উক্ত সমালোচনা-প্রবন্ধটির আলোকচিত্র সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান লেখকের হস্তগত হয়েছে। এখানে মূল থেকে সেটির বঙ্গানুবাদ করে দেওয়া গেল। প্রবন্ধটিতে আলোচনার মাঝে মাঝে প্রবন্ধ-লেখক যে সব স্বগতোক্তি করেছেন বা টীকা যোগ করেছেন—অনুবাদে সেগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। কোনও কোনও স্থানে অনুবাদকের পক্ষে অর্থবিস্তারের নিমিত্ত যে টীকা সংযোজনের প্রয়োজন হয়েছে সংখ্যানুক্রমে তা পাওয়া যাবে প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে:

॥ ম. পথিয়ে কৃত সমালোচনা-প্রবন্ধের অনুবাদ ॥

এটি একখানি বিচিত্র সংগ্রহ-গ্রন্থ যেমনটি ইতিপূর্বে কখনও প্রকাশিত হয় নি। এর মাধ্যমে আমরা এক অতি আশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছি (হাঁ, এটি অবশ্যই তাই, কেননা, ইতিহাসে তুলনীয় দ্বিতীয় উদাহরণ নেই); ঘটনাটি হল একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণের আবির্ভাব—যিনি ইউরোপের ভাষাসমূহে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনে তাঁর ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক ও বিচারবিতর্ক-মূলক গ্রন্থাবলীর এক দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থগুলি আদৌ সংস্কৃত, বাঙ্‌লা ও ইংরেজি ভাষায় কলিকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থকারের এগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল—তাঁর দেশবাসী ব্রাহ্মণদের কাছে প্রমাণ করা যে তাদের পবিত্র গ্রন্থ বেদ ব্রহ্মসত্তার একত্বই শিক্ষা দেয় এবং তাদের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির রচিত প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র কদাচ বিধবাগণকে তাদের স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেবার নির্দেশ দেয় না। এমন একজন জ্ঞানী ও উন্নতমনা ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংকীর্ণচিত্ত ও পরমত-অসহিষ্ণু ইংরেজ মিশনারীরা যে একজোট হবেন—তা তো অবধারিত; কেননা তাঁরা বলে বেড়ান একেশ্বরবাদের মত মহৎ ও উচ্চ ধর্মমত কেবলমাত্র হিব্রু ধর্মশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। তাঁরা এই প্রাজ্ঞ ও উদারমতি ব্রাহ্মণকে হয় অসাধু বিধর্মী (paien impie) অথবা সমান

বিপজ্জনক যুক্তিনির্ভর ধর্মবিশ্বাসী (deiste) (যাঁরাও তাঁদের মতে সম্ভবত কম অসাধু নন) বলে গণ্য করে থাকেন। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করেন,— রামমোহনের পরিকল্পনা ছিল এমন এক বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ধর্মসম্প্রদায় (une secte de purs deistes) গঠন করা যে সংঘ ইংরেজ মিশনারীদের ভারতবাসীকে ধর্মান্তরিত করার দাবী ও ভারতীয় পৌত্তলিকতা—যা স্বার্থান্ধ মূঢ়তারই নামান্তর—উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করবে। সুতরাং ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়ের জীবনের প্রায় সবটুকুই অতিবাহিত হয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন তর্কযুদ্ধে। দুদিক থেকেই তাঁকে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়েছে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে তিনি তাঁর সুমহৎ যুক্তি ও তার সমর্থক সুনিপুণ তর্কের সাহায্যে সর্বদা এই সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন।

এই বিশেষ পরিস্থিতি যা আমরা বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি,— রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেন দুই স্বতন্ত্র সত্তার জন্ম দিয়েছে। তার মধ্যে একটি ইংরেজ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অপরটি হিন্দু ব্রাহ্মণদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উক্ত উভয় সম্প্রদায়ই প্রাণহীন শাস্ত্র এবং প্রগতিশীল ও শ্রেষ্ঠ মানবীয় বুদ্ধির (যেমন রামমোহন রায়ের,) সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন রীতিনীতির প্রতি আসক্তিতে অন্ধ (Cette position singuliere, que nous avons essaye´ de definir, a developpe´ dans Rammohun Roy comme deux hommes distincts, dont l'un fait face aux chre´tiens anglais, et l'autre aux brahmanes hindous, attache´s servilement les uns et les autres a` des lettres mortes, a` des pratiques inconcilables avec la raison humaine, progressive et superieure, telle que celle de Rammohun Roy)। এর থেকে কেউ যেন ধরে না নেন এই ব্রাহ্মণ মনীষী সর্বপ্রকার শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জন করেছেন। তা নয়। ইনি যখন তাঁর দেশবাসীকে সম্বোধন করেন তখন তাঁর সমস্ত যুক্তি ভারতীয়গণের মান্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ থেকে সুনির্বাচিত উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থন করে থাকেন; তিনি তখন সম্পূর্ণমাত্রায় ভারতীয় ও ব্রাহ্মণ—কিন্তু এমন এক ভারতীয় ও ব্রাহ্মণ, যাঁর মন ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে আপন সিদ্ধান্তগুলিকে দৃঢ় করেছে। আবার যখন তিনি ইংরেজ মিশনারীদের সঙ্গে আলোচনা

করেন তাঁর যুক্তিগুলি হয় ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রনিরপেক্ষ; সে উপলক্ষে তিনি ইউরোপীয় বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করেন, এবং হিব্রু ও গ্রীক বাইবেল, খ্রীষ্টীয় সংঘের ধর্মগুরুগণের (les Pe´res de l e´glise) উক্তি ইত্যাদি যথাযোগ্য ইউরোপীয় শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করেন,—তাঁর প্রতিপক্ষগণই ভ্রান্ত:— বাইবেলের অমুক অমুক অংশের সঠিক ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে খ্রীষ্টানরা তার যে অর্থ করতে চাচ্ছেন প্রকৃত অর্থ ঠিক তার বিপরীত। পরিতাপের বিষয়, রামমোহন রায় তাঁর এই (শেষোক্ত) অভিনব বিতণ্ডামূলক রচনাবলী ইংলণ্ডে প্রকাশিত বর্তমান সংগ্রহগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত করেন নি। তবে যে কুণ্ঠা তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করেছে তার কারণ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। যে (খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী) দেশ তাঁকে আতিথ্য দিয়েছে সেখানে তিনি এই বিষয়ক উত্তেজনাকে পুনর্বার জাগিয়ে তুলতে চাননি এবং তিনি মনে করেছেন, যেখানে (ভারতবর্ষে) প্রকৃতপক্ষে তাঁর উপর (মিশনারীগণের) আক্রমণ ঘটেছে প্রতিবাদ সেখানে সীমাবদ্ধ থাকলেই তাঁর কর্তব্য পূর্ণমাত্রায় সমাধা হবে।[৫৬] সম্ভবত তিনি এটাও ভেবেছিলেন, ধর্মবিষয়ক বাদ-প্রতিবাদে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করা অপেক্ষাও তাঁর পক্ষে একটি উচ্চতর আদর্শ আছে; এবং ইউরোপীয় সভ্যতার গভীরতর অনুশীলন ও এর ফলাফল স্বদেশে প্রচার তাঁর নিকট অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যিনি লণ্ডনে তাঁকে বহুবার দেখেছেন আমাদের এমন কোনও এক বন্ধুর কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে সেখানে আমাদের (পাশ্চাত্যদেশীয়গণের) মধ্যে (বসবাসকালে) এইটিই ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য; এবং এটা তাঁর কাছে আশ্চর্য লাগত যে আমরা,—পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে সুশিক্ষিত নবীন যুগের ইউরোপীয়রা, তাঁর দেশের পবিত্র ভাষা ও গ্রন্থনিচয় অধ্যয়নের নিমিত্ত আমাদের সময় ও অকাতর পরিশ্রম ব্যয় করতে সক্ষম হচ্ছি। কিন্তু নিজদেশের সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান অপেক্ষা ইউরোপীয় সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে এই মনোভাব পোষণ করে রামমোহন তাঁর স্বদেশ ও আমাদের দেশ উভয়ের প্রতিই সম্ভবত কিঞ্চিৎ অবিচার করেছেন।[৫৭] কেননা, ঠিক যেমন তিনি স্বয়ং বিপুল আগ্রহসহকারে মানবসভ্যতা সম্পর্কে বৃহত্তর, মহত্তর ও দৃঢ়তর অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য ইউরোপীয় সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় ব্রতী হয়েছেন - তেমনি আমরা ইউরোপীয়রাও একই ভাবে মানবজাতি সম্পর্কে

বৃহত্তর ও উচ্চতর ধারণা অর্জন করবার জন্যই এসিয়ার সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান সমূহের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছি ; কারণ, মনুষ্যত্বের কোনও বিভাগ নেই ;[৫৮] এসিয়ার উচ্চ মালভূমিসমূহই মানবসভ্যতার উৎপত্তিস্থান ; সেখানেই সর্বপ্রথম রহস্যময় মানবসত্তা রূপপরিগ্রহণ করেছিল ; উত্তরকালে ইউরোপকে প্লাবিত করবার ও গমনপথে পশ্চাতে বিশাল বালুকাময় মরুভূমিসমূহ সৃষ্টি করে যাবার পূর্বে সেখান থেকেই সভ্যতার বিরাট প্রবাহ প্রথম নির্গত হয়েছিল। সুতরাং আংশিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজাতি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা করা যায় না, একে সমগ্রভাবে দেখা প্রয়োজন ; এর জন্ম, যৌবনকাল ও অবক্ষয়ের পর্ব-—সব একত্র মিলিয়ে দেখতে হবে। (মিশরের) নীল নদী বা (ভারতের) গঙ্গার মত যে যোগসূত্রগুলি (মানবসভ্যতার) এই বিরাট পরম্পরার উদ্ভবের ইতিহাসকে এখন পর্যন্ত লুকিয়ে রেখেছে, সেগুলিকে পুনরাবিষ্কার করাও আবশ্যক। আমাদের মতে ভারতবর্ষেই এই পরম্পরাসূত্রের প্রাচীনতম পশ্চাদ্ভূমি দৃশ্যমান ; সেখান থেকে (যেমন নীল-বিধৌত আবিসিনীয়ার পার্বত্য অঞ্চল থেকেও) ইউরোপ পর্যন্ত প্রবাহিত এই সভ্যতাস্রোত মানবিক বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে—যা (বর্তমানে ইউরোপ থেকে) পুনঃবিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়তো আমাদের জন্য আরও নূতন আবিষ্কার অপেক্ষা করে আছে।

বর্তমান নিবন্ধের অত্যন্ত সীমিত আয়তনের জন্য রামমোহন রায়ের অসংখ্য রচনা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাঁর জীবন সম্পর্কে অল্প কয়েকটি কথা এখানে বলব। তাঁর রচিত The Precepts of Jesus গ্রন্থখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ মিশনারী The Friend of India-র এক সংখ্যায় তাঁর বিরুদ্ধে Paganism বা সাকার-উপাসকত্বের অভিযোগ এনেছিলেন। আত্মপক্ষসমর্থনে তাঁর An Appeal to the Christian Public গ্রন্থে তিনি স্বয়ং আমাদের জানিয়েছেন,—সাকার দেবপূজক হওয়া দূরে থাক,—ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও তিনি অতি অল্প বয়সে কেবলমাত্র যে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেছিলেন তা নয়, অধিকন্তু জীবনের ঐ পর্বেই পৌত্তলিক উপাসনাপদ্ধতির বিরুদ্ধে আরবী ও ফার্সী ভাষায় একখানি পুস্তকও রচনা করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট অধিকার জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি (প্রকাশ্যভাবে) পৌত্তলিক

উপাসনা ত্যাগ করেন। এই পৌত্তলিকতা-বর্জনের জন্য তাঁকে নিদারুণ দুঃখভোগ করতে হয়েছিল—কেননা এর জন্য তিনি পিতামাতার বিরাগভাজন এবং বহু বৎসর যাবৎ স্বদেশবাসীর ঘৃণার পাত্র হন। রামমোহনের এই পৌত্তলিকতা-বর্জন কিন্তু ঠিক খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের সমার্থবাচক নয়; একে বলা যেতে পারে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের বিশুদ্ধীকরণ,—ব্রাহ্মণ্য হিন্দু পৌত্তলিক ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানের স্তর থেকে বিশুদ্ধ, সরল, যুক্তিমূলক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ধর্মের ভূমিতে উত্তরণ (une épuration de ses croyances religieuses, converties du culte et des pratiques idolatres du brahmanisme hindou au culte purement spirituel et mental du simple deisme)।

[The Precepts of Jesus গ্রন্থে' রামমোহন রায় খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের নৈতিক উপদেশ, খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বসমূহ ও খ্রীষ্টধর্মসংঘের সঙ্গে বিজড়িত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে পরস্পরের থেকে পৃথক গণ্য করেছেন—এই মর্মে ইংরেজ মিশনারীগণ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। রামমোহন তার জবাবে যা বলেছেন তা এই: "খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বগুলির যে সব বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার ফলেই যীশুখ্রীষ্টের অনুবর্তী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এত বেশী বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এর দ্বারা কেবল যে বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ঐক্য ও সদ্‌ভাব নষ্ট হয়েছে তা নয়; মধ্যযুগে এদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে যা খ্রীষ্টান ও বিধর্মীদের পরস্পর-সংঘর্ষের চেয়েও অনেক বেশী ভয়ংকর। আমার বিশ্বাস খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশগুলির ইতিহাসের উপর একবার চোখ বুলালেই আমার পাঠকবর্গ এ বিষয়ে সুনিশ্চিত ধারণা করতে পারবেন। যীশুখ্রীষ্টের এই উপদেশাবলীর সংগ্রাহক (রামমোহন রায়) সেই দেশেরই অধিবাসী যেখানে গত কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল ইউরোপীয় মিশনারীগণ ও অন্যান্যরা খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত সম্পূর্ণ বাইবেল গ্রন্থের অসংখ্য খণ্ড বৃথা বিতরণ করে আসছেন। তিনি এঁদের (উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থতাজাত) নিরাশার কারণগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ নন। যাই হোক, তিনি কখনও খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে তাঁদের উৎসাহের আন্তরিকতায় অথবা এই বিপুলসংখ্যক বাইবেল প্রকাশার্থ প্রতিবৎসর যে সুপ্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়েছে, তার পরিমাণ

সম্পর্কে তাঁদের প্রদত্ত হিসাবে সন্দেহ করেন নি। কিন্তু তিনি দেখে দুঃখিত হয়েছেন, তাঁরা খ্রীষ্টীয় ধর্মমন্দিরসমূহে উপদিষ্ট তাবৎ তত্ত্বকথা ও অলৌকিক রহস্যকাহিনী গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি প্রচার করে নিজেদের সৎপ্রচেষ্টার পথে নিজেরাই বাধা সৃষ্টি করেছেন। ফল হয়েছে এই যে, এদেশবাসীরা বাইবেল পাঠে উপকৃত হওয়া দূরে থাকুক, বিনামূল্যে প্রাপ্ত বাইবেলগুলিকে তারা প্রায়ই সাদা কাগজের সঙ্গে বিনিময় করে থাকে; এবং নিজেদের ভাষায় উক্ত তত্ত্ববাচক বহু শব্দ এমন তাচ্ছিল্য ও অশ্রদ্ধাসূচক অর্থে ব্যবহাব করে যার উল্লেখ করতেও আমার রুচিবোধ পীড়িত হয়। সাবাৎ নামক একজন পণ্ডিত অথচ অতিমাত্রায় অব্যবস্থিতচিত্ত আরবকে আমাদের মিশনারীরা প্রায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে ফেলেছেন বলেই ধরে নিয়েছিলেন; তাঁকে তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের সমস্ত তত্ত্বই শিক্ষা দিয়েছিলেন; কয়েক বছর আগে তিনিই সেই তত্ত্বগুলির বিরুদ্ধে আরবীতে এক বই লিখলেন—এবং সে বই ছাপিয়ে বেশ কয়েকশ খণ্ড প্রকাশও করলেন!" রামমোহন রায় এই রকম আরও অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে এর দ্বারা প্রমাণ হয় খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্ব ও অলৌকিক কাহিনীসমূহকে বাইবেলোক্ত নীতিদেশনার সঙ্গে সর্বদা জড়িত করার যে একগুঁয়ে মনোভাব খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে—বিধর্মীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করবার ব্যাপারে তাঁদের অসাফল্যের জোরালো কারণগুলির সেটি অন্যতম। এই সব তথ্যের গুরুত্ব অত্যধিক এবং এগুলি এমন এক সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞজনের কাছ থেকে এসেছে যে কোনক্রমেই এগুলিকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না (Ces avertissements sont trop importants et ils sont donnés par un homme trop instruit et trop grave, pour ne pas mériter une sérieuse attention)।]

রামমোহন রায়ের ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত ও 'একমাত্র সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরে বিশ্বাসীগণ'কে উৎসর্গীকৃত বেদান্তের ইংরেজি অনুবাদ সেই বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যুক্তিনির্ভর ধর্মবিশ্বাসেরই নিদর্শন বলে মনে হয়। আমাদের আলোচ্য পুস্তিকাগুলির দ্বিতীয় সংস্করণে যে ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে তাতে রামমোহন রায় বলছেন: "আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে মৎকৃত বেদের কতকাংশের অনুবাদ ও প্রতিমাপূজার সমর্থক ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে আমার বিতর্কের নিদর্শনগুলি পাওয়ার ইচ্ছা জানানোয় আমি নূতন করে প্রকাশ করবার জন্য

আমার কাগজপত্রের মধ্যে সেই গ্রন্থরাজির যে কয়টি ছিল ও যা কিছু আমার বন্ধুরা ঘটনাক্রমে ভারতবর্ষ থেকে এদেশে নিয়ে এসেছেন,—সেগুলি সংগ্রহ করেছি এবং বর্তমানে আদি অকৃত্রিম আকারে তা জনসাধারণের হাতে দিচ্ছি। আমি এখানে সংক্ষেপে এই রচনাগুলির সারমর্ম বিবৃত করতে প্রণোদিত হয়েছি —যাতে এর উদ্দেশ্য বোঝা সহজ হয়; কারণ সাধারণভাবে ইউরোপীয় পাঠকগণের কাছে এই বস্তু অপরিচিত। [আমরা পূর্বেই বলেছি এই সংগ্রহে রামমোহন রায় তাঁর কলিকাতা থেকে ১৮২০-২১ সালে প্রকাশিত ইংরেজ মিশনারীদের সঙ্গে বিতর্কবিষয়ক গ্রন্থগুলি পুনর্মুদ্রিত করেন নি।[৫৯]] বেদসমূহ —অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে বেদের ধর্মতত্ত্ববিষয়ক অধ্যায়গুলি,— সর্বত্র একবাক্যে বলেছে যে, আপন স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী মানুষ তার শ্রদ্ধার ও উপাসনার পাত্রগুলিকে সর্বদা মূর্ত রূপ দিতে চায়, এবং এইভাবে সে উক্ত বস্তুগুলির উপর এমন কতগুলি গুণ আরোপ করে যা উক্ত বস্তুনিচয় সম্পর্কে পোষিত ধারণার দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হতে পারে। এই প্রক্রিয়া থেকেই স্থূল বা সূক্ষ্ম আকারে পৌত্তলিক উপাসনার উদ্ভব—যা মানববুদ্ধিকে সত্যের পথ থেকে অলীক মরীচিকার দিকে আকর্ষণ করে। সেইজন্যই এই প্রামাণিক গ্রন্থগুলি (চতুর্বেদ) মানুষকে কোনও কাল্পনিক দেবতা সৃষ্টি করবার প্রবণতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপদেশ দিয়েছে; এবং মানুষকে আপন পারিপার্শ্বিকের অন্তর্গত বস্তুরাজিকে সমগ্রভাবে বা একক ভাবে অনুশীলন করতে অনুরোধ করেছে। এই বস্তুজগৎ মানবমনে আশ্চর্য ঐক্য, বিন্যাস, জ্ঞান ও শৃঙ্খলার ধারণা মুদ্রিত করে দেয়। এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাবে, বেদসমূহ কোনও সাধু ও নিরাসক্ত ব্যক্তির মনে এমন এক সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের ধারণা জন্মিয়ে দেয় যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপক এবং শাসনকর্তা ও যিনি বিশ্বের সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন। ঐ একই বেদগ্রন্থে আবার বিভিন্ন গ্রহ, প্রাকৃতিক বস্তু, বিমূর্ত মনোগত চিন্তার কাল্পনিক রূপাবলী ও দেবরূপে পূজিত বীরপুরুষগণকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানের বিবরণেরও অভাব নেই। এ সবের ব্যবস্থা অবশ্যই তাদের জন্য যাদের বোধশক্তি ক্ষীণ। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, সুখ ও কল্যাণলাভের অনন্য উপায়স্বরূপ বেদ আধ্যাত্মিক ঈশ্বরানুরাগ, জীব-হিতৈষণা ও প্রবৃত্তিদমন উপদেশ করেছেন।"

বেদের—এবং সর্বোপরি এর আধ্যাত্মিক শাস্ত্রভাগ উপনিষদের সংকলয়িতা ও সংগ্রহকর্তৃগণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করতেন ও সেই বিষয়টিই শিক্ষা দিয়েছেন—এতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই ; এবং একথাও স্বীকার্য, তাঁরা এই জ্ঞানময় পরাশক্তির এমন কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ কল্পনা করেন নি যা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রতীকরূপে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু বেদের কাব্যময় অংশে অন্যান্য প্রতীকের তুলনায় আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদি বা সৃষ্টির অন্যান্য উপাদান সম্পর্কিত ধর্মবিশ্বাসের স্পষ্ট প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। একথা অবশ্য সত্য যে, ভারতীয় সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ 'গায়ত্রী' নামক অপূর্ব স্তোত্রটি উক্ত কাব্যময় অংশেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে তার একটি আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া গেল :

'হে দীপ্তিমান পূষা, তোমারই জন্য এই নূতন ও উৎকৃষ্ট স্তুতি আমরা উচ্চারণ করিতেছি। আমি তোমার সমীপে সে প্রার্থনা করিতেছি সদয় হইয়া তাহা গ্রহণ কর। প্রণয়াসক্ত পুরুষ যেমন বাঞ্ছিতা স্ত্রীর অভিমুখে অগ্রসর হয় সেইরূপ তুমি তোমার অভিলাষকারিণী এই স্তুতির প্রতি আগমন কর। যে পূষা বিশ্বজগতে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট ও যিনি সকল সৃষ্ট বস্তু ও সমগ্র বিশ্বজগৎ বিশেষরূপে দর্শন করেন তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।

যিনি আমাদিগকে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন আমরা সেই তেজোময় বরণীয় সবিতার ধ্যান করি। তিনি আমাদের সকল চিন্তা ও ধ্যান তাঁহার অভিমুখে পরিচালিত করুন। জীবনে অন্নাভিলাষী হইয়া আমরা প্রভাময় সবিতার নিকট ধন যাচ্ঞা করি। মেধাবী অধ্বর্যুগণ যজ্ঞাহুতি দ্বারা ও সুন্দর স্তোত্র দ্বারা এই উজ্জ্বল সবিতাদেবকে পূজা করেন।'[৬০]

[রোজেন কর্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত ঋগ্বেদে প্রদত্ত মূল বচন (পৃঃ ১৩) থেকে এই অনুবাদ করা হয়েছে ;[৬১] রামমোহন রায় এই সুবিখ্যাত স্তোত্র বিষয়ক একটি পুস্তিকার অনুবাদ তাঁর গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন ; উইলিয়ম জোন্স ও কোলব্রুক উভয়েই মূল সংস্কৃত থেকে মন্ত্রটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু আমাদের একথা বলতেই হবে যে উইলিয়ম জোন্স ভাষ্যকারদের অনুসরণ করে মূল মন্ত্রটিকে যতখানি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সমন্বিত বলে ধরে নিয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে ততটা আধ্যাত্মিক গভীরতা নেই।

এই মন্ত্র বিশ্বজগতে প্রাণশক্তিসঞ্চারী ও পৃথিবীর উর্বরতাবৃদ্ধিকারী বাস্তব দৃশ্যমান সূর্যকেই নির্দেশ করছে মনে হয়।]

কিন্তু এই স্তোত্রটি– যেটিকে বেদের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ক অংশে ব্যক্ত সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার গীতিময় প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়,— সম্ভবত আমাদের এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে যে, বেদের উক্ত বিভাগে গ্রহনক্ষত্র ও সৃষ্টির স্থূল উপাদানসমূহকে কেন্দ্র করে বিকশিত ধর্মবিশ্বাসই সুপ্রাচীন কালে পারস্যের মত ভারতবর্ষেরও বৈশিষ্ট্য ছিল। তেমনি, ধরে নিতে হবে, বেদের ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক অংশে ঈশ্বরসম্পর্কীয় যে নব্য ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়— তা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা। প্রাচীনতর স্তরের সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেলা কোনও ক্রমেই উচিত নয়। দুঃখের বিষয় রামমোহন রায়ের মত তীক্ষ্ণধী মনীষীও— যিনি ইংরেজ মিশনারীদের অভিযোগ খণ্ডনে ও তাঁদের নিকট স্বদেশীয় শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন,— এই দুই যুগের, অর্থাৎ বেদবিবৃত এই আদিম ধর্মমত ও উত্তরকালীন গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি। ধর্মবিশ্বাসের এই স্তরানুক্রমিক অভিব্যক্তির মধ্যেই সভ্যতার বিবর্তনের সমগ্র সারমর্ম চুম্বকাকারে পাওয়া যাবে।[৬২]

আগেই বলা হয়েছে, বর্তমান সংগ্রহের প্রথম পুস্তকখানি অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সম্পর্কে বৈদিক সিদ্ধান্তের একটি সংক্ষিপ্তসার। রামমোহন রায়ের মতে এই সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের একত্ব স্থাপনা করা হয়েছে। আমরা বৈদিক সাহিত্যের বিকাশধারাকে বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ব্যবহারিক অংশ ও উপনিষদ্-ভিত্তিক অধ্যাত্মখণ্ড শীর্ষক যে দুই পর্বে ভাগ করেছি—এখানে তার সমর্থক একটি নূতন প্রমাণ মেলে। ঈশ্বরের একত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় যে সব শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করেছেন তার সবগুলিই বেদের উক্ত দ্বিতীয় অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই অংশ যে প্রথম স্তর অপেক্ষা পরবর্তী এর রচনারীতি ও এতে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি ও উৎকর্ষ এবং এই অংশে ব্যাখ্যাত তত্ত্বগুলির গভীরতাই তা প্রমাণ করছে।

(সংগ্রহের) দ্বিতীয় গ্রন্থ অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডক উপনিষদ্। চতুর্বেদের মধ্যে অথর্ববেদই সর্বাধিক পরবর্তী—কেননা মনুসংহিতায় এর উল্লেখ নেই ; এবং এই কারণে অন্য তিন বেদের বিষয়বস্তুর চেয়ে এর বিষয়বস্তুতে

আদিমতার ছাপ অল্প—যদিও হয়তো তার বৈচিত্র্য কম নয়।[৬৩] তৃতীয় গ্রন্থ হল সামবেদের অন্তর্ভুক্ত কেনোপনিষদের অনুবাদ যা আমরা এই 'রেভ্যু'তে ('রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্' সেপ্‌টেম্বর ১৮৩২, পৃঃ ৬৮০) 'Memoire sur l'origine et la propagation de la doctrine du Tao' অথবা লাও-ৎসিউ রচিত 'Raison' গ্রন্থের[৬৪] প্রকাশ ঘোষণা করবার পরেই সংস্কৃত, ফরাসী ও ফার্সী ভাষায় প্রকাশ করেছি। চতুর্থ গ্রন্থটি হচ্ছে যজুর্বেদের অন্তর্গত কঠোপনিষদের অনুবাদ; পঞ্চম সেই যজুর্বেদেরই অংশবিশেষ ঈশোপনিষদের অনুবাদ যেটিও 'রেভ্যু'তে প্রকাশিত পূর্বকথিত রচনার শেষে সংস্কৃত, ফার্সী ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সংগ্রহের ষষ্ঠ গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত পুস্তিকার অনুবাদ; এতে গায়ত্রীমন্ত্রের অনুবাদও দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে রামমোহন রায় হিন্দু স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্যের প্রামাণিক মতামত উদ্ধৃত করেছেন। তদনুযায়ী যে দেবতার উদ্দেশ্যে গায়ত্রী উচ্চারিত হয়েছে তিনি দৃশ্যমান সূর্যের অন্তরালে অবস্থিত অদৃশ্য পরব্রহ্ম। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে আরও অনেক ভাষ্যকারের মতামতও উদ্ধৃত হয়েছে।[৬৫]

আমাদের আলোচ্য এই বিচিত্র সংগ্রহগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সপ্তম পুস্তকটির বিষয়বস্তু—'মাদ্রাজ ক্যুরিয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত পৌত্তলিক উপাসনার কোনও সমর্থক কর্তৃক আক্রমণের বিরুদ্ধে রামমোহন রায় কৃত হিন্দু একেশ্বরবাদের সমর্থন।[৬৬] সংস্কৃত-বাঙ্‌লা-ইংরেজি ভাষায় (রামমোহন-কর্তৃক) পূর্বোক্ত ছয়খানি পুস্তক প্রকাশের ফলেই তাঁকে এই আক্রমণ করা হয়েছিল। এই আক্রমণাত্মক সমালোচনার মধ্যে, যা রামমোহন রায় খণ্ডন করবার উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করেছেন,—আমরা পরব্রহ্মের দ্বৈতভাবের অভাবসূচক এক বিচিত্র সংজ্ঞা পাই;—সেটি হল 'অদ্বৈত'। এই অদ্বৈতবাদ কার্যত একেশ্বরবাদ। এখানে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া গেল। দুঃখের বিষয় মূল শ্লোকগুলি আমাদের সামনে নেই:

"তিনি নিত্য, তিনি সর্বজ্যোতির মধ্যে পরম জ্যোতির্ময়।
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরমৈশ্বর্যবান।
তাঁর তুলনায় সূর্য-চন্দ্র-অগ্নির জ্যোতি ম্লান।

তুমি শ্রবণেন্দ্রিয় বিনা সব কিছু শ্রবণ কর ;
তুমি নাসারন্ধ্র বিনা সব কিছু আঘ্রাণ কর ;
তুমি পদদ্বয় বিনা চলমান ,
তুমি চক্ষু বিনা সর্বদ্রষ্টা ;
তুমি জিহ্বা বিনা সর্বরসাস্বাদী ;
তুমি জন্মরহিত, নামরূপ ও দেশকালের উর্ধ্বে।

যদিও তোমার এই স্বরূপ, তবু তুমি আকাশ ও পৃথিবীর অধীশ্বর।
যেমন জলের উপর সূর্যকিরণের অলীক প্রতিবিম্ব উজ্জ্বল মরীচিকারূপে
শোভমান, তেমনি হে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ সত্তা,
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিবিম্বরূপে তোমারই মধ্যে ঝলসিত।

তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত, জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর, তুমি স্বপ্রকাশ, তুমি উপাদান-বহির্ভূত।
দিবসের আবির্ভাবে রাত্রির অবসানের মত যখন জ্ঞানের উদ্ভাসে অজ্ঞানের বিলয় হয়,—তখন সূর্যের ন্যায় তোমার জ্যোতি সবকিছু দীপ্যমান করে।

তোমাতেই সর্বজীবের উৎপত্তি,
তোমাতেই সর্বজীবের স্থিতি,
জলরাশিতে বুদ্বুদের মত তোমাতেই সর্বজীবের বিলয়।"

রামমোহন রায়ের রচনাবলী ভারতবর্ষে যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এখানে সংক্ষেপে তার (স্বতন্ত্র) বিবরণ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এ পর্যন্ত যা বলেছি তার মর্মগ্রহণ করবার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট। সংগ্রহের শেষ তিনখানি পুস্তক 'সতীদাহ' বিষয়ক।[৬৭] এগুলি সম্ভবত এই সংগ্রহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা; কেন না বিধবাগণের সহমরণ ও অনুমরণ বিষয়ক বর্বর প্রথা সম্পর্কে ভারতের প্রাচীন ও নব্য সকল ধর্মশাস্ত্রকার ও আইন-ব্যবস্থাপকগণের বচন এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। যে বচনগুলি আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথা সমর্থন করে প্রবর্তক তার কোনটিই বাদ দেন নি; অপরপক্ষে যেগুলি এর বিরুদ্ধে যায়, অথবা আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধে যায়—অথবা শেষপর্যন্ত প্রথাটিকে বাধ্যতা-

মূলক সংজ্ঞা না দিয়ে (স্বেচ্ছামূলক বলে) সমর্থন করে ও অন্ততপক্ষে একে শাসনাত্মক বলে স্বীকার করে না,— নিষেধক তার কোনটিই উহ্য রাখেন নি। ভারতে কোন একটি বিতর্কিত বিষয়ের পক্ষ কি প্রণালীতে সমর্থন করা হত সে-সম্পর্কে বা ভারতের ব্যবহারশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যাঁরা সঠিক ধারণা করতে চান, এই বিচিত্র গ্রন্থগুলি তাঁদের অবশ্য পড়া উচিত। আমরা এই নিবন্ধের প্রথমেই যা বলেছি—তার নূতন প্রমাণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়ের হৃদয়ের মহত্ত্ব, বিরাট পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের অন্যান্য লক্ষণীয় শ্রেষ্ঠ গুণ-গুলির পরিচয়— এখানে পাওয়া যাবে। রামমোহন রায়ের দ্বৈত ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রাচ্যসত্তা ও তাঁর প্রতীচ্য সত্তাও এখানে প্রতিফলিত (On y verra une nouvelle preuve de ce que nous avons dit, en commancant cette notice, de l'espirit e´leve´, des vastes conaissances, des qualite´s supe´riures qui distinguent le brahmane Rammohun Roy. et de son double caracte`re d' *homme oriental* et d' *homme occidental*)। আমরা আলোচ্য গ্রন্থাবলীর শেষ পুস্তক Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindu Law of Inheritance থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি : ভারতীয় নারীজাতির অধিকার সম্পর্কে জানতে হলে গ্রন্থখানি খুবই উপযোগী। রামমোহন রায় বলছেন :

"প্রাচীন হিন্দুস্থানের সভ্যতা ও শাসকগণের স্বৈরাচারের ফলে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধোগতি সম্পর্কে জনসাধারণ যাতে ধারণা করতে পারেন তার জন্য আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি : নারীজাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে প্রাচীন (ভারতীয়) ধর্মশাস্ত্রকারগণের সযত্ন মনোযোগ ও নারীর উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত তাঁদের প্রদত্ত ব্যবস্থার ফলে নারীগণ স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করবার সুযোগ পেতেন; উক্ত বিধানগুলিকে যদি নব্য ও আমাদের সমকালীন ব্যবস্থাপকগণ নারীসমাজকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবনের সর্বসুখ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে যে সব উপায় অবলম্বন ও প্রতিষ্ঠা করেছেন তার সঙ্গে তুলনা করা যায়,— তাহলেই সেই পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

সমস্ত প্রাচীন স্মৃতিকারই একবাক্যে বলেছেন, পিতার মৃত্যুর পর (বিধবা) মাতা স্বীয় পুত্রের সঙ্গে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে সমান অংশ পাবে—যাতে তার

পক্ষে অবশিষ্ট জীবন সন্তানগণের থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে যাপন করা সম্ভব হয়। নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রবচনগুলি থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

যাজ্ঞবল্ক্য: পিতার মৃত্যুর পর পিতৃসম্পত্তিবিভাজনে মাতা পুত্রগণের সঙ্গে এক সমান অংশ পাবেন।"

কাত্যায়ন: পিতার মৃত্যু হলে মাতা পুত্রের সঙ্গে সম্পত্তির সমান অংশ পাবেন।"

নবীনগণের প্রসঙ্গে রামমোহন রায় দেখিয়েছেন—এই নব্য স্মৃতিকারগণ স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানবতী বিধবাদের কোনপ্রকার উত্তরাধিকারই স্বীকার করেন নি। তিনি লক্ষ্য করেছেন, যে সকল কারণে এই অনাথা বিধবাগণ স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে প্রণোদিত হন, নব্য স্মৃতিকারবর্গকৃত এই অবিচার তার অন্যতম। তিনি আরও অনুমান করেছেন, এর ফলে প্রচুর-সংখ্যায় বহুবিবাহ ঘটবার সুযোগ পায়। কিছু কিছু ব্রাহ্মণ—বিশেষত যাঁরা উচ্চবংশীয়,—দশ, কুড়ি এমন কি ত্রিশটি পর্যন্ত বিবাহ করেন—তা সে ধনলোভেই হোক বা আপন পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই হোক। এর পর রামমোহন রায় প্রমাণ করেছেন—এই বহুবিবাহপ্রথা প্রাচীন স্মৃতিব্যবস্থার বিরোধী।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুত্রগণ উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির যে অংশ পান কন্যারা তার এক-চতুর্থাংশের উত্তরাধিকারিণী। বর্তমানে পিতা, মাতা, পুত্রগণ—তাঁদের কন্যা বা ভগ্নীদের বিবাহ দিয়ে এককালীন কিছু পেয়ে থাকেন। (কেন না বিবাহে বরপক্ষ কন্যা ক্রয় করেন।) প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার মনু স্পষ্টত এই প্রথা নিষেধ করেছেন (৩।৫১; ৯।৯৮, ১০০)।[৬৮]

রামমোহন রায়ের অন্যান্য গ্রন্থ যা আমাদের জানা আছে ও যেগুলি আলোচ্য সংগ্রহে মুদ্রিত হয় নি, তা হল An Apology for the Pursuit of Final Beatitude independently of Brahmunical Observances (কলিকাতা ১৮২০) এবং The Prcecpts of Jesus··· extracted srom the Books of the New Testament ascribed to the four Evangelists with translations in to Sungscrit and Bengalee (কলিকাতা ১৮২০)।[৬৯] দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে বাইবেল শাস্ত্রভুক্ত (খ্রীষ্টের) নীতি-উপদেশগুলি মাত্র সংকলিত হয়েছে। আমরা

আলোচনার সুরুতেই বলেছি—এই কারণে গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ উঠেছিল। আমার ধারণা ম. তুকে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পারিতে বাইবেলের নৈতিকভাগ সংবলিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করায় তাঁকে যে ধরণের গালিগালাজ সহ্য করতে হয়েছিল—ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের প্রতিও প্রায় সেই জাতীয় কটুবাক্য বর্ষিত হয়েছিল। বাইবেলের বিতর্কিত ঐতিহাসিক অংশ স্বীয় গ্রন্থ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য তাঁকে অধার্মিক, দেবপূজক, ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন: "·· বিশেষ করে তিনি সেই সব অলৌকিক কাহিনী বাদ দিয়েছেন—যা এসিয়াবাসীদের মধ্যে প্রচলিত অনুরূপ গল্পকথা অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে কল্পনারঞ্জিত—যে কারণে উভয়ের মধ্যে তুলনা চলতে পারে না। অপর পক্ষে (বাইবেলোক্ত) নীতি-দেশনাগুলির প্রবণতা সর্বমানবের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষা করার উপর; এগুলি তত্ত্বগত জটিলতা থেকে মুক্ত এবং পণ্ডিত ও অজ্ঞ সাধারণ মানুষ-উভয় শ্রেণীর বোধ্য। যে পরমেশ্বর জাতি-শ্রেণী-বিত্ত নির্বিশেষে সর্বপ্রাণীর প্রতি পরিবর্তন, নিরাশা, দুঃখবেদনা ও মৃত্যুর বিধান করেছেন এবং প্রকৃতির উপর বর্ষিত তাঁর অজস্র কৃপার অংশভাক্ হবার সুযোগ সকলকে দিয়েছেন—তাঁর সম্পর্কে আধ্যাত্মিকতা ও নীতির এই সরল সূত্রগুলি অপূর্বভাবে উচ্চ ও উদার ধারণা জন্মিয়ে দেয়। এগুলি মানবজাতিকে তার আচরণ সংযত করতে ও মানুষকে নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্তব্যপালন করতে শেখায়। এই সব কারণে বর্তমান আকারে এই উপদেশাবলী প্রকাশ করে শ্রেষ্ঠ ফললাভের আশা পোষণ করছি।"

The Precepts of Jesus গ্রন্থের ভূমিকার এই সুন্দর উক্তিগুলি এতই উন্নতভাব প্রসূত যে তা সংকীর্ণমনা প্রটেস্টান্ট-সম্প্রদায়ভুক্ত ইংরেজ মিশনারীদের ধারণার অগম্য ছিল। সুতরাং জনৈক 'খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক' 'ফ্রেণ্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার পৃষ্ঠায় রামমোহন রায়কে আক্রমণ করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, খ্রীষ্ট-ধর্মতত্ত্বকে বাদ দিয়ে—কেবলমাত্র নীতি-উপদেশগুলি মানুষকে মুক্তি দেবার পক্ষে যথেষ্ট,—(রামমোহন রায়ের) এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; তিনি আরও বলেন,—উক্ত ব্রাহ্মণ বাইবেলের নৈতিক সিদ্ধান্তগুলিকে এর ঐতিহাসিক ভাগ ও তত্ত্বাংশের উপরে স্থান দিয়ে ভুল করেছেন; এই জাতীয় তাঁর আরও যুক্তি ছিল। এই আক্রমণের উত্তর দেবার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় The

Precepts of Jesus গ্রন্থের পক্ষ সমর্থন করে ১৮২০ ও ১৮২১ সালে কলিকাতা থেকে খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রতি দুটি 'আবেদন' প্রকাশ করেন। এর মধ্যে দ্বিতীয়খানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা সমন্বিত এক অতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি এখানে দেখিয়েছেন খ্রীষ্টশিষ্যগণ (প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের) ত্রীশ্বরতত্ত্ব কোথাও উপদেশ করেন নি। নিসের ধর্মসংগীতিতে কেন ত্রীশ্বরবাদীরা প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন সে বিষয়টি তিনি যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে বলেছেন এবং (প্রসঙ্গত খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস সংক্রান্ত) আরও অনেক বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই বিচারগ্রন্থগুলিতে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায়—একজন ব্রাহ্মণ এক খ্রীষ্টানকে শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দিচ্ছেন—যদিও এটি উক্ত গ্রন্থের আশ্চর্যতম বিশেষত্ব নয় (Dans cette polémique, on a le spectacle d'un brahmane qui enseigne, par les textes, la religion chrétienne à un Chrétien, cequi n'est pas encore le plus curieux de l'ouvrage),

আমরা এখানেই আমাদের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ শেষ করছি এবং আশা করছি আমাদের পাঠকবর্গের কাছে এটি নিশ্চয় প্রীতিপ্রদ হবে। এমন আশা করবার বিশেষ কারণ এই যে, যে ভারতীয় মনীষীকে তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে আমরা পারিতে বসে তাঁদের নিকট পরিচিত করবার চেষ্টা করেছি অল্প কিছুদিন আগে তিনি সেই পারিতেই ছিলেন; এবং তিনি সংকল্প করেছেন আমাদের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করবার মত ও আমাদের মধ্যে ভ্রমণ করে (আমাদের সংসর্গে) লাভবান হবার মত যথেষ্ট ফরাসী ভাষাজ্ঞান অর্জন করেই আবার এখানে ফিরে আসবেন।[৮] এই পুনরাগমনের উদ্দেশ্য তাঁর বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করা ও ফরাসী জাতি সম্পর্কে বিদেশীয়গণের মধ্যে যে শ্রদ্ধা সর্বজনীন, তাঁর অন্তরের সেই শ্রদ্ধা স্বদেশে বহন করে নিয়ে যাওয়া। (এই আলোচনা-প্রসঙ্গে) তাঁর চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও রচনাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে যদি কোনও ন্যূনতা না ঘটে থাকে তাহলেই আমরা সুখী হব; কেন না প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রথম যোগসূত্ররূপে সে চরিত্রে ও কীর্তিতে উচ্চ মনীষা এবং মানবপ্রগতি ও মানব কল্যাণসাধনে যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে, আমরা আন্তরিকভাবে তার অনুরাগী।

জি. পথিয়ে

ক্রোণিক, রেলিজিউজ্‌ (১৮১৯ ', 'জুর্নাল আসিয়াতিক' (১৮২৩) এবং 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্‌' (১৮৩২)-এর পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত ফরাসী বিদ্বন্মণ্ডলীর সঙ্গে রামমোহনের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের যে বিবরণ এতক্ষণ দেওয়া গেল তা ভিন্ন আর একজন সমসাময়িক ফরাসী পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কিছু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। ইনি হলেন ইসলাম-বিশেষজ্ঞ এবং ফরাসী ভাষায় হিন্দী ও হিন্দুস্তানী (উর্দু) সাহিত্যের সুবিখ্যাত ইতিহাস লেখক গার্স্যাঁ দ্য তাসী (১৭৯৪-১৮৭৮)। রামমোহনের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে সম্ভবত দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর যোগ ছিল। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। রামমোহন স্বয়ং ইসলামীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং হিন্দী ও হিন্দুস্তানী বা উর্দু ভাষাদ্বয়ে রামমোহনের অধিকার নিজ মাতৃভাষার তুল্য। এক্ষেত্রে বিদগ্ধ ও মার্জিত মনের স্বাভাবিক কৌতূহলবশত তিনি দ্য তাসী এবং তাঁর ইসলাম-গবেষণা ও হিন্দী-উর্দু সাহিত্যালোচনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। ইংলণ্ডে পৌঁছাবার প্রায় চার মাস পরেই রামমোহন দ্য তাসীকে এক পত্র লিখে শীঘ্র ফ্রান্সে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁর এই ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়নি। প্রায় দেড় বৎসর পরে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তাঁর পক্ষে অল্পকালের জন্য ফ্রান্স পরিদর্শন সম্ভব হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যেই (১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর ?) দ্য তাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। দ্য তাসী স্বয়ং তাঁর হিন্দী ও হিন্দুস্তানী সাহিত্যের সুবিখ্যাত ইতিহাসে এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছেন ও রামমোহনের কিছু পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করেছেন।[৭১] এই বিবরণটি সংক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। তবে দ্য তাসী দীর্ঘকাল চিঠিপত্রের মাধ্যমে রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং রামমোহনের ফ্রান্স-পরিদর্শনকালে দুইজনের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগও ঘটেছিল। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে বিবৃত রামমোহনের সংক্ষিপ্ত জীবনীর ভূমিকা-স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, রামমোহনের পারি-প্রবাসকালে তিনি বহুবার তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তাঁর নিকট হতে ইংরেজিতে ও হিন্দুস্তানীতে লিখিত অনেক পত্র পেয়েছেন (Voici une courte esquisse de la vie de cet homme remarquable, que j'ai en l'avantage de voir souvent pendant son séjour a Paris et dont j'ai récu plusieurs lettres en hindoustanie et en anglais)।[৭২] সেই

কারণেই রামমোহনের জীবনীপ্রসঙ্গে দ্য তাসীর কয়েকটি উক্তি কৌতূহলোদ্দীপক মনে হতে পারে। রামমোহনের তিব্বতগমন সম্পর্কে তিনি বলেন: বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মবিষয়ক সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে তিনি তিব্বত গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দুই-তিন বৎসর বাস করেন। কিন্তু তাদের অস্পষ্ট ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদসমূহ তাঁর পক্ষে কোনও আকর্ষণের বস্তু হয়নি' (Il alla dans le Tibet, pour voir s'il trouverait la verité chez les bouddhistes. Il y resta deux ou trois ans. Mais leurs doctrines obscures n'eurent aucun attrait pour lui)।[৭৩] রামমোহনের সার্বভৌম ধর্মসম্পর্কে দ্য তাসীর যা ধারণা হয়েছিল তা এই: 'এই সংস্কৃত মত হল এক প্রকার সমন্বয়মূলক ধর্মবিশ্বাস; এর দুটি মূলতত্ত্ব—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরলোকে বিশ্বাস। এই তত্ত্বদ্বয়ের ভিত্তিতে যাঁরাই ধর্মোপদেশ দিয়েছেন—যেমন মুষা, যীশুখ্রীষ্ট, ব্যাস ও মহম্মদ, তাঁদের সকলকেই এই ধর্ম সমান শ্রদ্ধার পাত্র বিবেচনা করে; এবং যে গ্রন্থসমূহে এই সকল তত্ত্ব উপদিষ্ট হয়েছে—যেমন পেণ্টাটিউক (বাইবেলের ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট্ অংশে প্রথম পাঁচটি গ্রন্থে বিবৃত মুষার উপদেশ), বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট্ অংশে প্রদত্ত যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ, বেদ ও কোরাণ, সেগুলিকেও এই মত উপাদেয় ও সম্মানার্হ মনে করে থাকে। একে কোনও ক্রমেই নূতন ধর্ম বলা যায় না। এই ধর্ম প্রাচ্য জগতের সূফী নামে পরিচিত অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের মতবাদের সঙ্গে অভিন্ন' (Cette réforme consistait en une sorte de religion éclectique, dont les principes fondamentaux etaient la croyance en Dieu et en la vie future. On y considérait comme egalement respectables tous ceux qui avaient propagé des doctrines religieuses fondées sur ces principes, Moise et Jésus-Christ, Vyasa et Mahomet; et comme egalement bons les livres ou étaient deposées ces doctrines, la Pentateuque, l'Evangile, le Védas, le Coran. Cette doctrine n'est point nouvelle: c'est celle des philosophes religieux de l'Orient nommés *sofis*)।[৭৪] লক্ষ্য করবার বিষয় দ্য তাসী

রামমোহনের সমকালীন ইংরেজ বন্ধু ও অনুরাগীদের মত তাঁকে খ্রীষ্টান প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে রামমোহনের ধর্মমতের অসাম্প্রদায়িকত্ব ও সার্বভৌমত্ব নির্ভুলভাবেই ধরা পড়েছিল। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি যে রামমোহনকে সূফী মরমীদের গোত্রভুক্ত করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। মুসলমান সূফীসাধক সম্প্রদায়ের প্রতি রামমোহনের অকৃত্রিম অনুরাগ ও ফার্সী সূফীসাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সুবিদিত। দ্য তাসী স্বয়ং ছিলেন মুসলিম সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। স্বভাবত রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদের এই দিকটি তাঁকে আকৃষ্ট করে ছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের মৃত্যুর উল্লেখ করে দ্য তাসী সংবাদ দিয়েছেন, এর পর বৎসর তুর্কী, রাশিয়া ও পারস্যের মধ্য দিয়ে তাঁর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা ছিল (Son intention etait de retourner dans l' Inde, l'anee suivante en passant par le Turquie, la Russie et la Perse)।[১৫] ইসলামের সঙ্গে সুগভীর পরিচয়সম্পন্ন রামমোহন যে প্রত্যাবর্তনের পথে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার অভিলাষী হবেন তা স্বাভাবিক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইংলণ্ডে উপনীত হবার অল্পকাল পরেই রামমোহন দ্য তাসীকে এক পত্র লিখেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে দ্য তাসী এই পত্রখানি রক্ষা করেছেন। তাঁর *Appendice aux Rudimens de la langue Hindoustanie* শীর্ষক গ্রন্থে রামমোহন কর্তৃক তাঁকে বিদগ্ধ ও মার্জিত উর্দুতে লিখিত উক্ত পত্রখানি ফরাসী অনুবাদসহ মুদ্রিত হয়েছে। বাঙলা মর্মানুবাদসহ সেটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল :[১৬]

মূল

জনাব ফাজিলাৎ মাআআব জেয়াদা মজদুহুম্ ওয়া শর্ফাহুম্ —

রোকায়ে মুবারক পঁহুছা, বান্দাকো মস্রুর্ ওয়া মওজ্জাজ্ কিয়া। কাদের আলালইৎলাক্ আপকো ইস ইয়াদ আওয়ারিকে সাথ সলামত রক্‌খে। তিন মাহিনেস জেয়াদা বান্দা ইংলণ্ডমে মক্‌কিম্ হৈ। ইন্‌সা আল্লাহ্‌তালা আন করিব পারিস মে মুশ্‌শারফ্ এ খেদ্‌মত হোগা ঔর আপকি তবজ্জোহ্‌সে জনাব শেজি সাহাব কি সাথ মুলাক্কাৎ হাসিল করেগা। আপকে ওয়াদায়

মুরাআৎ সে বান্দায়ে কম্‌তর মম্‌নূন হুয়া। ওয় আদায়ে শুক্‌র্ তহে দিলসে করতা হৈ।

জেয়াদা হদ্দে আদাব

খাদেমেকুম্ ওয়া মম্‌নূনকুম্

রামমোহন

হুরেরা ফি তারিখ্

ইয়াকুম্ আগষ্ট ১৮৩১

আইন, ইশভি

জনাব শফকৎ ফরমায়ি গেরামি কদর-এ ফর্‌বস সাহাবকি হাওয়ালা কিয়া গিয়া।

অনুবাদ

সুবিজ্ঞ মহাশয় (যেন তাঁর সুনাম ও যশোরাশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় !)

আপনার শুভপত্র পঁহুছিয়াছে এবং উহা আপনার ভৃত্যকে আনন্দে ও সম্মানে পূর্ণ করিয়াছে। প্রার্থনা করিতেছি যেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই অনুগ্রহপূর্ণ অভিজ্ঞানের নিমিত্ত আপনাকে সুস্বাস্থ্যে রক্ষা করেন। তিন মাসের অধিক হইল আপনার ভৃত্য ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছে। যদি পরমেশ্বর ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সে শীঘ্রই পারিসে উপস্থিত হইয়া আপনাকে অভিবাদন করিবার সম্মান লাভ করিবে ও আপনার মাধ্যমে শ্রীযুক্ত শেজি মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করিবে। আপনি তাহার তত্ত্ব লইবার যে প্রতিশ্রুতি তাহাকে দিয়াছেন তজ্জন্য আপনার দীন ভৃত্য গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছে ও অন্তর হইতে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে। পত্র দীর্ঘতর করিলে শিষ্টাচারের সীমা লংঘিত হইবে।

আপনার কৃতজ্ঞ ভৃত্য

রামমোহন

লিখিত ১ আগষ্ট
১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ

পুঃ এই পত্র সুমহান মাননীয় ফর্ব্‌স সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইল।

১ আগষ্ট, ১৮৩১ লিখিত এই পত্রে একটি সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। রামমোহন

যথাশীঘ্র ফ্রান্সে উপনীত হয়ে দ্য তাসীর মধ্যস্থতায় মঃ শেজির সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক ছিলেন। ইনি সমকালীন সুবিখ্যাত ফরাসী মনীষী আঁতোয়ান লেওনার দ্য শেজি। ইউরোপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইনি অন্যতম পথিকৃৎ এবং কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের সংস্করণ ও ফরাসী অনুবাদ এবং 'অমরুশতক' ও রামায়ণের 'যজ্ঞদত্তবধ' অংশের ফরাসী অনুবাদ এঁর সুপ্রসিদ্ধ কীর্তি। ফ্রান্সের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (Collège Royal de France) এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রথম অধ্যাপকরূপে কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।[৭৭] দ্য শেজির প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে স্বভাবত রামমোহন তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের জন্য উৎসুক হয়েছিলেন। তবে এ বিষয়ে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল কি না জানা যায় না। কেননা ফ্রান্সে যাবার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে অল্পদিনের জন্য। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে দ্য শেজিরও মৃত্যু হয়। পত্রের পুনশ্চ অংশটুকু থেকে আমরা জানতে পারি এইখানি দ্য তাসীর কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষা বিশারদ এবং উত্তরকালে লণ্ডনের কিংস কলেজে প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক ডান্‌কান ফর্ব্‌স (১৭৯৮-১৮৬৮)। ইনি জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে রামমোহনের সমানধর্মা বন্ধু ছিলেন।

সমকালীন অপর যে ফরাসী মনীষীর সঙ্গে রামমোহনের ভারতবর্ষে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও পর্যটক ভিকতর ঝাকমঁ। ইনি ভারত-পর্যটনের আসবার পূর্বেই স্বদেশ ফ্রান্সে রামমোহনের মনীষা ও কীর্তি সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা রামমোহনের খ্যাতি তখন ফরাসী দেশে সুপ্রতিষ্টিত; ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্'-এর সম্মানিত বিদেশী সদস্য মনোনীত হয়েছেন। ঝাকমঁ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি তাঁর প্রকাশিত ভারতভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৭৮] প্রসঙ্গত তিনি এই গ্রন্থে রামমোহন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা এই: 'রামমোহন রায় একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ; হিন্দু পণ্ডিত ও ইউরোপীয় মিশনারীদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত তাঁর ধর্মবিষয়ক বিতর্কমূলক গ্রন্থগুলির মাধ্যমে তাঁর নাম ফ্রান্সে পর্যন্ত পরিচিত। ভারত-আগমনের পূর্বে আমি জানতাম তিনি একজন সুনিপুণ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ

সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন নৈয়ায়িক ও অপরাজেয় তার্কিক; কিন্তু তিনি যে মানুষ হিসাবেও শ্রেষ্ঠ তা আমি পূর্বে খেয়াল করিনি' (Rammohan Roy est le brahme savant dont les ouvrages de pole´mique religieuse contre les docteurs hindous et les missionaires europe´ens ont fait connaitre le nom jusqu'en France. Je savais avant de venir dans l' Inde qu'il etait un orientaliste habile, un subtil logicien un dialecticien irresistable; mais j'ignorais qu'il etait le meilleur des hommes)।[৭৯] রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর ঝাকৃমঁ বুঝতে পারেন তিনি কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যে ও মনীষায় অগ্রগণ্য নন, মানুষ হিসাবেও শ্রেষ্ঠ। এই শ্রদ্ধার প্রকাশ তাঁর স্মৃতিচারণে আছে।

ভারতবর্ষের বাইরে রামমোহনের খ্যাতির বিষয় আলোচনা করতে গেলে স্বভাবত আমাদের ইংলণ্ডের কথা বেশী মনে পড়ে। সেখানে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কেননা তাঁর প্রতিভা ও কীর্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ইংরেজদের প্রথম থেকেই অনেক অধিক পরিমাণে ছিল। কিন্তু সমকালীন ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং তদানীন্তন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও যে তাঁর খ্যাতি প্রসারলাভ করেছিল সে সংবাদ আমাদের তেমন জানা নেই। ফরাসী বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন মুখ্যত 'পণ্ডিত' ও ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকাররূপে। গ্রেগোয়ার, লঁ্যাজুয়ানে, পথিয়ে, প্রভৃতির রচনাগুলিই তার প্রমাণ। বেদান্তবিষয়ক তাঁর Abridgment of the Vedant পুস্তকের জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনা থেকে;[৮০] এবং বেদান্তসমেত তাঁর কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থের ওলন্দাজ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কাম্পেন থেকে।[৮১] এগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গ্রন্থদুখানি ইউরোপখণ্ডে ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা ও দর্শনের প্রকৃত পরিচয়বাহী রূপে গৃহীত হয়েছিল।[৮২] সমকালীন জার্মান ও ওলন্দাজ পত্র-পত্রিকাতে এই গ্রন্থগুলির কোনও সমালোচনা ও প্রসঙ্গত রামমোহন সম্পর্কে কোনও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা এ পর্যন্ত সে বিষয়ে অনুসন্ধান সামান্যই হয়েছে। আমেরিকার ক্ষেত্রে শ্রীমতী আড্রিয়েন মূর অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে রামমোহন-সংক্রান্ত এই

জাতীয় বহু মূল্যবান সমকালীন তথ্য আবিষ্কার করেছেন ও তাঁর গবেষণার ফল *Rammohnn Roy and America* শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশ করে রামমোহন-গবেষকগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কেবল ইংলণ্ডে নয়, ইউরোপের অন্যত্রও বেদান্তদর্শন ও ভারতীয় জীবনচর্যার প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে একটি সশ্রদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। এ যাবৎ যে আলোচনা করা হয়েছে তার থেকে অন্তত এইটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এই ক্রমবর্ধমান সশ্রদ্ধ ভারত-জিজ্ঞাসার উন্মেষের ইতিহাসে রামমোহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ বিষয়ে বিস্তীর্ণতর আলোচনা আবশ্যক। আপাতত আমরা এই কথা ভেবে নিশ্চয় তৃপ্তিলাভ করতে পারি, আধুনিক যুগে বিপ্লবী আদর্শের জন্মদাতারূপে যে ফরাসীদেশের প্রতি রামমোহন আজীবন গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এসেছিলেন, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সেই দেশ তাঁকে দিয়েছিল প্রকাশ্য সম্মানের অর্ঘ্য। শ্রদ্ধার বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন শ্রদ্ধা, অনুরাগের বিনিময়ে অনুরাগ। এ গৌরব যেমন রামমোহনের তেমনি ফ্রান্সেরও।

প্রমাণ পঞ্জী :

১. Collet pp. 842-43 ; Carpenter—*Last Days* pp. 125-26.

২. *India and the World* December, 1933, pp, 328-29 ; *The Father of Modern India : Commemoration Volume of the Rammohun Roy Centenary Celebrations, 1933*, Calcutta, 1935, Part II pp, 363-71 ; প্রথম প্রবন্ধটি দ্বিতীয় গ্রন্থেও মুদ্রিত হয়েছে।

৩. *Last Days* p. 224.

৪. *Chronique Religieuse* Vol III (1819) pp. 388-403.

৫. *Last Days* pp. 49-54.

৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র ১৩৮৭) পৃ: ২০-৪১

৭. *Periodical Accounts relative to the Baptist Missonary Society* Vol VI (From June 1815 to January 1816) Bristol 1817, pp. 106-07.

৮. *The Third Report of the School Book Society's Proceedings* ; *Third Year 1819-20* Baptist Mission Press. Calcutta 1820-21, pp. 7-8.

৯. 'Second Appeal' *English Works* Pt. VI, pp. 89-90

১০. 'Rammohun Roy as an Educational Pioneer' *Journal of the Bihar and Orissa Research Society* Vol XVI. Pt. II pp. 154-57.

১১. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৮৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ: ২১

১২. Adrienne Moore *Rammohun Roy and America* Calcutta, 1942, pp. 121-22.

১৩ *Journal Asiatique* I Ser. Tome III (Paris, 1823), pp. 117-19.

১৪. ফরাসী বিজ্ঞাপনে প্রকাশের স্থান ও বৎসর দেওয়া আছে, কলিকাতা, ১৮১৭ ; কিন্তু এই ইংরেজি গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের স্থান এবং কাল প্রকৃতপক্ষে, কলিকাতা, ১৮১৬। অবশ্য রামমোহনের *Abridgement of the Vedant* ও *Cena Upanishad* গ্রন্থদ্বয় তাঁর প্রাক্তন মনিব ও অনুরাগী বন্ধু জন্ ডিগবী কর্তৃক ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে একত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক'-এর তালিকাকার সম্ভবত কলিকাতা ও লণ্ডন সংস্করণদ্বয়ের পৃথক প্রকাশকাল একত্র মিশিয়ে ফেলে ভুল করেছেন। অথবা এটি মুদ্রাকরপ্রমাদও হতে পারে। লক্ষ্য করবার বিষয় উল্লিখিত লণ্ডন সংস্করণটি ষষ্ঠ-সংখ্যক গ্রন্থরূপে বর্তমান তালিকাব অন্তর্ভুক্ত।

১৫. *Rammohun Roy and America* Calcutta, 1942, p. 180 ; *Journal Asiatique* I Ser. Tome III (Paris, 1823) 'Observations sur quelques ouvrages de Rammohun Roy' pp. 243-49.

১৬. দ্রষ্টব্য, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'তত্ত্বকৌমুদী', ৭৭ ভাগ, নবম সংখ্যা, 'পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় রামমোহনের প্রভাব' পৃ: ৭০-৭৩

১৭. *Journal Asiatique* I Ser, Tome III (Paris, 1823) p. 58.

১৮. *English Works* Part V p 58

১৯. রামমোহন রায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত যে পাঁচখানি উপনিষদের সংস্করণ প্রচলিত আছে সেগুলির মধ্যে কেনোপনিষদ্ সামবেদীয় এবং ঈশোপনিষদ্ ও কঠোপনিষদ্ যজুর্বেদীয়। সুতরাং সম্ভবত এখানে কেনোপনিষদ্ এবং দুখানি যজুর্বেদীয় উপনিষদের মধ্যে কোনও একখানির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকাশের যে তারিখ পাওয়া যাচ্ছে (কলিকাতা, ১৮১৮) তা উক্ত গ্রন্থগুলির জানিত প্রকাশকালের সঙ্গে মেলে না। কেনোপনিষদ্ ১৮১৬, ঈশোপনিষদ্ ১৮১৬ এবং কঠোপনিষদ্ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থ ইংরেজিতে না হওয়ায় নাম ফরাসী ভাষায় দেওয়া হয়েছে।

২০. *Translation of the Abridgment of the Vedant* শীর্ষক গ্রন্থটির কলিকাতা সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮১৬ এবং লণ্ডন সংস্করণের (কেনোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের সহিত একত্র) প্রকাশকাল ১৮১৭; গ্রন্থতালিকায় প্রদত্ত বৎসরটি ঠিক নয়।

২১. Kalika Ranjan Quanungo *Dara Shukoh* Vol I (Second Ed. Calcutta 1952) pp. 108-12.

২১ক. গ্রন্থখানির পূর্ণ শিরোনাম হল *Oupanek'hat i. e. secretum tegendum, opus ipsa in India rarissimum continens antiquam et arcanam s. theologicam et philosophicam doctrinam e equatuor sacris Indorum libris, Rak Beid, Djedir Beid, Sam Beid, Atharban Beid excerptam: ad verbum e persico idiomate, Sanscretitses vocabulis intermixto in latinum conversum...studio et opera* Anquetil Duprrron...2 vol. ; ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের এক আংশিক জার্মান অনুবাদ নুর্নবের্গ থেকে প্রকাশিত হয়।

২২. Winternitz *A History of Indian Literature* (English Translation) Vol. I (Calcutra, 1927) p. 20.

২৩. 'প্রচ্ছন্ন' বা 'আচ্ছাদিত' সংস্কৃত 'ঈশ'-এর প্রতিশব্দ নয়; এই উপনিষদের প্রথম শ্লোকের দুটি শব্দ 'ঈশাবাস্যম্'; দ্বিতীয় 'বাস্য' শব্দটির অর্থ 'আচ্ছাদনীয়'। একত্র শব্দদ্বয়ের অর্থ 'ঈশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদনীয়'। গ্রন্থখানিকে অনেক সময় 'ঈশাবাস্যোপনিষৎ' নামেও উল্লেখ করা হয়।

২৪. আঁক্যতিল্ দ্যু পেরোঁ কৃত উপনিষদের লাটিন অনুবাদের নাম।

২৪ক *The Works of Sir William Jones* Vol, VI (London, 1799) pp. 423-25; মূল প্রবন্ধে পত্রাঙ্কটি ছাপার ভুলে '৪৩৩' হয়েছে।

২৫. উক্তিটি ঠিক নয়; দুটি অনুবাদের দৈর্ঘ্য সমান। 'ঈশোপনিষৎ' গ্রন্থখানিই ক্ষুদ্র, মাত্র আঠারোটি শ্লোকের সমষ্টি; প্রবন্ধকার সম্ভবত মূল গ্রন্থ দেখেন নি।

২৬. দারা শুকোহ্ প্রধানত মুসলমান পাঠকগণের জন্যই তাঁর অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তাই হিন্দু চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়হীন মুসলমানগণের সুবিধার জন্য মুসলমান

ধর্মশাস্ত্রের পরিভাষা তাঁকে কিছু কিছু ব্যবহার করতে হয়েছিল। দ্রষ্টব্য Quanungo *Dara Shukoh* Vol 1 p. 111.

২৭. কেন না সেগুলি যে মূল গ্রন্থের অংশ নয় তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

২৮. এই উক্তির মর্ম বুঝতে পারা কঠিন, কেন না 'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্'-এ প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকার অন্তর্ভুক্ত 'কঠোপনিষদ্'-এর ইংরেজি অনুবাদ-প্রসঙ্গে গ্রন্থপ্রকাশের স্থান ও কাল (Calcutta, 1819) উল্লিখিত হয়েছে। প্রবন্ধকার ব্যবহৃত গ্রন্থখানিতে কি আখ্যাপত্র ছিল না?

২৯. ফার্সী অনুবাদে হয়তো লিপিকর-প্রমাদ হেতু 'কঠ' শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটে দাঁড়িয়েছে 'কিউ'ন'। ফার্সী লিপির অনুলিখনে এই জাতীয় প্রমাদ নূতন বা বিচিত্র নয়।

৩০. কৃষ্ণ যজুর্বেদের একটি শাখার নাম 'কঠ'। প্রবন্ধকার সম্ভবত একথা জানতেন না।

৩১. রামমোহন রায়ের উক্তিই নির্ভুল। 'কঠোপনিষদ' যজুর্বেদীয়। (দ্রষ্টব্য উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৩৬, পৃ: ‖৵০)

৩২. রামমোহন মূলের সম্পূর্ণ অনুবাদই করেছেন, গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন নি। প্রবন্ধকারের এই উক্তি থেকে মনে হয় মূল গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না।

৩৩. 'কেন' শব্দের ব্যাখ্যায় লেখক ভুল করেছেন। 'কেনোপনিষদ্'-এর প্রথম শ্লোকের আরম্ভ এইরূপ: 'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ'। এখানে 'কেন' শব্দের অর্থ 'কাঁহার দ্বারা'। প্রথম শ্লোকের প্রথম তিনটি চরণ ঐ একই সর্বনাম দ্বারা আরম্ভ হয়েছে বলেই আলোচ্য 'উপনিষদ' খানির নাম 'কেনোপনিষৎ'। এর অপর নাম 'তলবকারোপনিষৎ।'

৩৪. রামমোহনের উক্তিই নির্ভুল। দ্রষ্টব্য, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৯

৩৫. বইটির আখ্যাপত্রে রামমোহন যে বানান ব্যবহার করেছেন, তা 'Moonduk'; বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে গ্রন্থমধ্যে অবলম্বিত বানান Mundaka। আখ্যাপত্রে প্রদত্ত 'Moonduk' বা 'মুণ্ডাক' বানানের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের কোনও সম্পর্ক নেই। এই যুগে সংস্কৃত বানানের রোমান হরফে লিপ্যন্তরের কোনও সর্বস্বীকৃত আন্তর্জাতিক বিধি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেই জন্য রোমান বর্ণমালায় এই জাতীয় বানানের নানা রকমফের দৃষ্ট হয়। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ক্রমশ আরও অগ্রসর হলে পরবর্তী কালে এই লিপ্যন্তর-প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

৩৬. 'মুণ্ডক' শব্দের এই অর্থ ঠিক নয়। এর অর্থ 'যে বা যা মুণ্ডন করে।' 'যেমন ক্ষুর নিঃশেষরূপে কেশছেদন করে, তেমনি এই উপনিষদ্ নিঃশেষরূপে অবিদ্যা দূর করে, এই অর্থে ইহার নাম মুণ্ডক।' (তত্ত্বভূষণ, উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ: ৸৵০)।

৩৭. মূল বেদ-এ পৌত্তলিকতার উপদেশ নেই। লেখক সম্ভবত তা জানতেন না।

৩৮. প্রবন্ধকার vue ও miroir শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন; 'দর্শন'-এর প্রতিশব্দ

হিসাবে শব্দটির খুব সন্তোষজনক নয়। সংস্কৃত 'দর্শন' শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভাষায়: "The term 'darśana' comes from the word *drś*, to see. This seeing may be either perceptual observation or conceptual knowledge or intuitional experience. It may be inspection of fact, logical inquiry or insight of soul···Perhaps the word is advisedly used to indicate a thought system acquired by intuitive experience and sustained by logical argument." *Indian Philosophy* Vol I, London, 1940, p. 43.

৩৯. প্রবন্ধকার ছয়টি দর্শনকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন: (ক) সাংখ্য-যোগ; (খ) ন্যায়-বৈশেষিক, (গ) মীমাংসা-বেদান্ত।

৪০. 'মীমাংসা' শব্দের এই অর্থ ঠিক নয়; এর প্রকৃত অর্থ 'যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত'। দ্রষ্টব্য S. N. Dasgupta *A History of Indian Philosophy* Vol. I, Cambridge, 1932, p. 68.

৪১. বর্তমান কালের কোনও কোনও পণ্ডিত পূর্বমীমাংসাকে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত অপেক্ষা প্রাচীনতর মনে করেন বটে কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত উভয় দর্শনের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবন্ধকারের মত তাঁরা 'পূর্বমীমাংসা' নাম থেকে এই দর্শনের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব অনুমান করেন না। তাঁদের মতানুসারে কেবলমাত্র নাম হতে প্রাচীনত্ব সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত করা চলে না; দ্রষ্টব্য A. B. Keith *The Karma Mimamsa* Calcutta, 1921, p. 6.

৪২. এই উক্তিতে ভুল আছে। উত্তরমীমাংসা বা 'বেদান্তসূত্র' (ব্রহ্মসূত্র)-এর লেখক পতঞ্জলি নন, বাদরায়ণ অথবা ব্যাস।

৪৩. এই ছোট অনুচ্ছেদটিতে অনেকগুলি ভুল আছে। পূর্বমীমাংসা বা কর্মমীমাংসার সঙ্গে বেদান্তের কোনও সম্পর্ক নেই। উত্তরমীমাংসার অপর নাম বেদান্ত। পূর্বমীমাংসা-সূত্রের লেখক ব্যাস নন, জৈমিনি। পূর্বমীমাংসাদর্শনে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার মিলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে এ কথাও সত্য নয়। সে মন্তব্য উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত সম্পর্কে প্রযোজ্য।

৪৪. এই উক্তি রামমোহন প্রকাশিত দুখানি গ্রন্থ সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে: (১) ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'বেদান্তগ্রন্থ', যেখানিতে বেদান্তমত সম্পর্কে তিনি ভাষ্য অংশে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, (২) ১৭৪০ শকে বা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত শংকরাচার্যের সমগ্র ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'শারীরক মীমাংসা'। প্রকাশকালের অনুল্লেখ সম্পর্কে প্রবন্ধকারের মন্তব্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর। কেননা 'বেদান্ত-গ্রন্থ'-এর আখ্যাপত্রে প্রকাশের স্থান ও কালের (Calcutta, 1815) উল্লেখ দেখা যায়। অপর গ্রন্থখানির পুষ্পিকাতেও তার প্রকাশকাল (১৭৪০ শক) উল্লিখিত হয়েছে। মনে হয় দ্বিতীয় গ্রন্থখানির উল্লেখই প্রবন্ধকারের অভিপ্রেত। দু'খানি গ্রন্থের কোনটিই লেখক দেখেন নি। তাঁর আলোচনার অবলম্বন ছিল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহন প্রণীত 'বেদান্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদ

Translation of an Abridgment of the Vedant। এটি বেদান্তবিষয়ক জটিলতা-বর্জিত বিচারগ্রন্থ।

৪৫. প্রতিমাপূজা ও লোকাচার ভিত্তিক প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী জনসাধারণের মনে রামমোহন-ব্যাখ্যাত বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ ও একতত্ত্ববাদের পক্ষে বিশেষ রেখাপাত করা অসম্ভব—প্রবন্ধকারের এই বক্তব্য। ক্ষুদ্র হলেও রামমোহনের নিজস্ব যে একটি মণ্ডলী ছিল এ তথ্য সম্ভবত তাঁর অজানা ছিল।

৪৬. প্রবন্ধকার রামমোহনের *The Precepts of Jesus* (Calcutta, 1820), *An Appeal to the Christian Public* (Calcutta, 1820), ও *Second Appeal to the Christian Public* (Calcutta, 1821) গ্রন্থ তিনখানির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই পর্যায়ের রামমোহন-প্রণীত শেষ গ্রন্থ *Final Appeal to the Christian Public* (Calcutta 1823) তাঁর হাতে পৌঁছায়নি। সুতরাং এ বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অসম্পূর্ণ ছিল। তা ভিন্ন রামমোহন-কৃত খ্রীষ্টধর্মের যুক্তিবাদী সমালোচনা রোমান ক্যাথলিক্ ধর্মাবলম্বীর নিকট উপাদেয় লাগবার কথা নয়।

৪৭. *A Conference between an Advocate and an Opponent of the Practice of Burning Widows Alive* (Calcutta 1818)

৪৮. উল্লেখটি স্পষ্ট নয়। দ্রষ্টব্য Colebrooke 'On the Duties of a Faithful Hindu Widow' *Asiatick Researches* Vol. IV (Calcutta 1795), pp. 209-19; প্রবন্ধে প্রদত্ত পত্রাঙ্ক ২০৪ সম্ভবত মুদ্রাকর-প্রমাদ; সেখানে ২১৪ হবে। রচনাটি পরে কোলব্রুকের প্রবন্ধ-সংগ্রহেও মুদ্রিত হয়েছিল, দ্রষ্টব্য Colebrooke *Miscellaneous Essays* Vol. I (London, 1837) pp. 114-22; এক্ষেত্রে স্মরণীয় কোলব্রুক তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধে সতীদাহ সংক্রান্ত যে-সব শাস্ত্রবচন সমবেত করেছেন তার মধ্যে সতীদাহ-বিধায়ক বচনের সংখ্যাই বেশী; নিষেধকপক্ষে উক্তি বড় অল্প। তুলনাত্মকভাবে তাঁর সংগৃহীত বিধায়ক-বাক্যগুলির গুরুত্বও অনেক বেশী; তার মধ্যে অপব্যাখ্যাত ঋগ্বেদবাক্যও আছে। এ সম্পর্কে পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ: ২৬৮-৬৯

৪৯. সিসিলি দ্বীপের গ্রীক অধিবাসী দিওদোরস খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে আদিমকাল থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত মানবজাতির এক ইতিহাস রচনা করেন। সে গ্রন্থের নাম *Historical Library*। এই গ্রন্থে তিনি একটি ভারতীয় সতীদাহের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কাহিনীটি তিনি সম্ভবতঃ মেগাস্থেনেস বা অন্য কোনও পূর্ববর্তী লেখকের রচনা থেকে সংগ্রহ করে থাকবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, ভারতে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হবার কারণ, স্বামীর মৃত্যুর পর ভারতীয় নারীরা প্রায়ই ব্যাভিচারিণী হত এবং অনেক সময় এই উদ্দেশ্যে তারা বিষপ্রয়োগে পতিহত্যা করত। বলাবাহুল্য এই মতের কোনও ভিত্তি নেই; দ্রষ্টব্য *The Historical Library of Diodorus the Sicilian* (Eng. Trans, by Booth, London, 1841) Vol II pp. 345-47.

৫০. *Journal Asiatique* I Ser. Tome 5 (Paris, 1824), p. 62; মাদাম

মোর্'য়ার প্রবন্ধ *The Father of Modern India* (*Rammohun Centenary Commemoration Volume*) Part II p. 370.

৫১. Madam Morin, *Ibid.* Mary Carpenter *Last Days* pp. 223-25.

৫২. শ্রীমতী এড্রিয়েন মুর (*Rammohun Roy and America p.* 122) প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন; মেরী কার্পেণ্টার তাঁর *Last Days* গ্রন্থে (pp. 20-21) সিস্মোঁদির রামমোহন-সম্পর্কিত মন্তব্যের একটি ইংরেজি চুম্বকও দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় মূল ফরাসী প্রবন্ধটি বর্তমান লেখক সংগ্রহ করতে পারেন নি।

৫৩. *Journal Asiatique* 2nd Ser. Tome *X* I p. 484,

৫৪. *Revue Encyclope´dique* December 1832, pp. 694-706; পারি-প্রবাসী বন্ধু অধ্যাপক ডঃ কমলেশ্বর ভট্টাচার্য আমার অনুরোধে অশেষ সৌজন্য ও যত্নসহকারে এই সমালোচনা-নিবন্ধের আলোক-চিত্রলিপি আমাকে পাঠিয়েছেন।

৫৫. Collet p. 538-

৫৬. যদিও রামমোহনের খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত বিতর্কমূলক পুস্তকগুলি আলোচ্য সংগ্রহগ্রন্থে পুনর্মু´দ্রিত হয়নি—তবু এগুলি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী পাশ্চাত্যদেশে প্রকাশ করাতে তাঁর কোনও কুণ্ঠা ছিল বলে মনে হয় না। ১৮২৩ সালে তাঁর *The Precepts of Jesus* ও প্রথম ও দ্বিতীয় *Appeal to the Christian public* একত্র ও *Final Appeal to the Christian Public* স্বতন্ত্রভাবে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই ব্যাপারে উদ্যোক্তা ছিলেন ইংলণ্ডের ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়—কিন্তু রামমোহন তাঁদের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তেমনি *The Precepts of Jesus* ও প্রথম দুটি *Appeal* একত্র আমেরিকায় নিউইয়র্ক´ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে; প্রথম *Appeal* আমেরিকার বোস্টন থেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, এবং *Precepts* ও তিনটি *Appeal* একত্র বোস্টন থেকে মুদ্রিত হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর মূলেও ছিলেন আমেরিকার ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায়, তবে তাঁদের কাজে রামমোহনের সম্মতি ছিল; দ্রষ্টব্য Collet pp. 537, 540।

৫৭. ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে রামমোহনে মনে যে একটি গর্ববোধ ছিল সে-সম্পর্কে 'রামমোহন রায়ের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে উদাহরণ সহ কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। রামমোহনের এ বিশ্বাস নিশ্চয় ছিল যে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যায় সমকালীন পাশ্চাত্য জগৎ ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্য-জগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জাতিকে প্রগতির পথে পরিচালিত করতে হলে—এই বিজ্ঞান,—বিশেষত পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যা বা Technology ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু সাধারণভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতা নিকৃষ্ট এমন ধারণা পোষণ করবার মত হীনমন্যতা রামমোহনের ছিল না। এখানে সমালোচক বা তাঁর সংবাদদাতার মধ্যে সম্ভবত তাঁদের অজ্ঞাতসারে তদানীন্তন পাশ্চাত্য মানসের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতাবোধ বা Superiority Complex উঁকি মারছে। দ্রষ্টব্য, 'প্রথম অধ্যায়' ও Collet pp. 207-08, 249-50।

৫৮. এখানে স্পষ্টত সমালোচক রামমোহনকে ভুল বুঝেছেন। রামমোহনের চিত্ত যে বিশ্বমানবের ঐক্যবোধে দীপ্ত ছিল এ খবর তিনি রাখতেন না। এই সমালোচনা প্রকাশিত হবার পূর্বে, ফ্রান্স-যাত্রার প্রাক্কালে রামমোহন ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে যে সু'বখ্যাত পত্র লেখেন তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন : "It is now generally admitted that not religion only but unbiased common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations now existing are only various branches." এই পত্রেই তিনি ব্যক্ত করেছেন বিশ্বভ্রাতৃত্বমূলক এক আন্তর্জাতিক সংস্থা (Congress) গঠনের তাঁর মনোগত পরিকল্পনা। এই পত্রখানি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য *English Works*, Part IV pp. 126-28

৫৯. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৫৬

৬০. ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত ১০ম ঋকটি হল সুপরিচিত গায়ত্রী মন্ত্র। সমালোচক এখানে তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের অন্তর্গত সপ্তম থেকে দ্বাদশ ঋক্ পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন—তার মধ্যে অবশ্য গায়ত্রীও আছে। রামমোহন 'গায়ত্রী'র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংবলিত দুখানি পুস্তিকা সংস্কৃত-বাঙ্লায় রচনা করেছিলেন : (১) গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), (২) গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্ (১৮২৭)। দ্বিতীয়খানির ইংরেজি সংস্করণ *A Translation in to English of a Sunskrit Tract insculcating the Divine Worship esteemed by those who believe in the revelation of the Veds as most appropriate to the nature of the Supreme Being* শিরোনামে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত ইংরেজি পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ লণ্ডন থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত ষষ্ঠ গ্রন্থরূপে পুনর্মুদ্রিত।

৬১. জার্মান পণ্ডিত ফ্রীডরিখ্ রোজেন লণ্ডন থেকে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লাটিন অনুবাদ সহ ঋগ্‌বেদের এক সূক্তসংগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ মুদ্রিত হবার পূর্বে তিনি নমুনাস্বরূপ ঋগ্‌বেদের কিছু অংশ প্রকাশ করেছিলেন। পথিয়ে তার থেকেই 'গায়ত্রী'র অনুবাদ করেছেন।

৬২. উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। বেদান্ত-ব্যাখ্যাতারূপে রামমোহন শংকরাদি ভাষ্যকারের মতই মুখ্যত উপনিষদ্-বাক্যের উপর নির্ভর করেছেন। উপনিষদ্ পূর্ববর্তী বেদ-সংহিতা বর্ণিত দেবমণ্ডলী সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, এই দেবগণকে ঋষিরা সেই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রকাশরূপে গণ্য করে থাকেন—সুতরাং তাঁদের অন্তরালে অবস্থিত পরব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য জ্ঞান করতে হবে; ব্রহ্মসূত্র (১।২।১৮) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামমোহন বলছেন : "বেদে অধিদৈবাদি বাক্যসকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামী হয়েন যেহেতু অন্তর্যামীর অমৃতাদি বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি॥ অসৌ বা আদিত্যঃ॥ ইত্যাদি অনেক শ্রুতি সূর্যের মাহাত্ম্য কহেন। য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যান্তরঃ॥ বৃহদারণ্যক॥ যিনি সূর্যেতে অন্তর্যামিরূপে থাকেন তিনি সূর্য হইতে ভিন্ন হয়েন।" অন্যত্র ব্রহ্মসূত্র (১।১।২১) ব্যাখ্যায়—

তিনি আরও বলছেন: "সূর্যান্তর্যামী পুরুষ সূর্য হইতে ভিন্ন হয়েন যেহেতু সূর্যের সাহিত সূর্যান্তর্যামীর ভেদকথন বেদে আছে।' অন্যত্র এই প্রসঙ্গের বিশদ ব্যাখ্যাও তিনি করেছেন: "এইরূপ নানা দেবতার জগৎকর্তৃত্ব করিয়া স্থানে স্থানে বেদে বর্ণন আছে ইহাতে তাঁহাদের সাক্ষাৎ জগৎকারণত্ব না হয় যেহেতু বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি। সকল বেদ একাকে কহেন অতএব এক ভিন্ন অনেক কর্তা হইলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, আর বেদ কহেন যে—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম॥ কঠ॥ ব্রহ্ম এক দ্বিতীয়রহিত হয়েন। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা॥ বৃহদারণ্যক॥ ব্রহ্ম বিনা আর কেহ ঈক্ষণকর্তা না হয়। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ বৃহদারণ্যক॥...অতএব নানা বস্তুকে এবং নানা দেবতাকে ব্রহ্মত্ব আরোপণ করিয়া ব্রহ্ম কহিবাতে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন হয় নানা বস্তুর স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না। সকল দেবতার এবং সকল বস্তুর পৃথক পৃথক ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়...ইহা বুদ্ধির এবং বেদের বিরুদ্ধ মত হয়।"—'বেদান্তসার' রামমোহন গ্রন্থাবলী-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ—১, পৃঃ ১১৯-২০। 'গায়ত্রীর অর্থ' গ্রন্থে রামমোহন গায়ত্রীমন্ত্রের যে অনুবাদ করেছেন তা উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ: "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময় হয়েন সূর্যদেবের অন্তর্যামি সেই প্রার্থনীয় সর্বব্যাপি পরমাত্মাকে আমাদের অন্তর্যামিরূপে আমরা চিন্তা করি যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-সকলকে প্রেরণ করিতেছেন ইতি।"—গ্রন্থাবলী—৪, পৃঃ ৮। সুতরাং বেদ-সংহিতার ধর্মকে তাঁর দৃষ্টি থেকে তিনি স্থূল বহুদেববাদরূপে গ্রহণ করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোলব্রুকও বেদ-সংহিতার ধর্মকে seeming polytheism বা 'আপাতদৃষ্টিতে বহুদেবোপাসনা' বলে বর্ণনা করেছেন। গায়ত্রীমন্ত্রের অনুবাদে উইলিয়ম জোন্স্‌ও সেটিকে সূর্যের অন্তরালবর্তী পরব্রহ্মের প্রতি উচ্চারিত মন্ত্ররূপেই গ্রহণ করেছেন। এই কারণে রামমোহনকে তাঁর গায়ত্রী-সংক্রান্ত ইংরেজি পুস্তকে জোন্স্‌কৃত অনুবাদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করতে দেখা যায়—দ্রষ্টব্য *English Works* Pt II p. 80

৬৩. একথা সত্য যে মনু সাধারণ ভাবে বেদের তালিকায় ঋক, যজুস্‌ ও সাম এই তিনটি সংহিতাকেই ধরেছেন এবং অথর্ববেদকে বাদ দিয়েছেন। মনুসংহিতায় (১।২৩) বলা হয়েছে—পরমাত্মা যজ্ঞকার্যসিদ্ধির জন্য অগ্নি থেকে ঋগ্বেদ, বায়ু থেকে যজুর্বেদ ও সূর্য থেকে সামবেদ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এই অনুল্লেখমাত্র থেকেই একথা প্রমাণিত হয় না যে অথর্ববেদ অপর বেদত্রয় থেকে অপেক্ষাকৃত নবীন। কেননা মনুসংহিতার চেয়ে অনেক প্রাচীন উপনিষদে অথর্ববেদ অপর তিন বেদের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হয়েছে—যথা, 'তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতি-ষমিতি'—(মুণ্ডকোপনিষদ্‌ ১।১।৫)। অথর্ববেদ অবশ্যই ঋগ্বেদের পরবর্তী কিন্তু তা শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত এবং কদাচ অর্বাচীন নয়। তবে অনিষ্টসাধক অভিচারক্রিয়া, ইন্দ্রজাল, নানা প্রকার তুক-তাক ইত্যাদি এর বিষয়বস্তু হওয়ায় বেদজ্ঞ পুরোহিতগণ অনেকে এই গ্রন্থের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। এই কারণে অনেক সময়ে বেদের তালিকা থেকে এর নাম বাদ পড়েছে। মেধাতিথি তাঁর মনুভাষ্যে (২।৬) খুব পরিষ্কার করে বলেছেন, অথর্ববেদের

মধ্যে যজুর্বেদাদির মতই যাগযজ্ঞকর্ম উপদিষ্ট হয়েছে, তবে এই বেদে হিংসাত্মক অভিচারাদি ক্রিয়ার উপদেশ খুব বেশী থাকায়—কেউ কেউ ভ্রান্তিবশত একে বেদ বলে স্বীকার করতে চান না (ভচ্চাথর্ববেদেঽপি সর্বমাস্ত জ্যোতিষ্টোমাদিকর্মণাং যজুর্বেদাদিম্বিব তত্রাপ্যুপদেশাৎ অভিচারমূলকর্মাদিকর্মণাং বাহুল্যেন তত্রোপদেশাদবেদত্বমিতি বিভ্রম:)। আর অথর্ববেদের বিষয়বস্তুর উপর আদিম ধর্মবিশ্বাসের ছাপ অল্প,—এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বরং এ কথা জোর করেই বলা চলে অথর্ববেদ আর্যসমাজের আদিম ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের এক আকরগ্রন্থ।

৬৪. লাও-ৎ-সিউ প্রাচীন চীনের ব্রহ্মবাদী ঋষি। সাধারণত তাঁকে বুদ্ধের সমসাময়িক (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকের লোক) মনে করা হয়। তাঁর প্রবর্তিত অধ্যাত্মদর্শনের নাম 'তাও-বাদ'। ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে এর গভীর সাদৃশ্য আছে। সম্ভবত এই সাদৃশ্য দেখাবার জন্যই ম. পথিয়ে তাও-মতবাদ প্রসঙ্গে 'রেভ্যু'তে উপনিষদেরও অনুবাদ প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেছিলেন। লাও-ৎ-সিউ রচিত Raison গ্রন্থ বলতে তিনি কোন গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন বোঝা গেল না। লাও-ৎ-সিউর নামে একখানি গ্রন্থই প্রচলিত,—সেটি হল 'তাও-তে-কিঙ্'। কেউ কেউ মনে করেন 'তাও' সম্প্রদায়ের আদি গ্রন্থখানারই নাম 'লাও-ৎ-সিউ' (Henri Maspero *La Chine Antique* Paris 1955, p. 408 note 2)। 'তাও-তে-কিঙ্' নামটির অনুবাদ ফরাসীতে 'Raison' করলে একটু বিসদৃশ হয়।

৬৫. গায়ত্রী সংক্রান্ত ইংরেজি পুস্তকে রামমোহন তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে যে সব শাস্ত্র-গ্রন্থের ও স্মৃতিকারের বচন উদ্ধার করেছেন সে গ্রন্থ ও আচার্যের তালিকা এই: ছান্দোগ্য উপনিষদ্, মুণ্ডক উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসূত্রের শাংকরভাষ্য, মহানির্বাণতন্ত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ভট্ট গুণবিষ্ণু ও স্মার্ত রঘুনন্দন। ধর্মশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্যকেই এখানে 'যোগিযাজ্ঞবল্ক্য' নামে উল্লেখ করা হয়েছে—কেননা 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা'র প্রথম শ্লোকেই আছে:

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্।
বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্মানশেষত:॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১. ১

'যোগিযাজ্ঞবল্ক্য', 'হঠপ্রদীপিকা', 'যোগানুশাসন', 'রাজযোগ' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা যাজ্ঞবল্ক্য নামক এক যোগাচার্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্য ও ইনি অভিন্ন কিনা বলা কঠিন।

৬৬. রামমোহন প্রচারিত হিন্দুশাস্ত্রসমর্থিত একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তের সুদীর্ঘ প্রতিবাদ করেন মাদ্রাজ সংকারী কলেজের তদানীন্তন ইংরেজি-শিক্ষক শংকর শাস্ত্রী। ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৬ তারিখে লিখিত তাঁর এই প্রতিবাদ ৩১ ডিসেম্বর ১৮১৬ তারিখের 'মাদ্রাজ ক্যুরিয়র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এরই প্রত্যুত্তরস্বরূপ রামমোহন তাঁর *A Defence of Hindoo Theism* (কলিকাতা ১৮১৭) গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

৬৭. এই উক্তি অনবধানতাপ্রসূত। 'সতীদাহবিষয়ক' তিনটি রচনা আলোচ্য সংগ্রহের

শেষ তিনখানি গ্রন্থ নয়। এগুলির স্থান যথাক্রমে, দশম,একাদশ ও দ্বাদশ; এর পরেও ই সংগ্রহে আর একখানি গ্রন্থ আছে—সেটি হিন্দুনারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত। সমালোচক অবশ্য যথারীতি সেখানিরও আলোচনা করেছেন।

৬৮. ভারতীয় হিন্দুসমাজে প্রচলিত একটি কদর্য অথচ অশাস্ত্রীয় প্রথানুসারে বৃদ্ধ, অশক্ত, পঙ্গু, রোগজীর্ণ অথচ বিত্তশালী উচ্চবর্ণজাত পুরুষগণ যথেষ্ট কন্যাপণ দিয়ে বিবাহের জন্য কন্যা সংগ্রহ করতে পারত। কন্যাপক্ষ অর্থলোভে এসব ক্ষেত্রে কন্যাদান করতে দ্বিধা করত না। রামমোহন আলোচ্য পুস্তকে এই মর্মবিদারী কুপ্রথার তীব্র নিন্দা করেছেন ও স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে মনু, কাশ্যপ প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ এই 'কন্যাবিক্রয়' প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রাচীন স্মৃতিতে এই প্রথার নিন্দা থেকে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষেও এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। রামমোহনের ভাষায় "In the practice of our contempoaaries, a daughter or a sister is often a source of emolument to the Brahmans of less respectable caste (who are most numerous in Bengal) and to the Kayasthas of high caste. These so far from spending money on the marriage of their daughters or sisters, receive frequently considerable sums and generally bestow them in marriage on those who can pay most. Such Brahmans and Kayasthas, I regret to say, fequently marry their female relations to men having natural defects or worn-out by old age or disease, merely from pecuniary considerations, whereby they either bring widowhood upon them soon after marriage or render their lives misereble. They not only degrade themselves by such cruel and unmanly conduct, but violate entirely the express authorities of Manu and all other ancient law-givers..." *English Works* Pt. I p. 7...

৬৯. 'The Precepts of Jesus'-এর সংস্কৃত ও বাঙলা অনুবাদ রামমোহন শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি। উত্তরকালে রাখালদাস হালদার এর এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের শিরোনাম "সুখশান্তির উপায়স্বরূপ যীশু প্রণীত হিতোপদেশ" (কলিকাতা, ১৮৫৯)।

৭০. ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখ্যা 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক্'-এর উক্তি থেকে মনে হতে পারে রামমোহন ঐ বৎসর নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের প্রথমে ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ আর এক সমসাময়িক ফরাসী পণ্ডিত গার্সাঁ দ তাসী এ বিষয়ে একটু অন্য রকম সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন ১৮৩২ সালের শরৎকালে রামমোহন ফ্রান্সে আসেন এবং ১৮৩৩-এর জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ডে ফিরে যান (Il vint en France dans l'automne de l'anneé 1832 et retourna en Angleterre en janvier 1833, দ্রষ্টব্য Garcin de Tassy *Histoire de la Litterature Hindouie et Hindoustanie* Seconde Edition. Tome II Paris 1870, p. 551)। এই দুই মতের মধ্যে আপাতত সামঞ্জস্য করা গেলনা। যদি ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখ্যা 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক' কিছু দেরিতে প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে পথিয়ে হয়তো মাসের উল্লেখ না করেও

জানুয়ারীতে প্রত্যাবর্তনের কথাই মনে রেখেছিলেন। আর যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতেই হবে এঁদের কেউ একজন রামমোহনের প্রত্যাবর্তনের সময়টি সঠিক জানতেন না।

৭১. Garcin de Tassy *Histoire de la Literature Hindouie et Hindoustanie* Se´conde Edition, Tome II, Paris 1870, pp. 548-52.

৭২ *Ibid.* p. 548. হিন্দুস্থানী বা উর্দুতে লিখিত একখানি পত্র ব্যতীত রামমোহনের দ্য-তাসীকে লিখিত অপর পত্রগুলি এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। সয়িদা সুরিয়া হুসেন তাঁর গবেষণামূলক ফরাসী দ্য তাসী-জীবনীতে (*Garcin de Tassy. Biographie et Etude de ses Oeuvres* Pondicherry 1962) সমকালীন ভারতীয়গণের সঙ্গে দ্য তাসীর যোগাযোগের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন (p. 7)। আশ্চর্যের বিষয় মুদ্রিত সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রাচুর্যসত্ত্বেও এই প্রসঙ্গে তিনি রামমোহনের নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। রামমোহন-দ্য তাসীর পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, দিলীপকুমার বিশ্বাস 'রামমোহন রায় ও গার্সাঁ দ্য তাসী', দেশ, ৪৪ বর্ষ, ৫৩ সংখ্যা (১২ কার্তিক ১৩৮৪) পৃঃ ১৭-১৯

৭৩. *Ibid.* p. 549. ৭৪. *Ibid.* pp. 549-50 ৭৫. *Ibid.* p. 551

৭৬. *Appendice aux Rudiments de la Langue Hindoustani* Paris 1833, p. 31, No. 14. ডঃ কালিদাস নাগ ও শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ তাঁদের সংকলিত রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে এই পত্রখানিকে ভ্রমবশত ফার্সীতে লিখিত (in Persian) বলে উল্লেখ করেছেন, দ্রষ্টব্য *English Works* Vol IV, p. 124

৭৭. বাঙলা ভাষায় দ্য তাসির মনীষা ও কীর্তি বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, 'কাব্য-কৌতুক', কলিকাতা ১৩৬৭, পৃঃ ১৭৩-৮৮.

৭৮. ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জাকমঁর ভ্রমণকাহিনী *Voyage dans l'Inde* থেকে জাকমঁ-রামমোহন আলোচনা অংশটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী; দ্রষ্টব্য *Modern Review* June 1926, pp.689-92.

৭৯. Victor Jaquemont *Voyage dans l'Inde* Tome I Paris 1841, p, 183.

৮০. *Auflosung des Wedant orderer Auflosung aller Weds des beruhmtesen Werke Braminischer Gottesgelahrtheit worin die Einheit des Hochsten Wesens dargethan Wird, so wie auch dass Gottalein der Gegenstand Verohnung und Verhrung seyn konne* Jena, 1817, এটি তাঁর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত *Abridgment of the Vedant* শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থের জার্মান অনুবাদ।

৮১. *Vertaling Van Verscheidene voername Boeken Pladtsen en Teksten van de Veddas* Kampen 1840; এটি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর *Translation of Several Principal Books Passages and Texts of the Veds* শীর্ষক সংকলনগ্রন্থের ওলন্দাজ অনুবাদ। মূল ইংরেজি সংস্করণটি একখানি সংকলন। এতে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও শাস্ত্রবিচার সম্পর্কিত রামমোহনের সর্বসমেত তেরখানি গ্রন্থ স্থান পেয়েছে।

৮২. দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৫০-৫১

বাঙ্‌লার ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে বেন্টিংক্‌কে প্রদত্ত রামমোহন রায়ের স্মারক-লিপি

রামমোহন রায় হাউস অব্‌ কমন্‌স কর্তৃক ১৮৩১ সালে নিযুক্ত সিলেক্ট্‌ কমিটির সামনে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের ভূমিরাজস্বব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, এ তথ্য সুবিদিত। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য তিনি লিখিত আকারে দাখিল করেন। ১৮৩২ সালে লণ্ডনস্থ স্মিথ এল্‌ডার এ্যাণ্ড কোম্পানী তাঁর প্রদত্ত বিবরণটিকে Exposition of the Practical Operation of Judicial and Revenue Systems in India and the General Charcter and Condition of its Native Inhabitants as submitted in Evidence to the Authorities in England with notes and illustrations and Brief Preliminary Sketch of Ancient and Modern Boundaries and the History of that Country elucidated by a Map, শিরোনামে স্বতন্ত্র গ্রন্থকারেও প্রকাশ করেছিলেন। রামমোহনের সাক্ষ্য Parliamentary Papers-এর এবং তাঁর ইংরেজি গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণগুলিরও অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬৫ সালে অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় কলিকাতা থেকে Rammohun Roy on Indian Economy শীর্ষক এর একটি স্বতন্ত্র সংস্করণও প্রকাশিত হয়। মুখ্যত এই রচনার উপর ভিত্তি করে এ-পর্যন্ত অনেকে সমকালীন ভারতের অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে রামমোহনের চিন্তাধারার আলোচনা করেছেন: যেমন ডঃ জ্ঞানচাঁদ (সংক্ষিপ্ত উল্লেখ *The Father of Modern India; Commemoration Volume of Rammohun Roy Centenary Celebrations 1933*, Pt. I p. 79); সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'Economic Writings of Rammohun Roy' (*Students' Rammohun Centenary Volume*, M. C. Sarkar & Sons, Calcutta 1933, pp. 72-78); সুশোভনচন্দ্র সরকার (তৎসম্পাদিত Rammohun Roy on Indian Economy গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকা, pp. i-v; এবং তাঁর বাঙ্‌লা প্রবন্ধ 'অর্থনীতিচর্চায়

রামমোহন'—তত্ত্বকৌমুদী মাঘোৎসব সংখ্যা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ পৃ: ৩৮-৪৩); বি. এন. গাঙ্গুলী 'Rammohun Roy on India's Contemporay Economic Problems' (*Economic and Social Development; Essays in honour of Dr. C. D. Deshmukh* pp. 281-307); ভবতোষ দত্ত (*The Evolution of Economic Thinking in India* Calcutta 1962, pp 4-6, এবং তাঁর বাঙ্‌লা প্রবন্ধ 'রাজা রামমোহন রায় ও ভারতীয় অর্থনীতি,' বিশ্বভারতী পত্রিকা ২৮ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১১৪-২৩)।

এ-যাবৎ প্রায় সকলেই মনে করে এসেছেন যে, তাঁর কালের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে রামমোহনের যা বক্তব্য ছিল তা তিনি মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ১৮৩১-৩২ সালে সিলেক্ট্ কমিটির সামনে সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গেই প্রথম প্রকাশ করেন এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন। কিন্তু উক্ত রচনাগুলিতে প্রতিফলিত রামমোহনের অর্থনীতিবিষয়ক চিন্তা এমন পরিণত ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যে পাঠকের স্বভাবত মনে হয় এগুলির পশ্চাতে নিশ্চয় দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি ছিল। রামমোহনের প্রাক্-১৮৩১ রচনায় এরকম ইঙ্গিত আছে যদিও এতকাল তা গবেষকদের দৃষ্টি সমুচিতভাবে আকর্ষণ করেনি।

ডঃ (পরবর্তীকালে 'সার') জন বাউরিংকে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২২ তারিখে লেখা এক পত্রে রামমোহন বলছেন: 'Having been principally engaged in completing my final appeal to the Christian Public I could not pay due attention to my intended long memorial. I however made an attempt to bring it to a conclusion after I had the pleasure of receiving your note on Saturday last week, but from the want of some additional Revenue documents under the Moghul Government which my native friends of the upper provinces have not yet furnished me with,...I am afraid, I shall not be able to prepare it before your departure from India. As this will be my first production in political affairs, I am, therefore, very anxious to have it as perfect and well-authenticated as possible, so that having established

it on a sane foundation, no person can justly ascribe it to a party feeling or discontent with the Government.' পত্রশেষে তিনি পুনশ্চ মন্তব্য করছেন, "I hope you will not at present mention to any one the purport of the memorial which is not yet presented to L H." (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়*কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত *Modern Review* June 1927, p. 764 ; পুনর্মুদ্রিত *Englih Works* Pt. IV pp. 113-14)। এই পত্রাংশ থেকে প্রমাণ হয়, ধর্মবিষয়ক ঘোর তর্কযুদ্ধের মধ্যেও রামমোহন একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি (Long Memorial) প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন ; ১৮২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি এর খসড়াটি তিনি প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন, কিন্তু মুঘলযুগের ভূমিরাজস্ব-সংক্রান্ত কিছু দলিলপত্র তখন পর্যন্ত তাঁর হস্তগত না হওয়ায় এটির উপসংহার করেন নি ; তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গোপনে এটি রচনা করেছিলেন এবং তদানীন্তন বড়লাট লর্ড্ হেষ্টিংস্ (L. H.)-এর হাতে এটি দেবার তাঁর অভিলাষ ছিল। এ-পর্যন্ত যাঁরা উল্লিখিত পত্রখানি আলোচনা করেছেন তাঁরা Long Memorial বস্তুটি যে কি তা বুঝতে পারেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অকপটে তা স্বীকার করেছেন এবং রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থাবলীর সর্বশেষ সম্পাদকদ্বয় কালিদাস নাগ ও দেবজ্যোতি বর্মণ এর উপর কোনও মন্তব্যই করেন নি। কিন্তু এই দীর্ঘ স্মারকলিপিটিকে রামমোহন স্বয়ং যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন পত্র পড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। যদিও এটিকে তিনি সাধারণভাবে production in political affairs বলে অভিহিত করেছেন তথাপি এর উপাদানস্বরূপ মুঘলযুগের ভূমিরাজস্ব-বিষয়ক কাগজপত্রের উল্লেখ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় রচনাটি মুখ্যত সমকালীন ভূমিব্যবস্থা ও রাজস্ববিভাগীয় শাসনসমস্যা সংক্রান্ত। যেভাবে বাউরিং-এর নিকট তিনি তাঁর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন—তার থেকে এ-কথাও প্রমাণ হয়, তিনি সম্পূর্ণ নিজের প্রেরণায় গোপনে এটি লিখেছিলেন, শাসনকর্তৃপক্ষের আদেশে বা অনুরোধে নয়।

কিন্তু বর্তমানে যতদূর জানা যায় রামমোহন তাঁর পরিকল্পিত ও রচিত এই Long Memorial, লর্ড্ হেষ্টিংসের হাতে দিতে পারেন নি ; পরবর্তী জন এ্যাডাম ও লর্ড আমহার্স্টের আমলেও তাঁর পক্ষে এটি দাখিল করা সম্ভব

হয় নি। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। ১৮২২ থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত তিনি ক্রমশ গভীর ভাবে শিক্ষানৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যা সংক্রান্ত বিতর্ক ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এই পর্বে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ও পুস্তিকার সংখ্যা তিরিশ (১৩ খানি বাংলা, সতরখানি ইংরেজি)। ধর্ম ও সমাজবিষয়ক যে দুটি সমস্যার সমাধানে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সে দু'টির চূড়ান্ত সমাধানও ঘটে এই পর্বে—ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় (১৮২৮) ও সতীদাহ-উচ্ছেদ-আইন প্রবর্তনে (১৮২৯)। পুত্র রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী মামলা (১৮২৬-২৭)ও এই পর্বে তাঁর যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। সুতরাং জীবনের এই অধ্যায়ে তাঁর পরিকল্পিত স্মারক-লিপিটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া বা সরকারে দাখিল করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। উল্লিখিত সমস্ত কঠিন সমস্যাগুলির সফল সমাধানের পর ১৮২৯ সালের শেষভাগে রামমোহন সাময়িক বিরাম পেয়েছিলেন। সুতরাং এই সময়ে তিনি তাঁর সাত বৎসর পূর্বেকার পরিকল্পিত Long Memorial-টি সংশোধন ও সম্পূর্ণ করে সরকারকে পাঠাতে উদ্যোগী হবেন এটাই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। লর্ড্ উইলিয়ম বেণ্টিংকের আমলে রামমোহনের প্রতি সরকারী মহলের বিরূপতাও (রাধাপ্রসাদের মামলায় যা শোচনীয়ভাবে প্রতিফলিত) অনেকাংশে (সম্পূর্ণরূপে নয়) কেটে গিয়েছিল। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর পক্ষে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেবার অপেক্ষাকৃত অনুকূল একটি পরিবেশও এখন সৃষ্টি হল।

ইংলণ্ডের গ্রন্থাগারগুলিতে রামমোহনের জীবন সংক্রান্ত সমসাময়িক উপাদান অনুসন্ধানের সূত্রে বর্তমান লেখক সৌভাগ্যক্রমে নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত লর্ড্ উইলিয়াম বেণ্টিংকের কাগজপত্রের পোর্ট্‌ল্যাণ্ড সংগ্রহে রামমোহনের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্রাদির মধ্যে রামমোহনের হস্তলিখিত ব্রিটিশ ভারতের ভূমিব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি স্মারক-পত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এটি ঘন-সন্নিবিষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত নয় পৃষ্ঠার (১৩″×৮″) এক পাণ্ডুলিপি ; এর লাইব্রেরী ক্যাটালগ্ নম্বর PWJF 2735 ; পাণ্ডুলিপির পিছনে পেন্‌সিলে পরিষ্কার লেখা Rammohun Roy / Ryut Regns. / 5 Dec. / (Manuscript old Welbeck number 1869)। কোন সময় রচনাটি সরকারকে পাঠানোর জন্য শেষ করা হয়েছিল তার পরোক্ষ অভ্যন্তরীণ প্রমাণ

আছে। স্মারকপত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) প্রবর্তিত হবার পর ছত্রিশ বছর কেটে গেছে—অর্থাৎ রচনাটি শেষ হয়েছিল ১৮২৯ সালে; পশ্চাদ্‌ভাগে দেওয়া ৫ ডিসেম্বর তারিখটি সরকারী দফ্‌তরে সেটি প্রাপ্তির তারিখ। সুতরাং ধরে নেওয়া চলে রামমোহন ৫ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখে স্মারক-লিপিটি সরকারে দাখিল করেছিলেন। আদৌ ১৮২২ সালে লর্ড্‌ হেস্টিংসের আমলে তিনি যে Long Memorial খানি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সরকারকে পাঠাবার সংকল্প করেছিলেন আবিষ্কৃত স্মারক-পত্রটি যে সেই দলিল এতে বিশেষ সন্দেহ নেই। বর্তমান দলিলখানি তদানীন্তন ভূমিব্যবস্থা ও কোম্পানীর রাজস্ববিভাগীয় শাসন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে রচিত এবং কি উপায়ে এই শাসনকে নিপীড়িত কৃষককুলের পক্ষে কল্যাণমূলক করে তোলা যায় তৎ-সংক্রান্ত পরামর্শে পূর্ণ। তবে সাত বছর পরে পেশ করা হয়েছিল বলে হয়তো রামমোহন মূল খসড়াটিকে যথেষ্ট সংশোধন ও কিছুটা সংক্ষেপিত করে থাকতে পারেন।

স্মারক-পত্রটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উত্তরকালে সিলেক্ট্‌ কমিটির সামনে সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে রামমোহন রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার সঙ্গে মোটামুটি এর মিল আছে। তবে কতগুলি বাস্তব সমস্যা ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত কিছু বিস্তারিত ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ এটির বিশেষত্ব। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে জমিদার ও রায়ৎ দু'পক্ষের অবস্থা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন গত ছত্রিশ বছরের মধ্যে জমিদারেরা একটি নির্দিষ্ট হারে সরকারকে খাজনা দিয়েছে এবং তৎসহ পতিত জমিকে চাষের আওতায় এনে ও অনবরত নানা ছুতোয় রায়তের উপর করবৃদ্ধি করে নিজেরা সমৃদ্ধিশালী হয়েছে; অপর পক্ষে নিয়মিত করবৃদ্ধি ও শোষণের ফলে এই সময়ের মধ্যে রায়তের অবস্থা হয়ে উঠেছে শোচনীয়। জমিদারগণ জমির খাজনাবৃদ্ধি ব্যতীত আবওয়াব, চাঁদা, ধর্মীয় ও বিবাহানুষ্ঠানে অনুমতিদানের মূল্যস্বরূপ পাওনা—প্রভৃতি নানা অবৈধ আদায়ের দ্বারা প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গে তমলুক, হিজ্‌লী প্রভৃতি অঞ্চলে ও রংপুর প্রভৃতি জেলায় এ-জাতীয় প্রজাশোষণ খুবই সাধারণ ঘটনা। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন কতগুলি প্রতিকার নির্দেশ করেছেন: সরকারী নির্দেশে প্রত্যেক জমিদারের ভূসম্পত্তির নিখুঁৎ সমীক্ষা জেলার কালেক্টারদের

কাছে দাখিল করতে হবে; এবং সরকারীভাবে সেই হিসাব পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হবার পর প্রত্যেক চাষীর সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে সম্পাদিত স্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে চাষের জমি একটি নির্দিষ্ট করহারে বিলি করতে হবে। এই নির্দিষ্ট করহার ভবিষ্যতে কিছুতেই বৃদ্ধি করা চলবে না। জমিদারবর্গ এই নির্দিষ্ট করের অতিরিক্ত কোনও কিছু রায়তের কাছে দাবি করলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হবে এবং এর জন্য তাদের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড ভোগ করতে হবে। জমির মাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে জমিদারেরা যাতে চাষীদের ঠকাতে না পারে তার জন্য কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত জমির মাপকেই মান হিসাবে গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসিত সমস্ত অঞ্চলে কঠোর ভাবে তা চালু করতে হবে। জমিদারগণ যদি সরকারী আদেশপ্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে তাদের জমিদারীর সমস্ত হিসাব নিকাশ ও তদ্‌ভিত্তিক চাষীদের সঙ্গে জমি বন্দোবস্তের বিবরণ সরকারে দাখিল না করে তাহলে আদালতে তাদের বকেয়া খাজনার কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না; ইত্যাদি।

সমগ্র স্মারকপত্রটির প্রতি ছত্রে করভারনিপীড়িত ও নানা উপায়ে শোষিত কৃষককুলের জন্য লেখকের গভীর সহানুভূতি প্রতিফলিত। রামমোহন স্বয়ং জমির মালিক ছিলেন তা সত্ত্বেও অবৈধ প্রজাশোষণের নিমিত্ত অত্যাচারী ভূস্বামিগণের জন্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডের সুপারিশ করতে পশ্চাৎপদ হননি। কোনও প্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে সংযত অথচ সুতীক্ষ্ণ ভাষায় তিনি বাস্তব সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করেছেন। সম্পূর্ণ নিজের প্রেরণায় রচিত তাঁর এই লিপি পাঠ করলে নিশ্চিত হওয়া চলে ১৮৩১ সালে হাউস অব কমন্‌সের আহ্বান পাওয়ার অনেক পূর্ব হতেই রামমোহন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে সুরু করেছেন। ১৮২২ কি তারও পূর্বে তাঁর অর্থনীতিচর্চার আরম্ভ। সিলেক্ট্‌ কমিটির সামনে তিনি পরজীবনে বিস্তারিতভাবে যা বলেছেন—সূত্রাকারে তার রাজস্ব সংক্রান্ত অংশের সারমর্ম আলোচ্য লিপিতে আভাসিত। সমগ্র দলিলটি এখানে মুদ্রিত হল। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 'Rammohun Roy's Memorandum on the System of Land-holding in British India' *Bengal Past and Present* Vol XCIII, Pts II & III (May-August, September-December 1974) pp. 105-18

It is an undeniable fact that during the former Government such class of persons as are now termed Proprietors of land and such as are called Ryots or comm... or Cultivators of the soil stood practically on an equal footing both as to the uncertainty of assessment on the lands in their hands and their liability to be dispossessed of them on failure to meet the demands of a higher authority.

The British Governm... of Bengal conforming to established usage acted on this system ... late 1793 when with ... to collection of the ... and to afford to the Landholders fair ... encouragement to improve their respective ... the permanent settlement with them ... tlished, assessing each estate for perpetuity at a particular annual sum payable to Government by instalments — This ... has amply met the wishes of Government and ' exceeded

রামমোহন কর্তৃক বেন্টিংক্‌কে প্রদত্ত স্মারক-লিপির প্রথম পৃষ্ঠা।
পাণ্ডুলিপি বিভাগ, নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, নটিংহাম, ইংলণ্ড।

TEXT*

(UNIVERSITY LIBRARY, NOTTINGHAM' ENGLAND :
MS. PWJF 2795 : FOOLSCAP 13" × 8")

[1] It is an undeniable fact that during the former Government such class of persons as are now termed Proprietors of land and such as are called Ryots or common Cultivators of the soil stood practically on an equal footing both as to the uncertainty of assessment on the lands in their hands and their liability to be dispossessed of them on failure to meet the demands of a higher authority.

The Britsh Government of Bengal conforming to established usage acted on this system until so late as 1793, when with a view to facilitate the collection of the revenue and to afford to the Landholders fair encouragement to improve their respective estates, the permanent settlement with them was established, assessing each estate for perpetuity at a particular annual sum payable to Government by instalments.—This system has amply met the wishes of Government and has exceeded the hope of advantage [2] then entertained by the Landholders themselves.—Waste lands have been cultivated on every direction and the rents payable by Ryots have been raised to a great extent under various pretences on the part of the Landholders, so that many estates yield at present double the revenue paid to the Government by their respective Proprietors and there can scarcely be found a Zumindaree in the country which does not afford a considerable profit

* বন্ধনী মধ্যস্থ সংখ্যাগুলি মূল দলিলের পৃষ্ঠাঙ্কসূচক। —লেখক

to its Proprietor.—Nevertheless the Landholders have not directed their attention to ameliorate the condition of that most numerous but indigent class of British subjects called Ryots, in admitting them to a participation in the extensive benefit they themselves enjoy from the perpetual settlement.—No Zumeendar has ever proposed to grant his Ryots the same indulgence that Government spontaneously conferred [3] upon him in 1793. Nay, in proportion as their income increases their desire for further extortion seems excited.—Experience thus sufficiently indicates that the Zumeendars never will of their own accord perform the duty which they owe to their own character, to—Government and to those placed under their immediate management.

After continued successful exertions by the Zumeendars during a period upwards of six and thirty years to raise the rent of lands in their respective estates they cannot, under the present state of things, fairly effect a further increase of rent to any great degree in those lands.—It is now desirable that Government should adopt such measures as may be best calculated to secure the rights and independence of the Ryots without depriving the Zumeendars of those revenues which they have been hitherto permitted to appropriate to themselves.

It is accordingly [4] suggested that in the first instance every Landholder should be required to prepare a correct statement, containing under the title of each estate he may hold, names of the villages appertaining to that estate, the portions cultivated by different individuals and the rent

now paid for each portion and lastly the name of the individual cultivator or cultivators by whom the rent of such portion is actually paid.

Every Landholder should be also required to deliver a copy of the statement thus prepared by him into the Kutchuhree of the Collector of the District in which the estate is situated, that the Collector may carefully ascertain its accuracy by comparing it with the last Jumma Wassil Bakee Papers delivered into his records by the Kanoongou.

When the Collector is satisfied of the accuracy of the statement he should affix his signature to every page of it and of a duplicate copy, one to be kept among the Records of the Collcetorship [5] Collectorship (*sic*) and the other to be returned to the Landholder himself or to his Mokhtar in attendance.

The Landholder should then be required to grant leases corresponding with the statement approved of by the Collector and upon these being duly attested by the Collector they should be declared perpetual to the individual or individuals concerned and their heirs or assignees after a counterpart contract has been entered upon by that party.

In case the Ryot should announce to the Collector his refusal to hold the land at the rate specified, the Zumeendar pursuant to the treatment of Government towatds the Landholders in 1793, may either reserve to himself the management of that portion of land or farm it out to another individual in the same manner as he has the power to act with regard to waste lands.

In examining the statement produced by the Zumeendar —should doubts arise in a particular [6] case as to the exact amount of rent or concerning the names of cultivators, the Collector should call upon the Zumeender to produce the written contract previously executed by the Ryot as well as upon the Ryot to lay before the Collector the Putta & the receipt granted him by the Zumeendar and he should decide on those points according to that document.

As to measurement, the rule observed within the jurisdiction of Calcutta may be extended through all the Company's territories, that is, each portion of land occupied by a particuar individual or individuals should be considered consisting of such quantity as is mentioned in the Putta with its specific boundaries.—No power should be given to the Landholders which can enable them to harrass and intimidate the Ryots with proclamation of fresh measurement.

About two years ago an energitic Judge & Magistrate within 25 miles of the Presidency met with [7] partial success in a measure similar to that proposed, Through his personal vigilance this judicial officer discovered the constant extortion imposed on the Ryots by their Landholders and from a sense of humanity was induced to affix his seal to every Putta or written lease presented before him by a Ryot as granted by his Zumeendar—a conduct which though not precisely prescribed in the Regulation of Government, has deterred the Zumeendar under his jurisdiction from practising further extortion.

Every Zumeendar should be strictly prohibited under

penalty of fine and confinement, from demanding of the Ryots, under the name of Ubwabs or subcriptions or for granting permission for the performance of marriages or any other religious ceremony, any payment beyond what is specified in their Puttas a practice which is very general in the eastern parts of Bengal, in the estates near Tumlook and Hidglee, and in the district of Rungpore etc.

[8] To expedite the preparation of the statement and leases already proposed it is suggested that the Zumeendars should be publicly informed that in case of failure on their part in rendering the statement and the leases required within six months from the date of the promulgation of the orders of Government, no complaint for the recovery of arrears of revenue alleged to be due from Ryots shall be recognised in any judicial court.

If Government be not prepared to bestow on this class of its subjects the security above proposed, the least which common justice requires of the ruling power would be, that the Collector of land revenue should be directed to ascertain, if possible, from his own records the different rates attached to the soils of different descriptions in every village, or in case no document showing the rates of a particular [9] particular (*sic*) village, to prepare a statement of the rates to be observed from reference to the rates of the immediately neighbouring villages. The Collector should also be directed to furnish the Judge and the Magistrates of the District with copies of those rates that the decision in civil cases as far as matters of rent are concerned may be founded on those statements. The

Magistrates at the same time should be directed to exert themselves in preventing the least infringement of the rates thus fixed and publicly registered. This measure bowever would obviously be far less efficient than that first proposed; for, while it served as some security against extortion to the indolent Ryot, it would deprive the more active and intelligent of the strongest inducement to improve his land and adopt it for the cultivation of produce of a superior description to that now actually raised.

দলিলের শেষ পৃষ্ঠার পশ্চাৎভাগে লিখিত :

Rammohun Roy

Ryut. Regns.

5 Dec.

(Manuscript old Welbeck numbar 1869)

৩

হোরেস হেম্যান উইলসন ও অন্যান্যদের নিকট লিখিত রামমোহন রায়ের কয়েকখানি ও রামমোহন-সংক্রান্ত একখানি পত্র

১. উইলসনকে লিখিত পত্র ঃ

হোরেস হেম্যান উইলসনকে লিখিত ছু'খানি পত্র আমি লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে রক্ষিত উইলসনের কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজে পাই। উইলসনের পৌত্র আর্থার এইচ. উইলসনের সংগ্রহে আদৌ পত্র ছু'টি ছিল। তিনি তাঁর কাছে রক্ষিত তাঁর পিতামহের কাগজপত্রের সমস্ত সংগ্রহ ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে দান করে যান এবং সেই সঙ্গে এগুলিও সেখানে স্থান পায়। এই পত্র ছু'খানির কথা প্রথম শুনেছিলাম স্বর্গত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি ছাত্রাবস্থায় ইংলণ্ডে অবস্থানকালে আর্থাব উইলসনের ভবনে উইলসনকে লিখিত তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় ভারতীয়গণের পত্রাবলীর মধ্যে এগুলি দেখেছিলেন। ছুটি পত্র এখানে মুদ্রিত হল। পত্রগুলির বিষয়বস্তুর আলোচনা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায় পৃ: ২৪৩-৪৫। এগুলি সম্পর্কে আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি (দ্রষ্টব্য 'Rammohun Roy and Horace Hayman Wilson' *Bengal Past and Present* Vol XCII, Part II (July-December 1973, pp. 125-47)। কাগজের জীর্ণতাহেতু কালি বসে গিয়ে প্রথম পত্রখানিতে রামমোহনের স্বাক্ষর পড়া যায় না, কিন্তু এটি যে রামমোহন লিখিত সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কেননা প্রথম পত্রের প্রসঙ্গই দ্বিতীয় পত্রে বিস্তার করা হয়েছে। দ্বিতীয় পত্রখানির স্বাক্ষর খুবই পরিষ্কার। তা ছাড়া ছু'খানি পত্রের পশ্চাতেই রামমোহনের নাম লেখা আছে। পত্রের বিষয়বস্তু শংকরাচার্যের কাল।

TEXT

My Dear Sir,

As I am in sanguine expectation of procuring during the present week the loan of an anthenticated work denoting the series of Sunkur's successors which may settle the question respecting his age beyond every doubt and as you are not in urgent haste about the subject I think it prudent to postpone the benefit of your company until monday next, when I have every reason to hope that we may come to a final determination.

Allow me to refer you to line fifteen page 185 of the Sunkur-Bhashya where you may find the word *Jainu* itself and also to line 9 page 184 which contains the word *Arhutu* synonymous to *Jainu.*

The work Muhavakya does not appear to be a modern one but I have not yet been able to ascertain its age. I will however bring the book with me on Monday ; in the mean-time I remain.

Aug. 9th 1819

Yours sincerely

(স্বাক্ষর অস্পষ্ট, প্রায় বিলুপ্ত)

(পশ্চাতে লিখিত)

Doctor H. H. Wilson Balloogunge

Rammohun Roy

Aug. 1819

II

My Dear Sir,

In ascertaining the age of Sunkuracharyu it now remains for us to fill up the time from him to Chuitunya with the spiritual generations from the former down to the latter or to find out the exact age of Baikoonth Poori the author of the accompanying Dvadushu-Muhavakyu. Baikoonth not being so celebrated as Chaitunya I have not yet been able to discover his age and altho I have after a long research procured a list of the spiritual progenitors of Keshuva Bharuthi the teacher of Chaitunya in his Sanyus order up to Sunkur and from him back to *Nurayun* and another stating the name of Madhuvendru Poori who is supposed by the Vaishnuvas of Bengal to have instructed Chaitunya in Vishnoo doctrines before he received the order of Sanyus, with the names of his (Madhuvendru's) spiritual fathers up to Madhuv and from him to *Nurayun* ; but the contradiction between these two series is so obvious and irreconcilable that I felt ashamed to send them to you as the former bears the names of 39 generations from Chaitunya to Vishnoo and the latter only of twenty. With a view to correct this inconsistency I wrote about a month ago to an aquaintance of mine at Benares on the subject who has I believe a correct list of Sunkur's generations to the present time (they as far as my recollection extends are thirty and odd in number) but I have not as yet received an answer from him. I therefore venture to send you those lists as matters of curiosity and not as affording information to be relied

upon—I am at the same time really sorry that in return from the advantages which I daily derive from your most valuable Sungscrit Dictionary and for the friendly attention which you have so often shown me, I have not been able to render you the trifling service you required of me in this instance.

I remain,
Yours very sincerely
(Sd.) Rammohun Roy

Sept. 29th 1819

(পশ্চাতে লিখিত)
Doctor H. H. Wilson
Baloogunge
Rammohun Roy
Sept. 1819

২. সার গ্রেভ্স চ্যাম্প্নে হটনকে লিখিত রামমোহনের পত্র :

প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ হটনকে লিখিত রামমোহনের ২৭ আগস্ট ১৮৩৩ তারিখের এই পত্রখানি আমি স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করেছি। হটনের পরিচয় সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায় পৃ: ২৫৩-৫৪ দ্রষ্টব্য।

TEXT

48, Bedford Sq.
August 27, 1833
10 P. M.

My dear Friend,

Not having received an answer to my letter or any other communication from Lord Munster I feel reluctance to

intrude again ; But as Lord Munster is a literary character possessed of a considerable knowledge of the East, I shall feel obliged if you will kindly present to him on your behalf the accompanying tract treating of the creed of ancient Brahmans—I am incessantly engaged in making preparations for my journey to Bristol on Thrusday 7 o'clock A. M ; I am afraid I shall not be able to bid you farewell in person. I therefore conclude this with my best wishes for your health happiness and every success in life and remain

Yours most obediently
(Sd.) Rammohun Roy

P. S. Pray present my Regards to your Brother when you see him. RR.

I am sorry to say that my health has been indifferent & consequently I cannot leave town until to-morrow.—

Sir Graves Chamney (sic.) Haughton

৩. লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে মণ্টস্টুয়ার্ট এলফিন্‌স্টোন-সংগ্রহে রক্ষিত রামমোহনের ও রামমোহন-সংক্রান্ত দু'খানি পত্র ঃ

এই পত্র দু'খানি আমি উপরিউক্ত সংগ্রহ থেকে আবিষ্কার করি। প্রথম পত্রখানির তারিখ ১৯ মে ১৮৩৩। এটি কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে লেখা ; মনে হয় এতে এলফিন্‌স্টোনের প্রসঙ্গ থাকায় পত্রপ্রাপক এই পত্র এলফিন্‌স্টোনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং এইভাবে এখানি এলফিন্‌স্টোনের কাগজপত্রের মধ্যে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় পত্র জনৈক জে. স্ট্যাচি কর্তৃক এলফিন্‌স্টোনকে লিখিত। এর তারিখ ১২ অক্টোবর ১৮৩৩ ; চিঠিতে মাত্র ১২ অক্টোবর তারিখ উল্লিখিত, খামের উপর পোস্ট্ অফিসের ছাপ থেকে বৎসরটি (১৮৩৩)

জানতে পারা যায়। রামমোহনের মৃত্যুর অনতিপরে লিখিত এই পত্রে রামমোহনপ্রসঙ্গ অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে (পৃঃ ২৫২) প্রসঙ্গত রামমোহনের সঙ্গে এলফিন্‌স্টোনের যোগাযোগের উল্লেখ করা হয়েছে। পত্র দু'খানি প্রমাণ করে এঁরা পরস্পরকে ভালোভাবেই জানতেন।

TEXT

I

May 19th 1833

My dear Friend,

After I have assigned my reasons for preserving silence on particular topics concerned with the tempory politichs (sic) of the day, I observed that the Honble Mr. Elphinstone had left the party before my conversation with Mr. J. Mill & others on the same subject. Should an opportunity occur, therefore, you will oblige me by repeating to that philanthropist the grounds I then assigned for my reserve :— In justice to my own conscience & feelings I cannot express approbation of the Irish co-ercion bill & its authors & supporters. At the same time for consistency's sake I feel reluctant to speak ill of those whom I warmly praised for 16 months ; that Gentleman may judge how far that silence is proper.—

I was very poorly yesterday having undergone great fatigue on Saturday so soon after my recovery from Influenza, as the unsteadiness of my hand will indicate. I remain

Yours very sincerely
(Sd.) Rammohun Roy

II

Clifton Octr. 12th

My dear Mr. Elphinstone,

I am sure you will be glad to know that I have obtained a promise of the appointt. [appointment] I was seeking for my third son. Mr.⋯⋯has been so good as to say that he will give me the cadetship & also if I wish it place my son's name on his list of nominees for a Writership at a subsequent period.

As my fourth son is only fourteen, I may now I think allow my friends a little repose whilst I consider what my next suit is to be. My boy William possesses I really believe brilliant talents, but of a different description from those of his elder brothers—He has a great turn for languages and is most persevering in his application to his studies as well as quite in the acquisition of knowledge so that I trust he is to excel. All my sons appear disposed to be very steady as well as studious, which is as you may suppoae a great comfort to me.

We have been greatly concerned in this part of the country, by the death of Rammohun Roy. I had been anticipating the pleasute of meeting him at Sutton Court (?) when the melancholy news of his illness and its fatal termination reached me. Within the last few days I have seen the Hindoo servant who accompanied him in his last moments. He informed me that his master had for sometime suffered from considerable depression of spirit and had expressed his desire to die.

He did not think he had been well used by the East

India Company, and this cicumstance in addition to the failure of Mackintosh's house affected him deeply. The servant appears a pleasing intelligent person. He is most anxious to get a Circar's situation upon his return to Calcutta and will he thankful for any one who wlll assist him to procure such a place—Sir Henry says that he has no friends in Calcutta likely to be useful to him but I am in hopes that we may be able to get some person having acquaintance there to give him the aid he requires. It seems that Ram Rutte(n) was for sixteen years in the service of Ram Mohun Roy and like his master has rejected the superstitions in which he was born. As I was an enthusiastic admirer of the Hindoo reformer I am anxiously hoping that the Directors or the King's ministers will perceive the propriety of doing honor to his memory in some way or other. The Unitarians have been most anxious that he should be buried in one of their Chapels. The desire has been overruled and he is interred in the garden of the house where he died. In my humble opinion a place of greater publicity should have been assigned to so great a man—I still hope that something will be done expressive of the esteem of the English for the illustrious deceased. I direct my letter to Tunbridge Wells, but conclude that you are probably in Scotland by this time.

Believe me
Yours most truly
(Sd.) J. Strachey

খামের উপর ডাকঘরের ছাপ
16th Oct. 1833

৪

জবাব্‌-ই-তুহ্‌ফাৎ-উল্‌ মুও্‌হাহিদিন্‌

রামমোহন রায় সর্বসমেত আরবী-ফার্সী ভাষায় কয়খানি পুস্তক রচনা করেছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ এখনও সম্পূর্ণ একমত হতে পারেন নি। আরবী ভূমিকাযুক্ত ফার্সী পুস্তিকা 'তুহ্‌ফাত-উল্‌-মুও্‌হাহিদিন্‌'খানির যে তিনি প্রণেতা এ তথ্য অবশ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ঐ পুস্তিকায় 'মনাজারাৎ-উল্‌-আদিয়ান্‌' শীর্ষক রামমোহনের অপর যে গ্রন্থের নাম আছে তা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সে-প্রশ্ন বিতর্কিত। অপর পক্ষে রামমোহন তাঁর *An Appeal to the Christion Public* (১৮২০)-এর ভূমিকার বলেছেন, তাঁর জীবনের প্রারম্ভে (at a very ealy period of his life) তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধ সমালোচনা করে আরবী ও ফার্সী ভাষায় এক পুস্তক রচনা করেন। 'তুহ্‌ফাৎ'-এর রচনাকাল সাধারণত ১৮০৩-০৪ বলে ধরা হয়; তখন রামমোহনের বয়স ৩০।৩২ বৎসর। এই বয়সকে নিশ্চয় at a very early periol of his life বলে বর্ণনা করা চলে না। সুতরাং এই প্রসঙ্গে এমন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক *An Appeal to the Christian Public*-এর ভূমিকায় উল্লিখিত আরবী-ফার্সী গ্রন্থখানি কি 'তুহ্‌ফাৎ' না স্বতন্ত্র কোনও গ্রন্থ? লক্ষ্য করবার বিষয় 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুও্‌হাহিদিন্‌'-এ সাধারণ ভাবে সকল ধর্মমতের অন্তর্গত কুসংস্কার ও পুরোহিততন্ত্রের সমালোচনা স্থান পেয়েছে—কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের নয়; অথচ *An Appeal*-এর ভূমিকায় বর্ণিত পুস্তকখানি বিশেষভাবে হিন্দু প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধ সমালোচনামূলক বলে উক্ত। এই সমস্যার পূর্ণ সমাধানের জন্য আমাদের ভবিষ্যতে নূতন উপাদান আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রামমোহনেব নামের সঙ্গে জড়িত আর একখানি ফার্সী পুস্তিকার কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। রামমোহনের রচনাবলী প্রসঙ্গে পুস্তিকাখানি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হলেও—'তত্ত্বকৌমুদী' শ্রাবণ ১৩৭৬ সংখ্যায় বর্তমান লেখকের নিবন্ধ প্রকাশের পূর্বে এর কোনও আলোচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় এই রচনার প্রথম অংশ প্রকাশিত হওয়ার পরে অবশ্য অধ্যাপক

মেহ্রার্ আলি লস্কর এ-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার বিস্তারিত উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে যথাস্থানে করা হয়েছে।

লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে 'জবাব্-ই-তুহ্ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্' নামক একখানি লেখকের স্বাক্ষরহীন ক্ষুদ্র মুদ্রিত ফার্সী পুস্তিকা আছে। এই গ্রন্থাগারের ফার্সী পুস্তিকার তালিকায় এটিকে রামমোহন রায়ের রচনা বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে ও এর বিষয়বস্তু বর্ণনায় বলা হয়েছে: 'an anonymous defence of Rammohun Roy's Tuhfat-ul Muwahhidin··· against attacks of Zoroastrians'। বইখানি কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যদিও এতে প্রকাশকালের স্পষ্ট উল্লেখ নেই, তবু Catalogue-এ আনুমানিক প্রকাশ-বৎসর ধরা হয়েছে ১৮২০ (দ্রষ্টব্য E. Edwards *A Catalagne of Persian Printed Books in the British Museun* London 1922, p. 623)। এড্ওয়ার্ড্সের 'ক্যাটালগ্'-এ উল্লেখের পর উক্ত গ্রন্থটিকে দ্বিতীয় বার উল্লিখিত হতে দেখি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীঅমল হোম সংকলিত Rammohun Roy—the Man and his Work (Centenary Publicity Booklet No 1, June 1933) শীর্ষক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত রামমোহন-গ্রন্থতালিকায় (দ্রষ্টব্য উক্ত পুস্তক পৃঃ ১৪৭)। অবশ্য শ্রীযুক্ত হোমকে এর সন্ধান দিয়েছিলেন শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় প্রকাশিত 'রামমোহন রায়' গ্রন্থে (পঞ্চম সংস্করণ পৃঃ ৮৭ পাদটীকা) এই পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন এড্ওয়ার্ড্সের 'ক্যাটালগ্' থেকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এড্ওয়ার্ড্সের নাম করেন নি। পুস্তিকাখানি কলেটকৃত ইংরেজি রামমোহন জীবনীর সর্বশেষ সংস্করণেও উল্লিখিত (দ্রষ্টব্য Collet pp. 36, 525)। এই সংস্করণ (১৯৬২) প্রকাশিত হবার পর বর্তমান লেখক কৌতূহলী হয়ে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও মিউজিয়ম্-কর্তৃপক্ষ অশেষ সৌজন্য সহকারে ঐ বৎসরই পুস্তিকাখানির মাইক্রোফিল্ম্ সংস্করণ তাঁকে পাঠান। দিল্লীস্থ ন্যাশনাল্ ফিজিক্যাল্ ল্যাবরেটরী কর্তৃক আলোক-চিত্রিত হয়ে এটি মাইক্রোফিল্ম্ সংস্করণ সহ বর্তমান লেখকের হস্তগত হয়।

পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র; এর আকার ৬″×৯′; মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-১৬;

স্বতন্ত্র আখ্যাপত্র নেই। প্রথম পৃষ্ঠার উপরের প্রান্তে ইংরেজিতে লিখিত (সম্ভবত) গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তির ক্রমসংখ্যা E 1619 ও তার পরে 'k Rama Mohana Raya'। এড্‌ওয়ার্ড্‌সের তালিকায় এর পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হয়েছে ষোল (pp. 16)। কিন্তু মাইক্রোফিল্ম্‌ সংস্করণটি বার বার পরীক্ষা করে বর্তমান লেখকের ধারণা হয়েছে পুস্তিকাখানির মুদ্রণের মধ্যে কিছু রহস্য-আছে। গুণ্‌তিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা ষোল নয় আঠার। প্রথম ষোলখানি পৃষ্ঠা অতি পরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত এবং এই পর্যন্তই পাঠোদ্ধার করা যায়। তার পরে একখানি পাতা সম্পূর্ণ সাদা (blank); এর পরেও একখানি পৃষ্ঠা আছে যেটিতে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্নভাবে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি সম্ভবত মুদ্রিত (?) হয়েছিল যার পাঠোদ্ধার করা একরকম অসম্ভব। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারের তালিকাকার পুস্তিকাটিকে ষোল পৃষ্ঠার বলে বর্ণনা করলেন কেন? শেষ দুখানি পৃষ্ঠা কি তাঁরা লক্ষ্য করেননি, অথবা এগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব নয় বলে বাদ দিয়েছেন?

স্বর্গত ডঃ যতীন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে দিল্লীর এক বিদগ্ধ মুসলমান বন্ধুকৃত পুস্তিকাখানির একটি হস্তলিখিত ইংরেজি অনুবাদ আমার পাবার সৌভাগ্য হয়। মূল ফার্সী থেকে যত্নসহকারে করা এই ইংরেজি অনুবাদখানির একটি বাঙ্‌লা অনুবাদ আমি প্রস্তুত করি যেটি 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল (১-১৬ শ্রাবণ, ১৩৭৬ পৃঃ ৮১-৮৪; ১-১৬ ভাদ্র, ১৩৭৬, পৃঃ ১০৬-০৯, ১-১৬ আশ্বিন, ১৩৭৬, পৃঃ ১২১-২৯)। ঐ অনুবাদের ভূমিকাস্বরূপ আমি সেখানে পুস্তিকাখানি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম ও অনুবাদে কিছু টীকা-টিপ্পনীও যোগ করেছিলাম। আমার প্রবন্ধ প্রেসে যাবার পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কলিকাতায় ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের (All India Oriental Conference) অধিবেশনে শিলচর জি. সি. কলেজের অধ্যাপক মেহ্‌রাব্‌ আলি লস্কর এই পুস্তিকাখানি সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় আমার উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিন তিনি পুস্তিকাখানির সম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করেছিলেন। এই উদ্যমের জন্য অধ্যাপক লস্কর সমগ্র পণ্ডিতসমাজের, বিশেষত রামমোহন-বিশেষজ্ঞগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, স্বতন্ত্র ও পরস্পরের

অজানিতভাবে আমরা দুই পক্ষই একই ঐতিহাসিক উপকরণের অনুসন্ধান ও অনুশীলন করেছি। সময় হিসাবে আমি কিঞ্চিৎ পূর্বগামী হলেও অধ্যাপক লস্করের অনুশীলন ও অনুবাদ (যা তিনি উক্ত সভায় পাঠ করেছিলেন) যথেষ্ট মূল্যবান এবং তা পুনবার ও অধিবেশনে তৎসংক্রান্ত আলোচনায় যোগদানের সুযোগ পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছিলাম। আমার পূর্ববর্তী প্রচেষ্টার বিষয় না জানাতে অধ্যাপক লস্কর সে-প্রসঙ্গ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন নি, এতে তাঁর কোন সদাচারভঙ্গজনিত ত্রুটি হয় নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাতে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমি পুস্তিকাখানি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সম্বন্ধে যা বলেছিলাম তার সারমর্ম এখানে নিবেদন করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনের বিভিন্ন শাখায় পঠিত প্রবন্ধগুলির যে সারসংকলন মুদ্রিত হয়ে বিতরিত হয়েছিল তাতে অধ্যাপক লস্করের প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসারও স্থান পেয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে. এর পূর্বে (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় প্রকাশিত) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়' গ্রন্থেই একমাত্র আলোচ্য ফার্সী পুস্তিকাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই উক্তি সত্য নয়। পূর্বেই বলেছি 'ক্যাটালগ্' প্রণেতা এড্ওয়ার্ড্স (১৯২২), স্বর্গত অমল হোম (১৯৩৩), কলেটকৃত ইংরেজি রামমোহন-জীবনীর সম্পাদকদ্বয় (১৯৬২) সকলেই এটির বিষয় জানতেন ও উল্লেখ করে গেছেন। দ্বিতীয়ত একথা স্বীকার্য, এর পূর্বে যাঁরাই এই পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সকলেই ধরে নিয়েছেন এটি রামমোহন রায়ের রচনা হওয়াই সম্ভব। এই ধারণার জন্মদাতা অবশ্যই ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারের ফার্সী পুস্তকের তালিকা প্রণেতা এড্ওয়ার্ড্স। তাঁর তালিকাতে রামমোহন রচিত 'তুহ্ফাৎ'-এর সঙ্গে এটিকে একসঙ্গেই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে ও রামমোহন রচিত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা উচিত পাণ্ডুলিপির আখ্যাপত্রে রামমোহনের যে নাম লিখিত—তা তাঁর স্বাক্ষর নয়। তাঁর স্বাক্ষর সুপরিচিত এবং ইংরেজিতে তিনি নিজ নাম সর্বদা বানান করতেন Rammohun Roy। সংস্কৃত উচ্চারণানুসারী Rama Mohana Raya খুব সম্ভবত পরবর্তীকালে কোনও গ্রন্থাগার-কর্মচারীর সংযোজন যিনি গ্রন্থটিকে রাম-মোহনের রচনা বলেই ধারণা করেছিলেন। এ কাজ তালিকাকার এড্ওয়ার্ড্সের

হওয়াও বিচিত্র নয়। রামমোহন গ্রন্থকার হিসাবে নাম না দিয়ে, ছদ্ম নামে বা অপরের নামে নিজরচনা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত ছিলেন বলেই সম্ভবত লেখকের নাম না থাকা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে আলোচ্য পুস্তিকাটিকে রামমোহনের রচনা বলে ধরে নিতে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ইতস্ততঃ করেন নি। এড্‌ওয়ার্ড্‌সের পরে অন্য যে সব ক্ষেত্রে পুস্তিকাটি সম্পর্কে মন্তব্য আছে—সর্বত্র এটি রামমোহনের রচনা বলেই অনুমিত হয়েছে। কলেটের গ্রন্থ সম্পাদনকালে বর্তমান লেখকেরও এই রকম ধারণা ছিল। অধ্যাপক লস্করের আলোচনা শুনে মনে হল তিনিও অনুরূপ সিদ্ধান্তেই এসেছেন। কিন্তু পুস্তিকার বিষয়বস্তু খুঁটিয়ে বিচার করে এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে—এটির লেখক রামমোহন হতে পারেন না। এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেওয়া যেতে পারে: (১) পুস্তিকাখানির একটিমাত্র যে খণ্ড এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে সেটি স্পষ্টত অসম্পূর্ণ। শেষ দুখানি পৃষ্ঠার একখানি সাদা অপরখানিতে কয়েকটি অস্পষ্ট চিহ্নের অধিক কিছু নেই। প্রথম ষোলখানি মুদ্রিত পৃষ্ঠার পর বিষয়বস্তু আর সম্প্রসারিত হয়েছিল কিনা জানবার উপায় নেই। বর্তমান সংস্করণে যে-টুকু পাওয়া যায় তা একটি বাক্য বা sentence এর মাঝামাঝি এসে শেষ হয়ে গিয়েছে। এমন খণ্ডিত অবস্থায় কোনো পুস্তক মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হওয়াটা নিঃসন্দেহে অতি অদ্ভুত ব্যাপার। অন্তত এটির প্রণেতা যদি রামমোহন হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর দ্বারা একখানি পুস্তক অসম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হবে এমন সিদ্ধান্ত কিছুতেই করা চলে না। এই ধরণের খাপছাড়া কাজ রামমোহনের সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাঁর প্রকাশিত অসংখ্য গ্রন্থ-পুস্তিকা-প্রবন্ধের মধ্যে এযাবৎ কোনখানিই অসম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়নি। তা-ছাড়া এই পুস্তিকার প্রকাশকাল যদি ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থতালিকায় প্রদত্ত অনুমান অনুযায়ী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ হয়—তাহলে দেখা যাবে সেই বৎসর রামমোহনের বাঙ্‌লা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজি মিলিয়ে অন্ততপক্ষে আটখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যথা (১) কবিতাকারের সহিত বিচার; (২) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার; (৩) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (হিন্দী সংস্করণ); (৪) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (সংস্কৃত সংস্করণ); (৫) An Apology for the putsuit of final Beatitude independently of Brahmani-

cal Observances ('সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার'-এর ইংরেজি সংস্করণ) ; (৬) A Second Conference between an Advocate for and an Opponent of the practice of Burning Widows Alive ; (৭) The Precepts of Jesus ; (৮) An Appeal to the Christian Public। এগুলির প্রত্যেকখানি অতি যত্নসহকারে লিখিত ও সম্পূর্ণাকারে মুদ্রিত। সুতরাং ঐ একই বৎসরে প্রকাশিত ফার্সী ভাষায় একখানি গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবহেলার সহিত তিনি মুদ্রণ করবেন এমন কথা ভাবা যায় না ; (২) আলোচ্য পুস্তিকাখানির বিষয়বস্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বিতর্ক বা controversy। এটি পাঠ করলে বোঝা যায় রামমোহনের 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্' প্রকাশিত হবার পর জরথুষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তার এক সুতীব্র সমালোচনা—হয় গ্রন্থাকারে না হয় কোনও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাকারে—প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচ্য পুস্তিকার লেখক তার উত্তর দিয়েছেন ও স্বীয় বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মাঝে মাঝে প্রতিপক্ষের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। বিতর্ক ইত্যাদি উপলক্ষে বিনয় প্রকাশ রামমোহনের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তুহ্ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্ গ্রন্থে অন্ততঃ দুই স্থানে তিনি নিজেকে "I, the humblest creature of God···" (ইংরেজি অনুবাদ, পৃঃ ১৮) ও 'this humble creatur of God (তদেব, পৃ: ২৫) বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমান পুস্তিকাটির আরম্ভেই লেখক মুখবন্ধস্বরূপ যা বলছেন তার ইংরেজি অনুবাদ এই : "The author of Tuhfat-ul Muwahhidin, may the exalted God grant him peace and safety, having perused that nonsense··· thought it sufficient to say in retort : Every vessel gives out what it contains (Arabic proverb as translated). Yet, the love of unitarianism and regard for the venerated personality (author of Tuhfat-ul-Muwahhidin) inspired this humble being (author of this tract) to remedy the contempt caused by the Zoroastrians···" ইত্যাদি। ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, কটুকাটব্যপূর্ণ এই সমালোচনাটি রামমোহন তাচ্ছিল্য সহকারে উপেক্ষা করেছিলেন সম্ভবত ঐ আরবী প্রবাদ বাক্যটি উচ্চারণ করে—যার মর্ম

'অযোগ্যের নিকট উচ্চ প্রত্যাশা নিরর্থক।' কিন্তু আলোচ্য পুস্তিকার লেখক নিজেকে দীন, অকিঞ্চিৎকর বলে বর্ণনা করেছেন ও 'তুহ্‌ফাৎ' প্রণেতাকে অর্থাৎ রামমোহনকে নিজের থেকে স্বতন্ত্র এক বিরাট ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলে গণ্য করেছেন। একথাও তিনি গোপন রাখেননি যে তুহ্‌ফাৎ'-এর গ্রন্থকারের ন্যায় সম্মানার্হ ব্যক্তির মর্যাদারক্ষা তাঁর এই পুস্তিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য। তা ছাড়া এর পরেই 'তুহ্‌ফাৎ'-এর গ্রন্থকারের উল্লেখ করে লেখক বলেছেন 'May the exalted God grant him peace and safety'। রামমোহন স্বয়ং লেখক হলে নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় আশীর্বচন উচ্চারণ করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হত না। এর থেকেও নিশ্চিন্ত ভাবে অনুমান করা চলে 'জবাব্‌-ই-তুহ্‌ফাৎ-উল-মুও্‌হাহিদিন্‌'-এর লেখক রামমোহন নন,—রামমোহনের কোন অনুরাগী ভক্ত। এই পুস্তিকার অন্যত্র দেখা যায় লেখক অনুরূপভাবে 'তুহ্‌ফাৎ'-এর রচয়িতা (রামমোহন রায়)-কে অসামান্য শ্রদ্ধেয় মনীষী অভিধা দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষগণকে তীব্র তিরস্কার করেছেন। এক্ষেত্রেও রামমোহন যে লেখকের থেকে স্বতন্ত্র এক তৃতীয় ব্যক্তি এমন ইঙ্গিত গোপন থাকে নি: "As regards the accusation of deceit, blind-heartedness and unbelief about the reverend person (the author) who has in fact been engaged for so many years in removing those very evils, cannot be thought of except for the reason of being prejudiced and on account of stupidity (of the party against him)"; (৩) এ সম্পর্কে আরও বক্তব্য, আলোচ্য পুস্তিকাখানি আরম্ভ হয়েছে 'বিস্‌মিল্লা রহমানর্‌রহিম্‌' এই পবিত্র মাঙ্গলিক উচ্চারণ করে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণই কোন কার্যের (যেমন গ্রন্থরচনার) প্রারম্ভে এই মাঙ্গলিক সর্বদা উচ্চারণ করে থাকেন—যার অর্থ 'করুণাময় কৃপার আধার পরমেশ্বরের নামে।' এর থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে লেখক মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান রামমোহনের পক্ষেও এ উদার মাঙ্গলিক বাক্য উচ্চারণ করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, 'তুহ্‌ফাৎ' রচনাকলে তিনি এই প্রথা অবলম্বন করেন নি। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রতি

গভীর শ্রদ্ধার জন্য রামমোহন মুসলমান বিদগ্ধসমাজের উদারপন্থী অংশের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। সুতরাং তাঁর কোন মুসলমান বন্ধু ও অনুরাগী যে অগ্রণী হয়ে তাঁর উপর আক্রমণের প্রতিবাদ করবেন এর মধ্যে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিছু নেই, বরং বর্তমান ক্ষেত্রে তাই সম্ভবপর বলে মনে হয়; (৩) তা ছাড়া জরথুষ্ট্রীয় প্রতিপক্ষগণের কটুকাটব্যের উত্তর এই পুস্তিকায় যে উগ্র ও আশালীন ভাষায় দেওয়া হয়েছে তা রামমোহনের স্বভাবসম্মত নয়। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে: (১) জরথুষ্ট্রীয় সম্প্রদার সম্পর্কে বলা হয়েছে তাঁরা 'তুহ্‌ফাৎ'-এর প্রতিবাদ করেছেন 'because of their excessive indulgence in filthy polytheism and great inclination towards defiled beliefs'; (২) জরথুষ্ট্রীয় প্রতিপক্ষগণকে বর্ণনা করা হয়েছে এই ভাষায়: 'Those embodiments of total ignorance, and the worshippers of God having a body like that of a beast…'; (৩) অন্যত্র এই জরথুষ্ট্রীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে উক্তি: '… I would like to say that because of being exccedingly ignorant and absolutely inexperienced there is no difference between these unbelievers and animals.'; ইত্যাদি। এই জাতীয় অসহিষ্ণুতা ও নিম্নরুচির নিদর্শন পুস্তিকাখানির আরও অনেক স্থলে দেখতে পাওয়া যায়। এতখানি উগ্রতা যে রামমোহনের লেখনীপ্রসূত হতে পারে না তা এই রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে রামমোহনের অন্য যে কোনও বিচারগ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। ধর্মসংক্রান্ত বিতর্কে সংযম ও শালীনতা উভয় পক্ষেরই অবলম্বনীয় এই ছিল রামমোহনের সুচিন্তিত মত। The Brahmunical Magazine-এর তৃতীয় সংখ্যার উপসংহারে খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষের হিন্দুধর্মের উপর অসংযত ও অশালীন আক্রমণের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "As to the absusive terms made use of by the Editor, such as "Father of lies to whom it (Hindooism) evidently owes its origin," "Impure fables of his false gods", "Pretended gods of Hindoos" etc, common decency prevents me from making use of similar terms in return We must recollect that

we have engaged in solemn religious controversy and not in retorting abuse against each other"; (৪) লেখক যিনিই হন জরথুষ্ট্রীয় ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনও জ্ঞান ছিল বলে পুস্তিকা পাঠে মনে হয় না। সম্ভবত জরথুষ্ট্রীয় পুরাণের কিছু কাহিনী সম্পর্কে তাঁর অস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন ধারণা ছিল-আর সেই সঙ্গে ছিল পরধর্মের প্রতি হিংস্র বিদ্বেষ। রামমোহনের তুলনায় তাঁর মনীষা ও সংস্কৃতি যে অনেক নিম্নমানের ছিল তাঁর রচনা পড়লে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। রামমোহন যখন যে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচার করেছেন তখন সে প্রতিপক্ষের শাস্ত্র যথেষ্ট যত্ন নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে আয়ত্ত করেছেন ;—তাঁর বিচার গ্রন্থগুলিতে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আলোচ্য পুস্তিকাখানি এই নিয়মের সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম।

সুতরাং রামমোহন যে এই পুস্তিকার লেখক নন,—এ সম্পর্কে, পুস্তিকাখানির বিষয়বস্তু আলোচনা করলে এক রকম নিশ্চিত হওয়া চলে। তাহলে এর রচয়িতা কে? এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর দেবার উপায় নেই কিন্তু আমরা দু'একটি অনুমান করতে পারি। লেখক যিনিই হয়ে থাকুন, তিনি ছিলেন রামমোহনের শুধু সমসাময়িক নন, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও মনীষা সম্পর্কে অসীম শ্রদ্ধাবান। তাছাড়া ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। আরবী ও ফার্সী ভাষায় পারদর্শিতা ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য রামমোহন মুসলমান বিদগ্ধ সমাজের প্রিয় ছিলেন। যদিও তাঁর স্বাধীন বুদ্ধিদীপ্ত ধর্মালোচনা সংকীর্ণচিত্ত উলেমারা পছন্দ করেন নি এবং এজন্য তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল এমন কিংবদন্তী আছে—তবু শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমানসমাজের একাংশে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁকে দেওয়ানী চাকরীতে সুপারিশ করবার সময়ে জন ডিগ্‌বী তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সদর দেওয়ানী আদালতের কাজী-উল্-কাজ্জাৎ ও ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের মুখ্য ফার্সী মুন্‌শী প্রভৃতির অনুকূল মতামতের উল্লেখ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২২৭-২৮)। সুতরাং সমকালীন শাস্ত্রজ্ঞ ও অপেক্ষাকৃত উদারচেতা মুসলমানমণ্ডলীভুক্ত রামমোহনের কোনও বন্ধু 'তুহ্‌ফাৎ-উল্ মুওহাহিদিন্'-এর সমালোচনার জবাব দেবার জন্য এগিয়ে আসবেন—এর মধ্যে আশ্চর্য বা অসম্ভব কিছু নেই। পুস্তিকাখানির মধ্যেও যে লেখক রামমোহনের থেকে স্বতন্ত্র এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার উল্লেখ আগেই করেছি।

এ পর্যন্ত পুস্তিকাখানি রামমোহনের রচনা বলে যে ধারণা প্রচলিত ছিল উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সেটি পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়লেও কিন্তু রচনাটির বক্তব্য মূল্যহীন হয়ে যায় না। 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌ মুওহ্‌হিদিন্‌'-এর রচনাকাল ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দ ধরা হয়। এর পরে আরবী-ফার্সী ভাষায় রামমোহন আর কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। এমন কি 'তুহ্‌ফাৎ' প্রকাশের ফলে সমকালীন শিক্ষিত সমাজে বা ধর্মমণ্ডলীগুলির মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে-সম্বন্ধেও দীর্ঘকাল আমাদের সম্মুখে কোনও তথ্য ছিল না। উত্তরকালে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সমস্যার আলোচনাতেই মুখ্যত রামমোহনকে ব্যাপৃত দেখা যায়। এ সব বিষয়ে তাঁর পরবর্তী অসংখ্য রচনার ভিড়ে প্রথম জীবনের মুসলমান সংস্কৃতি ও আরবী-ফার্সী ভাষার অনুষঙ্গ লুপ্তপ্রায় মনে হত। কিন্তু আলোচ্য রচনাটি প্রমাণ করছে, এই চিত্র সম্পূর্ণ নয়: অন্ততপক্ষে এর প্রকাশকাল (১৮২০ ?) পর্যন্ত 'তুহ্‌ফাৎ'-এর ভাবধারা যথেষ্ট সজীব ছিল ও সমসাময়িক রক্ষণশীল সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে তীব্র বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছিল। কলিকাতায় পার্সী জরথুষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের যে একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী কেন্দ্র ছিল—তার নিদর্শনও এর থেকে মেলে। তাঁদের প্রতিবাদগ্রন্থটি পাওয়া না গেলেও আলোচ্য 'জবাব' থেকেই বোঝা যায় 'তুহ্‌ফাৎ'-এ ব্যাখ্যাত স্বাধীন যুক্তিবাদী ধর্মচিন্তাকে তাঁরা অতি তীব্র ভাবেই আক্রমণ করেছিলেন। অবশ্য জরথুষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশেষ করে 'তুহ্‌ফাৎ'-এর প্রতিবাদ কেন করবার প্রয়োজন হয়েছিল তা বুঝতে পারা কঠিন। কেননা 'তুহ্‌ফাৎ'-এ জরথুষ্ট্রীয় মতবাদের বিশেষ কোনও বিরুদ্ধ সমালোচনা দূরে থাক, স্বতন্ত্র উল্লেখও নেই। সাধারণ ভাবে তাতে সমস্ত প্রচলিত ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস সমূহের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। আরবী ভূমিকায় এ সম্পর্কে স্পষ্ট উক্তি আছে "....falsehood is common to all religions without distinction"। এই আক্রমণকে রামমোহন উপেক্ষা করলেও এর 'জবাব' দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন একজন মুসলমান। 'তুহ্‌ফাৎ'-এর রচয়িতা হিসাবে রামমোহন তখন পর্যন্ত মুসলমান সমাজে (একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও) কতখানি শ্রদ্ধাভাজন এই গ্রন্থ থেকে তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। দুঃখের বিষয় লেখকের নাম আমরা জানিনা,

তিনি কেন যে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশ করলেন সে কারণও আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু লেখক যিনিই হন রামমোহনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং রামমোহনের জীবনের কোনও ঘটনা সম্পর্কে তাঁর সাক্ষ্য যথেষ্ট মূল্যবান বিবেচিত হবে। 'তুহ্‌ফাৎ'-এর আরবী ভূমিকায় রামমোহন লিখেছিলেন, "I travelled in the remotest part of the world in plains as well as hilly land···" (ইংরেজি অনুবাদ)। এর প্রতিবাদে জরথুষ্ট্রীয় প্রতিপক্ষ নাকি লেখেন, তাঁরা কলিকাতার কিছু কিছু অধিবাসীর মুখে শুনেছেন যে 'তুহ্‌ফাৎ'-এর গ্রন্থকার দীর্ঘকাল যাবৎ কলিকাতাবাসী ও বাঙ্‌লাদেশের কোনও কোনও অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও তিনি ভ্রমণ করেননি। এর উত্তরে 'জবাব্‌-ই-তুহ্‌ফাৎ-উল মুও্‌হাহিদিন্‌'-এর অজানা লেখক বলেছেন: "যিনি (একক ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়) ভ্রমণ করেন তাঁর ভ্রমণের সাক্ষ্য তাঁর নিজের উক্তি ছাড়া আর কি হতে পারে? সেখানে তাঁর কথার উপর নির্ভর না করে কলিকাতার কোনও কোনও অধিবাসীর উক্তির উপর নির্ভর করার যৌক্তিকতা কোথায়? বিশেষত যখন সেই সব কলিকাতা-বাসীরা ভ্রমণকালে তাঁর সঙ্গীও ছিলেন না এবং যখন তাঁরা ধর্মবিষয়ে মতপার্থক্য হেতু তাঁর প্রতি গভীর শত্রুভাবাপন্ন! যে সকল স্থানে তিনি (রামমোহন) একাকী ভ্রমণ করেছেন সে সকল স্থানে ভ্রমণের সাক্ষ্য তাঁর নিজের উক্তি—কিন্তু তিনি যে ভুটান এবং হিন্দুস্তান (উত্তর ভারত) পরিভ্রমণ করেছিলেন স্বয়ং রাজপুরুষগণই তার সাক্ষী আছেন,—এবং তাঁদের নিকট থেকে সহজেই তার সত্যতা নির্ণয় করা যেতে পারে" (ভাবানুবাদ)। এই উক্তি রামমোহনের জীবনীকারদের পক্ষে মূল্যবান। রংপুরে অবস্থানকালে ইংরেজ সরকারের দূতরূপে রামমোহনকে যে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভুটান যেতে হয়েছিল—জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত কতগুলি প্রাচীন বাঙ্‌লা পত্রের সাহায্যে স্বর্গত ঐতিহাসিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তা প্রমাণ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য, 'প্রাচীন বাঙ্‌লা পত্র-সংকলন' সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২, পৃঃ ১৪০-৪১, ১৫২, ১৬৭-৬৯)। এই সব পত্রে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এর আগে সম্ভবত ১৮০৯ এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দেও রামমোহন কোচবিহার-ভূটান সীমান্ত পরিদর্শন করেছিলেন। 'জবাব্‌-ই তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুও্‌হাহিদিন্‌'-এর উল্লেখটিতে এই পত্রাবলীতে প্রকাশিত তথ্যের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া

যাচ্ছে। রামমোহনের মামলা-সংক্রান্ত নথিপত্র ও এলাহাবাদ কেন্দ্রীয় রেকর্ড্ অফিসে রক্ষিত বেনারস রাজস্ববিভাগের নথিপত্রের সাক্ষ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে রামমোহন ব্যবসায় ও চাকুরীর সূত্রে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান পর্যটন করেন (দ্রষ্টব্য Collet, pp. 14, 412)। আলোচ্য পুস্তিকার উক্তিতে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে একটি নূতন প্রমাণ যুক্ত হল। এই সব নানা কারণে রামমোহনের রচনা না হলেও রামমোহন বিষয়ক আলোচনাপ্রসঙ্গে পুস্তিকাখানি আমাদের মনোযোগ দাবী করতে পারে।

পুস্তিকার বঙ্গানুবাদের ভূমিকা শেষ করবার আগে আর একবার অধ্যাপক লস্করের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করছি। আমার প্রকাশিত অনুবাদটি সম্পর্কে আমার নিজের মনে প্রথম থেকে একটু দ্বিধা ছিল—কেননা তার জন্য আমাকে একজন ফার্সীবিদ্‌কৃত ইংরেজি অনুবাদের উপরই মুখ্যত নির্ভর করতে হয়েছিল। অপর পক্ষে অধ্যাপক লস্করের অনুবাদ মূল ফার্সী থেকে করা—সেটি আদ্যোপান্ত শুনে ও নিজের অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে আমার সে দ্বিধা কেটে যায় ও দিল্লী থেকে আনীত যে ইংরেজি অনুবাদটির উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়েছিল তার মূলানুগতা সম্পর্কে আমি একরকম নিশ্চিন্ত হই। অধ্যাপক লস্করের প্রামাণিক অনুবাদ মূল ও টীকা-টিপ্পনী সহ যথাশীঘ্র প্রকাশিত হলে পণ্ডিতসমাজ উপকৃত হবেন। তাঁর প্রয়াস সর্বাংশে অভিনন্দনযোগ্য।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, আমার ও অধ্যাপক লস্করের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর শ্রীঅজিতকুমার রায় 'জবাব-ই-তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুও্‌হাহিদিন্‌'-এর তৃতীয় একখানি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন (দ্রষ্টব্য, তাঁর *The Religious Ideas of Rammohun Roy* New Delhi 1976, pp. 69-91)। ভূমিকাতে তিনিও সিদ্ধান্ত করেছেন এই গ্রন্থের লেখক রামমোহন নন তাঁর কোনও অনুরাগী বন্ধু। কি কারণে জানিনা—তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে আমার ও অধ্যাপক লস্করের পূর্বকৃত বাঙ্‌লা ও ইংরেজি অনুবাদের উল্লেখও করেন নি। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই আমার যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলির আশ্চর্যরকম মিল আছে।

E 1614

Rāma mohana Raya

بسم الله الرحمن الرحیم

جمعی از علمای مجوس را که بسبب نوعی شرک متدنس
و کثرت مزاولت عقاید مجوس نفرت کلی از مفهوم توحید
و عداوت قلبی با ارباب حق میداشته است تحریک نموده
مرد و این کرده که عبارت از کاود غیره از و شنیده
جراست بر ان اغوا نمود که جواب تحفة الموحدین را که
مفهوم ادنی نکته آن از اذهان [illegible] ایشان
بفرسنگها بعید است ترتیب داده [illegible] مقتضای جهل
از علوم رسمی و آداب عرفی جز [illegible] و [illegible] و
دشنام و اجواب مسائل علمی پنداشته چند سطری [illegible]

'জবাব্‌-ই-তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওয়াহ্‌হিদিন্‌'-এর প্রথম পৃষ্ঠা।

জবাব্-ই-তুহ্ফাৎ-উল্-মুও্হাহিদিন্

(বঙ্গানুবাদ)

করুণাময় কৃপার আধার ঈশ্বরের নামে।

বহুসংখ্যক অজ্ঞানী জরথুষ্ট্রীয় মতাবলম্বী হীন বহুদেবোপাসনার প্রতি ও দূষিত ধর্মমতসমূহের প্রতি প্রবল আসক্তি ও অত্যধিক প্রবণতাবশত এবং একেশ্বরবাদেব প্রতি ঘৃণা, সত্যবিশ্বাসীগণের প্রতি বিদ্বেষ ও গো, বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতি তাঁদের নিজেদের সুপরিচিত উপাসনার বিষয়গুলির প্রতি মোহাধিক্য হেতু 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুও্হাহিদিন্' গ্রন্থের বক্তব্যের বিরুদ্ধে এক উত্তর লিখতে প্রণোদিত হয়েছেন ; যদিও এর বক্তব্যের অণুমাত্র তাদের ধর্মভ্রষ্ট জ্ঞানবুদ্ধির অতীত।[১] প্রথাগত বিদ্যা ও সাধারণ সৌজন্যের সহিত অপরিচয়বশত ও ভ্রান্ত কল্পনার দ্বারা এই জরথুষ্ট্রীয়গণ অনুমান করেছেন যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচিত প্রশ্নাদির উত্তর কটুভাষণ ও তিরস্কারের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব ; এবং (এই ধারণার বশবর্তী হয়ে) তাঁরা লজ্জাজনক, অশ্লীল উপাদানে পূর্ণ কিছু অর্থহীন রচনা প্রকাশ করেছেন ও তাতে গর্বসহকারে এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা কেবলমাত্র বর্ণপরিচয় সম্পন্ন শিশুও ব্যবহার করতে লজ্জাবোধ করবে। 'তুহ্ফাৎ-উল্ মুও্হাহিদিন্'-এর গ্রন্থকার (মহিমময় ঈশ্বর তাঁর শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করুন !)[২] জরথুষ্ট্রীয়গণের এই বিদ্রূপপূর্ণ প্রলাপোক্তি পাঠ করে উত্তরস্বরূপ মাত্র এইটুকুই বলা যথেষ্ট মনে করেছিলেন 'প্রত্যেক পাত্র তার অন্তর্নিহিত পদার্থের অধিক কিছুই প্রকাশ করতে পারে না' (আর্‌বী প্রবাদবাক্য)![৩] তবুও একেশ্বরবাদের প্রতি অনুরাগ ও 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুও্হাহিদিন্'-এর গ্রন্থকারের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমান পুস্তিকার দীন লেখক অজ্ঞান ও নাস্তিকতার প্রতিমূর্তি জরথুষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক প্রচারিত ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রতিবিধানার্থ অগ্রসর হয়েছেন।[৪] এই জন্য সুবিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট সুবিচার প্রত্যাশা করে উক্ত অযোগ্য কটুভাষিগণের উত্তরের উপযুক্ত প্রত্যুত্তরস্বরূপ (এই) কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তি রচিত হয়েছে। হায় ! একেশ্বরবাদীগণের স্বিরীকৃত নীতিসমূহের ও সত্যভিত্তিক প্রশ্নাবলীর প্রতি দৃষ্টিস্থাপন পূর্বক শ্রদ্ধেয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে পথে সুবুদ্ধি ও স্বাধীনতা সহকারে চলেন, এই দুঃসাহসী নিরীশ্বরবাদীগণ (তাঁদের)

জ্ঞানের প্রচুর ন্যূনতা সত্ত্বেও এবং দণ্ডদানে ঈশ্বরের ও তিরস্কারে জ্ঞানীগণের অবহেলা হেতু, নির্ভয়ে সেই পথে ধাবিত হতে সাহস করেছেন। কিন্তু যাঁরা নিজচিত্তের প্রচণ্ড অধোগামিতা ও মনোবৃত্তির নীচতা বশত নাস্তিকতার বিপজ্জালে জড়িয়ে পড়েছেন, সেই পাপচক্র থেকে নির্গত হবার কষ্ট আর তাঁরা স্বীকার করতে পারেন না। সম্ভবত তাঁদের অর্থহীন রচনার জন্য প্রশংসা পাবার লোভ তাঁদের এই কাজে উৎসাহিত করেছে।

এই অধঃপতিত কটুভাষকগণ প্রথম যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন তা এই : 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওহ্‌হাহিদিন্‌'-এর লেখক তাঁর পুস্তিকার ভূমিকায় আর্‌বী ভাষায় করেক পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন এবং (সেখানে) তিনি বলেছেন, তিনি পৃথিবীর বহু দূরদেশসমূহ ভ্রমণ করেছেন, ইত্যাদি; কিন্তু তাঁরা (জরথুষ্ট্রীয় সমালোচকগণ) নাকি কলিকাতার বহু অধিবাসীর নিকট শুনেছেন যে গ্রন্থকার (রামমোহন রায়) বঙ্গদেশের কয়েকটি স্থান ব্যতীত (কলিকাতা) নগরীর বাইরে কোথাও যান নি এবং বহুকাল যাবৎ কলিকাতাই তাঁর স্থায়ী বাসভূমি; সুতরাং তাঁর (রামমোহন রায়ের) উক্তি মিথ্যা, রচনা ভ্রান্ত ও ভাষা প্রমাদপূর্ণ; কথিত আছে মিথ্যাভাষীর স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ, সেই অনুসারে তিনি (রামমোহন রায়) মিথ্যাভাষণ দ্বারা তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন; এই প্রকার সূচনা থেকেই প্রতীয়মান হয় মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা অভিযোগ করা ভিন্ন তাঁর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।'

বস্তুত তথ্যের সত্যমিথ্যা জানবার চেষ্টা না করে উক্ত প্রবঞ্চকগণ (রামমোহনের দেশভ্রমণ সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ সরবরাহকারিগণ) কেবলমাত্র কর্ণগোচর কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করেছেন এবং প্রবঞ্চিত ব্যক্তি ('তুহ্‌ফাৎ'-এর জরথুষ্ট্রীয় সমালোচক) এটিকে (উক্ত অলীক কিংবদন্তীকে) সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা ও বিকৃত বিশ্বাসের স্তরে টেনে নামিয়েছেন। অধিকন্তু এই আচরণের দ্বারা তাঁরা মনুষ্যোচিত বিবেচনাগুণের পর্যন্ত অধিকারী হতে পারেন নি। নতুবা গ্রন্থকারের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর বিষয়ে তাঁরা গ্রন্থকারের নিজমুখের উক্তির বিপক্ষে কলিকাতার অন্য কয়েকজন অধিবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না; বিশেষত যে ক্ষেত্রে এটা জানা কথা যে উক্ত কলিকাতাবাসীবৃন্দের কেউই তাঁর ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন না এবং তাঁদের অনেকেই ধর্মবিশ্বাসের অনৈক্যহেতু তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন; এবং যদিচ উচ্চনীচ

সকল ব্যক্তিই জ্ঞাত আছেন যে নিজজীবনের (একান্ত ব্যক্তিগত) পরিবেশ ও ঘটনাবলী সম্পর্কে কোনও বিশেষ ব্যক্তি স্বয়ং অপর কোনও ব্যক্তি অপেক্ষা (স্বভাবত) অনেক বেশী জানেন। গ্রন্থকার অহংকারবশত বা নিজ কৃতিত্বপ্রচারের উদ্দেশ্যে নিজের দূরদেশভ্রমণের কাহিনী বিবৃত করেছেন, এটা অকল্পনীয়; কেননা সর্বদেশের গুপ্তচরগণ বা নাবিকগণ সমগ্র বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতায় অনেক সময় ব্যবসায়িগণকেও অতিক্রম করে যায়; কিন্তু কেবলমাত্র নানাদেশদর্শনের কারণেই এদের মধ্যে কেউ সম্ভ্রান্ত বা বিশ্বাসযোগ্য গণ্য হয় নি। উপরন্তু গ্রন্থকার—একেশ্বরবাদ প্রতিটি মানবহৃদয়ের মূল স্বাভাবিক বিশ্বাস,—নিজের এই উক্তি' সমর্থন করবার জন্য (দূরদেশভ্রমণবিষয়ক) অভিযুক্ত মিথ্যা বলেছেন এমন অনুমানও করা চলে না; বর্তমানে কলিকাতা নগরীতেই বিভিন্ন জাতীয় মানুষের আচার ও কর্মধারা এবং দূর পার্বত্য অঞ্চল ও দ্বীপসমূহের অধিবাসিবৃন্দের অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ এত অধিক যে (কেবলমাত্র) তাদের সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের জন্য কোনও জ্ঞানী ব্যক্তিকে জলপথে বা স্থলপথে ভ্রমণ করতে হয় না আবার এও বিচিত্র যে এই নির্বোধ কটুভাষিগণ নিজেরাই স্বীকার করছেন, গ্রন্থকার বঙ্গদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণের নিবাসস্থল অরণ্যপর্বতসংকুল বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছেন! তথাপি (নিজেদের উক্তির) বিস্মৃতি বশত (গ্রন্থকার) বিশ্বের নানা দূর দেশ ভ্রমণ করেছেন—এই উক্তি করবার জন্য গ্রন্থকারকে মিথ্যাভাষণের অপবাদ দিতে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। গ্রন্থকার যে বঙ্গদেশের বাইরে অন্তত ভুটান রাজ্য ও উত্তর ভারত (হিন্দুস্তান) পরিভ্রমণ করেছেন তা সরকারী কর্মচারিগণের নিকট থেকে ও গ্রন্থকারের বন্ধুগণের নিকট থেকে সহজেই জানা যেতে পারে; সুতরাং এর দ্বারাই উক্ত নিন্দুকগণ প্রদত্ত অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। অধিকন্তু সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে কোনও একটি উক্তির সম্মুখীন হলে সেটি স্বরূপত সত্য কি মিথ্যা তা বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেন, উক্তিকারকের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী বা গতিবিধি সম্পর্কিত সূক্ষ্ম তথ্য জানবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না।

গ্রন্থকারের আর্‌বী ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা (জরথুষ্ট্রীয়গণ) যা লিখেছেন তা এই: "'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওহ্‌হাহিদিন্‌'-এর লেখক তাঁর আর্‌বী ভূমিকার শেষাংশে বলেছেন, পরস্পরবিরোধী ধর্মসম্প্রদায়গুলির (যাঁদের প্রত্যেকটিই

নিজমতকে সত্য বলে দাবী করেন) সিদ্ধান্তসমূহকে হয় সত্য না হয় মিথ্যা— দুইয়ের একটি ভিন্ন আর কিছু বলা যাবে না। প্রথমটি (অর্থাৎ সত্য) হলে দুটি পরস্পরবিরোধী মতকে একসঙ্গে (সত্য বলে) স্বীকার করে নিতে হয়; এইভাবে তিনি ভূমিকায় শেষ পর্যন্ত বলে গিয়েছেন।[৬] এই মন্তব্য থেকে কেবলমাত্র (তুহ্ফাতের) লেখকের বোধশক্তির দুর্বলতা ও তর্কবিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রমাণিত হচ্ছে যে 'দুই পরস্পর বিরোধী মতের একত্র সম্মিলন' এই বাক্যাংশটির বিষয় তিনি কানে শুনেছেন মাত্র; প্রকৃত-পক্ষে কোন্ ক্ষেত্রে এই জাতীয় পরস্পর-বিরোধ সম্ভবপর নয় তার কোনও ধারণা তাঁর নেই। আমরা (জরথুষ্ট্রীয়গণ) বলি একই স্থানে একই আকারে দুটি পরস্পর-বিরোধী বস্তুর সম্মিলন অসম্ভব। এই অনুসারে কৃষ্ণত্ব ও শুভ্রত্ব নামক পরস্পর-বিরোধী গুণদ্বয় একই স্থানে একই আকারে অবস্থান করতে পারে না। যদি বস্তুগুলি পৃথক হয় ও তাদের সংযোগস্থান এক হলেও সংযোগ প্রণালী ভিন্ন হয় – তাহলে এই সংযোগকে পরস্পর-বিরোধী বস্তুদ্বয়ের মিশ্রণ বলা যায় না; এবং এই ভাবেই প্রত্যেক জাতির নিজ পূর্বপুরুষগণের উক্তিসমূহ একত্র তার বংশধরগণের অন্তরে সঞ্চিত আছে। অনুরূপ ভাবে ধর্মপ্রবর্তকগণের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশভিত্তিক উপদেশাবলী তাঁদের নিজ নিজ অনুবর্তিগণ এক অথচ বহুরূপে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকেন; কেননা 'আরিফ' বা সাধুগণের অন্তর নানা (আধ্যাত্মিক) উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হওয়ায় বিভিন্ন ধর্মের বিশিষ্ট তত্ত্বগুলিও তা একত্র ধারণ করতে সমর্থ; সুতরাং পূর্বপুরুষগণের উক্তিসমূহ অভ্রান্ত ও সত্য। এ-সবের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী তথ্যের সম্মিলন হয় নি।" এইখানে তাঁদের (জরথুষ্ট্রীয়গণের) প্রত্যুত্তর সমাপ্ত হয়েছে।

(পরমেশ্বর না করুন!) মনুষ্যোচিত বিচারবুদ্ধির প্রতি ও বিদ্যাচর্চার প্রতি শ্রদ্ধাবশত যাঁরা সুপরিচিত পরস্পরবিরোধী প্রশ্নসমূহের অর্থপর্যন্ত অবগত নন এবং বিভিন্ন ধর্মনায়কের মতসমূহের পরস্পর-বিরোধিত্ব অস্বীকার করেন— এমন প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিচারে জড়িত হবার প্রবৃত্তি আমাদের নেই। তবুও দোষখণ্ডনের জন্য ও অজ্ঞগণকে সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে কয়েক পঙ্‌ক্তি লেখা যাচ্ছে। জেনে রাখা কর্তব্য যে, প্রচলিত ধর্মমতসমূহের মধ্যে যে পরস্পর-বিরোধিত্ব আছে তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কারও কারও মতে ত্রিত্ববাদ[১] ঈশ্বরে অবিশ্বাসসূচক এবং যিনি এতে বিশ্বাস করেন তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। অপরপক্ষে অন্য অনেকে বলে থাকেন ত্রিত্ববাদ কখনও ঈশ্বরে অবিশ্বাসের সমার্থবাচক নয় এবং এতে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা মুক্তিলাভের অধিকারী। কেউ কেউ বলেন প্রতিমাপূজা একটি কদাচার; আবার অন্যরা সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশপূর্বক বলে থাকেন, এটি কদাচার নয়, পরন্তু এতে যথেষ্ট (আধ্যাত্মিক) উপকার লাভ হয়। এক সম্প্রদায় হয়তো কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে ধর্মপ্রবর্তকের আসন দেন—কিন্তু অন্যরা তা অস্বীকার করেন ও ঐ ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেন। এই মতগুলি কি পরস্পর-বিরোধী নয়? এই বিরোধী মতের সকলগুলিকেই কি এককালীন সত্য বলে স্বীকার করা সম্ভব? একথাও সুস্পষ্ট যে ঐ সকল পরস্পর-বিরোধী ভাবাত্মক ও ঋণাত্মক মতের প্রবর্তক ও অনুবর্তিগণ সম্পূর্ণভাবে দেশকালবোধবিবর্জিত। উক্ত মতগুলি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত, যাঁরা কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে ধর্মপ্রবর্তক বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা কখনও তাঁর মধ্যে মিথ্যা বা ভ্রান্তির লেশমাত্র আছে এমন কথা স্বীকার করবেন না। অপর পক্ষে যাঁরা ঐ ব্যক্তিকে ধর্মপ্রবক্তারূপে মেনে নিতে অস্বীকৃত এবং তাঁর অনুবর্তিগণ তাঁর যে-সকল বাণীকে প্রত্যাদিষ্ট বিবেচনা করেন সেগুলিতেই অবিশ্বাসী,—তাঁদের অস্বীকৃতি বা অবিশ্বাস কোনও এক বিশেষ অবস্থাপ্রসূত বা বিশেষ-কালে বদ্ধ নয়। এই সকল মতবিরোধের পরিণাম বহু শতাব্দী যাবৎ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার, কলহ এমন কি যুদ্ধ ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। নীচমনা কুৎসাকারিগণ নিজেরাই দুই পঙ্‌ক্তি পরে লিখেছেন, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় নিজ বিশিষ্ট বিশ্বাস ও আচার পালন করবার সময়ে অন্য সম্প্রদায়সমূহের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন। সুতরাং স্বভাবত সিদ্ধান্ত করতে হবে যে প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর ধর্মমতগুলি সম্পর্কে অসম্মানসূচক ও খণ্ডনসূচক যে সকল উক্তি করেন তা হয় সত্য না হয় অসত্য। যদি প্রথমটি স্বীকার করতে হয়—অর্থাৎ বলতে হয় প্রত্যেক সম্প্রদায়কৃত অপর সাম্প্রদায়িক মতসমূহের খণ্ডনগুলি সত্য—তাহলে প্রচলিত সমস্ত ধর্মমতই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। অপর পক্ষে যদি প্রত্যেক সম্প্রদায়কৃত খণ্ডনগুলি মিথ্যা বলে ধরে নেওয়া যায়—তাহলেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে সকল প্রচলিত ধর্মমতই মিথ্যা। অবশ্য, এই জাতীয়

স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট তর্কপদ্ধতির অস্বীকৃতি ও এইরকম পরস্পর-বিরোধী মতবাদকে সত্য বলে স্বীকৃতি দান একমাত্র তাঁদেরই কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায়—যাঁরা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অভাব হেতু প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছেন। তৃতীয়ত তাঁরা লিখেছেন : "আমরা আমাদের ধর্মোপদেশকগণের অনুবর্তি এবং ভবিষ্যদ্বক্তা ও অবতারে বিশ্বাস করি ; তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী দেবতারা মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর আকৃতি ধারণ করে থাকেন। তত্ত্বগতভাবে আমাদের চিন্তার দুটি দিক আছে। তার একটি হল 'ওয়াজ্‌দান্' (বা আধ্যাত্মিক ভাবোন্মত্ততার অবস্থা)। সুতরাং গুরুর আশীর্বাদে আমরা যখন এই আধ্যাত্মিক ভাবোন্মত্ততার স্তরে উপনীত হই, তখন প্রত্যেক ধর্মকেই তার যথাযথ স্থানে সত্য বলে মান্য করি এবং ঐরূপ করাতে কোনও পরস্পর-বিরোধী বস্তুর একত্র সম্মিলন হয় না। আমাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে একটি বিশিষ্ট ধর্মমতের অনুবর্তি হওয়াতে আমরা নিজ সাম্প্রদায়িক মতে বিশ্বাসবশত (সেই ধর্মমতের দৃষ্টি থেকে) অন্য সব ধর্মকে অস্বীকার করি। কিন্তু এতে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন কেমন করে উঠবে ? কেননা, একাধিক পক্ষপাতের বস্তুই সেখানে অনুপস্থিত।" এইখানে তাঁদের এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হয়েছে।

এই অজ্ঞতার প্রতিমূর্তিগণ,—যাঁরা পশুরূপে ঈশ্বরকে উপাসনা করতেও ইতস্ততঃ করেন না,—একথাও জানেন না যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিচার-বিতর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ আদরণীয় বস্তুর অভাব থাকলে—বাস্তবে যা বর্তমান তাই সমাদর লাভ করে থাকে ; ধর্ম বা আধ্যাত্মিক ভাবোন্মত্ততার ক্ষেত্রে তুলনামূলক সমাদরের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। বিভিন্ন ধর্মমত নিয়ে যেখানে উভয়পক্ষের মধ্যে (যুক্তিমূলক) বিচার সেখানে সাম্প্রদায়িক বা অনুভূতি-মূলক তর্কের কোনও মূল্য নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে কোনও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের ধর্মীয় পক্ষপাত বা কোনও বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতিমূলক পক্ষপাতের মূল্য আপেক্ষিক বা আংশিক ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই জাতীয় আপেক্ষিক দৃষ্টিপ্রসূত যুক্তি সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা ব্যক্তিগত অনুভূতিতে আস্থাহীন কোনও (যুক্তিবাদী) ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। যাঁরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম থেকে যুক্তি আহরণ করে ঐ সম্প্রদায়ের বিরোধিগণের নিকট স্বীয় ধর্মমত সমর্থন করতে অগ্রসর হন তাঁরা গভীর অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। এটাও আশ্চর্যের বিষয়

যে এই অবজ্ঞার পাত্র কটুভাষিগণ তাঁদের মতবাদের দুটি দিকের কথা বলেন—একটি তাঁদের সাম্প্রদায়িক ধর্মের অনুজ্ঞাপালন, অপরটি অনুভূতির রাজ্যে আধ্যাত্মিক ভাবোন্মত্ত অবস্থা। প্রথম ক্ষেত্রে—অর্থাৎ স্বধর্মের অনুজ্ঞা পালনের ক্ষেত্রে, তাঁরা অন্যান্য ধর্মকে অস্বীকার করেন। কিন্তু এই আচরণের দ্বারাই তাঁরা 'তুহ্‌ফাৎ'-এর লেখকের এই সিদ্ধান্তকে অঙ্গীকার করে নিচ্ছেন—যে এক ধর্মের বক্তব্য অপর ধর্মের বিরুদ্ধগামী। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুভূতিলব্ধ অবস্থায় তাঁরা অন্য সকল ধর্মকে স্বীকার করেন, যদিও এই সিদ্ধান্তের দ্বারা তাঁদের নিজধর্মই খণ্ডিত হয়; তা সত্ত্বেও এই নিন্দুকগণের অলীক মতানুযায়ী ব্যাপারটি নাকি ঈশ্বরের করুণার বলে সাধিত হয়! সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে যতক্ষণ এঁরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ না পাচ্ছেন, ততক্ষণ স্বধর্মের নির্দেশ পালনের দ্বারা এঁরা অপরাপর ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন। কিন্তু ঈশ্বরকৃপার সারস্বরূপ প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করে তাঁরা নিজধর্মকেই অস্বীকার ও খণ্ডন করতে আরম্ভ করেন, কেননা স্বধর্মের অনুশাসনের বিরুদ্ধবাদী অপর সকল ধর্মকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থই হল নিজধর্মকে খণ্ডন করা। অধিকন্তু এটাও অদ্ভুত মনে হয় যে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করবার পর স্বধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস দৃঢ়তর করবার পরিবর্তে তাঁরা নিজধর্মে বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন ও বিভিন্ন ধর্মের পরস্পরবিরোধিতাকে (দূষণীয় মনে না করে) খণ্ডন করতে অগ্রসর হন না। আশ্চর্যের বিষয়, যার দ্বারা নিজধর্মের অনুজ্ঞাপালনে বিরতি জন্মায় ও পরস্পরবিরোধী অন্যান্য ধর্মকে সত্য বলে স্বীকার করতে প্রবৃত্তি হয়, তাকে এঁরা ঈশ্বরের প্রসাদ বলে বর্ণনা করেন। অতীব দুঃখের কথা এই নির্বোধ নিন্দুকের দল অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা তাঁদের নিজধর্মের প্রতি অধিকতর সমাদর প্রকাশ করতে গিয়ে—তাকেই অধিকতর পক্ষপাতের বিষয়বস্তুরূপে গর্বভরে দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা এ তত্ত্ব জানেন না যে কোনও কিছুই একক ভাবে পক্ষপাতের বস্তু বলে প্রমাণিত হতে পারে না[৮]।

"তুহ্‌ফাৎ'-এর লেখকের তৃতীয় বক্তব্য খণ্ডন করবার মানসে তাঁরা যা লিখেছেন তা এই: "যদি আমরা প্রথম দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে সাক্ষাৎ ভাবে গ্রন্থকারের তৃতীয় আপত্তিটি সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে অগ্রসর হই তা হলে দেখতে পাব (গ্রন্থকারের বক্তব্য হচ্ছে) বিশ্বের সকল ধর্মের

মধ্যেই মিথ্যার অস্তিত্ব রয়েছে—এবং এই সাধারণ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে; কর্তব্য ও অকর্তব্যের মধ্যে ব্যবধানের প্রশ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে যারা গ্রন্থকারের অনুবর্তী তাদের মাতা বা ভগ্নীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবার স্বাধীনতাও থাকবে; কেননা গ্রন্থকারের মতে সকল ধর্মশাস্ত্রবিদের সিদ্ধান্তই মিথ্যার দ্বারা কলুষিত—এবং এঁদের নিকট থেকে ছাড়া কর্তব্যা-কর্তব্য জানবার উপায় নেই।" এই ভাবে তাঁরা তাঁদের প্রতিবাদপুস্তিকার শেষ পর্যন্ত বক্তব্য বিস্তার করেছেন। প্রকৃত ঈশ্বরোপাসকগণকে এই ভাবে তাঁরা যে ব্যভিচার-অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন—তার কারণ তাঁদের ধর্মগ্রন্থেই পাওয়া যাবে। সেখানে দেখা যায় তাঁদের বহু উচ্চস্তরের দেবতা নিজ নিজ কন্যাদের সঙ্গে সঙ্গমলিপ্সু; তার মধ্যে একজন দেবতা এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন যার গর্ভে সমগ্র পৃথিবীর (প্রাণিনিচয়ের) উৎপত্তি; এবং অন্যান্য দেবগণ নিজেরাই ব্যভিচারের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁরা একথাও বিশ্বাস করেন—তাঁদের ধর্মের শীর্ষস্থানীয় পঞ্চভ্রাতা সকলেই একটি মাত্র নারীকে বিবাহ করেছিলেন[১]। এই জাতীয় লজ্জাজনক ভয়ানক আখ্যায়িকাসমূহ শুনতে অভ্যস্ত বলেই তাঁরা এতটা কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত হতে পেরেছেন। অন্যথায় বৈজ্ঞানিক বিতর্কে মাতা বা কন্যার সঙ্গে ব্যভিচারের প্রসঙ্গ তাঁরা কল্পনাতেও আনতে পারতেন না। মোট কথা, আমি বলতে চাই অসীম অজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব হেতু এই অবিশ্বাসিগণের সঙ্গে পশুকুলের বিশেষ পার্থক্য নেই। সুতরাং পশুর ন্যায়ই এঁরা, যে বিচারশক্তি বিধাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান, যা মানুষে স্বভাব-বিকশিত এবং লোকযাত্রার প্রয়োজনীয় সংযম ও ব্যবস্থাপনার সাফল্যপূর্ণ সূত্র ও সদসৎ নিয়ম-অনিয়ম বিচারের মাধ্যম,—তা ব্যবহার করেন না। তাঁরা তাঁদের সমগোত্রীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসিগণের ন্যায় সেই বুদ্ধিবিবেচনাকেই দূরে রেখেছেন যা সর্বক্ষেত্রে অভ্রান্ত পথ-নির্দেশক এবং যা পশু হতে মানুষের শ্রেষ্ঠতার সূচক। দুঃখের বিষয়, এই নীচ ও অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এটুকুও জানে না যে বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্গত কোনও বিশেষ ব্যাপারে বৈধাবৈধসমস্যা বিভিন্ন মতাবলম্বী ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণের ধারণা ও মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর ফলেই দেখা যায় এক ধর্মে কোনও কোনও পশুর মাংসের (আহার্যরূপে)

ব্যবহার প্রশস্ত ; আবার অন্য ধর্মে তা নিষিদ্ধ। তেমনই, এক ধর্মে বিশেষ আত্মীয়তার সীমানার মধ্যে বিবাহবিধি প্রচলিত, অপর ধর্মে তা নিষিদ্ধ। এগুলি বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রবিদ্‌গণের চিন্তা ও মতবাদের বৈচিত্র্যই প্রমাণ করছে। তাঁরা কি এটা বোঝেন, যে সহোদরা ভিন্ন অন্য ভগ্নীসম্পর্কীয়াগণের সঙ্গে বিবাহ ইসলামধর্মে স্বীকৃত কিন্তু ব্রাহ্মণ্য (হিন্দু) ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ? ব্রাহ্মণ (হিন্দু)গণ উক্ত ভগ্নীসম্পর্কীয়াগণকে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায়ই জ্ঞান করেন। মুশার ধর্মে ভগ্নীকন্যার সঙ্গে বিবাহ অনুমোদিত কিন্তু ইসলাম ও হিন্দুধর্মে তা নিষিদ্ধ। শেষোক্ত ধর্মদ্বয়ে ভগ্নীকন্যাকে নিজ কন্যার তুল্য জ্ঞান করবার রীতি আছে। যদি কোনও ব্যক্তি এই সব পরস্পরবিরোধী বিধিসমূহকে বিধাতার সৃষ্টি বলে মনে করেন—তবে তা তিনি করতে পারেন। বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট অবশ্য অবিদিত নেই যে, পান, ভোজন, বিবাহ, প্রভৃতি ক্রিয়া যদি এমনভাবে নির্বাহ করা যায় যার ফলে কোনও এক শ্রেণীর সামাজিক সংহতি বিপর্যস্ত হয়, তাহলে সেগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজন ঘটে ; এবং সেক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীভুক্ত সকলেরই সেই নিষেধ মেনে চলবার প্রয়োজন থাকে। (ঈশ্বর না করুন!) যিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে প্রকৃত নিয়ন্তা ও নিজের প্রতিটি কাজকে তাঁর সদাজাগরিত দৃষ্টির অধীন বলে মনে করেন—তিনি কেমন করে সংসারে বিপর্যয়সৃষ্টিকারী কোনও কাজ করতে পারেন? 'তুহ্‌ফাৎ'-এর শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার বহুবৎসর যাবৎ প্রবঞ্চনা, অন্ধ কুসংস্কার, নাস্তিকতা প্রভৃতি পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত আছেন।[১০] এই অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ঐ একই অপরাধসমূহের অভিযোগের মাত্র একটি ব্যাখ্যাই হতে পারে—প্রতিবাদকারী বিরোধী দল নির্বোধ ও অহেতুক বিদ্বেষে অন্ধ। সামান্য বিবেচনা করলেই দেখা যাবে প্রবঞ্চনা, শাঠ্য, ভণ্ডামী, ব্যভিচার প্রভৃতির অভিযোগ তাঁদেরই সম্পর্কে সত্য হতে পারে যাঁরা অলৌকিক ক্রিয়াকারিত্বের দাবী রাখেন ও নিজেদের ঈশ্বরতুল্য বলে প্রচার করে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে চান। ('তুহ্‌ফাৎ'-এর লেখকের ন্যায়) যিনি নিজেকে বিধাতার সৃষ্টিমধ্যকার দীনতম ব্যক্তি জ্ঞান করেন তাঁর সম্পর্কে এ অভিযোগ খাটে না। ধর্মবিজ্ঞানের প্রকৃত তথ্যনিরূপণের উদ্দেশ্যে তিনি ('তুহ্‌ফাৎ'-এর লেখক) জনসাধারণকে বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে অনুরোধ করে থাকেন এবং যুক্তিনির্ভর তথ্যাদিপূর্ণ

গ্রন্থসমূহ পাঠ করতে বলেন। অন্যান্য অসংখ্য প্রশ্নের যথা অলৌকিক ক্রিয়াদি, স্রষ্টার মধ্যে সৃষ্টির বিলয়, এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনার অস্বীকৃতি প্রভৃতির উত্তর···(অসম্পূর্ণ)।

টীকা :

১. ধর্মবিষয়ক বিতর্কে এই ধরণের উগ্র, কটু ও অশালীন ভাষা ব্যবহার রামমোহনের স্বভাবসিদ্ধ নয়, ভূমিকাতে একথা উল্লেখ করেছি। লেখক যিনিই হোন—জরথুষ্ট্রীয়গণের উপর যে সকল মত ও বিশ্বাস তিনি আরোপ করেছেন—জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের উচ্চ তত্ত্বের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। লেখকের জরথুষ্ট্রীয় ধর্মসম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। প্রতিপক্ষ ও তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে এই জাতীয় অসংযত কটুভাষণের দৃষ্টান্ত পুস্তিকাটিতে আদ্যোপান্ত ছড়িয়ে আছে। জরথুষ্ট্রীয় পক্ষের রচনাটি আমাদের সামনে নেই—কিন্তু আলোচ্য পুস্তিকায় তার থেকে যে সব উদ্ধৃতি আছে—তা যদি মূলানুগ হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে সেপক্ষও ব্যক্তিগতভাবে 'তুহ্‌ফাৎ'-এর লেখককে এবং তাঁর মতবাদকে যথেষ্ট উগ্র ও অশালীন ভাষায় ও ভঙ্গীতে আক্রমণ করেছিলেন। এটাই সম্ভবতঃ 'জবাব্‌-ই-তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুও্‌হাহিদিন্‌'-এর লেখকের এতটা উত্তেজনার কারণ।

২. রামমোহন স্বয়ং লেখক হলে নিজনাম সম্পর্কে এই জাতীয় আশীর্বচন উচ্চারণ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হত না। ভূমিকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩. এর থেকে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিপক্ষীয় কটূকাটব্যপূর্ণ সমালোচনাটি রামমোহন দেখেও তাচ্ছিল্যসহকারে উপেক্ষা করেছিলেন—সম্ভবত ঐ আরবী প্রবাদটি উচ্চারণ করে যার অর্থ "অযোগ্যের নিকট উচ্চ প্রত্যাশা নিরর্থক।" ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪. লেখক নিজেকে রামমোহন হতে স্বতন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন—একথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভূমিকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫. এখানে স্পষ্টত 'তুহ্‌ফাৎ'-এর আরবী ভূমিকাতে রামমোহন কৃত এই উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে: "I travelled in the remotest part of the world in plains as well as in

hilly lands and I found the inhabitants thereof agreeing generally in the existence of One Being who is the source of creation and governor of it, ··· ··· ··· From this induction it has been known to me that turning generally towards One Eternal Being, is like a natural tendency in human being and is common to all individuals of mankind equally." (*Tuhfat-ul-Muwahhidin* Eng. Trans. Introduction).

৬. প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলি সম্পর্কে রামমোহন 'তুহ্‌ফাৎ'-এর ভূমিকায় যা বলেছিলেন এবং যে উক্তিকে এখানে লক্ষ্য করা হয়েছে তা এই : "Some of these sectarians are ready to confute the creeds of others owing to a disagreement with them, believing in the truth of sayings of their predecessors; while those predecessors also like other men were liable to commit sins and mistakes. Hence all those sectarians (in pretending the truth of their own religion) are true or false, In the former case two contradictions come together···· (which is logically inadmissible) and in the latter case, either falsehood is to be imputed to a certain religion particularly or commonly to all; in the first case *Tarjih bila Murajeh* i e. giving preference without there being any reason for it (which is logically inadmissible), follows. Hence falsehood is common to all religions without distinction."—*Tuhfat* Eng. Trans. Introduction.

৭. প্রচলিত খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস, যাতে 'পিতারূপী ঈশ্বর', 'পুত্ররূপী ঈশ্বর' ও 'পবিত্রাত্মা' এই তিনটি তত্ত্ব স্বীকৃত।

৮. অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব সর্বদা তুলনাভিত্তিক। একাধিক পক্ষের অস্তিত্বের উপর তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

৯. জরথুষ্ট্রীয় পুরাণের কিছু কাহিনীর সঙ্গে লেখকের অত্যন্ত অস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। যে দেবতা (?) ও নারীর সঙ্গমে মনুষ্যকুলের

উৎপত্তি তাঁরা কি জরথুষ্ট্রীয় পুরাণে বর্ণিত অহুর মাজদা (ওহ্‌রমাজ্‌দ্‌) সৃষ্ট গয়োমর্ত্‌ (আদি পুরুষ) ও আদি গণিকা (Primal whore)? অথবা গয়োমর্তের ঔরসে তার জননী পৃথিবীর গর্ভজাত মানব-মানবী মশ্যে ও মশ্যানে? অন্য উল্লেখগুলির ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট নয়! লেখকের কটু ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষা লক্ষণীয়। রামমোহন স্বয়ং লেখক হলে তাঁর পক্ষে এমন ভাষা ব্যবহার করা স্বাভাবিক হত না।

১০. এখানেও দেখা যাবে আলোচ্য পুস্তিকার লেখক নিজের থেকে রামমোহনকে পৃথক বলে উল্লেখ করেছেন। ভূমিকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাপ্রসঙ্গে প্রসন্নকুমার ঠাকুর

প্রথম অধ্যায়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবর্ষের পক্ষে সাময়িকভাবে মঙ্গলজনক মনে করলেও পরাধীনতার বেদনা রামমোহন অনুভব করতেন এবং ভবিষ্যতে কোনও সময়ে ভারতবর্ষ ইংরেজকবলমুক্ত হয়ে স্বাধীন হবে এ কল্পনাও তাঁর ছিল (পৃঃ ১৬-১৯)। তাঁর দৃষ্টিতে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হবার জন্যই পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল এবং এই যোগাযোগের মাধ্যম বলেই ব্রিটিশ শাসনকে এর সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও সাময়িকভাবে তাঁর বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল। এ-ক্ষেত্রে রামমোহনের চিন্তা তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ইংরেজি সাপ্তাহিক Reformer পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং ১৮৩৪ ও ১৮৩৫ সালের Reformer-এর পৃষ্ঠায় তিনি রামমোহনের প্রতিধ্বনি করে একাধিকবার বলেছেন—ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হল স্বাধীনতা বা Independence। রামমোহনের মতই তিনি মনে করেছেন—এই স্বাধীনতা বিদ্রোহ বা রক্তক্ষয়কারী সংগ্রামের পথে আসবে না; যখন ভারতবাসী স্বয়ং উত্তর এবং পশ্চিম সীমান্তের সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ শান্তিও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার যোগ্যতা অর্জন করবে তখনই তারা স্বাধীনতা লাভ করবে। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য ব্রিটিশ শাসনাধীনে প্রবর্তিত উদার আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষাই সর্বাধিক উপযোগী এবং সেই কারণে ভারতবর্ষে কিছুকাল ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনীয়তা আছে। ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা দাবী করবে, ইংলণ্ড তাতে আপত্তি করবে না কেন না স্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না, বরং সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হবে। Reformer-এর যে সংখ্যাগুলিতে এই সব রচনা প্রকাশিত হয়েছিল—সেগুলি দুষ্প্রাপ্য। এর প্রতিদ্বন্দ্বী বিরুদ্ধবাদী পত্রিকাগুলি এই মতের কঠোর সমালোচক ছিল, তারা এর মধ্যে স্পষ্ট ভাবেই রাজদ্রোহের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল Calcutta Courier। এর স্তম্ভে প্রকাশিত সমালোচনার উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনে Reformer-এ যা বলা হয়েছিল

সৌভাগ্যবশত ১ ডিসেম্বর ১৮৩৫ সংখ্যা Calcutta Courier-এ তা সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে। এর থেকে প্রসন্নকুমারের যুক্তি ও সিদ্ধান্তসমূহ পরিষ্কার জানা যায়। তা ছাড়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত Enquirer পত্রিকার পৃষ্ঠাতেও এ সম্পর্কে পত্রাকারে যথেষ্ট বাদানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। Enquirer-ও Reformer-কেই তার প্রবল প্রতিপক্ষ গণ্য করত। বস্তুত Reformer-এর এই স্বাধীনতা-প্রসঙ্গ বিগত শতকের তৃতীয় দশকে শিক্ষিত মহলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। কোন কোন মহলে Reformer-কে যে তখন স্বাধীনতাপন্থী পত্রিকা বলে মনে করা হত তার অন্য নিদর্শনও আছে। আলেকজাণ্ডার ডাফ এই পত্রিকা সম্পর্কে বলেছেন: "In politics the Reformer at first assumed a tone of rancorous and indiscriminating violence towards the British Government outdoing the wildest flights to which ultra-radicalism has ever soared in these lands. A nondescript species of native oligarchy and republieanism combined, was the panacea proposed for remedying all the ills of India, It was thus unskilful and injudicious enough to attempt the erection of towers and palaces out of the surrounding rubbish, by beginning at the top the intended edifices forcing a poor, blinded ignorant, priest-ridden race, to listen to weekly orations on their abstract rights and privileges, as members of a great social polity, before they were capaciated to comprehend one jot or tittle of their individual rights as men.'' (*India and India Missions* Edinburgh 1840, p. 643)

এখানে Calcutta Courier-এ উদ্ধৃত Reformer-এর বক্তব্য এবং Enquirer পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক পত্রালাপ সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল। Calcutta Courier-এর উল্লিখিত সংখ্যাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীমৃণালকান্তি চন্দ; "শ্রীচন্দের মধ্যস্থতায় এবং শ্রীমতী অনীতা কুমারের সৌজন্যে Enquirer-এর সংখ্যাগুলি দেখবার সুযোগ হয়েছে।

1. The Calcutta Courier, December 1, 1835

The Reformer's Defence.

The Courier as might have been expected, is at us again on his favorite position of defending the Govt. against supposed attempts at rebellion, and glorying in the fall of a straw-built house of his own erection. He has, however, the grace to compliment us on being "well employed in our vocation while engaged in making public the supposed breach of faith" on the part of Govt. We shall not suppose our contemporary to be ironical on this occasion, but accept the compliment with thanks. He "hopes the case will not be suffered to go by default," but "draw forth explanation." This is just what we want, particularly if it come from "the right quarter." But this circumstance is an argument in favour of the very line of conduct our brother of the Courier condemns. It has always been our opinion, that it is better to give vent to the latent feelings of the people through the press than to smother the flame for a while by shutting up that safety valve of the public mind. For a long time we, and not only we, but many others, have thought in the manner explained by us last week. As we own ourselves to be fallible men we might all be in error, and, but for this pernicious publicity, would have continued so to the end of our lives. We are, however, open to conviction, and most heartily join our contemporary in desiring to see our errors pointed out and the cause of our complaint real or imaginary removed. This surely the Courier will admit would be a beneficial effect resulting from our article of last week, We should like to know what evil effect is to be apprehended from it. If none, as we are sure there can

be none, what better reason can we have for continuing the line of conduct we have adopted in regard to the treatment of questions connected with the administration of public affairs ?

The next charge preferred by the Courier is that formerly we did not speak with the boldness we now do ; he says—"but now the mask is thrown off, He (the Reformer) tells you that independence and self-govt. are what he aims at." Yes ! We plead guility "to this charge ; but hold,—without the least hostile feeling towards the British Govt." This no doubt our contemporary will declare to be mightily inconsistent. We shall prove the contrary, Every nation, it will be admitted, which is capable of governing itself will desire to be independent of foreign control. This is a feeling natural to every branch of the family of men, and whether we look to the burning sands of Africa or the icy regions of the north, whether we consult the page of history or look around us for existing instances, we are compelled to acknowledge the important truth—that a desire for national independence is a feeling almost innate. If our contemporary has ever supposed that we hid this feeling, he has done us an injustice in as much as he has charged us with hypocrisy. But the following passages from our articles on this very question published long ago will be the best proof that we have always declared the same feeling.

(From the Rerformer of 2nd. November, 1834).

"The sentiments of the highest statesmen of the present day are, we suppose, opposed to the narrow minded policy, which the Courier would adopt, of crushing in the bud the rising energies of a nation. The future lawful INDEPENDENCE OF

INDIA, so far from injuring the interests of England, would certainly promote them, and therefore when the people of this country can govern themselves they, we are sure, will be aliowed to do so provided the commercial interests of England are secured to her. Hence there is not the most distant likelihood of a revolt ; and rash must that man be who would recommend rebellion to the people of India under circumstances which in every respect show the utter uselessness and injurious tendency of so absurd an attempt."

(From the Reformer of 20th. September, 1835,)

"But it may be said that when the people of this country are more improved, they will naturaliy desire to govern themselves and will become unwillimg to receive orders from so distant a country as England. This is admitted by all ; but what liberal-minded men will for a moment maintain that that consummation is not to be wished for ? What Englishmen is there who would not wish to derive all the commercial advantages derivable from the country without enslaving her ? The line of policy adopted by England towards India points to such a period. It is the opinion of her best and most experienced statesmen, that "if India could only be reserved as a part of the British Empire by keeping its inhabitants in a state of ignorance their domination would be a curse to the country and ought to cease." If then improvement of the people of India be an object of anxious desire in her present rulers, and if the natural consequence of improvement must be her independence, it is evident England is prepared for such an event, and none of her sons need repine at the march of improvement, whether it be by means of elementary schools

or the press. The native press, if it consult the intersts of the people of India—if it be actuated by s self interest, there can be no doubt it will never lead to other than that consummation which must be the desire of all liberal-minded politicians, whether English or Native—viz. THE INDEPENDENCE of India when she will have been prepared to govern herself—when her power could set at defiance the storms that may gather in the north and the west, and her councils able to check internal commotions and preserve domestic peace and order."

These passages (others could be found if we take the trouble of searching) show, not only that we have always, even with the press law hanging over us like the sword over Damocles thought and wrote as we now do, in regard to the future independance of India ; but also reconcile the seeming inconsistency of wishing for independence without any hostile feeling towards the British Govt. For they show that we do not want independence until we are prepared for it, and that when that period arrives, our British rulers will not object to our independence. Under these circumstances, so far from entertaining any hostile feelings, it is our best policy—our interest to support a wise, liberal, and civilised Government like that of Great Britain, which is evidently leading us to a state of happiness of which all the former conquerors thought proper to deprive us.

There is one more point in the remarks of the Courier, which should not go unnoticed. It is contained in the following quotation :—

"Our most liberal rulers, the Marquis of Hastings and the present Governor General, and other less exalted function-

aries of this Govt, have said they would rather that we lost the dominion of India than that we should rule it with injustice, and without studying to enlighten its population : they have said too, that though its independence were to be accelerated by the education we offer, still we ought not to withhold from them the benefits of education. But when they have dared to say—we will teach the people to dispense with their present rulers—we will give them a share in the Government in order that they may learn to take the whole—we will invite them to to regard the British rule as a hated thing and every Briton in India as an enemy ? "

We confess our obtuse faculties of discrimination are at fault in preceiving the difference between educating a people in order to give them a share in the administration of public affairs, and teaching them to become independent. Education is the cause—independence its natural and necessary consequence. It is not therefore requisite that we should quote particular instances in which our statesmen have declared the same views which we entertain on this subject—the very line of policy adopted by our Rulers points out the fact we are endeavouring to establish. However for the satisfaction of our brother of the Courier, we shall quote a very clear passage on this point from Lord William Bentinck's minute on the "Draft of the Regulation for abolishing the practice of Suttee" :

"The first and primary object of my heart is the benefit of the Hindoos. I know nothing of so important to the improvement of their future condition, as the establishment of a purer morality, whatever their belief, and a more just conception of

the will of God. The first step to this better understanding will be dissociation of religious belief and practice from blood and murder. They will then, ,when no longer under this brutalising excitement, view with more calmness acknowledged truth ; they will see that there can be no inconsistency in the ways of Providence ; that to the command received as divine by all races of men "no innocent blood shall be split," there can be no exception ; and when they shall have been convinced of the error of this first and most criminal of their customs, may it not be hoped that others which stand in the way of their improvement may likewise pass away, and that thus emancipated from those chains and shackles, upon their minds and actions, they may no longer continue, as they have done, slaves of every foreign conqueror, but that they may assume their just places among the great families of mankind. I disavow in these remarks, or in this measure, any view whatever to conversion to our own faith. I write and feel as a legislator for the Hindoos, and as I believe many enlightened Hindoos think and feel."

If the concluding part of the above paragraph mean anything, it means what we have asserted—viz, that our British rulers know that education will lead to our independence and that, knowing this, they are desirous we should, when prapared for it, enjoy the fruits of that state.

—Reformer

2. (a) The Enquirer, December 1834, pp. 25-27

The Reformer's Advice to his Countrymen

To

The Editor of the Enquirer.

Sir,

As it appears that the Editor of the *Reformer* Newspaper has lately excited much attention by the advice given to his countrymen, to follow the example of AMERICANS, I would beg leave to trouble you with a few remarks on the subject, provided you see no objection to give them a place in your most useful periodical.

In "The Reformer" Native Paper of the 25th October it seems that he alludes to the Americans and appeals to his countrymen to follow their example against the English.

"The Courier" very properly notices this and decidedly declares that it has a TREASONABLE *Tendency* as if *intended* to excite not only dissatisfaction but *revolt*. Indeed this seems to be the General opinion of all the persons I have heard name the subject, not one appears to regard it otherwise.

The *Samachar Durpun* another Native Paper (quoted by the Hurkaru of 8th Nov. inst.) animadverts upon the Brother Editor, with marked disapprobation and adduces an instance of some years past to prove that it is forbearance alone in the present Government, which affords the Reformer the liberty of thus abusing the privilege. About 36 years ago he says—

"The Asiatic Mirror the ablest English Journal *then*

in Calcutta, was only saved from entire *destruction* of the Paper—and banishment of the two English propietors, by the greatest entreaty, submission and promises in consequence of the "SEDITION *of an article*" wich stated that "if each Native were to cast a pebble on the English, we (the English) should be overwhelmed" because "we were such an handful in comparison."—Dr. Sholbred and Mr. C. K. Bruce, were told by the Secretary "*to prepare to leave the country*"—and it was only by promises and submission, *they* were allowed to remain and the paper to be continued.

Now Mr. Editor, it is very clear, such Press regulations, if in force now, or such sentiments *were* entertained by the Government, the Editor of the Reformer *dare* not have braved the consequences, for however, as native, he might claim a partial exemption of *some* consequences, yet he must be well aware that punishments might be found, and *have been* inflicted, fully commensurate in effect, on natives, with that of being sent home, to an Englishman, Fine, ruin, disgrace. separation of family connection, ruin of all commercial and other pursuits, deprivation of any lucrative office or situation that might be held or enjoyed by the native, including also *Transportation* to any other part of India—however distant and *unhealthy* and thus tending to shorten life. as well as abridge liberty (perhaps to the extent of total confinement in a prison,) with the additional Evil of a Sea Voyage, which to *some* natives would be esteemed a terrific part of the punishment—all these parts of a whole, might in

some cases, be united to form an aggregate of punishment in the way of example; provided the Government were determined to make *a severe* EXAMPLE of the offender. When therefore these particulars are considered, and the offender is a *servant* of the Government in a lucrative situation of trust and responsibility—it necessarily excites a very great degree of surprize, that an Editor so keen as that of the Reformer is known to be, should, or could by any chance, be guilty of an oversight so diametrically opposed to his best interest, and all his lucrative views and family feelings—as this most intoward exposure has proved; and we should naturally expect, that he would most anxiously explain *how* such an oversight could have escaped him.

The natural character of the native, so vigilant and argus-eyed in *whatever* concerns their worldly interst—seems here to have been dozing; and taken by surprize as if an enemy had usurped the Editor's place; and designed an injury, that was calculated to produce the present evil to himself; or that at all events would *assuredly* be remembered by his enemies, and called forth in future, to be *acted upon* whenever required. This is putting the case in the most favorable point of view that his friends can possibly desire; as affording him the means of trying to "back out" of such an awkward situation: while to others, as the *disniterested* who take an impartial view of the subject, and its obvious tendency; and especially his enemies, who would *aggravate* every indication—it is certain that the most severe conclusions might be drawn from such premises.

Taking it indeed, as it appears on the first casual reading, it must strike every reflecting mind, as the obvious tendency of *European Education undirected by proper principles.* This naturally tending to pluck down the hand that raised it, and void of all gratitude shows the inherent tendency of *power* to do wrong, when the *will* to direct that power aright is wanting and had been alike disregarded by the Teacher and the Pupil.

Both sides of the Question will be considered in my next, with your leave Mr. Editor, obliged as I am to write this in great haste, and send it, without the corrections it requires.

Your's &c.

AN OCCASIONAL READER OF "THE REFORMER"

10th Nov. 1834

b) The Enquirer, January 1835, pp. 17-18

The Reformer's Advice to his Countrymen

To The Editor of the Enquirer

Sir,

Aa it appears that your correspondent "An Occasional Reader of the Reformer" has lately excited some, if not much attention by charging the Reformer of rebellion ! and high treason ! I would beg leave to trouble you with a few remarks on the subject, provided you see no objection to give these a place in your most useful Periodical

He begins by saying "in the Reformer Native Paper of

the 25 th October, it seems that he alludes to the Americans, and appeals to his countrymen to follow their example against the English." He next proceeds by saying "The Courier very properly notices this and decidedly declares that it has a TREASONABLE TENDENCY as if INTENDED to excite not only dissatisfaction but REVOLT." Indeed, Mr. Editor, this at once shows the ATTENTION with which your correspondent reads the Reformer ! O ! I beg his pardon, he is an "Occasional Reader of the Reformer". He does not peruse the Reformer of every Sunday, and that no doubt is the reason why he so daringly comes forward before the public to accuse the Editor of that paper of rebellion ! Does he not know that the Editor of the Reformer has expressly declared in his answer to "The Courier" accusing him of high treason and rebellion that "*rash must that man be who recommends rebellion to the natives in their present condition* ?* Does he not know that he was merely reiteratnig the arguments of the Courier the answer to which has already been given ? And dares he yet promise the public to continue his remarks on the same subject ? Sureley, Sir, he is quite mistaken ; let him read the Reformer's answer to the Courier's remarks on the subject ; let him not fill up your much valuable monthly Journal by repeating arguments already urged by the Courier. I would advice (sic.) him to make any further observations on the subject after a mature reflection—to condemn the Reformer-if he at all deserves His censures—after perusing his answer to the Courier's remarks.

* This may not be the very language of the Reformer. I have put only from my recollection.

It is very astonishing, Mr. Editor, that you have given insertion to an article which merely repeats the REFUTED argument of the Courier, and condemns the Reformer of high treason ! without any just and reasonable ground. It is certainly either your immature reflection, or the hatred* you bear against the Reformer, which has led you to give publicity to such an useless article in your monthly Journal.

A word more to your correspondent, and I have done. He would have employed his time in treating more useful subjects than "on the Reformer's Advice to his Countrymen." The subject of Native Education, which at present excites much attention, should have deserved his undivided attention instead of a mere useless subject. He, in short, should have employed his head to the consideration of the means of enlightening and improving the obscured and barbarised mind of the native. But that which is past is gone and irrecoverable. Let us not deplore the loss of the hour already passed. Let us only draw valuable lessons from it ; so that let not your correspondent any longer trouble his head, and puzzle his brains, with the discussion of such useless subjects. It is for his good that I remind him for the future not to employ his head with the discussion of useless subjects, but to treat such subjects as are of general interest. With these I conclude,

Yours most obediently, etc.
AN OCCASIONAL READER OF
"THE ENQUIRFR"

18th December 1834

* We bear no hatred against the Reformer and as to the reason why we inserted the former article we think our correspondent might have abstained from asking the question.—ED.

c) **The Enquirer, March 1835, pp. 91-93**

'The Reformer's Advice to his Countrymen'

(এটি প্রথম পত্রলেখক কর্তৃক দ্বিতীয় পত্রলেখক কৃত সমালোচনার প্রত্যুত্তর। কিন্তু এই দীর্ঘ পত্রখানির তিন-চতুর্থাংশেরও বেশী একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ের গালিগালাজে পূর্ণ যা বর্তমান প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অবান্তর। তাই সেই কটুকাটব্য বাদ দিয়ে এর যেটুকু অংশ প্রাসঙ্গিক তাই মুদ্রিত হল।)

To

The Editor of the Enquirer

Sir,

...It appears form his statement that my remarks had occasioned "more attention" than was agreeable to his fine feelings and he therefore proceeds to assert for me what I never asserted for myself—viz. "charging the Reformer of Rebellion"...

I made no charge of any kind ; but merely copied what "The Courier" had said—the whole amount of which was, that the expressions alluded to were "of a treasonable tendency" and "as if *intended* to excite dissatisfaction and revolt,"

...The fact clearly adduced by your correspondent is this that the natural consequence of what I stated was too obvious to be mistaken ; or he would not have been so ready to make an immediate application of it. Had there been two opinions on the subject, the Courier would not have felt called upon to expose the natural tendency of a direct misehief, and had not the cap fitted your correspondent, he would never have put it on...

Now, Mr, Editor, supposing for arguments' sake, that the

Editor of the Reformer did disclaim all that his weak advocate would wish to be believed, why is poison at any time scattered without its remedy ? Does it not prove the danger and fatal effects that may be produced by any *partial* statements ? The evil sentiment elsewhere copied (according to the infidel practice of that Arch apostate Voltaire) may be divested of its exposer : and produce all the mischief by its native Virulence.

I remain, Sir, Yours

AN OCCASIONAL READER OF THE REFORMER

P. S,......So far from having the most remote animosity against the Reformer—it was only the natural tendency of an evil PRINCIPAL which I wished to oppose and expose....

৬

ইংলণ্ডে রামমোহনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ

প্রথম অধ্যায়ে এই অপ্রকাশিত সমসাময়িক বিবরণটি প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছে (পৃঃ ২৫—২৬)। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার থেকে আমি এটি সংগ্রহ করেছি। ১৯৭২ সালে যখন এটি আমার হাতে আসে তখন প্রতিলিপির উপর কর্তৃপক্ষ পেন্‌সিলে লিখে দিয়েছিলেন No Eur. Mss. number yet. Will be accessioned later'। লেখক নিজের নাম উহ্য রেখেছেন তবে উপসংহারে রচনার তারিখটি উল্লেখ করেছেন—১৯ মার্চ ১৮৩২। লণ্ডনে কোনও এক মহিলার গৃহে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য সম্মিলনীতে তাঁর সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হয়েছিল এবং অনতিপরে তিনি এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। রিফর্ম্ বিল, উপবাসের উপকারিতা, খ্রীষ্টধর্মের আদিপাপতত্ত্ব, রাজতন্ত্র, সংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁদের আলাপ হয়। আলোচনা-প্রসঙ্গে রামমোহন রাজতন্ত্রের প্রতি যে তীব্র বিরাগ প্রকাশ করেছিলেন তা লক্ষণীয়। জীবনের শেষ পর্বে তিনি যে প্রজাতন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছিলেন এখানে তার একটি অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। সমগ্র বিবরণটি এখানে মুদ্রিত হল। পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা সংখ্যা চার ; আকার ৯″×৭″।

TEXT

"I met Rammohun Roy at Mrs.—'s soiree—. He began speaking very earnestly upon politics & the Reform Bill this approaching fast, and the manner in which it would be kept—he expressed great astonishment at the rejection of fasting by Protestants, and said that in this respect the Catholics were far more consistent Christians : that he considered fast very salutary and hoped he should have strength to observe them whenever they might assist him to mortify any wrong inclination,

but whilst approving the practices, he expressed dislike at interference of the Governt. [Government] in commanding it—he said it was a duty between every man and his God & that no earthly order could make it binding...It was beautiful to hear him quote Scripture on this subject and it was plain he was intimately acquainted with them. He had just seen a young Catholic lady & she had repeated to him at his request one of the prayers she used on going to bed beginning with "Mother of God !"... "Mother of God" !—he repeated several times—can it be possible ?—he seemed to feel almost an impiety in even repeating the phrase, remarked that even if Christ was God, the Virgin was not by the Trinitarian doctrine his mother as God, but as man, of Christ in his human capacity alone—a Lady present asked him suddenly—'Do you believe in the depravity of human nature ?" He was silent for a moment—then lifting up his eyes with an expression of intense reverence, said slowly—"that is a question which it does not become me with my limited understanding to decide—it is beyond my feeble faculties to determine—it may be so but it is not revealed to us : it is one of those things which it is not intended that we should know—no man ought to presume to feel sure on such a point"—he then went on more cheerfully—"but it does not make any great difference : we are creatures capable of good & evil ; we are not entirely evil, because we have wishes to do good, and we are also inclined to do evil whether from the guilt incurred by Adam, or the sinfulness of our own natures—though I do not belong to the sect which professes to believe this doctrine I do not object to it—I think it would do every one good to believe it for themselves, for to be humble & to

Rammohun Roy —

"I met Rammohun Roy at Mrs —'s Soirée — He began speaking very earnestly upon politics & the Reform Bill, the approaching Lent, and the manner in which it would be kept — he expressed great astonishment at the rejection of fasting by Protestants, and said that in this respect the Catholics were far more consistent Christians: that he considered Fasts very salutary and believed he should have strength to observe them whenever they might assist him to mortify any wrong inclinations but whilst approving the practice, he expressed dislike at the interference of Governmt in commanding it — he said it was a duty between every man & his God, & that no earthly order could make it binding. — It was beautiful to hear him quote Scripture on this subject, and it was plain he was intimately acquainted with them — He had just seen a young Catholic lady, & she had repeated to him, at his request, one of the prayers she used on going to bed, beginning with 'Mother of God!' — 'Mother of God!' he repeated several times — can it be possible?" — he seemed to feel almost an impiety in even repeating the phrase. remarked that even if Christ were God, the Virgin was not by the Trinitarian doctrine his Mother as God, but as man, of Christ in his human capacity alone — A lady present asked him suddenly — 'Do you believe in the depravity of human nature?' — He was silent for a moment: then lifting up his eyes with an expression of intense reverence, said slowly — "that is a question

সাক্ষাৎকার-বিবরণের পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠা।

ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার, লণ্ডন।

labour to correct our faults, is the great end of Christianity—"For myself", he said with much feeling motioning his hand to his heart, "for myself I like to think that it is true: I would reflect'how weak and poor and sinful I am rather than how perfect in morals and how pure & great & good I am become—Pride is not for man—Worm of Dust! he cannot think of himself too humbly—it is the chief duty of Christians"—"But" he added, "Dr. Channing, the honour of his age has very peculiar views on this subject, quite new—he thinks that our souls are a portion of the Divine nature, & exhorts us not to abuse so glorious an origin"—he said emphatically, "he is a good man." He spoke a good deal of self-denial as "the mother of all virtue—"—and drew a contrast between man & brute creation, to prove that his superiority rests on thc power of self-denial! Speaking of the fast & Rev. Percival he said he knew him well, & that he believed him to be a very sincere and good man, but that he was a bigot & often mistaken. He commented on his and his friends' rigid observance of one part of the Christian law, & neglect of the great law of charity—when he heard kingly Govt. praised, he smiled & said, he did not know what to say to that; he could not sympathize with the English in their partiality for it—that there was indeed the highest authority against it; in the case of the Israelites, Jehovah himself warned them what they must expect if they persisted in chasing a king and "that is enough—it is the very highest authority."—"But there is a very great attachment to Royalty in this country", he continued "when I first came and saw thc word 'Royal' associated with places of business & amusements & establishments of various kinds I thought that the King must have had some share in their building, or was in

some way personally connected with them."—The present King he allowed, was a very good man—"he is a real patriot". He said he could not leave London till the Reform Bill was over—that he watched its treatment from friends & enemies with the utmost interest—that it affected not England only, nor Europe, but the world at large. "The destiny of thc whole globe depends upon the fate of this measure—it was a most interesting time !" He asked for music, & after I had played once he begged me to sit down again & listened attentively to some national airs—he said every one must be fond of music—His dress was magnificent—a purple velvet robe, bordered with rich gold lace—a vest of crimson embroidered with gold & variegated shawl crossed round the waist & tied behind, with a massy gold buckle fastening his robe in front—He has an imposing appearance, very courteous, inclining himself profoundly to every salutation, remarkably attentive to listening a countenance that seems to comprehend all things.—

March 19—1832.

৭

রবার্ট ওয়েন ও তাঁর পুত্রকে লিখিত রামমোহনের পত্রাবলী

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে রামমোহন রায়ের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৩৮৭-৮৯)। ম্যাঞ্চেস্টার কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের গ্রন্থাগারে রবার্ট ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের যে পাঁচখানি এবং নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত তৎপুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত যে একখানি পত্র আমার সংগ্রহ করবার সৌভাগ্য হয়েছে সেগুলি এখানে মুদ্রিত হল। এই পত্রগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত ওয়েনকে লিখিত তৃতীয় পত্রখানিতে রামমোহনের স্বাক্ষর নেই। কিন্তু এটিযে তাঁর লেখা পত্রখানি পড়লেই তা বোঝা যায়। রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত পত্রখানি আমি ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছি (দ্রষ্টব্য Collet pp. 494-95)।

রবার্ট ওয়েনকে লিখিত পত্র :

১

15th of May 31

My Dear Sir,

I regret that you should have misunderstood me the other day. I will however do myself the pleasure of calling upon you and Mrs. Owen within this evening or on Tuesday to arrange the things without disappointing other friends. Pray remember me kindly to Mrs. Owen and believe me.

Yours sincerely

(Sd.) Rammohun Roy

অপর পৃষ্ঠায় :

Pray excuse haste.

48 Bedford Sq.
Jany. 2nd—1832

My Dear Sir,

I am still waiting for a few lines (which I wished you to write and which you gave me reason to expect) that I may be able to have the honor of attending your meeting.

With my best wishes for the success of your system (if founded upon the Precepts of Christianity) I have the honour to be

My Dear Sir
Your most obedient servant
(Sd.) Rammohun Roy

৩

48 Bedford Sq.
Jany. 9th 1832

My Dear Sir,

Having received note from a Gentleman reminding me of a long previous engagement with him this evening, I find no other means of acquittal except that of throwing myself on your indulgence praying that you may kindly enable me to redeem this previous pledge by excusing my absence this evening. From distraction of mind and constant interruptions I have been liable to make errors of a similar nature to my great annoyance—a circumstance which I deeply regret.

On Friday next week I am disengaged and propose doing myself the honour of joining your private or public evening party and guard myself against any engagement on that day. With my best regard for your philanthropic exertions.

48. Bedford Sq.
Jany 26th 1832

My dear Sir

Having suffered considerably from the cold on my return home from Mr Montague's Lecture last Evening I feel so poorly that I must deny myself the satisfaction of being present at your Party this Evening, which I hope

you will kindly excuse
be good enough to remember
me to your amiable
daughters, & believe me to
remain my dear Sir

Yours very sincerely
Rammohun Roy

PS Under the circumstances
above stated you will excuse this
note being written by a friend.

রবার্ট্ ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের একখানি পত্র।

48 Bedford Sq.
Jany. 20th 1832

My Dear Sir,

Having suffered considerably from the cold on my return home from Mr. Montague's lecture last evening I feel so poorly that I must deny myself the satisfaction of being present at your Party this evening which I hope you will kindly excuse. Be good enough to remember me to your amiable daughters and believe me to remain.

My Dear Sir
Yours very sincerely
(Sd.) Rammohun Roy

P. S. Under the circumstances above stated you will excuse the note being written by a friend.

৫

48 Bedford Sq.
Feby. 13th 1832

My Dear Sir,

As I have not yet received any communication from you intimating that your system is virtually founded upon the Precepts of Christianity—nor have I yet seen an assertion of a similar nature in any of the Public Journals—I am sorry to feel myself under the necessity of foregoing the pleasure of attending your Public Meeting this evening,

I remain my dear sir,
Yours very faithfully
(Sd.) Rammohun Roy

Robert Owen Esqr.

রবার্ট্ ওয়েনের পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত পত্র :

48 Bedford Sq.
April 19th 1833

Dear Sir,

Not having been sufficieutly fortunate to find you or any of your friends at home I feel induced to make one or two remarks in writing to which from what I have heard from you on Tuesday night, I think you will agree. They are as follows : It is not necessary either in England or in America to oppose Religion in promoting the social domestic and political welfare of their inhabitants particularly a system of religion which inculcates the doctrine of universal love and charity, Did such philanthropists as Locke or Newton oppose religion ? No ! They rather tried to remove the perversions gradually introduced in religions. Admitting for a moment that the truth of the Divinity of Religion cannot be established to the satisfaction of a free-thinker, but from an impartial enquiry, I presume we may feel persuaded to believe that a system of religion (Christianity) which consists in love and charity is capable of furthering our happiness, facilitating our reciprocal transactions and curbing our obnoxious suspicions and feelings. I grieve to observe that by opposing religion your most benevolent father has hitherto impeded his success. He, I seriously believe, is a follower of Christianity in the above sense though he is not aware of being so. Allow me to send Hamilton's East Indies (1st vol.) in whieh you will find page 35 line 36 that more than two thousand years ago wise and pious Brahmans of India entertained almost the samc

48. Bedford Square
April 19th 1833

Dear Sir,

Not having been sufficiently fortunate yesterday [to] find you, or any of your friends at home, I feel induced to make one or two remarks in writing to which, from what I heard from you on Tuesday night, I think you will agree. They are as follows:- It is not necessary, either in England or in America, to oppose Religion in promoting the social, domestic and political welfare of their Inhabitants, particularly a system of Religion which inculcates the doctrine of Universal Love and Charity. Did such Philanthropists as Locke & Newton oppose Religion? No! They rather tried to remove the perversions gradually introduced in Religions. Admitting for a moment that the Truths of the Divinity of Religion

[...] [fa]culties of a Freethinker.

but from an impartial enquiry I presume we may feel persuaded to believe that a system of Religion (Christianity) which consists in Love and Charity is [...]

[...] our reciprocal transactions and carrying on obnoxious passions and feelings. I [...] perceive to observe that by opposing Religion you must

benevolent Father has hitherto impeded his success. He, I firmly believe, is a follower of Christianity in the above sense though he is not aware of being so. Allow me to send Hamilton's East Indies (1st Vol.) in which you will find - page 35 line 24, that at more than two thousand years ago the wise and pious Brahmuns of India entertained almost the same opinions which your Father now offers though they by no means were destitute of religion.

My desire to see you and your Father crowned with success in your benevolent undertakings has emboldened me to make these observations; a freedom which I hope you will, in consideration of my motives, excuse. With my best Compliments to your Father and kind regards for Mrs Owen and Miss Owen I remain with my best wishes for your success Dear Sir

Yours very faithfully
Rammohun Roy

P.S. I am now troubled with a strong attack of Influenza, which prevents me from sitting for a few minutes or writing a few lines. RR

রবার্ট্ ডেল ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের পত্র।

নিউ ইয়র্ক্ পাবলিক্ লাইব্রেরী।

opinions which your father offers though they by no means were destitute of religion.

My desire to see you and your father crowned with success in your benevolent undertakings, has emboldened me to make these observations, a freedom which I hope, you will, in consideration of my motives, excuse. With my best compliments to your father and kind regards to Mrs. Owen aud Miss Owen I remain with my best wishes for your success Dear Sir

Yours very faithfully
(Sd.) Rammohun Roy

P. S. I am now troubled with a strong attack of influenza which prevents me from sitting for a few minutes or writing a few lines. RR.

নির্ঘণ্ট